মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

২০শ বর্ষ

ফাল্গুন ১৩২৯—মাঘ ১৩৩০

সম্পাদক—

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত, এম্-এ, বি-এল্

শ্রীকৃষ্ণদাস চন্দ্র

প্রকাশক—

শ্রীউপেন্দ্রনাথ রায়

অর্চ্চনা-কার্য্যালয়—

পার্ব্বতীচরণ ঘোষের লেন, অর্চ্চনা পোষ্ট, কলিকাতা।

সম্পাদকীয় বিভাগ—৪০ নং চাষাধোবাপাড়া ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

মূল্য ২৷৷৵

২০শ বর্ষের সূচী

বিষয়	লেখক ও লেখিকাগণের নাম	পৃষ্ঠা
	অ	
অতিথি (কবিতা)	শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, বি-এ	৩৭
অগ্রদূত (কবিতা)	শ্রীকালিদাস রায়	৭৭
অগ্নিমান্দ্য বা অজীর্ণ রোগ	কবিরাজ শ্রীঅমূল্যচরণ চক্রবর্ত্তী ভিষগ্রত্ন	৪৬৫
অনুতপ্ত (গল্প)	শ্রীসুশীলকুমার রায়	৮৯
অনাহূত (কবিতা)	শ্রীভবতারণ সরকার, বি-এ	১০৩
অপরাধ স্বীকার (কবিতা)	শ্রীদ্বিজপদ মুখোপাধ্যায়, বি-এ	১৭৮
অর্চ্চনার সাহিত্য-প্রসঙ্গের প্রতিবাদ	শ্রীগোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	২১৮
অদৃষ্টের খেলা (গল্প)	শ্রীমতী রাধারাণী ঘোষ	২৭১
অনুরোধ (কবিতা)	শ্রীপ্রমথনাথ রায়	২৭৯
অন্তরিতা (কবিতা)	শ্রীঅরীন্দ্রজিৎ মুখোপাধ্যায়, এম-এ	৫৮০
অশ্রু-অঞ্জলি	শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত, এম-এ, বি-এল	৪৩৩
	আ	
আবাহন (কবিতা)	শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, বি-এ	৭৮
আমার দেখা লোক (উদ্ধৃত প্রবন্ধ)	৺মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায়	১০৭
আস্তিক্যবাদ	শ্রীরামসহায় বেদান্তশাস্ত্রী	১২৮
আত্মদ্রোহী (কবিতা)	শ্রীঅবনীকুমার দে	১৮৩
আঁখি (কবিতা)	শ্রীভবতারণ সরকার, বি-এ	২০০
আগাছা (গল্প)	শ্রীপ্রফুল্লকুমার মণ্ডল, বি-এল	২২৩
আমার সকার (গল্প)	শ্রীরাসবিহারী মণ্ডল, বি-এল	৩৪৩
আর্ট ও সাহিত্য (সমালোচনা)	শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভুয়রা, বি-এ	৩৮
আমাদের খাদ্য	শ্রীসুরেশচন্দ্র মিত্র, এল-এম-এস	৪২২
আলোচনা	শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত, এম-এ, বি-এল	৪১
আলোচনা	শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত, এম-এ, বি-এল	৩৮
আত্মোৎসর্গে (কবিতা)	শ্রীঅক্ষয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বি-এ	৪৩৪
	ঈ	
ঈশ্বর গুপ্ত ও সংবাদ প্রভাকর	অধ্যাপক শ্রীহরিহর শাস্ত্রী	২২৮
	উ	
উপেক্ষিতা (গল্প)	শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী	১৪৩

বিষয়]	লেখক লেখিকাগণের নাম
চুণ ও স্বাস্থ্য	... ...
চমৎকার গান (কবিতা)	শ্রীলীলা মিত্র
চিত্ত কোথায় (ঐ)	শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল, বি-এল
	ছ
ছবি (গল্প)	শ্রীমাধবচন্দ্র মিত্র
	জ
জৈন-শাস্ত্রের কথা	অধ্যাপক শ্রীহরিহর শাস্ত্রী
	ট
টুর্গেনিফ্	শ্রীমতী নীহারবালা নাগ চৌধুরী
	ড
ডাকটিকিটের ইতিহাস (উদ্ধৃত প্রবন্ধ)	শ্রীবিমলকান্তি মুখোপাধ্যায়
	ত
তুমি প্রেমময় (কবিতা)	শ্রীদেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়
তুমি (ঐ)	শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায়, বি-এ
	দ
দেশীয় ভৈষজ্যতত্ত্ব	কবিরাজ শ্রীইন্দুভূষণ সেনগুপ্ত আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রী, এচ্-এম্-বি
দায়মুক্ত (গল্প)	শ্রীহৃষিকেশ চট্টোপাধ্যায়, বি-এ
দুঃখবরণ (কবিতা)	শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল, বি-এল
দেবদর্শন (ঐ)	শ্রীমতী বীণাপাণি দেবী
	ধ
ধরার ধূলি (কবিতা)	শ্রীকালিদাস রায়
ধর তুমি মোর দুটি হাত (কবিতা)	শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায়, বি-এ
	ন
নববর্ষের প্রার্থনা (কবিতা)	শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল, বি-এল
নিশীথে (ঐ)	শ্রীপ্রমথনাথ রায়
নব যুগের সত্য	শ্রীসাহাজী
	প
পথভ্রান্ত (গল্প)	শ্রীরাসবিহারী মণ্ডল, বি-এল
প্রেমের চিহ্ন (কবিতা)	শ্রীদ্বিজপদ মুখোপাধ্যায় বি-এ
পরিবর্ত্তন (গল্প)	শ্রীসুশীলকুমার রায়
পারের-ডাক (কবিতা)	শ্রীঅক্ষয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বি-এ

হ

ক্ষ

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

২০শ ভাগ] { ফাল্গুন, ১৩২৯। } [১ম সংখ্যা

বৃহদারণ্যকে গার্গী যাজ্ঞবল্ক্য।

[শ্রীরামসহায় বেদান্তশাস্ত্রী]

রাজর্ষি জনকের অশ্বমেধ যজ্ঞ। দেশের সকল ঋষিই সেই যজ্ঞে আহূত হইয়া নিমন্ত্রিত। জনক জানিতে চাহিলেন—এই ঋষিগণের মধ্যে 'ব্রহ্মিষ্ঠ' কে? উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিলেন—"আপনাদের মধ্যে যিনি ব্রহ্মিষ্ঠ—তিনি এই সহস্র পয়স্বিনী গ্রহণ করুন; আমি তাঁহাকে এই দান করিলাম।" সকল ঋষিই নিস্তব্ধ। কে শ্রেষ্ঠ, কে দান লইবে—এই ভাবিয়া সকলেই পরস্পরের মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন।

তখন মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য সেই সভা মধ্যে উঠিয়া সেই সহস্র গোধন গৃহে লইয়া যাইবার জন্য নিজের প্রিয় ছাত্রকে আজ্ঞা করিলেন। নিস্তব্ধ সমুদ্রবৎ সেই বৃহৎ যজ্ঞস্থল সহসা বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। সকলেরই মনে তখন এই ভাব হইল—'যাজ্ঞবল্ক্য কিসে সকলের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইলেন?' যজ্ঞের হোতা 'অশ্বল' প্রথমেই নিজের অসন্তোষ ব্যক্ত করিলেন, কহিলেন—"যাজ্ঞবল্ক্য, কিসে তুমি 'ব্রহ্মিষ্ঠ' ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ হইলে?"

সমবেত ব্রাহ্মণেরা সকলেই হৃদয়ের সহিত ইহার সমর্থনসূচক মনোভাব প্রকাশ করিলেন। তখন যাজ্ঞবল্ক্য ধীরে ধীরে আসন ত্যাগ করিয়া দাঁড়াইয়া উঠিলেন, কহিলেন, "আমি ব্রহ্মিষ্ঠগণকে নমস্কার করি, গোধন আমার প্রিয় এবং ইহার প্রয়োজন আছে—তাই আমি লইলাম। ঔদ্ধত্য ব্রাহ্মণের লক্ষণ নহে, নিরভিমানিতাই ব্রাহ্মণের ভূষণ, তজ্জন্যই এই উক্ত।

যজ্ঞের হোতা অশ্বল প্রশ্ন করিয়া তাহার সদুত্তর পাইয়া নিরস্ত হইলেন। বুঝিলেন যাজ্ঞবল্ক্যের সহিত বিচারে তাঁহার জয়ের আশা নাই। আরও দুই চারিজন বিচারার্থ অগ্রসর হইয়া সুবিধা নহে বুঝি। মৌন হইলেন।

তখন ব্রহ্মবাদিনী, ব্রহ্মচারিণী গার্গী উঠিয়া যাজ্ঞবল্ক্যের সহিত বিচারার্থ দাঁড়াইলেন। দুই চারিটি কথার পর অকস্মাৎ যাজ্ঞবল্ক্য জলদগম্ভীর স্বরে গার্গীকে আদেশ করিলেন—"নিস্তব্ধ হও গার্গি, 'ব্রহ্মলোক কাহাতে ওতঃপ্রোত' এ প্রশ্ন বন্ধ কর, নতুবা তোমার এখনই মস্তকপাত হইবে।"

গার্গী মস্তক-পাত ভয়ে মৌনী হইয়া আসনে বসিয়া পড়িলেন। তখন 'আরুণি' প্রভৃতি অবশিষ্ট ঋষিরাও বিচারার্থ অগ্রসর হইয়া একে একে নিরস্ত হইলেন।

'যাজ্ঞবল্ক্যই ব্রহ্মিষ্ঠ'—ইহা উদ্ঘোষিত হইবার উপক্রম দেখিয়া গার্গী কহিলেন—"আমি মস্তক পাত ভয়ে মৌন হই-

য়াছি। সমবেত ব্রাহ্মণমণ্ডলী আমাকে আদেশ করিলে আমি যাজ্ঞবল্ক্যকে দুইটী প্রশ্ন করি।" সকলেই গার্গীকে উৎসাহ দিলেন। গার্গী তখন জিজ্ঞাসা করিলেন—

যাজ্ঞবল্ক্য, স্বর্গের ঊর্দ্ধে পৃথিবীর নিম্নে, স্বর্গ ও মর্ত্ত্যের মাঝখানে অবস্থিত, তাহা কাহাতে ওতঃপ্রোত ভাবে বিদ্যমান? আর, যাহার মধ্যে স্বর্গ ও মর্ত্ত্য অবস্থিত, যাহা অতীতে বর্ত্তমানে ও ভবিষ্যতে স্থিতিশীল তাহাই বা কাহাতে ওতঃপ্রোত ভাবে বর্ত্তমান?—ইহাই আমার প্রথম প্রশ্ন।

যাজ্ঞবল্ক্য গার্গীর প্রশ্নে বড়ই সন্তোষ লাভ করিয়া ধীরে ধীরে উত্তর দিলেন। 'আকাশে ওদোতঃ প্রোতঞ্চেতি'। "গার্গি, তুমি সূত্রাত্মক বিশ্বের বিষয়ে প্রশ্ন করিয়াছ। এই সূত্রাত্মক নামরূপে প্রকাশিত জগৎ প্রপঞ্চ, নামরূপবিহীন সূক্ষ্ম আকাশে ওতঃপ্রোত ভাবে বিদ্যমান! এই দৃশ্যমান্ জগৎ প্রপঞ্চ, এই নামরূপ বিশিষ্ট দ্বৈতবিষয়, এই স্থূল ভৌতিক পদার্থ অব্যাকৃত আকাশেই কি অতীত কি ভবিষ্যতে বর্ত্তমান!"

গার্গীর প্রথম প্রশ্নের উত্তর হইয়া গেল। তখন সেই গর্ব্বিতা ব্রহ্মবাদিনী রমণী যাজ্ঞবল্ক্যকে নমস্কার করিয়া বলিলেন—"ধন্য ঋষিবর, প্রথম শর আমার ব্যর্থ হইল। এইবার দ্বিতীয় শর ক্ষেপ করিব। সাবধান হউন মহর্ষি!"

"মানিলাম, এই ব্যাকৃত—নামরূপে প্রকাশিত বিশ্ব, নামরূপহীন অব্যাকৃত আকাশে ওতঃপ্রোত। কিন্তু এই অব্যাকৃত নামরূপহীন আকাশ কি কাহাতে ওতঃপ্রোত বিদ্যমান্? যদি কাহাতে বিদ্যমান হয়—তবে সে কি পদার্থ ঋষিবর?"- ইহাই আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন।

'অস্মিন্ খল্বক্ষরে গার্গ্যাকাশ ওতঃপ্রোতশ্চেতি'

এই প্রশ্নে যাজ্ঞবল্ক্য বড় সন্তুষ্ট হইলেন। বুঝিলেন, গার্গীরই বেদপাঠ সার্থক। কহিলেন—"শোন গার্গি, তোমার দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর। অবহিত হও ব্রহ্মবাদিনি।"

'নামরূপবিহীন অব্যাকৃত আকাশ এই অক্ষর পরমব্রহ্মে ওতঃপ্রোত ভাবে বর্ত্তমান। যাহা প্রত্যক্ষ হইয়াও পরোক্ষ, যাহা সকল গতির পরাকাষ্ঠা, যাহা সর্ব্বান্তর, অশনায়াদি ধর্ম্মহীন—সেই নিত্য অক্ষর পরম ব্রহ্মে—কি ব্যাকৃত বিশ্ব, কিবা অব্যাকৃত আকাশ ওতঃপ্রোতরূপে বিদ্যমান। তিলে যেমন তৈল থাকে, মণিমালায় যেমন সূত্র থাকে, তেমনই ভাবেই অবস্থিত। এ যেন শূন্যে ইন্দ্রজাল, আকাশে গন্ধর্ব্ব নগর, মরীচিকায় মরুভূমি। এ যেন অনাদি বহমান্ স্বপ্ন ধারা। এ এক অনির্ব্বচনীয় অপূর্ব্ব লীলারস প্রবাহ।

'অস্থূলমনণ্বহ্রস্বমদীর্ঘমলোহিতমস্নেহমচ্ছায়মতমঃ' ইত্যাদি। 'ন ক্ষরতীতি অক্ষরঃ'—এই অক্ষর বা পরম ব্রহ্ম স্থূল নহে, অণু নহে। ইহা লোহিতবর্ণ, শুভ্রবর্ণ, কৃষ্ণবর্ণ নহে—ইহা গুণহীন। ইহা বায়ু নহে, আকাশও নহে। রূপ রস গন্ধ, বাক্য মন প্রাণ চক্ষু শ্রোত্র ত্বক—এ সকল তিনি কিছুই নহেন, ইঁহার ছিদ্র নাই, কিছুই ইনি ভোগ করেন না। বাহ্য বস্তু ইঁহার ভোগ্য নহে, কোন বিশেষণেই ইনি বিশেষিত নন।*

এতস্যাক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠতঃ। ইত্যাদি—

এই অক্ষরের প্রশাসনে অবস্থিত বলিয়া সূর্য্য চন্দ্র অহোরাত্রের প্রদীপের কার্য্য করে। স্বর্গ মর্ত্ত্য ইঁহারই প্রশাসনে বিধৃত; নিমেষ মুহূর্ত্ত মাস ঋতু সংবৎসর ইঁহারই প্রশাসনে নিয়ন্ত্রিত। হিমালয়াদি পর্ব্বত, গঙ্গাদি নদী, পশ্চিমদিগভিমুখী সিন্ধু আদি নদ ইঁহারই প্রশাসনে আবদ্ধ। মানবেরা যে দেবতাদের উপাসনা করে, যজমানেরা যে যজ্ঞ করে, ব্রাহ্মণপুত্রগণ যে শ্রাদ্ধ তর্পণ করে—ইঁহারই প্রশাসনে প্রশাসিত বলিয়া। এই প্রশাসন চ্যুতি ঘটিলে কোন সৃষ্টির নিয়ম-শৃঙ্খলা থাকিবে না, প্রকৃতির বিপর্য্যয় ঘটিবে, বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড প্রলয় সলিলে ডুবিয়া যাইবে।

"যো বা এতদক্ষরং গার্গ্যবিদিত্বাঽস্মাৎ
লোকাৎ প্রৈতি স কৃপণঃ॥"

'গার্গি,—তাহারাই কৃপণ, যাহারা এই অক্ষরতত্ত্ব না বুঝিয়া, বুঝিবার চেষ্টা না করিয়া ইহলোক ত্যাগ করে। এই অক্ষরতত্ত্ব আয়ত্ত না করিয়া তপস্যা হোম যজ্ঞ শিক্ষা দীক্ষা উপাসনার আংশিক ফল ফলে মাত্র।

---

* 'অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্' অণু হইতে অণু, মহান্ হইতে মহান্, সর্ব্বগুণময়। বায়ু তেজ আকাশাদি সর্ব্বরূপে স্থিত। ইনিই ভোক্তা; সর্ব্ব বিশেষণেই বিশেষিত, সবিশেষ।—লেখক।

"অন্নং বৈ তেষাং সুখং'—তাহাদের সুখ অল্প। সে অল্প সুখে মনের তৃপ্তি ঘটে না। সংসারের রোগ শোক, বিবাদ কোলাহল হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায় না। অভাব আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ না হওয়ায় প্রাণের হাহাকার ঘোচে না।

"যো বা এতদক্ষরং গার্গী বিদিত্বাঽস্মাৎ লোকাৎ প্রৈতি স ব্রাহ্মণঃ"।

যিনি এই অক্ষরতত্ত্ব সম্যক্ বুঝিয়া এই সংসার ত্যাগ করেন—তিনিই ব্রাহ্মণ। পরিপূর্ণ সুখ, প্রচুর আনন্দ তাঁহারই ঘটে। তিনি সুখে উন্মত্ত, দুঃখে বিহ্বল, বিলাস লালসায় ব্যগ্র হন্ না। রোগ শোকে অবিচলিত, অভাব আকাঙ্ক্ষায় একরূপে অবস্থিত, ক্রোধ কাম লোভে মোহে অপরিচ্যুত—তিনিই ব্রাহ্মণ। ত্যাগে যাঁহার আনন্দ, অপমানেও যাঁহার অক্ষোভ, অল্পেই যিনি সন্তুষ্ট—তিনিই ব্রাহ্মণ। *

অর্থের যিনি পূজা করেন, অক্ষরতত্ত্ব বুঝিবার যিনি চেষ্টা করেন না, কাম ক্রোধ লোভ মোহের যিনি দাসত্ব করেন—তিনি ব্রাহ্মণ নন্ গার্গি!

এই অক্ষর কেমন জান গার্গি? ইহা যাবতীয় পৃথিব্যাদি বস্তুতে বিদ্যমান; অথচ পৃথিব্যাদি কোন কালে তাঁহাকে জানিবে না, জানিবার সম্ভাবনাও নাই। এই পৃথিব্যাদি যাঁহার শরীর, যিনি এই পৃথিব্যাদিকে শরীরের মত ইচ্ছানুসারে চালাইতেছেন সেই অন্তর্যামী অমৃত আত্মা[illegible] অক্ষর জানিও। অদ্রষ্টা হইয়া দ্রষ্টা, অশ্রোতা হইয়া শ্রো[illegible]

'অপাণিপাদো জবনোগ্রহীতা
পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ'।

এই দৃশ্যমান, যাহা কিছু দেখিতেছ গার্গি, উহা [illegible] অক্ষর পরমাত্মার আভাস মাত্র। সীমাবদ্ধ দৃষ্টি লইয়া বি[illegible] করিলে তিনি সসীম পরিচ্ছিন্ন, উপাধিযুক্ত। পারমা[illegible] দৃষ্টিতে বিচার করিলে তিনি নিরুপাধি, নিত্য, অরূপ অনাম। আমাদের রূপ আকার দৃষ্টান্তে যদি তাঁহা সাকার সত্যরূপ বিশিষ্ট বল, তবে তাহা ঔপাধিক মায়াময়। আর যদি তাঁহারই রূপ আকার তাঁহারই ভ[illegible] ভাবময়, তাঁহারই জ্যোতিতে জ্যোতির্ময় ভাব, তাহা হই[illegible] তিনি সত্যই সাকার, সত্যরূপ বিশিষ্ট, নিরঞ্জন।

ভক্তানুকল্পাধৃত বিগ্রহ শ্রীভগবান্ নিত্যদ্রষ্টা নিত্য স্বরূপ, মনোময় মনোগম্য যাহাই বল না কেন, সক[illegible] তাঁহাতে কল্পিত, সকলই তাঁহাতে সত্য।

তখন সেই সমবেত ব্রাহ্মণমণ্ডলী মনে মনে বুঝিলেন যাজ্ঞবল্ক্যই আমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তখন গার্গী প্র[illegible] আশাতিরিক্ত উত্তর জানিয়া যাজ্ঞবল্ক্যকে প্রণাম ক[illegible] ব্রাহ্মণগণকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন—

ভো ভগবন্তো ব্রাহ্মণাঃ, যাজ্ঞবল্ক্য বস্তুতঃই ব্রহ্মিষ্ঠ।

এবার কবি।

[শ্রীপ্রিয়লাল দাস এম-এ]

অক্ষয়কুমারের অপরিণত বয়সে রচিত "কনকাঞ্জলি" নামক গীতি-কাব্য পাঠ করিলে মনে হয় যে, কবির কল্পনা স্বপ্নময় জগতে 'জোছনার স্রোতে ভেসে ভেসে' একদিন 'বরষা-রাতের এক স্বপন-কাহিনী'র মত 'আঁধারে মিলায়ে' যাইবে। কিশোর কবি অক্ষয়কুমার তখন সেলির নিকট 'আঁখির আশা' 'আঁখির ভাষা' সম্বন্ধে পাঠ মুখস্থ করিতেছেন, রবার্ট ব্রাউনিং-এর কাব্য-কাননে অতীতের স্মৃতি-[illegible] ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। রবীন্দ্রনাথের ন্যায় অক্ষয়কু[illegible] প্রথম যৌবনে বৈষ্ণব কবির পাঠশালায় প্রেমের [illegible] পড়িয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না। বৈষ্ণব কবির ভাষ ভাবানুকরণে রচিত ভানুসিংহের পদাবলীর মত কো[illegible] কিছু অক্ষয়কুমার লেখেন নাই। তবে, দরশে, পর[illegible] অনিমিখ, প্রভৃতি শব্দগুলি যে ভাবে তিনি তাঁহার কা[illegible] প্রয়োগ করিয়াছেন তাহাতে মনে হইতে পারে যে, [illegible]

* উপবীত বা অন্যান্য ব্রাহ্মণ্য সংস্কার, বেদপাঠ ব্রাহ্মণের পক্ষে আবশ্যক। ইহা বাহ্য।

তিনি বৈষ্ণব কবির অভিধান হইতে সেগুলি সংগ্রহ করিয়াছেন। আমাদের কিন্তু বিশ্বাস যে, অক্ষয়কুমার রবীন্দ্রনাথের কাব্য-গ্রন্থ হইতে এই শব্দগুলি গ্রহণ করিয়াছেন। শুধু তাই নয়, বড়াল কবির "কনকাঞ্জলি"তে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব স্পষ্ট অনুভব করা যায়। রবীন্দ্রনাথের গুরু স্বর্গীয় কবি বিহারীলাল চক্রবর্ত্তীকে "কনকাঞ্জলি" উৎসর্গ করা হইয়াছে। 'উৎসর্গ' নামক কবিতায় অক্ষয়কুমার বিহারীলালকে গুরু বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন। এক হিসাবে বিহারীলাল রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ কবিকুলের গুরু, কারণ বিহারীলাল বঙ্গীয় কাব্য-জগতে 'ভাবের' নূতন যুগ আনয়ন করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ "বিহারীলাল" শীর্ষক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন,—"কবির নিজের হৃদয়গত আশা আকাঙ্ক্ষা সুখ দুঃখের কথা আমরা বিহারীলালের কাব্যই প্রথম দেখিতে পাই।" রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা কিন্তু এই নবযুগের কবিদের কল্পনাকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। অক্ষয়কুমার কবি-জীবনের উষাকালে রবীন্দ্রনাথের কবিতার যে অত্যন্ত পক্ষপাতী হইয়া পড়িয়াছিলেন তাহার প্রমাণ "কনকাঞ্জলি"র অনেক স্থানে পাওয়া যায়। 'দেহ চায় দেহের পরশ,' 'ম্লান শশী,' 'মৃদুল মধুর বাজে,' ও অন্যান্য অনেক প্রকার শব্দ যোজনা রবীন্দ্রনাথের স্পষ্ট অনুকরণ। অক্ষয়কুমারের 'সন্ধ্যায়' শিশুর স্নেহ-আকর্ষণ রবীন্দ্রনাথের একটি সুবিখ্যাত কবিতায় শিশুর 'যেতে নাহি দিব,' এই উক্তির ব্যাখ্যা মাত্র। "কনকাঞ্জলি"র কয়েকটি কবিতার মূল আদর্শও রবীন্দ্রনাথের 'মানস-সুন্দরী'। অক্ষয়কুমার 'অবশেষে,' 'আমার এ কাব্যে' ও 'কবিতা বিদায়' নামক পদ্যময় রচনায় কবিতা-সুন্দরীকে প্রণয়িনীরূপে কল্পনা করিয়াছেন। বড়াল কবির এই কবিতা-সুন্দরী রবীন্দ্রনাথের 'মানস-সুন্দরী'র সখী হইবারও উপযুক্ত নহে। অক্ষয়কুমার "কনকাঞ্জলি"তে রবীন্দ্রনাথের অনুকরণে যে স্বপ্ন-রাজ্য সৃজন করিয়াছেন তাহাতে কিন্তু ভাবুকতার কেমন একটি অস্পষ্ট সুর মাঝে মাঝে শুনা যায়। এইটি অক্ষয়কুমারের নিজের জিনিষ আর ইহাতে-ই তাঁহার স্বাতন্ত্র্যের সামান্য আভাস পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথের ন্যায় অক্ষয়কুমারের যৌবন-স্বপ্নে উন্মত্ত আকাঙ্ক্ষার পরিচয় পাওয়া যায় না। রবীন্দ্রনাথের কল্পনা যতক্ষণ না সৌন্দর্য্যকে নগ্নাবস্থায় উপভোগ করিয়াছে ততক্ষণ পরিতৃপ্ত হয় নাই। অক্ষয়কুমারের ক্ষুধাতুর হৃদয় সংযম মানিয়া কল্পনাকে মিতাচার শিক্ষা দিয়াছে। হিন্দু সমাজের কঠোর শাসন অক্ষয়কুমারের প্রতিভাকে উচ্ছৃঙ্খল বিলাসভোগে প্রবৃত্ত হইবার অবসর দেয় নাই। অতৃপ্ত কবি হৃদয়ের বাসনাগুলি সেইজন্য অনেক সময়ে পরের প্রমোদ-প্রফুল্ল বাঁশীর স্বরে চমকাইয়া উঠিয়াছে।

> "এ যে রে সুখের ধরা,
> প্রেমের স্বপনে ভরা—
> কার বাঁশী গেয়ে গেল কাহার তরে!
> বাঁধিতেছিলাম মন আপন ঘরে।"
> (বাঁশরী স্বরে)

ইহা রবীন্দ্রনাথের বাঁশীর স্বর। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত অনেক কিশোর কবিকে এইরূপে গৃহের বাহিরে 'প্রেমের স্বপনে ভরা' কাল্পনিক জগতে টানিয়া লইয়া গিয়াছে। যৌবনে বাস্তব জগতের দিকে কবিরা স্বভাবতঃই আকৃষ্ট হয় না। 'সরল-হৃদয় কবি যেখানে মাধুরী-ছবি' দেখে সেখানে দাঁড়ায়ে আকুল মনে কত কি বকিতে থাকে। "কনকাঞ্জলি"র কবিতাগুলি পাঠ করিতে করিতে সেই জন্য মনে হয় যে, অক্ষয়কুমার অনেক বিচ্ছিন্ন ভাব কতকটা শিথিল ছন্দে গাঁথিয়াছেন। তবে, অক্ষয়কুমারের কবি-হৃদয় যে প্রেম প্রেম করিয়া একেবারে উন্মত্ত হয় নাই তাহা সুনিশ্চিত। কবি নিজেই বলিয়াছেন যে, তিনি মনকে আপন ঘরে বাঁধিতে চেষ্টা করিতেছিলেন। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর শিক্ষিত বাঙ্গালীর গৃহে যে প্রেম বিরাজ করিতেছে তাহাতে দোষাবহ বাসনার গন্ধ নাই। সে "অজর প্রেম, দেবতার পুণ্যভোগ—চিরশুভ, সুন্দর, মহান্।" কবি তাই বলিতেছেন—"ও মুখ হেরিয়া আজ মনে হয় তীর্থ ঘুরি' আসিয়াছি দেশে পুনরায়।" (সম্ভাষণ) অক্ষয়কুমার ক্রমশঃ আধুনিক বঙ্গীয় কাব্য-সাহিত্যের পরকীয়া প্রেমের মোহিনী-শক্তিকে উপেক্ষা করিতে সাহসী হইতেছেন। অক্ষয়কুমার যদি ভাবুক না হইতেন, তাঁহার হিন্দুসমাজ যদি অবাধ প্রেমের প্রতিবাদ করিতে শিখিত, কিম্বা যদি তিনি সমাজ-সংস্কারক

সাজিয়া বিধবা বিবাহ ও স্ত্রীস্বাধীনতার পক্ষ অবলম্বন করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার কাব্য গ্রন্থসকল অতৃপ্তি, অশান্তি, নিরাশার হাহাকারে ভরিয়া যাইত। অক্ষয়কুমার তাহা হইলে 'প্রেম কি বুঝান যায়?'—এই প্রশ্নের উত্তরে আদর্শ হিন্দুনারীর হৃদয়গত গভীর প্রেমের স্বরূপ বর্ণন করিতে পারিতেন না।

"পরবাসে পতি, মরে কেন সতী?
মতি-গতি পতি-পায়।
আপন মরণে আপনি বরিয়া
কেমনে বুঝাব তায়!"

এষা-কাব্যে অক্ষয়কুমারের কবিত্বের যে পূর্ণ বিকাশ আমরা দেখিতে পাই "কনকাঞ্জলি"র কয়েকটি গাম্ভীর্য্যপূর্ণ রচনায় তাহার সূচনা হইয়াছে। মধু-যামিনীতে প্রকৃতির উৎসব লীলার অভিনয় দেখিয়া কুসুম-কামিনীর নিকট বিদায় গ্রহণ কালে কবি বলিলেন,—"এখনো দেবতা আঁখি জাগিয়া আকাশে; এখনো দেবতা শ্বাস ভাসিছে বাতাসে।" কবি জড়ের অতীত দেশে এইবার উপস্থিত হইয়াছেন। কল্পনার ছবিতে এখন হইতে তিনি 'স্বপন-ছলনার' পরিবর্ত্তে জীবনের অন্তরালে অনন্ত জীবন বিকাসিত করিয়া দেখাইতে আরম্ভ করিলেন।

"জন্মিয়া অনন্ত-মাঝে, বাড়িয়া অনন্ত-মাঝে,
অনন্তের হ'য়ে অবতার—
তুচ্ছ সুখে দুঃখে আর, আত্মঘাতী হই কেন,—
কেন্দ্র করি' দেহ আপনার?
ধূমায়িত দীপ-শিখা দাও দাও নিবাইয়া,
উঠুক—উঠুক ঊষা হেসে!
পঙ্কিল সরসীকূলে রেখ না ডুবায়ে আর,
যাই—যাই পারাবারে ভেসে!"

স্বপ্নের ঘোর কাটিয়া গেলে অক্ষয়কুমার বোধ হয় রবীন্দ্রনাথের সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন,—"অর্দ্ধ-নিদ্র-জাগরণে ধরা স্বর্গচ্ছবি—জীবনে স্বপন-ভ্রম, ফুটে রবি-কবি!" অক্ষয়কুমারের বিচারশক্তি দিন দিন বাড়িতেছে। তিনি কবি ও কাব্য আলোচনা করিতে শিখিয়াছেন। "শঙ্খ" নামক কাব্যে অক্ষয়কুমার রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আরও অনেকগুলি বাঙ্গালী কবির প্রশংসা করিয়াছেন। তিনি সংসাররূপ কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিবার পর যে সকল কবিতা রচনা করিয়াছিলেন তাহাতে কবির নিজের জীবনের অনেক কথা স্থান পাইয়াছে। "শঙ্খ" নামক কাব্যগ্রন্থে এই শ্রেণীর অনেকগুলি কবিতায় কবির আত্মকথা লিপিবদ্ধ হইয়াছে। 'বন্ধুর বিবাহে' ও 'কন্যার বিবাহে' অক্ষয়কুমার যাহা লিখিয়াছেন তাহাতে আরও বেশী আন্তরিকতা প্রকাশ পাইলে ভাল হইত। 'পিতৃহীন,' 'মাতৃহীন,' 'সংসারে' ও 'বালবিধবা' নামক কয়টি কবিতায় করুণ রস তেমন গাঢ় হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। 'পূজার পর,' 'মাণিক' ও 'পঞ্চদশ বর্ষ গত' শীর্ষক তিনটি কবিতায় হাস্যরস সৃষ্টি করিবার চেষ্টা দেখা যায়। অক্ষয়কুমার হাস্যরসের কবি নহেন। 'বঙ্গভূমি' ও 'কিসের অভাব' নামক দুইটি কবিতায় স্বদেশানুরাগ ফুটিয়া বাহির হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। শেষোক্ত কবিতাটি দ্বিজেন্দ্রলালের সুবিখ্যাত মাতৃবন্দনার ক্ষীণ প্রতিধ্বনি মাত্র। 'শঙ্খ' নামক কাব্যগ্রন্থের উল্লিখিত কবিতাগুলি পাঠ করিয়া মনে হয় যে, কবি স্বপ্নভঙ্গের পর কিছুদিন ধরিয়া পারিবারিক সঙ্কীর্ণতার মধ্যে অবস্থান করিয়াছিলেন। সেই সময়ে তিনি আধুনিক বাঙ্গালা কাব্য পাঠে মনোনিবেশ করেন। অক্ষয়কুমার যে ইংরাজি কাব্য-সাহিত্যও এই সময়ে পাঠ করিতেছিলেন সে কথা তিনি 'আদর' নামক কবিতার শীর্ষটীকায় স্বীকার করিয়াছেন। বড়াল কবি পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও দর্শনশাস্ত্র হইতে যে জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, বিপুল ইংরাজি কাব্য-সাহিত্য ও ইতিহাস পাঠ করিয়া যে সকল ভাব সংগ্রহ করিয়াছেন, তাঁহার পঙ্ক্তময় রচনায় সেই অভিজ্ঞতা ও নব-ভাবকে সাজ-ঘরের পোষাকে ঢাকিয়া দিয়া কবির নূতন একটা কিছু সৃষ্টি বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা দেখা যায় না। আধুনিক যুগে একাধিক বাঙ্গালী কবি ইংরাজ কবির ভাববিশেষকে কল্পনার সাহায্যে নিজস্ব করিয়া লইয়াছেন বটে কিন্তু শিল্প-চাতুর্য্যের অভাবে অনেক সময়ে একটা অস্পষ্টতার ছায়া সেই ভাবটির সৌন্দর্য্য ফুটাইয়া বাহির করিবার পক্ষে অন্তরায় হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের ন্যায় নিপুণ শিল্পীর হাতেও কখন কখন ইংরাজ কবি শেলির সব দোষগুলি সম্পূর্ণ ঢাকা

পড়ে নাই। অস্পষ্টতা ও যুক্তির অভাব সেলির কবিতায় যেমন আছে তাঁহার ভাবানুকরণে রবীন্দ্রনাথ কর্ত্তৃক রচিত কবিতায় তেমনই রহিয়া গিয়াছে। অক্ষয়কুমার ভাবের ঘরে কখনও ভেজাল চালাইবার চেষ্টা করেন নাই। "প্রদীপ" নামক গীতি-কাব্যে তাঁহার রচিত 'মানব-বন্দনা' নামে কবিতা পাঠ করিয়া আমরা বেশ বুঝিতে পারি কোন্‌খানটায় তিনি ডারউইনের মতবাদকে লক্ষ্য করিয়াছেন, কোথায় গ্রীক কবির সহিত 'গ্রহে গ্রহে আবর্ত্তন—গভীর নিনাদ' শুনিয়াছেন, ঐতিহাসিক গবেষণার আলোকে কিরূপে তিনি প্রস্তর-যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া যাযাবর মানবের সহিত ভ্রমণ করিতে করিতে শেষে নগরবাসী নর-দেবতার সন্ধান পাইয়াছেন। এই গীতি-কাব্যের 'নারী-বন্দনা' নামক কবিতায় নিউটন কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত মাধ্যাকর্ষণ শক্তির উল্লেখ আছে। অক্ষয়কুমার মিল্টনের 'প্যারাডাইজ লষ্ট' ও টেনিসনের 'ইন্ মেমোরিয়াম্' যে উত্তমরূপ আয়ত্ত করিয়াছিলেন তাহার প্রমাণ তাঁহার কাব্য-গ্রন্থে পাওয়া যায়। অক্ষয়কুমার যে "শঙ্খ" নামক গীতি-কাব্য রচনাকালে হিন্দুশাস্ত্রোক্ত ত্রয়ী-তত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছিলেন তদ্বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই। উক্ত কাব্যের ভূমিকায় 'ত্রয়ী' নামক কবিতার ভাবটি বিশ্লেষণ করিয়া খুব জমকাল রকমের যে এগার পৃষ্ঠাব্যাপী সমালোচনা লিখিত হইয়াছে তাহার সহিত চারিটি মাত্র নাতিদীর্ঘ শ্লোকে রচিত এই কবিতার সামঞ্জস্য রক্ষা করা সুকঠিন। কবিতাটি পাঠ করিয়া অনুবাদ লেখকের হৃদয়ের অন্তঃপুরে যে ধ্বনি উত্থিত হইয়াছিল তাঁহার লেখনীমুখে তাহার বর্ণনা বিস্তৃত হইতে বিস্তৃততর হইয়া পড়িয়াছে। সাধারণ পাঠক 'ত্রয়ী' পাঠ করিয়া বুঝিবেন যে, কবি 'ওঙ্কার ধ্বনি'র কবিত্বময় ব্যাখ্যায় হিন্দুর ধর্ম্মশাস্ত্রে লিখিত ইহার বিবিধার্থ বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। ওঙ্কার অর্থে তিন বেদ, ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর, সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়, সৎ চিৎ আনন্দ, ইত্যাদি বুঝায়। কবি সেইজন্য 'জীবনের এ সঙ্গীত মহান্‌' —এই ওঙ্কার ধ্বনিতে ভীষণ মধুর ও সুন্দর, এই তিনটি ভাবকে বিবৃত করিয়া দেখাইয়াছেন। 'হৃদয় শঙ্খ' নামক কবিতাটিতে 'ত্রয়ী'র গীতি-কথা ও কবির নিবেদন সুন্দর ভাবে মিশিয়া গিয়াছে। 'প্রাতভার উদ্বোধন' শীর্ষক কবিতায় সেই 'অনাহত ওঙ্কার ঝঙ্কার' শুনা যাইতেছে। কবির চিত্তাকাশ 'নব জাগরণে' আকুল ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছে।

কাব্য পাঠ করিয়া কবির মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে বিচার করা সকল সময়ে সহজ নহে। অক্ষয়কুমার সরল হৃদয়ের কথা এমন সহজ ভাষায় তাঁহার কবিতার ভিতর দিয়া প্রকাশ করিয়াছেন যে, আমরা নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি, এই হিন্দু কবি শাস্ত্রালোচনায় প্রবৃত্ত হইবার পর তাঁহার কবি-হৃদয় হিন্দুধর্ম্মতত্ত্বের সাড়া পাইয়া জাগিয়া উঠিয়াছিল। অক্ষয়কুমারের কাব্য-মন্দিরে মঙ্গল-শঙ্খের ধ্বনি তাঁহার কবি-জীবনে পরিবর্ত্তনের স্পষ্ট আভাস দিতেছে। এতদিন তাঁহার কল্পনা রঙ্-মশালের আলোয় মুগ্ধ হইয়া শোভাযাত্রার আদর্শে মানব-জীবনের ছবি আঁকিতেছিল। নির্ম্মম বাস্তব জগতে মানুষকে, বিশেষতঃ বাঙ্গালীকে যে ভীষণ সংগ্রামে দিনরাত ব্যাপৃত থাকিতে হয়, তৎসম্বন্ধে কবি যখন সংসারের নানা কার্য্যে অভিজ্ঞতা লাভ করিলেন, তখন তাঁহার শিক্ষা সম্পূর্ণ হইল। সুখে দুঃখে ভরা গৃহস্থ বাঙ্গালীর ঘরে জন্ম মৃত্যু বিবাহ কবির হৃদয়ের অন্তরতম দেশে যে সকল উৎসের মুখ খুলিয়া দিয়াছিল তাহাতে অন্তর্জগতের অনেক শুষ্ক স্থান সরস হইতেছিল। 'সদ্যজাতা কন্যা' নামক কবিতাটিতে যদিও ভাবের পুনরুক্তি আছে, তাহা হইলেও এই কবিতাটি বেশ সুন্দর ও মনোরম। ইহাতে কবিত্বের সহিত হিন্দুশাস্ত্রোক্ত আত্মার জীবদেহ ধারণ করিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে জন্মগ্রহণ ইত্যাদি নানা কথা মিশিয়া গিয়াছে। 'শ্মশান-প্রান্তে', 'জন্ম ও মৃত্যু', 'শিশু হারা' ও 'বিপত্নীক'—এই কবিতাগুলিতে করুণরসই আত্মহারা বিহ্বল শোকের ভিতর দিয়া পাঠকের হৃদয়কে অবশ করিয়া ফেলে। অক্ষয়কুমারের তুলিকাতে ট্রেজেডির ছবি যে উৎকর্ষতা লাভ করিতে পারে, তাহার পরিচয় আমরা এই কয়টি কবিতায় পাই। এবার কবি হৃদয়হীন বাস্তব জগতে ট্রেজেডির পথে ক্রমশঃ অগ্রসর হইতেছেন। "শঙ্খ কাব্যে" 'প্রার্থনা' শীর্ষক একটি ক্ষুদ্র পদ্যময় রচনায় কবির অনুতপ্ত হৃদয় গলিয়া বাহির হইয়াছে।

"আজি—বহুদিন পরে ভ্রান্ত পুত্র ফেরে ঘরে,
তুমি পিতা তার—
সব অপরাধ ভুলে', লও—লও বুকে তুলে'
আগ্রহে আবার!"

কবি 'প্রার্থনা' নামক আর একটি কবিতায় বলিয়াছেন,—

"ঋষি বলে,—'ধ্রুব তুমি, বরেণ্য ভূমান্।'
কবি বলে,—'তুমি শোভাময়।'
গৃহী আমি, জীব যুদ্ধে ডাকি হে কাতরে,—
'দয়াময়, হও হে সদয়!'"

অক্ষয়কুমার তাঁহার জীবনের পর্দ্দাগুলি একটি একটি করিয়া খুলিয়া তাঁহার কবি-হৃদয়ের কাহিনী আমাদিগের সমক্ষে ধরিয়াছেন। এমন আন্তরিকতা আধুনিক যুগে বাঙ্গালী কবিদের রচনায় বিরল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অক্ষয়কুমারের কাব্যে কবির যতটা পরিচয় পাওয়া যায়, অপর কবিদের কাব্যে ততটা পাওয়া যায় না।

"যে গীতে ঝঙ্কারে সুরে গায়কের মন,—
কত-না অব্যক্ত আশা, অস্ফুট ক্রন্দন;
সে-ই দেব গীতি।
যে কাব্যে বিকাশে ছন্দে কবির অন্তর,—
জীবনে জাগিয়া উঠে জন্ম-জন্মান্তর;
সে-ই দেব-প্রীতি।
কাব্য নয়, চিত্র নয়, প্রতিমূর্ত্তি নয়,
ধরণী চাহিছে শুধু,—হৃদয়—হৃদয়।"

অক্ষয়কুমারের কবি-জীবনে এক্ষণে যে পরিবর্ত্তন সূচিত হইয়াছে, তাহার কারণ শুধু শাস্ত্রালোচনা ও কর্ম্ম-জীবনে অভিজ্ঞতা লাভ নহে। তিনি এক্ষণে প্রৌঢ়ত্বে পদার্পণ করিয়াছেন। তাঁহার প্রতিভার নব জাগরণে অন্তর্জগতে নূতন রশ্মিরেখা দেখা দিয়াছে। যৌবনের উপর যখন 'পড়িছে প্রৌঢ়ের দীর্ঘশ্বাস' তখন একে একে তাঁহার ভুল ধারণাগুলি সরিয়া যাইতে লাগিল। এখন হইতে তিনি বিরহে 'মিলন-আশ্বাস,' 'জীবনে বিশ্বাস' পাইতে লাগিলেন।

"ওই কুটীরের দ্বারে, এ ভাঙ্গা বেড়ার পারে
কেহ কি বসিয়া নাই মোর অপেক্ষায়?"

কবির ভাবুকতা কূলে কূলে বহিতে আরম্ভ করিয়াছে।

"এই জীবনের পারে, এই স্বপনের শেষে, কে যেন আমার আছে জীবন্ত কল্পনা-বেশে!" অক্ষয়কুমারের প্রতিভা কিন্তু 'প্রদীপ' নামক গীতি-কাব্যেই ষোল কলায় পরিপূর্ণতা লাভ করিয়াছে। মানব-জীবনের রহস্য 'প্রদীপে'র আলোয় সমুজ্জ্বল। বাঙ্গালীর দেশ, বাঙ্গালীর ঘর-কন্না, বাঙ্গালীর কর্ম্মময় জীবনের প্রতি কবির দৃষ্টি আকৃষ্ট হইলে পারিপার্শ্বিক অবস্থার যে চিত্র বস্তুতন্ত্রতার দিক হইতে তাঁহার চক্ষে প্রতিভাত হইল, অক্ষয়কুমার দার্শনিকের ন্যায় তাহার মর্ম্ম গ্রহণ করিয়া আমাদিগকে কর্ত্তব্যের পথ নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন। মুক্ত ও সংশয়বাদী এই পথের যাত্রী নহে। 'নির্ম্মম জীবন-সংগ্রামে' অক্ষয়কুমার মঙ্গলময়ের মঙ্গলবিধান-শক্তির কথা কখনও ভুলিয়া যান নাই। প্রতীচ্য ধরণের দুঃখবাদে সিক্ত বাঙ্গালা ভাষার গীতি-কাব্যে অক্ষয়কুমার হিন্দুর দেবতাকে শিবরূপে প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। গীতি-কাব্যের আসরে অক্ষয়কুমারের এইখানেই কৃতিত্ব ও বিশেষত্ব।

রামমোহন রায়ের আমল হইতে আমরা শুনিয়া আসিতেছিলাম যে, হিন্দুরা পৌত্তলিকতাকে তাহাদের ধর্ম্ম ও সমাজ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া না দিলে উন্নত পাশ্চাত্য আদর্শকে অনুসরণ করিয়াও মানব-সমাজে তাহারা বসিবার স্থান পাইবে না। রামমোহন রায় ১৭৯০ খৃষ্টাব্দে ষোল বৎসর বয়ঃক্রম কালে "হিন্দুদিগের পৌত্তলিক ধর্ম্ম" নামক সুবিখ্যাত গ্রন্থ রচনা করেন। সেই সময় হইতে আরম্ভ করিয়া শতবর্ষ যাবত বহুতর শিক্ষিত বাঙ্গালী পৌত্তলিকতার বিরোধী ধর্ম্মভাব দেশের মধ্যে জাগাইবার জন্য বাঙ্গালীর ধর্ম্ম, সমাজ ও সাহিত্য প্রভৃতি জাতীয় জীবনের বিভাগগুলিকে ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া পাশ্চাত্যের আদর্শে নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়া আসিয়াছেন। এই একশত বৎসরের জাতীয় উদ্যমের হিসাব নিকাশ করিয়া দেখিতে পাওয়া যায় যে, তেত্রিশ কোটি ভারতবাসী ও তাহাদের ভিতরে সাত কোটি বাঙ্গালী পূর্ব্বে যেমন পৌত্তলিক ছিল, এখনও সেইরূপই আছে। বৎসরান্তে নূতন খাতায়, চিঠি ও দলিলের শীর্ষদেশে, সংবাদপত্রে সম্পাদকীয় মন্তব্যের

উপরিভাগে বাঙ্গালী এখনও হিন্দুদেবদেবীর নাম লিখিতে ভুলিয়া যায় নাই। যাত্রার আসরে ও রঙ্গমঞ্চে অসংখ্য নাট্য-কাব্যের ভিতর দিয়া পৌরাণিক দেবদেবীর সংখ্যা ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে। প্রতিমা-পূজার সঙ্গে সঙ্গে প্রতি-মূর্ত্তি পূজার আড়ম্বর সমাজে প্রবর্ত্তিত হওয়াতে পৌত্তলিকতা নূতন আকার ধারণ করিয়াছে। রামমোহন রায় যদি ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত কারলাইলের 'হিরো-পূজা' নামক গ্রন্থ পাঠ করিতেন, তাহা হইলে তিনি পাশ্চাত্যের খৃষ্টান-জগতে পৌত্তলিকতার প্রভাব যে কত বেশী তাহা জানিতে পারিতেন। মূর্ত্তি-পূজা ও দ্বৈতবাদের রহস্য মানব-সমাজের হাড়ে-হাড়ে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া গিয়াছে। কোনও দেশের সভ্য সমাজ এই দুইটি জিনিষকে ছাঁটিয়া ফেলিতে পারে না। উচ্চ অঙ্গের শিল্প-কলা এই দুইটি জিনিষের আশ্রয়ে পৃথিবীতে বাঁচিয়া আছে। ওয়ার্ডসোয়ার্থ ও সেলি প্রমুখ ইংরাজ কবিদের কাব্যে রোমান্টিক যুগ প্রকৃতি-পূজার প্রাধান্য বিস্তার করিবার পর চিন্তারাজ্যে যে আলোড়ন আরম্ভ হয়, তাহার ফলে বঙ্গভাষার কাব্য-সংসারে প্রতীচ্য সভ্যতার বাহন স্বরূপ নূতন একদল কবি জন্মগ্রহণ করেন। গীতি-কাব্যের ভিতর দিয়া এই কবিরা ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্বের যে প্রকোষ্ঠে উপনীত হইতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাদের ভাবপ্রবণতার যতটা পরিচয় পাওয়া যায়, বাস্তব জগত সম্বন্ধে অভিজ্ঞতার ততটা পরিচয় পাওয়া যায় না। ধর্ম্ম ও সমাজ-সংস্কারক, গল্প ও পদ্যলেখক চোখের সম্মুখে প্রতীচ্যের নূতন আদর্শ দেখিয়া তাহার চিত্রকেই বাঙ্গালীর জাতীয়-জীবনের কাজে লাগাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছিলেন। চারিদিক হইতে যে সুপ্রাচীন ধর্ম্ম ও সমাজ তাঁহাদিগকে ঘিরিয়াছিল, তাহার সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া জাতীয় সৌধ নির্ম্মাণ করিবার চেষ্টা করেন নাই বলিয়া তাঁহাদের উদ্যম ব্যর্থ হইয়াছে। এই শ্রেণীর কবিদের কাব্যে সেইজন্য নিরাশার ছায়া ঘনীভূত হইয়া রহিয়াছে। তাঁহাদের প্রেমে স্বাধীনতা নাই, বিরহে আশা নাই। তাঁহাদের সমাজতত্ত্ব কেবল অনুকরণ আর না হয় অনুবাদ, সমালোচনা ও প্রতিবাদেই পরিপূর্ণ। এই শ্রেণীর কবিদের ধর্ম্মতত্ত্বেও 'ধরি ধরি', এই ভাবটি প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত বর্ত্তমান রহিয়াছে। এই শ্রেণীর কোনও গীতি-কবিতা রচয়িতা আজ পর্য্যন্ত রামপ্রসাদ সেনের মত জোর করিয়া বলিতে পারিলেন না,—"মা আমার অন্তরে আছ, তোমায় কে বলে অন্তরে শ্যামা?" অক্ষয়কুমারও কবি-জীবনের উষা-কালে সঙ্গদোষে গভীর রজনীতে 'সংকীর্ত্তন-ধ্বনি' শুনিয়া বলিয়াছিলেন,—"এই কি জীবন?" (যাই, কনকাঞ্জলি)। বাস্তবিক, 'কনকাঞ্জলি'র কবিকে আমরা 'প্রদীপে'র আলোয় যখন দেখিলাম, তখন স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম যে, তিনি রবীন্দ্রনাথের প্রভাব হইতে মুক্তিলাভ করিয়া গীতি-কাব্যের উদ্যানে হিন্দুর আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের "কৈশোরকে"র ন্যায় "কনকাঞ্জলি" অক্ষয়-কুমারের ছেলেমানুষীতে (youngmanishness) পরিপূর্ণ। 'শঙ্খে'র ধ্বনি অক্ষয়কুমারকে বাড়ীর বাহির হইতে গৃহস্থের অন্তঃপুরে টানিয়া আনে। সেখানে তিনি ঠাকুরঘরের পাশে বসিয়া শাস্ত্রালোচনা করেন। কবির শিক্ষা এইভাবে শেষ হইলে তিনি মন্দিরে প্রবেশ করিয়া 'প্রদীপে'র আলোয় দেবদর্শন করিলেন। অক্ষয়কুমারের কবিত্ব-প্রতিভার ক্রমবিকাশ বঙ্গভাষার আধুনিক গীতি-কাব্যের ইতিহাসে একটি নূতন অধ্যায় রচনা করিয়াছে। এবার কবি অক্ষয়কুমার পৌত্তলিক হইলে কি হয়, তিনি সাধনা দ্বারা স্থূলের ভিতর দিয়া সূক্ষ্মের সন্ধান পাইয়াছেন, মূর্ত্তির মধ্যে নিরাকারকে উপলব্ধি করিয়াছেন, আর সেই কারণে তিনি এদেশের প্রাচ্যভাবাপন্ন শিক্ষিত বাঙ্গালীর উপযোগী যে উচ্চাঙ্গের হিন্দু-আদর্শ সৃজন করিয়াছেন, তাহার তুলনা বঙ্গভাষার আধুনিক গীতিকাব্যের কোথাও নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

মিলনের আশায়।

[শ্রীনগেশনাথ ঘোষ]

আবুবেকর যখন তাহার ছোট্ট ফলের বিপনিখানা নিয়া কাইরোর বাজারে বসিত তখন তাহার সুন্দর গৌরবর্ণ বীরত্বব্যঞ্জক মুখখানির দিকে কেহই না চাহিয়া থাকিতে পারিত না। সেই বিংশতি বৎসর যুবার বদনে যে কি সুন্দর ভাব মাখান থাকিত তাহা যে দেখিত তাহার হৃদয়ই যেন তাহার দিকে আকৃষ্ট হইত। রোজ সকালে বাজারের এক কোণে সে তাহার ছোট্ট দোকানখানা খুলিয়া বসিত, সন্ধ্যা হইলে দোকান বন্ধ করিয়া বাড়ি যাইত। আবুর সংসারে কেহই নাই। কোন বন্ধনই তাহার সংসারে ছিল না। বাসায় যাইয়া পবিত্র কোরাণ শরিফখানা খুলিয়া সে যখন গম্ভীরনাদে বয়েৎ আওড়াইত তখন সকলেই মুগ্ধ হইয়া থাকিত। কি সুন্দর তাহার কণ্ঠস্বর! কি সুন্দর তাহার উচ্চারণ! পড়িতে পড়িতে সে আহার-নিদ্রা ভুলিয়া যাইত। বিছানায় শুইয়া সে কেবলই ভাবিত যে এই দুনিয়ায় সে বড়ই একা। সে মাঝে মাঝে মনে করিত এবার বিবাহ করিবে। আবুর যে সংসারে কেহই নাই। কে তাহার বিবাহ দিবে? কেইবা তাহাকে মেয়ে দিবে? তখনই তাহার মনে ধিক্কার হইত। পৃথিবীতে সবার চেয়ে নিজকে সে হতভাগা মনে করিত।

ইং ১৯১৪ সাল। ইউরোপে যুদ্ধের নিনাদ বাজিয়া উঠিয়াছে। দলে দলে লোক যুদ্ধে যাইতেছে। আবুও মনে করিল সে যুদ্ধে যাইবে। একদিন সকালবেলা বাজারের সকলে দেখিল, আবু তাহার দোকান বন্ধ করিতেছে। সকলেই জানিল আবু যুদ্ধে যাইবে। বাজারের অন্যান্য দোকানদার তাহাকে বিদায় দিতে আসিল। একদিন সন্ধ্যার সময় ইংরেজের রণপোতে আরোহণ করিয়া সে তাহার মাতৃভূমি কাইরোর নিকট বিদায় লইল। কাইরোর তট-ভূমিটুকু যখন আস্তে আস্তে নিলীমায় মিলাইয়া গেল, বড় বড় কয়েক ফোঁটা অশ্রু তাহার রক্তবর্ণ গণ্ডস্থলে গড়াইয়া পড়িল। কতক্ষণ পর্য্যন্ত বিহ্বল নেত্রে আকাশের পানে তাকাইয়া থাকিয়া সে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া পড়িল। জোড়হস্তে বলিল "খোদা, তুমিই আমাকে সৃষ্টি করিয়াছ। তোমারই দয়ায় এই দুনিয়া চলিতেছে, তুমিই জান কবে আমাকে আবার মায়ের কোলে ফিরাইয়া দিবে।" জানি না আবুর প্রার্থনা ভগবান শুনিয়াছিলেন কি না।

প্রায় ছয় মাস আবু মেসপটেমিয়ায় আছে। এক প্রান্তরের মাঝখানে ইংরেজ সৈন্য শিবির করিয়াছে। চারিদিকে কেবল উত্তপ্ত বালুকারাশী। বৃক্ষাদি কিছুই বড় একটা দেখা যায় না। কেবল উগ্র মার্ত্তণ্ড-তপ্ত প্রান্তর। দুপুরবেলা গরম বাতাস হু হু করিয়া বহিতেছে। সঙ্গে সঙ্গে আবুর মনও হু হু করিতেছে। কাইরোর কথা, তাহার মৃতা জননীর কথা, প্রতিবেশীদিগের কথা যখনই মনে হইত তখন সে আর স্থির থাকিতে পারিত না। একদিন কোন এক জরুরী পত্র লইয়া টাইগ্রীস নদীতে যে ইংরেজের রণতরী আছে তাহার মধ্যে তাহাকে যাইতে হইল। দুই ধারে প্রান্তরের পর প্রান্তর ছাড়াইয়া আবু উষ্ট্রপৃষ্ঠে গন্তব্য স্থলে যাইতেছে। সন্ধ্যা হয় হয় এমন সময় বিশ্রামার্থ সে উষ্ট্রপৃষ্ঠ হইতে নামিয়া মাটিতে বসিল। অমনি ১০।১২ জন বলিষ্ঠ লোক তাহাকে চাপিয়া ধরিল। তাহাদের সঙ্গে ধ্বস্তা-ধ্বস্তি করিতে সে অজ্ঞান হইয়া পড়িল। যখন জ্ঞান হইল তখন দেখিল যে সে হাসপাতালে। যাহারা তাহাকে আক্রমণ করিয়াছিল, তাহারা শুধু অর্থ নিয়া সন্তুষ্ট হয় নাই, তাহার মাথায়ও কিছু আঘাত দিয়াছিল। হাসপাতালের সকলেই তাহাকে প্রীতির চক্ষে দেখিত। সুন্দর মুখের জয় প্রায় সর্ব্বত্রই দেখা যায়। এখানেও

তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই। আজ ডাক্তার ঘোষ আবুর সংবাদ লইতে আসিয়া দেখিলেন যে নার্স এথেল আবুর সহিত কি কথা কহিতেছেন। এই নার্সটি যেন তাহাকে সকলের চেয়ে বেশী যত্ন করিত। অনেকক্ষণ তাহাকে লইয়া গল্প গুজব করিত। এথেলের তুষার-শুভ্র পোষাকে তাহার যৌবনের অলৌকিক সৌন্দর্য্য যেন উছলিয়া পড়িতেছিল। ক্ষুদ্র আলোটি হাতে করিয়া সে যখন রাত্রে আবুর খোঁজ নিতে আসিত তখন আবুর মনে যে কি আনন্দ হইত তাহা বলা যায় না। তাহার মনে হইত স্বর্গের কোন দেবী তাহাকে উদ্ধার করিতে আসিয়াছে। এথেল যখন শুনিল আবুর সংসারে কেহই নাই, তখন সে তাহাকে আরও ভালবাসিতে লাগিল। হায়! কে জানিত এই অনাবিল ভালবাসায় ভবিষ্যৎ পরিণাম শোচনীয়! রাত্রিতে শুইবার পূর্ব্বে এথেল রোগীদের ঘরে যাইয়া দেখিল আবু জাগিয়া আছে। সকলেই তখন সুপ্ত। বাহিরে কেবল কামানের অস্পষ্ট ধ্বনি। এথেল বলিল, "আবু আবু, তুমি কি ভাবিতেছ?" আবু বলিল, "কি আর ভাবিব এথেল! ভাবিতেছি তোমাদের কথা, তোমাদের যত্ন, বিশেষতঃ তোমার আন্তরিক ভালবাসা। এ সংসারে এই হতভাগাকে কেহই তো এত যত্ন ও ভালবাসা দেখায় নাই। এই দুনিয়ায় আমি দীন দরিদ্র, তবে কেন তোমরা আমায় এত ভালবাস, এত যত্ন কর! এথেল, আজ কি মনে পড়িতেছে জান? মনে পড়িতেছে কাইরোর কথা, মনে পড়িতেছে আমার দৈনিক কোরাণ পাঠ। সংসারে একান্ত একেলা আমি। তাই মনে হয়, খোদা দয়া করিয়া আমাকে তোমার কাছে তোমার ভালবাসার শিখরে আনিয়া দিয়াছেন।

বল এথেল, বল কেন আমার এই কথা মনে হইতেছে! এথেল! মাতৃহারা হইয়া যখন সুদীর্ঘ ছয় বৎসর কাইরোতে ছিলাম, রাত্রিতে শয্যায় পড়িয়া কেবল মনে হইত দুনিয়ায় আমি বড়ই একা। এথেল, আজ আমার মনে হইতেছে আর আমি একা নই। সত্যি কি তাই? বল এথেল, সত্যি কি তাই?"

এথেল কি বলিবে খুঁজিয়া পাইল না। কেবল মুক্তার মত কয় ফোঁটা অশ্রু সে চোখ হইতে রুমাল দিয়া মুছিয়া লইল। প্রকৃতিস্থ হইয়া এথেল বলিল, "আবু, আবু, অভাগিনীকে যদিই ভালবাসিয়াছ তবে চল আমরা এই যুদ্ধক্ষেত্র ছাড়িয়া যাই। কোথায় যাইব তাহাও আমি স্থির করিয়াছি। জনবিরল আফগানিস্থানের শৈলশিখরে আমরা দুইজনে জীবন কাটাইয়া দিতে পারিব। চল আবু, অর্থের জন্য ভাবিও না। আমার এই মুক্তার হার ও ব্রোচ আছে, ইহা দ্বারা বছর খানেক যাইবে তারপর আমার শিল্পকার্য্য দ্বারা দুইজনের অনায়াসে চলিয়া যাইবে।" একদিন রাত্রির অন্ধকারে ছদ্মবেশে যুবক ও যুবতী পলাইয়া গেল। নিরাপদ স্থানে আসিয়া তাহারা এক মসজিদে আশ্রয় লইল। মসজিদের ইমাম সাহেব তাহাদের আহারের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। এদিকে, সারাদিনের অনাহারে ও ক্লান্তিতে এথেল ঘুমাইয়া পড়িল। এথেলকে বড়ই সুন্দর দেখাইতেছিল। উদ্যমের পর অবসাদ আসে ইহাই পৃথিবীর নিয়ম। আবু যখন এথেলকে নিয়া চলিয়া আসিতেছিল, কোন চিন্তাই তাহার মনে আসে নাই। কেবল নবোদ্যমে তাহাদের নবজীবনের আশায় ছুটিয়া আসিতেছিল। গন্তব্যস্থলে যখন তাহারা আসিয়া পড়িল, অনেক চিন্তা আবুর মনে আসিল। এত চিন্তা তো তাহার মনে কোন দিনই আসে নাই। উদরান্নের জন্য সে ভাবে নাই। কেবলই মনে হইতেছিল এথেল তাহার কাছে থাকিবে কি না। এথেলের ঘুমন্ত সুন্দর মুখখানির দিকে চাহিয়া তাহার মনে হইল 'এত সুখ সহিলে হয়।'

* * *

আজ মেসপটেমিয়ায় হৈ হৈ পড়িয়া গিয়াছে। সংবাদপত্রের স্তম্ভে বড় বড় অক্ষরে "মিশরীয় যুবকের সহিত, নার্সের পলায়ন" এই সংবাদ উঠিয়াছে।' চারিদিকে গুপ্তচর পাঠান হইল। বহু ইংরেজ ও ভারতীয় সেনানী এই যুবক যুবতীর অনুসন্ধান করিতে করিতে সেই মসজিদে আসিয়া উপস্থিত হইল। মসজিদ ঘেরাও করিয়া তাহাদের গ্রেপ্তার করা হইল। কিয়ৎক্ষণ পরেই তাহাদিগকে মেসপটেমিয়ায় লইয়া যাওয়া হইবে। সেখানে সামরিক আইন

অনুসারে তাহাদের বিচার হইবে। প্রথমতঃ এথেলকে লইয়া যাওয়া হইল, পরে আবুর পালা। এথেলকে যখন লইয়া যায়, তখন আবু মনে করিল, "এ জীবনে আর প্রয়োজন কি? আমাদের দুইজনের আর তো সাক্ষাৎ হইবে না। তবে আর কেন মায়া,—যদি সত্যই এথেলকে ভালবাসিয়া থাকি, যদি কোন দিন ধর্ম্ম মানিয়া থাকি, তবে উহাকে আবার পাইব। এখানে পাইতে না পারি, কিন্তু বেহস্তে পাইব। সেখানে তো কেহই উহাকে নিতে পারিবে না" এই চিন্তায় সে প্রণোদিত হইল। যখন তাহার যাইবার সময় হইল, তখন প্রার্থনার নিমিত্ত সে তিন মিনিটের সময় চাহিল। কাপ্তেন উহা গ্রাহ্য করিলেন। ধীরপাদবিক্ষেপে সে ভিতরে প্রবেশ করিল। কিয়ৎক্ষণ পরে বন্দুকের শব্দে সকলে দৌড়িয়া আসিয়া দেখিল, আবুর রক্তাক্ত মৃতদেহ পড়িয়া রহিয়াছে!

বর্ত্তমান যুগ প্রসঙ্গ।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

[শ্রীসাহাজি]

স্বামী বিবেকানন্দের ন্যায় মহাত্মা গান্ধিও ঋষিকল্প মহাপুরুষ! তিনি রাজনৈতিক বলিয়া তাঁহাকে অশ্রদ্ধা করা কর্ত্তব্য নহে। তাঁহার রাজ-নীতি ধর্ম্মেরই নামান্তর। উহাতে হিংসার স্থান নাই, হত্যার প্রয়োজন নাই, কোনও প্রকার সাম্প্রদায়িকতা নাই। উহা চাহে,—মনুষ্য মনুষ্যের পার্শ্বে গিয়া দণ্ডায়মান হউক ভ্রাতৃভাবে—এক পিতার সন্তান-রূপে। উহা শুধু বলিতে চাহে,—মানবে মানবে শত্রুতা নাই, প্রভু ভৃত্যের সম্বন্ধ নাই। ফলতঃ, চৈতন্য বুদ্ধ মহম্মদ ও খৃষ্টের যাহা উদ্দেশ্য ছিল, গান্ধির উদ্দেশ্যও তাহাই। চৈতন্যের প্রেম এবং গান্ধির রাজনীতি একই জিনিষ। কিন্তু হায়! কি দুঃখের বিষয়,—এমন মহাপুরুষকেও তথা কথিত ধর্ম্মধ্বজী মহোদয়েরা মহাত্মা বলিতে কুণ্ঠিত হন। ইহাতেই বুঝা যায়, ভারতে আজ সত্য বুঝিবার লোক নাই, আছে কেবল বদ্ধ সংস্কার ভাব বিষয়ে দীনাতিদীন গড্ডলিকা প্রবাহবৎ জীবশ্রেণী। চৈতন্যদেবকে যদি মহাত্মা বলা যায়, তবে গান্ধিকে কেন বলা যাইবে না? চৈতন্যের মুণ্ডিত মস্তক ছিল, তিনি শিখা রাখিতেন, তিলক কাটিতেন, খোল বাজাইয়া কীর্ত্তন করিতেন। গান্ধির এ সকল কিছুই নাই। চৈতন্য বিশুদ্ধ সংস্কৃত ভাষায় শ্লোক বলিতেন, গান্ধি ম্লেচ্ছ-ভাষায় বক্তৃতা করেন। চৈতন্য বলিতেন প্রেম, গান্ধি বলেন রাজ-নীতি। হউক চৈতন্যের প্রেম এবং গান্ধির রাজনীতি একই বস্তু, কিন্তু উভয়ের মধ্যে যখন 'এত প্রভেদ', তখন গান্ধি নিশ্চিত মহাত্মা নামের অযোগ্য। হায়! এই হতভাগ্যদেশে 'আধ্যাত্মিক' এই লেবেল ভিন্ন কোনও বস্তুই চলে না। গান্ধির বচনে হিন্দু শাস্ত্রের গালভরা শব্দগুলি নাই, সুতরাং তাঁহার প্রচারিত সত্যকে ধর্ম্ম বলা যায় কি করিয়া?

What's in a name?
that which we call a rose
By any other name
would smell as sweet—

সেক্‌সপীয়র মূর্খ ছিলেন, তাই তিনি এ কথা লিখিয়া গিয়াছেন। আমাদের দেশে কিন্তু 'ডিঃ গুপ্ত'কে anti-periodic mixture বলিলে হাটে বিকায় না। এ যে হাটুরিয়ার দেশ। God will be nearer to you through the Foot-ball than through the Geeta—বিবেকানন্দের এ কথাও তাই এই আধ্যাত্মিক বায়ুগ্রস্ত ভারতবর্ষের হাটে বিকাইল না। যিনি গীতা পড়েন,* তাঁহার পাঠ মাত্রই সার হয়। কিন্তু যিনি ফুটবল খেলেন, তিনি গীতা না পড়িয়াও, এমন কি গীতার

* ভারতবর্ষে এখনও এমন অনেক লোক পাওয়া যায়, তাঁহারা প্রত্যহ ত্রিসন্ধ্যা গীতা পাঠ করেন, পুষ্পচন্দনে গীতা-গ্রন্থের নিত্য পূজা করিয়া থাকেন, অথচ গীতার প্রভাব তাঁহাদের জীবনের সামান্য একটী কার্য্যেও পরিদৃষ্ট হয় না। কিন্তু নিষ্ঠাবান্ হিন্দু বলিয়া তাঁহাদের গর্ব্বের আর অন্ত নাই।

নাম পর্য্যন্ত না জানিয়াও, যতই সামান্যভাবে হউক, অজ্ঞাতসারে গীতার উপদেশেরই অনুসরণ করিয়া থাকেন, ইহাই ছিল স্বামীজির ঐ কথার তাৎপর্য্য। কিন্তু এই সহজ অর্থটীও আমরা বুঝিতে পারিলাম না, বা বুঝিতে চাহিলাম না। * * ফলতঃ, গান্ধির অসহযোগ নীতি সমর্থনযোগ্য নাও হইতে পারে, বর্দৌলি প্রস্তাবে তিনি তাঁহার কার্য্যপ্রণালীর সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন করিয়াছেন, অনেক স্থলে তিনি স্বেচ্ছায় ক্রটীর দায়িত্ব আপনার স্কন্ধে গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহার কার্য্যপ্রণালীতে যথেষ্ট ভুলচুক রহিয়াছে এবং তিনি নিজেও তাহা স্বীকার করিতেছেন, এ সকল কথাও না হয় সত্য। কিন্তু জিজ্ঞাস্য এই, কোন্ মহাপুরুষের জীবনে ভুলচুক একেবারেই হয় নাই? ভারতের পূর্ব্বতন অবতার পুরুষদের চরিত্রেও ভুলচুক (?) দেখাইতে না পারা যায়, এমন নহে। তবে, তাঁহাদের সেই সামান্য ক্রটী বিচ্যুতির(?) উল্লেখ করিয়া লেখনী কলঙ্কিত করা যুক্তি-সঙ্গত নহে। কেন না, কলঙ্ক যেমন চন্দ্রের পক্ষে নিন্দার স্বরূপ না হইয়া উহার শোভাই বর্দ্ধিত করে, ঐগুলিও সেইরূপ তাঁহাদের চরিত্রের মাধুর্য্যই পরিস্ফুট করিয়া তুলে। ফলতঃ, গান্ধিজীর যে সকল ক্রটীর কথার উল্লেখ করা হইল, বস্তুতঃ ঐগুলি তাঁহার চরিত্র আরও উজ্জ্বল করিয়াই তুলিয়াছে। বিশেষতঃ পূর্ব্বতন মহাপুরুষগণের ন্যায় তিনিও অগ্নি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া আপনার পূর্ণ বিশুদ্ধি জগৎ সমক্ষে সম্যকরূপে সপ্রমাণ করিয়াছেন। বহুক্ষেত্রেই তাঁহার সর্ব্বারম্ভ পরিত্যাগিতা প্রভৃতি দেবদুর্লভ গুণনিচয়ের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছে এবং হইতেছে। সুতরাং এরূপ মহাপুরুষকে মহাত্মা না বলিলে সত্যেরই অবমাননা করা হয়। * * * অনেকে আবার গান্ধি টলষ্টয়ের মন্ত্র-শিষ্য বলিয়া আপত্তি করিয়া থাকেন। ভারতবর্ষের শত শত অবতারকল্প মহাপুরুষ থাকিতে তিনি তাঁহার আদর্শ খুঁজিয়া পাইলেন কি না এক পাশ্চাত্য মনীষীর মধ্যে, ইহাই বোধ হয় তাঁহাদের আপত্তির হেতু। আমাদের পূর্ব্বতন ঋষিদের প্রচারিত সত্যই টলষ্টয়ের মধ্যে নবযুগোপযোগী হইয়া উঠিয়াছে, ইহা বুঝিয়া মহাত্মাজী যদি টলষ্টয়কেই আদর্শরূপে বরণ করিয়া লইয়া থাকেন, তাহা হইলে ইহাতে আপত্তি করিবার হেতু কি থাকিতে পারে? বিশেষতঃ, যাঁহার মধ্য দিয়াই আসুক, সত্য চিরদিনই সত্য। ফলতঃ, গান্ধি এ যুগের,—শুধু ভারতবর্ষের কেন,—সমস্ত জগতের আদর্শপুরুষ, representative man.

* * *

বঙ্গদেশ তখন শুষ্ক পাণ্ডিত্য, নীরস শাস্ত্র বিচার ও প্রাণহীন তর্ক চর্চ্চায় মরুভূমি তুল্য হইয়াছিল। মানবে মানবে প্রীতি ও সহানুভূতি ছিল না। ছিল কেবল মিথ্যা শাস্ত্রোক্ত জাতিভেদ প্রভৃতির কঠিন বন্ধন। ছিল কেবল প্রাণহীন পূজাদি কর্ম্মকাণ্ড এবং তজ্জনিত দারুণ আত্মাভিমান। এই সকল দেখিয়াই শ্রীচৈতন্যদেব তখন প্রেমধর্ম্মের প্রচার করিয়াছিলেন। সেইরূপ, শ্রীবিবেকানন্দও যুগোপযোগী সেবাধর্ম্ম ভারতের ভবিষ্যৎ সিদ্ধির উপায়-স্বরূপে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন। বর্ত্তমান শ্রীগান্ধির মধ্যেও সেই সেবাধর্ম্মেরই পূর্ণ প্রকাশ দেদীপ্যমান। তবে, প্রকারভেদ আছে, নতুবা উভয়েরই উদ্দেশ্য এক। বর্ত্তমান সময়ে সকল দেশেই রাজনীতির প্রভাব অত্যন্ত প্রবল। এ যুগে ধর্ম্ম, সমাজ, শাসন প্রভৃতি সকল বিভাগের প্রায় সকল কার্য্যই রাজনৈতিক শক্তির দ্বারাই প্রধানতঃ নিয়ন্ত্রিত হয়। সুতরাং চৈতন্য, বুদ্ধ, বিবেকানন্দের ন্যায় মহাপুরুষেরা মানবসমাজের যাহা করিতে চাহিয়াছিলেন, বর্ত্তমান সময়ে তাহা করিতে হইলে রাজনীতির সাহায্যে তাহা করিতে যাওয়াই সমধিক ফলপ্রদ, রোগের গোড়া ধরিয়া ঔষধ দেওয়াই সুবিবেচনার কার্য্য, এই কথা বুঝিতে পারিয়াই গান্ধি আজ রাজনীতিকেই জীবনের ব্রতস্বরূপে বরণ করিয়া লইয়াছেন। তবে, তাঁহার এই উদার সার্ব্বজনীন রাজনীতিতে এবং পাশ্চাত্য রাষ্ট্রবিদ্গণের স্বার্থ পুতিগন্ধময় সেই দূষিত রাজনীতিতে যে আকাশ পাতাল প্রভেদ, তাহা ভুলিয়া গেলে চলিবে না! তাঁহার এই অহিংস রাজনীতি 'কাঁটালের আমসত্ব' 'পিতলে সোণার ঘটী' বলিয়া হাসিয়া উড়াইয়া দিবার জিনিস নহে। উহা বস্তুতঃই নির্জনে নিদিধ্যাসনের বিষয়।

* * *

এই সকল কথা শুনিয়া অনেকে হয়ত নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া বলিবেন, "উহা লোকসেবা, ধর্ম্ম নহে। পৃথিবীর

মানব-সমাজ আর কতটুকু? ধর্ম্ম কিন্তু এক অখণ্ড বস্তু।” আমরাও তাঁহাদের কথা অস্বীকার করি না। গীতাও এই কথাই বলিয়াছেন, ‘তবাংশেন ধৃতমিদং কৃৎস্নং জগৎ।’ কিন্তু এস্থলে বক্তব্য এই, অগ্রে এই ক্ষুদ্র মানব-সমাজই সর্ব্বাংশে উন্নত হইয়া উঠুক, পরে সেই বিরাট্ সত্তার সন্ধান লইবার অবসর মিলিবে। অগ্রে প্রত্যেক মনুষ্য ভগবৎ শক্তির মূর্ত্ত-প্রকাশরূপে প্রকটিত হউক, চৈতন্যের ভাষায়, এই বিশ্বের নিত্য বৃন্দাবন লীলায় সকলেই যে সেই লীলাময়েরই লীলার সহায়, এই সত্য প্রত্যেক মনুষ্য বুঝিতে পারুক, পরে সেই পরমতত্ত্বকে বুঝিবার সম্ভাবনা হইবে। Charity begins at home. যিনি ‘খুঁটি’ গড়াইতে পারেন না, তিনি যদি ‘কোলা’র বায়না লইয়া বসেন, তাহা হইলে হাসি সংবরণ করা দুঃসাধ্য হইয়া পড়ে। * * * ইহাই হইল এক শ্রেণীর লোকের কথা। অন্য শ্রেণীর লোকেরা আবার ‘তৃণাদপি সুনীচেন’ ইত্যাদি বাক্যের পক্ষপাতী। তাঁহারা বলিবেন, “ক্ষুদ্র আমি সেবা করিব এই বিশাল বিশ্বের? যাঁহার বিশ্ব, সে চিন্তা তাঁহার” এইরূপ বলিয়া তাঁহারা গীতায় উক্ত আত্মসমর্পণ যোগেরই (?) পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিলেন বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। যাহা হউক, যাঁহাদের ধারণা এইরূপ, তাঁহারা সামান্য ব্যক্তি। আপনাপন ক্ষুদ্র সংসার পরিচালনের ক্ষমতাই নাই তাঁহাদের; বৃহৎ মানবসমাজের সেবা করিবার কল্পনা করাও তাঁহাদের পক্ষে ধৃষ্টতামাত্র। নিরভিমান নিষ্কাম প্রেমিক যিনি, প্রেমে যাঁহার আমিত্বের সম্পূর্ণ লোপ হয়, যাঁহার যথার্থ প্রেমের উদয় হয়, তখন আর তাঁহার আপনার শক্তি সামর্থ্য বিচার করিবার অবসর থাকে না। প্রেমে মানব দুর্ব্বল হয় না, বরং অমিত বলে বলী হয়। তাঁহার তখন প্রণয়ীর জন্য পতঙ্গ হইয়া অগ্নিতে ঝম্প প্রদান করিতেও সঙ্কোচ হয় না। ব্রজ গোপীরাও অবলা কুলবালা হইয়াও তাঁহাদের প্রিয়তমের জন্য কি না করিতে সমর্থা হইয়াছিলেন? ফলতঃ, যাঁহার আমিত্ব নাই, তাঁহার অসাধ্য কিছুই নাই। ‘আমি ছোট’ এবং ‘আমি বড়’ এই দুই প্রকার সংস্কারই আমিত্বেরই প্রকার ভেদ, সুতরাং দুইটাই বন্ধন। যে আপনাকে অসমর্থ মনে করিয়া বিশ্বের ভার ভগবানের স্কন্ধে ফেলিয়া দিয়া স্বয়ং দূরে পলাইয়া থাকিতে চাহে, সে ভক্ত নহে, জ্ঞানী নহে এবং কর্ম্মীও নহে। সামান্য ক্ষুদ্র জীব সে। সুতরাং তাহার ঐ প্রকার কথা বিনীত ভক্ত হৃদয়ের কথা নহে, উহা অলস প্রকৃতি জড়বাদীর প্রলাপ উক্তি। ‘প্রভু, তোমার মানবসমাজকে তুমিই রক্ষা কর, আমার শক্তি নাই’—এই বলিয়া বিশ্বের সমস্ত ভার নিজের স্কন্ধ হইতে প্রভুর স্কন্ধে ফেলিয়া দেওয়া, এ অতি উত্তম কথা, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু প্রভুর স্কন্ধে যাহা তুমি ফেলিয়া দিতে চাহিতেছ, ভাবিয়া দেখ, তুমি তাহা নিজের স্কন্ধে তুলিয়া লইতে পারিয়াছ কি না? তোমার নিজের স্কন্ধেই যদি তাহা না তুলিয়া লইয়া থাক, তাহা হইলে আর তাহা তুমি প্রভুকে দিবে কি করিয়া? ‘গাছে কলা নৈবেদ্যায় নমঃ’ বলিয়া ফুল ফেলিয়া দেওয়াকে প্রভুকে নিবেদন করিয়া দেওয়া বলে না। আগে নিজে ভার লও, পরে প্রভু স্বয়ং তোমার ভার গ্রহণ করিবেন। “God helps those that help themselves.” অধিক কি, হয়ত তুমিই তখন বলিবে, ‘প্রভু, তোমায় আর কষ্ট করিতে হইবে না, আমি নিজেই সমস্ত ভার বহিতে পারিব।’ প্রভুকে বকল্‌মা দেওয়া দূরে থাকুক, হয়ত তুমিই তখন প্রভুর বকল্‌মা লইবে। ইহারই নাম যথার্থ আত্ম-সমর্পণ যোগ।

ব্যবসায়ী টাকা-মণ ধান কিনিলেন, পর বৎসর দুর্ভিক্ষে দেশে হাহাকার উঠিলে, তিনি সেই ধান্য প্রতিমণ চারি টাকায় বিক্রয় করিলেন। ধার্ম্মিক জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘টাকার তোড়া সিন্ধুকে উঠিল সত্য, কিন্তু কার্য্যটি কি ভাল হইল’? ব্যবসায়ী উত্তর দিলেন, ‘মহাশয়! এ বাণিজ্য-নীতি, ধর্ম্মের এলাকা নয়, ঝুলি-কাঁধে-করা বৈরাগীর পথ নহে।’ সমস্ত দ্বিধা সঙ্কোচ কাটিয়া গেল। তথাপি যাঁহার ‘মন-খুঁৎখুঁতি’ গেল না, তিনি একবার ৬চন্দ্রনাথে গিয়া তীর্থ করিয়া আসিলেন, না হয় বাড়ীতে তিন মাস ব্যাপিয়া ভাগবত পাঠের আয়োজন করিলেন, না হয় বড় জোর কাশী রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে পাঁচশত টাকা পাঠাইয়া দিলেন। * * * অনাথা এক বালবিধবাকে দুর্বৃত্তেরা

ধরিয়া লইয়া গিয়া তাহার ধর্ম্ম নষ্ট করিল। হতভাগী কাঁদিয়া সমাজপতিদের দ্বারে হত্যা দিল। কর্ত্তারা বলিলেন,—'দূর হও'। ধার্ম্মিক কহিলেন, 'মহাশয়, পাপকে ঘৃণা কর, পাপীকে নয়, ইহা আপনাদেরই শাস্ত্রের আদেশ।' কর্ত্তারা চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া উত্তর দিলেন, 'ধর্ম্মের জন্য আমরা কি সমাজ নষ্ট করিব? এ সমাজ-নীতি, হরিঘোষের গোয়াল নহে।' হতভাগীর জন্য যাঁহার প্রাণ নিতান্ত ব্যথিত হইল, তিনি শ্রীচৈতন্যের "জীবে দয়া" উপদেশ স্মরণ করত তাহাকে দশ বিশ টাকা সাহায্য দিয়া বাজারের সোজা রাস্তা দেখাইয়া দিলেন। যাঁহারা আজ তাহাকে সমাজে লইতে সঙ্কুচিত হইলেন, তাঁহারাই কাল আবার তাহার বাজারের ঘরে যাওয়া আসা সুরু করিয়া দিলেন। এইরূপে তাঁহাদের পতিতোদ্ধার ব্রত পালনের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইল। * * * জাপান কোরিয়াকে বুকে পা দিয়া চাপিয়া ধরিলেন, বলিলেন, "উহার 'হাড় মুড়মুড়ি' ব্যারাম হইয়াছে,কিছু ঠাসিয়া দেওয়ার প্রয়োজন।" ধার্ম্মিক বলিলেন, "Help thy neighbours, ইহা কি আপনাদেরই প্রভুর আদেশ নহে?" জাপান উত্তর করিলেন, "অনধিকার চর্চ্চা করিতেছেন কেন? মনে রাখিবেন, ইহা রাজনীতি।" কোরিয়ার জন্য যাঁহার সবিশেষ মাথা ব্যথা হইল, তিনি বড়ও জোর খবরের কাগজে দিস্তা খানেক প্রবন্ধ লিখিলেন। * * * এখন ভাবিয়া দেখুন, কি ভীষণ নিষ্ঠুরতা রাজনীতি, সমাজনীতি প্রভৃতি আপাত-সুন্দর নাম গ্রহণ করত ধর্ম্মকে তথা মানব সমাজকে নিত্য নিপীড়িত করিতেছে। গান্ধির অহিংস যুদ্ধ ঘোষণা এই নিষ্ঠুরতারই বিরুদ্ধে। তাঁহার রাজনীতি ও ধর্ম্ম তাই একই বস্তু। যাহা মানুষকে মানুষের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখে, তাহা রাজনীতি নহে, সমাজনীতি নহে, তাহা কিছুই নহে। ফলতঃ, রাষ্ট্র সমাজ এবং ধর্ম্মকে এক্ষণে আর পৃথক বলিয়া ভাবিলে চলিবে না। তিনই এক, এই নবযুগে এই কথাই আমাদিগকে বিশেষ করিয়া বুঝিতে হইবে।

* * * *

সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই ত্রিগুণ মানবের স্বভাবজ সহজ ধর্ম্ম। মানবচরিত্রে যতদিন সদ্‌গুণ থাকিবে, ততদিন তমোগুণ থাকাও অবশ্যম্ভাবী, সুতরাং যতদিন প্রেম থাকিবে, ততদিন হিংসা থাকাও অনিবার্য্য। অতএব, গান্ধির অহিংসামন্ত্র কদাপি সফল হইবে না, জগৎ হইতে হিংসার এককালীন বিলোপ হওয়া অসম্ভব, গীতার দোহাই দিয়া যাঁহারা এইরূপ বলেন, দুর্ভাগ্যের বিষয়, গান্ধির বাণীর তাৎপর্য্য তাঁহারা আজো বুঝিতে পারেন নাই। * * * ফলতঃ, মনুষ্যচরিত্রে আসৃষ্টিপ্রলয় কাল তমোগুণ থাকিলেও, তাহাতে ক্ষতির কোনও কারণ নাই। আর সেই হেতু মানবের মধ্যে কখন কখন কোন কোন বিষয় লইয়া মত বিরোধ উপস্থিত হইলেও, তাহাতে চিন্তিত হইবারও কোনও কারণ নাই; বরং ঐরূপ বিরোধ হওয়াই স্বাভাবিক এবং উহাই মানব অস্তিত্বের যথার্থ লক্ষণ। কারণ, মানব বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন জীব, 'ইট পাথরে'র ন্যায় জড়পদার্থ নহে। কিন্তু তাই বলিয়াই যে তাহাদিগকে অহিনকুলের ন্যায় বাস করিতে হইবে, এরূপ ভাবিবারও কোনই কারণ নাই। কোনওরূপ বিরোধ উপস্থিত হইলেই যে তাহার জন্য অস্ত্রধারণ করা অপরিহার্য্য, ইহা বিশ্বাসযোগ্য নহে; বিশেষতঃ, মানবের প্রবৃত্তি কোনমতেই ইহার সমর্থন করে না। কোনও সুস্থ মানবই যুদ্ধে কাটাকাটি মারামারি করিয়া মরিতে চাহে না। যদি তাহাই চাহিত, তাহা হইলে আর তাহারা সমাজে দলবদ্ধ হইয়া বাস করিত না। পশুরা যে এমন নিকৃষ্ট জীব, তাহারাও দলবদ্ধ হইয়া বাস করে। মানবের বুদ্ধি পরিমার্জ্জিত, সুতরাং তাহারা দলবদ্ধ হইয়া আরও উৎকৃষ্টতর প্রণালীতে জীবন যাপন করিবে, ইহাই ছিল ভগবানের অভিপ্রায়। মানব কিন্তু তাহা বুঝিল না। ভালুকের হস্তে খনিত্র পড়িলে যাহা হয়, তাহারাও তাহাই করিয়া বসিল। তাহারা বুঝিল না, যতই বিরোধ উপস্থিত হউক, সকল বিরোধই আমাদের আত্ম-বিকাশের পথ পরিষ্কৃত করিয়া দিবার জন্যই বিধাতা কর্ত্তৃক পরিকল্পিত, সুতরাং আমাদের উচিত, সেইগুলির যথাযথ সদ্ব্যবহার করা। মানব কিন্তু তাহা করিল না। যাহা তাহাদের আত্ম-বিকাশের জন্য পরিসৃষ্ট, তাহাকে তাহারা আত্মধ্বংসের জন্য নিয়োজিত করিল। * * * মানিয়া

লইলাম, যুদ্ধের উদ্দেশ্য এই যে, অন্যকে জিনিয়া তাহার উপর আপনার প্রাধান্য স্থাপন করা। কিন্তু যাহাকে জিনিতে চাহি, তাহাকে যদি মারিয়াই ফেলিলাম, তাহা হইলে আর আমার জয়লাভ করিবার সার্থকতা রহিল কোথায়? ফলতঃ, যে উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করা, যুদ্ধ করিয়া সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবার সম্ভাবনা সুদূরপরাহত। এযাবৎ যুদ্ধের ফলে জগতের যে পরিমাণ ক্ষতি হইয়াছে, তাহা ধরিয়া বিচার করিলে মনে হয়, যে প্রয়োজনে যুদ্ধ করা, সেই প্রয়োজন কিয়দংশেও সফল হইয়াছে কি না সন্দেহ। বিংশ শতাব্দীর কুরুক্ষেত্র সমরের পর, প্রতীচ্য শক্তিপুঞ্জও আজ তাই জানিতে চাহিতেছেন, যুদ্ধ করিয়া তাঁহাদের কি লাভ হইল? বাঁচিবার জন্য মানবের যে আকাঙ্ক্ষা, তাহা যদি ভীরুতা হয়, তবে তাহার জন্য দোষী বিধাতা। কিন্তু ইহার জন্য ইউরোপে conscription law পর্য্যন্ত প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। আমাদের দেশের শাস্ত্রকারগণ যেমন সমর্থ অসমর্থ বিচার না করিয়া বিধবামাত্রকেই ব্রহ্মচর্য্যের ব্যবস্থা দিয়া 'খোদার কলম' উল্টাইয়া দিতে চাহিয়াছেন, ইহাও প্রায় সেইরূপ। ফলতঃ, যে conscription law স্বাধীনতালাভের দোহাই দিয়াই সমর্থিত হইয়া আসিতেছে, তাহাই জগতে তারস্বরে ঘোষণা করিতেছে, সেই স্বাধীনতা এখনও বহুদূরে, হনোজ্ দিল্লী দূরস্ত্। স্বাধীনতার লীলাভূমি (?) ইউরোপ খণ্ডে তাই আজ ফ্যাসিষ্ট বিদ্রোহ, সিনফিন আক্রমণ, বেকার সমস্যা, শ্রমজীবী ধর্ম্মঘট ইত্যাদি নিত্য ঘটনা। স্বাধীনতার জন্য এত যে রক্তপাত, ইহাই তাহার শোচনীয় পরিণাম। তবে যে জনসমাজ এতদিন ধরিয়া যুদ্ধ করিয়া আসিতেছে, স্বদেশপ্রীতির নামে হত্যার সমর্থন করিয়া আসিতেছে, যে প্রাণরক্ষার জন্য কত মহাত্মার কত প্রকার চেষ্টা, সেই প্রাণ অকাতরে লক্ষ লক্ষ বলি দিয়া আসিতেছে, তাহার একমাত্র কারণ তাহার সুশিক্ষার অভাব এবং চিরদিনের পুঞ্জীভূত সংস্কার অর্থাৎ এক কথায়, তাহার মূর্খতা। সে বুঝিয়া দেখে নাই, যাহাকে সে স্বদেশপ্রীতি বলিতেছে, তাহাই যথার্থ স্বদেশদ্রোহিতা। প্রীতি মিলন চাহে না, চাহে হত্যা, হিংসা এবং দ্বেষ। যাহাকে প্রীতি করি, তাহাকেই পাঠাই মরণের মুখে; বলুন দেখি, ইহা অপেক্ষা অধিক মূর্খতা আর কি হইতে পারে? মহাত্মা গান্ধি আজ জগতের এই পুঞ্জীভূত সংস্কারজাল ছিন্ন করিতে বদ্ধপরিকর। তাঁহার স্বদেশপ্রীতি তাই বিশ্বপ্রীতিরই প্রথম সোপান, তাঁহার রাজনীতি তাই ধর্ম্মের প্রকারভেদ, তাঁহার স্বাধীনতাও তাই ঋষি-প্রবর্ত্তিত মুক্তিরই নামান্তর।

*　　*　　*　　*

একখণ্ড জমি লইয়া দুই ব্যক্তির মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইলে কখন কখন উভয়ের মধ্যে খুনোখুনি হইয়া যায়। কখন কখন বিবদমান ব্যক্তিরা আদালতের আশ্রয় লইয়া থাকেন। কখন কখন আবার উভয়ের মধ্যে আপোষে সমস্ত গোলযোগ মিটিয়া যায়। এরূপস্থলে, শেষোক্ত দুই শ্রেণীর লোক যে প্রথম শ্রেণীর লোক অপেক্ষা অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ, তাহা নিঃসন্দেহ। গান্ধির অহিংসা নীতির প্রভাবে যদি মানব জাতির স্বভাব শেষোক্ত দুই শ্রেণীর ব্যক্তির ন্যায়ও হয়, তবে তাহা মনুষ্যসমাজের অল্প লাভ নহে। বিশেষতঃ, যুদ্ধ করিয়া কদাপি সেরূপ সুফল পাওয়া যায় না, অহিংসক থাকিয়া সকলকে বুঝাইয়া নিজ মতে আনিয়া যেরূপ সুফল পাওয়া যাইতে পারে। একটী পাশব শক্তির এবং অন্যটী আত্মিক শক্তির কার্য্য। তবে পশু শক্তির আপাত মধুর ফল যত শীঘ্র পাওয়া যায়, অধ্যাত্ম শক্তি তত শীঘ্র ফলবতী হয় না, একথা সত্য বটে, কিন্তু ইহাতে যেরূপ সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর স্থায়ী ফল লাভ হয়, পশু শক্তিতে তাহা কদাপি সম্ভবপর হইতে পারে না। বর্ত্তমান রাজনীতির প্রাণবিদাহী উষ্ণ মরুভূমিতে দেবত্বের অমৃতধারা প্রবাহিত করিতে হইলে, গান্ধির অহিংসা পথই উহার একমাত্র প্রশস্ত পথ।

*　　*　　*　　*

একখণ্ড জমি লইয়া আপনার ও আমার মধ্যে খুনোখুনি হইবার উপক্রম হইল। কিন্তু কেন এমন হইল, ইহার একমাত্র কারণ এই যে, আমরা উভয়েই জমিটুকু ভোগ করিবার জন্য ব্যতিব্যস্ত, বর্ত্তমান সভ্যতা আমাদিগকে ইহাই শিক্ষা দেয়—শিক্ষা দেয় যে, ভোগই একমাত্র পরম পুরুষার্থ, যে ভোগ করিতে না পারিল, তাহার

জন্মই বৃথা হইল। ফলতঃ, বর্ত্তমান সময়ের এই ভোগাত্মিকা শিক্ষাকে পদদলিত করিয়া যেদিন আমরা তপঃ ক্ষেত্র ভারতের ত্যাগমুখী শিক্ষাকে বরণ করিয়া লইতে পারিব, সেদিন আবার হয়ত আমরাই পরস্পরে বলাবলি করিব, "ভাই, তোমার কষ্টের সংসার, জমিটুকু তুমিই লও"। গল্প শুনিয়াছিলাম, এক কৃষক তাহার প্রতিবেশীর নিকটে একখণ্ড জমি বিক্রয় করিয়াছিল। ঐ জমিতে শেষে কিছু গুপ্তধন পাওয়া যায়। ইহা লইয়া উভয়ের মধ্যে গোলযোগ উপস্থিত হয়। একজন বলে "জমি তোমায় বেচিয়াছি, সুতরাং ঐ ধন তোমার"। অন্যে বলে, "আমি শুধু জমিই কিনিয়াছি, সুতরাং ঐ ধন তোমারই, তুমিই উহা লও।" পরিশেষে, আপন আপন পুত্র কন্যার বিবাহ দিয়া ঐ ধন তাহাদিগকে যৌতুক স্বরূপ অর্পণ করত তবে তাহারা সেই গোলযোগের নিষ্পত্তি করিয়াছিল। ভোগবাদীর "চোখের মন বোঁচকার দিকে" সে হয়ত এই কৃষকদিগকে মূর্খ বলিয়া মনে করিবে, কিন্তু যথার্থ জ্ঞানী বুঝিবেন, কি পরমধনের অধিকারী এই মূর্খ কৃষকেরা। আধসেরি ঘটিতে যেমন এক সের দুগ্ধ ধরে না, সেইরূপ, বর্ত্তমান যুগের এই ভোগাত্মিকা বুদ্ধির দ্বারা মহাত্মার এই নব রাজনৈতিক সত্য বুঝিতে যাওয়াও বিড়ম্বনা মাত্র।

* * * *

আর্য্য ঋষিরা ধর্ম্মের বিরাট রূপ কল্পনা করিয়াছেন। এই বিরাট ধর্ম্মহীনতা পূর্ণ রাজনীতিকেও কেমন করিয়া ধীরে ধীরে আপনার বিশাল কুক্ষিগত করিয়া লইতেছে, রাজনীতি ও ধর্ম্ম কেমন করিয়া ধীরে ধীরে সমার্থক হইয়া দাঁড়াইতেছে, তাহা ভাবিয়া দেখিবার বিষয়। বস্তুতঃ, কি রাষ্ট্রে, কি ধর্ম্মে সর্ব্বত্রই আজ একই নীতি—সর্ব্বত্রই গণতন্ত্রের প্রভাব। ধর্ম্মগুরু এখন আর জাতিবর্ণ বিদ্যাবুদ্ধির দ্বারা হওয়া যায় না। একমাত্র সাধনার দ্বারা, একমাত্র মানবজাতির সেবার দ্বারাই এখন ধর্ম্মগুরু হইতে হয়। সেবাক্ষেত্রের অগ্নি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিলেই তবে গুরুত্ব করিবার অধিকার জন্মে। বিবেকানন্দ ভারতের একনিষ্ঠ সেবক হইতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই জনসাধারণ তাঁহাকে গুরুত্বে বরণ করিয়া লইয়াছিল। সেইরূপ, এখন আর রাজবংশে জন্মিলেই রাজা হওয়া যায় না। এব্রাহাম লিঙ্কনের ন্যায় দেশসেবায় যোগ্যতা প্রদর্শন করিয়া তবে দেশনায়কের পদবী অর্জ্জন করিতে হয়। প্রজারা মানিলেই তবে রাজা, নহিলে রাজা কিসের? ভক্তেরা মানিলেই তবে ভগবান, নহিলে ভগবান কিসের? তাই শাস্ত্র বলেন, ভগবানের চেয়ে ভক্তেরাই বড়। কৃষ্ণের চেয়ে রাধারই তাই অধিক মান। ফলতঃ, ঐশীশক্তি, রাজশক্তি, এখন আর কোনও স্থানবিশেষে কেন্দ্রীভূত নহে। প্রত্যেক ব্যক্তিই স্বরাট্ এবং ভগবানের পূর্ণ প্রকাশ, এই সত্য উপলব্ধি করাই বর্ত্তমান যুগের সাধনা। শাস্ত্র নিয়ম বিধি নিষেধের গণ্ডী রচনা করিয়া, আইন আদালতের মার-প্যাঁচে ফেলিয়া আত্মাকে পঙ্গু করিয়া ফেলা, এ যুগের সাধনা নহে, ইহা স্মরণ রাখা সকলেরই কর্ত্তব্য।

* * * *

Survival of the fittest—যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তন—বর্ত্তমান ইউরোপের মন্ত্রগুরু ডারউইনের ইহাই উক্তি। কিন্তু এক্ষণে প্রশ্ন এই, যোগ্যতম কে?—সিংহ পশুরাজ, নখাস্ত্রধারী মহাবল। কিন্তু সেই পশুরাজ আজ দুর্ব্বল মানবের ক্রীড়নকমাত্র। মনুষ্য সিংহকে পোষ মানাইয়াছে, কিন্তু সিংহ মনুষ্যকে বশীভূত করিয়াছে, এমন কথা কোনও দিন শুনা যায় নাই। আত্মার প্রভাব এইখানেই অনুভূত হয়। প্রাচীন রোমকরাজ্যের কি না ছিল—অস্ত্র ছিল, সৈন্য ছিল, অর্থ ছিল, বিদ্যা ছিল, বীর্য্য ছিল, এক কথায় সে সর্ব্বাংশেই যোগ্যতম ছিল। কিন্তু আজ সে কোথায়? হাউইবাজি আকাশে উঠিয়া আকাশেই নিবিয়া গিয়াছে। তাহার চিহ্নমাত্র খুঁজিতে হইলে আজ শুধু ইতিহাসের পৃষ্ঠাই উল্টাইতে হয়। আর, এই হতভাগ্য ভারতবর্ষ শত ঝঞ্ঝাবাত, সহস্র শিলাবৃষ্টি শিরে সহিল, আঘাতে আঘাতে জর্জ্জরিত হইল, মচ্কাইল, ভাঙ্গিল, কিন্তু মরিল না। সুতরাং বুঝিতে হয়, কৌপীনমাত্র সম্বল ভারতের এমন কিছু নিজস্ব নিশ্চয়ই আছে, যাহা বিশাল রোমক সাম্রাজ্যেরও ছিল না। উহাই ভারতের আধ্যাত্মিক বল,—তাহার নিজস্ব সম্পত্তি।

স্বরাজ-মিস্ত্রী।

[শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত এম্-এ, বি-এল]

ভোরের বেলায় বাঘা ও ভাল্‌কো—আমার দো-আঁসলা টেরিয়র-যুগল—ভীষণ চীৎকার করিয়া উঠিল। আমি ভাবিলাম একটা কাবুলীওয়ালা বা চীনাম্যান আসিয়াছে। আমি তাড়াতাড়ি বাহিরে গিয়া বাঘা-ভাল্‌কোকে থামাইলাম। দেখি, আমাদের পল্লীর এম্ এল্ সি বাবু, পৃষ্ঠে একটা মস্ত ঝুলি লইয়া এক কিম্ভূতকিমাকার সাজে আমার দ্বারস্থ হইয়াছেন। এক হস্তে রাজমিস্ত্রীর করণিকের মত একটা যন্ত্র, অপর হস্তে একটা পোঁচড়া। কোমরে একটা দড়িতে বাঁধা সাবল, বাইস আর একখানা নক্সার কাগজ রুলের মত পাকানো।

ছোট ছেলের গভীর অভিমানের কান্নার উৎসকে লজনচুস এবং আলিপুরের চিড়িয়াখানায় লইয়া যাইবার প্রতিশ্রুতির দ্বারা থামাইলে সে যেমন মাঝে মাঝে ফুঁপানোর আকার ধারণ করিয়া আত্ম-প্রকাশের চেষ্টা করে, আমার ভৎর্সনায় শান্ত হইয়াও বাঘা-ভাল্‌কো মাঝে মাঝে একটা অর্দ্ধস্ফুট কেঁউ কেঁউএর দ্বারা এম্ এল্ সি বাবুর প্রতি অসম্মান প্রকাশে যত্নবান ছিল। আমি মাঝে মাঝে দুই একটা দাব্‌ড়ি দিয়া এম্ এল্ সি বাবুকে বলিলাম—এ কি সাজ?

তিনি নিজের কোমরের যন্ত্রগুলা নাড়িয়া বলিলেন—স্বরাজ-মিস্ত্রী।

বাঘা—কেঁ—

আমি বলিলাম—"চুপ্।" বাঘা লেজ নাড়িল। ভাল্‌কো ঘাড় নীচু করিয়া তাহার তিন ইঞ্চি লাঙ্গুলকে দোদুল-দোলায় দুলাইয়া দিল।

আমি স্বরাজ-মিস্ত্রীকে আমার সম্মিলিত বৈঠকখানা-ড্রয়িংরুম-লাইব্রেরি ও রজনীতে বেকার নীলু খুড়ার শয়ন-কক্ষে লইয়া গিয়া একখানা নিলামে-খরিদ ক্যাঁচকেচে কৌচের উপর বসাইয়া বলিলাম—রাজ-মিস্ত্রী শুনেছি, ফ্রি-মেশন নামক এক রকম খানা-খাবার-যম আর মাল টানবার কুপো বিশেষ এক জাতীয় মিস্ত্রী তো জানি। স্বরাজ-মিস্ত্রীটা একটু অভিনব।

তিনি হাসিয়া বলিলেন—হ্যাঁ, অভিনব যুগের উপযোগী। পৃথিবী বর্দ্ধমান—

আমি বলিলাম—হ্যাঁ। এখন বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজের প্রভাব—

তিনি বাধা দিয়া বলিলেন—আহা! সে বর্দ্ধমান না ভাব-বর্দ্ধমান অর্থাৎ উন্নতিশীল।

আমি অপ্রস্তুত হইয়া বে-মালুম উপলব্ধি করিলাম যে, ভাব-বর্দ্ধমান মিহিদানা-প্রসূ বর্দ্ধমান হইতে বিভিন্ন। তিনি বলিলেন—ভারতবর্ষ এখন সংস্কৃত—

আমি বাধা দিয়া বলিলাম—এটি মাফ করতে হ'বে, সংস্কৃত-চর্চ্চা—

তিনি বলিলেন—আপনি বড় গোল করেন। সংস্কৃত ভাষা নয়, সংস্কৃত ভারত—রিফর্ম্‌ড্ ইণ্ডিয়া।

আমি জানালার দিকে চাহিলাম। গবাক্ষ পথে একটু ভিড়ের লক্ষণ দেখা যাইতেছিল। একটি বালক অপর একটি বালকের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ পদ-দলিত করিয়া একটা গণ্ড-গোল স্ফুলিঙ্গ উৎপন্ন করিয়াছিল—তাহা একজন যুবক দুইজনকে দুইটা থাবড়া দিয়া নির্ব্বাপিত করিয়া দিয়াছিল।

আমার সম্মানিত অতিথি বলিলেন—আমাদের নূতন রাজনৈতিক সংস্কার হেতু দেশে রাজনৈতিক দলের সৃষ্টি হইয়াছে। আমি অসহযোগীদের কথা বলি না—তাহারা কৌন্সিলের বাহিরে—

জানালা হইতে জ্যাঠ্‌ছেঁদর বলিল—জেলের ভিতরে—

এম্ এল্ সি একটু উষ্ণতার সহিত বলিল—নিজ কর্ম্মফলে—

একজন সক্রোধে বলিল—বটে, ক্যানচাটা—

গোলমালে ভাল্‌কো কেঁউ করিয়া উঠিল। আমি হাত নাড়িয়া সকলকে থামাইয়া পারিষদকে কথা কহিতে বলিলাম।

তিনি বলিলেন—কৌন্সিলের ভিতর একদল কেবল বাধা দেয়—সকল অনুষ্ঠানে বাধা। কিন্তু আমাদের দল—মন্ত্রীর দল—জাতি-গাঁথুনী বা নেশন-বিল্ডিং দল। তাই আমরা নিজেদের নামকরণ করিয়াছি—স্বরাজ-মিস্ত্রী।

আমার হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে একটি স্বস্তির শ্বাস বা সাই অফ্ রিলিফ উত্থিত হইল। দুষ্টামি করিয়া জ্যাঠ্ঠেশ্বর নস্য-সহযোগে একটা বিকট ভাবে হাঁচিল। অসহযোগী স্যাণ্ডেশ্বর ভ্রূকুটি করিয়া বলিল—"রাখালি কত খেলাই দেখালি।"

সকলে নিস্তব্ধ হইলে এম্ এল্ সিকে বলিলাম—যদি গাঁথাই আপনাদের দলের ব্যবসা তবে শাবল কেন?

সে বলিল—গড়িতে গেলেই ভাঙ্গিতে হয়।

জ্যাঠ্ঠেশ্বর বলিল—যথা য়ুনিভার্সিটি।

এম্ এল্ সি সগৌরবে বলিল—হাঁ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ভাঙ্গা আমাদের কার্য্য-বিবরণীর মধ্যে। আমাদের নায়ক-পুত্র বাল্যচপলতা বশে একটা পরীক্ষায় বহি দেখিয়া লিখিয়াছিল—য়ুনিভার্সিটির এত বড় স্পর্দ্ধা যে তাহাকে শাস্তি দেয়। দেশের এই অরাজকতা—শক্তির এই অযথা কেন্দ্রীকরণের আমরা বিরোধী।

স্যাণ্ডেশ্বর ভ্রূকুটি করিয়া বলিল—যাদুরে!

অনেকে হাসিল। একজন বলিল—চুপ করুন না মশায়।

স্বরাজ-মিস্ত্রী বলিল—এই যে শাবল—এর নাম আশুতোড় শাবল। এই নক্সা আমাদের ভাবী স্বরাজ সৌধের চিত্র।

এবার তিনি বড় থলিটি খুলিলেন, তাহার ভিতর হইতে তিনখানি মোটা মোটা ইট বাহির করিলেন। আমি আশ্চর্য্য হইয়া একখানা তুলিতে গেলাম, পারিলাম না।

তিনি হাসিয়া বলিলেন—ইহার নাম বনীয়াদ ইট। একটা ইমারত গড়তে গেলে দৃঢ় করতে হয় তার বনীয়াদ। এক একখানি ইটের ওজন ৬৪,০০০ তোলা বা ২০ মণ।

"বটে!"

"হাঁ। এই ধরুন মোটরচালক আর গরুর গাড়ির গাড়োয়ান—কাজ করে দু'জনেই এক। মোটরচালকের ইজ্জৎ অধিক, কারণ তার বেতন অধিক। রেলের গার্ডের মান ঐ কারণেই ট্রাম কণ্ডাকটার অপেক্ষা অধিক। এই বনীয়াদী ইট এক একখানি সচিবের বেতন। স্বরাজ গেঁথে তুল্‌তে গেলে সচিবের বেতন অধিক হওয়া চাই। ঐটাই বনীয়াদ। বুঝলেন?

স্যাণ্ডেশ্বর বলিল—জলের মত।

জ্যাঠ্ঠেশ্বর বলিল—ঐ সব বুঝে সুঝেই তো চক্ষু বুজে আছি।

বক্তেশ্বর একটা বক্তৃতা দিবার চেষ্টা করিতেছিল, তাহাকে ধমক ধামক দিয়া চুপ করাইয়া দেওয়া গেল।

আমি বলিলাম—ভাল। আপনার ও মগটা কিসের?

তিনি বলিলেন—রাজমিস্ত্রী যেমন জল দিয়া গাঁথনী করে, আমার বিশ্বাস যে জাতি-গাঁথুনীতে তৈল ব্যবহার করা দরকার। এই মগে করিয়া আমরা তৈল দান করি। প্রথম তৈল ভোটারদের, যাহাদের ভোট ব্যতীত আমরা কৌন্সিলে যাইতে পারি না। তাহার পর নানাপ্রকারে তৈলের সদ্ব্যবহার করিয়া আমরা স্বরাজলাভ করিব! করিব!! করিব!!! কেবল লড়াই করিয়া বা কাটুগোঁয়ারের মত অসহযোগ করিয়া—

স্যাণ্ডেশ্বর সক্রোধে বলিল—খবরদার।

স্বরাজ-নির্ম্মাতা বলিল—নয় তো কি? চলতি ট্রেণের সামনে গিয়ে চুপটি করে শুয়ে থেকে দেখ দেখি আত্মিক বল বেশী কি রেলগাড়ির চাকার জোর বেশী।

একটা তর্ক উঠিতেছিল। তাহা থামাইয়া বলিলাম—যাক্। ও বাস্ কিসের?

তিনি বলিলেন—ইহা কুড়ুলের প্রকার ভেদ। কৌন্সিলের ভিতরেও আবার একটা হুমকী দল আছে। তারা মন্ত্রীর দলের বিরোধী—ভবিষ্যতে মন্ত্রীত্বের উমেদবার। তাদের হাতে কুড়ুল থাকে। তারা প্রতি বৎসর এক একবার মাঘ ফাল্গুনে কুড়ুল ঘুরিয়ে পাঁয়তাড়া করে। আমাদের পুলিস স্তম্ভের পাদমূলে কুঠারাঘাত করিতে যায়, পারে না। তারা এমন কি মাঝে মাঝে বুনিয়াদ ইটের উপর কোপ মারিবার চেষ্টা করে।

আমি বিস্ময়ে বলিলাম—বলেন কি? তবুন কি ক'রে

এই অত্যাবশ্যক স্বরাজ-সৌধের ভিত্তি-ইষ্টককে সেই অল্পবুদ্ধিদের আক্রমণ হ'তে রক্ষা করেন ?

তিনি হাসিয়া বলিলেন—সে যন্ত্র আমাদের আছে। বস্তুতঃ চাণক্য-শ্লোক হইতে আরম্ভ করিয়া আধুনিক সমস্ত রাজনৈতিক জগদ্গুরুর বক্তে, সে যন্ত্রের আভাষ পাওয়া যায়। সংস্কৃতে তাহাকে বলে কূটনীতি—কথাটা শুনতে খারাপ। আধুনিক ভাষায় তাহার নাম—ডিপ্লোমেসি। যখন সেই বেকুফি-কুঠার আমাদের বনীয়াদ ইটের উপর নিপতিত হয়, তখন আমাদের দলপতিরা কিম্বা কোনও ইংরাজ মুরুব্বি তাহাদের প্রত্যেককে বিরলে ডাকিয়া বলে—করছ কি, তোমার নিজের ভবিষ্যৎ বেতন কাটছ ? তাহারা প্রত্যেকে ভাবে—আগামী বারে মন্ত্রী হইব আমি। বাড়ী গিয়া স্ত্রীর সঙ্গে ভাল করিয়া কথা কয় না—সদাই অন্যমনস্ক থাকে—স্ত্রী ভাবে স্বামীর চরিত্রদোষ জন্মিয়াছে। গৃহে অশান্তি হয়। সেই বিদ্রোহ দমন করিতে গিয়া তাহার সমস্ত শক্তি নষ্ট হয়। কৌন্সিলে আর লড়িতে পারে না। আর কাণে যে শ্যামের বাঁশী বাজিয়ে দেওয়া হয়, তাহার মোহে সে আমাদের দিকে ভোট দেয়।

একটা মহা গণ্ডগোল হইল। অহা থামাইয়া বলিলাম —আচ্ছা এ বাইসের তো কার্য্যের কথা বলিলেন না ?

"আমাদের সংস্কৃত-পরিষদের একটা তুচ্ছ ভুল হ'য়ে গেছে—আয়ে ব্যয়ে মেলে না। এমন অসামঞ্জস্য দুনিয়ার ঘটেই থাকে। এই আইন দিয়ে আমাদের মাঝে মাঝে খরচ-বৃক্ষের ডালপালা কাটতে হয়।"

জ্যাঠ্ঠেশ্বর—এই যথা—কেরাণী, চাপরাসী, দপ্তরী এবং শিক্ষা বিভাগের ব্যয়।

সগর্ব্বে এম্ এল্ সি বলিল—নিশ্চয়, তা না হ'লে কি পুলিস কমবে, না শাসনবিষয়ে শিক্ষা-গুরু ইংরাজ আমলার বেতন—

স্যাণ্ডেশ্বর বলিল—বালাই, ষাট !

আমি দেখিলাম একটা ঝগড়ার সূচনা হইতেছে। আমি বলিলাম—থাক্। থাক্। আপনি অপর একদিন এসে বাকী অস্ত্রশস্ত্রগুলার দোষ গুণ প্রয়োজন বলে যাবেন। আপাততঃ এক কথায় বলে যান—ঐ পোঁচড়াটা কি কাজের জন্য ?

সে বলিল—একটা সৌধ নির্ম্মাণ করতে গেলে অনেক কাটখড় লাগে। এই পোঁচড়া একটা অত্যাবশ্যক পদার্থ। একে আধুনিক ভাষায় বলে—কমিশন, এই কলিচুণের পোঁচড়া—

বক্কেশ্বর বলিল—কালির পোঁচড়া আছে ?

তিনি সক্রোধে বলিলেন—কেন মশায় ?

জ্যাঠ্ঠেশ্বর গম্ভীর ভাবে বলিল—তাহ'লে আপনার মত নেশান-বিল্ডারের এক গালে এই পোঁচড়াটা, আর এক গালে সেই পোঁচড়াটা টেনে দিলে—দেশের ও দশের উপকার হ'ত।

পথভ্রান্ত।

[শ্রীরাসবিহারী মণ্ডল বি-এল]

(১)

এমনি অভাবনীয় ভাবে যে আজ এতদিন পরে এই সুদূর ছোটনাগপুরের রাজপথে দীনেশের সঙ্গে দেখা হবে, তা আমি ধারণা করতেও পারি নাই। দীনেশ আমার আবাল্যের বন্ধু, যৌবনের সহপাঠী। যখন আমি সেক্রেটারিয়েটে চাকুরী নিয়ে বাংলা ছেড়ে এখানে আসি তখন সে বি,এ পাশ করে' আইন পড়ছিল। তারপরও মাঝে দু' একবার দেখা হ'য়েছিল, কিন্তু এই শেষ পনর ষোল বৎসরের মধ্যে আর তার সঙ্গে সাক্ষাতের সৌভাগ্য হয়ে ওঠেনি। তবে এই রাঁচিতে রাজসেবা করতে করতেও মধ্যে মধ্যে সংবাদ পেতুম, দীনেশ নাকি এখন হাইকোর্টের একজন প্রসিদ্ধ উকিল,—অগাধ ধনের অধীশ্বর। অফিস্ হ'তে ফেরবার পথে আজ তাকে চাক্ষুষ দেখলুম, সে তার স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে মোটরে বেড়াতে

'পড়ে' চিৎকার করছে,—আর আমার ভাই সীতেশ খোকার মৃতদেহটা তখন বুকে ক'রে পাথরের মত বসে আছে। আমার ইচ্ছা হ'ল দেওয়ালে আমার মাথাটা ঠুকে ভেঙ্গে ফেলে সব শেষ করে দিই, কিন্তু কিছুই করা হ'ল না, আস্তে আস্তে চোরের মত সীতেশের বুক হ'তে খোকার নীলবর্ণ দেহখানা তুলে নিয়ে অমলার অজ্ঞাতে বাড়ী হ'তে বেরিয়ে পড়লুম। বাড়ীর বাহিরে এসে গ্যাসের আলোর নিচে খোকার উন্মুক্ত ছোট্ট কচি মুখখানি একবার ভাল ক'রে দেখে তাকে বুকে চেপে ধরে শ্মশানের পথ ধরলুম—তখনও অমলার বুকভাঙ্গা কান্নার শব্দ বাতাসে ভেসে আসছিল।

* * *

ঠিক্ তার পরদিন রাত্রে, সেই সবেমাত্র খোকাকে হারিয়ে অমলার সঙ্গে প্রথম কথা কচ্ছিলুম, সে আমার পায়ের উপর মাথাটা রেখে, অশ্রুজলে আমার পা-দু'টো ধুয়ে দিচ্ছিল। আর আমার বুকখানা সোজা হ'য়ে উঠছিল—নিয়ন্তার বিপক্ষে। সেই সময় ব্যস্ত হ'য়ে বাহিরে কে ডাক্‌লে,—"উকিল বাবু!"

বাহিরে আসতেই এক ভদ্রলোক আমায় বল্লেন, "মশাই দয়া করে একবার আস্‌বেন, একখানা উইলে সাক্ষী হ'তে হবে—বৃদ্ধের মৃত্যু সন্নিকট"।

দ্বিরুক্তি না করে, অমলাকে বলে সেই ভদ্রলোকের সঙ্গে বেরিয়ে পড়লুম। হরিশ মুখার্জ্জি রোডের উপর একখানা প্রকাণ্ড বাড়ীর সাম্‌নে এসে আমরা গাড়ী হ'তে নামলুম। উপরে উঠে দেখলুম ঘরের ভিতর এক বৃদ্ধের মৃতদেহ, পার্শ্বে উপবিষ্টা এক অপূর্ব্ব ষোড়শী সুন্দরী! সে কে জান? সে চামেলী, যাকে তুমি এইমাত্র দেখ্‌লে। ঘরের ভিতর আরও দু-চার জন লোক ছিল; যে ভদ্রলোকের সঙ্গে গিয়েছিলুম, তিনি আমায় পাশের ঘরে ডেকে নিয়ে গেলেন। সেখানে একজন অল্পবয়স্ক ডাক্তার বসেছিলেন। আমার হাতে তিনি উইলখানা দিয়ে সমস্ত ব্যাপারটা খুলে বললেন। সাক্ষরিত উইলে সাক্ষী হ'তে হবে,—আমাকে ও ডাক্তারবাবুকে। পুরস্কার সহস্র মুদ্রা!

আমি মুখে বললুম, "না মশায়, এ কাজ আমার দ্বারা হবে না। সে শুধু দুর বাড়াবার জন্য। ভদ্রলোকের অনেক মিনতি, অনেক পীড়াপীড়ির পর আমি বল্‌লুম, দেখুন, এতে Responsibility (দায়িত্ব) অনেকখানি, এত কমে হবে না। ডাক্তার বাবুও আমাকে সমর্থন করে বলে উঠ্‌লেন, "নিশ্চয়ই"

* * *

গভীর রাত্রে, কার্য্যশেষে, একসঙ্গে দু'হাজার টাকা পকেটে নিয়ে বাড়ী ফিরলুম। চামেলীর স্বামী, সেই মৃত বৃদ্ধের অনেক জমিদারী—অগাধ পয়সা। চামেলীর পিতা, সেই ভদ্রলোক, চামেলীর ষ্টেটের সমস্ত কাজকর্ম্ম আমায় দিতে প্রতিশ্রুত হলেন। সৌভাগ্যলক্ষ্মী সেই হ'তেই আমার প্রতি সুপ্রসন্ন দৃষ্টিপাত করলেন। চামেলীর ষ্টেটের যে সমস্ত মোকর্দ্দমা আমার হাতে এল'—তাতেই একজন জুনিয়র উকিলের বেশ চলে যায়, সঙ্গে সঙ্গে অন্য কাজকর্ম্মও বেশ জুটতে লাগল'।

চামেলীর বাড়ী প্রায়ই আমায় যেতে হত'—চামেলীর বাপই জমীদারীর তত্ত্বাবধান করতেন। তাঁর সঙ্গে যখন কথা-বার্ত্তা হত',—দোরের আড়ে পর্দ্দার পাশে চামেলী চুপটি করে দাঁড়িয়ে থাকত।

চামেলীর স্বামীর বৈমাত্রভায়ের ছেলেরা ওয়ারিশন সূত্র নিয়ে উইলের বিরুদ্ধে মকর্দ্দমা করলে। জেলা কোর্টে আমরা জিতলুম—হাইকোর্টে আপিল হ'ল। ঠিক সেই সময় তিন দিনের জ্বরে ভুগে চামেলীর বাবা পরপারে চলে গেলেন। এদিকে হাইকোর্টেও মোকর্দ্দমার বিচার উল্টে গেল। চামেলী ভেঙ্গে পড়ল—সেই সময় প্রত্যহই একবার করে আমায় চামেলীকে দেখ্‌তে যেতে হ'ত। তাকে সান্ত্বনা দেবার তেমন নিকট-আত্মীয় কেউ ছিল না। চামেলীকে বুঝিয়ে মোকর্দ্দমা Privy Council এ পাঠান হল।

এদিকে চামেলীর শোকের বেগটা একটু কমে এলে, সে মাঝে মাঝে আমার সঙ্গে বেড়াতে যেত। তাকে সঙ্গে নিয়ে ইডেন গার্ডেনে, ময়দানে বেড়াতে যেতুম। এম্‌নি দিনের পর দিন চামেলীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা খুব বেড়ে উঠ্‌তে লাগল, কিন্তু তখন বুঝিনি যে চামেলী এম্‌নি একটা অচ্ছেদ্য ডোরে আমার সঙ্গে বাঁধা পড়ছে। তবে এইটুকু বুঝ্‌তুম, সে আমায় দেখ্‌লে সুখী হ'ত, দিনান্তের পর সন্ধ্যার

ব্যাকুল আগ্রহে আমার আশাপথ চেয়ে ব'সে থাকত,—আমায় দেখে তার মুখখানি দীপ্ত হ'য়ে উঠ্‌তো—চোখ দু'টী প্রোজ্জল হ'য়ে উঠত।

(৩)

বৎসর ঘুরতেই আবার একটী দেবদূতের মত শিশু এসে অমলার কোল জুড়ে ব'সেছিল,—কিন্তু ফনি! আমার দুঃখের দিনে অমলার মুখের যে হাসিটুকু জ্যোৎস্নার মত স্বচ্ছ হ'য়ে স্বতঃই ফুটে থাকত',—সৌভাগ্যের দোরে দাঁড়িয়েও, আর যেন সহস্র চেষ্টাতেও সেটুকু ফিরিয়ে আনতে পারতুম না। সে যেন বড়ই অন্যমনা হ'য়ে পড়েছিল,—কিন্তু তখন কি আর আমার সময় ছিল যে তার দিকে দৃষ্টি রাখি, না তখন আমি ভেবেছিলুম যে একদিকে যেমন আমি সৌভাগ্যের উচ্চশিখরে উঠ্‌ছি—তেমনি সঙ্গে সঙ্গে অন্যদিকে আমার সর্ব্বস্ব হারাতে বসেছি। তখন আমার অবসর মোটেই ছিল না—ধনীর সে অবসর থাকে না। তার উপর চামেলী! তার রূপের মোহেও যে আমি আচ্ছন্ন হ'য়ে না পড়েছিলুম তা বল্‌তে পারি না, তবে বোধ হয় এ অহঙ্কারটুকু তখনও ছিল যে যেখানে অমলার প্রেমের অক্ষয় কবচ ধর্ম্মের মত ঘিরে আছে, ইচ্ছা করলেই সেখান হ'তে এ দুর্ব্বলতাকে ঝেড়ে ফেলে দেব। সুন্দর—যে, তাকে দেখে প্রশংসা না ক'রে থাক্‌তে পারে কে? রূপের উপাসক নয় কে? কিন্তু যেদিন Privy Councilএর মকর্দ্দমা জয়ের সংবাদ নিয়ে চামেলীকে অভ্যর্থনা করতে গেলুম, সেইদিন সেই উৎসবময়ী রজনীতে অনাঘ্রাতা চামেলী আমায় অবলম্বন করে কলঙ্ক-সাগরে ঝাঁপ দিলে। যখন তার অতৃপ্ত বাসনারাশি অশ্রু হ'য়ে গলে আমার পা-দুখানা ধুয়ে দিলে, আমি সংসার ভুলে, অমলাকে ভুলে, ক্ষণিকের মোহের বশে অধঃপতনের নিম্নস্তরে নেমে গেলুম। সমস্ত ডুবিয়ে দিয়ে সেই আঁধারের দেশে বুকখানা আলো করে রইলো,—চামেলীর ফুলের মত মুখখানা! তার ব্যর্থ জীবন সার্থকতার আলোকে দীপ্ত হ'য়ে উঠ্‌লো,—তার অতৃপ্ত বাসনামাখা চোখ দু'টীতে একটা তৃপ্তির অরুণিমা ফুটে উঠল। আমি ধন্য হলুম,—আত্মদানে। তার তৃপ্তির জন্য জীবন উৎসর্গ ক'রে, যে আমার সকল সৌভাগ্যের মূল।

আমার যশোরাশি চারিদিকে ব্যাপ্ত হ'য়ে পড়ল, এই Privy Councilএর মকর্দ্দমা জয়ের পর হ'তে। আমি সেই সময় হাইকোর্ট join করলুম। চামেলী নিজের ব্যয়ে আমায় ভবানীপুরে বাড়ী তৈয়ার করিয়ে দিলে,—গাড়ী ঘোড়াও কিনে দিলে।

যেদিন নূতন বাড়ীতে 'গৃহ-প্রবেশ' করলুম, সেই রাত্রে উৎসব শেষে অমলা আমায় বলেছিল, "ওগো! আমার সবই হয়েছে, কিন্তু আমার মনে হয় যেন তোমায় আমি হারাতে বসেছি।" ফনি, সেদিন আমি বুঝি নেই অভাগিনী কি মর্ম্মন্তুদ যাতনায় আমার কাছে সেই অনুযোগ করেছিল। আমি বেশ কঠোর হ'য়েই তাকে উত্তর দিয়েছিলুম, "তুমি আমায় অবিশ্বাস কর, না অমলা? এম্‌নি সঙ্কীর্ণ মন তোমার! কিন্তু সেদিন আর নেই অমলা, যে আমি তোমাকেই সম্বল ক'রে দিবারাত্রি তোমার আঁচলে বাঁধা থাকব।" অমলা তার ঐশ্বর্য্যমদদৃপ্ত স্বামীকে আর কোন কথা বলে নাই, অভিমানে ফুলে ফুলে কেঁদে অভাগিনী ঘুমিয়ে পড়েছিল।

তখন আমি নেমে যাচ্ছিলুম, চামেলীর রূপের নেশায় তখন আমি বিভোর। চামেলীর অঙ্গে তখন যৌবনের ভর্ত্তি জোয়ার,—তার অপরিসীম রূপের তরঙ্গে আমি গা ভাসিয়ে দিয়েছিলুম, অমলার সুখ-দুঃখের অনুসন্ধান করবার মত সময় আমার ছিল না। এম্‌নি যখন প্রলয় অবসানে ধ্বংসস্তূপের মত এই সংসারের বুকে আমরা দুটী প্রাণী, চামেলী আর আমি,—আর সব চোখের সাম্‌নে হ'তে সরে গিয়েছিল; ঠিক্ সেই সময় সহসা একদিন ডাক্তারের মুখে শুনলুম, অমলাকে কালে ধ'রেছে,—সে যক্ষ্মা-রোগ-গ্রস্তা। মুহূর্ত্তে আমার নেশা ছুটে গেল, চোখের সাম্‌নে বিশ্বসংসার কালো হয়ে গেল; চামেলীকে খুঁজে পেলাম না, স্ত্রী হ'ল অমলা,—আমার দুঃখের সঙ্গিনী অমলা! কিন্তু আমার অদৃষ্টে তা সইবে কেন? তিন মাস গেল না,—ফুল ঝরে গেল,—আমার সংসার-নন্দনের পারিজাত অকালে শুকিয়ে গেল!

ঐশ্বর্য্যে তাকে সুখী করতে পারিনি, সে বলেছিল, "তোমার বিনিময়ে যে ঐশ্বর্য্য আমি পেয়েছি, সে ঐশ্বর্য্য শুধু আমার জ্বালা বাড়িয়েছে।"

এমনি যখন সর্ব্বস্বহারা হ'য়ে, আমি তার স্মৃতির জ্বলন্ত দহনে ধীরে ধীরে অনন্তের পথে অগ্রসর হচ্ছিলুম,—আর আমার পাপের সহচরী চামেলী তার প্রাণপণ শক্তিতে আমায় ধ'রে রাখবার চেষ্টা করছিল,—সেই সময় একদিন চামেলী আমায় বুঝিয়ে দিল যে, আমাদের অবৈধ প্রণয়ের বিষময় ফল ফলেছে। সেই সময় নিরুপায় হ'য়ে নিজের লজ্জা, বিধবার লজ্জা ঢাকবার জন্য একটা লৌকিক আয়োজন করে সমাজকে বুঝিয়ে দিলুম, আমি বিধবা চামেলীকে বিবাহ করেছি। সেই পর্য্যন্ত লোকে জানে চামেলী আমার পরিণীতা স্ত্রী। কিন্তু ফনি! ধর্ম্মতঃ সে আমার কেউ নয়, শুধু পাপের সঙ্গিনী! তবে সেই আমার সৌভাগ্যলক্ষ্মী,—জীবনযুদ্ধে রক্তাক্ত হ'য়ে তাকে অবলম্বন করেই আমি সৌভাগ্যের ক্ষীণ আলোকরেখা দেখেছিলুম——ঐশ্বর্য্যের উচ্চশিখরে ওঠবার প্রলোভনে তার হাত ধ'রে অধঃপতনের নিম্নস্তরে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলুম। শুধু ঐশ্বর্য্যের বিনিময়ে বিবেকের কণ্ঠরোধ করে তার কাছে আত্মবিক্রয় করেছি,—অমলাকে হত্যা করেছি। কিন্তু যেদিন এসেছে ফনি! তাতে দু'বেলা পেট ভরে দু'টি খেতে হ'লে ধর্ম্মের মুখ চেয়ে ব'সে থাকলে চলে না, সত্যযুগের আলো সংসার হ'তে নিবে গিয়েছে। ধর্ম্মের দোহাই দিয়ে ব'সে থাকলে চোখের সামনে স্ত্রী-পুত্র-কন্যার অনাহার দেখতে হবে,—চিকিৎসাভাবে, চোখের সামনে তাদের মৃত্যু দেখতে হবে। এ অনিবার্য্য! এ অধর্ম্মের বিষাক্ত বায়ু সংক্রামক হ'য়ে উঠেছে,—তাই মা লক্ষ্মী চঞ্চলা শুধু ধার্ম্মিক পণ্ডিতের ঘরে, আর ওঁর অচঞ্চল আসন আমার মত ঠগবাজ লম্পট জোচ্চোরের ঘরে!

সংসারকে খুব ধাপ্পা দিয়ে বড় হ'য়েচি না ফনি! আমি সেই দীনেশ,—ক্লাসের ফার্ষ্ট বয়,—স্কুলে, কলেজে যার চরিত্র আদর্শ ছিল! লোকে বলে আমি 'Self-made man'। এখনও আমার জীবন-সংগ্রামের এই যে জয় এটাও অনেকের আদর্শ! কিন্তু বলত ফনি, এ আমার জয় না পরাজয়?"

দীনেশ আড়ষ্টের মত কৌচখানায় শুয়ে পড়ল,—আমি নিশ্চল হ'য়ে তার মুখের পানে চেয়ে রইলুম। ঘরখানা ভীষণ স্তব্ধ হ'য়ে উঠল—শুধু পাশের টেবিলের উপর চলন্ত 'yost fan'টা মুখর হ'য়ে উঠে দীনেশের কথার প্রতিধ্বনি করতে লাগল,—'এ আমার জয় না পরাজয়?'

সহসা দীনেশ উঠে ব'সে আবার বলতে লাগল,—"এখনও শেষ হয়নি ফনি,—এখনও আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি নেই। এখনও যেমন একদিকে উঠছি, তেমনি অন্যদিকে ধাপে ধাপে নেমে যাচ্ছি। কিন্তু যখন নেমেছি, তখন এর তল না দেখে ফিরছি না। সবই ভুলেছি ফনি; কিন্তু বিবেককে এখনও ঠিক বশে আনতে পারিনি,—তাই এখনও মাঝে মাঝে কণ্ঠরুদ্ধ বিবেক রক্তবমন করতে করতেও অবরুদ্ধ কণ্ঠে গুমরে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে,—আর ধুয়ে ফেলতে পারি নেই ফনি! অমলার স্মৃতির রক্তলেখা!"*

চাঁদপ্রতাপের ব্রত-কথা।

(২) উদ্ধার চণ্ডী।

[শ্রীযোগেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী]

পুরাঙ্গনাগণ নানা ব্রতে নানা ভাবে দেবী ভগবতীর আরাধনা করিয়া থাকেন। বিপদ-আপদ না ঘটে ও দুর্ভাগ্য ক্রমে ঘটিলে তাহা হইতে উদ্ধার পাইবার কামনা করিয়া মহিলাগণ উদ্ধার চণ্ডী-ব্রত করিয়া থাকেন। বিপদাপদের ত্রিলোকত্তারিণী বিপদুদ্ধারিণী জগদম্বাই ত্রাণকর্ত্রী। তাঁহার চরণ-কমলে অচলা ভক্তি থাকিলে সুখে শান্তিতে কালযাপন করা যায়, ইহাই বঙ্গরমণী-বৃন্দের ধ্রুব বিশ্বাস। তাই বঙ্গের হিন্দুমাত্রেরই গৃহে মহিলাগণ ভক্তিপূতান্তঃকরণে, নিজের জন্য নহে, স্বামী-পুত্র আত্মীয়-গণের কল্যাণের নিমিত্ত ব্রতাদি করিয়া থাকেন। ইহাই বঙ্গ ললনাগণের বৈশিষ্ট্য।

অগ্রহায়ণ মাসের রবি অথবা বৃহস্পতিবারে দিবা ভাগে উক্ত চণ্ডীর ব্রত হইয়া থাকে। কোন বিশেষ কারণে উক্ত মাসে না পারিলে মাঘ ও বৈশাখ মাসেও এই ব্রত করা যায়।* প্রত্যেক ব্রতিনী একসের, একমুষ্টি ও এক চিমটি (দুই আঙুলের মিলিত অগ্রভাগ) পরিমিত আমন ধান লইয়া উহা হইতে চাউল প্রস্তুত করিয়া, ব্রতের দিন উহা চূর্ণ করেন এবং প্রত্যেকেই সম পরিমিত দুধ ও তদনুযায়ী খেজুর গুড় অর্থাৎ একসের দুধ, একপোয়া গুড় কিংবা ততোধিক পরিমাণে এই দুইটি দ্রব্য লইয়া থাকেন। তুষ (ধানের পেষিত খোসা), কুঁড়া (চাউলের লাল আবরণ), চাউল ধোয়া জল প্রভৃতি কিছুরই অপব্যবহার করা হয় না। ব্রতিনীগণ নিজেরা ক্ষির (তণ্ডুল চূর্ণ, দুগ্ধ ও গুড় দ্বারা প্রস্তুত পিষ্টক) ধাপরা পিঠা (শুধু চাউলের চূর্ণ অল্প জলে গুলিয়া তৈল, ঘি ছাড়া দুই পিঠ ভর্জ্জিত পিষ্টক) ও কুঁড়ার চাপটি প্রস্তুত করিয়া ভিন্ন ভিন্ন পাত্রে সাজাইয়া দিয়া থাকেন। ইহাই খাদ্যোপকরণ। পুরোহিত শাস্ত্রোক্ত বিধানানুসারে চণ্ডীদেবীর পূজা করিয়া থাকেন। সাধারণতঃ পঞ্চোপচারেই দেবীর অর্চনা করা হয়। মূর্ত্তি গঠিত হয় না। ঘটেই পূজা করা হয়। বলা বাহুল্য যে, ব্রাহ্মণেতর বাড়ীতে তণ্ডুল চূর্ণ, কাঁচা দুধ ও গুড় নিবেদনার্থ দেওয়া হইয়া থাকে। সেই সকল বাড়ীর মহিলাগণ পূজা শেষে পিষ্টক প্রস্তুত করিয়া থাকেন। ব্রতিনিগণ উক্ত পিষ্টক ভিন্ন ব্রত দিবসে আর কিছুই ভোজন করিতে পারেন না। তাঁহারা সেইদিন মাত্র একবার আহার করিয়া থাকেন। ব্রতিনীদিগকে দিবা ভাগেই ভোজন করিতে হয়। যাঁহার তাহা কোন কারণে না হইয়া উঠে, তিনি রাত্রিকালেই আহার করিয়া থাকেন। বাড়ীর অন্যান্য সকলকেই পিষ্টক-প্রসাদ দেওয়া হইয়া থাকে। ব্রত শেষ হইলে জনৈকা ব্রতিনী কথা কহিয়া থাকেন। ব্রতকারিণীদের প্রত্যেকেরই "কথা" শ্রবণ করিতে হয়।

কথা—এক ছিল গৃহস্থ। গৃহস্থ অবিবাহিত যুবক। সংসারে বৃদ্ধা মাতা ভিন্ন তাহার আর কেহই ছিল না। মায়ের সকল আদেশ অম্লান-চিত্তে পালন করিলেও, বিবাহের প্রস্তাবে সে কিছুতেই কর্ণপাত করিত না। আর কোনও অভাব না থাকিলেও, শুধু পুত্রবধূর চাঁদ মুখ দর্শনে বঞ্চিত বলিয়া মায়ের প্রাণে শান্তি ছিল না।

গৃহস্থের দেব দ্বিজে অচলা ভক্তিপরায়ণতা, অতিথি সৎকারে যত্নশীলতা, পরোপকারে পরমোৎসাহশীলতা ইত্যাদি সদ্গুণে সকলেই তাহাকে বিশ্বাস করিত, সকলেই তাহাকে মানিয়া চলিত। অধিকাংশ ব্যক্তিই তাহার পরামর্শ ছাড়া কোন কাজই করিত না।

যুবক গৃহস্থ পরম সাধু; কালে হয়ত সে গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী হইবে, তাই বুঝি তাহার বিবাহে মন নাই; এইরূপ জল্পনা কল্পনা দশ জনে করিত। ইহা শুনিয়া মায়ের মন আরও অস্থির হইত। পুত্রের সান্ত্বনা বাক্যে বৃদ্ধা মাতা কিছুতেই প্রবোধ মানিত না।

চিরদিন কাহারও সমান যায় না। সাধুগণও সময়ের ফেরে লাঞ্ছনা ভোগ করিয়া থাকেন। কয়েক বৎসর অজন্মার দরুণ প্রায় সকলেই এমন নিঃস্ব হইয়া পড়িল যে, রাজকর, এমন কি পরিবারের ভরণ পোষণের [illegible] করাও অনেকেরই সাধ্যাতীত হইল। খাজনা অনাদায় হেতু রাজকর্ম্মচারিগণের কঠোর শাসনে উৎপীড়িত, ক্ষুধায় কাতর স্ত্রী পুত্রাদির বিষাদ-কালিমা-লিপ্ত [illegible] দর্শনে ব্যথিত চিত্ত প্রজাবৃন্দ দিশাহারা হইয়া পড়িল। সদ্যুক্তির নিমিত্ত সাধু গৃহস্থের নিকট সকলেই যাতায়াত করিতে লাগিল। এ খবর সত্বরই প্রধান রাজকর্ম্মচারীর কর্ণগোচর হইল। তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিল যে, যুবকের পরামর্শেই প্রজাগণ খাজানা বন্ধ করিয়াছে। এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়াও কোনও কুটিল লোকের কুমন্ত্রণায় রাজ-প্রতিনিধি তাহাকে বিদ্রোহী ও আরও এক গর্হিত দোষে দোষী সাব্যস্ত করিলেন। সহসা একদিন বন্ধনাবস্থায় সে রাজবাটীতে নীত হইল। বিচারে তাহার শূল-দণ্ডাদেশ হইল। কু লোকের কূট চক্রান্ত-জালে পড়িয়া পরার্থপর সাধু গৃহস্থ প্রাণ হারাইতে বসিল। তাহার মুক্তির নিমিত্ত প্রজাবৃন্দের অক্লান্ত চেষ্টা-যত্ন বিফল হইল। তাহারা মনে করিল,—বিনা মেঘে বজ্রাঘাত হইল। এই নিদারুণ সংবাদ শ্রবণে গৃহস্থের বৃদ্ধা জননী কাঁদিয়া ব্যাকুল হইল।

* কোন কোন ব্রাহ্মণেতর গৃহে জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়েও এই ব্রত করিতে দেখা যায়।—লেখক।

যথাসময়ে গৃহস্থ বধ্যভূমিতে নীত হইল। শূলে দিবার পূর্ব্বে তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল যে, তাহার কোন কিছু দেখিবার, শুনিবার কিংবা খাইবার ইচ্ছা আছে কি না? উত্তরে সে বলিল যে, কচি শিশুর সরল হাসিমাখা সুন্দর মুখ এবং গো-বৎসের লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক ক্রীড়া দেখিবার বাসনা তাহার বলবতী। অমনি তাহাকে সশস্ত্র প্রহরিগণের সঙ্গে তাহার অভিলাষ পূরণার্থ পাঠান হইল। এক বাটীতে উপস্থিত হইয়া হুলুধ্বনি শ্রবণে যুবক জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল যে, তথায় উদ্ধার চণ্ডীর ব্রত হইল। এই ব্রতে কি ফল লাভ হয়, এই প্রশ্ন করায় এক ব্রতিনী বলিলেন যে, বিপদ-কালে ত্রাণ পাইবার নিমিত্ত কাতরভাবে মা চণ্ডীর উদ্দেশে প্রার্থনা করিলে ও ব্রত মানস করিলে বিপন্মুক্ত হওয়া যায়। তখনই সাধু গৃহস্থ তাহার নিকট ব্রতের নিয়ম প্রণালী জানিয়া লইল ও ভক্তিপূত মনে মানস করিল যে, যদি সে এই ঘোর বিপদ হইতে রক্ষা পায়, তাহা হইলে প্রতিবৎসর যথা নিয়মে তাহার মাতাকে দিয়া সে উদ্ধার চণ্ডী ব্রত করাইবে।

প্রহরী-বেষ্টিত গৃহস্থ উক্ত বাড়ী হইতে অপসারিত হইতে না হইতেই খবর আসিল যে, তখনই তাহাকে রাজ-সমীপে লইয়া যাইতে হইবে। রাজা তাহার মহৎ গুণের কথা বিশ্বস্ত লোক-মুখে অবগত হইয়া, সে যে নির্দ্দোষ তাহা ভালরূপ বুঝিতে পারিয়া, তাঁহার সম্মুখীন হইবামাত্র তিনি গৃহস্থকে মুক্তি দিলেন এবং এমন বোধহীন বিচারককে উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করিলেন। রাজা যুবকের প্রার্থনানুসারে দুঃস্থ প্রজাবৃন্দকে, অবস্থা পরিবর্ত্তিত না হওয়া পর্য্যন্ত, কর দিতে হইবে না বলিয়া মত প্রকাশ করিলেন।

উদ্ধার চণ্ডীর কৃপায় উদ্ধার পাইয়া সাধু গৃহস্থ হৃষ্টচিত্তে বাটী প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া বৃদ্ধা জননীর সহিত সাক্ষাৎ করিল। হারানিধি পাইয়া মায়ের প্রাণ শান্ত হইল।

যথাসময়ে যথানিয়মে গৃহস্থের মাতা ভক্তিসহকারে উদ্ধার চণ্ডীর ব্রত করিলেন। ব্রত-মাহাত্ম্য শ্রবণে গ্রাম-গ্রামান্তরের কুলললনাগণ এই ব্রত করিতে আরম্ভ করিলেন।

পুত্র মায়ের আগ্রহাতিশয্যে নিজের অনিচ্ছা সত্ত্বেও শুধু মাতৃমন সন্তুষ্ট রাখিবার মানসে, বিবাহে সম্মত হইল। এক শুভদিনে, শুভ লগ্নে গৃহস্থ বিবাহ করিল। সুন্দরী, সচ্চরিত্রা পুত্রবধূ পাইয়া বৃদ্ধা মাতার আহ্লাদের সীমা রহিল না। লক্ষ্মী বউ ঘরে আসিলে, শ্বশ্রূর সহিত সেও উদ্ধার চণ্ডীর ব্রত আরম্ভ করিল। ধন-পুত্রাদির অধীশ্বর হইয়া সাধু গৃহস্থ সুখে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিল।

এই অঞ্চলে এ ব্রতের এই কথা। চাঁদপ্রতাপের হিন্দু মাত্রেরই গৃহে উদ্ধার চণ্ডী-ব্রত হইয়া থাকে।

কলের যুগ।

[শ্রীরাখালরাজ রায় এম-এ]

সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপর এই তিন যুগ ছিল কিনা এ সম্বন্ধে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য পণ্ডিতগণ একমত হইতে পারেন নাই। কিন্তু বর্ত্তমান যুগের নামকরণ সম্বন্ধে উভয় দলের মধ্যে প্রায় একমত। আমাদের দেশের পণ্ডিতেরা বলেন, এটা কলিযুগ আর প্রতীচ্য পণ্ডিতগণের মতে এটা কলের যুগ। কলিযুগের লক্ষণ এই যে, এ যুগে মানুষ এত ছোট হইবে যে বেগুন গাছে আঁকশী লাগাইয়া বেগুন পাড়িবে। কলের যুগে মানুষ আকারে ছোট না হউক, প্রকারে যে ছোট হইতে বসিয়াছে তাহার শুভ সূচনা দেখা যাইতেছে।

কলের কাজ, এক সঙ্গে এক আকারের বহু দ্রব্য উৎপাদন বা যাহা হাতে করিতে বহু সময় লাগে তাহা অল্প সময়ে উৎপাদন। যে মানুষ কলে কাজ করে, সে ব্যক্তিত্ব হারায়। আর কল যেমন একটা বিশাল হৃদয়হীন রাক্ষসের মত কাজ করে, কলের লোকগুলিও তেমনই সঙ্গদোষে হৃদয়হীন হইয়া পড়ে। তাহার নিত্য জীবনে দেখিবে, সে অর্থোপার্জ্জন ভিন্ন কিছু জানে না। কলের সর্দ্দার ও কলের মজুর, কেরাণীর লক্ষ্য একমাত্র অর্থোপার্জ্জন।

আমাদের দেশে কল ছিল না। যাহা ছিল সেগুলিকে

যন্ত্র বা হেতের কথা চলে। "কুমোরের চাক, কলুর ঘানি, ডাল ও আটা ভাঙ্গিবার জাঁতা, তাঁতির চরকা ও তাঁত, চাষীর লাঙ্গল, ছুতোরের চিঁড়ে কুটিবার ঢেঁকি, শাঁখারির করাত, কামার ছুতোর ও সোণারের হেতের এ সবই যন্ত্র বা হেতের। দুই কোম্পানির কলের কাপড় যেমন দেখিতে এক, দুইজন তাঁতির কাপড় তেমন এক নহে। রামা তাঁতির কাপড় জোড়াটা যদি ৭৲ টাকায় বিকায়, হরির কাপড় তাহা হইলে ৯৲ টাকা জোড়া বিকাইবে, হরির এমনই হাতের গুণ।

আমাদের সে দিন কাল কিন্তু গিয়াছে। এখন আমাদের নিজের দেশের লোকের কল না থাকিলেও, বিদেশীরা কলে আমাদের সব জিনিষ যোগাইতেছে—আর আমরা কলের পুতুলের মত সজীবতা দেখাইবার জন্য হাত পা নাড়িয়া, চোক মুখ ঘুরাইয়া কলের জিনিষ হজম করিতেছি। কলের আটা, কলের তেল, কলের জল, কলের কাপড়, কলের গান, কলের থিয়েটার বা বায়োস্কোপ, কলের ছবি বা ফটোগ্রাফ নহিলে আমাদের দিন চলে না, কারণ কলের জিনিষ সস্তা।

কিন্তু দেখিতে দেখিতে কল আমাদের সর্ব্ববিষয়ে বিকল করিয়া দিয়াছে। প্রথমেই ধরা যাউক আমাদের চলা ফেরার কথা। সেকালে দেখিয়াছি এক বৈষ্ণবী তীর্থ দর্শনের জন্য সমস্ত ভারতবর্ষটা হাঁটিয়া দুই দুইবার বেড়াইয়া আসিয়াছিল। আর এখন রেলের গাড়ীতে চড়িয়া এমনই অভ্যস্ত হইয়াছি যে, ২ ক্রোশ হাঁটিতে হইলে আমাদের মাথায় বজ্রাঘাত হয়। কলিকাতার কেরাণী বাবুরা ১ মাইলও হাঁটিতে পারেন না। আজ যদি ট্রাম কোম্পানি ছুদিনের জন্য ট্রাম বন্ধ করেন তাহা হইলে দেখিতে পাইবেন, কত লোক বিকলাঙ্গ হইয়াছেন। বড় লোকের ত কথাই নাই—তাঁহারা বাল্যকাল হইতে পেরাম্বুলেটার, ঘোড়গাড়ী, মোটর প্রভৃতি বিভিন্ন যানে চড়িয়া এমনই অভ্যস্ত হইয়াছেন যে, তাঁহাদের বংশধরেরা দু' এক পুরুষের মধ্যেই পঙ্গু হইবেন বলিয়া আশঙ্কা হয়।

তার পরে ধরা যাউক, স্কুলে লেখা পড়ার কথা—সরকারী শিক্ষা বিভাগের কৃপায় নিম্নপ্রাথমিক হইতে মধ্য ইংরাজী পরীক্ষা পর্য্যন্ত এমনই সব বাঁধা নিয়ম করিয়া দিয়াছেন যে, পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রের জ্ঞান সবই এক রকমের। কলেরও ঠিক এই নিয়ম, কলের সব জিনিষই এক রকমের। শিক্ষক চিরদিন ধরিয়া একই বিষয় পড়াইয়া আসিতেছেন। যে চটকলে যে বিভাগে কাজ করে, সে চিরকাল একই রকম কাজ করে, কারণ পাটের প্রকৃতি কখনও পরিবর্ত্তিত হয় না। কিন্তু শিক্ষক একদিন ভাবিয়া দেখেন না যে, সব ছাত্রের বুদ্ধিবৃত্তি এক নহে। বিশেষ করিয়া উকীলেরা বলেন, এক বিষয় পুনঃ পুনঃ পড়াইয়া শিক্ষক কিছুদিনে নাকি মনুষ্যত্ব হারায়।

যেখানে বহুর সমাগম সেইখানে কল দেখা দিয়াছে। বহুলোক একত্রে যায় বলিয়া রেলগাড়ী দেখা দিয়াছে। নূতন উকীলে যখন প্রথম প্রথম মোকদ্দমা পান, তখন প্রাণপণে কাজ করেন; মোকদ্দমায় হারিলে কিছু বিষ[ণ্ণ] হন। কিন্তু যাঁহার পসার হইয়াছে, অর্থাৎ বহু মক্কে[ল] পাইতেছেন, তিনি মোকদ্দমায় হার জিতে নির্ব্বিকার চিত্ত। তাঁহার ফি না পাইলেই তিনি বিষণ্ণ। মক্ক[েলের] মক্কেলের দুঃখে তাঁহার কিছুমাত্র সহানুভূতি নাই। তি[নি] কলের মতই হৃদয়হীন।

হাঁসপাতালে গেলে দেখিতে পাওয়া যায়, ডাক্তারে[র] আউটডোর বিভাগে দলে দলে লোক দাঁড়াইয়া আছে ডাক্তার বাবু কলের মত কাজ করিয়া যাইতেছেন। "জি[ভ] দেখি, দাস্ত পরিষ্কার হয়? নাড়ী দেখি।" তৎপরে প্রেস্ক্রিপসন্। সে আবার বাঁধি মিক্সচার। ইণ্ডো[র] বিভাগেও সেইরূপ ব্যবস্থা—বাড়ার ভাগ পথ্যের ব্যবস্থা রোগী দেখিয়া দেখিয়া হাঁসপাতালের লোক এমন[ই] হৃদয়হীন হইয়া পড়েন যে, মৃত্যুর সম্মুখে দাঁড়াইয়া তাঁহারা অকুণ্ঠিত চিত্তে হাস্য পরিহাস করিতে পারেন বিষাদ বা অশ্রুর সহিত তাঁহাদের পরিচয় নাই। এ যে হৃদয়হীন কলের হৃদয়হীন মজুর।

হিন্দুর পূজা পার্ব্বণেও কলের প্রভাব দেখা যায়। যা[হাকে] এক পুরোহিতকে এক রাত্রিতে ১০ খানি কালী পূ[জা] করিতে হয়, সকলেই জানেন যে, সেরূপ ক্ষেত্রে পুরোহি[ত] মাকে আর জাগান না।

লেখার কলে বা টাইপ্‌রাইটারে হাতের লেখার কদর উঠাইয়া দিয়াছে। সেকালে কেরাণীদের মধ্যে এক একজনের হাতের লেখা দেখিয়া ধন্ত ধন্ত করিতে হইত। এখন গুণ তাগেরও কল হইয়াছে। সুতরাং অঙ্ক কষিবার জন্ত কাহাকেও প্রশংসা করিতে হইবে না।

দেখিতে দেখিতে আমাদের সাহিত্য-ক্ষেত্রেও কল দেখা দিয়াছে। কলের কাগজ, কলের ছাপা বই অনেক দিন দেখা দিয়াছে। কলের উপন্তাস-লেখক ও কলের কবি কত চান? বসন্তে বসন্তমঙ্গল আর বর্ষায় বর্ষামঙ্গল প্রভৃতি বৎসরই বাহির হইতেছে। আর সামাজিক উপন্তাস বছরে ২।৩খানি করিয়া লিখিতেছেন এমন উপন্তাস-লেখক অনেক আছেন। মাসিক পত্রিকা যেমন কলের মত মাসের পয়লা তারিখে বাহির হয়, অনেক উপন্তাস-লেখকও তেমনই যথা সময়ে গ্রন্থ লিখিবেনই। সে নিয়ম ভঙ্গ হইবার নয়। উপন্তাসগুলি নাড়িয়া চাড়িয়া দেখুন, সব এক ছাঁচের; আর কবিতাগুলিও যদি পড়েন, তবে দেখিবেন "সেই শিক, সেই দাঁড়, সেই এক ঘর।"

কলিকাতা সহরটি সব-জিনিষ-গ্রাসকারী কল। সামুদ্রিক রাক্ষস অক্টোপসের মত ৮টি রেল লাইনের সাহায্যে মফঃসলের সমস্ত খাইবার দ্রব্য টানিয়া আনিয়া কলিকাতা তাহার বিশাল উদর পূর্ণ করিতেছে। পরণের কাপড় কোনরূপে কলে আটকাইয়া গেলে, যেমন সমস্ত মানুষটি কলের মধ্যে চলিয়া যায়, তেমনই কলিকাতারূপ কলের রূপার চাকীর জন্ত গরিবের পুঁইমাচারও টান পড়ে। শুনিয়াছি গোকুলে শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি শুনিয়া অবলা রমণীরাই ছুটিত, কিন্তু সকাল ৭টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত কলিকাতার চারি পাশে চেয়ে দেখুন, রেলের এঞ্জিন ও ষ্টিমারের এঞ্জিনের সুমধুর বংশীধ্বনি শুনিয়া কত লক্ষ লক্ষ পুরুষের দল কলিকাতা অভিমুখে ত্রস্তপদে ছুটিতেছে। গ্রাম গৃহ শূন্ত করিয়া, গৃহিণীর শত উপরোধ অগ্রাহ্য করিয়া —এমন কি, পীড়িত সন্তানকে রোগশয্যায় শায়িত রাখিয়াও ছুটিতেছে।

টাঁকশালের কলে এক জায়গায় রূপার পাত দিলে যেমন অন্ত জায়গায় টাকা হইয়া বাহির হয়, আমরা বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকেও তেমনই রূপান্তরকারী কল মনে করিয়াছি। আমরা ভাবি, যখন টাকা ঢালিয়া দেশের ছেলেগুলিকে বিশ্ববিদ্যালয়রূপ কলের মধ্য দিয়া পার করিয়া আনিতেছি,তখন তাহারা নিশ্চয়ই টাঁকশালের মত হুড় হুড় করিয়া মাসে মাসে টাকা আনিবে। কিন্তু কলে জিনিষ হইলেই কিছু টাকা আসে না—বাজারে কাটতি হইবে, তবে ত টাকা আসিবে? কিন্তু যেরূপ দিন কাল পড়িয়াছে, তাহাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপ-মারা ছেলেগুলি বিবাহের বাজারে বিকাইয়া যায়, কিছু টাকাকড়ি ঘরে আনে বটে, কিন্তু চাকরির বাজারে আর বিকাইতেছে না। এখন অন্ত বাজার দেখিতে হইবে বলিয়া আমাদের দেশে একটা সাড়া পড়িয়া গিয়াছে।

আমাদের দেশের বিচারালয়গুলিও একরূপ কল। কলে যেমন জিনিষ দেওয়া যায়, কলে উৎপন্ন দ্রব্যও সেইরূপ হয়। বিচারালয়গুলিতে যে যেমন টাকা ঢালিতে পারিবে, সে সেইরূপ ফল পাইবে।

কলপ্রস্তুতকারী শিল্পী যেমন করিয়া কল তৈয়ার করে, কলটিও ড্রাইভারের অঙ্গুলি সঙ্কেতে সেইরূপ পথে চলে। কলের মজুরদের কোন বুদ্ধি খাটাইতে হয় না, একটা বাঁধা পথে চলিতে হয়। সে কোনরূপে তৈয়ারী জিনিষের কোনরূপ পরিবর্ত্তন করিতে পারে না। আমাদের দেশের নূতন ব্যবস্থাপক সভাগুলিও তেমনই আইন তৈরীর কল। কল কি হইবে না হইবে, তাহা সভ্যদের উপর নির্ভর করে না। অধিকাংশ সভ্যকে কলের পুতুলের মত হাঁ কিংবা না বলিতে হয়। মিউনিসিপালিটি, ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড প্রভৃতি স্বায়ত্বশাসনের জন্ত কলগুলিও তদ্রূপ।

সুরের যন্ত্রগুলি মানুষের গলার সুরের অনুকরণ। কিন্তু সেই অনুকৃত যন্ত্রগুলি কলের আকার ধারণ করিয়া এমনই আমাদের পাইয়া বসিয়াছে যে, এখন আমরা গাইতে কলের সুরের অনুকরণ করি। আমাদের দেশের গায়কেরা তানপুরার সঙ্গে সঙ্গত রাখিয়া গাইতেন, কিন্তু তাঁহাদের গলার সুর ইচ্ছামত খেলিতে সুবিধা পাইত। এখন আমরা কলের সুর হার্মোনিয়মের সঙ্গে সঙ্গত—রাখিয়া গান করি, আমাদের গলা কলের পুতুলের মত হার্মোনিয়মের

পেছনে পেছনে ছুটে, এখন আমরা গায়কের গানের তেমন আদর করি না, এখন গ্রামোফোন হইয়াছে আমাদের সর্ব্বস্ব।

সাহিত্য চর্চ্চাটা আমাদের দেশের নাম রাখিয়াছিল। যাঁহারা সাহিত্যচর্চ্চা করিতেন, তাঁহাদের সহিত লক্ষ্মীদেবীর মুখ দেখা দেখি ছিল না। এখন সাহিত্যের সমস্ত উপকরণ যেমন কলে তৈরি হয়, যথা কাগজ, টাইপ, কালি, ছাপা ইত্যাদি, তেমনই সংবাদ পত্রে আমাদের দেশের সাহিত্য চর্চ্চার প্রধান উপকরণ হইয়াছে বিশ্বনিন্দা। ইহা ঠিক কলের মত অবিরত এক আকারেই বাহির হইতেছে। কলগুলির লক্ষ্য অর্থোপার্জ্জন, সুতরাং সাহিত্য চর্চ্চার প্রধান লক্ষ্য হইয়াছে অর্থোপার্জ্জন। যেহেতু উপন্যাস গল্প লিখিলে টাকাটা আমদানী হয় বেশ, তাই গল্প উপন্যাসে আমাদের সাহিত্য-ক্ষেত্র ছাইয়া ফেলিয়াছে।

গরুর গাড়ী, জাঁতা, শালনোড়া প্রভৃতি আমাদের দেশের কলের অনুকল্পগুলি যেমন মান্ধাতার আমল হইতে রূপ পরিবর্ত্তন করে নাই, তেমনই আমাদের হিন্দু সমাজও একযন্ত্রে চিরজীবন যাপন করিতেছে। এই সমাজ-যন্ত্রটির নানা অংশে মরিচা পড়িয়া গেলেও কোন দিন পরিষ্কার করা হয় নাই। যে অংশ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, তাহাও বদলান হয় নাই। আমাদের ভাষা বদলাইয়া গিয়াছে, কিন্তু শাস্ত্রের মন্ত্রগুলির ভাষা বদলায় নাই। সুতরাং আমরা বুঝি আর নাই বুঝি, পুরোহিত বা পূজারি সেই মৃতভাষার মন্ত্রগুলি আওড়াইয়া যায়। সুতরাং "বিষ্ণা স্থানেভ্য এবচ" বলিতে পুরোহিত ঠাকুর যখন বলেন, "বিষ্ণা স্থানে ভ্যএবচ", তখন আমরা যদি অর্থ করি "বিদ্যার স্থানে ভয়ে ভয়ে কথা বল," তাহা হইলে বাগ্‌দেবী আমাদের উপর তুষ্ট হইবেন কি রুষ্ট হইবেন তাহা ঠিক বলা যায় না। আমরা নানারূপ উপাদেয় খাদ্য ভোজন করিলেও, আমাদের পিতৃপুরুষেরা সেই মান্ধাতার আমলের তিল যব খাইবেন, আর শিব-ঠাকুরের চাল ভিজান খাওয়া ঘুচিবে না। আমরা অহিন্দুর ছোঁয়া জল লেমনেড বরফ চা ডাক্তারী ঔষধ অনায়াসে হজম করিতে পারি, কিন্তু আমাদের শাস্ত্রীয় কলের ব্যবস্থায় নাকি লেখা আছে যে জল-অচল হিন্দুর জল কিছুতেই হজম হইবে না অথচ তাহাদের দেওয়া টাকাকড়িগুলি ব্যবস্থাপক মহাশয়েরা নির্ব্বিবাদে হজম করেন।

কল চালাইয়া চালাইয়া কলের মজুরদের এমনই একটা অভ্যাস হইয়া যায় যে, পুরাতন চিরাভ্যস্ত পথ ছাড়া তাহার উপায় নাই, কল বিগড়াইয়া গেলে, সে চোখে সরিষা ফুল দেখে। আমরা দেশের লোক কলের প্রভাবে তেমনই একপথে চলিতে শিখিয়াছি। মহাযুদ্ধের সময় কলের জিনিষের আমদানী কম হওয়ায় আমরাও চতুর্দ্দিকে সরিষা ফুল দেখিতাম। আমরা সাধারণতঃ ১০টায় খাইয়া আপিস যাই, ৫টায় ফিরিয়া গৃহে শয়ন করি। যে মাইনে পাই, তাহাতে খাওয়া দাওয়া চলে, গৃহিণীর অলঙ্কার বাড়ী বাগান গাড়ী ঘোড়া হয়। পাড়ার লোক বিপন্ন হইয়া ভিক্ষা চাহিলে আমাদের নিত্যনৈমিত্তিক কাজের তালিকায় সেরূপ ব্যাপারের স্থান খুঁজিয়া পাই না। প্রয়োজন হইলে রবিবারে বা ছুটির দিনেও আপিস গিয়া থাকি, কিন্তু পাড়ার কেহ মরিলে তাহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্য শ্মশানে যাওয়া আমাদের এই কলের যুগের শাস্ত্রে লেখে না। সামাজিক আচার ব্যবহারে কলের মজুরের মত এমনই আমরা হৃদয়হীন হইয়া পড়িয়াছি!

তেলাপোকা যেমন কাচপোকা দ্বারা আক্রান্ত হইয়া, তাহার রূপ ধ্যান করিতে করিতে কাচ পোকায় পরিবর্ত্তিত হয়, আমরা তেমনই চতুর্দ্দিকে কলের প্রভাবে পড়িয়া কলে পরিণত হইয়াছি। তাই কলিকাতার ২।৪ জন লোকে কলের চালকের মত যেমন একটা fashion চালাইতে সুরু করিল, আমরা সব বাঙ্গালী মিলিয়া সঙ্গে সঙ্গে তাহার অনুকরণ করিতে আরম্ভ করিলাম। কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য ভাবিয়া দেখিবার অবসর পাইলাম না। পেছনের চুল ছাঁটা, হাঁটুর নীচে পর্য্যন্ত লম্বা জামা পরা, প্রজাপতির মত গোঁফ রাখা ইত্যাদি ইত্যাদি ইহার দৃষ্টান্ত। অথচ এমন একদিন ছিল যেদিন লোকে গোঁফদাড়ি কামান ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের "বৃন্দে দূতী" বলিয়া ঠাট্টা করিত। আবার লর্ড কুর্জ্জনের দেখাদেখি ছেলেরাও কিছুদিন দাড়ি কামাইয়া বুড়ো সাজিতে আরম্ভ করিল। শেষে একদিন হয় ত কাহারও মনে হইল, "চেহারা দেখিয়া যদি কেহ রমণী বলিয়া আমায়

সন্দেহ কমে। সর্ব্বনাশ!" আর সঙ্গে সঙ্গে প্রজাপতি গোঁফ, বাবুজের নাকের নীচে দেখা দিল। মানুষের সকল কাজেরই একটা কারণ থাকে, কিন্তু কলের অংশগুলি চলে কেন তাহা সে জানে না। আমাদেরও সেই দশা হইয়াছে।

গুটীপোকা যেমন নিজের তৈরী জালে নিজেই আবদ্ধ হয়, তখন তাহার যেমন ঘুরিবার ফিরিবার স্বাধীনতা থাকে না, আমাদেরও কতকটা তেমনই দশা হইয়াছে। আমরা যে কাজই করি না কেন, আমাদের কোন বিষয়েই মনুষ্যত্ব প্রকাশ পায় না। বিশেষ করিয়া কোন কাজেই আমাদের ব্যক্তিত্ব ফুটিয়া উঠে না। কলের সব জিনিষই যেমন এক রকম, আমরাও তেমনই সব এক ছাঁচে গঠিত হইয়াছি। এই ছাঁচ কবে বদলাইবে, বিধাতাই জানেন। এখন আমরা যেন ঘুমাইয়া পথ চলিতেছি। কবে আমাদের জাগরণের দিন আসিবে? কবে আমরা মানুষের মত নিজের পায়ে ভর দিয়া দাঁড়াইতে পারিব কে জানে।

ক্রিমি রোগ ও দেশীয় মতে তাহার চিকিৎসা।

[কবিরাজ শ্রীইন্দুভূষণ সেন গুপ্ত এচ্, এম্, বি]

ক্রিমি রোগ উৎপত্তির কারণ।

অজীর্ণ সত্বে ভোজন, সর্ব্বদা মধুর ও অম্ল রস ভোজন, অতিমাত্রায় তরল দ্রব্য পান, অবিশুদ্ধ জল পান, গুড়, পিষ্টক, শাক, মাষকলাই ও দধি প্রভৃতি অতিমাত্রায় ভোজন, ক্ষীর মৎস্যাদি সংযোগ বিরুদ্ধ দ্রব্য ভোজন, দিবানিদ্রা প্রভৃতি কারণে ক্রিমি রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ভেদ নির্ণয়।

ক্রিমি দ্বিবিধ, যথা,—আভ্যন্তর দোষজ ও বহির্ম্মলজ। ইহাদের ভিতর আভ্যন্তর ক্রিমি পুরীষজ, কফজ ও রক্তজ ভেদে তিন প্রকার। পক্বাশয়ে পুরীষজ ক্রিমি, কফজ ক্রিমি আমাশয়ে এবং রক্তজ ক্রিমি শিরাগত রক্তে জন্মিয়া থাকে।

পুরীষজ ক্রিমি—অধোমার্গে বিচরণ করিয়া থাকে। উহারা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া আমাশয়াভিমুখে গমন করিলে রোগীর উদগার ও নিশ্বাসে মল গন্ধ যুক্ত হইয়া থাকে। উহাদের কতকগুলি সূক্ষ্ম অথচ স্থূলাকৃতি বিশিষ্ট ও উহাদের বর্ণ শ্যাব, পীত, শ্বেত এবং কৃষ্ণ।

কফজ ক্রিমি—ঊর্দ্ধঃ ও অধঃমার্গের সকল স্থানে বিচরণ করিয়া থাকে। উহাদের কতকগুলি স্থূল, কতকগুলি ব্রধ্ন সদৃশ, কতকগুলি ধান্যাঙ্কুরের ন্যায় সূক্ষ্ম ও কতকগুলি দীর্ঘ। ইহাদের বর্ণ শ্বেত এবং তাম্র।

রক্তজ ক্রিমি—রক্তবাহী শিরা সকলে বিচরণ করিয়া থাকে। ইহারা দেখিতে গোলাকার, পদবিহীন এবং অতীব সূক্ষ্ম। ইহারা তাম্র বর্ণ।

বহির্ম্মলজ ক্রিমি—মল ও স্বেদ সমূহে উৎপন্ন হইয়া থাকে। যাহারা অপরিষ্কার ও অপরিচ্ছন্ন তাহাদের বেশীর ভাগ লোকই এই ক্রিমি দ্বারা আক্রান্ত হইয়া থাকে। ইহারা দেখিতে তিল সদৃশ। ইহাদিগকেই চলিত কথায় উকুন বলে। ইহারা কেশে বেশীর ভাগ অবস্থান করে।

দেশীয় মতে চিকিৎসা।

(১) বিড়ঙ্গ চূর্ণ /• আনা মাত্রায় জল সহ অথবা দুই তোলা বিড়ঙ্গের কাথ পান করিলে আভ্যন্তর ক্রিমি ভাল হয়।

(২) খেজুর পত্রের রস এক তোলা প্রত্যহ একবার করিয়া সেবন করিলে ৭।৮ দিনের মধ্যে ক্রিমি নষ্ট হয়। (খেজুর পাতার রস বাসি লইতে হয়)।

(৩) পলাশ বীজের রস ও মধু অথবা পলাশের বীজ বাটিয়া ঘোলের সহিত সেবনে ক্রিমি বিনষ্ট হয়।

(৪) ঘেঁটুরা পাতার রস এক চামচে মধু সহ সেবনে ক্রিমি বিনষ্ট হয়।

(৫) আনারস পাতার রস ও মধু প্রত্যহ সেবনে ৪।৫ দিনের ভিতর ক্রিমি নষ্ট হয়।

(৬) দুই আনা মাত্রায় কাঁচা সুপারি বাটিয়া এক তোলা জবীর-রসের সহিত সেবনে ক্রিমি ভাল হয়।

(৭) খেজুর পাতার রস দুই আনা ও দুই আনা লেবুর রস একত্র মিশাইয়া সেবনে ক্রিমি ভাল হয়।

(৮) প্রত্যহ প্রাতঃকালে কিছু গুড় খাইয়া তাহার পর-বাসি জলের সহিত খোরাসানী যমানী সেবনে কোষ্ঠগত ক্রিমি মলের সহিত পতিত হয়।

(৯) নারিকেল জল মধু সহ পান করিলে ক্রিমি নষ্ট হয়।

(১০) পালিধা মাদারের পাতার রস, ফেউ পাতার রস অথবা সাঞ্চিশাকের রস পৃথক পৃথক ভাবে প্রত্যহ এক তোলা মাত্রায় মধু সহ সেবনে ক্রিমি বিনষ্ট হয়।

(১১) প্রাতঃকালে খোরাসানী যমানী সৈন্ধব লবণের সহিত বাটিয়া সেবনে অজীর্ণ, আমবাত ও ক্রিমি নষ্ট হয়।

(১২) দাড়িমের খোলার কাথ প্রস্তুত করিয়া তাহাতে কিঞ্চিৎ তিল তৈল সহ পান করিলে কোষ্ঠ হইতে ক্রিমি সকল পড়িয়া যায়।

(১৩) মুতা, ইন্দুরকানী পানা, ত্রিফলা (হরীতকী, আমলকী, বহেড়া) দেবদারু ও সজিনা বীজ ইহাদের কাথে পিপুল চূর্ণ ৵০ আনা ও বিড়ঙ্গ চূর্ণ দুই আনা মাত্রায় প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে সকল প্রকার ক্রিমি ও ক্রিমিজ রোগ ভাল হয়।

(১৪) জলের সহিত সোমরাজী বীজ চূর্ণ এক আনা সেবনে সর্ব্বপ্রকার ক্রিমি নষ্ট হয়।

(১৫) পলাশ বীজ, ইন্দ্রযব, বিড়ঙ্গ, নিমছাল ও চিরতা চূর্ণ—সমভাগে লইয়া কিঞ্চিৎ গুড়ের সহিত সেবনে তিন দিনের ভিতর ক্রিমি সকল নিপতিত হয়।

(১৬) ধুতুরা পত্রের বা পানের রস কর্পূরের সহিত মাড়িয়া মস্তকে প্রলেপ দিলে উকুন মরিয়া যায়।

পথ্যাপথ্য।

দিবসে পুরাতন তণ্ডুলের অন্ন, ক্ষুদ্র মৎস্যের ঝোল, পটোল, মোচা, উচ্ছে, করোলা, বেত্তাগ্র, বেগুন, মানকচু ও ডুমুর প্রভৃতির তরকারী। রাত্রিতে সহ্যানুসারে অন্ন অথবা সাগু, বার্লি, এরারুট প্রভৃতি। আমানী, ছাগদুগ্ধ, খয়ের, যোয়ান, লেবুর রস ইহাতে উপকারী। ইহা ভিন্ন তিক্ত-কষায় ও ঝাল রস বিশেষ উপকারী।

স্নান—সহ্যানুসারে।

অপথ্য—পিষ্টক প্রভৃতি গুরুপাক দ্রব্য, অধিক মিষ্ট দ্রব্য, গুড়, মাষকলাই, দধি, অধিক ঘৃত; মাংস, দ্রবপ্রধান দ্রব্য, দিবানিদ্রা, মলের বেগ ধারণ বিশেষ অপকারক।

যাহাতে অজীর্ণ না হয় সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখা উচিৎ। এক কথায়, ক্রিমি রোগে আহার খুব লঘু হওয়া আবশ্যক।

কোষ্ঠ কাঠিন্য থাকিলে মধ্যে মধ্যে জোলাপ লওয়া আবশ্যক।

দ্রষ্টব্য—যে-সকল ঔষধের প্রস্তুতপ্রণালী প্রদত্ত হয় নাই, তাহারা মোট দ্রব্য দুই তোলা, জল অর্দ্ধ সের, শেষ অর্দ্ধ পোয়া থাকিতে নামাইয়া ছেঁকিয়া সেব্য।

সংগ্রহ ও সঙ্কলন।

স্ব-পাক ভোজন

ভোজনের কালাপাহাড়ী নীতি (অর্থাৎ যথেচ্ছাচারিতার) অঙ্গ রূপ দেখান প্রয়োজন। আমার মনে হয়, এগুলি বিশেষ প্রণিধানের যোগ্য :—

(১) বরফের মধ্যে "গয়ার"।—আমার পরিচিত তালতলা-নিবাসী কোনও চিকিৎসক কয়েক বৎসর পূর্ব্বে, একদা তদীয় সহপাঠী অপর চিকিৎসকের সঙ্গে, হ্যারিসন রোডের কোনও ডিস্পেন্সারীতে বসিয়া একত্রে বরফ-জল পান করিতে করিতে দেখেন যে, বন্ধুটির গ্লাসের বরফের

ভিতর হইতে গলিত "গয়ার" ভাসিয়া উঠিয়াছিল। আরো একটি দৈনিক-পত্রের সম্পাদক বন্ধুর নিকট ঠিক এই কথাই শুনিয়াছি।

(২) "সোডার" বোতলে মূত্র।—কয়েক বৎসর পূর্ব্বে "ইণ্ডিয়ান মেডিকেল গেজেটে" জনৈক সাহেব-ডাক্তার লিখিয়াছিলেন:—যে লোকের টাইফয়েড্ রোগ (বাত-শ্লেষ্মাবিকার) হয়, তাহার প্রস্রাবে ঐ রোগের বিষ যথেষ্ট পরিমাণে থাকে। কলিকাতার কথা বলিতে পারি না, মফস্বলে বহু লোকে খালি সোডা-ওয়াটারের বোতলে প্রস্রাব ধরিয়া আনিয়া, ডাক্তারকে দেখায়—এবং ঐ সকল বোতল বাজারে বিক্রীত হইয়া, অথবা অন্য প্রকারে হস্তান্তরিত হইয়া, সোডা-ওয়াটারে ভর্ত্তি হইয়া বহুজন কর্ত্তৃক ব্যবহৃত হয়; এইরূপেও টাইফয়েড্ জ্বর বিস্তৃতি লাভ করে। এ কথাটি সোডা ও লেমনেড পানকারী বাবুদিগের স্মরণ রাখিবার উপযুক্ত।

(৩) দুধে ঘর্ম্মাক্ত ও ময়লা হাত ডুবান।—দুষ্টবুদ্ধি ও নিরক্ষর গোয়ালারা দুধ বিক্রয় করিবার আগে, তাহার মাটা তুলিয়া লয় এবং তাহাতে বাসী দুধ মিশায়। পরে যে-সে পুকুরের জল ও পালো মিশায় এবং যে-সে অবস্থায় প্রাপ্ত বিচালি বা খেজুর পাতা দুধের মধ্যে ফেলিয়া রাখে, এ কথা সকলেই জানেন এবং গোয়ালারা মূর্খ ও ধূর্ত্ত বিধায় সেজন্য কেহ কিছু বলেন না, কিন্তু কলিকাতার বৈঠকখানার হাটে ও শিয়ালদহ ষ্টেশনে, ঘর্ম্মাক্ত কলেবর স্বাস্থ্যের ধ্বজাধারী সরকারী ফুড-ইন্স্পেক্টার মহাপ্রভুরা কি রকম ভাবে দুধে হাত ডুবাইয়া দুধ পরীক্ষা করেন, তাহা দেখিবার জিনিষ। তাঁহাদের দেখাদেখি হয়ত কুষ্ঠ ও অপরাপর দুষ্ট রোগগ্রস্ত অথবা অপরাপর লোকেরা যে-সে অবস্থায়, ময়লা হাত ডুবাইয়া, দুধের ভাল মন্দ অবস্থা পরীক্ষা করে।—এইরূপে এতটুকু দুধে বহুলোকে হাত ডুবায়, কিন্তু সেই দুধ একজনে কিনিয়া লয়। এ রোগের প্রতিকার কি নাই? কতদিন ধরিয়া এ ভীষণ পাপ কার্য্য সহরবাসীরা করিতে দিবেন?

(৪) কুল্পি বরফে রক্তামাশায়।—আজ হঠাৎ কলিকাতার স্বাস্থ্য কর্ম্মকর্ত্তা কুল্পি বরফের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছেন। কিন্তু যে পচা অবিক্রীত ক্ষীর ও ময়লা জলের সংযোগে কুল্পি (বিশেষতঃ মালাইয়ের কুল্পি) প্রস্তুত হয়, তাহাতে কুল্পি খাইয়া কলেরা, আমাশয়, টাইফয়েড্ যে হইতে পারে, তাহাতে আর আশ্চর্য্যের কি আছে? ছয় বৎসর পূর্ব্বে, একটি সদ্যো মাতৃহীন বালক (৪ বৎসর বয়স্ক), বৈকালে একটি মালাইয়ের কুল্পি খাইয়া, রাত্রে রক্তমল ত্যাগ করিয়া, পরদিন মারা পড়ে। ভবানীপুরে বিশ্বাস-ভবনে কুল্পি ভোজনে যে সর্ব্বনাশ হয়, তাহা অনেকেই জানেন।

ইহা ছাড়া অপর প্রকারের কয়েকটি জিনিষের তালিকা দিব:—

(১) যে কাঠগুঁড়ায় বরফ ঢাকিয়া রাখা হয়, তাহা প্রকাশ্যভাবে রাস্তায় শুকাইতে দেওয়া হয় এবং যে-সে লোকে তাহা বিষ্ঠা-লিপ্ত পদে বা জুতায় সারাদিন ধরিয়া মাড়াইয়া যায়। ময়রার দোকানে খাবারের জন্য যে শাল-পাতা ব্যবহৃত হয়, তাহাও কম অপরিষ্কার নয়।

(২) চা'য়ের দোকানের ব্যবহৃত চা-পাতাগুলি একটি কোণে জমা করিয়া রাখা হয়। সেই পাতা হইতে সস্তার চায়ের দোকানের চা তৈয়ারী হয়।

(৩) চানাচুরের চানা (ছোলা) অধিকাংশস্থলে সহিসদিগের নিকট হইতে সংগৃহীত হয়। তাহার মধ্যে কতগুলি যে-ঘোড়ার মুখ হইতে আহৃত, তাহা বলা কঠিন।

(৪) "পাঁঠার" ঘুগ্নি—পাঁঠার নাড়ীভুড়ী সিদ্ধ-করা জলে পাক করা হয়।

(৫) মাংসের হোটেলে মাংস আসিলে তাহাকে সিদ্ধ করিয়া যে জল বাহির করিয়া লওয়া হয়, সেটাতে "সুপ" (Soup) হয়। সেই অর্দ্ধসিদ্ধ মাংসকে মসলা-সংযোগে ভাল করিয়া রাঁধিয়া "কারি" (curry) তৈয়ারী করা হয়। এ বেলার "কারি"-কে পুনরায় সাঁতলাইয়া ওবেলা "টাট্কা" করা হয়। পরদিনে তাহাতে রকমারি মসলাসংযোগে, "কাবাব" তৈয়ারী করা হয়। অবিক্রীত কাবাব হইতে "চপ" এবং অবিক্রীত "কাট্লেট্" হইতেও "চপ" তৈয়ারি করা হয়।

(৬) "র-মিট যুষ" (raw meat juice) কি

ছাগ বা ভেড়ার মাংস হইতে হয়? এ কথার সত্যতার প্রমাণ চাই। গো-মাংস ব্যবহার না করিলে, লাভ যতটুকু থাকে, কেহ খতাইয়া দেখাইবেন কি?

(৭) হোটেলে ও চায়ের দোকানের বাসন-ধোয়া জল ও "ন্যাতা" খানি কি কেহ দয়া করিয়া পরীক্ষা করিবেন? অনেক গৃহস্থের হেসেলের "ন্যাতার" অবস্থাও তদ্রূপ শুনিয়াছি। কোনও কোনও "ভদ্রলোক-দিগের আহারের স্থানে" পাতের, অভুক্ত অন্নাদি তুলিয়া রাখিয়া, পরবর্ত্তী "ভদ্রলোক"-কে তাহা দেওয়া হয়। সরবৎ ও চায়ের দোকানে ছত্রিশ জাতি একই গ্লাসে চুমুক দেন।

(৮) যত বাজারের বেশ্যারা দিনের বেলায় সহরের পথের ধারে পান বিক্রয় করিতেছে—আর আজ সেই পানের বিক্রয় দিন দিন অতি মাত্রায় বৃদ্ধি পাইতেছে। ছেলেকে জলশৌচ করাইয়া, কোনও গতিকে হাত ধুইয়া, এবং নিজ দেহ ও মুখমোছা গামছার উপরে সাজাইয়া তাহারা যে পান সাজে না, তাহা কে বলিতে পারেন?

(৯) রাস্তার ধারে ময়রার দোকানে যে সকল খাবার সাজান থাকে (মিষ্টান্ন, তেলের খাবার, ইত্যাদি) তাহাতে রাস্তা ঝাঁট দেওয়া কত ধূলা জমাট হইয়া থাকে, তাহা ভাবিলেও শিহরিয়া উঠিতে হয়। যে লোকেরা সে সকল খাবার তৈয়ারি করে এবং যে অপরিষ্কার হাতে তাহা বিক্রয় করে এবং রাস্তার আস্তাকুড় হইতে উড়িয়া আসিয়া যে মক্ষিকারাশি সেই খাদ্যের উপরে বসে—তাহাও ছুঁৎ-মার্গী, আচার ও নিষ্ঠার বড়াইকারী হিন্দুর ভাবিবার বিষয়। অথচ এসকল দোকানের খাবারই অবাধে ঠাকুরকেও নিবেদন করা হয়, এবং আদর করিয়া অতিথি, অভ্যাগত ও কুটুম্বকেও দেওয়া হয়।

(১০) মিছরির কুঁদো, মধু, গুড়—ইহাতে পড়ে না এমন কীট পতঙ্গ নাই। অথচ আমরা অসঙ্কোচে এ সকলকে ব্যবহার করি। বিলাতী লবণের স্তূপের মধ্যে মানুষের দাঁত পাওয়া গিয়াছে বলিয়া একটি বন্ধুর মুখে সংবাদ পাইয়াছি।

(১১) গৃহস্থের ভাণ্ডারে যে যে হাঁড়িতে মসলাদি রক্ষিত হয়, তাহাতে আরসুলা ও ইঁদুরের বিষ্ঠা পর্য্যন্ত প্রবাহে সঞ্চিত হয়, এবং অনেক সময়ে সে সকল গলাধঃকরণও হইয়া থাকে।

(১২) পাচক ব্রাহ্মণেরা এত অপরিষ্কার, এবং শতকরা একশত জন পাচক ব্রাহ্মণ এমন কুৎসিৎ রোগগ্রস্ত এবং অস্থানে বাস করে, এবং অপরিচ্ছন্নতা তাহাদিগের এত বেশী মাত্রায় মজ্জাগত, যে কেমন করিয়া এই সকল "বামুন ঠাকুরের" হাতে আমরা খাই, তাহা ভাবিয়া পাই না। তাহা ছাড়া যাহারা কলিকাতায় পাচকতা করে, তাহাদের মধ্যে সত্যসত্যই যে কত জন ব্রাহ্মণ, তাহাও বিবেচ্য। কলিকাতায় কোনও ভদ্রপরিবারে একাধিকবার তরকারীর সঙ্গে নেংটি ইঁদুর রাঁধা হইয়া গিয়াছে—সন্ধান পাইয়াছি। কোনও ধনীর গৃহে চাকরেরা চা-তৈয়ারী করিয়া দিবার সময়ে পাত্রস্থিত বিছাকে সেই সঙ্গে সিদ্ধ করিয়া দিয়াছে বলিয়া শুনিয়াছি। পাচক ঠাকুরেরা এমনিই হুঁসিয়ার, অথচ "বামুন" না হইলে, (অর্থাৎ ব্রাহ্মণেতর লোকের হাতে) খাইলে জাতি যায়!

পূর্ব্বে যখন এই কথাটা শুনিতাম ("অমুক জিনিষ খাইলে বা অমুকের স্পৃষ্ট খাদ্য খাইলে জাতি যাইবে") তখন অবজ্ঞার হাসি হাসিতাম। বলিতাম—"জাতি"-টা কি এতই ক্ষণভঙ্গুর, এতই কি ইতর, হেয় বা হীন যে, কথায় কথায় নষ্ট হয়? ক্রমে যত বয়স বাড়িতেছে, ততই বুঝিতেছি যে কথাটা বড় শক্ত, বড় ঠিক। "জাতি যায়" বলিলে ব্যক্তিগত ক্ষতি বুঝায় না—সমাজের, দেশের, একটা জাতির, ক্ষতি বুঝায়। ইংরাজ এদেশে দেড় শত বৎসর আছে, তবুও এদেশীয় বেশভূষা, আহারাদি লয় নাই—তাহাতে তাহাদের জাতি (জাতীয়তা) যায়। ইংরাজ এদেশে আসিয়া, এদেশের মত ক্যম্বকর্ম্ম করিবার সময়ও লয় নাই—পাছে তাহাতে তাহাদের জাতি যায়। অথচ আমরা এক কথায় ছত্রিশ জাতিকে অনুগ্রহ করিয়া জাতীয় বিশিষ্টতা হারাইয়া ফেলিতেছি। বিধবারা বলেন "ইংরাজী ঔষধ খাইব না—উহাতে আমার জাতি যাইবে।" বাস্তবিক আজ যদি সমস্ত হিন্দু জাতি ঐ কথা বলিত তাহা হইলে এ দেশের কত ধন এদেশেই থাকিয়া যাইত।

আমরা যদি এত সহজে স্বজাতি সুলভ আচার-ব্যবহার পরিত্যাগ না করিতাম, তাহা হইলে আমাদের জাতিটা আজ এত মেরুদণ্ডহীন হইয়া পড়িত না। এই জাতীয় একতা ছিল বলিয়াই, আজ সহস্র বৎসর ধরিয়া হিন্দু বাঁচিয়া আছে। স্বপাক ভোজন এই জাতীয়তা রক্ষা করিবার একটি প্রধান অস্ত্র।

স্বপাক ভোজনের আরো একটি মস্ত কারণ আছে,—সেটি স্বাস্থ্যরক্ষার দিক দিয়া বিবেচনা করিতে হইবে। ক্ষয়কাশ বা থাইসিস্ ব্যারামের বিষ ঐ রোগীর কাশে থাকে। যদি পাচক-ঠাকুর ক্ষয়কাশগ্রস্ত হন, তবে তিনি যতবার পরিবেশন বা রন্ধন করিতে করিতে কাশিবেন, ততবারই খাদ্যদ্রব্যে ঐ রোগের বিষ ছড়াইবেন। যে লোক সম্প্রতি টাইফয়েড্ জ্বরে ভুগিয়াছে বা যাহার টাইফয়েড্ জ্বর সবে মাত্র ধরিয়াছে, সে ব্যক্তির থুথুতে ঐ ব্যারামের জীবাণু থাকে। পাচক ঠাকুর অনেক সময়ে দোক্তা ও পানভরা মুখ বা ঠোঁট থুথু আঙ্গুলিবারা মুছিয়া, হাত না ধুইয়া, খাদ্যদ্রব্যে হাত দেন—এবং এইরূপে বাড়ীতে টাইফয়েড্ রোগের আমদানী করেন। যে লোকের কলেরা বা ওলাউঠা হইয়াছিল, বহুকাল ধরিয়া তাহারও মুখের লালায় ঐ রোগের বিষ বর্ত্তমান থাকে। কাজেই বিনামেঘে বজ্রাঘাতের মত অকস্মাৎ ও অলক্ষিতে "পাচক-ঠাকুর" কর্ত্তৃক সংসারে ওলাউঠার প্রাদুর্ভাব হইতে পারে। যাঁহারা উপদংশ বা গর্ম্মীর ব্যারামে পীড়িত, তাঁহাদের এঁটো করা বাসনে চা বা হোটেলে খানা খাইয়া ঐ ব্যারাম হওয়া বিচিত্র নয়। * * *

শ্রীরমেশচন্দ্র রায়, এল্, এম্-এস্
ভারতবর্ষ, মাঘ, ১৩২৯।

ছবি।

[শ্রীমাধবচন্দ্র মিত্র]

দেওয়ালে একটা ছবি টানান ছিল। কে এই ছবি আনিয়াছে ইহা লইয়া একদিন স্বামী-স্ত্রীতে কিছু অভিমানের লীলা চলিল। কারণটা অদ্ভুত কি না সে বিষয়ে মতভেদ হওয়ার সম্ভাবনা।

সুপ্রিয় চিত্র বিদ্যাকে যখন জীবনের সহচরী করিয়াছিল তখন সে জানে নাই, যে নয়নে কটাক্ষ লইয়া আর একজন তাহারই পাশে দাঁড়াইবে। কত বিনিদ্র রজনী তাহার মানস-সুন্দরীকে জীবন্ত করিতে কাটিয়া গিয়াছে, কত বিরহ-অনলে তাহার অন্তর কাঁদিয়া মরিয়াছে, কত জ্যোৎস্নালোকে সে উদাস ভাবে আকাশের দিকে তাকাইয়া বাঞ্ছিত প্রেমিককে খুঁজিয়াছে, কিন্তু সকলই মোহমুগ্ধকারী ভগবান অন্বেষীর দেবতার মত দিনে দিনে কোন স্বপ্নলোকে অন্তর্ধান হইয়াছে। সে ফিরিয়া তাকায় নাই; যাহার প্রতি তাকাইয়াছে সে কোন্ দুর্ভেদ্য অবগুণ্ঠনে আপনাকে নয়নের আড়াল করিয়াছে।

একদিন সহসা যেন একটা কুয়াসার আবরণের মাঝে এক তরুণ সূর্য্য অপূর্ব্ব মাধুরী লইয়া দেখা দিল। সে এতদিন যাহা আকাঙ্ক্ষা করিয়াছে আজ তাহা বর্ণরূপে তাহার তুলিতে মোহন হইয়া ফুটিয়া উঠিল।

সেই চির আকাঙ্ক্ষিত সাগর-সেচিত রত্নকে যে কি করিয়া কোথায় রাখিয়া প্রাণের তৃষ্ণা মিটাইবে, কেমন করিয়া তাহাকে আদর করিবে ভাবিতে ভাবিতে সুপ্রিয় যখন বাস্তব রাজ্যে নামিয়া আসিল তখন নিতান্তই ক্লিষ্ট মনে সেই প্রণয়িনীকে দেওয়ালে টানাইয়া রাখিল।

কয়েক দিন পরে ছবিখানি লইয়া সে নদীর ধারে যাইয়া বসিল। সেদিন বৈকালিক রৌদ্রের কিরণরেখায় নদীর জল অনুপম মাধুরীতে ভরিয়া গিয়াছিল। মৃদুমন্দ হাওয়ায় নদীর উপর দিয়া ছোট ছোট নৌকাগুলি পাল-ভরে চলিয়াছিল। সহসা বিদ্যুৎ চমকের মত যেন একটা নৌকার মাঝ হইতে একটী সুন্দর মুখ দেখা দিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল। ব্যস্ততার সহিত সঙ্গের ছবিখানি টানিয়া বাহির করিয়া সুপ্রিয় বলিয়া উঠিল—'এ যে সেই!'

কত নৌকা নদী বক্ষ দিয়া চলিয়া গেল, কেহই যে সুখের বারতা লইয়া আসিল না, কেবল একটা নিরাশার দীর্ঘশ্বাস সুপ্রিয়ের বুকের মধ্যে ঘনাইয়া আসিল। যাহা স্বপ্নের অতীত তাহার জন্য মানুষের মন এমন করিয়া আকুল হয় কেন। যাহা পাইবার নয়, যে দুর্লভকে কল্পনা করিতেও কিসের সঙ্কোচ, কি একটা হৃদয় বেদনা সমস্ত জীবনকে যেন আপ্লুত করিয়া দেয়, তাহা কেন এমন করিয়া ক্ষণিকের আলোকে দেখা দিয়া কোন্ অনন্ত তিমিরে বিলীন হয়!

সুপ্রিয় অস্থির হইয়া বাড়ী ফিরিল। সেই মুখখানি আঁকিবার জন্য তুলিকা লইয়া বসিল। আগের ছবিখানিতে ত তাহারই মুখ, কিন্তু কি যেন সেখানে নাই। এমনি করিয়া কয়েক বৎসর সুপ্রিয়ের জীবনটা যেন একটা স্বপ্নরাজ্যে কাটিয়া গেল; তারপর সে যখন একদিন চক্ষু মেলিয়া চাহিল তাহারই প্রণয়িনী তাহার পার্শ্বে। এ দীর্ঘ বিরহ ক্রন্দন আজ যেন তার সার্থক হইয়া উঠিল। মানস কল্পনার সেই রূপসী যখন গৃহের মধ্যে বাস্তব সত্তায় মূর্ত্তিমতী হইয়া উঠিলেন তখন স্বপ্নলোক মুহূর্তে নির্জন হই গেল। সংসারে তার আপন দাবী লইয়া তিনি হাজির হইলেন। প্রেম, স্বার্থ, অভিমান, ক্রোধ সকলগুলিই সে অনাবিল প্রণয় চিন্তার মধ্য হইতে কেমন করিয়া কো দিন একে একে দর্শন দিতে লাগিলেন। অবাস্তবের সঙ্গে পার্থিব ভোগ কামনার চোখো-চোখিতে যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ঠিক্‌রিয়া উঠিল। তাহারই মাঝে একদিন সুপ্রিয়ের সেই মানস-সুন্দরীর ছবিখানি গৃহের মধ্যে টিকিতে পারিল না। মূর্ত্তিমতী প্রণয়িনী অভিমান করিয়া আপনার প্রেমের দাবীকে গভীর করিয়া তুলিতে গেলেন। সুপ্রিয় চাহিয়া দেখিল সেই ছবিখানির অধর যেন বিদ্রুপ হাসিতে রঞ্জিত হইয়া উঠিয়াছে; সে যেন বলিতেছে—এতই তুচ্ছ এ নারীর প্রণয়! সুপ্রিয় আপন প্রণয়িনীকে বুকের মধ্যে টানিয়া বলিল,—ও যে তোমারই ছবি প্রিয়ে!

এক মুহূর্তে সেই অভিমানী নারীর মুখ প্রণয়োজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সুপ্রিয়ের মাথার ভিতর যেন বাজিয়া উঠিল,—কল্পনা মিথ্যা কি বাস্তব সত্য।

কবিতা-কুঞ্জ।

'ফিরে পাওয়া।'

[শ্রীভক্তিসুধা রায়]

যে বাণী মোর ফুটতে গিয়ে
সুর হারালো বারে বারে—
সেই বাণী আজ উঠ্‌ল বেজে
জীবন-বীণার তারে তারে।
হারিয়ে যাওয়া সুরখানি যে
ভুলিয়ে দিয়ে সকল কাজে,
নূতন ছাঁদে মনের মাঝে
গুঞ্জরিয়া ফিরছে গো,—
যখন আলো পাতার ফাঁকে,
তরল হাসি পাখীর ডাকে,
অন্তরেরি কুঞ্জে আমার
নূপুর তারি বাজ্‌ছে গো।
বেণুবনের আন্দোলনে
হাওয়ার সাথে ঘুরে ঘুরে—
উধাও হ'ল পথ হারিয়ে
কোন্ বিপথে দূরে দূরে।
দেশ বিদেশের কান্না-হাসি
আন্‌লে ব'য়ে রাশি রাশি,
অণু অণু পুষ্পরেণু
কুড়িয়ে এনে ঢাল্‌লে গো;—
প্রেমিক প্রাণের প্রীতির সাড়া,
চাঁদের বুকের সুধার ধারা,
সাত সাগরের সঞ্চিত ধন
শূন্য ঝুলি ভর্‌লে গো।

সাফল্য।

[শ্রীমতী চারুবালা দেবী]

জীবনের হাসি-খেলা প্রতি পলে পলে
মিশে যায় অতীতের অজানিত দেশে,
শত আশা জেগে উঠে মরমের তলে
তখনি ঝরিয়া পড়ে পোতাহারা বেশে।

ফুটিতে ফুটিতে অশ্রু শুকাইয়া যায়,
হাসিটিও চাপা থাকে অধরের কোণে,
বলিবার কথাগুলি মনেই মিলায়—
জীবন ঢলিয়া পড়ে মরণ-শয়নে।

না ফুরাতে দিবসের ছোট কাজগুলি,
রজনী আসিয়া করে প্রভাব বিস্তার,
প্রতি নিমেষের সাথে দূরে যায় চলি'
হৃদয়ের আশাভরা স্বপন-সম্ভার।

আমি জানি সফলতা মনোরম সাজে
জেগে থাকে জীবনের ব্যর্থতার মাঝে।

ধরার ধূলি।

[শ্রীকালিদাস রায়]

হা ধূলি তোমায় কেমন করিয়া
কঠিন চরণে দলি,
প্রাণহীন হয়ে তপ্ত শয়নে
আজি পড়ে' আছ বলি'?
আমিও ছিলাম তোমারি দোসর,
কত শত যুগ নীরস ধূসর
আজিকে না হয় মানবাত্মার
অনলে উঠেছি জলি'
সে কথা স্মরিয়া হা ধূলি, তোমায়
কেমনে চরণে দলি?
আজ যাহা আছে চরণের তলে
প্রাণহীন কণা অণু,
কালি তাহা পাবে নিয়ম প্রভাবে
জীবনোষ্ণ তনু।
কালি যদি তুমি গজরাজ হয়ে,
রাজার রাজারে গৌরবে বয়ে,
মম কঙ্কাল চূর্ণ তূর্ণ
উড়াইয়া যাও চলি,—
সে কথা স্মরিয়া হা ধূলি, তোমারি
কেমনে চরণে দলি?

স্মৃতির সৌরভ।

[শ্রীশ্রীপতিপ্রসন্ন ঘোষ, বি-এ]

জানি টুটে যাবে বীণার তন্ত্রী—
মিশে যাবে কাল-প্রবাহ সনে,
সঙ্গীত তার নাহি হবে লয়,
গাঁথা রবে সুর মানবমনে।
নিঠুর নিয়তি নির্ম্মম-ঘায়
ফুলহাসি-ডোর ছিঁড়ে দিয়ে যায়,
গন্ধ যে তবু ভাসিয়া বেড়ায়
আকুল করিয়া বিশ্বজনে;
অমিয়-সাগরে ডুব দিয়ে সে যে
ফুটে উঠে পুনঃ মনের বনে।

প্রথম-মিলন-বাসরে তোমায়
দিছিনু যে মালা প্রণয়ভরে—
আজি সে শুষ্ক, তবু যে পুরানো
প্রেমের সুরভি বহন করে।
মরণ তুহিন-কর পরশিয়া
নিয়েছিল তোমা গোপনে হরিয়া,
স্মৃতি হয়ে আজ আসিলে ফিরিয়া
লুটিয়া পড়িলে হৃদয় 'পরে;—
মৃত্যু-বিজয়ী প্রেমের গৌরী
ভুলিতে কি পারে আপন ঘরে?

খেলাঘরের খেলা।

[শ্রীহারাণচন্দ্র রক্ষিত]

খেলা-ঘরে খেল্‌বে আমার কে।
ছিল যেজন খেলার সাথী, পালিয়ে গিয়েছে ॥
কোথায় গেছে, কেমন আছে, ভেবে আমি মরি মিছে,
সে ত আর চায় না পিছে, 'আহা' ব'লে যে।
এই কি স্নেহ ভালবাসা, ভ্রান্তি শুধু মায়ার নেশা,
বাড়ে কেবল দারুণ তৃষা, করে দাহ যে।
সুখে থাক', ভাল থাক', কি জানি এসে ঘাঁটিতে পাঁক,
আছে শুধু হেথায় জোঁক, রক্ত শোষে সে।
গেছ' ভুলে বিধিমতে, উঠ্‌তে ব'স্‌তে খেতে শুতে,
ভুল্‌ব না তা উঠ্‌লের চিতে, এম্‌নি জ্বলন যে।
দীনে কোয়লে শিউরে উঠি, কি নিঠুর এ আত্মঘাতী,
নিদয় কঠিন ক্রূরমতি,—পুণ্যবতী হে।
সাধ্বী লক্ষ্মী তুমি সতি, দেবী সমান ক্ষমাবতী,
অমানুষী মহাশক্তি, ভাব্‌লে কাঁপি যে।
আত্মপাপে এ আত্মঘাতী, তাই জীবনের অধোগতি,
চরম এ অবনতি, সুনিশ্চিত হে।
হবার হয়ত হোকগে আরো, প্রায়শ্চিত্ত সব প্রকারো,
থাকুতে কসুর ইহকালো, না পাব মুক্তি যে।
হ'চ্ছে নরক ভোগ এখানে, পরলোকের পরিত্রাণে,
'মিল্‌বো আবার তোমার সনে, গুরুর চরণ নে'।
ভক্তিমতী ছিলে তুমি, 'সেই পুণ্যেতে ত'রবো আমি,
বেশ বুঝ্‌তেছি অন্তর্যামী, তারবে চরণ দে'।
হ'চ্ছে শোধন পরিপাটী, পোড় খাওয়ায়ে ক'ত্তে খাঁটী,
থাকৃতে সোণার মলা-মাটী, ছাড়ান্ নাইকো যে।
শিখিয়ে গেছ' তুমি সতি, ত্যাগের শিক্ষা কি মহতী,
তাইতে পূজি ইষ্টমূর্ত্তি, চোখের জলে হে।
তিনিই তোমায় নেছেন টেনে, মুক্তি দিতে মুক্ত প্রাণে,
পুনর্জ্জন্ম (আর) কোন দিনে, না হবে তোমার যে।
চাই আমি হে তোমার সহায়, মুক্ত হ'তে ভব-কারায়,
না আসব আর প'ড়ে মায়ায়, এ খেলা-ঘরে হে।'
এস ওহে দীনের হরি, পারের কর্ত্তা, হে কাণ্ডারি,
লও হে মোরে কৃপা করি, ঐ চরণ-তরী দে' ॥

অতিথি।

[শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, বি-এ]

দুয়ারে দাঁড়ায়ে আমি অতিথি—
আমি অতিথি—
এসেছি দূর পথ বাহি গো,
কোথায় আঁধারে ধাই—
পথ খুঁজে নাহি পাই,—
বড় আশা করে' তাই—
এসেছি, শুধু ঠাঁই চাহি গো।

ডেকে লও ডেকে লও আদর করিয়া মোরে;
অজানা অচেনা ব'লে ফিরায়ে দিওনা দূরে!
তোদের হৃদয়-মাঝে,
এমন শকতি আছে—
আপন করিতে পার
অকূলে, কেহ যার নাহি গো!

কত আশা নিরাশায় কত না আঁখির জলে
সারাদিন কেটে গেছে পথে পথে তরুতলে।
হেথায় বিদেশে এসে—
মরিতে কি হবে শেষে!
মরি তায় দুখ নাই—
যদি শুধু জেনে যাই—
একটী ব্যথিত প্রাণ
কেঁদেছে, মোর পানে চাহি গো!

সরস্বতী।

(গান) *

[শ্রীযোগেশ চক্রবর্ত্তী]

অয়ি শুভ্র সরসিজবাসিনী,
অয়ি শুভ্রবরণী বীণাবাদিনী, (মা)
নমি তব রাতুল চরণে।

---

* এই "ভুবন মনোমোহিনী"'র গানের সুর।

অলক্ত রঞ্জিত সুকোমল পদতল,
মৃদুবায়ু-কম্পিত কাঞ্চন অঞ্চল,
হাস্যসমুজ্জ্বল বদন-শতদল
অপরূপ শোভা গো নয়নে।

জ্ঞানদায়িনী তুমি অজ্ঞানবিনাশিনী
অপার করুণাময়ী কবিমনোমোহিনী
বাজে যেন গো সদা তোমারি রাগিণী
জীবন-কুঞ্জ-কাননে।

আলোচনা।

"কিংকর্ত্তব্যমতঃপরম্।" ইহাই এখন দেশের চিন্তা। কিন্তু এ চিন্তার মধ্যে সত্ত্বের বিশুদ্ধতা নাই, রাজসিক উদ্দীপনা নাই—আছে ইহাতে তামসিক মোহের প্রহেলিকা। তাই দেশের প্রাণে প্রশ্নটা দৈনিক নিত্যকর্ম্মের অবসরে এক একবার উঠে মাত্র, কিন্তু তখনই জলবুদ্বুদের মত ভাঙ্গিয়া জীবনস্রোতে মিশিয়া যায়। যাহারা ভাবিতে জানে তাহারা ভাবিয়া কুল-কিনারা পায় না—কারণ দেখি তাহাদেরও উত্তরের মধ্যে বিশিষ্টতা বা স্পষ্টতার লক্ষণ বিদ্যমান নাই। আর যাহারা কোন কালে ভাবে না—অপরের চিন্তার ফল নিজস্ব করিয়া লইয়া, নেতৃত্বের অনুসরণ করে, তাহারা নায়কের মুখের অস্পষ্ট, অনিশ্চিত, কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় ভাব দেখিয়া, দেশের ও দশের ভাবনা ছাড়িয়া আপনাপন মঙ্গল কামনায় আত্মনিয়োগ করে।

* *
*

এমনটি হইল কেন? গত বৎসর এমন দিনে যে দেশাত্মবোধের প্রবাহে সমগ্র ভারতবর্ষ প্লাবিত হইয়াছিল, যে স্রোতে ভাসিয়া দেশের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা নূতন কূলের সন্ধান পাইয়াছিল—আজ হঠাৎ সে প্রবাহ নিস্তেজ হইল কেন? একটা কথা প্রথমেই মনে হয় যে, দেশের অবস্থাটা হইয়াছে আপাততঃ কর্ণধার-হীন তরণীর মত। কর্ণধারের নেতৃত্ব আজ নাই, যাঁহারা তাঁহার স্থলাভিষিক্ত—নিশ্চয়ই তাঁহাদের এমন শক্তি নাই, যাহাতে ভারতবর্ষ আজ স্বরাজের পথে অগ্রসর হইতে পারে। সে শক্তি কাহারও থাকিলে আজ দেশটি আত্মাহীন দেহের মত নীরব নিস্পন্দ প্রাণহীন হইয়া পড়িয়া থাকিত না। আমি কোনও নায়কের আত্মাভিমানে আঘাত করিবার জন্য এ কথা বলিতেছি না। কেবল যুক্তিতর্কের দ্বারা অন্য সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার উপায় নাই বলিয়াই বলিতেছি যে, যে যাদুবল মহাত্মার ছিল—সে যাদুবল কাহারও নাই।

* *
*

যখন সে শক্তি কোথাও নাই, যখন নূতন মন্ত্র উদ্ধার করিবার পূর্ব্বে বোধ হয় জননায়কদের কর্ত্তব্য ছিল, নিরুপদ্রব অসহযোগ মন্ত্রের সম্যক সাধনা করা। যাহা কিছু ফল ফলিয়াছিল অসহযোগ আন্দোলনে। যেখানে মহাত্মার উপদেশের বিপরীতে তথা-কথিত অসহযোগী কার্য্য করিয়াছে, সেইখানেই অমঙ্গল ঘটিয়াছে। মহা অনিষ্ট ঘটিয়াছিল চৌরীচৌরায়, যেখানে লোক পাগল হইয়া মহাত্মার মহদুপদেশ উপেক্ষা করিয়াছিল।

* *
*

শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ প্রমুখ ত্যাগী মহাপুরুষ যে নূতন দল সংঘটনের আয়োজন করিতেছেন, তাহার প্রধান ফল এই হইল যে, কংগ্রেস হইতে তাঁহাদের বাহিরে থাকিতে হইবে। কারণ কংগ্রেসের নূতন প্রস্তাব হইতে অন্ততঃ এক বৎসর বিলম্ব হইবে। এই এক বৎসরের ভিতর কাউন্সিলে প্রবেশ করিবার আয়োজন করিতে না পারিলে নূতন কাউন্সিল গঠিত হইবার সময় এই দলের কাউন্সিল প্রবেশ এবং পরে প্রত্যাহার করিবার সংকল্প কার্য্যে পরিণত হইবে না। এই এক বৎসর কাল পরিশ্রম করিয়া কংগ্রেসের মত ফিরাইতে পারিলে সে পরিশ্রমটা বিফল হইবে। ইতিমধ্যে দেশের লোকের মন একটা চিত্র নাই

যাহা তাহাদের উদ্দীপিত করিবে, একটা আশা নাই, যাহা তাহাদের অনুপ্রাণিত করিবে।

* *
*

কংগ্রেসের বিলাতী বর্জ্জনের প্রস্তাব গৃহীত না হওয়ায় খদ্দর ও স্বদেশীর বড় ক্ষতি হইবে। খুব ওকালতীর যুক্তি-তর্কের ভিতর দিয়া প্রস্তাবটা বুঝিলে কোনও কু-ফল সম্ভবপর নয়। কিন্তু সাধারণ লোকে আপাততঃ বুঝিয়াছে যে, বিলাতী-বর্জ্জন নিষ্প্রয়োজন, ইহাই জাতীয় মহাসমিতির ফতোয়া। ইংরাজের উপর বিদ্বেষ করিয়া বা ইংরাজ বণিকের অর্থহানি করিয়া তাহাদের সুপারিসে স্বরাজ লাভ করিব, বিলাতী পণ্য বর্জ্জনের এ দুইটা কারণের মূলেই দোষ আছে—একটু নষ্টামীও আছে। কিন্তু যাহারা প্রস্তুত প্রস্তাবে দেশের শ্রমশিল্প উন্নতির প্রয়াসী, জনসাধারণের বিলাসিতার স্রোত প্রতিরোধ করিবার জন্য ব্যস্ত, তাহারা বলিবে আপাততঃ একটু কষ্ট উৎপাদন করিলেও স্বদেশী শিল্প দেশের পক্ষে বিশেষ হিতকর। আপামর সাধারণের মনে এই কথা অহরহঃ না জাগাইলে ভারতের হিত-সাধন সুদূর-পরাহত। বিলাতী সভ্যতার ঝকঝকে তকতকে বহিরাবরণের স্রোতকে ভারতবাসীর গৃহ-প্রাঙ্গণের বাহিরে রাখিতে হইলে বিলাতের ঝকঝকে তকতকে চাক-চিক্যশালী পণ্যদ্রব্যকেও ঘরের বাহিরে রাখিতে হইবে। পাশ্চাত্য জীবনের স্রোত বেগবান, আমাদের জীবনের স্রোত প্রায় অচল। সুতরাং দুই প্রবাহে মিলিলে প্রবল প্রবাহই বিজয়-লাভ করিবে।

* *
*

এই বিলাতী জীবন-প্রবাহে আমাদের মন্দ-স্রোত জীবন প্রবাহ মিলিয়া গিয়া আমাদের বিশেষত্ব লোপ করিবার উপক্রম করিয়াছিল, সে শিক্ষা তো আমাদের হইয়াছে। এখনও আমরা নিত্য দেখি আমাদের শূরবীর অনেক পাণ্ডা ইংরাজী জীবনের ঘূর্ণীর নিকটস্থ হইলেই সেই ঘূর্ণীতে পড়িয়া নাকানী-চোবানী খায়। তবে মনের ও দেহের শক্তি কম বলিয়া আবার তাহারা শেষাশেষি সেই ঘূর্ণীর বাহিরে আসিয়া ঘরের ছেলে ঘরে ফিরিতে চেষ্টা করে। অবশ্য তখন তাহারা দুইয়ের বার হয় এবং স্বজাতির বা আপনার কোনও মঙ্গল সাধিতে পারে না। এই মৃন্ময় ও কাঞ্চনময় পাত্রের এক আবর্ত্তনে ঘূর্ণন বন্ধ করিবার জন্যই মহাত্মা অসহযোগ শিক্ষা দিয়াছেন। তাঁহার প্রেমময় প্রাণ। তিনি স্বজাতি-প্রেমে মাতিয়া স্বজাতি ও স্বদেশের বিশেষত্ব রাখিবার জন্যই এ শিক্ষা দিয়াছেন, ইংরাজের উপর বিদ্বেষ পরবশ হইয়া নয়। এই ঘর সামলাইবার চেষ্টা, আমার মনে হয়, আমাদের আপাততঃ একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত। আমাদের ঘরের আবর্জ্জনা ঝুড়ি ঝুড়ি। সেগুলার বহিষ্করণ ব্যবস্থায় সকল শক্তি নিয়োজিত করা একান্ত প্রয়োজন। এখন সহযোগ করিলেই লোলুপতা আসিবে, দাস-বৃত্তি জাগিয়া উঠিবে, নিজের স্বার্থের হাঁড়িকাটে দেশের স্বার্থের গলায় কোপ বসাইবার হীন বুদ্ধি আপনা আপনি যুগাইবে। অসহযোগে ইংরাজ পাততাড়ি গুটাইবে না—আমরা স্বরাজের উপযোগী হইব এবং বিজয়লক্ষ্মী প্রসন্ন হইয়া আপনি স্বরাজ আনিয়া দিবে।

* *
*

যাঁহারা বলেন ইংরাজের সহযোগিতা ব্যতীত দেশের মুক্তি নাই, তাঁহারা দেশের লোকের নিকট শ্রদ্ধা হারাইয়াছেন নানা কারণে। তাঁহাদের মধ্যে সন্ন্যাসী নাই—তাঁহাদের মত প্রচার করিবার জন্য, বুঝাইবার জন্য তাঁহাদের মধ্যে স্বার্থত্যাগ করিয়াছেন, এমন লোক যদি থাকে তো তাঁহাদের সংখ্যা অতি অল্প। তাঁহাদের সম্বন্ধে লোকে বরং উল্টাটা দেখে। লোকে দেখে তাঁহাদের নিজেদের, জ্ঞাতি গোষ্ঠি, কুটুম্ব, বন্ধু-বান্ধব সকলেরই দিন দিন পুষ্টি সাধন হয়—এবং তাঁহারাও আত্মোন্নতির সোপানের যত ঊর্দ্ধে উঠেন, সেই পরিমাণে তাঁহারাও দারিদ্র্যক্লিষ্ট স্বজাতির বাহিরে গিয়া পড়েন। গবর্ণমেন্টের একজন উন্নত প্রতাপশালী রাজপুরুষের জন্য ভোট সংগ্রহ করিয়াছিল বলিয়া না কি তিনি একজনকে এই বৎসর "রায়বাহাদুর" এবং অপরটিকে "রায়সাহেব" করিয়া দিয়াছেন। এ সকল দৃষ্টান্ত অপ্রীতিকর হয় বলিয়া অধিক দেওয়া নিষ্প্রয়োজন—

কিন্তু লোকের বিশ্বাস যে, আত্মহারা হইয়া ত্যাগের উপর দেশসেবায় ব্রতী না হইলে কেহ প্রকৃতপক্ষে এদেশের জনহিতকর কার্য্য করিতে পারে না। সহযোগী লোকের মধ্যে দেশ-ভক্ত নাই বা তাহারা দেশের হিত-কামনা করে না বা তাহাদের দেশভক্তি প্রগাঢ় নহে, এ কথা আদৌ সত্য নহে। তাহাদের মধ্যে অধিকাংশ লোকের দেশসেবার সঙ্গে আত্ম-সেবা সংমিশ্রিত বলিয়া তাহাদের উপর ভারতবাসীর শ্রদ্ধা নাই, বিশ্বাস নাই।

* *
*

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীনতার মূলে কুঠারাঘাত করিবার জন্য যে দল সৃষ্ট হইয়াছে, সে দলে উদারনীতির পরিপোষক স্পষ্টবক্তা স্বাধীনচিত্ত শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক মহাশয়কে যোগদান করিতে দেখিয়া আমরা মর্ম্মাহত হইয়াছি। মানুষে মানুষে মতভেদ হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু যে মত কাহারও বিশিষ্টতার পরিপন্থী, সে মত সর্ব্বথা পরিবর্জ্জনীয়। মল্লিক মহাশয় বিচক্ষণ, কর্ম্মঠ এবং সর্ব্বত্র স্বাধীনতার পোষক। তাঁহার নিকট আমরা অনেক "গঠন" প্রত্যাশা করি, হঠাৎ তিনি এ "ভাঙ্গনের" কাজে হস্তক্ষেপ করিলেন কেন? বিশ্ববিদ্যালয়ের আভ্যন্তরীন সংস্কার একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়কে আমলাতন্ত্রের দপ্তর বিশেষে পরিণত করিলে অনিষ্টের অবধি থাকিবে না। মল্লিক মহাশয় প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটে প্রবেশ করিয়া দল বাঁধিয়া সংস্কারকার্য্য হাতে লইলে যে ফল হইবে, বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীনতা-হরণে সে ফল কখনও ফলিতে পারে না। তাই বলি—"সবর সবর অসি।"

গ্রন্থ সমালোচনা।

ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম ও হিন্দুয়ানী—শ্রীযুক্ত রাজা শশিশেখরেশ্বর রায় বাহাদুর কর্ত্তৃক লিখিত। মূল্য।০ চারি আনা মাত্র। এই পুস্তকখানি শিক্ষিত হিন্দুমাত্রেরই অবশ্য পাঠ্য। ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম ও হিন্দুয়ানীর প্রকৃত স্বরূপ কি, উভয়ের পার্থক্য কত দূর, এবং বর্ত্তমান হিন্দুসমাজ আদর্শ হিন্দুয়ানী হইতে কিরূপ ভাবে বিচলিত হইয়া তাহার কতদূর নিম্নে গিয়া পতিত হইয়াছে, অপিতু ভ্রান্তভাবে অকার্য্য কার্য্যের নিত্য অনুষ্ঠানে লিপ্ত রহিয়াছে, তাহার বহু দৃষ্টান্ত দেখাইয়া লেখক অতি সুন্দরভাবে সকল বিষয়ের সমালোচনা করিয়া চিন্তাশীলতার যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছেন। যাঁহারা প্রকৃত হিন্দু এবং যাঁহারা বর্ত্তমান হিন্দু সমাজের প্রকৃত সংবাদ জানেন ও সমাজের ভাবনা ভাবেন, তাঁহাদের নিকট এই পুস্তক সমধিক আদর পাইবার যোগ্য।

পুরাণতত্ত্ব—শ্রীমদ্ ব্রহ্মানন্দ ভারতী কর্ত্তৃক ব্যাখ্যাত। মূল্য ।/০ পাঁচ আনা মাত্র। পঞ্চলক্ষণাক্রান্ত অষ্টাদশ পুরাণের পরস্পর বৈশিষ্ট ও রহস্য উপলব্ধি বিষয়ে যাঁহারা উৎসুক, তাঁহারা ভারতী মহাশয়ের এই পুরাণতত্ত্ব পাঠ করিয়া তৃপ্তি লাভ করিবেন। অতীত তিন হাজার বৎসর কাল হইতে এতাবৎ কালের মধ্যে হিন্দু সমাজের জন্ম স্বরূপ পুরাণ সমূহের ভিতর কত ভাবের কত বিষয় সন্নিবিষ্ট ও পরিবর্জ্জিত হইয়াছে, তাহা সাধারণের অবগতির জন্য ইহাতে সুন্দরভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত অনেক জ্ঞানগর্ভ নূতন নূতন বিষয়ও ইহাতে আলোচিত হইয়াছে।

দীক্ষাতত্ত্ব—শ্রীযুক্ত রাজা শশিশেখরেশ্বর রায় বাহাদুরের ভূমিকা সম্বলিত রাজকুলগুরু পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস তত্ত্বরত্ন লিখিত দীক্ষাতত্ত্ব নামক উক্ত পুস্তকখানি হিন্দু সমাজের পক্ষে একটী অমূল্য রত্নবিশেষ। সংসার-বিষ জর্জ্জরিত আধিব্যাধি-প্রপীড়িত মানব যখন মনে মনে সংসারের অসারতা বুঝিতে পারিয়া শান্তির আশায় সেই সর্ব্বাপদভঞ্জন পরমাত্মার শরণ লইতে ইচ্ছা করে, তখন সেই করুণাময়ের দর্শন লাভের পথপ্রদর্শক রূপে মানবের সহায় একমাত্র গুরুমন্ত্র। এবং সেই গুরুমন্ত্র গ্রহণের নাম দীক্ষা। এই দীক্ষা গ্রহণ তান্ত্রিক সাধনার একটী প্রধান অঙ্গ। পরন্তু সেই তান্ত্রিক সাধনা কিরূপ ও দীক্ষা গ্রহণের তাৎপর্য্য কি, দীক্ষাশব্দের নিগূঢ়ার্থ কি, ইত্যাদি আধ্যাত্মিক তত্ত্ব সকল এই পুস্তকে অতি প্রাঞ্জল ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। সর্ব্ব সাধারণে এই পুস্তকের বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়।

প্রাপ্তি-স্বীকার।

কবিরাজ শ্রীযুক্ত সি, এম, গুপ্ত বি, এ মহাশয় প্রস্তুত টুথ পাউডার এক কৌটা উপহার পাইয়াছি এবং ব্যবহার করিয়া প্রীতি লাভ করিয়াছি। ইহাতে দাঁত পরিষ্কার হয় এবং দাঁতের গোড়ার ব্যথার শান্তি হয়। ২০।১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে পাওয়া যায়। ঐ

মাসিক-পত্রিকা ও সমালোচনী।

২০শ ভাগ] চৈত্র, ১৩২৯। [২য় সংখ্যা

আলোচনা।

[শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত]

রসিক কবি দ্বিজেন্দ্রলাল গাহিয়াছিলেন—

"বদ্‌লে গেল মতটা
ছেড়ে দিলাম পথটা
এমন অবস্থায় পড়লে সবারি মত বদ্‌লায়।"

তাঁহার বিদ্রূপের নায়ক ধর্ম্ম জগতের। বিভুর সৃষ্ট জগতে গুটিপোকা, শুঁয়োপোকা প্রজাপতির সৌন্দর্য্য লাভ করে, সেটা পরিবর্ত্তন নয়—পরিবর্দ্ধন, দেহের পূর্ণতা লাভ। পিপীলিকার পালক উঠে তাহাকে পূর্ণ করিবার জন্য—"বদলে গেল মতটা" হিসাবে নয়। প্রকৃতির নিয়মে এমন বদলে যায় দুই, একটা ইতর শ্রেণীর জীব। কীট-তত্ত্ববিদ্ দু প্লেসিস (Du plessis) এক প্রকারের কীট আবিষ্কার করিয়াছেন যাহারা হেমন্ত ও শীতে পুরুষ, বসন্তে স্ত্রীজাতীয় এবং গ্রীষ্মে ক্লীবত্ব প্রাপ্ত হয়। এই পোকার বৈজ্ঞানিক নাম—Grubea Protendricas। অপরের উপদ্রবেও পুরুষ জাতীয় জীব রমণী-ভাব ধারণ করে তাহার উদাহরণ জীব জগতে এক প্রকারের কাঁকড়া। এই জাতীয় পুরুষ কাঁকড়ার দেহে একপ্রকার উপজীব উপনিবেশ স্থাপন করিয়া ইহার বীর্য্যাধার আহার করিয়া ফেলে। তখন এই কাঁকড়ার চাল চলন হয় স্ত্রীজাতীয়ের মত—কর্কটী যেমন ডিম্বের যত্ন লয়, এই কর্কট তেমনি পরজীবের যত্ন করে। এই কর্কটের বৈজ্ঞানিক নাম—Stenorhynchus আর উপজীবের নাম Bopydæ। ইহা দেখিয়া প্রফেসার বেস্ একটা Ophrytocha Puerilis স্ত্রী-কীটের পেট কাটিয়া দিয়াছিলেন। তিন সপ্তাহ পরে যখন সেই অংশের পুনরাবির্ভাব হইল তখন সে পুরুষের আকার ধারণ করিল। মানুষের পক্ষে ঐ প্রকার দেহান্তর অসম্ভব। তবে মানুষ মতামত পরিবর্ত্তন করিয়া নিজের বিশিষ্টতা বদল করিতে পারে।

* * *

নিজের সিদ্ধান্তকে ভ্রমাত্মক বুঝিয়া যে ব্যক্তি নিজের অভিমত পরিবর্ত্তন না করে, নীতিশাস্ত্রের মতে সে কাপুরুষ। কিন্তু আজীবন এক সিদ্ধির জন্য সাধনা করিয়া, একই সাধনায় বিশিষ্টতা অর্জ্জন করিয়া, বৃদ্ধবয়সে যাহাকে সেই সাধনাটাকে আমূল উল্টাবাজী খাওয়াইতে হয়, বুঝা যায় সে ব্যক্তির সমস্ত জীবনটা নয় ব্যর্থ, আর না হয়ত, সে বৃদ্ধবয়সের নূতন দলে মিশিবার জন্য সারা জীবনটা উল্টা সাধনায় কপটতার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। এখনকার

সিদ্ধিলাভ করিবার জন্যই সে সাধনার পথটা বিপরীত করিয়া গড়িয়া লইয়াছিল। অবশ্য ইহা অতি হীন অবস্থা,—অতি অল্প লোকই আত্ম-মর্য্যাদার এমন অপব্যবহার করিতে পারে। আমার মনে হয় যে, আমাদের দেশের যে-সব গণ্যমান্য বরেণ্য ব্যক্তি সারা জীবনের সাধনার বিপরীত সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, তাঁহারা প্রভূত সৎ-সাহস দেখাইয়া আপনাপন প্রাচীন মতামতের অসারত্ব সপ্রমাণ করিয়াছেন। ইহাতে বিশ্ব মাঝে তাঁহাদের ঘোষণা করিতে হইয়াছে যে তাঁহাদের বিফল জীবন বিফল যৌবন বৃথা আন্দোলনে উৎসর্গ করিয়া তাঁহারা অধুনা সত্যপথের সন্ধান পাইয়াছেন। কিন্তু আমাদের দেশে একদল অন্ধ কুলোক আছে যাহাদের দৃষ্টি এই সৎ-সাহসের জ্যোতিতে ঝলসিত হয় না। ইহারা অহরহঃ এই সকল মহাপুরুষের নিন্দাবাদ করিয়া দেশের আপামর সাধারণের চোখে ধাঁধা লাগাইবার চেষ্টা করে। রাজনীতি ক্ষেত্রে ইহাই দুর্নীতি।

* * *

যে-সকল মহাপ্রাণ হিন্দু-মুসলমান তুচ্ছ স্বার্থ ও অন্যায় জিদ পরিত্যাগ করিয়া ভারতবর্ষকে প্রকৃত উন্নতির পথে লইয়া যাইবার জন্য নির্য্যাতন-ভোগ করিয়াছেন, তাঁহারা বাঙ্গালা লাট-মজলিসের মিউনিসিপালিটির আইন প্রণেতাদের বুদ্ধির পরিচয় পাইয়া লজ্জায় অধোবদন হইবেন। সকল সভ্যে একমত হইয়াছিল যে, কলিকাতায় নাগরিক সভায় কতকগুলি মুসলমান সদস্য থাকিতেই হইবে। এ ন্যায়-সঙ্গত প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিবার উপায় নাই—কারণ সভার ইতিহাসে প্রমাণ যে মুসলমান সদস্য সম্বন্ধে বিশেষ বিধান না থাকিলে মুসলমান সদস্য প্রতিযোগিতায় অন্যান্য সদস্যের নিকট পরাস্ত হয়। কিন্তু কথা উঠিয়াছিল—হিন্দু-মুসলমান প্রভৃতি সকল করদাতা মিলিয়া হিন্দু ও মুসলমান সদস্য নির্ব্বাচন করিবে। আর একটা কথা উঠিয়াছিল যে মুসলমান সদস্যদের নির্ব্বাচন করিবে কেবল মুসলমান করদাতা। উভয় মতের পরিপোষকদের মধ্যে খুব তর্ক চলিতেছিল—শেষে এক গোরা সদস্য মধ্যস্থ করিয়া দিলেন যে, আগামী নয় বৎসর কাল কেবল মুসলমান কর-দাতাই মুসলমান সদস্য নির্ব্বাচন করিবেন। গোরার এই প্রস্তাবে দুই দল ভিজিয়া গলিয়া নরম হইয়া তিন কুর্ণিস-সহ প্রস্তাবটি গ্রহণ করিলেন এবং বৃদ্ধ মন্ত্রী সার সুরেন্দ্রনাথ—আজীবন এই মতের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াও—অকস্মাৎ বুঝিলেন যে সাহেবের বচন অখণ্ডনীয়। ইহার পর যদি ইংরাজেরা বলে যে আমরা স্বায়ত্ত-শাসনে অনুপযুক্ত তাহা হইলে আমাদের ক্রোধ অবিবেচকের ভাব-প্রবণতা হইবে মাত্র।

* * *

আমার মনে হয় প্রত্যেক মিউনিসিপালিটি, প্রত্যেক জেলা-বোর্ড প্রভৃতি এখন কলিকাতা আইনের এই বিধান নকল করিবে। এখন ত তর্কের মূর্চ্ছনা ব্যঞ্জনা বাগ্মীতা থামিয়াছে—এখন স্থির দৃষ্টিতে দেখিলে কি মনে হইবে না যে, এই বিধানে হিন্দু-মুসলমানের রাজনীতিক স্বার্থের একত্রীকরণ এখন সুদূর পরাহত হইল। যদি হিন্দু সদস্যকে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের কর-দাতাদিগের নিকট জবাবদীহি করিতে হইত তাহা হইলে উদার নীতি আশ্রয় না করিলে তাহার উপায় ছিল না। মুসলমান সদস্যকেও উদার হইতে হইত, আর উভয় দলের নাগরিকগণ নির্ব্বাচন রূপ নাগরিক ব্যাপারে একসঙ্গে হুড়াহুড়ি মেশামেশি করিয়া পরস্পরকে চিনিত ভাল। কিন্তু এখন উভয় সম্প্রদায় বেশ একটা চীনে দেওয়ালের দুই পার্শ্বে থাকিবার সুবিধা পাইল। যাহার স্বার্থ সিদ্ধির জন্য আবশ্যক হইবে—সে প্রাচীরের দুই পার্শ্বের দুইটা লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিয়া দুই দলে বেশ রমারম ঝমাঝম কোন্দল বাধাইয়া দিবে। ধর্ম্ম-মন্দিরে হিন্দু-মুসলমান মিলিতে পারে না, সামাজিক জীবনে উভয় জাতির বৈষম্য আছে—যাহা উভয় জাতি বজায় রাখিতে যত্নবান একমাত্র একত্রীকরণের উপায় আছে রাজনীতি। এক্ষেত্রেও যখন একটা গণ্ডী টানিয়া দেওয়া হইল তখন ভেদনীতি—ভারতের কালকীট, দেশভক্তের বিভীষিকা, দেশদ্রোহীর অমোঘ অস্ত্র—বেশ আত্ম-প্রতিষ্ঠা করিবে—মনে এই ভয়টাই জাগিয়া উঠে।

তবে অনিষ্টটা তত বেশী হইবে না একটা কারণে। এই ভোটের ব্যাপারটা এদেশে এখনও প্রাণ-লাভ করে নাই—ইহা বিলাতী নন্দন কাননের একটা গাছ, এদেশে পরগাছা মাত্র—ইহা এখনও আত্ম-প্রকাশ করিতে পারে নাই—এখনও সঞ্জীবনীর সন্ধান পায় নাই। ইহা আপাততঃ একটা খেলার ব্যাপার মাত্র। লোকে ভোট দেয় অনুরোধে, ভয়ে বা টানা-হ্যাঁচড়ার দায়ে। ইহার আসল ব্যবহার কি তাহা কেহ জানে না। সুতরাং সদস্য-নির্ব্বাচন ও ভোট-দান বিপথগামী হইল বলিয়া এখন বোধ হয় হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতির ধারা রুদ্ধ হইবে না। আর একটা আমার বিশেষ অনুরোধ—যাহা হইবার তাহা তো হইয়া গিয়াছে—যাহাতে এই ব্যাপার অনিষ্ট-প্রসূ না হয়, উভয় সম্প্রদায়ের সকল শিক্ষিত লোক যেন সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখেন। স্মরণ থাকে যেন, আমাদের দুই দলের অনিষ্টে তৃতীয় দলের ইষ্ট, হিন্দু-মুসলমানের দৌর্ব্বল্যে তৃতীয় সম্প্রদায়ের বল। যাঁহারা এই নির্ব্বাচন প্রথায় স্বরাজ লাভের প্রয়াসী তাঁহারা যেন নির্ব্বাচনের মূল নীতি জন সাধারণকে বুঝাইতে সচেষ্ট থাকেন এবং যাহাদের দেশের যন্ত্র এই নির্ব্বাচন প্রথা তাহাদের নিকট প্রমাণ করিয়া দেন যে এ যন্ত্রের ব্যবহার এ দেশ শিখিতেছে। তাহা না হইলে নির্ব্বাচনটা এক প্রাণহীন নিষ্ফল অভিনয় থাকিয়া যাইবে মাত্র।

* *
*

আমাদের পাঠ্যাবস্থায় এক শ্রেণীর ছাত্র ছিল যাহারা প্রত্যেক খানি পাঠ্য-পুস্তক খরিদ করিত তাহাতে পংক্তি বিশেষকে রাঙ্গাইত, চক্চকে বাঁধা-খাতায় স্পষ্টাক্ষরে সব ব্যাখ্যা লিখিয়া লইত, কিন্তু কোন দিন অধ্যয়ন করিত না। জিজ্ঞাসা করিলে বলিত—"এ সব এখন বস্তা-বন্দী করিয়াছি, পরীক্ষার সময় আয়ত্ত করিব, আপাততঃ এ সবের কোনও প্রয়োজন নাই। তবে বাপ মা অভিভাবক দেখিলে বলিবে—বেশ।" আমাদের নির্ব্বাচন সম্বন্ধে আইন কানুনও সেইরূপ বস্তাবন্দী—যদি কোনও দিন এই উপায়ে স্বরাজ লাভ হয় তো বিধি নিষেধগুলা কাজে লাগিবে। আপাততঃ অভিভাবক মুরুব্বির দল দেখিলে বলিবে—আহা বেশ! কলিকাতার নাগরিক সভার নির্ব্বাচন বিষয়ে মহিলাদের সমান অধিকার হইয়াছে পুরুষদের সহিত। ইহা ন্যায় বিচার, নিরপেক্ষতা, যুক্তি-শোভন। বস্তাবন্দী হইল একটা ভাল বিধান তাহা নিঃসন্দেহ। কিন্তু যে কারণে—প্রকৃত পক্ষে অকারণে—পুরুষ সদস্য নির্ব্বাচিত হয়, সে উপায়ে মহিলাদের নির্ব্বাচন হইলে ব্যাপারটা ব্যর্থ হইবে। তবে আইনের বস্তায় একটা সুবন্দোবস্ত রহিল ইহাই মঙ্গলের কথা। এবারকার সভায় শ্রদ্ধেয়া শ্রীমতী বাসন্তী দেবী, শ্রীমতী উর্ম্মিলা দেবী, প্রভৃতি মহাপ্রাণ নারী সমষ্টি দেখিলে আশান্বিত হইব। দেশভক্ত সমাদৃতা শ্রীমতী সরলা দেবী বঙ্গের বাহিরে এবং তিনি অসহযোগিনী। সুতরাং এ সময়ে তিনি যুঝিতে পারিবেন না। শ্রীমতী নায়ডু ভারত-গৌরব কলিকাতার সহিত তাঁহার সংশ্রব অল্প। তিনি এ সভায় প্রবেশ করিলে আমরা শীঘ্রই মহিলা-মেয়র পাইতাম।

* *
*

অসহযোগী জুজুর ভয়ে প্রবীণ সচিব সার সুরেন্দ্রনাথ বিধান করিয়াছেন যে, কর্পোরেশনের যে সদস্য শপথ ভঙ্গ করিয়াছে একথা সাব্যস্ত হইবে, গবর্ণমেণ্ট গেজেটে ফতোয়া বাহির করিয়া তাহাকে বরখাস্ত করিতে পারিবে। সাবাস্ গণতন্ত্র! সাবাস্ স্বাধীন নাগরিক সভা! যত বড় নাগরিক সভা হউক তাহাকে স্বায়ত্ত (?) সচিবের আয়ত্তের ভিতরে থাকিতে হইবেই হইবে। হুসিয়ার কাউন্সিলার, খবরদার অলডারমান—যা কর' তা কর' দেখো যেন প্রভু না সন্দেহ করেন যে তুমি সভার কালাপাহাড়। হাঁকাহোঁকা সব চলিবে যতক্ষণ চক্ষু না "জবাকুসুমসঙ্কাশং" হয়। দুই এক জনের বাগ্মীতা হাউয়ের মত ঊর্দ্ধগামী হইয়াছিল—এ প্রস্তাবের বিপক্ষে। কিন্তু সচিবের প্রস্তাব সমর্থন করিবার জন্য যদি তুলিবার হাত না থাকে তো সে হাতে পক্ষাঘাত হওয়া উচিত।

* *
*

কলিকাতার বাঙ্গালী হিন্দুকে দেখিয়া বাঙ্গালী-হিন্দু-সমাজের অবস্থা বুঝিতে হইলে প্রাণে বল বুদ্ধি ভরসা কমিয়া যায়। সকল দিকে হিন্দুর অধঃপতনের সাক্ষ্য জাজ্বল্যমান। ধর্ম্ম মন্দিরে তাহার স্থান নাই, কর্ম্ম জগতে সে নিশ্চেষ্ট। ঘোর বিলাসিতা পঙ্কে মগ্ন বাঙ্গালীর জীবন আজ সঙ্কটাপন্ন। ব্যবসায়ীর মাঝে তাহার স্থান নাই—বীরের দল হইতে সে বিতাড়িত, ব্রাহ্মণত্বের কোন পরিচয় তাহার মধ্যে পাই না। বিনা পরিশ্রমে অর্থোপার্জ্জন করিয়া সাহেবিয়ানা করিবার অভিপ্রায়ে মাঝে মাঝে সে দুই একটা জুয়াচুরির ব্যবসা খুলে আর সে দলে দলে ঘোড়-দৌড়ের মাঠে গিয়া দ্যূতক্রীড়ায় সর্ব্বস্বান্ত হয়। বিদ্যাকে অর্থকরী ভাবিয়া সে বাণী মন্দিরে অর্ঘ্যদান করে, পরে দেখে যে মা কমলা সে অর্ঘ্যে তুষ্ট হন না। দেহের বল, মনের বল আমরা নিত্যই হারাইতেছি, নিত্যই আমাদের মাতৃভূমি অপরের ধন সম্পত্তির ব্যবস্থা করিতেছেন আর আমরা মায়ের কোলে মোহ নিদ্রায় সুপ্ত গ্রাসাচ্ছাদনের অভাবে কালব্যাধির করাল গ্রাসে পতিত হইতেছি। আমাদের মধ্যে দলাদলি, রেষারিষী, কলহ বিদ্বেষ ক্রমশঃই বাড়িয়া যাইতেছে, আর সেই অবসরে অপরে লাভবান হইতেছে। আমার সকল সম্পত্তি কমিতেছে, সদ্‌গুণ হ্রাস হইতেছে, আত্ম-মর্য্যাদা মলিন হইতেছে। এ অপ্রিয় সত্য বলিতে চোখে জল আসে, কিন্তু মনকে আঁখি ঠারিয়া আর কতদিন দেখা যায়' কিরূপে একে একে ঘরের ইট কাট কড়ি বরগা প্রাচীর প্রাকার ভূমিসাৎ হয়। এখনও সময় আছে, এখনও আমাদের যুবক সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রাণ আছে, এখনও তাহাদের চোখ ফুটাইলে তাহারা এই জীর্ণ কুটীরের সংস্কার করিতে পারে। আর আসল কার্য্য ছাড়িয়া, গৃহ সংস্কার উপেক্ষা করিয়া পরের সম্পদে লোভ-লোলুপ দৃষ্টিতে তাকাইয়া কথার জালে জড়াইয়া মরিলে ধ্বংস অনিবার্য্য—লোপ সন্নিকট।

মুকুন্দরামের চণ্ডীকাব্যে কৃত্তিবাসের ছায়া।

[শ্রীপ্রিয়লাল দাস এম-এ, বি-এল]

মুকুন্দরামের রচিত চণ্ডীকাব্যের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে একজন সমালোচক লিখিয়াছেন,—"চণ্ডীর প্রভাব দেখান বোধ করি গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য, সেইজন্য দুইটি বিভিন্ন উপাখ্যান রচনা করিয়া কেবল মাত্র চণ্ডীর অনুগ্রহ সূত্রে দুইটীকে একত্র গাঁথিয়া দিয়াছেন। সংসারের সকল সুখ দুঃখের মধ্যেই চণ্ডীর মঙ্গল হস্ত বিদ্যমান—তাঁহার অনুগ্রহ বিনা কোনও কার্য্য সুসম্পন্ন হয় না।" দেবীর মাহাত্ম্য প্রচার করা যে মুকুন্দ কবির উদ্দেশ্য ছিল তদ্বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই। কিন্তু কালকেতুর উপাখ্যানে লিখিত রাজনৈতিক ঘটনাবলী ও ধনপতি সদাগরের বৃত্তান্তে বর্ণিত সামাজিক অবস্থার চিত্রগুলির সহিত যে মূল কাব্যের প্রধান উদ্দেশ্যের কোনও সম্পর্ক নাই, একথা সহজে বিশ্বাস হয় না। মুকুন্দরাম উক্ত দুইটি উপাখ্যানে কলিঙ্গ, গুজরাট ও সিংহলের রাজাদের কথা যথাক্রমে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। বাঙ্গালী বণিকের সমুদ্রযাত্রার বিশদ বিবরণ কবি ধনপতির উপাখ্যানে লিখিয়াছেন। কয়েকটি যুদ্ধের বর্ণনাও উপাখ্যান দুইটীতে পাওয়া যায়। যে যুগে মুকুন্দরাম বঙ্গীয় কাব্য-জগতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন সে যুগে বঙ্গদেশে এক দিকে শ্রীচৈতন্যদেব-প্রবর্ত্তিত উদার বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রভাব যেমন মন্দীভূত হইয়া আসিতেছিল, অপর দিকে তেমনি কয়েকজন বাঙ্গালী রাজা স্বাধীনতা লাভের আশায় শক্তি-পূজার পক্ষপাতী হইয়া পড়িতেছিলেন। দেশের সেই সময়কার চতুর্দ্দিকের অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, মুকুন্দরাম তাঁহার চণ্ডীকাব্যে সমসাময়িক বাঙ্গালী জগতের চিত্রগুলি শাক্তধর্ম্মের নূতন সূত্রে দৃঢ়ভাবে বাঁধিয়া রাখিবার জন্য সচেষ্ট ছিলেন। চণ্ডীপূজার বিবরণ, রাজচরিত্রের সমালোচনা ও যুদ্ধাদির বর্ণনা মুকুন্দরাম যে বাল্যকালে কৃত্তিবাসের রামায়ণে পাঠ করিয়াছিলেন তাহা

সহজেই অনুমান করা যায়। কবিরা বাল্যকালে ও যৌবনে যে সকল গ্রন্থ আগ্রহের সহিত পাঠ করেন তাহাদের প্রভাব তাঁহারা কবি-জীবনে উপেক্ষা করিতে পারেন না। মুকুন্দরামের চণ্ডীকাব্যের অধিকাংশ বর্ণনীয় বিষয়ের মূল আদর্শ যে কৃত্তিবাসের রামায়ণ হইতে সংগৃহীত হইয়াছে তাহা বঙ্গভাষায় এই দুইখানি সুবৃহৎ কাব্য গ্রন্থে বর্ণিত ঘটনাবলীর ঐক্য সন্ধিগুলি যিনি মিলাইয়া দেখিয়াছেন তাঁহার বুঝিতে বিলম্ব হয় না। বাস্তবিক, মুকুন্দরামের চণ্ডীকাব্য পাঠ করিয়া আমরা কৃত্তিবাসের রামায়ণের যতটা পরিচয় পাই, বোধ হয় অন্য কোনও প্রাচীন কাব্য পাঠ করিয়া ততটা পাই না। মাধবাচার্য্যের "জাগরণ" নামক চণ্ডী বিষয়ক কাব্য-গ্রন্থেও কৃত্তিবাসি রামায়ণে বর্ণিত ঘটনাবলীর স্থানে স্থানে উল্লেখ আছে বটে, কিন্তু তাহা মাধব কবির রচনা-শিল্পের প্রধান উপকরণ নহে। মুকুন্দরাম যে মাধবাচার্য্যের "জাগরণ" কাব্য পাঠ করিয়াছিলেন তাহা সুনিশ্চিত এবং হয়ত তিনি কৃত্তিবাস-রচিত রামায়ণ হইতে উপকরণ সংগ্রহ করিয়া তাঁহার চণ্ডী কাব্যের বর্ণনীয় বিষয়গুলিকে ঐশ্বর্য্যশালী করিবার সন্ধান মাধব কবির নিকট প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; তাহা হইলেও মুকুন্দরাম তাঁহার চণ্ডী-কাব্যে কৃত্তিবাসকে যে ভাবে অনুসরণ করিয়াছেন মাধব কবি তাঁহার রচিত "জাগরণ" কাব্যে সে ভাবে কৃত্তিবাসকে অনুসরণ করেন নাই। এই দুইজন ষোড়শ শতাব্দীর শাক্ত কবির উপর কৃত্তিবাসি রামায়ণের প্রভাব যে সমধিক তাহাতে সন্দেহ করিবার কোনও কারণ নাই। মুকুন্দরাম ও মাধবাচার্য্যের মধ্যে কে যে কৃত্তিবাসের নিকট বেশী ঋণী তাহা এই প্রবন্ধে আবশ্যক মত পরে আলোচিত হইবে। মাধবাচার্য্য ও মুকুন্দরাম কৃত্তিবাসের নামোল্লেখ করিয়া যদিও তাঁহাদের কাব্যে কোনও শ্লোক বা পদ, স্তুতি বা বন্দনা লেখেন নাই, তাহা হইলেও তাঁহারা, বিশেষতঃ কবিকঙ্কণ কৃত্তিবাসি রামায়ণে বর্ণিত ঘটনাবলীর এত বেশী উল্লেখ করিয়াছেন যে তাহাতে বিস্মিত হইতে হয়। কৃত্তিবাসের ভাষা-রামায়ণের প্রভাব শুধু মাধবাচার্য্য ও মুকুন্দরাম কেন, অন্যান্য শাক্ত কবির রচনাতেও স্পষ্ট অনুভব করা যায়।

কৃত্তিবাস শ্রীচৈতন্যদেবের ৬০ বৎসর পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত রামায়ণ যে শ্রীচৈতন্যদেবের সমসাময়িক বৈষ্ণব কবিগণ পাঠ করিয়াছিলেন, এরূপ অনুমান বোধ হয় অসঙ্গত নহে। বৈষ্ণব কাব্য-সাহিত্যে কিন্তু রামচরিত্র আদৌ বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিতে পারে নাই। মহাপ্রভু ও তাঁহার পার্শ্বদগণের জীবনে রামাবতারের যেটুকু অভিনয় চৈতন্য চরিতাখ্যান লেখকগণ লক্ষ্য করিয়াছেন তাহাতে ভক্ত কবির কল্পনার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় বটে, কিন্তু কৃত্তিবাস কর্তৃক পদ্যময় বঙ্গভাষায় রচিত পৌরাণিক ইতিহাসের আদর্শ চরিত্র শ্রীরামচন্দ্রের অবতার-লীলার কোনও ইঙ্গিত তাহাতে পাওয়া যায় না। শ্রীচৈতন্যদেবের তিরোভাবের অর্দ্ধ শতাব্দী পরে বৈষ্ণব কবিরা যখন চরিতাখ্যানমূলক কাব্য গ্রন্থ ও অসংখ্য পদাবলী রচনা করিয়া বঙ্গদেশে বৈষ্ণব ধর্ম্মকে কাব্য-সাহিত্যের ভিত্তির উপর নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছিলেন সেই সময়ে দেশের রাজনৈতিক অবস্থার পরিবর্ত্তন হওয়াতে কৃষ্ণপ্রেমের প্লাবন ক্রমশঃ সমাজের উপরিভাগ হইতে অন্তর্হিত হইয়া কতকগুলি স্বল্পায়তন সাম্প্রদায়িক কূপে আবদ্ধ হইয়াছিল। মানব-সমাজে ধর্ম্ম যখনই প্রচারকের মৃত্যুর পর কবির লেখনীর আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে তখনই তাহার প্রসারণ ক্ষমতা সঙ্কুচিত হইয়া গিয়াছে। বৈষ্ণব ধর্ম্মের এই অবস্থায় বঙ্গদেশে পাঠান রাজত্বের অবসান হইলে মোগলের অধীনে বারভুঁইয়ারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজত্ব স্থাপন করিতে যত্নবান হইয়াছিলেন। এই স্বাধীনতা লাভের উচ্চাশা ফলবতী করিবার অভিপ্রায়ে বাঙ্গালী জমিদারগণকে দেবীর শরণাপন্ন হইতে হইয়াছিল। ইহার কারণ, বাঙ্গালীর বাহুতে বল ও হৃদয়ে শক্তি সঞ্চার করিবার সামর্থ্য চৈতন্যভক্তগণের ছিল না। মুকুন্দরাম পরিবর্ত্তিত পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রভাব অনুভব করিয়াছিলেন। তিনি চণ্ডীকাব্যে কর্ম্মী বাঙ্গালীর চরিত্রের একাধিক আদর্শ সৃজন করিয়া তাঁহার সমসাময়িক বাঙ্গালী সমাজের জীবন্ত ইতিহাস প্রকারান্তরে লিখিয়া গিয়াছেন। সেই কর্ম্মময় যুগে মুকুন্দ কবি যে কর্ম্মাবতার ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের

আদর্শ-চরিত্রের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন, ইহা অত্যন্ত স্বাভাবিক। মুকুন্দরাম তাঁহার চণ্ডীকাব্যের আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত যখনই সুবিধা পাইয়াছেন কৃত্তিবাসের রামায়ণে বর্ণিত শ্রীরামচন্দ্রের লীলাময় জীবনের ঘটনা-বিশেষের উল্লেখ করিয়াছেন। বাস্তবিক, কৃত্তিবাসের কীর্ত্তিস্তম্ভের উপর মুকুন্দরাম তাঁহার চণ্ডীকাব্যের সৌধ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। গ্রন্থারম্ভে গণেশ, সরস্বতী ও লক্ষ্মীর বন্দনা করিয়া কবি চৈতন্য-বন্দনা করিয়াছেন ও তৎপরে শ্রীরাম-বন্দনা করিয়া শেষে চণ্ডী-বন্দনা করিয়াছেন। কবি যেন অষ্টাহব্যাপী মঙ্গলগানের সূচনাতে শ্রোতাগণের চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া বলিতেছেন যে, এক্ষণে "ভাবের যুগ" চলিয়া গিয়াছে, "কর্ম্মের যুগ" আরম্ভ হইয়াছে, তোমরা শক্তির পূজা করিতে শিক্ষা কর। মুকুন্দরামের শ্রীরাম-বন্দনা পাঠ করিয়া বেশ বুঝা যায় যে, তিনি কৃত্তিবাসের রামচন্দ্রের উদ্দেশে এই স্তোত্র রচনা করিয়াছিলেন—

"আনন্দে বন্দিব রাম, মুক্তিদাতা যার নাম,
প্রভুরাম কমললোচন।
অযোধ্যার পতি রাম, নব দুর্ব্বাদলশ্যাম,
প্রণমহ কৌশল্যানন্দন॥
প্রণমহ প্রভু রাম, মন্ত্রী যার জাম্বুবান,
মিত্র যার গুহক চণ্ডাল।
রিপু যার দশানন, সত্য সত্যপরায়ণ,
যার কীর্ত্তি সমুদ্রে জাঙ্গাল॥
লক্ষ্মী যার উপনীতা, শ্রীরাম বনিতা সীতা,
সঙ্গে যার অনুজ লক্ষ্মণ।
আমি দেব পুরন্দরে, ধরিলেক দণ্ড শিরে,
সেবে যারে পবননন্দন॥
বাঞ্ছা করি নিরন্তর, হই শ্রীরাম কিঙ্কর,
পক্ষিরাজ যাহার বাহন।
কর্ণের সমান দাতা, প্রজার পালনে পিতা,
অশেষ গুণের নিকেতন॥
ধনুর্ব্বাণ করে ধরি, ডরেতে পলায় অরি,
অনুগত জনে কৃপাবান।
রঘুনাথ পদ যুগে, একান্ত ভকতি মাগে,
চক্রবর্ত্তী শ্রীকবিকঙ্কণ।"

এই বন্দনায় কবি যে সকল শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন সেগুলির অধিকাংশই কৃত্তিবাসি রামায়ণে আছে। সংস্কৃত ভাষায় কৃত্তিবাসের রচিত শ্রীরাম-বন্দনার ইহা প্রতিধ্বনি বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ভাষা রামায়ণে গ্রন্থকারের প্রার্থনায় আছে,—"রাম রাম প্রভু রাম কমল-লোচন।" মুকুন্দরাম উক্ত রামায়ণ হইতে উপরোক্ত স্তোত্রে শুধু এই ছত্রটি সন্নিবেশিত করেন নাই। কৃত্তিবাস রামের নিকট প্রার্থনা করিয়াছেন,—"তব পদে ভক্তি সদা মাগি এই বর," মুকুন্দরামও উদ্ধৃত বন্দনায় সেই মর্ম্মে প্রার্থনা করিয়াছেন—"রঘুনাথ পদ যুগে, একান্ত ভকতি মাগে, চক্রবর্ত্তী শ্রীকবিকঙ্কণ।" মুকুন্দ কবির বন্দনায় "জাঙ্গাল" শব্দটি যে কৃত্তিবাসের অভিধান হইতে গৃহীত তাহা বোধ হয় সকলেই স্বীকার করিবেন। মুকুন্দরাম উল্লিখিত শ্রীরাম বন্দনায় শ্রীরামচন্দ্রকে গুহক চণ্ডালের মিত্র বলিয়াছেন। বাল্মীকির রামায়ণে আদিকাণ্ডে গুহক চণ্ডালের নাম নাই। উক্ত রামায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডের পঞ্চাশ সর্গে এক স্থানে রামের মিত্র নিষাদ জাতীয় গুহের উল্লেখ আছে, তাহাও অনেকে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া অনুমান করেন। কৃত্তিবাস বোধ হয় প্রেমাবতার শ্রীরামচন্দ্রের, বানররূপী অনার্য্যগণকেও প্রেম বিতরণের কথা স্মরণ করিয়া বাঙ্গালীর চক্ষে তাঁহার চরিত্রের সৌন্দর্য্য পরিস্ফুট করিবার জন্য ভাষা রামায়ণের আদিকাণ্ডে শ্রীরামচন্দ্রের সহিত গুহকের মিতালি পাতাইয়াছেন। কৃত্তিবাসি রামায়ণে বর্ণিত এই মিতালি ব্যাপারটির উল্লেখ করিয়া ভাষা-রামায়ণ সম্বন্ধে অনেকে অনেক কথা বলিয়া থাকেন। সমালোচকগণ কিন্তু একটা কথা ভুলিয়া যান। কৃত্তিবাস কর্ত্তৃক পয়ারে অনূদিত রামায়ণের নায়ক নায়িকা ও পাত্র পাত্রীদের চরিত্রে অনুবাদকের সমসাময়িক বাঙ্গালী সমাজের চিত্র প্রতিফলিত হওয়াতে এই ভাষা-রামায়ণ যে বাঙ্গালীর নিজস্ব হইয়াছে তাহা কেহ ভাবিয়া দেখেন না। কবিকঙ্কণ উদ্ধৃত শ্রীরাম-বন্দনায় গুহক চণ্ডালের উল্লেখ করিয়া শত সহস্র বাঙ্গালী কবির গুরুস্থানীয় কৃত্তিবাসের প্রতিভা ও উদারতার উপযুক্ত সম্মাননা করিয়াছেন। মাধবাচার্য্যের "জাগরণ" নামক চণ্ডীকাব্যে কবি গ্রন্থারম্ভে সর্ব্বদেব-

বন্দনায় শ্রীরামচন্দ্রের উল্লেখ করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহাতে কৃত্তিবাসের রামচন্দ্রের কোনও ইঙ্গিত পাওয়া যায় না। এই বন্দনায় দশাবতারের কথায় মাধব কবি লিখিয়াছেন,—"রামরূপে অরণ্যেতে বেড়াইলা ভ্রমিয়া। ঘুচাইলে দেবের বিঘণ রাবণ বধিয়া॥" বন্দনার শেষাংশে আছে,—"ব্যাস বাল্মীকি বন্দি মুনির প্রধান। যাহার পুরাণ প্রভা ঘোষে ত্রিভুবন॥" মাধবাচার্য্যের "জাগরণে" কৃত্তিবাসের প্রভাব যদিও অপেক্ষাকৃত কম, কিন্তু শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি মাধব কবির ভক্তি খুব বেশী বলিয়া মনে হয়। "জাগরণের" প্রায় প্রত্যেক গানের ধুয়া রাম নামের মাহাত্ম্য প্রচার করিতেছে। "জয় রাম শ্রীমধুসূদন।" "ভাল বীর রাম রাজা ভরে হয়।" "রাম মোর সুন্দর রে।" "রাম পরম ধন জপনারে।" "অতি মধু রাম নাম বাণী।" "রাজা দশরথে রাখিয়াছে রাম নাম বাণী।" ইত্যাদি। চণ্ডী বিষয়ক কাব্যগ্রন্থে বারংবার রাম নামের গুণ কীর্ত্তন শুনিলে মনে হইতে পারে যে কবি অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের উল্লেখ করিয়া তাঁহার কাব্যকে অসঙ্গতি দোষে দুষ্ট করিয়াছেন। এই বিষয়ের আলোচনা করিবার পূর্ব্বে মুকুন্দরামের চণ্ডীতে শ্রীরামচন্দ্রের মাহাত্ম্য কিরূপে প্রচারিত হইয়াছে তদ্বিষয়ে সন্ধান লওয়া আবশ্যক।

মুকুন্দরামের সমকালে শ্রীরামচন্দ্র বোধ হয় বাঙ্গালীর ইষ্ট দেবতারূপে গণ্য হইয়াছিলেন। মুকুন্দরাম চণ্ডীকাব্যের প্রথম ভাগে মহাদেবের ঘরকন্না বর্ণন করিতে গিয়া লিখিয়াছেন,—"রাম ২ স্মরণে পোহাইল রজনী। শয্যা হইতে প্রভাতে উঠিলা শূলপাণি॥" কলিঙ্গের রাজাও রাত্রিকালে দুঃস্বপ্ন দেখিয়া প্রভাতে "রাম ২ স্মরণে" শয্যা হইতে উঠিলেন। গুজরাটের রাজা কালকেতু স্বীয় পুত্র পুষ্পকেতুকে যেদিন রাজ্যে অভিষেক করিলেন সেই স্মরণীয় দিনের উল্লেখ করিয়া কবি লিখিয়াছেন,—"রাম ২ স্মরণে পোহাইল রজনী। প্রভাতে শুনেন বীর কোকিলের ধ্বনি।" ধনপতি খুল্লনার সহিত বাসর ঘরে রাত্রি যাপন করিবার পর, "রাম ২ স্মরণে পোহাইল রাত্তি। শয্যা ত্যজি প্রভাতে উঠিল ধনপতি॥" নিদ্রাভঙ্গে রামভক্তগণ যে কৃত্তিবাসের যুগে রাম নাম স্মরণ করিতেন তাহার প্রমাণ কৃত্তিবাসের ভাষা-রামায়ণে পাওয়া যায়। ভরদ্বাজের আশ্রমে অযোধ্যাভিমুখী রাম-সীতার সাথী বানর সৈন্যগণ চর্ব্ব চোষ্য লেহ্য পেয় আহারান্তে শয়ন করিলেন।

"নানা সুখে হইল নিশার অবসান।
শ্রীরাম শ্রীরাম বলি করে গাত্রোত্থান॥"

(কৃত্তিবাস)

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য, শাক্ত কবি মুকুন্দরামের চণ্ডীকাব্যে পাত্র পাত্রীদের মুখে আমরা প্রতিদিন প্রভাতে রাম নাম শুনিতে পাই কেন? পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, চণ্ডীকাব্যের আসরে মুকুন্দ কবি একাধিক রাজার কার্য্যকলাপ বর্ণন করিয়াছেন। মুকুন্দরাম রাজাদিগের চরিত্রের রীতিমত সমালোচনা করিতে ছাড়েন নাই। কবির সমসাময়িক বঙ্গের শাসনকর্ত্তা রাজা মানসিংহের প্রশংসার পরেই রাজা মামুদ সরিফের নিন্দা করিয়া মুকুন্দরাম সমসাময়িক রাজ-চরিত্রের দুইখানি বিসদৃশ চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। মুকুন্দরামের পূর্ব্বে চারি শত বৎসর ধরিয়া বাঙ্গালী প্রজা বিধর্ম্মী রাজাদের হস্তে নিগৃহীত হইয়া আসিতেছিল। কিন্তু মুকুন্দরামের পূর্ব্বে মাধবাচার্য্য "জাগরণ" কাব্যে আত্মপরিচয়স্থলে লিখিয়াছেন,—"পঞ্চ গৌড় নামে স্থান পৃথিবীর সার। একার্ব্বর নামে রাজা অর্জ্জুন অবতার॥ অপার প্রতাপী রাজা বুদ্ধে বৃহস্পতি। কলি যুগে রাম তুল্য প্রজা পালে ক্ষিতি॥" বাস্তবিক এই মোগল সম্রাট স্বনামপ্রসিদ্ধ আকবরের সময় হইতেই ভারতবাসী প্রজাবৎসল ও সমদর্শী রাজাদিগের জীবন্ত ইতিহাস মুখে মুখে রচনা করিতে আরম্ভ করে। রাজ-চরিত্র সম্বন্ধে সাধারণ লোকের মনের ভাব সেই জন্য মাধবাচার্য্য ও মুকুন্দরাম তাঁহাদের রচিত কাব্যে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। কৃত্তিবাস ভাষা-রামায়ণ রচনা করিবার পরে বাঙ্গালী প্রজা শ্রীরামচন্দ্রের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতে যেমন শিখিয়াছিল, রামচরিত্রের সহিত সেইরূপ তাহারা জীবন্ত রাজাদের চরিত্রের তুলনা করিতে অভ্যস্ত হইয়াছিল। শ্রীচৈতন্যের সময়ে ও তাঁহার পরবর্ত্তী যুগে রামাৎ শ্রেণীর বৈষ্ণবগণের প্রভাব যে বঙ্গদেশে কতকটা আসিয়া পৌঁছিয়াছিল এরূপ অনু-

মানও বোধ হয় নেহাত অসঙ্গত নহে। মাধবাচার্য্যের "জাগরণ" কাব্যে সেইজন্য আমরা বিষ্ণুর অবতার শ্রীরামচন্দ্রের নাম তাঁহার রচিত গানের ধুয়ায় শুনিতে পাই। মাধবাচার্য্য শাক্ত কবি হইলেও বৈষ্ণব ধর্ম্ম ও শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি তাঁহার হৃদয়ের কেমন একটা টান ছিল। মাধব কবি হৃদয়ের আবেগে লিখিয়াছেন,—"সীতা রাম বলি, সদায় আকুলি, এই তনু ধূলায়ে লুটায়।" "করুণা সাগর রাম রাম। হেন হরি নাম নিতে বিধি হৈল বাম॥ পঞ্চ মুখে পঞ্চানন করেন সাধন। অখিল ব্রহ্মাণ্ডপতি ব্রহ্ম সনাতন॥" মুকুন্দরাম শিল্পকলা ও চণ্ডীর মাহাত্ম্য প্রচারের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া অন্য কোনও প্রকার ধর্ম্ম মতকে তাঁহার কাব্যে প্রাধান্য দেন নাই। মাধবাচার্য্য শ্রীরামচন্দ্রকে ধর্ম্মের দিক হইতে দেখিয়াছেন, মুকুন্দরাম তাঁহাকে কর্ম্মের দিক হইতে লক্ষ্য করিয়াছেন। মুকুন্দরামের সময়ে বাঙ্গালার সর্ব্বত্র কর্ম্মময়তা জাগিয়া উঠিয়াছিল। মুকুন্দরাম সেই জন্য কর্ম্মাবতার শ্রীরামচন্দ্রের সুপরিচিত চিত্রগানিকে কৃত্তিবাসের চিত্রশালা হইতে গ্রহণ করিয়া তাঁহার চণ্ডীকাব্যে বিবিধ বর্ণে রঞ্জিত করিয়া বাঙ্গালীর সম্মুখে ধরিয়াছেন।

বাঙ্গালী প্রজা আধুনিক সময়ে অর্থাৎ ইংরাজের আমলে প্রকাশ্যভাবে রাজনীতির আলোচনা করিতে আরম্ভ করিয়াছে, একথা যাঁহারা বলেন তাঁহারা বঙ্গভাষার প্রাচীন কাব্য-সাহিত্যের আভ্যন্তরীন প্রমাণগুলি ঐতিহাসিক সমালোচনার সাহায্যে বিশ্লেষণ করেন নাই। মুকুন্দরামের সমকালে বাঙ্গালী প্রজা যে প্রতাপাদিত্য প্রমুখ বাঙ্গালী রাজাদের চরিত্র ও কার্য্যকলাপ রাজনীতির দিক হইতে প্রকাশ্যভাবে সমালোচনা করিত তাহার প্রমাণ এই কবির চণ্ডীকাব্যে নানা স্থানে ছড়াইয়া রহিয়াছে। দেশের রাজনৈতিক অবস্থার প্রভাব মুকুন্দ কবি ও তাঁহার কাব্যের অভিনেতৃবৃন্দ উপেক্ষা করিতে পারেন নাই। ধনপতি সদাগরের বাসস্থান উজানির রাজা "যেন রঘুরাজা, হেন পালে প্রজা, কর্ণের সমান দাতা।" ধনপতি যখন গৌড়েশ্বরের নিকট আসিলেন তখন তিনি আত্ম-পরিচয় দিয়া বলিলেন, "আমি উজ্জয়িনীতে বাস করি।" উজ্জয়িনীর রাজা "প্রজার পালনে রাম, সমস্ত গুণের ধাম, বিক্রমকেশরী গুণমণি॥ সুশীতল সুধাকর, রামবৎ ধনুর্দ্ধর, রূপে মীনকেতুর সমান। পাত্র তার হরিহর, জনার্দ্দন দ্বিজবর, পুরোহিত বিদ্যার নিধান॥ রাজার কৃপায় রায়, আমি সদাগর তায়, ধনপতি দত্ত অভিধান॥" মুকুন্দরামের "হিরো" (Hero) কালকেতুর রাজচরিত্র কিরূপ? কালকেতুর শত্রু কলিঙ্গের রাজার কোটালের মুখ দিয়া কবি বলিয়াছেন,—"যেন বীর রাম রাজা, দুঃখিত নাহিক প্রজা, কোন চিন্তা নাহিক গুজরাটে।" এমন কি, ভাঁড়ু দত্তও কালকেতুর রাজধানী গুজরাটের বর্ণনা করিতে গিয়া ইসারায় এই রাজার গুণকীর্ত্তন করিয়াছে। "অযোধ্যা সমান পুরী, আমি কি বলিতে পারি, সুবর্ণে জড়িত যেন লঙ্কা।" শ্রীরামচন্দ্র যে মুকুন্দরামের সময়ে বাঙ্গালীর ইষ্টদেবতা স্বরূপ হইয়াছিলেন, ইহা কল্পিত কথা নহে। রাম নাম স্মরণে ভূতের ভয় যেমন নিবারণ হয়, সে সময়ে রাজভয় হইতেও সেইরূপ পরিত্রাণ পাওয়া যাইত। লোকে তখন বিবাদ স্থলেও রামের দিব্য দিয়া সত্য কথা বলিতে অনুরোধ করিত। ধনপতির পুত্র শ্রীপতির সহিত তাহার শিক্ষকের বচসা উপস্থিত হইলে গুরুমহাশয় শিষ্যের প্রতি কটুবাক্য প্রয়োগ করিয়া বলিলেন,—"যদি না বলহ রামচন্দ্রের দোহাই॥ পিতা তোর পরবাসে তোমার জনম। নাহি জান আপনার জাতির মরম॥" কবিকঙ্কণ শ্রীরামচন্দ্রের রাজ-চরিত্র ও তাঁহার নামের গুণ চণ্ডীকাব্যে অলঙ্কারের খাতিরে কেবলমাত্র আভাসে প্রকাশ করিয়া ক্ষান্ত হন নাই। সূর্য্যবংশের ইতিহাস তিনি কৃত্তিবাসি রামায়ণে উত্তমরূপ পাঠ করিয়াছিলেন। তিনি চণ্ডীকাব্যে একাধিক বার সূর্য্যবংশের উল্লেখ করিয়াছেন। মুকুন্দরামের শুক পক্ষীটিও রামায়ণে সূর্য্যবংশের কথা শুনিয়াছে। শুক কহিল,—"সকল বিদ্যার ধাম, ভানুবংশে রাজা রাম, কোদণ্ড ধরেন রঘুমণি। রাম সহ গেল বন, সীতা নিল দশানন, রামায়ণে এই কথা শুনি॥" কৃত্তিবাসি রামায়ণের লঙ্কাকাণ্ডে যে সকল যুদ্ধের বিবরণ স্থান পাইয়াছে মুকুন্দরাম সেগুলি যে উৎসাহের সহিত পাঠ করিয়াছিলেন তাঁহার প্রমাণ তাঁহার রচিত চণ্ডীকাব্যে পাওয়া যায়। "কালকেতুর

সহিত কলিঙ্গের রাজার যে যুদ্ধ হয় তাহাতে কবির সময়ের যুদ্ধাস্ত্র কামান যেমন ব্যবহৃত হইয়াছিল, সেই সঙ্গে রামায়ণে বর্ণিত বহুবিধ অস্ত্রসস্ত্রও সেইরূপ ব্যবহৃত হইয়াছিল। এই যুদ্ধে স্বয়ং দেবী রণাঙ্গণে অবতীর্ণা হইয়া কালকেতুকে সাহায্য করিয়াছিলেন। সিংহলের রাজা শালিবাহনের বিরুদ্ধে দেবী ভবানী যে অভিযান করেন তাহার বর্ণনাতেও আমরা কামান ও পৌরাণিক অস্ত্রসস্ত্রের উল্লেখ দেখিতে পাই। রামায়ণের যুদ্ধের জন্ত কৃত্তিবাস যে সকল বাদ্যভাণ্ড সংগ্রহ করিয়াছিলেন তাহাদের মধ্যে অনেকগুলি মুকুন্দরামের সময়ে অব্যবহার্য্য হইলেও চণ্ডীকাব্যের কবি সেগুলিকে অপেক্ষাকৃত আধুনিক সময়ের যুদ্ধে ব্যবহার করিয়াছেন। বিবাহাদি সামাজিক উৎসব উপলক্ষে আমরা কৃত্তিবাসি রামায়ণ ও চণ্ডীকাব্যে যে "বেয়াল্লিশ বাজনা" শুনিতে পাই তাহা বোধ হয় পৌরাণিক বাদ্যের প্রতিধ্বনি নয়। কৃত্তিবাস ও মুকুন্দকবি উভয়েই তাঁহাদের জীবদ্দশায় বঙ্গদেশে এই "বেয়াল্লিশ বাজনা" বা "ঢুল ব্যাণ্ড" শুনিয়া থাকিবেন। মুকুন্দরাম কিন্তু পৌরাণিক অস্ত্রসস্ত্র ও বাদ্যভাণ্ডের ব্যবহার চণ্ডীকাব্যের যুদ্ধে প্রচলিত করিয়া তাঁহার কাব্য-শিল্পের উৎকর্ষ সাধন করিয়াছিলেন। কবিকঙ্কণ বুঝিয়াছিলেন যে, ষোড়শ শতাব্দীর বঙ্গভাষার ধর্ম্মপুস্তকে পৌরাণিক যুগের ইতিহাস হইতে মাল মসলা সংগ্রহ করিয়া সাজাইয়া না রাখিলে দেবীর অলৌকিক কার্য্যের প্রভাব শ্রোতাগণের হৃদয়ে মুদ্রিত হইবে না। মুকুন্দরামের চণ্ডীকাব্যে যুদ্ধের বিবরণ পাঠ করিতে করিতে আমাদের কল্পনা জাগিয়া উঠিয়া পৌরাণিক জগতে বিচরণ করিতে থাকে, আমাদের মনে হয় যে কবি পুরাবৃত্তে লিখিত কোনও যুদ্ধের বিবরণ শুনাইতেছেন। মুকুন্দরামের স্থায় ইংরাজি ভাষার কবি-বিশেষ কাব্য-শিল্পের খাতিরে এই প্রকার উপায় সময়ে সময়ে অবলম্বন করিয়াছেন। ইংরাজ কবি স্পেন্সারের রচিত "পরী রাণী" (Spenser's Fairy Queene) এই প্রকার শিল্পকলার সুন্দর উদাহরণ। মাধবাচার্য্যের "জাগরণে" যুদ্ধের বর্ণনা আছে বটে, কিন্তু সে যুদ্ধ রামায়ণের যুদ্ধের তুলনায় সামান্ত হাতা-হাতামা মাত্র। মাধব কবির চণ্ডীর সহিত মঙ্গল দৈত্যের যে যুদ্ধ হইয়াছিল তাহার বর্ণনা কবি দুই চারি ছত্রেই শেষ করিয়াছেন। কলিঙ্গের রাজার সহিত কালকেতুর যে যুদ্ধ হয় "জাগরণ" কাব্যে তাহার বিবরণ পাঠ করিয়া আমরা জানিতে পারি যে, উভয়-পক্ষ গুলি শর ও বর্শা ব্যবহার করিয়াছিল, কিন্তু পৌরাণিক অস্ত্রসস্ত্রের ব্যবহার সম্বন্ধে মাধবাচার্য্যের সৈন্তগণ সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ছিল। ফল কথা, ইংরাজ কবি স্পেন্সার যে শিল্পের সাহায্যে চসারের (Chaucer) কাব্য-কানন হইতে ও বাঙ্গালী কবি মুকুন্দরাম কৃত্তিবাস রূপ বৃক্ষ হইতে শব্দ-প্রসূন আহরণ করিয়া তাঁহাদের রচিত কাব্যোদ্যানের শোভা বর্দ্ধন করিয়াছিলেন, মাধবাচার্য্য সেই শিল্প সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ না হইলেও অলৌকিক ঘটনার বর্ণনায় তাহার সাহায্য লইয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না।

মুকুন্দরামের চণ্ডীকাব্যের নায়ক নায়িকা ও পাত্র পাত্রীরা কৃত্তিবাসের রামায়ণ হইতে যে কত নীতি-কথা শিক্ষা করিয়াছেন, আবশুক মত কত দৃষ্টান্ত তাঁহারা সংগ্রহ করিতে পারেন তাহার সংখ্যা হয় না। কালকেতুর পত্নী ফুল্লরা ছদ্মবেশী ভবানীকে বলিতেছেন যে, (স্বামী স্ত্রীকে তিরস্কার করিতে বা শাস্তি দিতে পারে, তাহাতে স্ত্রীর রাগ বা অভিমান করা উচিত নয়) তুমি স্বামীর নিকট ফিরিয়া যাও। "শুনগো ২ সই, হিতবাণী তোরে কই, ইতিহাসে কই অবগতি॥ রাবণ বধিয়া রাম, সীতাকে আনিল ধাম, করাইল পরীক্ষা দাহনে। লোকবাদ খণ্ডিবারে, বনবাস দিল তারে, আদেশিয়া সুমিত্রা নন্দনে॥ পঞ্চমাস গর্ভকালে, সাধ খাওয়াবার ছলে, লয়ে গেলা লক্ষ্মণ কাননে। শুনগো দারুণ কথা, কাননে ছাড়িয়া সীতা, পুন বীর আইল ভুবনে॥" ফুল্লরা এই দৃষ্টান্ত দিয়া ভবানীকে বলিলেন,—"ছাড়িয়া পতির পাশ, আইলা পরের বাস, আপনার কি সাধিতে মান?" ভগবতী ফুল্লরার বক্তৃতা শুনিয়াও ব্যাধের গৃহ হইতে নড়িলেন না। তিনি বলিলেন,—"আছিলাম একাকিনী বসিয়া কাননে। আনিল তোমার স্বামী বান্ধি নিজ গুণে।" ইতিপূর্ব্বে গোধিকা-রূপিণী ভগবতীকে যে কালকেতু ধনুকের গুণে বাঁধিয়া আনিয়াছিলেন, ফুল্লরা তাহা বুঝিতে না পারিয়া কাঁদিয়া

আকুল হইলেন। দ্রুতগতি গোলাঘাটে গিয়া ফুল্লরা কালকেতুকে নয়নের জলে বলিতে লাগিলেন,—"কি লাগিয়া প্রভু তুমি পাপে দিলা মন। আজি হৈতে হৈলা তুমি লঙ্কার রাবণ॥ আজি হৈতে বিধাতা হইল মোর বাম। তুমি হৈলা রাবণ বিপক্ষ হৈল রাম॥" কালকেতু ফুল্লরার কথা শুনিয়া যেন আকাশ হইতে ভূমিতে পড়িলেন। তিনি তাড়াতাড়ি গৃহে আসিয়া দেখেন যে, ফুল্লরা যাহার কথা বলিয়াছেন সেই সুন্দরী তাঁহার ভাঙ্গা কুঁড়েখানি আলো করিয়া বসিয়া আছেন। কালকেতু দেবীকে বলিলেন যে, বোধ হয় তিনি পথ ভুলিয়া ব্যাধের ঘরে আসিয়াছেন। "কিবা পথ পরিশ্রমে, আইলা দিগের ভ্রমে, আয়াস ছাড়িতে এই ঘর। চল বন্ধুজন পথে, ফুল্লরা চলুক সাথে, পাছে লয়ে যাব ধনুঃশর॥ সীতা গো পরম সতী, তার শুন দুর্গতি, দৈবে ছিলা রাবণ ভবনে। রণে রাম তারে হানি, সতী জানকীরে আনি, তবে সে আনিল নিকেতনে॥ রজকের শুনি কথা, পরীক্ষা করায়ে সীতা, পুনরপি পাঠান কাননে।" রাম সীতা ও রাবণ সম্বন্ধে ফুল্লরা ও কালকেতুর উক্তিগুলি মুকুন্দরাম নাটকীয় শিল্প কৌশলে কেমন সুন্দরভাবে চণ্ডীকাব্যে বুনিয়া দিয়াছেন! সীতার অগ্নি-পরীক্ষার কথা বাল্মীকির রামায়ণে আছে। রজকের মুখে সীতার অপবাদ শুনিয়া রাম সাধ খাওয়াইবার ছলে তাঁহাকে বনবাসে পাঠাইয়াছিলেন, একথা বাল্মিকী বলেন না। কৃত্তিবাস ভাষা-রামায়ণে এই নূতন কথা রচনা করিয়াছেন। মুকুন্দরাম কৃত্তিবাসকে অনুসরণ করিয়া চণ্ডী কাব্যে ইহা উল্লেখ করিয়াছেন। মুকুন্দরাম উপরোক্ত যে দৃশ্যে ভগবতী, কালকেতু ও ফুল্লরার ছবি আঁকিয়াছেন মাধবাচার্য্য তাঁহার "জাগরণ" নামক চণ্ডীকাব্যের সেই দৃশ্যে এই তিনখানি ছবি আঁকিয়াছেন বটে, কিন্তু মাধব কবির কালকেতু ও ফুল্লরা কৃত্তিবাসের রামায়ণ হইতে উদাহরণ সংগ্রহ করিয়া নিজেদের উক্তি বা যুক্তিকে অলঙ্কৃত ও মনোজ্ঞ করিতে জানেন না। মাধবাচার্য্যের ফুল্লরা ভগবতীকে গালাগালি করিয়াছেন। তাঁহার কালকেতু জিজ্ঞাসিলেন,—"কে তুমি?" ভগবতীর নিকট কোনও উত্তর না পাইয়া তিনি বলিলেন,—"বাণ মারিয়া আজু লইব জীবন।" বাস্তবিক, মাধবাচার্য্য ও মুকুন্দরামের শিল্পকলায় যে কত প্রভেদ, মুকুন্দরাম মাধবাচার্য্য হইতে যে কত বড় কবি, তাহা কৃত্তিবাসের মাপ-কাটিতে স্পষ্ট বুঝা যায়। মাধবাচার্য্যের ফুল্লরা ও কালকেতু যে রামায়ণ পাঠ করেন নাই তাহা নহে। মাধব কবির ফুল্লরা ভগবতীর সম্মুখ হইতে স্বামীর নিকট ছুটিয়া আসিয়া তাঁহাকে যাহা বলিলেন ও রামায়ণ হইতে সেই সঙ্গে যে উদাহরণ দিলেন তাহাতে তাঁহার মনের ভাবটি অস্পষ্টতর হইয়া গিয়াছে। "বালি বানর অধিকারী, হরিল ভায়ের নারী, তাহা আছে বিদিত সংসারে। পূর্ব্ব কৃত পুণ্য ছিল, তেঁই বিধি ঘুচাইল, সংহারিল রঘুনাথের শরে॥ নিশাচর অধিপতি, হরিলেক সীতা সতী, বিকল হইয়া কাম বাণে। গাজিলেক দাশরথী, কপিকুল সঙ্গতি, উদ্ধারিলা বধিয়া রাবণে॥" মুকুন্দরামের ফুল্লরা এরূপ অসংলগ্ন কথা কহিতে জানেন না। বাস্তবিক, মুকুন্দরাম কৃত্তিবাসি রামায়ণে লিখিত নিয়মগুলি এমন গভীরভাবে পাঠ করিয়াছেন যে আবশ্যক মত সেগুলিকে তিনি অনায়াসে তাঁহার কাব্য-শিল্পের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির জন্য ব্যবহার করিতে পারেন। আমরা মুকুন্দরামের সহিত চণ্ডীকাব্যের ভিতর দিয়া যতই অগ্রসর হইতে থাকি, কৃত্তিবাস রূপ কল্পতরুর ছায়া ততই ঘনীভূত হইতেছে দেখিতে পাই।

হতভাগা।

[শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী]

(১)

অদূরে প্রবাহিতা ভাদ্রের ভরা জাহ্নবী, দুপাশে শ্যামল তট, কত গাছ; কত ঝোপ। কোথাও ঘন বাঁশবনের পাশে পাশে ছোট কুটীরশ্রেণী, ঘাটে যাইবার সরু গ্রাম্য পথটা আঁকিয়া বাঁকিয়া নদীতট হইতে একটী রেখার মত গিয়া তার পর বহু ভাগে বিভক্ত হইয়া গিয়াছে।

ওই বাঁশবনের ধারে একটা ছোট কুটীরে রাখাল তাহার পিতা ও সৎমায়ের নিকট বাস করিত। রাখালের পিতা বৃন্দাবন ধীবর ছিল ; প্রত্যেক দিনেই সে মাছ ধরিয়া নদী পার হইয়া সহরের বাজারে বিক্রয় করিতে লইয়া যাইত। তাহার অসুখ হইলে কখনও কখনও রাখালের সৎমা লক্ষ্মীও বাজারে যাইতে বাধ্য হইত, তথাপি রাখালকে কেহ বাজারে পাঠাইতে পারিত না।

গ্রামের নাম জগন্নাথপুর, সেথান হইতে বহরমপুর সহরটা বড় বেশী দূর ছিল না, মাঝে নদীটা থাকায় যা একটু বাধা হইয়াছিল। গ্রামবাসীরা নদী পার হইয়া কলাবেড়ে ঘাটে পৌছাইত, সেথান হইতে বরাবর বাঁধ ধরিয়া তাহারা সহরের বাজারে গিয়া উঠিত। বামপার্শ্বে বরাবর থাকিত নদী, দক্ষিণে কত মাঠ, গ্রাম পড়িত।

রাখাল সহরের কোলাহলের মধ্যে প্রাণসত্ত্বে যাইতে চাহিত না। অন্ত সময় তাহাকে মাথার দিব্য দিয়া মারিয়া ভাত না খাইতে দিয়া, কিছুতেই সহরে পাঠানো যাইত না, কিন্তু যখন সহরে কোনও পর্ব্বের দিন আসিত—তখন ? সে আর এক কথা। দুর্গা পূজার সময় সেই চারটা দিন, সরস্বতী পূজার সময় ভাসানের দিন, কার্ত্তিক পূজার বিসর্জ্জনের দিন, মহরমের সময়—ইত্যাদি নাম-প্রসিদ্ধ উৎসবগুলিতে সে যেন সে গ্রামের ছেলেই না। সারা দিন রাত সে যে কোথায় থাকিত তাহার ঠিক ছিল না।

জেলের ঘরের ছেলে সে, কিন্তু সেদিক দিয়াও সে যায় নাই। এই বার তের বৎসর সে কেবল দেখিয়াই আসিতেছে তাহারা রাপ মাছ ধরে, বাজারে যায়, তাহার মাও যায়। রাখাল কোনও দিন নিজে বাজারে গিয়া মাছ বিক্রী করার কথা মুখেও আনে নাই।

ঘন কৃষ্ণ তাহার গাত্রবর্ণ, বার্ণিশ করার মত চিক্কণ। মাথায় বড় বড় কৃষ্ণ চুল। বাবুগিরির দিকে তাহার দৃষ্টিটা বেশ তীক্ষ ছিল, তাই প্রত্যেক দিনই স্নানান্তে সে তাহার ছোট্ট আয়নাখানা লইয়া কাঠের কাঁকই দ্বারা সেগুলাকে আঁচড়াইয়া আঙুল দিয়া স্তবকে স্তবকে কুঞ্চিত করিয়া দিত। তাহার পরণের সেই তাঁতের বোনা ছোট্ট সাতহাতি কাপড় খানা বেশ গুছাইয়া পরিত, কাঁধের গামছাখানা পরিপাটী রূপে ভাঁজ করিয়া কাঁধের উপর ফেলিয়া সৎমায়ের অশ্রদ্ধার দান ভাত বেশ নির্ব্বিবাদে খাইয়া পাড়ায় পাড়ায় ঘুরিয়া বেড়াইত।

সংসারের কোনও কাজে সে হাত দিত না, কিন্তু পরের কাজে সে বড় উৎসাহী ছিল। কাহার অসুখ হইয়াছে, সমস্ত দিন রাত সে সেখানে। কাহারও বাড়ী কোনও কাজ পড়িয়াছে, সে কোমর বাঁধিয়া সেখানে কাজ করিয়া দিত।

অবকাশের স্থান তাহার ছিল নদীতীরে বাঁশবনের স্নিগ্ধ ছায়াটা। চারিদিক হইতে আপনাকে মুক্ত করিয়া আনিয়া সে এইখানে আপনাকে নিঃশেষে দান করিয়া ফেলিত। শ্রান্তভাবে বাঁশের ছায়ায় শুইয়া পড়িয়া হাতের উপর মাথা রাখিয়া সে উদাস নয়নে চাহিত।

কি শান্ত সুন্দর স্থানটা! সম্মুখে পুণ্যতোয়া জাহ্নবী, স্রোতের পরে স্রোতগুলি একে একে চলিয়া যাইতেছে, পিছনে কি রহিয়া গেল তাহা দেখিবার জন্ত আর একবারও মাথা ফিরাইয়া দেখে না। দু'ধারে কত জীবন্ত ছবি দেখিবার অবকাশ তাহার একটু নাই। ওপারে বাঁধের ধারে ধারে বাঁশ ঝোপ, আম কাঁঠালের বাগান, এপার হইতে দেখা যায় বড় সুন্দর, এ সুন্দরের তুলনা নাই। নদীর জলে ছায়া ফেলিয়া নীল আকাশের গায়ে কত পাখী সারাদিন যাওয়া আসা করে, তাহাও তেমনি সুন্দর। নদীর তীরে মাঠে গাভীগুলি চরিয়া বেড়ায়, তৃষ্ণা পাইলে নদীর জল প্রাণ ভরিয়া পান করে। তাহাদের ক্ষুধার আহার, তৃষ্ণার জল প্রকৃতি এখানে সর্ব্বদাই সঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছে।

আপনা হারাইয়া রাখাল এখানে বসিয়া থাকিত। কোন্‌টা রাখিয়া সে কোন্‌টা দেখিবে, তাহা ভাবিয়া পাইত না।

সে প্রভাতে গৃহ ছাড়িয়াই আগে তাহার বাঞ্ছিত এই স্থানটাতে ছুটিয়া আসিত, প্রভাতের তরুণ-রবির অরুণ-কিরণ গাছের পাতায়, নদীর তরঙ্গের উপর কেমন করিয়া ঝিকিমিকি করিয়া জলে তাহাই দেখিবার জন্ত। সন্ধ্যার সময় ছুটিয়া আসে অস্তমিত রবির শেষ দান আলোটুকু

প্রকৃতি-রাণীর মুখখানাকে কতটুকু প্রফুল্লিত করে তাহাই দেখিবার জন্য।

প্রত্যেক দিন দেখিয়া দেখিয়া আশা তাহার মিটে না, সে আরও দেখিতে চায়, আপনাকে ওই অসীম সৌন্দর্য্যের মাঝে একেবারে বিলাইয়া দিতে চায়।

সে পাঠশালায় মাঝে মাঝে যাইত, একটু আধটু লেখাপড়াও শিখিয়াছিল, সহরে গিয়া গানও শিখিয়াছিল। তাহার মত প্রকৃতি-প্রেমিকের প্রকৃতির লীলার গান বড় ভাল লাগিয়াছিল, তাই সে যত্ন করিয়া তাহাই শিখিত। বিভোর প্রাণে দেখিতে দেখিতে সে নূতন শেখা গান বার বার গাহিয়া উঠিত।

তাহার পিতা তাহাকে শাসন করিয়া পারিত না, মাতা তাহাকে নানাপ্রকারে লাঞ্ছনা করিয়া, ভাত না খাইতে দিয়াও পারিত না। সে নিজের খেয়াল মতে নিজে চলিত, কাহারও মত লইত না। এমনি করিয়া তাহার কবে বাল্যকাল চলিয়া গেল, কৈশোর আসিয়া পড়িল তাহা সে একবার চোখ তুলিয়াও দেখিল না। প্রকৃতির হাতের রং যে তাহার সর্ব্বাঙ্গে ছড়াইয়া পড়িয়াছে তাহা দেখিতে গেলে তাহার প্রকৃতি দেখা হয় কই।

সংসারে যে দু'জন তাহার বড় বেশী আপনার নামে খ্যাত, সেই দুজনাই ছিল তাহার কাছে বড় পর। সে স্বেচ্ছায় আর সকলের কাছে ধরা দিয়াছে, ধরা দিতে পারে নাই শুধু পিতামাতার কাছে। বড় হইয়াও সে তেমনি তফাতেই থাকিয়া গেল। পিতা মাতাও তাহাকে পাইবার জন্য ব্যাকুল আগ্রহ প্রকাশ করিল না, সেও তাহাদের কাছে ধরা দিবার জন্য উদ্বেগ ব্যাকুল হইল না।

(২)

সংসারে আসিয়া সে কাহারও কাছ হইতে যথার্থ স্নেহের কথা একটাও পায় নাই। তাহার মা তাহাকে তিন মাসেরটী রাখিয়া ইহলোক ত্যাগ করিয়াছে, সে তিন মাসের যত্ন তাহার কাছে একেবারেই অজ্ঞাত। তাহার পিতা তাহাকে নেহাৎ ফেলিয়া দিতে পারিল না, নিজের এক মাসীর নিকট রাঙামাটী গ্রামে তাহাকে দিয়া আসিল এবং আবার বিবাহ করিয়া সুখে ঘর সংসার করিতে লাগিল।

মাসীর কাছে সে ছিল বেশ, ছয় সাত বৎসর বেশ সে কাটাইয়া দিয়াছিল, তাহার পর তাহার পরলোকান্তে অগত্যা পিতা তাহাকে নিজের কাছে আনিল, এবং বিষয় কর্ম্ম শিখাইতে যত্নবান হইল, কিন্তু ছেলের অবস্থা দেখিয়া সে সব আশা ছাড়িয়া দিল।

গ্রামের লোক—যাহারা এই ছেলেটির কাছ হইতে সেবা পাইত, কাজ পাইত, তাহারাও গোপনে তাহাকে অলস, অন্নধ্বংসকারী প্রভৃতি বিশেষণে বিশেষিত করিত।

প্রকৃত ভালবাসা সে আর কাহারও কাছে পায় নাই, পাইয়াছিল একটী ছোট মেয়ের কাছে।

মেয়েটীর ভাল নাম নাকি ছিল শ্রান্তি, কিন্তু অপভ্রংশ হিরা কথাটাই সকলের মুখে চলিত। শ্রান্তি নাম কে রাখিয়াছিল তাহা খুঁজিলে পাওয়া যায়। শুনা যায় তাহার মা যখন ছোট্ট মেয়েটীকে বুকে বাঁধিয়া মাছের ডালা মাথায় লইয়া বাজারে দৌড়াইত, তখন ফুটফুটে সুন্দর মেয়েটীকে দেখিয়া কোন ভদ্রলোক এই নাম দিয়াছিলেন। ভদ্রলোকে তাহার মেয়ের নামকরণ করিয়াছে, যেহেতু তাহার মেয়ে বড় সুন্দরী, সুতরাং মা সগর্ব্বে এই নামটাই বাহাল রাখিল; কিন্তু ওরকম নাম উচ্চারণ করা বড় কঠিন, শ্রান্তির নাম প্রথমতঃ হেরানতি, তারপর ক্রমেই হিরাতে পরিণত হইল।

হিরা ছোটবেলা হইতে রাখালের সাথে সাথেই ঘুরিত। রাখালের কাছে অনেক প্রহার, অনেক উৎপীড়ন সে সহ্য করিয়াছে, কিন্তু কখনও সেকথা সে মনে করিয়া রাখে নাই বা অপর কাহাকেও জানিতে দেয় নাই। অনেক দিন অনেক নিদারুণ প্রহারের চিহ্ন তাহার গাত্রে দেখা গিয়াছে। কে প্রহার করিল, তাহার উত্তরে সে হয় জানাইত পড়িয়া গিয়া হইয়াছে, নয় একেবারেই নীরব হইয়া যাইত।

রাখাল কোনও দিনই মেয়েটার দিকে তাকায় নাই, তাকাইবার প্রয়োজনও হয় নাই। কোনও দিন সে না আসিলেও তাহার ক্ষতি হইত না, আসিলে বরং একটু

খাওয়া হইত। যেখানে যাহা পাইত হিরা তাহা রাখালের জন্ত লইয়া আসিত; রাখাল তাহা না খাইলে তাহার কিছুতেই শান্তি হইত না।

সেদিন দুপুরে রাখাল ভাদ্রের ভরা নদীর ধারে সেই বাঁশবনের মাঝে একটী ছায়াযুক্ত স্থানে বসিয়াছিল। মাথার উপর একটা দোদুল্যমান বাঁশের আগায় একটা হরিদ্রা রঙ্গের পাখী ডাকিতেছিল। অনতিদূরে কোথা হইতে তাহার জাতীয় আর একটা পাখীও তাহার উত্তর দিতেছিল। আকাশ সুনীল, তাহার কোলে কত পাখী উড়িতেছে, উড়িতে উড়িতে মেঘের কোলে কোথায় বিলীন হইয়া যাইতেছে। ঝর ঝর করিয়া এক একবার বাতাস আসিতেছে, সর সর করিয়া গাছের পাতাগুলো কাঁপাইয়া দিয়া চলিয়া যাইতেছে।

গাঙ্গের লাল জলের উপর দিয়া পাল তুলিয়া বড় ছোট কত নৌকা যাতায়াত করিতেছে। আরোহীরা মুখ বাড়াইয়া দুই ধারের সুন্দর দৃশ্য দেখিয়া লইতেছিল। মুগ্ধ নয়নে রাখাল চাহিয়া দেখিতেছিল।

আজ তাহার প্রাণে একটুও শান্তি ছিল না। গ্রামের আবদুল্লা সেখের পুত্রটীর কলেরা হইয়াছিল, কেহই তাহাকে দেখিতে যায় নাই। বৃদ্ধ আবদুল্লা যখন আকাশ পাতাল ভাবিয়া কূল পাইতেছিল না, তখন রাখাল সেখানে গিয়া পড়িল।

এ সব কাজে রাখালের ভারি উৎসাহ ছিল, তাহার অলসতা একটুও থাকিত না। সে সেখানে গিয়া রোগীর ভার লইল। সহর হইতে ডাক্তার ডাকিয়া আনা, দশবার ঔষধ লইয়া আসা, রোগীর সেবা অক্লান্ত পরিশ্রমে সে করিতে লাগিল।

কিন্তু কিছুতেই ছেলেটীকে সে বাঁচাইতে পারিল না। আজ সকালেই সে মারা গিয়াছে।

গ্রামের লোকে সকলেই তাহাকে সে ভয়ানক রোগের সেবার ভার লইতে নিষেধ করিয়াছিল, অনেকে ভয়ও দেখাইয়াছিল, কিন্তু সে কিছুতেই দমিয়া যায় নাই।

ছেলেটী যখন মরিয়া গেল তখন সে বাহির হইল। বাড়ীতে পদার্পণ করিবামাত্র লক্ষ্মী চীৎকার করিয়া উঠিল —ওগো দেখ তোমার ছেলে এসেছে বাড়ী।

বৃন্দাবন গৃহমধ্য হইতে বাহির হইয়া আসিল। হস্তধৃত থেলো হুঁকাটায় একটা টান দিয়া ধূমরাশি ছাড়িয়া দিয়া বলিল, "কি করতে এসেছিস বাড়ী, যা বেরো।"

রাখাল চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

লক্ষ্মী তেমনি কাংস্যকণ্ঠে বলিল, "মড়া ছুঁয়ে এল বাড়ীতে, একটা ডুব ইস্তক দিয়ে আসে নি গা; এতে বাড়ীর কল্যেণ হবে কি করে? যত সব ভূত মরতে এসেছে আমার বাড়ী। জাতের মড়া নয়, হিঁদুর মড়া নয়, জলজ্যান্ত মুসলমানের মড়া গো—যাদের ছুঁলে চান করতে হয়। ও মা মা, আমি কমনে যাব! হাঁ করে তাকিয়ে রয়েছ কি? যেতে বল বলছি, আমার ঘরে আমি কক্ষনো ওকে উঠতে দেব না।"

বৃন্দাবন কিছু বলিবার আগেই রাখাল সে স্থান ত্যাগ করিল।

তাহার হৃদয়ে আজ যথার্থ বড় আঘাত লাগিয়া গেল। ইহার চেয়ে বেশী আঘাতদায়ক কথাও সে শুনিয়াছে, কিন্তু তাহা এত মর্ম্মবিদারক হয় নাই, আজ একে মনটাই তাহার বড় খারাপ ছিল, তাহার উপর এই সব কথা, তাহার বুকটা যেন ফাটিয়া যাইতে চাহিতেছিল।

আজ এইখানে বসিয়া রাখাল ভাবিতেছিল—আজ যদি তাহার মা থাকিত! তাহার মা হইলে কখনই তাহাকে এমন করিয়া তাড়াইয়া দিতে পারিত না। হায়, তাহার যদি একটা বোনও থাকিত, আজ এ সময়ে সেই তো তাহাকে সান্ত্বনা দিতে পারিত। ভগবান এমন সুন্দর পৃথিবীটা গড়িলেন, একটুখানি তাহার জন্ম কেন অসম্পূর্ণ রাখিয়া দিলেন, কেন তাহার মা রহিল না, কিম্বা একটা বোন রহিল না?

পশ্চাতে সর সর শব্দ শুনিয়াও সে মুখ তুলিল না। চুপি চুপি আসিয়া হিরা তাহার পিছনে দাঁড়াইল। তাহার অঞ্চলে বাঁধা কয়েকটা পেয়ারা, এগুলি সে রাখুদাকে দিতে আসিয়াছে। কিন্তু এমন সাহস তাহার নাই যে তাহাকে ডাকিয়া দিবে। সে দেখিয়া ভারি আশ্চর্য্য হইল, রাখাল নাক ঝাড়িল, এবং গামছাখানা দিয়া চোখ মুছিল।

সে আপনাকে গোপন করিয়া আর রাখিতে পারিল

না, একেবারে সামনে আসিয়া বিস্ময়ের সুরে বলিয়া উঠিল, "তুমি কাঁদছ রাখু দা?"

সহসা সম্মুখে তাহাকে দেখিয়া অষ্টাদশ বর্ষীয় কিশোর রাখাল একেবারে অপ্রস্তুত হইয়া পড়িল। দুঃখটা রাগের আকারে মুহূর্ত্তে পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল; তবু সে প্রথমটা কিছুই বলিল না, শুধু তাহার মুখপানে তাকাইয়া রহিল।

হিরা তাহার মনের হঠাৎ পরিবর্ত্তনের কথা কিছুই বুঝিতে পারিল না, বলিল, "কাঁদছ কেন রাখু দা, তোমায় তোমার বাবা মেরেছে?"

"হ্যাঁ, মেরেছে, পোড়ামুখী, ফের মরতে এসেছিস আমার কাছে? বেরো বলছি, যা এখনও।"

এ রাগের কারণ কিছুই বুঝিতে না পারিয়া হিরা অবাক হইয়া তাকাইয়া রহিল।

"গেলি নে এখনও, দেখবি তবে?"

বলিয়াই লাফাইয়া উঠিয়া গোঁয়ার রাখাল হিরার পিঠে বেশ গোটাকত কীল চড় উপহার দিল, শেষে একটা ধাক্কা মারিয়া বলিল, "বেরো এখনি—যা।"

হিরা পড়িয়া গেল, উঠিয়া একটা কথাও না বলিয়া যেমন ধীর পদে আসিয়াছিল তেমনিই চলিয়া গেল।

বীরত্বের পরিচয় একটী একাদশ বর্ষীয়া বালিকাকে দিয়া রাখাল আবার শান্ত হইয়া বসিল।

মনটা তাহার একেই খারাপ ছিল, হিরাকে মারার পরে আরও খারাপ হইয়া গেল, কারণ সে দেখিতে পাইল হিরার আঁচলের অর্দ্ধপক্ক পেয়ারা কয়টা তাহারই খুব কাছে পড়িয়া আছে। হিরা যে তাহারই জন্য পেয়ারা আনিয়াছিল তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ ছিল না।

রাখাল পেয়ারা কয়টা কুড়াইয়া লইয়া চর্ব্বণে প্রবৃত্ত হইল, আর হিরার উপর তাহার অন্যায় আচরণের কথা ভাবিয়া যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইতে লাগিল।

(৩)

বৃন্দাবন প্রাঙ্গণে বসিয়া দা দিয়া কতকগুলা শুষ্ক গাছের ডাল রন্ধনের জন্য ব্যবহৃত হইবার জন্য ছোট ছোট করিয়া কাটিতেছিল আর নিকটে আসনে তামাক সেবনে রত মাধবকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছিল, "কালে কালে কতই হবে দাদা, কতই দেখতে শুনতে হবে। আমার ছেলেটী যেন একটা নবাবপুত্তুর। সেটাকে বললে যদি একটা কথা শোনে। খাইয়ে হাতীর গতর হয়েছে, দাদা, খাটবার মুরোদ ওই পর্য্যন্ত। ঘরের একটা কুটো ভেঙ্গে দুখানা করতে পারে না, গেলবার সময় বসবে যখন—দেখবে সে এক পাথর। অত বড় যুগ্যি ছেলে গো দাদা, আমরা অমনি সময়ে সকাল হতে রাত এগারটা পর্য্যন্ত কাজ করেছি, আর ও ছেলে কিছু করবে না। বললে আবার গোঁসা কত।"

মাধব বলিল, "আরে ভাই, আজ কাল কি সে দিন আছে? ছেলেরা বসে থাকবে, আমরা খেটে দেব তবে হবে। সারাডা দিন ক্ষেত খামারের কাজ করি, ছেলে-ডারে যদি বলি একটু ক্ষেতে যা, ছেলে বলে রোদের তাত সয় না। বিষ্টি লাগলে তানাদের হঁরদি হয়, রোদ লাগলে মাথা কামড়ায়। তোমার ছেলেডাও অমনি না হবে কেন? সে ছোঁড়া কোথায়?"

বৃন্দাবন চুপি চুপি হাত তুলিয়া দেখাইল ওই ঘরে। মুখে বলিল, "সে দিন আবদুল্লা মিঞার ছেলের ওলাবিবি হয়েছিল না, হাজার বার বলনু বাপা যাস নে। ওমা, স্রোতের আগে টেঁপা ভাসে; ছেলে অমনি সেখানে। মড়াটা যখন উঠোনে তখন এল বাড়ী। ওর গঙ্গা-ধ্যাড়ানি—না ওর ওই মা যেই বলেছে গঙ্গায় একটা ডুব দিয়ে আসতে, অমনি ছেলে ভোঁ দৌড়। বিকেল বেলা খুঁজে খুঁজে বাঁশবনের মধ্যে আছে জেনে নিয়ে এনু।"

রাখাল গৃহ ত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিয়া পিতার হাত হইতে দা লইয়া বলিল, "তুমি উঠো, আমি কাঠ কেটে দেব।"

পিতা বলিল, "এ হয়ে গেছে, তোকে আর দেখতে হবে না। ওখানে গাছটা কাটা পড়ে আছে, সেটা কাটতে গেলে হাতীর গতর পড়ে যাবে বুঝি?"

কোনও কথা না বলিয়া রাখাল দাওয়া হইতে কুড়াল লইয়া চলিয়া গেল।

সমস্ত দিন সে অক্লান্ত পরিশ্রমে গাছটা কাটিয়া ফেলিল, তাহার পর কাঠ বহিয়া আনিয়া কাঠের ঘরে সাজাইতে লাগিল।

হিরা সারাদিনই তাহাকে দূর হইতে দেখিয়া দেখিয়া সরিয়া গিয়াছে। কাঠ বহিবার সময় অংশ লইবার জন্য সে আসিয়া দাঁড়াইল। বিস্মিত রাখাল বলিল, "তুই কি করবি হিরা ?"

"আমি কাঠ বইব।"

রাখাল হাসিয়া বলিল, "ধাঃ, পারবি নে।"

হিরা মুখ ভার করিয়া বলিল, "হুঁ, পারব না বুঝি ? তুমি পার, আমি পারব না কেন ?"

ছোট মেয়েটী যেমন ভাবে কাঠ বহিতে লাগিল তাহাতে রাখাল তাহার প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিল না।

কয়েকদিন রাখাল বেশ মনোযোগের সহিত কাজ করিতে লাগিল। লক্ষ্মী দেখিয়া ভাল মন্দ কিছুই বলিল না, বৃন্দাবন ভারি খুসি হইয়া উঠিল।

কিন্তু সেদিন যখন লক্ষ্মী তাহাকে ভাতের হাঁড়ি নামাইয়া দিতে বলায় সে ভাত নামাইতে গিয়া সত্যই হাঁড়িটা ভাঙ্গিয়া ফেলিল সেই দিনই আবার মেসিন খারাপ হইয়া গেল।

দাঁতের উপর দাঁত রাখিয়া লক্ষ্মী বলিল, "ওরে হাতী, হাতীরে ; তোর গায়ে দশটা হাতীর জোর আছে। বেরো আপদ, আজ ভাত পাবিনে। যত গুলো ভাত আমার ফেললি আগে নিয়ে আয়, তবে ভাত পাবি।"

রাখাল বাহির হইয়া গেল।

সেদিন সারাদিন সে বাড়ীতেই গেল না। মাঠে তখন ধান কাটার মরসুম পড়িয়াছে। ভুলো মণ্ডল কাস্তে দিয়া ধান কাটিতে কাটিতে তাহাকে ডাকিল, "মিতে, যাচ্ছ কোথা ? এদিকে এসো, কথা আছে।"

রাখাল তাহার পার্শ্বের পতিত কাস্তে লইয়া ধান কাটিতে বসিয়া গেল।

ভুলো মণ্ডল বলিল, "কি মিতে, বিয়ের কি হচ্ছে ?"

অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া রাখাল বলিল, "বিয়ে ? বিয়ে কি ?"

ভুলো একটু হাসিয়া বলিল, "তোমার বিয়ে মিতে, হিরার সঙ্গে নাকি হ'বার সব ঠিক হয়েছিল ?"

রাখাল আশ্বস্তির একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "রাম বল, হিরার সঙ্গে বিয়ে ? দুঃ তা নাকি হয় কখনও ?"

ভুলো বলিল, "তাইতো বলছিনু, হিরার বিয়ের নাকি ঠিক হয়ে গেল, আজ তারা আশীর্ব্বাদ করে গেছে।"

কথাটা খুব সহজ বলিয়াই ঠেকিল, তাই রাখাল খানিক প্রাণ খুলিয়া হাসিল।

বৈকালের দিকে কাটা ধান একরূপ বন্দোবস্ত করিয়া রাখাল তাহার পূর্ব্ব স্থানটীতে গিয়া বসিল।

থাকিয়া থাকিয়া আজ কেবলই তাহার মনে পড়িতে লাগিল, আশীর্ব্বাদ হইয়া গিয়াছে, আর কয়দিন বাদেই হিরার বিবাহ ! যে হিরাকে আজ গালি দিবার, মারিবার অধিকার আছে, দু'দিন পরে আর তাহা থাকিবে না।

কি জানি কি একটা অব্যক্ত যন্ত্রণায় তাহার সারা বুকটা টন্ টন্ করিতে লাগিল।

হিরার বিবাহ ; হোক না, তাহাতে তাহার কি ?

তাহার কি ? না, তাহার তো কিছুই নয় তাহাতে।

তবে ?

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া সে উঠিল।

অসংযত চরণ তাহাকে যেখানে আনিয়া ফেলিল সেখানে আসিয়াই সে চমকিয়া উঠিল, এ যে হিরাদের সেই কুটীরখানা।

হিরার মা বড় মাটীর কলসীটাতে জল পুরিয়া মাথায় লইয়া বাড়ী আসিতেছিল, তাহার পিছনে হিরা, তাহারও মাথায় একটা বড় কলসী।

"কি গো বাবা, আজ হঠাৎ মনে পড়েছে নাকি আমাদের ?"

রাখাল মুখ তুলিল। চোখ মেলিতেই দৃষ্টি-সম্মুখে ভাসিল হিরার সুন্দর মুখখানা। সূর্য্য তখন ডুবিয়া গিয়াছে, সারা আকাশখানা লাল মেঘে ছাওয়া ; তাহারই রঙিন আলোটা আসিয়া পড়িয়াছে হিরার সুন্দর মুখখানার উপর।

কি সুন্দর সে মুখখানা !

হিরা এত সুন্দরী তাহা তো রাখাল জানে না। এ সৌন্দর্য্য এতদিন কোথায় লুকাইয়া ছিল, কেন তাহা রাখালের সম্মুখে পূর্ব্বেই বিকশিত হয় নাই? তাহা হইলে তো রাখাল তাহাকে কারণে অকারণে এরূপ করিয়া মারিত না। রাখাল আজ স্পষ্ট চক্ষে চাহিয়া দেখিল প্রকৃতি তাহার শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্য্য দান করিয়াছে হিরাকে, সে অন্ধ তাহা চাহিয়াও দেখে নাই। সম্মুখে মূর্ত্তিমতী শোভাকে না দেখিয়া সে চাহিয়াছিল অতি দূরে।

রাখাল এতক্ষণে কথা কহিল, মুখ ফিরাইয়া বলিল "এমনি এসেছি এখানে।"

কলসী নামাইয়া হিরার মা বলিল, "বস বাপ এই দাওয়াটার উঠে বস। হিরা, একটা পিঁড়ি দিয়ে যা মা।"

রাখাল বসিল না, চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

হিরার মা বলিল, "আজ গোকর্ণ হ'তে বরপক্ষেরা এসেছিল হিরাকে আশীর্ব্বাদ করতে। এই মাসের চব্বিশে তারিখ ঠিক হয়ে গেছে। তা বাবা, সে সময়টা তুমি না থাকিলে তো কোনও ক্রমেই চলবে না। হিরা তোমার বোনের মতই, আমার আর কেউ নেই বাবা, তাই তোমাকেই বলছি, আমি আজ দুপুরে গেছনু তোমাদের বাড়ী, তোমার সৎমা আবাগী তাই কত কথা শুনিয়ে দিলে। বল বাবা, থাকবে তো তুমি?"

রাখাল মুখখানা গম্ভীর করিয়া বলিল, "দেখি, যতদূর যা হয়।"

হিরার মা তথাপি ছাড়িল না। বার বার হাতে ধরিয়া মাথার দিব্য দিয়া তাহাকে বিবাহস্থলে থাকিতে স্বীকার করাইয়া তবে সে বিদায় দিল।

পথে আসিয়া রাখাল খানিক এদিক ওদিক ঘুরিল। তাহার পর আর কোথাও দেরী না করিয়া একেবারে বাড়ী গিয়া হাজির হইল।

পিতা রাগ করিয়া কথা কহিল না, মাও কথা কহিল না, তাহাতে রাখালের ভাল বই মন্দ হইল না। সে নিজের ঘরে গিয়া দেখিল দিনের ভাত তখনও ঢাকা পড়িয়া আছে। ক্ষুধার্ত্ত রাখাল নিঃসঙ্কোচে ভাত খাইয়া হাত মুখ ধুইয়া আসিয়া দরজা বন্ধ করিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল—ঘুমাইবার জন্য নয়, চিন্তা করিবার জন্য।

(৪)

সেদিন হিরার বিবাহ।

অনেক রাত্রে লগ্ন ছিল, সারাটা দিন তাহাদের বাড়ী খাটিয়া রাখাল সন্ধ্যার সময়টায় কাহাকেও কিছু না বলিয়া খানিকক্ষণের জন্য গা ঢাকা দিল।

আকাশের পশ্চিম দিক ঘেঁসিয়া ভাসিয়া উঠিয়াছে তৃতীয়ার রেখাবৎ চাঁদখানি। স্বল্প আলো তাহার ধরার বুকে আসিয়া পড়িয়া মুহূর্ত্তের তরেও তাহাকে প্রফুল্লতা দান করিয়াছে। গঙ্গার ছোট ছোট তরঙ্গগুলির উপর তাহার আলো পড়িয়া ঝিক মিক করিয়া জ্বলিতেছে।

রাখাল আজ একেবারে গঙ্গার তীরে গিয়া বসিয়া পড়িল। প্রকৃতির এ চারু সৌন্দর্য্যে আজ সে কিছুতেই মুগ্ধ হইয়া বলিতে পারিতেছিল না—কি সুন্দর! তাহার প্রাণে আজ সে যে অভাব অনুভব করিতেছিল তাহা আজ তাহার আকাশ ভুবন ছাইয়া হাহাকার করিয়া বাজিয়া উঠিতেছিল। আর্ত্তপ্রাণটা আপনাকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া কাঁদিয়া উঠিয়া প্রকাশ হইতে চাহিতেছিল, রাখাল কিছুতেই তাহাকে বাহির হইতে দেয় নাই। যাতনায় অস্থির হইয়া সে বাহির হইয়া পড়িয়াছে।

সে বুঝিতে পারিতেছিল না তাহার মন কি চায়, কেন সে হাহাকার করিতেছে। প্রাণের সেই গোপন কান্নাটা বাহির হইতে চায়, কিন্তু তাহাকে চাপিয়া সে আরও অস্থির হইয়া পড়িতেছে, আরও যন্ত্রণায় আত্মহারা হইয়া পড়িতেছে।

এতদিন রাখাল পৃথিবীটাকে একেবারে শূন্য বলিয়া ভাবে নাই, আজ মনে হইতেছে সব শূন্য হইয়া গেল। একটী আলো—যাহা তাহার সকল অন্ধকার নাশ করিতে সমর্থ, আজ সে আলোটীও নিভিয়া গেল।

অন্ধকার, বড় অন্ধকার চারিদিক!

রাখালের প্রাণটা হাঁফাইয়া উঠিল, সে সেই বালুকা-রাশির উপর সহসা উবুড় হইয়া পড়িয়া ডাকিল—"মা—"

যদিও সে মা কেমন তা জানে না, তবু এই শান্তিপ্রদ পবিত্র নামটী মুখে আনিতে ঝর ঝর করিয়া অশ্রুধারা ঝরিয়া পড়িল, তাহার বেদনারাশি উচ্ছ্বসিত বারিধারারূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল।

"বাবা—বাবা রাখালের রাখু—"

মুখ তুলিয়া চট্ করিয়া চোখ মুখ মুছিয়া রাখাল চাহিয়া দেখিল তাহার বন্ধু কার্ত্তিকের মা। ইহাকে সে মা বলিয়াই ডাকিত, এবং সেও তাহাকে কার্ত্তিকের মতই যত্ন করিত।

"কি মা ?"

রাখাল উঠিয়া বসিয়া পাণ্ডুর চাঁদের আলোক উদ্বেগ-ব্যাকুল মাতার পানে চাহিল।

বৃদ্ধা কাঁদিয়াই আকুল, কথাই কহিতে পারে না। অনেক কষ্টে বলিল, "কার্ত্তিকে—"

ব্যগ্র রাখাল বলিল, "কি হয়েছে তার ?"

"সহরে গেছল কাজ করতে, এইমাত্র খবর পেলুম ওর কলেরা হয়েছে, কি হবে বাবা ?"

বৃদ্ধা হাউ হাউ করিয়া কাঁদিতে লাগিল।

কার্ত্তিকের আর কেহই ছিল না। প্রত্যহ প্রাতে সে সহরে মজুরের কাজে যাইত, সন্ধ্যাবেলায় বাড়ী ফিরিত।

রাখাল উঠিয়া দাঁড়াইল—"কোথা আছে সে ?"

মা বলিল, "শুনলুম ধর্ম্মশালায় আছে। আমিও যাব বাবা, আমাকে সঙ্গে নিয়ে চল।"

রহিল পড়িয়া হিরার বিবাহ, তখনিই রাখাল বৃদ্ধা কার্ত্তিকের মাকে লইয়া ডোঙ্গায় উঠিয়া বসিয়া ডোঙ্গা ভাসাইয়া দিল।

ধর্ম্মশালায় যখন উপস্থিত হইল তখন কার্ত্তিকের আশা মোটেই ছিল না। কয়েকটী স্বার্থত্যাগী কলেজের ছেলে তাহার সব ভার লইয়াছিল, এবং প্রাণপণে তাহার সেবা করিতেছিল।

কার্ত্তিকের মা হতজ্ঞান ভাবে বসিয়াই রহিল, রাখাল কার্ত্তিকের পাশে বসিয়া তাহার সেবা করিতে লাগিল।

কিন্তু কিছুতেই না, সেই রাত্রি শেষেই কার্ত্তিক মারা গেল। হতভাগিনী কার্ত্তিকের মাকে লইয়া কার্ত্তিকের দাহ শেষে রাখাল যে সময় বাড়ী ফিরিবার উদ্যোগ করিতেছিল, ঠিক সেই সময়ে সেও কলেরাক্রান্ত হইয়া পড়িল।

ভদ্র যুবকেরা দয়া করিয়া ধর্ম্মশালায় তাহাকে রাখিয়া তাহার ভার লইতে প্রস্তুত হইল, কিন্তু রাখাল কিছুতেই রাজি হইতে পারিল না। সজল নয়নে সে অনুরোধ করিল তাহাকে তাহার গ্রামে পাঠাইয়া দেওয়া হউক, সেখানে সে বাঁচিবে, কিন্তু এখানে থাকিলে সে মরিয়া যাইবে।

তাহার কাতর অনুনয়ে অগত্যা তাহাকে একখানা পাল্কী করিয়া জগন্নাথপুরে পাঠাইয়া দেওয়া হইল।

বেলা তখন প্রায় বারটা। আকাশে স্থানে স্থানে মেঘ জমিয়া রহিয়াছে, সূর্য্য মাঝে মাঝে মেঘের আড়ালে লুকাইতেছে, মাঝে মাঝে বাহির হইতেছে। ধান্যপূর্ণ মাঠগুলা আনন্দে হাসিয়া উঠিতেছে। মাঝে মাঝে বাতাস আসিয়া ঢেউয়ের তালে তাহাদের কাঁপাইয়া দিয়া যাইতেছে।

রোগের যাতনা রাখাল ভুলিয়া গেল, একবার প্রাণ ভরিয়া সে সেই দৃশ্য দেখিয়া লইল।

ওই না সেই বাঁশবন, উহার ওইখানে না সে বসিত ? রাখালের দুই চোখ ভরিয়া জল আসিল। হায়, আর সে আসিবে না, আর সে ওখানে বসিবে না, আর এই সুন্দর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য সে দেখিতে পাইবে না।

সে ঠিক জানিয়াছে সে মরিবেই, সে বাঁচিবে না। সে দেশে থাকিয়া মরিতে চায়, আর কোথাও সে মরিতে চায় না।

আর একবার ভেদ বমি হইয়া সে আর চাহিতে পারিল না; দু' চোখ মুদিয়া পড়িয়া রহিল। অদূরে বিবাহ বাড়ীতে বাদ্য বাজিতেছিল, বাঁশীর সুর শুনিতে শুনিতে সে ঘুমাইয়া পড়িল। সে ঘুম নয়, সে তন্দ্রালুতা।

যখন তাহার সে তন্দ্রা-ঘোর ভাঙ্গিল তখন সে নিজের সেই কুটীরখানির বারাণ্ডায় একটা ছিন্ন মাদুরের উপর পড়িয়া আছে। প্রাঙ্গণে বসিয়া লক্ষ্মী চীৎকার করিতেছে "ওরে হতভাগা মুখপোড়া, এবার নিজে তো মরবেই, সকলকে না খেয়ে যাবে না। মরবি—এখুনি মর, এখুনি মর। বাড়ীময় ব্যারামের বাতাসটা না ছড়িয়ে এখুনি মরে যা। মরবার জায়গা পেলি না মুখপোড়া, ধর্ম্মশালায় কার্ত্তিক মরতে পারল, তুই মরতে পারলি নে হতভাগা!"

শুনিতে শুনিতে সে আবার তন্দ্রাশূন্য হইয়া পড়িল।

যখন আবার তাহার জ্ঞান হইল, তখন পথ দিয়া বাদ্য

বাজাইয়া বধূ হিয়া স্বামীর নিকট শ্বশুর ভবনে যাত্রা করিয়াছে। বিদায়কালীন বাঁশী বড় কাতর সুরে বিদায়ের গান গাহিতেছিল।

চোখ চাহিয়া রাখাল দেখিল পাশে বৃন্দাবন; দুই চোখের জলে তাহার মুখ ভাসিয়া যাইতেছে, রুদ্ধকণ্ঠে সে কেবল ডাকিতেছে, রাখাল, রাখলা, একবার তাকা বাবা, একবার তোর হতভাগা বাপের পানে তাকিয়ে যা বাবা। কখনও তোকে আদর করি নি, কতদিন তোকে খেতে দেই নি, তাই কি তুই আজ রাগ করে যাচ্ছিস বাপ?

তখন তাহার কথা কহিবার শক্তি বিলুপ্ত হইয়াছিল, তাহার চোখের কোণ বহিয়া শুধু অশ্রুধারা গড়াইয়া পড়িল।

বাঁশী বাজিতে বাজিতে দূরে চলিয়া গেল, দূর হইতে আরও দূরে—ক্রমে বিলীন হইয়া গেল।

উৎকর্ণে মরণাহত সেই বাঁশীর শেষ তানটুকু তখনও হৃদয় ভরিয়া পান করিতেছিল। বাঁশীর শব্দ যে মুহূর্ত্তে মিলাইয়া গেল, সেই মুহূর্ত্তে তাহার মাথাটাও উপাধান হইতে গড়াইয়া মাটীতে পড়িয়া গেল।

সাহিত্য-প্রসঙ্গ।

[শ্রীকৃষ্ণদাস চন্দ্র]

সম্প্রতি বঙ্গীয় কর্ম্মকার-সম্মিলনীর এক সাধারণ অধিবেশনে লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্য-সেবী সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রিয়লাল দাস এম্-এ, বি-এল, মহোদয় একটী সারগর্ভ অভিভাষণ পাঠ করেন। তাঁহার বক্তব্যগুলি কর্ম্মকার জাতীয় সভ্যবৃন্দকে সম্বোধন করিয়া বলা হইলেও আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিব যে, তাহা সকল অবজ্ঞাত জাতির পক্ষে সমানভাবে প্রযোজ্য। তিনি বিচারাসনে বসিয়া যাহা নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহা প্রণিধানযোগ্য। আমরা তাঁহার অভিভাষণ হইতে স্থানে স্থানে নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

* * *

"কায়স্থ জাতি ত্রিশ বৎসর যাবৎ আন্দোলন করিয়াও যখন আজ পর্য্যন্ত নিজেদের ললাট হইতে শূদ্রত্বের ছাপ অপসারিত করিতে পারিলেন না, তখন শিল্পী জাতি কর্ম্মকারগণ যদি ক্ষত্রিয়ত্বের টীকা লইলেই ক্ষত্রিয় হইবার আশা করিয়া থাকেন, তাহা হইলে সেই আশা যে কতদূর ফলবতী হইবে তাহা আমার সামান্য বুদ্ধি ঠিক করিয়া উঠিতে অক্ষম।'

"আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি, একাধিক ক্ষত্রিয়বাদী শিক্ষিত কর্ম্মকার 'দেব' 'বর্ম্মণ' প্রভৃতি উপাধি পৈত্রিক পদবীর শেষে জুড়িয়া দিয়া পোষ্টকার্ড ও চিঠির কোণে বসাইয়া আস্ফালন করিতেছেন। বলিতে লজ্জা হয়, সেই ক্ষত্রিয়-পুঙ্গবেরা যখন দলিলাদি সম্পাদন করিয়াছেন, আদালতের কাগজে দস্তখৎ করিয়াছেন, তখন তাঁহারা সখের উপনামটী ব্যবহার করেন নাই। সুবিধা দেখিলে ক্ষত্রিয়ত্ব জাহির করিব আর অসুবিধা দেখিলে করিব না, মনের এই ভাব আন্তরিকতার আদৌ অনুকূল নহে। অধিক দিন এই ভাবে মনের সহিত লুকোচুরি খেলায় প্রবৃত্ত থাকিলে স্বভাব-চরিত্র একেবারে বিগড়াইয়া যাইবে। অসত্যকে ক্ষণেকের তরেও মনের মধ্যে স্থান দিলে নানা প্রকার মানসিক ব্যাধির উৎপত্তি হওয়া সম্ভব। এতদ্ব্যতীত মুষ্টিমেয় ক্ষত্রিয়বাদী কর্ম্মকারের উক্ত প্রকার কপটতার ফলে লোকসমাজে সমগ্র কর্ম্মকার জাতির দুর্নাম রটিবে, সকলে আমাদিগকে মিথ্যাবাদী প্রবঞ্চক বলিয়া গালাগালি করিবে। না—না—না—না, জাতিতত্ত্বের যে রাস্তায় দলাদলি ক্ষুরধার কাচখণ্ড সকল ছড়াইয়া রাখিয়াছে, আশেপাশে আবর্জ্জনার স্তূপ হইতে মানসিক সুস্থতার হানিকর বাষ্প সর্ব্বদা উত্থিত

হইতেছে, সেই বিপদ-সঙ্কুল পথে আমাদের যাত্রা করা উচিত নয়। ক্ষত্রিয়বাদী কর্ম্মকারগণ যে বিষম ভ্রমে পতিত হইয়াছেন তাহা যে তাঁহাদের বহুদর্শিতার অভাবে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই। আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, অপরাপর যে সকল শ্রেণীর মধ্যে এইরূপ "হাম্-ক্ষত্রিয়-হ্যায়" নামধারী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল সৃষ্টি হইয়াছে তাহাদের বেশী কিছু উন্নতি হয় নাই। উন্নতির মধ্যে কেবল লোকে তাহাদিগকে দেখিয়া হাসে, বিদ্রূপ করে, এই যা।"

* *
*

"ঘরের ভিতর বসিয়া নিজেকে বড় মনে করিলে, মাথায় পাগড়ী বাঁধিয়া রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়াইলে যদি কেহ বড় হইত, বীর বলিয়া গণ্য হইত, তাহা হইলে সমাজে উচ্চস্থান অধিকার করা সকলের পক্ষেই সহজ হইত। ছোট বড়র, উচ্চ নীচের, ভাল মন্দের পরীক্ষা দেশের কর্ম্মক্ষেত্র। কায়স্থ কুলোদ্ভব স্যর প্রফুল্লচন্দ্র রায় আজ এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সমাজে যে উচ্চাসন অধিকার করিয়াছেন তাহার পাদপীঠের নিকটেও উচ্চতম শ্রেণীর কোনও ব্যক্তি পৌছিতে পারিতেছে না। স্যর প্রফুল্লচন্দ্র দরিদ্র-নারায়ণের সেবায় জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। যুদ্ধ বিগ্রহের যুগে আর্য্যদিগের সময়ে ভারতবর্ষে ক্ষত্রিয়ত্বের বৈশিষ্ট্য ছিল অনার্য্যের অস্ত্রাঘাত হইতে সমাজকে রক্ষা করা। ইংরাজের রাজত্বে সমাজকে অস্ত্রাঘাত হইতে রক্ষা করিবার কোনও কালে দরকার হয় নাই, কিন্তু দুর্ভিক্ষ ম্যালেরিয়া ও বন্যার অত্যাচার হইতে রক্ষা করিবার দরকার অনেকবার হইয়াছে।"

* *
*

"ক্ষত্রিয়বাদী কর্ম্মকারদের মুখে শুনিয়াছি যে,শূদ্র অতি নীচ জাতি। আর বৈশ্য শূদ্রাপেক্ষা কিছু বড় বটে, কিন্তু ক্ষত্রিয় হইতে পারিলে ব্রাহ্মণ ছাড়া অপর সকল জাতির তুলনায় আমরা সমাজে উচ্চ আসন পাইব। ইহার উত্তরে আমি বলিতে চাই যে, শূদ্র একটি মার্কা-করা স্বতন্ত্র জাতি নয়। পূরাকালে কর্ম্ম ও চরিত্রবলে ব্রাহ্মণ শূদ্র হইত, শূদ্রও ব্রাহ্মণ হইতে পারিত।" মনুসংহিতায় আছে—

শূদ্রো ব্রাহ্মণতামেতি ব্রাহ্মণশ্চৈতি শূদ্রতাম্
ক্ষত্রিয় জ্জাত মেবন্তু বিদ্যাদ্বৈশ্যাত্তথৈবঃ চ।

শূদ্র ব্রাহ্মণ-পদ প্রাপ্ত হয়েন এবং ব্রাহ্মণও শূদ্র-পদ প্রাপ্ত হয়েন; ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য সন্তানের বিষয়েও এই প্রকার জানিবে।

শুক্রনীতিতে দৃষ্ট হয়—

"না জাতা ব্রাহ্মণাশ্চাত্র ক্ষত্রিয় বৈশ্য এব বা।
ন শূদ্রো ন চ বা ম্লেচ্ছো ভেদিতা গুণ কর্ম্মভিঃ॥"

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র বা ম্লেচ্ছ হইয়া কেহ জন্মায় না; গুণ ও কর্ম্ম দ্বারাই ভেদ নির্দ্ধারিত হয়।

গৌতম সূত্রে দেখা যায়—

"বর্ণান্তরগমনমুৎকর্ষাপকর্ষাভ্যাম্"—

সৎ গুণ ও সৎ ক্রিয়া এবং অসৎ গুণ ও অসৎ ক্রিয়া দ্বারা বর্ণান্তর গমন হয়। বৃদ্ধ গৌতম সংহিতায় রহিয়াছে—

"ক্ষান্তং দান্তং জিতক্রোধং জিতাত্মানং জিতেন্দ্রিয়ম্
তমেব ব্রাহ্মণং মন্যে শেষা শূদ্রা ইতি স্মৃতাঃ।
* * *
ন জাতিঃ পূজ্যতে রাজন্ গুণাঃ কল্যাণকারকাঃ।
চণ্ডালমপি বৃত্তস্থং তং দেবা ব্রাহ্মণং বিদুঃ॥"

ক্ষমবান ক্ষমশীল জিতক্রোধ জিতাত্ম এবং জিতেন্দ্রিয়কেই ব্রাহ্মণ বলিতে হইবে, আর সকলে শূদ্র। * * * জাতি পূজ্য নহে, গুণই কল্যাণ-কারক; চণ্ডালও বৃত্তস্থ হইলে দেবতারা তাহাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া থাকেন।

মহাভারতে দেখিতে পাওয়া যায়,—"যে শূদ্র সত্য দম ও ধর্ম্মে সতত অনুরক্ত, তাহাকে ব্রাহ্মণ বিবেচনা করা যায়; কারণ ব্যবহারেই ব্রাহ্মণ হয়।

(বন, মার্কণ্ড ২১৫ অধ্যায়)

যুধিষ্ঠির বলিয়াছেন,—"সত্য দাম ক্ষমা শীল অনৃশংস তপস্যা ও দয়া, এই সকল গুণ যাঁহাতে দৃষ্ট হয়, তিনিই ব্রাহ্মণ বলিয়া উক্ত হন। * * *

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ভগবান স্বয়ং কহিয়াছেন,—

"চাতুর্ব্বর্ণং ময়াসৃষ্টং গুণকর্ম বিভাগশঃ"

গুণ ও কর্ম্মের বিভাগ অনুসারে আমা কর্ত্তৃক চারি বর্ণ সৃষ্ট হইয়াছে।

সেইজন্ত আমার মনে হয় যে, সমাজতত্ত্বের আলোচনায় একটা স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইলে যদি শাস্ত্রের উপদেশ গ্রহণ করিতে হয়, তাহা হইলে উদ্ধৃত শাস্ত্রবচনগুলির উপদেশ হইতে উৎকৃষ্টতর উপদেশ কল্পনা করা যায় না। জীবিকা-অর্জ্জনের জন্ত কৃষি ও শিল্পকার্য্য শাস্ত্রানুসারে ব্রাহ্মণও করিতে পারেন, তাহাতে তাঁহার ব্রাহ্মণত্বের হানি হয় না। বস্তুতঃ, আজকাল বাঙ্গালীর দেশে জীবিকা অর্জ্জনের জন্ত লোকে কৃষিকার্য্যই করুক আর শিল্পকার্য্যই করুক তাহাতে উচ্চশ্রেণীর কাহাকেও জাতিভ্রষ্ট হইতে হয় না। সদসৎ কার্য্য দ্বারাই লোকে বাঙ্গালী সমাজে আজকাল উঁচু বা নীচু স্থান অধিকার করিতেছে। সদ্গুণবিশিষ্ট হওয়া ও সৎকার্য্য করা, যে কোনও শ্রেণীর ব্যক্তিবিশেষের সাধ্যাতীত নহে। এক্ষণে আমি ক্ষত্রিয়বাদী কর্ম্মকারগণকেই জিজ্ঞাসা করিতে চাই, তাঁহারা চরিত্রবান হইয়াও সদনুষ্ঠান দ্বারা ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিতে ইচ্ছা করেন কি? শাস্ত্রের বচন শিরোধার্য্য করিয়া এই ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিতে হইলে কাহাকেও উপবীত গ্রহণ করিতে হইবে না বা ব্রাহ্মণের ন্তায় দশ দিনে অশৌচান্তের প্রথা মানিয়া চলিতে হইবে না। এই ব্রাহ্মণত্বে দল বাঁধিয়া খাতায় নাম লেখাইতে হয় না। ইহাতে নাম বা উপাধির পরিবর্ত্তন করা অনাবশুক। এই ব্রাহ্মণত্বের অর্থ হিন্দুশাস্ত্রমতে "বৃত্তস্থ" অর্থাৎ সচ্চরিত্র হওয়া। ক্ষত্রিয়ত্ব হইতে এই ব্রাহ্মণত্বের আদর্শ কত উচ্চ! ইহাতে দলাদলি নাই, হিংসা দ্বেষ অসূয়া নাই, ব্রাহ্মণত্বের এই উচ্চতম আদর্শে কর্ম্মময় জীবনকে গড়িয়া তুলিলে ইহকাল ও পরকালের মঙ্গল।"

* * *

সভাপতি মহাশয় তাঁহার অভিভাষণে Democracy বা জনতন্ত্রবাদ বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন এবং লাট কাউন্সিলে নির্ব্বাচিত সদস্তের কর্ত্তব্য-পথ অনেকটা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তিনি সত্যই বলিয়াছেন, নির্ব্বাচিত হইবার পর কোনও সদস্ত কোনও শ্রেণীর মত লইয়া কাজ করেন না। "যে দেশে সায়ত্ত-শাসনের জন্ম, সে দেশে প্রতিনিধিদের নিকট হইতে নির্ব্বাচনের পূর্ব্বে অনেক সময়ে সভা-সমিতি বিশেষের উদ্দেশুকে কার্য্যে পরিণত করিবার জন্ত অঙ্গীকার করাইয়া লওয়ার প্রথা আছে। এদেশে ঐরূপ কোনও নিয়ম প্রচলিত না থাকাতে নির্ব্বাচিত সদস্তগণ অনেক সময়ে ভোটারদিগের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ব্যবস্থাপক ও অন্তান্ত সভায় নিজেদের অভিমত প্রকাশ করিয়া থাকেন।"

আমাদের ভরসা আছে, কর্ম্মকার ও অন্তান্ত শিল্পজাতি সভাপতি মহাশয়ের উপদেশের সারবত্তা হৃদয়ঙ্গম করিয়া বিশেষ উপকৃত হইবেন।

* * *

নব প্রকাশিত "সাম্যবাদী" নামক মাসিকের ১ম সংখ্যায় গোটাকত পাকা কথা আছে। একদিকে আমরা উচ্চ-নীচ জাতি-তত্ত্বের নিরাকরণে আহার-নিদ্রা কর্ত্তব্য ভুলিয়া যাইতে বসিয়াছি, অন্তদিকে এই জাতিবিভাগের আঁচ মুসলমান সমাজে প্রবেশ করিয়াছে বলিয়া প্রবন্ধ-লেখক তারস্বরে বলিতেছেন—

"হিন্দু সমাজের বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের (জাতিভেদের) অনুকরণে মুসলমান সমাজে যে ব্যবসায়-বিভাগ-মূলক জাতিভেদ বা শ্রেণীভেদ প্রবেশ করিয়াছে, তাহা এক দম ভাঙ্গিয়া চুরমার করিয়া দিবার জন্তই আমাদিগকে চেষ্টা করিতে হইবে। তুরস্কের সোলতান আর ভারতবর্ষের একজন সামান্ত মজুর আল্লার সৃষ্টিতে সমান মানুষ। তাই মসজিদে গিয়া মহামহিম সোলতানকে সামান্ত মজুরের পার্শ্বে দাঁড়াইয়াই খোদার নিকট মাথা নোয়াইতে হয়। মুসলমান সমাজের মধ্যে মানুষে মানুষে এই প্রকার সমান ভাব স্থাপন করিতে হইবে।"

* * *

"লোকে আমাদিগকে ছোট বলিলেও আমরা ছোট নহি, হীন নহি, ঘৃণ্য নহি, তুচ্ছ নহি। সকল মানুষের মত আমরাও মানুষ। সকলের ন্তায় হজরত আদম ও বিবি হাওয়া আমাদেরও আদি পিতামাতা। খোদা আমাদিগকে ছোট করিয়া সৃষ্টি করেন নাই। আমরা যত, ব্রাহ্মণের

মত বড়, শেখ সৈয়দ মোগল পাঠানেরই মত বড়, দুনিয়ার সকল মানুষের মতই বড়। আমাদের চাই কেবল পরহেজগারী, চাই কেবল ধর্ম্মভক্তি, চাই কেবল উন্নতি। এই বিশ্বাস, এই ভাব মনে লইয়া আমাদের সকলকে সাম্য প্রতিষ্ঠার পথে—ভেদ লোপ করিবার পথে—সকল মুসলমানকে সমান অধিকার-দানের পথে ছুটিতে হইবে। ইহাই আমাদের এখনকার কাজ।"

"যে শ্রেণী নিজের অবস্থা পরিবর্ত্তন করে না, আল্লা তাহার অবস্থা পরিবর্ত্তন করেন না"—কোরআন।

* *
*

যে Democracy বা জনতন্ত্রবাদ লইয়া পৃথিবীর সকল জাতি এখন মাতামাতি করিতেছে, সেই Democracy জন্মলাভ করিয়াছে, বহু শতাব্দী পূর্ব্বে মুসলমান-ধর্ম্মের আচার-ব্যবহারের ভিতর দিয়া। আমাদের আশা আছে লেখকের নির্দ্দেশটুকু ব্যর্থ হইবে না।

* *
*

বসন্তের প্রারম্ভে বঙ্গবাণী নূতন রূপে, নূতন সজ্জায় তাঁহার বরপুত্র স্যর আশুতোষ সরস্বতীর সৌম্য তেজোদীপ্ত মূর্ত্তির প্রতিকৃতি বুকে লইয়া বাঙ্গালা সাহিত্যে আবির্ভূতা হইয়া উঁচু পর্দ্দায় তান ধরিয়াছে। প্রবন্ধগৌরবে টল টল করিতেছে। রকমটা বজায় রাখিতে পারিলে বঙ্গবাণী সাহিত্য-আসরে দিন কিনিবে, এমন আশা আমরা করি।

* *
*

এবারে অনেকগুলি প্রবন্ধের "সর্ব্বসত্ব সংরক্ষিত" সুতরাং সেগুলির নামোল্লেখ করাও যুক্তিসঙ্গত মনে করি না। "নয়া জার্ম্মাণীর ভাবভঙ্গী" শীর্ষক প্রবন্ধে লেখক শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার মহাশয় সহজ সরল বোধগম্য ভাষায় জার্ম্মাণীর সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার একখানি নিখুঁত ছবি দিয়াছেন।

যদি কেহ বাঙ্গালী সমাজের আদি গড়ন সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিতে চান ও ভাষায় 'দ্যোতনা ব্যঞ্জনা'র পরিতৃপ্তি লাভ করিতে ইচ্ছুক হন, তাঁহাকে আমরা শ্রদ্ধেয় পাঁচকড়িবাবুর প্রবন্ধটী পাঠ করিতে অনুরোধ করি। এ প্রবন্ধটীরও "সর্ব্বসত্ব সংরক্ষিত" সুতরাং ইহার নামোল্লেখ বা স্থানে স্থানে উদ্ধৃত করিলাম না।

* *
*

কবিতাও এ সংখ্যায় অনেকগুলি আছে, তার মধ্যে 'বসন্ত' কবিতাটী ভাবে-ভাষায়, ছন্দে-বন্দে ও আনন্দে অভিনব। রবিবাবু এক সময় বলিয়াছিলেন 'কবিতা-গন্ধ'। অর্থাৎ কবিতা বুঝিতে চেষ্টা করিও না, আঘ্রাণে বুঝহ। এই সংজ্ঞামত স্বীকার করিব—বসন্ত কবিতাটী 'সাজন্ত' হইয়াছে। কবিযশপ্রার্থীরা এই কবিতার (যথা, রসন্ত, হসন্ত, খশন্ত ইত্যাদি) মিলগুলি দেখিয়া রাখুন, ভবিষ্যতে মাথা ঘামাইতে না হয়।

মধুমক্ষিকা-সমবায়।*

[শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত এম্-এ, বি-এল]

(১)

দীন-হীন নগণ্য পদার্থ দল বাঁধিলে সে দল শক্তির কেন্দ্র হয়। কবি তাহার উদাহরণও দিয়াছেন—"তৃণৈর্গুণত্বমাপন্নৈ র্বধ্যন্তে মত্ত দন্তিনঃ।" জড়-প্রকৃতি জোট বাঁধিলে অসাধ্য-সাধন করিতে পারে,—প্রকৃতির নাট্যশালায় এ দৃষ্টান্ত প্রচুর। সে সংহতির কার্য্যে বদান্ততাও আছে, নিমকহারামীও আছে; সেরূপ জল-বাঁধায় ফলে ধরিত্রীর আকৃতি পরিবর্ত্তিত হইতেছে; কোথাও সে কুৎসিৎ হইতেছে

* বহুদিন পূর্ব্বে এই প্রবন্ধটী রামমোহন লাইব্রেরিতে পঠিত হইয়াছিল। এই অংশটুকু ১৩২৫ চৈত্র মাসের 'ভারতবর্ষে' প্রকাশিত হইয়াছিল। বাকী অংশটুকু অপ্রকাশ ছিল। ধারাবাহিক রূপে তাহা "অর্চ্চনা"য় প্রকাশিত হইবে। অঃ সঃ।

কোথাও তাহার বরবপু রত্নালঙ্কারে সুশোভিত হইয়েছে। স্রোতস্বতীর সুখস্রোতে কোটী-কোটী ক্ষীণ নগণ্য ধূলিকণা ভাসিয়া যায়; নদীর মোহনায় আসিয়া হঠাৎ তাহারা জোট বাঁধে; একটী-একটী করিয়া কৃতঘ্ন বালুকণা মগ্ন হয়—ক্ষীণের সঙ্গে ক্ষীণ দেহ মিলাইয়া দেয়। শেষে বিরাটায়তন হইয়া বালুকণা নিমকহারামী করে—মত্ত নদীর খর স্রোতের সম্মুখে রুখিয়া দাঁড়ায়—তাহার গতির বিরুদ্ধে একটা বিরাট প্রতিকূল শক্তি গড়িয়া তুলে। তখন নদীর গর্ব্ব খর্ব্ব হয়—নদীর মোহনায় চড়া পড়ে—ভরা নদী মজিয়া যায়। সেখানে ধরণীর ঢল ঢল তরল লাবণ্য ম্লান হইয়া যায়।

কিন্তু এই কৃতঘ্ন বালুকণার সংহতি অজ্ঞের একজোট, জ্ঞানহীনের অন্ধ-শক্তি। প্রাণময় জগতেও তেমনি দীন-হীন ক্ষুদ্রের দ্বারা প্রকৃতির পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে,—এক স্থানের পদার্থ অন্য স্থানে মিলিতেছে—লঘু মিলিয়া গুরু হইতেছে, গুরু ভাঙ্গিয়া লঘু হইতেছে। আমার মনে হয়, বিধির বিধানে সৃষ্ট জীবের মধ্যে যাহারা ঐ শক্তির অধিকারী, তাহারাই ঐশ-শক্তি-ভূষিত সৃষ্টিরক্ষক প্রজাপতি:—তা' হউক তাহারা গাছের পাতার সবুজ কোষ ক্লোরোফিল, আর হউক তাহারা ভ্যানভেনে মৌমাছি বা ঢ্যাবঢেবে লাক্ষা-কীট। গাছপালার প্রাণ আছে এ কথা এখন সিদ্ধ;—তবে তাহাদের জ্ঞানের মাত্রা কতটুকু, তর্ক সেই খানে। এখন তাহারা শারীরিক সুখ দুঃখ, সুবিধা-অসুবিধার কথা আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের খাতায় লিখিয়া দিতেছে। সে হিসাবে গাছের সবুজ কোষের প্রাণ আছে,—সে বালুকণার মত জড় নয়,—সে জীবদেহের অঙ্গ। এই ক্লোরোফিল সৃষ্টিরক্ষক প্রজাপতির প্রধান কর্ম্মচারী—তাঁহার পৃথিবী-পরগণার নায়েব, মনিব, গোমস্তা। সূর্য্যালোকে দাঁড়াইয়া বাড়ীর কর্ম্মকর্ত্তা মুরুব্বির মত কার্ব্বন বা কয়লার সঙ্গে জলজানকে ওতপ্রোত ভাবে মিলাইয়া দেয়, বদ্ধ অম্লজানকে অব্যাহতি দেয়। এই ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র তুচ্ছ ক্লোরোফিলের দানা যদি hydrocarbon বা উদঙ্গার নির্ম্মাণ করিয়া না দিত, তাহা হইলে পৃথিবীতে কোনও প্রাণী বসবাস করিবার অধিকার পাইত না। যেহেতু এ কথাটা এখন উত্তমরূপে প্রমাণ হইয়া গিয়াছে যে, প্রকৃতির অশরীরী শক্তিকে শরীর দিতে পারে এক ক্লোরোফিল; আর সেই শরীরী উদ্ভিদ বা উদ্ভিদ-ভোজী জীব না খাইলে কেহ বাঁচিতে পারে না। এই জীব-পরিপোষক উদঙ্গার রচনার কায়দা-করণ কেবল উদ্ভিদের করায়ত্ত—আমাদের মধ্যে কোনও হোমরা-চোমরা পণ্ডিত এখনও সে শক্তি নিজস্ব করিতে পারেন নাই। আমি দৃষ্টান্ত বাড়াইয়া আপনাদের ধৈর্য্য পরীক্ষা করিতে চাহি না। আমার বক্তব্য বিষয়ে এই ক্লোরোফিলের কথাটা "শিব-সঙ্গতী" নয়। প্রাণ-পরিপোষক উদ্ভিদ-জগতের বংশের ধারা অপ্রতিহত থাকে, তাহার ফুলের রেণু তাহার ফুলের বীজ-কোষের মধ্যে মিশিলে। মৌমাছি-প্রমুখ কীট পতঙ্গ এই মিলনে বিশেষ ভাবে সহায়তা করে। কিন্তু সে সাহায্য উদ্ভিদ পায় না, তাহার কাজের মজুরি না দিলে। উদ্ভিদ ফুলের চুঙ্গির ভিতর মধু জমাইয়া রাখে, মৌমাছি সেই সুধার লোভে অঙ্গে ফুলের রেণু মাখে, সেই রেণু অপর ফুলের পক্ব বীজ-কোষে মিশাইয়া দেয়, তখন ফুল তাহার মজুরি দেয় অতি অল্প একটু সুধা। এই সুধা থাকে বটে ফুলের বুকের মাঝে; কিন্তু ভাবিবেন না, এই বুকের ধন দিয়া ফুল বড় বদান্যতার পরিচয় দেয়। মৌমাছির পেয় হইলেও, ফুলের সুধা ফুলের পক্ষে জঞ্জাল। উদ্ভিদের দেহের মধ্যে রাসায়নিক কারখানা আছে। সেখানে উদ্ভিদের পুষ্টির জন্য নানাপ্রকার পদার্থ নির্ম্মিত হয়। শর্করা বা চিনি সেইরূপ একটী পদার্থ। যে শর্করাটুকু তাহার দেহের মঙ্গলের জন্য আবশ্যক হয় না, উদ্ভিদ সেই চিনিটুকু ফুলের মাঝে ফেলিয়া রাখে। প্রকৃতি আদৌ অপচয় দেখিতে পারে না। সে জঞ্জালটুকু সে রাখিয়া দেয়; কারণ, সে জানে, যাহা উদ্ভিদের পক্ষে আবর্জ্জনা, তাহা অনেক জীবের পক্ষে সুধা। তাহার বীজ-গঠনে সহায়তা লইয়া ফুল মৌমাছিকে দেয় এক বিন্দুর তিন শতাংশের এক অংশ সুধা! কি বদান্যতা!

এই এত অল্প মাত্রায় কেন সুধাদান করিয়া প্রকৃতি উদ্ভিদ-জগতের বংশধারা অক্ষুন্ন রাখে, তাহারও একটা কারণ আছে। এই কার্পণ্যের মূলে প্রকৃতির সকল অনুষ্ঠানের মত

দোকানদারা আছে। একই ফুলের রেণুর দ্বারা বীজ উর্ব্বর হইলে তেজাল গাছ জন্মে না। ভিন্ন ফুলের রেণু পাইবার জন্য প্রকৃতি নানা কৌশল করিয়াছে। 'অর্চ্চনা'র আমি সে কথা বলিয়াছি। আমার মনে হয়, এই ভিন্ন ফুলের রেণু লাভের জন্যই ফুলের দান অত তুচ্ছ —প্রকৃতি এত কৃপণ। একশত ফুলে ঘুরিলে তবে মৌমাছি এক পেট সুধা পায়; আর তাহার ক্ষুদ্র দেহের এক পেট সুধা এক বিন্দুর এক-তৃতীয় অংশ মাত্র। এক টানে এক শত ফুলে ঘুরিবার সময় একের রেণু অন্যের বীজে মিলাইয়া মৌমাছি তাহাদের উর্ব্বর করে। সুতরাং আমরা যখন মৌচাকের মধু লুটিবার সময় মনকে আঁখি ঠারিয়া বলি যে, চোরের উপর বাটপাড়ি করিতেছি, সে কথাটা অলীক। আমরা বাটপাড় নই, কারণ মৌমাছি বেচারা চোর নয়।

সমবায় গড়িয়া, সঙ্ঘ রচিয়া তবে ক্ষীণ-দেহ মৌমাছি প্রকৃতির এত বড় একটা কার্য্য সাধিতে পারে,—আমাদের মত রসগ্রাহী জীবকে মধুদান করিতে পারে। প্রকৃতির একটা আবর্জ্জনাকে সংগ্রহ করিয়া অন্য জীবের মঙ্গল সাধিতে পারে বলিয়াই তুচ্ছ মৌমাছি বরেণ্য। আমরা ভূমিষ্ঠ হইয়াই তাহার পরিশ্রম-লব্ধ মধু পান করি; মধু দিয়া যাগ-যজ্ঞ করি, দেবতার প্রসাদ পাইবার জন্য; আর তাহার ঘর ভাঙ্গিয়া মোম লই দেবতার সন্তোষের জন্য; কারণ, কেবল হিন্দু নয়, মুসলমান, ক্যাথলিক, য়ুহুদি সকলের দেবালয় আলোকিত হয় চাক-ভাঙ্গা খাঁটি মোমের দীপের আলোকে। নানা লোকে নানা কারণে মৌমাছির কার্য্য-কলাপ পর্য্যবেক্ষণ করে, তাহার সমবায়ের গুণ গান করে। আমার কিন্তু মনে হয় যে, মৌমাছি মানুষের প্রিয় একটা কারণে - সে তাহার সঙ্ঘের ভাণ্ডার হইতে আমাদের মধুদান করে বলিয়া। যে দেয়, সেই বড়,—সেই বন্ধু। মৌমাছি মধুদান করে, তাই সে বরেণ্য। অবশ্য কথাটা নিষ্ঠুর ও উচ্চনীতির পরিপন্থী বটে; কিন্তু ইহার একটা গুণ আছে যে, ইহা শতকরা ৯৯ জনের প্রাণের স্বরের প্রতিধ্বনি।

এ হেন মক্ষি-সঙ্ঘ দেখিবার, বুঝিবার—দেখিয়া, বুঝিয়া তাহাকে মজিবার সামগ্রী। চল্লিশ, পঞ্চাশ, ষাট হাজার জীব একত্র বাস করে;—এক উদ্দেশ্যে, এক সাধনায় প্রাণপাত করে;—অক্লান্ত ভাবে পরিশ্রম করে;—পরস্পরে মারামারি-কাটাকাটি করে না, খেয়োখেয়ি দলাদলি করে না;—তথাকথিত ইতর জীবের এ হেন কার্য্য-কলাপ দেখিয়া জীব-শ্রেষ্ঠ মনুষ্য অক্লেশে লজ্জায় নতশির হইতে পারে। মক্ষি-সমবায়ের দৈনন্দিন কাজ করিবার, চলা-ফেরার প্রতি পদে-পদে যে সব আইন-কানুন, বিধি-নিষেধ মানিয়া চলিতে হয়, সেগুলার মধ্যে বিচার-বুদ্ধির জাজ্বল্য প্রমাণ আছে। সে বুদ্ধির জন্য মৌমাছি স্বয়ং কতটুকু স্তুতির দাবী করিতে পারে, সে কূট তর্ক পরে তুলিব।

মৌচাক মৌমাছির জন্মভূমি, কর্ম্মভূমি, বাসস্থান। চাক্ তাহার নিজের গড়া। চাক-নির্ম্মাণের মাল-মসলাটুকু তাহার নিজের দেহ-নিঃসৃত যন্ত্রের সামগ্রী। তাই মানুষের পূর্ত্ত-বিভাগের কার্য্যের মত ইহাদের পূর্ত্ত-বিভাগে অপচয় নাই;—'কোম্পানীকা মাল দরিয়ামে ডাল'—এ নীতির প্রচলন নাই।

মধুচক্র দেখে নাই কে? পুরাণ-বাড়ীর ঠাকুর-দালানের কড়ি-কাঠে, বৃদ্ধ-পিতামহের পিতামহীর প্রতিষ্ঠিত বৃহৎ অশ্বত্থ-বটের কোটরে, গোশালার ছাঁচতলায়,—যে স্থানই একটু ঝড় ঝাপটা, দুর্গন্ধ হইতে নিরাপদ, মৌমাছির দল সেই স্থলেই বাসা করে। আমার নিকটে একটা শূন্য মধুচক্র আছে, সেটি বড় আমগাছের আওতায় প্রোথিত একটা তরুণ কামিনী গাছের মোটা ডালে রচিত হইয়াছিল। ইহার উপরের ভিত্তি ছিল কামিনী গাছে, পার্শ্বের বাঁধন ছিল বাগানের কাঠের রেলে। স্থানটি বেশ নিরিবিলি—ঝড়-ঝাপটা হইতে অনেকটা নিরাপদ, অথচ ভূমি হইতে মাত্র ৪।৫ ফুট উচ্চে। আমাদের দেশে মৌমাছির চাষ নাই; তাই আমি এই প্রকৃতিজাত মধুচক্রের কথা বলিলাম। বিলাতে মৌমাছির চাষ হয়, তাই বিলাতী পুস্তকের বর্ণনা তাহাদের মক্ষি-শালা, bee-house, apiaryর বর্ণনা। মোটের উপর উভয় সম্প্রদায় মৌমাছির গুণপণা, কৃতিত্ব, শিল্প-কলা সমান। আমি সংক্ষেপে বিলাতী মক্ষি-শালারও বর্ণনা দিব।

বলিয়াছি মৌচাক মোম-রচিত। মক্ষিকারা কিরূপ

উপায়ে চাক নির্ম্মাণ করে, সে কথা পরে বলিব। এখন বলিব চাকের কথা। মক্ষিকা-হীন মধুচক্র দেখিতে বড় সুন্দর। চক্রে মক্ষিকা থাকিলে তাহার সান্নিধ্য বড় নিরাপদ নহে এবং ঝাঁক-ঝাঁক মৌমাছি চাকে বসিয়া ভ্যানভ্যান করিতেছে, নিজের মনে ছুটাছুটি করিতেছে,—আর্ট হিসাবে সে চিত্রও বড় মনোরম নহে। নীচে ভিত্তি করিয়া আমরা যেমন অট্টালিকা উপর দিকে গাঁথিয়া তুলি, মৌমাছি তেমনি উপরে গাছের ডালে, বা কড়িকাঠে, বিলাতী মক্ষিশালায় ফ্রেমের উপরের কাষ্ঠে ভিত গাঁথিয়া ক্রমশঃ নীচের দিকে ঘর বাড়াইয়া যায়। চাকের দুইদিকেই ঘর থাকে; অর্থাৎ যদি এক সারি ঘর হয় পূর্ব্বমুখ, অপর সারি হইবে পশ্চিম মুখ। এই ঘরগুলি প্রত্যেকটি ছয়-কোণা—কিন্তু প্রত্যেক ঘর সমান নয়, কতকগুলি বড় কতকগুলি ছোট; কতক-গুলি ঠিক সোজা horizontal নয়, বাহিরের মুখটা একটু উঁচু। ভবিষ্যতে যাহারা মক্ষি-রাণী হইয়া অন্য চক্রে গৃহিণী-পণা করিবেন, তাঁহারা বড় প্রশস্ত কক্ষগুলায় পালিতা হন। যে ঘরগুলার ভিতর দিকে ঈষৎ ঢালু সামান্য গড়ানে, সেগুলি ভাণ্ডার-গৃহ,—তাহারই ভিতর মধু থাকে। মধু গড়াইয়া আসিবে না বলিয়া ঐরূপ গৃহ নির্ম্মাণের ব্যবস্থা।

শ্রাদ্ধ।

[অধ্যাপক শ্রীপ্রিয়গোবিন্দ দত্ত এম-এ, বি-এল]

শ্যামার বিধবা হওয়ার সংবাদ বহন করিয়া সর্দ্দার লক্ষ্মণ সিং যখন তাহার বাবু মাধবচন্দ্রকে নির্ম্মম পত্রখানি প্রদান করিল তখন মাধবচন্দ্র খবরের কাগজের বিজ্ঞাপন পড়িতেছিলেন। সুদীর্ঘ গ্রীষ্মাবকাশের কর্ম্মহীন গেঁয়ো দিন আর কাটিতেছিল না। তিনি কলেজে অধ্যাপকতা করিতেন। সে কলেজ খুলিতে তখন আরও পনর দিন বিলম্ব ছিল। এমন সময় ঠিক উল্কাপাতের মতনই ভগ্নীর বিধবা হওয়ার সংবাদটা তাঁহার কাছে পৌঁছিল।

একটা কাণ্ড বাঁধিবে ভাবিয়া লক্ষ্মণ সিং সরিয়া পড়িল। সেইজন্য পত্রখানি পড়া শেষ করিয়া মাধবচন্দ্র যখন জলভরা চক্ষু দুইটি উঠাইলেন তখন আর সেখানে কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা ভাবিয়া মাধবচন্দ্র নিজে নিজেই কহিলেন—যাক্ আমার কাছেই এনে রাখব। ঠিক তখনই তাঁহার স্ত্রী সুশীলা দ্বারের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া কহিল—বা! আজ যে এখনও স্নানের নাম নেই! আমি আর পারি নাকো। তাগিদ দেওয়ার জন্য একটা লোক রাখলেই পার। এত নবাবী করলে আবার সংসার চলে!

মাধবচন্দ্র কহিলেন, একটু স্থির হও। চিঠি এসেছে। খবর ভাল নয়। এই নাও, পড়ে দেখ।

সুশীলা চিঠিখানি হাতে করিয়া চলিয়া গেল।

বৈকালে জল খাইতে বসিলেই মাধবচন্দ্রকে সুশীলা কহিল—এখন তুমি কি করবে?

মাধবচন্দ্র কহিলেন—লক্ষ্মণকে নিয়ে কাল শ্যামাদের ওখানে একবার যাব। শ্রাদ্ধের ত একটা বন্দোবস্ত করতে হবে।

সুশীলা কোনও কথা না বলিয়া নিজ কার্য্যে চলিয়া গেল।

পরের দিন মাধবচন্দ্র বাক্স গোছাইতেছিলেন, এমন সময় সুশীলা আসিয়া কহিল—যাচ্ছ যখন বারণ করব না—কিন্তু দেখ যেন গুষ্টি-শুদ্ধো নিয়ে হাজির হয়ো না। একেই ত পাঁচ ছয় জনকে বসিয়ে বসিয়ে খাওয়াচ্ছ।

মাধবচন্দ্র বলিতে যাইতেছিলেন—নিজের ভাইয়ের ছেলে তাদিকে খাওয়াব না? কিন্তু মুখ দিয়া কথা বাহির হইতে না হইতেই সুশীলা কহিল—রক্ষে কর, আমি আর শুনতে চাইনে। ও গদ্ ত একশো বারের কম শুনাও নাই। এদিকে রাঁধতে রাঁধতে আমার হাতের আঙুল কটা যে ক্ষয়ে যাচ্ছে তা'ত কেউ দেখতে পাচ্ছে না। দু-চারটে ঠাকুর চাকর রাখবার সামর্থ্যও ত নাই যে রাতদিন কথা শুনাতে আস।

মাধবচন্দ্রকে জবাব দিবার কোনও সুযোগ না দিয়া সুশীলা চলিয়া গেল। মাধবচন্দ্র অনেকক্ষণ ভাবিয়া চিন্তিয়া ডাকিলেন—লক্ষ্মণ সিং। 'হুজুর' বলিয়া লক্ষ্মণ সিং আসিয়া দাঁড়াইলে মাধবচন্দ্র কহিলেন—তামাকু বাড়াও।

কি ভাবিয়া মাধবচন্দ্র সেদিন আর গেলেন না। রাত্রে সুশীলার নিকট কথাটা পাড়িতেই সে ব'লল—যাও, বিরক্ত করো না। আমার বড়ই ঘুম পাচ্ছে। সুতরাং পত্নীর পরামর্শ না গ্রহণ করিয়াই মাধবচন্দ্রকে ভগ্নীর বাড়ী যাত্রা করিতে হইল।

দাদাকে দেখিয়া শ্যামা চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। মাধবচন্দ্রেরও দুই গণ্ড বাহিয়া অশ্রুধারা পড়িল। পরের দিন সকালবেলায় হরি-ঝি আসিয়া কহিল, বাবু,কি বোলব। আমাদের কর্ত্তা যেদিন স্বর্গে গেলেন তার পরের দিন সকালে ও বাড়ীর উপেন ঘোষ এসে ঘটি বাটি প্রায় সকলই সারয়ে নিয়ে গেল। বললো কি না—সেই এখন মালিক। গিন্নীমার যখন ছেলে মেয়ে নেই তখন স্বামীর বিষয়ে তাঁর এক তিলও অধিকার নাই। ও মা! এই নাকি দেশের আইন!

মাধবচন্দ্র উত্তেজিত হইয়া কহিলেন—কি! টাকা পয়সা সব নিয়ে গেছে?

হরি-ঝি কহিল—না বাবু, আমরা নিতে দেই নি। গিন্নীমা দা নিয়ে বড় ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে বললেন—হরি, আয় দেখিন আমার কাছে। আমি যেতে না যেতেই উপেন ঘোষ যেয়ে বোলল—বৌদি, একটু সরে দাঁড়াও দেখি। সিন্দুকটা একটু বের করে দেখব।

গিন্নীমা বললেন—চুরি ডাকাতি যা করছ তা ওদিক থেকেই কর—এদিকে এলে বুঝিয়ে দেব কার কাঁধে ক'টা মাথা। উপেন ঘোষ আর এগুতে সাহস না করে চলে গেল বাবু। গিন্নীমা তখন তাকে শুনিয়ে শুনিয়ে বললেন—চাষার ছেলের বুকেও একটু দয়া মমতা থাকে। ভদ্রলোকের ছেলে হয়ে চুরি করতে শিখেছে—এটা চাষারও অধম।

মাধবচন্দ্র কহিলেন—ঠিকই বলেছে তোদের গিন্নীমা। উপেনটা চুরিই করেছে। নালিশ করলে তার জেল অনিবার্য্য। এমন পিশাচ ত দুনিয়ায় দেখি নাই। ওকে জেলে পাঠানই ভাল।

আর দেরী না করিয়া মাধবচন্দ্র চশমাটা চোখে লাগাইয়া লাঠিটা হাতে করিয়া বাহির হইয়া পড়িলেন। হাঁটিতে হাঁটিতে গ্রামের পাঁচজন ভদ্রলোককে একজায়গায় করিয়া কহিলেন—আমি সহজে ছাড়ব না, দেখে নেব, উপেন ঘোষের বুকের জোর কতখানি।

উপেনের বন্ধু হরি চক্রবর্ত্তী কহিলেন—কেন, উপেন ত আইনমতই কাজ করেছে। তার আবার ভয় কি? গায়ে প'ড়ে এত চেটাং চেটাং কথা শুনানই বা কেন? ফৌজদারী ত বন্ধ নেই, আর নালিশ করতে ত কেউ মানা করে নাই যে চুপটি করে বসে আছেন।

মাধবচন্দ্র কহিলেন—বেশ, শুনে সুখী হলুম। আইন মত কাজ করেছে কি না তা' আদালতেই বুঝা যাবে।

এমন সময় উপেন ঘোষ আসিয়া কহিল—মুখে বড়াই না করে আদালতে গেলেই হয়। আমিও বলে' রাখছি আমার ভাই এর বিষয়ের এক কানা কড়িও যদি কেউ ঘরের বের করে, তবে তার একদিন আর আমার একদিন। আমিও আইন জানি। থানাও আমার চেনা আছে। মনে রাখবেন, এ স্কুলের ছেলে নয় যে লেজ গুটিয়ে কথা শুনবে।

আর একটু হইলেই একটা হেস্ত-নেস্ত বাধিয়া যাইত। কিন্তু আর সকলে মিলিয়া উপেনকে থামাইয়া দিল। নিতাই চৌধুরী কহিলেন—থাম উপেন। ভদ্রতা ত একটা আছে। তোর দাদার শ্রাদ্ধের খরচ পত্তর ত তোকেই করতে হবে। আর তোর বৌদিকে খোর-পোষ ত তুই-ই দিবি। দশ পাঁচ টাকার ঘটি বাটি নিয়ে এত চাষামী করা কি ভাল? আমরা পাঁচ জন আছি। যা' হয় একটা মীমাংসা করে দেব।

"আমি যদি দাদার সমস্ত জিনিষ পত্র না পাই তবে বলে রাখছি আমি দাদার শ্রাদ্ধে থাকব না।"—এই বলিয়া উপেন ঘোষ চলিয়া গেল। হরি চক্রবর্ত্তীও উঠিতে যাইতেছিল, কিন্তু উপেন চোখের ইসারায় কি যেন কহিল। সে রহিয়া গেল।

অনেকক্ষণ কথা কাটাকাটি করিয়াও আইনের মর্ম্মটা মাধবচন্দ্র কাহাকেও তেমন করিয়া বুঝাইতে পারিলেন না।

নিতাই চৌধুরী কহিলেন—বাপ দাদার আমল থেকে আমাদের গ্রামে ঘরে যেমনটি হয়ে আসছে এক্ষেত্রেও তেমনটী হবে। অত আইন দেখতে গেলে কি আমাদের চলে? আমাদের এখানে বামুন পণ্ডিতের ব্যবস্থারই চল। আপনাকেও সেই ব্যবস্থা মানতে হবে।

"লেখা পড়া শিখে বে-আইনী কাজ আমি করতে পারব না"—বলিয়া মাধবচন্দ্র উঠিয়া পড়িলেন। নিতাই চৌধুরী কহিলেন—কাল একবার আসবেন। দেখি যদি একটা আপোষ-মীমাংসা করতে পারি।

ফিরিয়া আসিয়া মাধবচন্দ্র শ্যামাকে কহিলেন—উপেন ঘোষটা কি চাষা। চুরি চামারী করে' ত জিনিষ-গুলি নিয়েছে। এখন আবার বলছে কি না সে শ্রাদ্ধে থাকবে না। আমিও সহজে ছাড়ব না। বদমায়েসী করলে আমিও তাকে দেখে নেব।

পরের দিন নিতাই চৌধুরীর নিকট গিয়া মাধবচন্দ্র একটু সকাল সকাল উপস্থিত হইলেন। সমাদর করিয়া বসিতে দিয়া নিতাই চৌধুরী কহিলেন—ওরা আসুক এখন। ততক্ষণ আপনি তামাক খান।

প্রায় দশটা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে করিতে মাধবচন্দ্র বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। "আমি তবে উঠি"—বলিয়া তিনি উঠিয়াই পড়িলেন।

তখন নিতাই চৌধুরী কহিলেন—ঘোর কলিকাল। দেখতেই ত পাচ্ছেন। এখন কি আর ছেলেরা বুড়োদের কথা শোনে? আমায় কিন্তু দোষ দেবেন না। মেটাবার জন্য আমি যে যথাসাধ্য চেষ্টা করলেম তা ত চোখেই দেখলেন।

মাধবচন্দ্র আর একটি কথাও ব্যয় না করিয়া ফিরিয়া আসিলেন। পথে হরি চক্রবর্ত্তীর সহিত দেখা হইলে চক্রবর্ত্তী মহাশয় একটু পাশ কাটাইয়া গেলেন। ঠোঁটের কোণে একটু হাসিও যেন উছলিয়া পড়িল।

বাড়ীর দরজায় আসিয়া পৌঁছিতেই লক্ষ্মণ সিং দৌড়াইয়া আসিয়া কহিল—"বাবু, জলদি আইয়ে। উ লোক সব বহুৎ হল্লা লাগায়া।"

মাধবচন্দ্র তাড়াতাড়ি বাড়ীর মধ্যে আসিয়া দেখিলেন উপেন উঠানের উপর সাত আট জন লোক লইয়া দাঁড়াইয়া আছে। আর শ্যামা ঘরের দরজায় দাঁড়াইয়া একটা দা দেখাইয়া কহিতেছে—আমি রক্ত গঙ্গা না করে ছাড়ব না বলে রাখলুম।

মাধবচন্দ্র লক্ষ্মণের দিকে রোষ-কষায়িত নয়নে তাকাইয়া কহিলেন—তুই কি করছিলি বসে বসে। এত কাল ভাল রুটি খেয়েছিস্ কি এর জন্যে?

লক্ষ্মণ সিং কহিল—হুকুম দিজিয়ে, বাবুজী। ইসব লোক্‌কা শাবি শীর উতার দেঙ্গে।

মাধবচন্দ্র কহিলেন—জলদি নিকাল দেও। বেইমান যত সব।

লক্ষ্মণ সিংএর ভীষণ মূর্ত্তি ও তেল কুচ্‌কুচ্ বাঁধান লাঠির বহর দেখিয়া উপেন ঘোষ দরজার কাছে আসিয়া সরিয়া দাঁড়াইল। আর একটু হইলেই লক্ষ্মণের কঠোর হস্ত তাহার গলদেশে অর্পিত হইত। উপেনের সঙ্গী কয়টিও লাঠির ভয়ে তাহার পশ্চাৎ ভাগে আসিয়া দাঁড়াইল। লক্ষ্মণ গর্জ্জিয়া উঠিয়া কহিল—শালা লোক! কাহে ভাগ যাতা? আও, ইধার আও।

তাড়াতাড়িতে উপেন পড়িয়া গেল। আর সেই মুহূর্ত্তে লক্ষ্মণ আসিয়া তাহার হাত পাকড়াও করিল।

মাধবচন্দ্র কহিলেন—ছোড় দেও। মারো মাৎ।

লক্ষ্মণ সিং উপেনের সখের লাঠি গাছটি কাড়িয়া লইয়া একটু ক্ষুদ্রাকারের ধাক্কা দিয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিল। খানিকটা দূরে সরিয়া গিয়া উপেন কহিল—আমি যদি এর প্রতিশোধ না নেই তবে আমার নাম উপেন ঘোষ নয়। লক্ষ্মণ তাহার দিকে অগ্রসর হইতেছিল কিন্তু মাধবচন্দ্র তাহাকে নিষেধ করিয়া থামাইয়া দিলেন।

এতক্ষণ শ্যামা দরজার নিকট দাঁড়াইয়া কাঁপিতেছিল। একটা খুন জখম হইবে ভাবিয়া তাহার আতঙ্কের আর সীমা ছিল না। উপেন চলিয়া গেলে শ্যামা কহিল—দাদা, চল, এখান থেকে চলে যাই। মাধবচন্দ্রের ক্রোধ তখনও নির্ব্বাপিত হয় নাই। তাই তিনি কহিলেন—উপেনটাকে জেলে না পাঠিয়ে আমি যাচ্ছি নে।

লক্ষ্মণকে লইয়া উপেনের দলবলের পরিত্যক্ত জিনিস

পত্র এক যায়গায় একত্রিত করিয়া মাধবচন্দ্র থানার দারোগার নিকট একটা রিপোর্ট লিখিতে বসিলেন। রিপোর্ট লেখা শেষ হইলে মাধবচন্দ্র দেখিলেন শ্যামা পশ্চাতে বসিয়া কাঁদিতেছে। মাধবচন্দ্র বিরক্ত হইয়া কহিলেন—কাঁদচিস্ কেন ?

শ্যামা অনেক কষ্টে কহিল—এর জন্য যদি মোকদ্দমা হয় তবে আমাকে ত কাচারীতে যেয়ে সাক্ষ্য দিতে হবে ? এ কথাটা মাধবচন্দ্রের মনেই ছিল না। কাচারীতে গিয়া সাক্ষ্য দেওয়াটা যে ভদ্রমহিলার পক্ষে নরক গমন তুল্য—এ কুসংস্কার যে এখনও টি'কিয়া আছে মাধবচন্দ্র তাহা বিলক্ষণ জানিতেন, এবং অন্তরে অন্তরে অনুভবও করিতেন। প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা ধরিয়া নীরব থাকিয়া মাধবচন্দ্র কহিলেন—চল, আজই চ'লে যাই। মোকদ্দমায় আর কাজ নাই।

প্রায় এক ঘণ্টার মধ্যেই দুইটা পাল্কী আর চার জন মুটে লইয়া লক্ষ্মণ হাজির হইল। মূল্যবান জিনিসগুলি একটা বেতের ঝাপিতে বন্ধ করিয়া পাল্কীর মধ্যে তোলা হইল। আর সব জিনিস পত্র মুটের মাথায় উঠাইয়া দেওয়া হইল। অবশিষ্ট যাহা রহিল তাহা ঘরের মধ্যে পূরিয়া হবসের তালা দিয়া বন্ধ করিয়া রাখা হইল।

শ্যামা যখন পাল্কীতে উঠিয়া বসিল, ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই নিতাই চৌধুরী আসিয়া কহিলেন—কি! চ'লে যাচ্ছেন না কি ? আর দুদিন থাকলেই মীমাংসা একটা-না-একটা কিছু করে দিতে পারতুম। এমনি চলেছেন—উপেনটা একটা গোলমাল বাধাতে পারে।

মাধবচন্দ্র পাল্কীতে উঠিয়া কহিলেন—সে ভাবনা আপনাদের ভাবতে হবে না। উপেন এসে রাত না দিন তা ভাল করেই বুঝে গেছে।

বেহারারা পাল্কী উঠাইতেই নিতাই চৌধুরী কহিলেন—এ করেছেন কি! ওবুধও যে যায় নাই। এমন সদ্য বিধবাকে পাল্কীতে চড়াতে হয় ? এত শিখেছেন এটা শেখেন নি! জাত গেল যে! চোদ্দ পুরুষ নরকে যাবে যে!

মাধবচন্দ্র কহিলেন—নিন্, নিন্। বক্ বক্ করে চাষার মত যা' তা' বলবেন না। গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল। তার উপর আবার সর্দ্দারী করতে আসেন। ভদ্রলোকও যে চাষার অধম হয় তা আমি এইখানেই দেখলুম।

পাল্কীটা একটু অগ্রসর হইলে নিতাই চৌধুরী কহিলেন—নবাবের মত চ'লে গেলেই হলো আর কি! আমি বলে রাখলুম, উপেন যদি বাপের বেটা হয়, তবে এ শ্রাদ্ধে সে যাবে না।

পথে মাধবচন্দ্রকে আর কোনও উৎপাত সহ্য করিতে হইল না। শুধু পাল্কীর ফাঁক দিয়া গ্রামের সীমানার পার্শ্বে তিনি হরি চক্রবর্ত্তীকে দাঁড়াইতে দেখিলেন মাত্র।

বাড়ীতে আসিয়া বেহারারা যখন পাল্কী নামাইল, তখন সুশীলা আসিয়া শ্যামাকে বিশেষ ভাবে আদর করিয়া নামাইল। সকলেই ভাবিল, তাহারা যেন পরস্পরকে পাইয়া কতই সুখী হইয়াছে। কিন্তু এক মিনিট যাইতে না যাইতেই দুই জনে পরস্পরের গলা ধরিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

পরের দিন সুশীলা সকল ঘটনা ভাল করিয়া শুনিয়া কহিল—উপেনটাকে জেলে না দিয়ে ভাল কর নাই। বদমায়েসকে প্রশ্রয় দেওয়া পাপ। ব্যাটাছেলে কাচারী গিয়ে হামেশা সাক্ষ্য দিয়ে আসবে আর আমরা গেলে মাথা কাটা পড়বে, এ কথা আমি মানতেই চাই না।

মাধবচন্দ্র কহিলেন—উপেনটা হাজার হ'লেও ত শ্যামার দেবর। তাকে জেলে পাঠান কি সঙ্গত হবে ?

সুশীলা উত্তেজিত হইয়া কহিল—রেখে দাও তোমার দেবর। বদমায়েসী করলে নিজের ছেলেকেও জেলে পাঠান মানুষের মত কাজ।

মাধবচন্দ্র কহিলেন—সাক্ষী প্রমাণ তেমন পাওয়া যাবে না। গ্রামের লোক সব বিপক্ষে।

সুশীলা কহিল—এ সব কুঁড়ের কথা বাক্সে বন্ধ করে রেখে দাও।

মাধবচন্দ্র তখন আম্‌তা আম্‌তা করিয়া কহিলেন—আমার বন্ধও যে প্রায় ফুরিয়ে গেছে। মোকদ্দমা নিয়ে পড়ে' থাকবার মত আমার কি সময় আছে ?

সুশীলা আর কোনও জবাব না দিয়া আঁচলটাকে কাঁধের উপর ফেলিয়া চলিয়া গেল।

ইহার কয়েক দিন পর মাধবচন্দ্র শ্যামাকে কহিলেন—

শ্রাদ্ধটা পশ্চিমে গিয়েই করা যাবে। আমার বন্ধুটা থাকলে এখানেই করা যেত।

শ্যামা কিছু বলিতে পারিল না, নীরবেই দাঁড়াইয়া রহিল। পার্শ্বের ঘর হইতে সুশীলা কহিল—তা হবে না। শ্রাদ্ধ এখানেই করতে হবে। তুমি চলে যেও। আমি সব ঠিক করে দেব এখন। পশ্চিমে না পাবে বামুন, না পাবে খোঁট দেওয়ার মত একটা মানুষ।

মাধবচন্দ্রকে বাধ্য হইয়াই মত দিতে হইল। তিনি কর্ম্মস্থানে চলিয়া গিয়া আবার সাতদিনের মধ্যেই কয়েক দিনের ছুটি লইয়া ফিরিয়া আসিলেন। বাড়ী আসিয়া শুনিলেন উপেন আর নিতাই চৌধুরী দুইজনেই দুইখানি চিঠি লিখিয়াছে। মাধবচন্দ্র নিতাই চৌধুরীকে জবাবটা লিখিয়া প্রায় শেষ করিয়া আনিতেছিলেন, এমন সময় সুশীলা আসিয়া কহিল—কাকে চিঠি লিখচ?

মাধবচন্দ্র কহিলেন—এই নিতাই চৌধুরীকে জবাবটা দিয়ে দিচ্ছি। সুশীলা কহিল—ও মা! আমি যে তাকে লিখে দিয়েছি অনেক কাল। জমীগুলি ওর সঙ্গেই বন্দোবস্ত করব ভাবছি। শ্রাদ্ধের পর আসতে বলেছি।

মাধবচন্দ্র কহিলেন—তোমার মনে নাই, আসার সময় ঐ নিতাইটা কেমন চেটাং চেটাং কথা শুনিয়েছিল? সুশীলা কহিল—তুমিও কম শুনাও নাই। ও-সব রেখে এখন শ্রাদ্ধটার সব ঠিক-ঠাক কর। উপেনকে কিন্তু খবরদার কোন জবাব দিও না।

শ্রাদ্ধের পূর্ব্বদিন বৈকালে উপেন আসিয়া মাধবচন্দ্রকে বাহির বাড়ীতে কহিল—আমরা অশিক্ষিত, বোধ-শোধ কম। তাই আপনার সঙ্গে ভদ্র ব্যবহার করতে পারি নাই। অনুগ্রহ করে ক্ষমা করবেন। আর দাদার শ্রাদ্ধের উদ্যোগ আয়োজন আমারই কর্ত্তব্য। আমি না করলে দাদারও অমঙ্গল, আমারও অমঙ্গল, আর নরক ভোগ। বৌদিকে বলবেন আমার যা কর্ত্তব্য তা আমি করব। আজ আমি পারণ করেছি।

শ্রাদ্ধটা সুসম্পন্ন হইবে ভাবিয়া মাধবচন্দ্র উপেনকে থাকিতে বলিলেন। পারণের জন্য উপেন বৈকালটা নিরাহারেই রহিল। তাই সুশীলার নিকট সংবাদটা সেদিন পৌঁছিতেই পারিল না।

পরদিন সকালে শ্রাদ্ধের জায়গায় জিনিস পত্র গোছাইতে আসিয়া সুশীলা উপেনকে দেখিয়া একেবারে উত্তেজিত হইয়া উঠিল, এবং পরক্ষণেই লক্ষ্মণকে ডাকিয়া কহিল—নিকাল দেও ইঁহাসে।

মাধবচন্দ্রকে খুব তাড়াতাড়ি আসিয়াই লক্ষ্মণকে থামাইতে হইয়াছিল, নতুবা লক্ষ্মণসিং সেদিন তাহার ভোজ-পুরী বাহুবল প্রকাশ না করিয়া ছাড়িত না।

অন্তঃপুরে আসিয়া মাধবচন্দ্র সুশীলাকে কহিলেন—কেন মিছামিছি তাড়ালে? উপেনটা থাকলে শ্রাদ্ধটা সুসম্পন্ন হ'তো।

সুশীলা কহিল—খুব বুদ্ধি তোমার। উপেন যে শ্যামাকে এতখানি অপমান করলে তাকি তার স্বামী স্বর্গ থেকে দেখে নাই বলতে চাও? তা দেখেও ঐ পাষণ্ডটাকে উপস্থিত দেখে তিনি শ্রাদ্ধের পিণ্ড গ্রহণ করবেন, এই তোমার মত? বিঘে কয়েক জমীর আশায় যে কুকুরের মত আসতে পারে, তার উপর তোমার শ্রদ্ধা বিশ্বাস?

মাধবচন্দ্রের মুখ দিয়া আর কথা ফুটিল না। শ্যামা নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিল।

ব্যালজ্যাক।

[শ্রীমতী নীহারবালা নাগ চৌধুরী]

ইংরাজ এদেশের রাজা বলিয়া ইংরাজী ভাষা ও ইংরাজী সাহিত্যের সহিত আমরা বেশী পরিচিত। আর এদেশের প্রাদেশিক ভাষা সমূহের মধ্যে বাঙ্গালা সাহিত্যের স্থান যে আজ এত উচ্চে তাহাও অনেকাংশে এই ইংরাজী সাহিত্যের প্রভাবে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, কথা-সাহিত্য (fiction) বিভাগে আজকাল উচ্চদরের ইংরাজ লেখকের বড়ই অভাব। মনীষা এক্ষণে ইংরাজ বর্জ্জিত য়ুরোপার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। ওয়েলস্ প্রভৃতি ইংরাজ লেখকের

প্রভাব বিশ্ব-সাহিত্যে সুপরিচিত, কিন্তু অসংখ্য দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর লেখকের মধ্যে ইঁহাদের সংখ্যা মুষ্টিমেয়। টুর্গেনিফ, ব্যালজ্যাক, গ্যাবোরিও প্রমুখ ঔপন্যাসিক ও নাট্যকারগণ তাঁহাদের রচনায় যে বিচিত্র ভাবপূর্ণ চিন্তার ধারা প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন তাহাতে য়ুরোপীয় সভ্যতার কৃত্রিম বিধানের মোহ হইতে সাধারণকে জাগ্রত করিবার চেষ্টা পরিস্ফুট। ইবসেন, হপ্টম্যান, ফ্রাঁস প্রভৃতি আধুনিক মনস্বীগণের গ্রন্থেও বর্ত্তমান সভ্য জগতের জটিল সমস্তাগুলির সমাধান প্রয়াসে নির্ভীক ও স্বাধীন চিন্তাশক্তির উন্মেষ দেখিতে পাওয়া যায়। দুঃখের বিষয়, য়ুরোপীয় ভাষায় অজ্ঞতা ও সুন্দর অনুবাদের অভাব হেতু য়ুরোপীয় কথা-সাহিত্যের সম্যক আলোচনা আমাদের দেশে এখনও হয় নাই।

আধুনিক ঔপন্যাসিকগণ অনেকেই realism বা বস্তুতন্ত্রের পক্ষপাতী। এই বর্ত্তমান বস্তুতান্ত্রিক লেখকগণের পথপ্রদর্শক বা বস্তুতান্ত্রিক লেখার প্রবর্ত্তক হইতেছেন ব্যালজ্যাক (Balzac)। ব্যালজ্যাক প্রায় শতাধিক পুস্তক লিখিয়া গিয়াছেন। যদিও সকলগুলিই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর নহে—কিন্তু প্রত্যেকটিতেই, বর্ণনা, চরিত্রাঙ্কন, চরিত্র-বিশ্লেষণ বা আলোচনা হিসাবে কিছু-না-কিছু বিশেষত্ব আছে। বৈচিত্র্য ও প্রাচুর্য্যই ছিল ব্যালজ্যাকের বিশিষ্টতা। আরাম-কেদারায় লম্বমান লঘুচিত্ত পাঠকের পড়িবার মত পুস্তক ব্যালজ্যাক লিখেন নাই। তাঁহার পুস্তকগুলির প্রত্যেক ছোট ছোট ঘটনাও এত সূক্ষ্ম ও সুচারুভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে যে, সম্যক উপলব্ধি করিতে হইলে বিশেষ ধৈর্য্য ও মনঃসংযোগের সহিত পাঠ করা আবশ্যক। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গসুন্দর বর্ণনা ও লেখন প্রণালীর জন্য টেন (Taine) তাঁহাকে "সেক্সপীয়র ও সেণ্ট সাইমনের সহিত জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মনুষ্য চরিত্রের পরিচয় পত্র সংগ্রাহক" বলিয়া গিয়াছেন। আমার মনে হয় ইংরাজ কবি ব্রাউনিং-এর ন্যায় মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণে ও মনুষ্য চরিত্র অঙ্কনে ব্যালজ্যাকের ক্ষমতা অসাধারণ, তবে তাহা কথাবার্ত্তায় না করিয়া বর্ণনা দ্বারা ফুটাইয়া তোলা হইয়াছে। গল্প হিসাবে ব্যালজ্যাকের লেখার আদর কমিয়া গেলেও কেবলমাত্র এই দুই কারণেই ইহারা চিরকাল উপভোগ্য হইবে। হুগোর (Hugo) বর্ণনাও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ও খুঁটিনাটি জিনিষে ভরা, কিন্তু হুগোর চরিত্রগুলিকে যেরূপ ideal situation বা অস্বাভাবিক অবস্থার মধ্য দিয়া দেখাইবার চেষ্টা হইয়াছে তাহা ব্যালজ্যাকের লেখায় বিরল। স্বাভাবিক দৃশ্য ও ঘটনা স্বাভাবিক ভাবেই খুব নিপুণতার সহিত অঙ্কিত, হুগোর ন্যায় বর্ণনা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিবার জন্য তাহাতে মানসিক বৃত্তির আরোপ করিয়া চিত্রটি আ ও রঙ্গীন করিবার আকাঙ্খা ব্যালজ্যাকের নাই। অবান্তর বা বিশেষ ঘটনার যখন প্রধান ঘটনার ন্যায় খুব বিস্তারিত ভাবে বর্ণনায় পাঠকের ধৈর্য্যচ্যুতির সম্ভাবনা হয় তখন হয়ত একটি সুন্দর ছোট্ট কথায় ব্যালজ্যাকের অসামান্য মনুষ্য চরিত্র জ্ঞানের পরিচয়ে আনন্দে মন ভরিয়া উঠে এবং পাঠক্লেশ দূরীভূত হয়।

মনুষ্য জীবনের সমস্ত বিভাগই আলোচনা করা, সমস্ত অবস্থার মানব চরিত্র অঙ্কন করা এবং সদসৎ সকল পথেই ভ্রাম্যমান মানবের পরিচয় দেওয়াই ব্যালজ্যাকের প্রধান আকাঙ্ক্ষা ছিল। তিনি উনবিংশ শতাব্দীর মনুষ্য-সমাজের চিত্র রাখিয়া যাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। প্রধান প্রধান রাজনৈতিক ঘটনাগুলিই বর্ণনা না করিয়া যাহারা সেই সময়ে বাস করিত তাহাদের স্বভাব এবং ঐ ঘটনাগুলি সম্বন্ধে তাঁহাদের ব্যবহার, এইগুলির আলোচনাই ছিল ব্যালজ্যাকের প্রধান উদ্দেশ্য। মানুষকে মানুষ হিসাবে বুঝিবার ও বোঝাইবার চেষ্টাই (realistic school) বস্তুতান্ত্রিকতার বিশেষত্ব। বর্ত্তমান য়ুরোপীয় কথা-সাহিত্যে শক্তিশালী লেখকগণের হস্তে ইহার যে পরিণতি তাহার মূলে ব্যালজ্যাক।

ব্যালজ্যাক তাঁহার রচনাবলীর নাম "মনুষ্য-জীবনের রঙ্গনাট্য" রাখিয়াছিলেন। একজন সমালোচকের ভাষায় "এই রঙ্গনাট্য একটি যাদুঘর বিশেষ, আর ইহাতে বিচিত্র রোগদুষ্ট বহুবিধ মনুষ্য-চরিত্রের সংগ্রহ ছিল।" ব্যালজ্যাকের চরিত্রগুলি বহুস্থলেই কিছু পরিমাণে অস্বাভাবিক হইলেও সকলগুলিই যে রোগদুষ্ট এরূপ বলা চলে না। তিনি যে অসংখ্য চরিত্র সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন তাহার মধ্যে সর্ব্বাঙ্গ

সুন্দর সুগঠিত জীবন্ত মূর্ত্তির সংখ্যাও কম নহে—বিশ্ব-সাহিত্যে ইহাদের স্থান চিরস্থায়ী।

ব্যালজ্যাকের বইগুলির কেবল নামই অনেকটা স্থান দখল করে। তিনি অক্লান্তকর্ম্মী ছিলেন কিন্তু বিনা আয়াসে লিখিতেন না—তাঁহার ন্যায় যত্ন সহকারে অতি অল্প লেখকই লিখিয়াছেন। তিনি লিখিতে লিখিতেই অনবরত পরিবর্ত্তন ও সংশোধন করিতেন। কথিত আছে, তিনি অনেক সময় ষোড়শ ঘটিকা বা তদূর্দ্ধ সময়ও পুস্তক রচনায় অতিবাহিত করিতেন। রাত্রি জাগরণ ও কফিপানের ফলে তাঁহার সুন্দর স্বাস্থ্য একেবারে নষ্ট হইয়া যায়। তিনি যে এত পরিশ্রম করিয়াও পঞ্চাশ বৎসর অবধি বাঁচিয়াছিলেন ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়। তিনি সারাজীবন প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন, কিন্তু এত বিলাসী ও আড়ম্বরপ্রিয় ছিলেন যে, কঠোর পরিশ্রম করিয়াও কখনও স্বাচ্ছল্য অনুভব করেন নাই। তাঁহার শেষের বইগুলি অতি অল্প সময়ে লিখিত—অভাবের তাড়নায় লিখিত বলিয়া লেখকের ব্যস্ততার চিহ্ন এই রচনাগুলিতে পরিস্ফুট। তাঁহার কল্পনা-শক্তি এত প্রখর ছিল যে, ডুমার (Dumas) ন্যায় এক সময়ে তিনি দুই, তিন বা ততোধিক উপন্যাস লিখিতে পারিতেন।

ব্যালজ্যাকের পিতা সরকারী কর্ম্মচারী ছিলেন, কিন্তু পুত্র পিতার ইচ্ছার বিরুদ্ধে সাহিত্যচর্চ্চায় রত হন এবং ১৮.৯ খৃষ্টাব্দে একোনবিংশ বয়ঃক্রম কালে প্যারিসে আগমন করেন। এইস্থানে কিছুকাল ছোট গল্প প্রভৃতি লিখিয়া তিনি দিন গুজরান করেন। অবশেষে প্রায় ত্রিশখানি গল্প-পুস্তক লিখিবার পর ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত "লে রোয়াঁ" সাহিত্য-সমাজে তাঁহাকে সুপরিচিত করিয়া দেয়। ইহার অল্প পরেই "লা ফিজিয়লজি ডু ম্যারাজ"ও অতি উচ্চদরের লেখা বলিয়া আদৃত হয়। কিন্তু "লা পু দে স্যাগ্রিঁ" নামক উপন্যাসে বাস্তব জীবনে অলৌকিক চিত্রের সমাবেশ তাঁহাকে তাৎকালিক সাহিত্যিকদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া দেয়। ইহার পর যশ ও আদর উভয়ই ব্যালজ্যাকের ভাগ্যে সুলভ হইয়াছিল। ইহার পর তাঁহার অন্যান্য লেখাগুলি ক্রমাগত প্রকাশিত হইয়াছিল। অতি নিপুণ ভাবে বিভিন্ন অবস্থায় মানব-জীবনের চিত্র—গার্হস্থ্য, নাগরিক, গ্রাম্য, রাজনৈতিক, সামরিক ও পল্লীচিত্র সম্বলিত মনুষ্যজীবনের কোনও বিভাগই তাঁহার লেখনী অঙ্কন করিতে বিরত হয় নাই। এতদ্ভিন্ন "বিশ্লেষক ও দার্শনিক রচনা" নাম দিয়া তিনি কতকগুলি চরিত্র আলোচনা রাখিয়া গিয়াছেন। এবং প্রাচীন ফরাসী ভাষায় কতকগুলি রঙ্গচিত্র লিখিয়া গিয়াছেন। "ইউজিনি গ্রান্দে," "লে পেরে গোরিয়ো," "লা ফুসিঁ বেত্তে" অনেক পূর্ব্বেই ইংরাজীতে অনুবাদিত হইয়াছিল। "লা ডিবেকল্" বা ১৮৭৫ সালের ফরাসী রাষ্ট্রশক্তির জার্ম্মানির হস্তে পরাজয় চিত্র এবং অন্যান্য ছোট গল্পেরও ইংরাজী সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে! ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে তাঁহার পুস্তক পাঠ করিয়া কাউন্টেস হান্স্কা নামক পোলিস্ মহিলা তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হন এবং এই সময়ই ব্যালজ্যাকের সহিত তাঁহার পত্র-ব্যবহার চলিতে থাকে। কাউন্টের মৃত্যুর পর উভয়ের এই পরিচয় অনুরাগে পরিণত হয়। বিবাহিত জীবনের ব্যয় সঙ্কুলানের জন্য ব্যালজ্যাককে কঠোর পরিশ্রম করিতে হয়, কিন্তু গার্হস্থ্য জীবনের শান্তি ভোগ জগদীশ্বর তাঁহার ভাগ্যে লিখেন নাই। বিবাহের তিন মাস পরেই ১৮৫০ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে এই অসাধারণ লেখকের পঞ্চাশৎ বর্ষব্যাপী জীবন-নাট্যের যবনিকাপাত হয়।

চাঁদপ্রতাপের ব্রত-কথা।

[শ্রীযোগেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী]

(৩) মঙ্গলচণ্ডী।

হিন্দু ললনাবৃন্দ ধর্ম্ম-কর্ম্মে সর্ব্বদাই ব্যাপৃত থাকেন। মাসে মাসেই তাঁহারা ব্রত নিয়মাদি করিয়া থাকেন। তাঁহাদের বিশ্বাস যে, ভক্তি সহকারে দেবার্চ্চনা করিলে অভীষ্ট সিদ্ধি লাভ হইয়া থাকে। তাই তাঁহারা কোন-কিছু লাভের কামনা করিয়া নানা ব্রত করেন। শুধু যে প্রাপ্তির আশা হৃদয়ে পোষণ করিয়াই বঙ্গ মহিলাগণ ব্রতাদি করেন, তাহা নয়; স্বধর্ম্মানুমোদিত চির প্রচলিত কর্ম্মাদি সাধ্যানুসারে সম্পাদন করা অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া তাঁহারা মনে করেন। মঙ্গলচণ্ডীর ব্রত করিলে ধন-পুত্রাদি লাভ হয়, একথা এবং "পুত্রং দেহি ধনং দেহি ভাগ্যং দেহি মে সর্ব্বদা" ইত্যাদি প্রার্থনা বাক্য ভবিষ্যপুরাণে লিখিত আছে।

বৈশাখ * মাসের প্রতি মঙ্গলবার মঙ্গলচণ্ডীর ব্রত করিতে হয়। একখানি কলার 'মাইজ' পাতায় সাতটি তুলসী পত্র, সাত গাছি দূর্ব্বা, আটটি আতপ চাউল, খোসা রহিত কাঁচা আম একটি ও অন্যান্য ফল-মূল সাজাইয়া দিতে হয়। কেহ কেহ 'মাইজ' পাতার অগ্রভাগে সিঁদুর ও উহার নিম্নে কচুপাতা দিয়া থাকেন। † কোন কোন গৃহে উক্ত পাত্রে দুই এক টুকরা লেবু এবং নৈবেদ্যও দেওয়া হয়। ছাতু, চিড়া, দুগ্ধ, দধি ইত্যাদিও পূজায় দেওয়া হইয়া থাকে; কিন্তু পিষ্টক দিবার রীতি নাই। বাড়ীর গিন্নী ও অন্যান্য মহিলাগণ ব্রত করিয়া থাকেন। ‡ প্রত্যেকেরই ভিন্ন ভিন্ন 'মাইজে' উক্ত উপকরণাদি দিতে হয়। কোন বিশেষ কারণে কেহ এক মঙ্গলবার ব্রত করিতে না পারিলে পরবর্ত্তীবারে তাহার জন্য উপকরণাদি সহ দুইখানা 'মাইজে' দেওয়া হয়। পুরোহিত শাস্ত্রোক্ত বিধান মতে চণ্ডীদেবীর পূজা করিয়া থাকেন। কেহ কেহ নিজগৃহে অসুবিধা হইলে পুরোহিত বাড়ীতে ব্রতোপকরণাদি দিয়া থাকেন। তথায় তাঁহাদের নামে সঙ্কল্প করিয়া পুরোহিত দেবীর অর্চ্চনা করেন। সেইখানেই তাঁহাদিগকে 'কথা' শ্রবণ করিতে হয়। সর্ব্বসাধারণের গৃহে দশোপচারে পূজা হইয়া থাকে। ব্রত দিবাভাগেই করিতে হয়। এই ব্রত চিরকালই করিতে হয়। নমঃশূদ্রাদির গৃহে এই ব্রত করিতে বড় দেখা যায় না।

ব্রতিনীদিগকে ব্রত দিবসে দেবী-প্রসাদ চিপিটকাদি ভোজন করিতে হয়; ঐদিন তাঁহাদের অন্য কিছু আহার করিবার নিয়ম নাই। পূজাশেষে জনৈকা ব্রতিনী 'কথা' কহিয়া থাকেন। অধিকাংশ গৃহেই, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ বাড়ীতে, পুরোহিত মঙ্গলচণ্ডীর পাচালী পাঠ করিয়া থাকেন। এ অঞ্চলের কোন স্থানে পুরাণোক্ত 'কথা' পঠিত হয় বলিয়া শুনা যায় না।

কথা।—লক্ষপতি ও ধনপতি নামে দুই সদাগর ছিলেন। তাঁহারা দুই ভাই। এক সদাগরের দুই সুরূপা কন্যার সহিত তাঁহাদের বিবাহ হয়। বড় বধূর নাম লক্ষণা,

---

* কোন্ কোন অঞ্চলে জ্যৈষ্ঠ মাসে এই ব্রত করিবার রীতি আছে। পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য মহাশয় লিখিয়াছেন, "জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রতি মঙ্গলবারে এই ব্রত করিতে হয়।" (পুরোহিত দর্পণ ৮৬৯ পৃঃ)। পুরাণে উক্ত মাসে এই ব্রত করিবার বিধান আছে। —লেখক।

† অন্য কোন স্থানে ষোলটি করিয়া প্রত্যেক দ্রব্য এবং কাঁটালের পাতা ও গুবাকও 'মাইজ' দেওয়া হয়। ইহাও পুরাণের বিধান। —লেখক।

‡ কোন কোন অঞ্চলে বর্ষীয়সী মহিলারাই মঙ্গলচণ্ডীর ব্রত করিয়া থাকেন। সুলেখিকা শ্রীযুক্তা শতদলবাসিনী বিশ্বাস মহাশয়া "বাঙ্গালার ব্রতকথা"য় লিখিয়াছেন,—"বর্ষীয়সী মহিলাগণ পরিবারের কল্যাণার্থে এই ব্রত করিয়া থাকেন।" (১৫ পৃঃ)। জানি না, এরূপ প্রথা কোথায় প্রচলিত।—লেখক।

ছোট বধূর নাম খুল্লনা। প্রতিবৎসর বৈশাখ মাসের প্রতি মঙ্গলবার দুই ভগ্নী ভক্তি সহকারে মঙ্গলচণ্ডীর ব্রত করিতেন। দেবীর কৃপায় সদাগর দুই ভাই অগাধ ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইলেন। ক্রমে লক্ষণার সাত ছেলে হইল; কিন্তু খুল্লনার একটি পুত্র, এমন কি একটি মেয়েও হইল না। নিঃসন্তান বলিয়া ধনপতি ও তাঁহার স্ত্রী বিষণ্ণ চিত্তে কাল যাপন করিতেন। এজন্য লক্ষপতি ও তাঁহার পত্নীর মনে শান্তি ছিল না।

দেশান্তরে কর্ম্মে ব্যাপৃত থাকিলে ভাইয়ের মনে অশান্তি হ্রাস পাইতে পারে বিবেচনা করিয়া, লক্ষপতি ভ্রাতাকে সঙ্গে লইয়া বাণিজ্য গমনে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। এক শুভদিনে চৌদ্দডিঙ্গা সাজাইয়া দুই ভাই বাণিজ্যের নিমিত্ত বিদেশে রওনা হইলেন।

মাঝিগণ নৌকা ছাড়িয়া দিতে উদ্যত, এমন সময় লক্ষণা হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া সহাস্য বদনে স্বামী ও দেবরকে বলিলেন যে, খুল্লনার সন্তান-সম্ভাবনা হইয়াছে। এইমাত্র টের পাইয়া তিনি নিজেই তাঁহাদিগকে এ শুভ সংবাদ দিতে আসিয়াছেন। ইহা শুনিয়া দুই ভাই অতিশয় আনন্দিত হইলেন। বাণিজ্যার্থ যাত্রা করিয়া তখনই বাটী প্রত্যাবর্ত্তন করা অসম্ভব। তাই তাঁহারা তাঁহাদের তাল পাতার ছাতা হইতে একটি তাল-পাতা বাহির করিয়া উহাতে শ্রীমন্তকুমার ও শ্রীমন্তকুমারী লিখিয়া, লক্ষপতি স্ত্রীর হাতে তাহা অর্পণ করিয়া, পুত্র হইলে শ্রীমন্তকুমার ও কন্যা হইলে শ্রীমন্তকুমারী নাম রাখিতে আদেশ করিলেন। বড় বধূ বাড়ী গিয়া পাতাটি অতি যত্নে রাখিয়া দিলেন।

যথাসময়ে ছোট বধূ একটি সর্ব্বসুলক্ষণযুক্ত সুশ্রী পুত্র সন্তান প্রসব করিলেন। এতদিনে তাঁহার জীবনের সাধ পূর্ণ হইল। নবজাত শিশুর সুন্দর মুখ দর্শনে দুই ভগ্নীর আহ্লাদের সীমা রহিল না। শিশুর নাম রাখা হইল শ্রীমন্তকুমার। সে বৎসর দুই ভগ্নী খুব ঘটা করিয়া মঙ্গল-চণ্ডীর পূজা করিলেন।

এদিকে দুই সদাগর নানা দেশ ঘুরিয়া অবশেষে অভিপ্সিত রাজ্যে আসিয়া উপনীত হইলেন। তখন তাঁহারা ভক্তি-পূতান্তঃকরণে মা মঙ্গলচণ্ডীর উদ্দেশে করযোড়ে প্রণাম করিলেন। সেই সময় জলের উপর পদ্মাসনোপবিষ্টা এক অলোকসামান্য রূপবতী নারী সন্দর্শনে তাঁহারা বিমোহিত হইলেন। তাঁহারা ভাবিতে লাগিলেন যে, ইনি মানবী নহেন,—নিশ্চয়ই দেবী।

দেখিতে দেখিতে নৌকা রাজধানীর নিকটবর্ত্তী হইল। মাঝিরা রাজধানীর ঘাটে নৌকা লাগাইল। তাঁহাদের আগমন সংবাদ অবগত হইয়া সেখানকার বণিকগণ তাঁহাদের নিকট যাতায়াত করিতে লাগিল। ক্রয়-বিক্রয়ে তাঁহাদের মন নাই; কাহারও সঙ্গে তাঁহারা কথাবার্ত্তাও কহিতে চাহেন না। তাঁহারা সেই দেবীর চিন্তায় সর্ব্বদা বিভোর থাকেন। একদিন প্রসঙ্গক্রমে রাজা তাঁহাদের নিকট হইতে কমলে কামিনীর কথা শুনিলেন ও অতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। রাজা দুই ভাইকে বলিলেন যে, যদি তাঁহারা তাঁহাকে জলের উপর কমলে কামিনী দেখাইতে পারেন, তবে তিনি তাঁহাদিগকে পুরস্কার দানে পরিতুষ্ট করিবেন; নতুবা তাঁহাদিগকে আজীবন কারা-যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে। একথায় তাঁহারা সম্মত হইলেন। তাঁহারা মনে করিলেন যে, যাহা তাঁহারা স্বচক্ষে দেখিয়াছেন, তাহা অপরেও অবশ্যই দেখিতে পাইবে। যথাস্থানে উপস্থিত হইয়া তাঁহারা রাজাকে কমলে কামিনী দেখাইতে পারিলেন না। সেই সময় তথায় জল ছাড়া আর কিছুই দেখা গেল না। রাজা ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা হইলেন। তাঁহারা চিরকালের নিমিত্ত কারারুদ্ধ হইলেন।

এদিকে শ্রীমন্তকুমার শুক্লপক্ষের চন্দ্রের ন্যায় দিন দিন বাড়িতে লাগিল। যথাসময়ে তাহাকে বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করিয়া দেওয়া হইল।

একদিন সমপাঠিদের সহিত শ্রীমন্তের কোন কারণে বচসা হইল। তাহাকে জব্দ করিবার জন্য—বাপ্‌কে যে চিনেনা, কখনও চক্ষেও দেখে নাই, তাহার আবার এত আস্ফালন—এই বলিয়া ঠাট্টা করিল। ইহাতে সে মনে বড়ই কষ্ট পাইল। বাড়ী গিয়া সে মা-মাসীকে একথা জানাইল এবং বাপ-জেঠার অনুসন্ধানে বিদেশ গমনে কৃতসংকল্প হইল। লক্ষণা খুল্লনা তাহাকে নিষেধ করিলেন, কত বুঝাইলেন, কিন্তু কিছুতেই সে মত পরিবর্ত্তন করিল না। অগত্যা

তাঁহাদিগকে অনুমতি দিতে হইল। এক শুভদিনে তাঁহাদের উপদেশানুসারে মা মঙ্গলচণ্ডীর উদ্দেশে প্রণাম করিয়া ও মনে মনে তাঁহাকে আত্মনিবেদন জানাইয়া বালক শ্রীমন্ত বাপ-জেঠার অনুসন্ধানে ঘরের বাহির হইল। রওনা হইবার পূর্ব্বে লক্ষণা তাহাকে সেই তালপাতাটি দিয়াছিলেন ও তাহার বাপ জেঠাকে চিনিবার উপায়ও বলিয়া দিয়াছিলেন। বড় আদরের শ্রীমন্তকে বিদায় দিয়া লক্ষণা খুল্লনা দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে কালযাপন করিতে লাগিলেন।

শ্রীমন্তের ডিঙ্গা নানাদেশ ঘুরিয়া পরিশেষে যেখানে তাহার বাপ-জেঠা কমলে কামিনী দর্শন করিয়াছিলেন তথায় পৌঁছিল। সেও পিতা পিতৃব্যের ন্যায় স্বচ্ছ-সলিলোপরি অর্দ্ধ কমলাসনে আসীনা সেই অনুপম রূপবতী সুন্দরী দর্শনে পরম পুলকিত হইল এবং দেবীজ্ঞানে ভক্তিপূত মনে করজোড়ে প্রণাম করিল। রাজধানীতে উপস্থিত হইয়া একথা সে প্রকাশ করিল। ক্রমে ইহা রাজার কর্ণগোচর হইল। তিনি সেই পুরাতন সংবাদ বহুকাল পর পুনরায় শ্রীমন্তের নিকট অবগত হইয়া বড়ই বিস্মিত হইলেন এবং তাঁহাকেও বলিলেন যে, যদি সে সেই কমলে কামিনী দেখাইতে পারে, ভাল; নতুবা তাহাকে চির কারারুদ্ধ থাকিতে হইবে। বালকের ধ্রুব বিশ্বাস যে, সে যাহা নিজ চক্ষে দেখিয়াছে তাহা নিশ্চয়ই রাজা দেখিতে পাইবেন; তাই সে সাহসে বুক বাঁধিল ও রাজার কথায় স্বীকৃত হইল। রাজা শ্রীমন্তের সঙ্গে যথাস্থানে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু কোথায় বা সে কমল, কোথায় বা সে অপরূপা কামিনী! বালকের কথায় অনৈক্য হওয়ায় রাজা ক্রোধে অধীর হইলেন। তিনি কোতোয়ালকে হুকুম দিলেন বালককে অবিলম্বে বুকে পাথর চাপা দিয়া কারাগারে আবদ্ধ করিতে।

শ্রীমন্ত বন্দীশালায় দর-বিগলিত নেত্রে, কাতর প্রাণে সর্ব্বদুঃখবিনাশিনী মঙ্গলচণ্ডী দেবীকে ডাকিতে লাগিল। দেবী তাহাকে স্বপ্নে দেখা দিয়া বলিলেন যে তাহার পিতা পিতৃব্যও এই রাজ-কারাগারে বন্দী; সে ও তাহারা অতি সত্বর কারামুক্ত হইবে।

সেই রাত্রিতে রাজা স্বপ্নে দেখিলেন, এক জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী তাহাকে বলিতেছেন,—"তুমি নিজে পাপিষ্ঠ, তাই আমাকে দেখিতে পাও নাই। তুমি বিনাদোষে আমার ভক্তদিগকে কারা-যন্ত্রণা দিতেছ। শীঘ্র তাহাদিগকে মুক্তি দাও এবং শ্রীমন্তের সহিত তোমার কন্যার বিবাহ দাও। নচেৎ তোমার দুঃখের অবধি থাকিবে না" রাজা অতি প্রত্যুষে তাহাদিগকে মুক্তি দান করিলেন, এবং তাহাদের নিকট ক্ষমা চাহিলেন। তখন শ্রীমন্ত পিতা ও পিতৃব্যের সহিত পরিচিত হইল। শ্রীমন্তের শ্রীমুখ দর্শনে লক্ষপতি ও ধনপতি আনন্দে আত্মহারা হইলেন।

তাহার পর রাজা মহাসমারোহে শ্রীমন্তের সহিত স্বীয় সুলক্ষণা, সুরূপা কন্যার বিবাহ দিলেন। বৈবাহিকদের নিকট দেবীর মাহাত্ম্য শ্রবণ করিলেন ও ব্রতের নিয়ম-প্রণালী অবগত হইলেন। যথাসময়ে রাণী খুব ঘটা করিয়া মঙ্গলচণ্ডীর ব্রত করিলেন।

দুই সদাগর ছেলে ও বধূকে লইয়া বাড়ী আসিলেন। তাঁহাদিগকে পাইয়া লক্ষণা ও খুল্লনার আহ্লাদের সীমা রহিল না। দেবী মঙ্গলচণ্ডীর কৃপায় তাঁহাদের সকল দুঃখের অবসান হইল। তাঁহারা সুখে শান্তিতে ঘর-সংসার করিতে লাগিলেন।

এই ব্রতের অন্য প্রকার 'কথা' আছে। তাহা চাঁদপ্রতাপে প্রচলিত নাই বলিলেই হয়। তাই উহা লিপিবদ্ধ করা সমীচীন বোধ করিলাম না।

হিক্কা ও শ্বাস রোগ এবং দেশীয় মতে তাহার চিকিৎসা।

[কবিরাজ শ্রীইন্দুভূষণ সেনগুপ্ত এল্, এম, বি]

যে সকল দ্রব্য আহার করিলে উপযুক্ত সময়ে পরিপাক না হইয়া তাহা শুষ্ক হইয়া থাকে, কিম্বা যে সকল দ্রব্য ভোজনে বক্ষঃস্থল ও কণ্ঠনালীতে জ্বালা উপস্থিত হয়, সেই সকল দ্রব্য ভোজন জন্য এবং গুরুপাক, রুক্ষ, কফবর্দ্ধক, শীতল দ্রব্য আহার, শীতল স্থানে বাস, নাসিকাপথে ধূম ও ধূলি প্রবেশ, আতপ ও প্রবল বায়ু

সেবন, বক্ষস্থলে আঘাত লাগিতে পারে এইরূপ ব্যায়াম, অধিক ভার বহন, পথপর্য্যটন, মলমূত্রাদির বেগধারণ, অনশন ও রুক্ষতাজনক কার্য্য দ্বারা হিক্কা ও শ্বাস রোগ উৎপন্ন হয়।

হিক্কা ও শ্বাস রোগের উৎপত্তি স্থান সাধারণতঃ আমাশয় ও হৃদয়। প্রাণ ও উদান বায়ু কুপিত হইয়া বারংবার ঊর্দ্ধদিকে উপস্থিত হয় ও তজ্জন্য হিক্ হিক্ শব্দের সহিত বায়ু নির্গত হইয়া থাকে। এই জন্য ইহাকে হিক্কা বলিয়া থাকে।

যে সকল কারণে কাস উৎপন্ন হয়, সেই সকল কারণে এই কাস উপেক্ষিত হইলে শ্বাস রোগ জন্মিতে পারে।

প্রকারভেদ

হিক্কা রোগ পাঁচ প্রকার, যথা—অন্নজ, যমল, ক্ষুদ্র, গম্ভীর ও মহাহিক্কা। ইহাদের মধ্যে গম্ভীর ও মহা হিক্কাই প্রাণনাশক। যে হিক্কা নাভিস্থল হইতে উৎপন্ন হয় ও গম্ভীর স্বরে প্রবর্ত্তিত হয় এবং তৃষ্ণা, জ্বর প্রভৃতি বহু প্রকার উপদ্রব আনয়ন করে তাহাকে গম্ভীর হিক্কা বলে। যে হিক্কা নিরন্তর উদ্গত হইতে থাকে, উদ্গত হইবার সময় সর্ব্ব দেহ কম্পমান করিয়া তোলে এবং যাহাতে বস্তি, হৃদয় ও মস্তক প্রভৃতি প্রধান প্রধান মর্ম্মস্থান সকল বিদীর্ণ হইতেছে বলিয়া প্রতীয়মান হয় তাহার নাম মহা হিক্কা।

অপরিমিত অন্নপানীয় সেবনের জন্য কুপিত প্রাণবায়ু ঊর্দ্ধগামী হইয়া যে হিক্কা উপস্থিত হয় তাহাকে অন্নজা হিক্কা বলে।

যে হিক্কা দুইটী বা ততোধিক সংখ্যার সহিত বিলম্বে উত্থিত হয় ও রোগীর মস্তক ও গ্রীবাদেশকে কম্পিত করে, তাহার নাম "যমলা হিক্কা"। যে হিক্কা যকৃমূল হইতে উত্থিত হয় ও অল্পবেগের সহিত বিলম্বে উত্থিত হয় তাহাকে ক্ষুদ্রিকা হিক্কা নামে অভিহিত করা হয়।

শ্বাস রোগও পাঁচভাগে বিভক্ত, যথা ক্ষুদ্রশ্বাস, তমকশ্বাস, ছিন্নশ্বাস, মহাশ্বাস ও ঊর্দ্ধশ্বাস। ছিন্নশ্বাস, ঊর্দ্ধশ্বাস ও মহাশ্বাস উপস্থিত হইলে রোগী নিশ্চয় মৃত্যুমুখে পতিত হয়। তমকশ্বাস যদিও যাপ্য, তথাপি ইহা যদি প্রথমাবস্থায় চিকিৎসিত হয় তাহা হইলে আরোগ্য হইয়া থাকে। ক্ষুদ্রশ্বাস উপস্থিত হইলে রোগী খুব কষ্ট পাইয়া থাকে, কিন্তু উহাতে রোগীর মৃত্যুর কোন আশঙ্কা থাকে না।

আমরা সাধারণতঃ তমকশ্বাসের রোগীই বেশী দেখিতে পাই। এই তমকশ্বাসগ্রস্ত রোগীকে যদি জ্বর ও মূর্চ্ছায় আক্রমণ করে তাহা হইলে তখন তাহাকে চিকিৎসকগণ "প্রতমক শ্বাস" নাম দিয়া থাকেন।

হিক্কা ও শ্বাস উভয় রোগই বাত প্রধান। কেবল তমকশ্বাস শ্লেষ্মা প্রধান। অতএব বায়ুর অনুলোমক অথচ উষ্ণ বীর্য্য ক্রিয়া দ্বারা ইহাদের চিকিৎসা করিতে হইবে এবং স্নিগ্ধ স্বেদ দেওয়ার বিশেষ আবশ্যক। হিক্কা রোগে উদরে এবং শ্বাস রোগে হৃদয়ে তৈল মর্দ্দন করিয়া স্বেদ দিলে বিশেষ উপকার হইয়া থাকে। রোগী যদি বলবান হয় তাহা হইলে বায়ুর অনুলোমকারী মৃদু বমনকারক ও বিরেচন ঔষধে (যথা আকন্দের মূল চূর্ণ দুই আনা মাত্রায় জল সহ সেবনে বমন হয়) হিক্কা ও শ্বাস প্রশমিত হয়। কিন্তু দুর্ব্বল রোগীকে কদাচ বমনের ব্যবস্থা করা উচিত নহে। কারণ ইহাতে রোগীর প্রাণ নাশের সম্ভাবনা আছে।

হিক্কারোগের দেশীয় মতে চিকিৎসা।

নিম্নলিখিত ঔষধগুলি হিক্কা ও শ্বাস রোগ নিবারক।

(১) কুলের আঁটির শাঁস; সৌবীরাঞ্জন, খৈ ও মধু চূর্ণ সেবনে হিক্কা ভাল হয়।

(২) কটুকী, স্বর্ণ গেরিমাটী ও মধু সেবনে হিক্কা বিনষ্ট হয়।

(৩) পিপুল, আমলকী, চিনি, শুঁঠ ও মধু সেবনে হিক্কা প্রশমিত হয়।

(৪) হিরাকস, কয়েদ বেলের শাঁস ও মধু সেবনে হিক্কা ভাল হয়।

(৫) পারুল বৃক্ষের ফল, পুষ্প ও মধু ইহাদের লেহন করিলে হিক্কা ভাল হয়।

(৬) পিপুল, খেজুরের মাতি ও মধু ইহাদের লেহনে হিক্কা উপশম হয়।

(৭) যষ্টি মধু চূর্ণ মধুর সহিত, পিপুল চূর্ণ চিনির

...৩ ও শুঁঠ চূর্ণ গুড়ের সহিত ইহাদের নস্য লইলে হিক্কা-রোগীর বিশেষ উপকার হয়।

(৮) মাছির বিষ্ঠা স্তন দুগ্ধের সহিত অথবা আলতার জলের সহিত গুলিয়া কিম্বা স্তন দুগ্ধের দ্বারা রক্তচন্দন ঘসিয়া নস্য লইলে হিক্কা ভাল হয়।

(৯) প্রবাল ভস্ম, শঙ্খ ভস্ম এবং ত্রিফলা (হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া) ও পিঁপুল ও গেরিমাটী সমভাগে চূর্ণ করিয়া মধু ও ঘৃতের সহিত লেহন করিলে হিক্কা রোগীর শান্তি হয়।

(১০) কেশের মূল চূর্ণ মধুর সহিত বাটিয়া সেবন করিলে হিক্কা বিনষ্ট হয়।

(১১) চিনি, মরিচ চূর্ণ ও মধু এই তিনটী দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে হিক্কা ভাল হয়।

(১২) কদলী মূলের রস মধুর সহিত পান করিলে হিক্কা প্রশমিত হয়।

(১৩) পিঁপুল, আমলকী ও শুঁঠ চূর্ণ একত্রে মধু ও চিনি ও ঘৃতের সহিত মিশ্রিত করিয়া বারংবার লেহন করিলে হিক্কা বিনষ্ট হয়।

(১৪) ময়ূরপুচ্ছ ভস্ম, পিঁপুল চূর্ণ ও মধু একত্র মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে হিক্কা প্রশমিত হয়। ইহা শ্বাস রোগে ব্যবহৃত হয়।

(১৫) হরীতকী ও শুঁঠ উষ্ণ জলের সহিত পান করিলে হিক্কা ভাল হয়।

(১৬) যবক্ষার ও মরিচ বাটিয়া উষ্ণ জলের সহিত পান করিলে হিক্কা প্রশমিত হয়। ইহা শ্বাসও নিবারক।

(১৭) ইন্দ্রযব চূর্ণ অর্দ্ধতোলা, মধুর সহিত লেহন করিলে হিক্কা ভাল হয়। ইহাতে শ্বাসও প্রশমিত হয়।

(১৮) হিং ও মাষকলাই ইহাদের চূর্ণ সমভাগে লইয়া ধূমরহিত অঙ্গারে নিক্ষেপ করতঃ ধূমপান করিলে পঞ্চ প্রকার হিক্কা প্রশমিত হয়।

(১৯) শুঁঠ চূর্ণ সংযুক্ত পক্ক ছাগ দুগ্ধ পান করিলে হিক্কা প্রশমিত হয়।

(২০) মধু ও সৌবর্চ্চল লবণ সমন্বিত ছোলঙ্গ লেবুর রস পান করিলে হিক্কা প্রশমিত হয়।

(২১) শসাবীচির শাঁস ৮।১০টী কিঞ্চিৎ মিছরি ও জলের সহিত পান করিলে হিক্কা প্রশমিত হয়।

(২২) পলতার রস ১ তোলা, আমলকীর রস ১ তোলা মধুর সহিত পান করিলে হিক্কা ও বমি বন্ধ হয়।

(২৩) কুলের আঁটির শাঁস ৩টী ও শসাবীচির শাঁস ৪।৫টী একত্রে জলে ঘসিয়া কিঞ্চিৎ মিছরির সহিত পান করিলে হিক্কা ও বমি নষ্ট হয়।

(২৪) শুঁঠ ২ তোলা, ছাগ দুগ্ধ ।০ পোয়া, ।১ সের জলে সিদ্ধ করতঃ দুগ্ধাবশেষ থাকিতে নামাইয়া পান করিলে হিক্কা ভাল হয়।

(২৫) মাষকলাই কিঞ্চিৎ কুট্টিত করিয়া কলিকাতে সাজিয়া ধূমপান করিলে আশু হিক্কা প্রশমিত হয়।

(২৬) কাঁচা হরিদ্রার পত্র তামাকের ন্যায় কলিকাতে সাজিয়া অগ্নি সংযোগে তামাকের ন্যায় ধূমপান করিলে হিক্কা অন্তর্হিত হয়।*

(আগামীবারে সমাপ্য)

* হিক্কা ও শ্বাসরোগের অনেক বিষয় আমি আমার পিতৃদেব কবিরাজ শ্রীযুক্ত সত্যচরণ সেনগুপ্ত মহাশয়ের "কায়চিকিৎসা" গ্রন্থ হইতে সাহায্য লইয়াছি। হিক্কা রোগের কয়েকটী যোগও আমি আমার পিতামহ ইটালির স্বনামধন্য ভিষক্ কবিরাজ স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র শিরোমণির পরীক্ষিত ঔষধাবলীর জীর্ণ পুঁথি হইতে প্রাপ্ত হইয়াছি।
—লেখক।

সংগ্রহ ও সঙ্কলন।

শাস্ত্রে রমণীর উচ্চশিক্ষা

আদি শাস্ত্র বেদ আলোচনা করিলে দেখিতে পাই যে বৈদিককালে স্ত্রী-শিক্ষা বিশেষরূপ অনুমোদিত ছিল। অথর্ববেদে আছে "ব্রহ্মচর্য্যেণ কন্যা যুবানং বিন্দতে পতিং" কন্যা ব্রহ্মচর্য্যের দ্বারাই যুবা পতি প্রাপ্ত হয়েন। এই ব্রহ্মচর্য্য-অর্থে যে ইন্দ্রিয়-সংযমের সহিত বিদ্যাভ্যাস, বিশেষতঃ বেদবিদ্যা বা ব্রহ্মবিদ্যা অভ্যাস, তাহা শ্রুতি স্মৃতি, মহাভারত প্রভৃতি আলোচনা করিলেই বুঝা যাইবে। স্ত্রীলোকের ব্রহ্মচর্য্য পুরুষের ব্রহ্মচর্য্য হইতে বস্তুতঃ পৃথক্ করিয়া শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। আশ্বলায়ন শ্রৌতসূত্রে আছে "সমানং ব্রহ্মচর্য্যং (পট ৪, কং ১৫) স্ত্রী ও পুরুষের ব্রহ্মচর্য্য একই প্রকার হইবে। ঋগ্বেদেও দেখা যায় যে পূর্ব্বে স্ত্রী-পুরুষে মিলিত ভাবে যজ্ঞ সম্পাদন করিতেন। কেবল তাহাই নহে, বিশ্ববারা প্রভৃতি কতকগুলি স্ত্রীলোক মন্ত্রদ্রষ্ট্রী ঋষি ছিলেন এবং ঋত্বিকের কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। গোভিল গৃহ্যসূত্রে যে মন্ত্র আছে যে "সায়ংকালে এবং প্রাতঃকালে পত্নী গৃহ্য অগ্নিতে ইচ্ছা করিলে হোম করিবে," সেই মন্ত্রের টীকাকার লিখিতেছেন যে "পত্নীকে বেদ অধ্যয়ন করাইবে, কারণ পত্নী হোম করিবে, এই বচনের দ্বারাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে পত্নী বেদ অধ্যয়ন না করিয়া হোম করিতে সক্ষম হয় না।" গোভিল দর্শপৌর্ণমাস যজ্ঞ বিষয়ে মানতন্তব্য নামক আচার্য্যের মত উদ্ধৃত করিয়া স্ত্রীলোকের উচ্চশিক্ষা বিষয়ে আপনার সম্মতি জ্ঞাপন করিয়াছেন। সে মতটী এই যে গৃহকর্ত্তা প্রবাসে থাকিলে গৃহে অবস্থিত গৃহকর্ত্রীর দ্বারাও উক্ত যজ্ঞ নিষ্পন্ন হইতে পারিবে—এই যজ্ঞের পূর্ব্ব দিবসে উপবাস থাকিতে হয়, (নির্জ্জলা উপবাস বিশেষরূপে নিষিদ্ধ), এবং সেই উপবাস দিবসের রাত্রিকালে বৈদিক ইতিবৃত্ত (যথা, ব্রহ্ম হ বা ইদমেকমগ্রআসীৎ ইত্যাদি) আলোচনা করিয়া অথবা সাধারণতঃ ধর্ম্মালোচনায় যাপন করিতে হয়। বিবাহের প্রারম্ভভাগেও কন্যাকে বেদমন্ত্র পাঠ করিতে হয়; গৃহ্যসূত্রাদির অনেক স্থলেই দেখা যায় যে, নানা কার্য্যোপলক্ষেই স্ত্রীলোকদিগের বেদমন্ত্র পাঠ করিতে হইত। কেবল গৃহকর্ত্রীই যে বেদমন্ত্র পড়িয়া ক্ষান্ত ছিলেন তাহা নহে; গৃহের নাপিতানী পরিচারিকা প্রভৃতিকেও অবস্থা-বিশেষে বেদমন্ত্র পড়িতে হইত। এখনও হিন্দু-সমাজে যে সকল সামাজিক অনুষ্ঠানের বিধি আছে, তৎসমুদায় বিশেষতঃ বিবাহবিধি আলোচনা করিলেই দেখা যাইতে পারে যে, স্ত্রীলোকের বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিবার অধিকার আজ পর্য্যন্ত কেহই বিলুপ্ত করিতে পারে নাই। তবে অধুনা উপযুক্ত পুরোহিত এবং স্ত্রী-শিক্ষার অভাবে সেগুলি প্রায়ই কন্যাকে উচ্চারণ করিতে হয় না। একটী দৃষ্টান্ত দিই— শ্রৌতসূত্রে স্পষ্টই উল্লেখ আছে যে, "বেদ পত্নীকে প্রদান করিয়া তাহা পাঠ করাইবে।" আজও সেই অনুশাসনের মর্য্যাদা রক্ষা করিবার নিমিত্ত বিবাহ-কালে কন্যার হস্তে সচরাচর চণ্ডীগ্রন্থ রক্ষিত হয়।

বৈদিক ঋষিরা স্ত্রীলোকদিগকে বেদাধ্যয়নে যেমন সম্পূর্ণ অধিকার দিয়াছিলেন, তেমনি তাঁহাদিগকে তাহার উপযুক্ত পাত্র করিতেও বিরত হন নাই। তখন বাল্যকালে উপনয়নের সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মচর্য্য ব্রত অবলম্বন করা যেমন পুরুষের অধিকার ও কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচিত হইত, সেইরূপ স্ত্রীলোকেরও উপনয়ন এবং তৎসঙ্গে ব্রহ্মচর্য্য ব্রত অবলম্বন একটী গুরুতর অধিকার ও কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া কীর্ত্তিত হইত। গোভিল তাঁহার গৃহ্যসূত্রে বলিতেছেন যে বিবাহের প্রারম্ভেই "বস্ত্রাচ্ছাদিত, যজ্ঞোপবীতযুক্ত কন্যাকে (ভাবীপতি) নিরাভিমুখ করত সমীপে আনাইয়া 'প্রমে' ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করাইবে।" ইহা হইতেই আমরা বুঝিতেছি যে তখন স্ত্রীলোকের যজ্ঞোপবীত ধারণ এবং কুমারী অবস্থায় ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করা অসামাজিক ছিল না, প্রত্যুত এ সম্বন্ধে সামাজিক বিধিই ছিল। এই যজ্ঞের

সম্বন্ধে গোভিল যে একমত ছিলেন তাহা নহে। পারস্কর গৃহ্যসূত্রেও উপনীত ও অনুপনীত স্ত্রীলোকের স্পষ্টই উল্লেখ আছে "স্ত্রিয় উপনীতা অনুপনীতাশ্চ।" এই সকল সূত্র অবলম্বন করিয়া পরাশর-স্মৃতির মাধব্যভাষ্যে লিখিত হইয়াছে যে, পূর্ব্বে স্ত্রীলোকের দুই প্রকার শ্রেণী-বিভাগ ছিল, ব্রহ্মবাদিনী এবং সদ্যোবধূ; তন্মধ্যে ব্রহ্মবাদিনীদিগের রীতিমত উপনয়ন, অগ্ন্যাধান, বেদাধ্যয়ন ও স্বগৃহে ভিক্ষা প্রভৃতি অবলম্বনীয় এবং যাঁহারা ব্রহ্মবাদিনী না হইয়া গৃহলক্ষ্মী হইতে বাসনা করেন, তাঁহাদিগের যে সে রকমে নামে মাত্র উপনয়ন গ্রহণ করিয়া বিবাহ করাই কর্ত্তব্য। ভাষ্যকার শাস্ত্র হইতে স্ত্রীলোকের উপনয়ন দিবার প্রথা পাইয়াছেন, কিন্তু দেশাচার বশতঃ সাধারণতঃ স্ত্রীলোকের বিবাহ-কালে যে-সে রকমে উপনয়ন দিবার কথা নিজের উর্ব্বর মস্তিষ্ক হইতে আবিষ্কার করিয়াছেন। আমরা দেখিতেছি যে বৈদিক কালে স্ত্রীলোকের উপনয়ন ধারণ এবং ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করা একটী নিয়মিত প্রথা ছিল। এরূপ নিয়মিত প্রথা বৈদিক কালের শেষ ভাগেও প্রচলিত ছিল, তাহার ফলে বৃহদারণ্যকোপনিষদের যাজ্ঞবল্ক্য, মৈত্রেয়ী এবং যাজ্ঞবল্ক্য-গার্গী সংবাদ। পুরাণের মধ্যে দেখি যে স্ত্রীলোকের উচ্চশিক্ষার বিরোধী কোনও কথাই নাই। পুরাণের মধ্যে মহাভারতই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরাণ বলিয়া সর্ব্ববাদীসম্মত। ইহাতে মহামতি ব্যাসদেব দৃষ্টান্তের দ্বারা স্ত্রীশিক্ষার উপদেশ দিয়াছেন। মহাভারতের দ্রৌপদী-চরিত্র আলোচনা করিলে স্পষ্টই বোধ হয় যে তিনি অতিশয় বিদুষী ছিলেন। দ্রৌপদী একাধিক স্থলে পণ্ডিতা বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। বনপর্ব্বের একস্থানে আছে, "অত্র শর্ম্মা শিবা নাম ব্রাহ্মণী বেদপারগা" ইত্যাদি। শান্তিপর্ব্বের অষ্টাদশ অধ্যায়ে জনক রাজাকে সন্ন্যাসগ্রহণ হইতে তাঁহার পত্নীর নানাবিধ শাস্ত্রীয় প্রমাণাদি দ্বারা নিবৃত্ত করিবার কথা উল্লিখিত আছে। মহাভারতের সময় যে কিরূপ স্ত্রীশিক্ষার প্রচলন ছিল, তাহা সমগ্র ভারতের স্ত্রীচরিত্র আলোচনা না করিলে সম্যক্ উপলব্ধি হইবে না।

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, পৌষ ১৩২৯।

কবিতা-কুঞ্জ।

অগ্রদূত।

[শ্রীকালিদাস রায়]

নিভৃতে যবে কমল ফুটে
উষার নব আলোকে,
তাহার পাশে মধুপ গাহে হরষে,
মাদক গীতে বাড়ায়ে দেয়
জাগরণের পুলকে
বিকাশ তার শিহরে পাখা পরশে।
অরুণ ভূষা তরুণী উষা
যখনি আসে গোপনে,
শুকতারা ও পাখীরা আসে আগায়ে
রবিরে পাছে বরিতে ভুলে
রহি বিঘোর স্বপনে
কলকূজনে সবারে ভুলে জাগায়ে।

আষাঢ় ঘন জলদ যবে
ঘনায়ে আসে আকাশে
চাতক ছুটে করুণা-বারি চাহিয়া
তৃষা তাপিত ধরার ব্যথা
বহি' তাহার সকাশে
করুণ আবাহনীর গান গাহিয়া।
যবে জাতীয় জীবন জ্যোতি
জাগিতে রহে নীরবে
প্রভাতী গীতি বাজে কবির শানায়ে
সে কথা কবি রটায় আগে
ছন্দোময় গরবে
সুপ্তি হ'তে জাগর' তুষা জানায়ে।

স্মৃতি।

[শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক]

মানব মনো মণির খনি
লুপ্ত গীতের সুর তুমি,
বিকিয়ে যাওয়া লক্ষ্মীজোনের
ধান্য কণকচুর তুমি।
দেউলে পরা বুকের দেউল
কান্না হাসির রামধনু,
অতীত দিনের চিত্রশালা,
মন-পিপাসীর কামধেনু।
মহোৎসবের বরণডালা
শুষ্ক মালা সৌরভের
নয়নপলের নিরঞ্জনা
তক্ষশিলা গৌরবের।
আনন্দেরি উজ্জয়িনী
ব্যথার পাণিপথ তুমি
ভগ্ন বুকের ভাণ্ডারেতে
কালের আমানত্ তুমি।
বর্ষা বাতের চম্পা তুমি
পৌষ প্রভাতের পদ্মফুল,
দুর অলকার দ্রাক্ষালতা
বক্ষে হ'লে বদ্ধমূল।

একাগ্রতা।

[শ্রীমতী প্রতিভা দেবী]

আমি ত নিরাশ হ'ব না
বসে তব আশে, এ মলিন বাসে,
বক্ষে কি তুলে ল'বে না!
এই তাপিত হৃদয় শীতল্ করিতে,
প্রেমবারি ঢেলে হেবে না?
পাপী তাপী কত, ত'রে গেল নাথ,
করিয়ে তোমার সাধনা।
শুনে সখা তাই এসেছি হেথায়,
আশা কি পূরণ হ'বে না?

আবাহন।

[শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত বি, এ]

আজি এস, মাগো, বঙ্গে
হাসি প্রেম-রঙ্গে
আলো-পথে বেয়ে হেমতরণি
এস, এস, কল্যাণি, জননি!

আজি অম্বর ঘন-মেঘ-মুক্ত
অন্ধ-তামস রাশি লুপ্ত;
রূপ-রস-গন্ধে
হাসি-গীত-ছন্দে
ঝঙ্কৃত নন্দিত ধরণী
এস, এস, বেয়ে হেম-তরণি।

আজি সুধাময়-সিত-শরদিন্দু
বিমল-সলিল-বাহী সিন্ধু;
মঞ্জুল-কুঞ্জে
অলিকুল গুঞ্জে
সৌরভে মাতোয়ারা অবনী;
এস, জ্যোৎস্না-তরণি বেয়ে জননি!
আজি পথে পথে ছুটে যায় অন্ধ
কোথাও নাহিক পথ বন্ধ!
জাগ্রত—সুপ্ত
নব-বল যুক্ত
শুনাও অভয়-বাণী তারিণি!
ওগো, দুর্গতি-দুখ-শোক-হারিণি!

আজি সকল কুটীর, মাঝে শূন্য
আন তায় ধন-জন-পূর্ণ
উৎসাহ শান্তি
উজ্জ্বল কান্তি
শিবময়ি, শঙ্কর-ঘরণি!
ওগো, কোটী কোটী জীব-কুল ত্রাণি!

রিক্ত।

[শ্রীমতী চারুলতা দেবী]

আজ আর কিছু নাই, নিঃসম্বল আমি
আজ শুধু চেয়ে র'ব অতীতের পানে,
ছড়া'য়ে মলিন আলো রবি অস্তগামী
ক্ষীণ জ্যোতি ঢেলে দেয় বিদীর্ণ পরাণে।
ম্লান মুখে পরে ধরা শোণিতের সাজ,
আমি শুধু সেইদিকে চেয়ে র'ব আজ।

অযুত আলোক ভাতি উঠে বিভাসিয়া
স্মৃতির বিশাল গ্রন্থে—প্রতিটি পৃষ্ঠায়,
আশার কনক-রেখা উঠে উছলিয়া,
তারি মাঝে নিরাশার কালি দেখা যায়।
বিরলে খুলিয়া সেই স্মৃতি গ্রন্থখানি,
অনিমিষ চোখে শুধু চেয়ে র'ব আমি।

অতীত কি বর্ত্তমানে ভুলাইতে পারে?
আছে কি বিস্মৃতি এত অতীতের কোলে?
ভুল ভেঙে গেল আজ—পড়িনু পাথারে,
স্মৃতির লেখায় শুধু অগ্নিরাশি জ্বলে।
বাস্তব-জগতে এ যে স্বপন-সান্ত্বনা!
হায়, আমি করি তবে কার উপাসনা?

যেথা প্রাণখানি প্রেমে ভরপুর।

[শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায় বি, এ]

(Duncan Campbell Scott)

(১)

যেথা প্রাণখানি প্রেমে ভরপুর
সেথা সেথা ফোটে গোলাপ মধুর!
বহুক্ ঝটিকা, পড়ুক্ তুহিন,
অযুত গোলাপে জীবন-বিপিন।
ছেয়ে দেয় ধীরে, ধীরে দোল খায়—
তালে তালে তালে মাথাটী নোয়ায়।
জানি যেথা প্রাণ প্রেমে ভরপুর—
সেথা সেথা ফোটে গোলাপ মধুর!

(২)

যেথা প্রাণখানি প্রেমে ভরপুর,
সেথা সেথা ফোটে গোলাপ মধুর।
আসুক্ না কেন দুখ শোক রোগ,
ভাবনা অভাব শত অভিযোগ—
তাহাদের মূল গোলাপের মূলে
এমনি জড়ায়ে যাবে ভেদ ভুলে—
যা' হ'তে টুটিবে গোলাপ মধুর,
যেথা প্রাণখানি প্রেমে ভরপুর।

গান।

আমি ছুটে যাব
　　তুমি শুধু ডাক দিও
তোমার সময় যখন আসবে তখন
　　আমায় মনে ভাবিও।
হোক্‌না সপ্ত সিন্ধু পারে
　　হোক্‌না গো সে মরুর দেশ
আমার নাই বা হ'লো এ জীবনে
　　সে পথ চলার অবশেষ—
তবু ডাকলে তুমি শুনতে আমি পাব—
　　ছুটে যাব—
হয়ত তুমি মেঘের রথে
আসবে নেমে স্বরগ হ'তে
হয়ত বা গো আধেক পথে
　　তোমার দেখা পাব।
আমি তোমার চরণ লাগি দু'হাত বাড়াব—
　　ছুটে যাব—
আসবে সেদিন আসবে জানি
　　কবে, ফিরে আসবে
আবার পাখী গাহিবে গান
আবার আলো হাসবে—
সেদিন পায়ের 'পরে
আমায় নেবে না কি আপন করে'
আমি আঁখ জলের সাথে সেদিন আঁখি মেশাব—
　　ছুটে যাব।

গ্রন্থ-সমালোচনা।

প্রাচীন শিল্পপরিচয়—পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র বেদান্ত-তীর্থ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত; শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় সি, আই, ই কৃত ভূমিকা সংযুক্ত ও রাজসাহী হইতে শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ২৲ টাকা।

ভূমিকা-লেখা ব্যাধির সংক্রামণ হইতে আজকাল বাঙ্গালায় প্রকাশিত কোনও পুস্তক, এমন কি উপন্যাস, ছোটগল্প প্রভৃতিও অব্যাহতিলাভ করিতেছে না। এই ভূমিকা-ব্যাধির যুগে ভূমিকা দেখিলেই ভয় হয়। আনন্দের বিষয়, আলোচ্য গ্রন্থের শ্রদ্ধেয় ভূমিকা-লেখক মহাশয় সাধারণ ভূমিকা-লেখকের পন্থানুবর্ত্তী হইয়া শুধু দুটো ফাঁকা কথায় 'দোহাই" দিয়া কর্ত্তব্য শেষ করেন নাই। পরন্তু তিনি বিশেষ গবেষণা করিয়া শাস্ত্রীয় প্রমাণ ও যুক্তিদ্বারা শিল্প কি এবং কয় প্রকারের বুঝাইয়াছেন এবং প্রাচীন শিল্পপরিচয়ের আবশ্যকতা দেখাইয়াছেন। গ্রন্থের অন্তর্গত বিষয়গুলির মত ভূমিকাটীও পাঠ্য এবং শিক্ষাপ্রদ। প্রকৃতপক্ষে এই ভূমিকাতেই গ্রন্থের সমালোচনা হইয়াছে।

"প্রাচীন সভ্যতার পরিচয়লাভ করিতে হইলে প্রাচীন শিল্প-পরিচয় আবশ্যক। তজ্জন্য তথ্যানুসন্ধান অপরিহার্য্য। * * শিল্প-তত্ত্ব পুরতত্ত্বের অঙ্গ-বিদ্যা। তাহাতে কল্পনার অধিকার নাই। সমুচিত বিচার-পদ্ধতির আশ্রয়-গ্রহণ করিতে না পারিলে, সত্য আবিষ্কৃত হইতে পারে না। বিচার-পদ্ধতি যে প্রমাণের উপর নির্ভর করে, শিল্প-পরিচয় সেই প্রমাণ। * * মানব শিল্প বিষয়ে নিরপেক্ষ হইয়া, আত্মপ্রকাশ করিতে পারে না। কারণ সকল দেশের শিল্পের মধ্যেই তদ্দেশ-প্রচলিত বিষয় বিশেষের নিগূঢ় সম্পর্ক দেখিতে পাওয়া যায়। ভারত-শিল্প যে সকল বিষয় অবলম্বন করিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল, তাহা ভারতবর্ষের বিশিষ্টতার পরিচয়-প্রদান করে। তজ্জন্য ভারতবর্ষকেই ভারত-শিল্পের উদ্ভবক্ষেত্র বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। * * *

"বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রসারের সহিত শিল্প-পরিচয় সঙ্কলন করিবার প্রয়োজন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। তাই মনে হয় উপযুক্ত সময়েই পণ্ডিতপ্রবর বেদান্ততীর্থ মহাশয় সংস্কৃত সাহিত্যের সকল রকমের গ্রন্থ শ্রব্যকাব্য, দৃশ্যকাব্য, আখ্যায়িকা প্রভৃতি বিশেষভাবে অধ্যয়ন ও মন্থন করিয়া এই শিল্প-সমাচারখানি সঙ্কলন করিয়াছেন; এবং তাঁহার এই অক্লান্ত পরিশ্রমের ফল—এই অমূল্য রত্নহার—বঙ্গবাণীকে উপহার দিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যের গৌরব-বৃদ্ধি করিয়াছেন।

বাঙ্গালা সাহিত্যে যাঁহারা গবেষণামূলক প্রবন্ধ লিখেন, গ্রন্থখানি সর্ব্বসময়েই তাঁহাদের বিশেষ কাজে লাগিবে। যাঁহারা কর্ম্মী তাঁহারা দেশের লুপ্তগৌরবের উদ্ধারকল্পে শিল্পের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিবেন। সাধারণ পাঠক ইহা পাঠে জ্ঞানার্জ্জন করিবেন।

বাঙ্গালী পাঠকের ঘরে ঘরে গৃহপঞ্জীর মত গ্রন্থখানি বিরাজ করুক, ইহা আমাদের ঐকান্তিক বাসনা।

মণিমোহন-জীবনী—মূল্য ১৲। শ্রীযুক্ত রামকুমার নাথ সঙ্কলিত। যোগিসম্প্রদায়ের মধ্যে ৺মণিমোহন নাথ একজন প্রধান ব্যক্তি ছিলেন। আলোচ্য পুস্তকখানি তাঁহার স্বরচিত বা autobiography. এই পুস্তকখানিতে তাঁহার জীবনকাহিনী এবং যোগিজাতির উৎপত্তি ও জাতীয় আন্দোলনের সমগ্র ইতিহাসটুকু সন্নিবেশিত হইয়াছে।

এই প্রসঙ্গে আমরা একটা অপ্রিয় কথা বলিব। কোনও জাতির পক্ষেই নূতন করিয়া উপবীত-গ্রহণ-ব্যবস্থার পক্ষপাতী আমরা একেবারেই নহি। আমাদের মতে, উপবীত-গ্রহণের পরিবর্ত্তে সত্যপ্রিয় ও সেবাধর্ম্মপরায়ণ হইলে দেশের মঙ্গল হয়; শুধু উপবীত যে টানিয়া হেঁচড়াইয়া নীচু মাথাকে উঁচু করিতে পারে এ ধারণা আমাদের নাই। এই প্রসঙ্গে কর্ম্মকার-সম্মিলনীর সভাপতি সুসাহিত্যিক শ্রীযুক্ত প্রিয়লাল দাস মহাশয় যাহা বলিয়াছেন, (এই সংখ্যা 'অর্চ্চনা'র সাহিত্য-প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য) তাহা প্রণিধানযোগ্য।

পুস্তকখানির ছাপা কাগজ ভাল। যোগিজাতির নিকট গ্রন্থখানি আদর লাভ করিবে।

পরকাল-তত্ত্ব—মূল্য ।৵০, শ্রীযুক্ত রাজা শশিশেখরেশ্বর রায় বাহাদুর লিখিত ও কাশী ব্রাহ্মণ-সভা হইতে প্রকাশিত।

বহু গবেষণা করিয়া লেখক দার্শনিক যুক্তি দ্বারা "আত্মার নিত্যত্ব-সমর্থন" আলোচনা করিয়াছেন।

পরকাল সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিতে যাঁহারা ইচ্ছুক এবং অনুসন্ধিৎসু, তাঁহারা এই পুস্তিকাখানি পাঠ করিয়া উপকৃত হইবেন। আমরা ইহার শেষ খণ্ড দেখিবার জন্য উৎসুক রহিলাম।

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

২০শ ভাগ] । বৈশাখ, ১৩৩০। [৩য় সংখ্যা

মুকুন্দরামের চণ্ডীকাব্যে কৃত্তিবাসের ছায়া।

[শ্রীপ্রিয়লাল দাস এম-এ, বি-এল]

(২)

মুকুন্দরাম কৃত্তিবাসের নিকট যে অশেষভাবে ঋণী তাহার প্রমাণ তাঁহার রচিত চণ্ডীকাব্যের নাট্যাংশ ছাড়া অন্যান্য প্রকার শিল্পনৈপুণ্যের নিদর্শনের ভিতরেও রহিয়াছে।* মুকুন্দরাম কালকেতুর উপাখ্যানে নাটকীয় ঘটনার ক্রমবিকাশ দেখাইবার জন্য কয়েকবার কৃত্তিবাসের সাহায্য লইয়াছেন। সর্ব্বমঙ্গলা কালকেতুকে ছলনা করিবার নিমিত্ত প্রথমে গোধিকা রূপ ধারণ করেন, পরে তিনি মৃগী রূপ ধারণ করিলে কালকেতু তাঁহাকে মারিবার জন্য অনেক ছুটা-ছুটি করিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। দেবী আবার গোধিকা রূপ ধারণ করিলেন। সেদিন কালকেতুর ঘরে জীবন ধারণের জন্য কোনও আহার্য্য ছিল না। ব্যাধ সেই জন্য মানুষের অভক্ষ্য সেই স্বর্ণ গোধিকাকে গৃহে লইয়া গেলেন। মুকুন্দরামের চণ্ডীকাব্যের মায়া-মৃগী যে কৃত্তিবাসের রামায়ণের মায়ামৃগের অনুকরণ তাহা মুকুন্দ কবি নিজেই কালকেতুর মুখ দিয়া ইসারায় বলিয়াছেন।

"এই পাপ মায়া মৃগ, পবন জিনিয়া বেগ,
দৌড়ে বিড়ম্বিতে কৈল বিধি।
যেন রামে বিড়ম্বিতে, আইল কানন পথে,
মারীচ যেমন মায়া নিধি॥"

মুকুন্দরামের ন্যায় কৃত্তিবাসও বলিয়াছেন,—"বিধাতা করিল হেন মৃগের নির্ম্মাণ॥" দুইটি মৃগই যে খুব মুল্যবান শিকার তাহা কৃত্তিবাসি রামায়ণ ও আলোচ্য চণ্ডীকাব্যের পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন। কৃত্তিবাসের শ্রীরামচন্দ্র লক্ষ্মণকে বলিয়াছিলেন,—"জানকী চাহেন এই হরিণের চর্ম্ম।" মুকুন্দরামের কালকেতু বলিয়াছেন,—"এই মৃগ যদি ধরি, বেচিয়া সম্বল করি, ফুল্লরা পরিবে মৃগছাল।" মাধবাচার্য্যের "জাগরণ" কাব্যে রামায়ণের এই মায়া-মৃগের উল্লেখ নাই। মুকুন্দরাম দেবীকে মায়া-মৃগীর রূপ ধারণ করাইয়া শুধু রামায়ণের একটি মনোরম দৃশ্য পাঠকের মানস-পটে প্রতিফলিত করেন নাই। অশুভ দর্শন ও অভক্ষ্য গোধিকাকে গৃহে লইয়া যাইবার পূর্ব্বে মুকুন্দরামের কালকেতুকে বাঙ্গালী পাঠক শিকার লাভে বিফল মনোরথ হইতে না দেখিলে তাঁহার কার্য্য অস্বাভাবিক বলিয়া মনে করিতেন। মুকুন্দ কবি নাটকীয় শিল্প-কৌশলে ঘটনাবলীর স্বাভাবিক নিয়মে বিকাশ দেখাইবার জন্য এই দৃশ্যটি যে অঙ্কিত করিয়াছেন তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। মুকুন্দরাম যে বাল্মীকির রামায়ণের পরিবর্ত্তে কৃত্তিবাসের ভাষা রামায়ণ হইতে এই মায়া-মৃগের চিত্র গ্রহণ করিয়াছেন ইহা শুধু অনুমান-সাপেক্ষ নহে।

বাল্মীকির সীতা রামকে বলিয়াছিলেন,—"হে আর্য্যপুত্র! যদি ঐ মৃগটি জীবদবস্থাতেই ধরিয়া আনিতে পারেন, তাহা হইলে বনবাসাবসানে যখন আমরা পুনর্ব্বার রাজ্যস্থ হইব তখন আমি এই আশ্চর্য্যভূত মৃগটি শোভার্থ অন্তঃপুরে রাখিব। তখন এই দিব্য মৃগরূপ আর্য্যপুত্র ভরত ও শ্বশ্রূ দেবীগণের বিস্ময় উৎপাদন করিবে। আর যদি উহা জীবদ্দশাতে তোমার বশবর্ত্তী বা হস্তগত না হয়, তবে ইহার রুচির চর্ম্ম সংগ্রহ করিয়া আনিবে। এই মৃগ নিহত হইলে বালতৃণ নির্ম্মিত তাপসাসনের উপরিভাগে উহার ঐ স্বর্ণময় চর্ম্ম বিস্তৃত করিয়া তাহাতে তোমার সহিত উপবেশন করিব, আমার এইরূপ বাসনা হইতেছে।" কৃত্তিবাসের সীতা মৃগের চর্ম্মমাত্র চাহিয়াছিলেন, জীবন্ত মৃগ ধরিয়া আনিতে রামকে অনুরোধ করেন নাই।

"রামেরে বলেন সীতা মধুর বচন।
অনুমতি যদি হয় করি নিবেদন॥
এই মৃগচর্ম্ম যদি দাও ভালবাসি।
কুটীরে কৌতুকে রাম বিছাইয়া বসি॥"

মুকুন্দরাম কৃত্তিবাসকে অনুসরণ করিয়া কালকেতুর মুখ দিয়া ফুল্লরার জন্য মৃগচর্ম্ম চাহিয়াছেন। বাল্মীকির মায়া মৃগের "খুর বৈদূর্য্য সংকাশ" অর্থাৎ নীলকান্ত মণির ন্যায় কৃষ্ণপীত বর্ণযুক্ত। কৃত্তিবাসের মায়া মৃগের "শ্বেতবর্ণ চারি খুর দেখিতে সুন্দর।" মুকুন্দরামের মায়া-মৃগীর খুর কৃত্তিবাসের মায়া-মৃগের খুরের ন্যায় "শ্বেতবর্ণ" কারণ তাহা "রজতময়।" মুকুন্দরাম দেবীকে মৃগীরূপে কল্পনা করিয়া সামঞ্জস্য রক্ষার জন্য তাঁহাকে বহু মূল্য অলঙ্কারে সাজাইয়াছেন।

"বদরী ফলের তুল্য, নাসা অগ্রেতে অমূল্য,
গজমুক্তা তাহে লম্বমান।
কণ্ঠেতে কনকহার, হিরায় গাঁথনি তার,
কার সঙ্গে দিব উপমান॥"

মুকুন্দরাম ইহার পর বোধ হয় কোনও সমসাময়িক ধনীর প্রতি কটাক্ষ করিয়া কালকেতুর মুখ দিয়া বলিয়াছেন,—

"হেন লয় মোর মনে, পুষিয়াছে কোন জনে,
এই ত হরিণী অভিলাষে।
লইয়া এ নানাধন, বিপাকে আইল বন,
আমার দুঃখের অবশেষে॥"

কালকেতুর জীবনে আর একটি ঘটনার বিষয় ভাবিয়া দেখিলে স্পষ্ট বুঝা যাইবে যে মুকুন্দরাম কৃত্তিবাসের রামায়ণ হইতে তাহার সূত্র সংগ্রহ করিয়াছেন। কালকেতুর সহিত কলিঙ্গের রাজার যে যুদ্ধ হইয়াছিল সেই যুদ্ধে শত্রুসেনা কালকেতুর বিক্রম সহ্য করিতে না পারিয়া রণে ভঙ্গ দিলে কালকেতু নিজের রাজধানী গুজরাট নগরীতে ফিরিয়া আসিলেন। ইহার পরে কলিঙ্গের সেনাগণ পুনরায় যুদ্ধার্থে গুজরাট নগরী ঘিরিয়া ফেলিলে ফুল্লরা কালকেতুকে রামায়ণে বর্ণিত একটি বিশেষ ঘটনার কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া তাঁহাকে পলায়ন করিতে বলিলেন। ফুল্লরা কালকেতুকে যে যুক্তি দেখাইয়াছেন রামায়ণে বালির পত্নী তারাও সুগ্রীব দ্বিতীয়বার কিষ্কিন্ধ্যা আক্রমণ করিলে স্বামীকে সেই যুক্তি দেখাইয়াছিলেন। ফুল্লরা তারার যুক্তি বজায় রাখিয়া তাঁহার কথাগুলি ত্রিপদী ছন্দে শুনাইয়াছেন মাত্র। কৃত্তিবাসের তারা বালিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—"আমার বচন শুন জীবন-কারণ।" ইত্যাদি। মুকুন্দরামের ফুল্লরাও কালকেতুকে কহিয়াছেন,—

"প্রাণনাথ শুনহ আমার উপদেশ।
হারিয়া যে জন যায়, পুনরপি আইসে তায়,
হেতু কিছু আছয়ে বিশেষ॥
যদি আছে জীতে আশা, ত্যজিয়া দেশের বাসা,
প্রাণ লয়ে চল মহাবীর।
আজি পূর্ণ হইল কাল, সাজ্যে আসে মহীপাল,
তার রণে কেবা হয় স্থির॥
* * *
আমি কহি উপদেশ, যদি না ছাড়িবা দেশ,
রামায়ণে শুন ইতিহাস॥
সুগ্রীবে জিনিয়া রণে, দয়ায় রাখিল প্রাণে,
আরোপিয়া হৃদয়ে পাষাণ।
বিষম সমর ধীর, কিষ্কিন্ধ্যা আইল বীর,
জয় ঘণ্টা বাজায়ে নিশান॥

সুগ্রীব পলায়ে যায়, আশ্বাসিলা রাম তায়,
সখাভাবে রহে ঋষ্যমূকে।
সুগ্রীব রামের তেজে, বালির দুয়ারে গর্জে,
ধায় বালি রণ অভিমুখে॥
কান্দিয়া এমন কালে, চরণে ধরিয়া বলে,
পতিব্রতা বালীর রমণী।
আমি করি নিবেদন, আজি না করিহ রণ,
হেতু কিছু আমি মনে গণি॥
যে জন তোমার ভয়, রাজপাটে স্থির নয়,
সেই জন দ্বারে দেয় ডাক।
হেন লয় মোর মনে, কোপে রাজা আইল রণে,
ছলে পাছে পাড়য়ে বিপাক॥
তারে বিড়ম্বিল বিধি, না মানে জায়ার বুদ্ধি,
সমরে পড়িল রাম শরে।"

তারার উক্তি সম্বন্ধে এস্থলে বলা আবশ্যক যে, বাল্মীকি ও কৃত্তিবাসের মধ্যে যুক্তির মিল আছে। সেই কারণে মনে হইতে পারে যে, মুকুন্দরাম হয়ত বাল্মীকিকে অনুসরণ করিয়াছেন। এই অনুমানের বিরুদ্ধে বক্তব্য এই যে, যখন আমরা দেখিতেছি মুকুন্দরাম কৃত্তিবাসের রামায়ণে কল্পিত কথাগুলি আবশ্যক মত তাঁহার চণ্ডীকাব্যে সন্নিবেশিত করিয়াছেন, তখন তিনি যে মূল রামায়ণের পরিবর্ত্তে ভাষা-রামায়ণ হইতে তাঁহার কাব্যের জন্য অবশিষ্ট উপকরণ আহরণ করিয়াছেন, এই সিদ্ধান্তই সত্য বলিয়া মনে হয়। কৃত্তিবাসি রামায়ণ ও মুকুন্দরামের চণ্ডীকাব্যের ভাষায় যখন অনেক স্থলে ঐক্য দেখা যায় তখন মুকুন্দ কবি যে চণ্ডীকাব্য রচনায় ভাষা-রামায়ণের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছিলেন, এই অনুমান ভিত্তিহীন না হইবারই কথা। তবে, চণ্ডীর কবি যে বাল্মীকির রামায়ণ আদৌ পাঠ করেন নাই এবং তাহা হইতে কোনও কিছু গ্রহণ করেন নাই, এই প্রকার অসঙ্গত অনুমান করিবারও বিশেষ কোনও কারণ দেখা যায় না। চণ্ডীকাব্যে রামায়ণের ন্যায় এত বেশী না হউক, মহাভারতেরও অনেক ঘটনার উল্লেখ দেখা যায়। এতদ্ব্যতীত বহু সংস্কৃত পুরাণ ও উপপুরাণ হইতে মুকুন্দরাম চণ্ডীকাব্যের জন্য বিবিধ তত্ত্ব সংগ্রহ করিয়াছেন। সুতরাং মুকুন্দ কবি যে মূল রামায়ণ পাঠ করিয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু তিনি বাঙ্গালী শ্রোতার মনোরঞ্জনের নিমিত্ত তাহার সুপরিচিত কৃত্তিবাসি রামায়ণ হইতেই চণ্ডীকাব্যের কাঠ কুঠা, ক্ষুদ্র ও বৃহৎ নানা প্রকার সরঞ্জাম যোগাড় করিয়াছিলেন। মাধবাচার্য্যের "জাগরণ" কাব্যের এই দৃশ্যে বালির পত্নী তারার উল্লেখ নাই। মাধবাচার্য্যের ফুল্লরা মুকুন্দরামের ফুল্লরার মত বুদ্ধিমতীও নহেন। মাধবাচার্য্যের কাব্যে গুজরাট নগরী কলিঙ্গের সৈন্যগণ কর্ত্তৃক দ্বিতীয়বার অবরুদ্ধও হয় নাই। মুকুন্দরাম বালি ও সুগ্রীবের যুদ্ধ সংক্রান্ত ঘটনা ও তৎসঙ্গে কিষ্কিন্ধ্যার রাজান্তঃপুরের দৃশ্যটি কৃত্তিবাসের রামায়ণ হইতে গ্রহণ করিয়া কেবল যে চণ্ডীকাব্যের ঘটনা-বৈচিত্র্য সম্পাদন করিয়াছেন তাহা নহে। গুজরাট নগরীতে দ্বিতীয়বার যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্ব্বে কবিকঙ্কণ রাজা ও রাণীর উক্তি প্রত্যুক্তিতে বালিরাজা ও তারার কথোপকথনের সময়োপযোগী অবতারণা করিয়া উচ্চ অঙ্গের নাট্য-শিল্পের পরিচয় দিয়াছেন। জাতীয় জীবনের রঙ্গমঞ্চে অতীত ইতিহাসের ঘটনাবিশেষের দ্বিতীয় বার অভিনয়ন হইয়া থাকে (History repeats itself), এই বাক্যটির সার্থকতা মুকুন্দরাম দেখাইয়াছেন।

মুকুন্দরামের চণ্ডীকাব্যে দেবীর কার্য্যকলাপের ভিতর দিয়াও আমরা কৃত্তিবাসের রামায়ণের পরিচয় পাই। মুকুন্দ কবি দেবীর অলৌকিক ক্রিয়াগুলি দুইজন পৌরাণিক ব্যক্তির সাহায্যে সম্পাদিত হইতে দেখিয়াছিলেন। এই দুই জনের নাম—বিশ্বকর্ম্মা ও হনুমান। কৃত্তিবাসি রামায়ণে উল্লিখিত আছে যে, রামের আদেশে নল ও হনুমান কর্ত্তৃক সেতু নির্ম্মিত হইয়াছিল। অন্যান্য কপিগণও ইঁহাদিগকে সাহায্য করিয়াছে। বিশ্বকর্ম্মার পুত্র নল রাম কর্ত্তৃক সেতু নির্ম্মাণের জন্য আদিষ্ট হইলে শ্রীরামচন্দ্রের নিকট কপিগণের সাহায্য প্রার্থনা করেন। "এক মাসে বান্দি দিব শতেক যোজন। গাছ পাথর আনি যোগাউক কপিগণ॥" মূল সংস্কৃত রামায়ণ ও কৃত্তিবাসি রামায়ণে সেতু নির্ম্মাণের কথায় অনেকটা ঐক্য আছে। মুকুন্দরাম

কৃত্তিবাসি রামায়ণে লিখিত সেতু নির্ম্মাণের অধ্যায়টিকে অনুসরণ করিয়া কলিঙ্গনগরে চণ্ডীর দেউল ও কালকেতুর রাজধানী গুজরাট নগরী নির্ম্মাণ করাইয়াছেন। "বিশ্বকর্ম্মা ভগবতী করিল ধেয়ান। সেইক্ষণে বিশ্বকর্ম্মা আইল সন্নিধান॥" ভগবতী কহিলেন,—

"কলিঙ্গ দেশেতে মোর নির্ম্মাহ দেউল॥
শুনি বিশ্বকর্ম্মা তবে কৈল নিবেদন।
যুগ্ম করি কর তবে বলয়ে বচন॥
তবে সে করিতে পারি দেউল নির্ম্মাণ।
মোর সঙ্গে দেহ যদি বীর হনুমান॥"

ভগবতী স্মরণ করিবামাত্র হনুমান আসিলেন। বিশ্বকর্ম্মা ও হনুমান এক রাত্রের মধ্যে দেউল নির্ম্মাণ করিলেন। হনুমান বোধ হয় কৃত্তিবাসি রামায়ণে বর্ণিত সেতু নির্ম্মাণের ব্যাপার স্মরণ করিয়া কলিঙ্গে দেউল নির্ম্মাণ করিবার জন্য গাছ পাথর আনিয়া যোগাইয়াছিলেন। মুকুন্দরামের চণ্ডীকাব্যে এই দেউল নির্ম্মাণ ব্যাপারটি যে কৃত্তিবাসি রামায়ণ হইতে গৃহীত তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। ভাষা-রামায়ণে লিখিত আছে,—

"শ্রীরাম বলেন নল শুনহ বিশেষ।
দেউল গঠিয়া দেহ পূজিতে মহেশ॥
এত শুনি নল বীর হইয়া সত্বর।
দেউল গঠিল সেই জাঙ্গাল উপর॥
পর্ব্বত আনিয়া দেয় পবননন্দন।
চিত্র বিচিত্র করে দেউল গঠন॥
শ্বেতবর্ণ শিব গঠে তাহার ভিতর।
নল জানাইল গিয়া রামের গোচর॥"

মহর্ষি বাল্মীকি-প্রণীত রামায়ণের লঙ্কাকাণ্ডে ত্রয়োবিংশ সর্গে বর্ণিত সেতু নির্ম্মাণের কথায় কৃত্তিবাসের উক্ত দেউলের কোনও উল্লেখ নাই। তবে, লঙ্কাকাণ্ডের পঞ্চবিংশাধিক-শততম সর্গে অযোধ্যাভিমুখী বাল্মীকির রাম সীতাকে বলিতেছেন,—"ঐস্থানে ভগবান মহাদেব সেতুবন্ধনের পূর্ব্বে আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছিলেন। সেতুকার্য্য নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইবার নিমিত্ত ঐ সেতুমূল সাগর-তীর্থে আমি শিব-লিঙ্গ স্থাপন করিয়াছিলাম।" বাল্মীকির রামায়ণে দেউল নির্ম্মাণের উল্লেখ নাই। মুকুন্দরাম কৃত্তিবাসকে অনুসরণ করিয়া কেবল যে কলিঙ্গে দেউল নির্ম্মাণ করাইয়াছেন তাহা নহে। চণ্ডীর আদেশে বিশ্বকর্ম্মা ও হনুমান ও কালকেতুর রাজধানী গুজরাট নগরী নির্ম্মাণ করিয়া তাহার "সপ্তম মহলে তোলে চণ্ডীর দেউল।" "অযোধ্যা সমান পুরী, বিশাই নির্ম্মাণ করি, পুরদ্বারে রচিল কপাট।" মাধবাচার্য্যের "জাগরণে" বৌদ্ধ মঠের নমুনায় কলিঙ্গে দেবীর পূজার জন্য মঠ নির্ম্মিত হইয়াছে।

"দেবী বলে বিশ্বকর্ম্মা লও গুয়া পান।
কংস নদীতটে কর মঠের নির্ম্মাণ॥
আরতি পাইয়া হৈল বিশাইর গমন।
সংহতি চলিল বীর পবননন্দন॥
পাথর বহিয়া আনে যত ভৃত্যগণ।"

মাধবাচার্য্যের পদ্মাবতী পূর্ব্ব হইতে সব ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলেন।

"পদ্মা কৈলা সারোদ্ধার, দেবী কৈলা অঙ্গীকার,
বিশ্বভরে দিলা গুয়া পান।
কংস নদীর তটে, গঠহ সুন্দর মঠে,
অনুবল দিনু হনুমান॥"

মাধবাচার্য্যের চণ্ডীকাব্যে বিশ্বকর্ম্মা ও হনুমান কংস নদীর তটে দেবীর পূজার জন্য মঠ নির্ম্মাণ করিলেও গুজরাট নগরী নির্ম্মাণ করিবার সময় বিশ্বকর্ম্মা হনুমানের সাহায্য লয়েন নাই। মাধবাচার্য্যের চণ্ডী বিশ্বকর্ম্মাকে আজ্ঞা দিলে তিনি এককথায় গুজরাট নগর নির্ম্মাণ করিলেন। মুকুন্দরামের ন্যায় মাধবাচার্য্যের গুজরাট নগরে কোনও দেউল নির্ম্মিত হইবার কথা শুনা যায় না। বাস্তবিক, মাধবাচার্য্যের "জাগরণ" কাব্যে রামায়ণের সামান্য আভাস পাওয়া যায় মাত্র। মুকুন্দরামের চণ্ডীকাব্যের প্রত্যেক পর্য্যায়ে আমরা কৃত্তিবাসি রামায়ণে বর্ণিত ঘটনাবলীর কিছু-না-কিছু সংবাদ প্রাপ্ত হই।

মুকুন্দরাম ধনপতির উপাখ্যানে বিশ্বকর্ম্মা ও হনুমানের সাহায্যে বণিকপুত্র শ্রীপতির সাতখান নৌকাও নির্ম্মাণ করাইয়াছেন।

"বিশ্বকর্ম্মে ভগবতী করিল ধেয়ান।
স্মৃতিমাত্রে বিশ্বকর্ম্মা আইল সন্নিধান॥
তার পুত্র নাম ব্রহ্ম আইল সংহতি।
হাতে পান দিয়া চণ্ডী দিলেন আরতি॥
যদি কৃপা থাকয়ে তোমার আমা প্রতি।
সাত ডিঙ্গা গড়্যা দিবা আজিকার রাতি॥"

বিশ্বকর্ম্মা কহিলেন,—

"চারি পর রাত্রে করি ডিঙ্গা সাতখান।
মোর সঙ্গে আনি দেহ বীর হনুমান॥
স্মরণ করিবামাত্রে আইল মারুতি।
হাতে পান দিয়া চণ্ডী দিলেন আরতি॥"

একরাত্রের মধ্যে সাতখান ডিঙ্গা নির্ম্মিত হইল। মাধবাচার্য্যের "জাগরণে"ও লিখিত আছে যে, বিশাই হনুমানের সাহায্যে সাতখান নৌকা নির্ম্মাণ করিলেন। নির্ম্মাণ-কার্য্যে ভগবতী যেমন বারংবার হনুমানের সাহায্য লইয়াছেন, ধ্বংস-কার্য্যেও তেমনি তিনি কয়েকবার পবন-নন্দনের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন। মুকুন্দরামের চণ্ডীর ইচ্ছায় যখন কলিঙ্গনগর উৎসন্ন গেল, তখন হনুমান দ্বারা তিনি সেই কার্য্য সম্পন্ন করাইলেন। "চণ্ডীর আদেশ পায় বীর হনুমান। মুষ্ট্যাঘাতে ঘরগুলা করে খান ২॥" এই দৃশ্যটি বোধ হয় হনুমান কর্ত্তৃক লঙ্কাদগ্ধের বর্ণনা হইতে গৃহীত হইয়াছে। মাধবাচার্য্যের কাব্যে ইহার অনুরূপ কোনও দৃশ্য নাই। মুকুন্দরামের হনুমান চণ্ডীর আদেশে ধনপতির ছয়খানি নৌকাও ডুবাইয়াছিলেন।

"অভয়া বলেন বাছা শুনহ উত্তর।
মোর সহ বাদ ধনপতি সদাগর॥
লঙ্ঘেছে আমার বারি শুন হনুমান।
ছয়খানি ডিঙ্গা ডুবাও মোর বিদ্যমান॥"

হনুমান তাহাই করিলেন। এইখানে মাধবাচার্য্যের সহিত মুকুন্দরামের মিল আছে। হনুমান কর্ত্তৃক নৌকা ডুবানর ঘটনাটি যে রামায়ণ হইতে গৃহীত হয় নাই তাহাতে সন্দেহ নাই। তবে, ঝড়ে ছয় খানি নৌকা ডুবিয়া যাওয়াতে মাধবাচার্য্য ও মুকুন্দরাম যে পবন-নন্দনের ঘাড়ে এই কার্য্যের দায়িত্ব চাপাইয়াছেন তাহা সমীচীন বলিয়া মনে হয়। বানর-চরিত্র যে জগৎকে ধ্বংসের দিকে লইয়া যায়, তাহা বাল্মীকি হইতে আরম্ভ করিয়া সকল হিন্দু কবিই স্বীকার করিয়াছেন। শাক্ত কবি চণ্ডীবিষয়ক কাব্যে শক্তির বৈচিত্র্যময় বিকাশ দেখাইয়াছেন। শক্তি যখন সদুদ্দেশ্যে প্রযুক্ত হয়, তখন মানব-সমাজ তদ্দ্বারা উপকৃত হইয়া থাকে। বিশ্বকর্ম্মা ও তৎপুত্র নল হনুমানের স্থূল শক্তিকে নিজেদের সূক্ষ্ম বুদ্ধি দ্বারা সংযত করিয়া তবে গঠন কার্য্যে সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন। মুকুন্দরাম রামায়ণে লিখিত সেতু-নির্ম্মাণের প্রকরণ হইতে বিশ্বকর্ম্মার পুত্র নলের শিল্প-নৈপুণ্যের পরিচয় পাইয়া নলের পিতা দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মাকে সমাজের নানা হিতকর কার্য্যে নিয়োজিত করিয়াছেন। মুকুন্দরামের সময়ে বাঙ্গালী সমাজ শিল্পীর মর্য্যাদা রাখিতে জানিত। দেশের শিল্পশক্তি সেই উন্নতির যুগে বাঙ্গালীকে রণস্থলে ও সমুদ্র বক্ষে স্বাধীনতার পতাকা উড়াইতে দেখিয়াছিল। ভগবতী সেইজন্য আলোচ্য শাক্তকাব্যে বিশ্বকর্ম্মা ও হনুমানকে পান সুপারী দিয়া আরতি করিয়াছেন। মাধবাচার্য্য ও মুকুন্দরাম কালকেতুর উপাখ্যানে বিশ্বকর্ম্মা কর্ত্তৃক ভগবতীর কাঁচলি প্রস্তুত করিবারও কথা লিখিয়াছেন। এই আশ্চর্য্য কাঁচলির উপর পুরাণাদি গ্রন্থে উক্ত বিশেষ বিশেষ ঘটনাবলীর চিত্র অঙ্কিত হইয়াছিল। মাধব কবি বলেন,—"স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল যে লিখেন বিশাই।" মাধবাচার্য্য কিন্তু রামায়ণে বর্ণিত কোনও ঘটনার চিত্র এই বিশ্বব্যাপী কাঁচলিতে অঙ্কিত হইতে দেখেন নাই। রামায়ণের অনেকগুলি সুন্দর চিত্র মুকুন্দরামের ভগবতীর কাঁচলির শোভা-বর্দ্ধন করিয়াছে। শাক্ত কবি রামপ্রসাদ সেন গাহিয়াছিলেন,—"ত্রিভুবন যে মায়ের মূর্ত্তি।" মুকুন্দরাম আদ্যা-শক্তি ভগবতীর যুগে যুগে অনন্ত লীলা বর্ণন করিবার অভিপ্রায়ে বোধ হয় দেবীর শ্রীঅঙ্গে উক্ত কাঁচলি পরাইয়া দিয়াছেন। মুকুন্দ কবি চল্লিশটি মাত্র শ্লোকে এই কাঁচলির উপর অঙ্কিত বহু শত চিত্রের সংবাদ দিয়াছেন। নিম্নে উদ্ধৃত উক্ত শ্লোকগুলি হইতে পাঠক রামায়ণের চিত্রগুলি বাছিয়া লইবেন।

"বিশাই কাঁচলি লিখে, ভারত পুরাণ দেখে,
লিখে নানা আগমের সার।
করিয়া চণ্ডিকা ধ্যান, তুলি ধরে সাবধান,
আগে লিখে দশ অবতার ॥
মহামীন কলেবরে, প্রলয় সাগর বরে,
লিখিলা প্রথম অবতার।
করে বহুতর লীলা, জলচর মাঝে খেলা,
লিখে সত্যব্রতের উদ্ধার ॥
নিজবলে পৃষ্ঠে করি, ধরিয়া মন্দর গিরি,
সুধা হেতু জলধি মন্থন।
লিখে কূর্ম্ম অবতার, ফিরে গিরি পৃষ্ঠে যার,
পৃষ্ঠ করিলেন লক্ষ যোজন ॥
লিখিল বরাহ মূর্ত্তি, উদ্ধার করিয়া পৃথ্বী,
প্রবেশিল পাতাল ভিতরে।
আদি দানবেরে মারি, অবনি উদ্ধার করি,
আরোপিল জলের উপরে ॥
লিখিল নৃসিংহ তনু, অখণ্ড প্রচণ্ড ভানু,
স্ফটিকের স্তম্ভে অবতার।
হিরণ্যকশিপু বীর, নখে করি দুই চির,
নিজ তেজে নাশিল আঁধার ॥
লিখিল বামন মূর্ত্তি, ভুবন পালন কীর্ত্তি,
অসুর কুলের এক কাল।
হইয়া ত্রিলোকস্বামী, ত্রিপাদ মাগিলা ভূমী,
দৈত্যরাজে লইল পাতাল ॥
ক্ষত্রিয় কুলেতে বাম, লিখিল পরশুরাম,
ত্রিভুবন রাখিল শাসনে।
কার একবিংশতি, নিঃক্ষত্রা করিয়া ক্ষিতি,
দান কৈল মরীচিনন্দনে ॥
লিখে দুর্ব্বাদল শ্যাম, জানকী সহিত রাম,
শিরে ছত্র ধরেন লক্ষ্মণ।
জায়া হরণের হেতু, সাগরে বান্ধিলা সেতু,
ভুজবলে বধিলা রাবণ ॥
রূপে অভিনব কাম, লিখে হলধর রাম,
প্রবল ধেনুক বিনাশন।
মুষ্টিক মারিয়া বীর, হলাগ্রে যমুনা নীর,
প্রবেশ করিলা বৃন্দাবন ॥
হইয়া পাষণ্ড মত, নিন্দা করে বেদপথ,
বৌদ্ধরূপী লিখে ভগবান।
দেখি কলি সন্নিবেশ, হইলা প্রভু কল্কি বেশ,
তাহারে লিখিল সাবধান ॥
হরিতে অবনি ভার, যদুকুলে অবতার,
মধ্যে লিখে যশোদানন্দন।
প্রকাশি শৈশব রঙ্গ, করিল শকট ভঙ্গ,
পুতনাকে করিল নিধন ॥
হইয়া বিষম ভারী, তৃণাবর্ত্ত বীরে মারি,
বিশ্বরূপ দেখালে বদনে।
যশোদা পরম রঙ্গে, যমল অর্জ্জুন ভঙ্গে,
লিখে অঘাসুর বিনাশন ॥
লিখিল যমুনা হ্রদ, কালিয় মস্তকে পদ,
তাণ্ডব করেন বনমালী।
গোপগণে করি বল, বন মাঝে দাবানল,
পান কৈল করিয়া অঞ্জলি ॥
ইন্দ্র মখ ভঙ্গ করি, লিখে গোবর্দ্ধনধারী,
গোকুলের করিল রক্ষণ।
ইন্দ্রের পরম গর্ব্ব, আপনি করিলা খর্ব্ব,
নিবারিয়া ঝড় বরিষণ ॥
লিখিল পরম ধন্যা, রাধা আদি গোপকন্যা,
লিখে বৃন্দা বিপিন বিহারী।
যতেক আভীর নারী, সভাকার মনোহারী,
নানা ছন্দে লিখিল মুরারি ॥
আসিয়া মথুরা পুরী, কুবলয় গজে মারি,
রঙ্গেতে চাণূর বিনাশন।
ভোজরাজ অবতংশে, মঞ্চ হইতে পাড়ি কংসে,
কৃষ্ণ তার করিল নিধন ॥
জনক জননী শোক, ঘুচিল সভার শোক,
মথুরায় করিলা আনন্দ।

* * *

ডানি দিকে লিখে বিশ্বকর্ম্মা মুনিগণ।
কপালে চড়ক ফোঁটা লোহিত লোচন ॥

দেব ঋষি জ্যেষ্ঠ লিখে শনৎকুমার।
শ্রীনীললোহিত লিখে অনুজ তাহার ॥
দীঘল ধবল দাড়ি তপ জপ শীল।
পিতা পুত্রে লিখিলেক কর্দ্দম কপিল ॥
দুর্ব্বাসা জৈমিনি গর্গ ভৃগু পরাশর।
বশিষ্ঠ অঙ্গিরা অত্রি ব্যাস মুনিবর ॥
পুলস্ত কশ্যপ কণ্ব পুলহ অসিত।
নারদ পর্ব্বত ধৌম্য শঙ্খ লিখিত ॥
দণ্ড কমণ্ডলুধারী জটা সুবিচিত্র।
বামদেব জমদগ্নি লিখে বিশ্বামিত্র ॥
মরীচি গৌতম লিখে মৃকণ্ডনন্দন।
শুকদেব তুম্বরু লিখিল তপোধন ॥
বাম দিকে লিখিল গরুড় মহাবীরে।
জটায়ু সম্পাতি লিখে সুপার্শ্ব কিঙ্করে ॥
জলে তাম্রচূড় লিখে চকোর চকোরী।
পেখম ধরিয়া নাচে ময়ূর ময়ূরী ॥
সারসী সারস হংস লিখে চক্রবাক।
দেবরূপী বিহঙ্গ লিখিল শ্বেতকাক ॥
উড়িয়া পড়িয়া মৎস্য ধরে মৎস্য রঙ্গা।
ভুজঙ্গ ধরিয়া খায় ধোকড়িয়া কাঁকা ॥
উড়িয়া কমলে বৈসে খঞ্জনী খঞ্জন।
চাতকী চাতক জল চাহে ঘন ঘন ॥
চটক কপোত লিখে বায়স পেচক।
সারি শুক কোকিল লিখিল আর বক ॥
সংক্ষেপে লিখিয়া পক্ষী লিখে পশুগণ।
কেশরী শার্দূল আর গণ্ডার বারণ ॥
ভালূক লিখিল দেবরূপী জাম্ববান।
সুগ্রীব অঙ্গদ নল নীল হনুমান ॥
পনস কুমুদ আদি যত রামসেনা।
বন পশু আরো লিখে বিশ্বকর্ম্মা নানা ॥
উলাক ঘোড়াক কৃষ্ণসার ঢোলকান।
গবয় মহিষ মহা বিষম বিষাণ ॥
শশক শল্লকী লিখে নকুল শৃগাল।
তরক্ষু প্রভৃতি পশু লিখিল বিশাল ॥
লিখিল বরাহ কূর্ম্ম হাঁকর মুশিক।
শঙ্কর মকর আদি লিখে চারিদিক ॥
কাঁচলির মধ্যভাগে লিখে বৃন্দাবন।
পূর্ব্বভাগে দোলমঞ্চ কদম্ব কানন ॥
অশোক কিংশুক শাল পিয়াল রসাল।
শিংসপা অসন ধব খর্জ্জুর তমাল ॥
অশ্বত্থ কপিত্থ জম্বু জম্বীর পনস।
তগর তুলসী দোল লবঙ্গ বেতস ॥
রঙ্গন চম্পক পারিজাত মরুবক।
নেহালি বাকুলি করবীর কুরণ্টক ॥
লিখিল কালিয় হ্রদে ভুজঙ্গম গণা।
গোনস প্রভৃতি সর্প উভ যার ফণা ॥
গোক্ষুরা কেউটে আর লিখে বোড়া চিতি।
পাতালে বাসুকি লিখে শেষ অহিপতি ॥"

ভাষাতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতেরা বলেন যে, সেক্ষপীয়রের ন্যায় শব্দ-সম্পদে ধনী অপর কোনও ইংরাজ কবি ইংলণ্ডে জন্মগ্রহণ করেন নাই। বঙ্গভাষায় কবিদিগের মধ্যে মুকুন্দরামের ন্যায় শব্দ-সম্পদে ধনী অন্য কোনও কবি আজ পর্য্যন্ত জন্মগ্রহণ করিয়াছেন বলিয়াও মনে হয় না। ইংরাজ কবি মিল্টনের রচিত "প্যারাডাইজ্ লষ্ট" নামক মহাকাব্যে খৃষ্টানদিগের ধর্ম্মপুস্তক বাইবেলে লিখিত ঘটনাবলীর যতটা পরিচয় পাওয়া যায়, অপর কোনও ইংরাজ কবির কাব্যে ততটা পাওয়া যায় না। মুকুন্দরামের চণ্ডীকাব্যে ও হিন্দুর ধর্ম্মপুস্তকে বর্ণিত ঘটনাবলীর যতটা সংবাদ পাওয়া যায় অন্য কোনও বাঙ্গালী কবির রচিত কাব্য-গ্রন্থে ততটা পাওয়া যায় না। আভিধানিক শব্দ ও পুরাবৃত্ত সম্বন্ধে সেক্ষপীয়র ও মিল্টনের উক্ত প্রকার অভিজ্ঞতা লইয়া যদি কোনও ইংরাজ কবি পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেন তাহা হইলে হয়ত তিনি একদিন বাঙ্গালী কবি মুকুন্দরামের সমকক্ষ হইতে পারেন।

মুকুন্দরাম হনুমানকে দেবীর আদেশে সর্ব্বাপেক্ষা অলৌকিক কার্য্য যাহা করিতে দেখিয়াছেন মাধবাচার্য্য স্বয়ং দেবীকে কাহারও সাহায্য না লইয়া সেই কার্য্য বিভিন্ন উপায়ে সম্পন্ন করিতে দেখিয়াছিলেন। মুকুন্দরামের চণ্ডী

শালিবাহন রাজার সৈন্যগণকে বিনষ্ট করিয়া শ্রীপতিকে উদ্ধার করিলে রাজা তাঁহার শরণাপন্ন হইলেন। তৎপরে পদ্মাবতী চণ্ডীকে বলিলেন,—"লোক জিয়াও প্রতাপ দেখুক নরপতি।" এই কথা শুনিয়া "স্মরণ করিল মাতা পবন-নন্দন। স্মরণ মাত্রেতে বীর দিল দরশন॥" চণ্ডী বলিলেন,—

"হনুমান ঝাট আন বিশল্যকরণী।
তোমার সহায় করি, সমর সাগরে তরি,
সীতা উদ্ধারিল রঘুমণি॥
শুন পুত্র হনুমান, লহরে আমার পান,
যাহ ঝাট গন্ধমাদনে।
বিশল্যকরণী আদি, আন নানা মহৌষধি,
প্রাণদান দেহ সেনাগণে॥
অস্থি সঞ্চারিণী নাম, আছে তথা অনুপম,
ভাঙ্গা অস্থি যাতে যোড়া যায়।
ক্রোধ করিবেন হর, অবিলম্বে যাব ঘর,
হও পুত্র আমার সহায়॥
রাবণ পুত্রের শোকে, লক্ষ্মণ বীরের বুকে,
শেলঘাতে হরিল জীবন।
রামের সাধিতে মান, লক্ষ্মণেরে প্রাণদান,
আনি দিলে গন্ধমাদন॥
কুবেরের অনুচর, আছে তথা যক্ষবর,
ঔষধের করিয়া রক্ষণ।
তোমা বিনে অন্য বীর, তাহাতে নহিবে স্থির,
বিলম্ব করহ অকারণ॥
চণ্ডীর আদেশ পায়, পবন নন্দন ধায়,
এক লাফে দ্বাদশ যোজন।
আইলেন বীররাজ, সাধিয়া চণ্ডীর কাজ,
বিরচিল শ্রীকবি-কঙ্কণ॥"

"হনুমান আজ্ঞা দিল বিশল্যকরণী।
অস্থি সঞ্চারিণী নাম মৃত সঞ্জীবনী॥
আজ্ঞা দিল বাটিবারে চণ্ডী কৃপানিধি।
জয়া বিজয়া পদ্মা বাটেন মহৌষধি॥
তিন মহৌষধি থুইল নূতন কলসে।
জিয়ে মৃত সেনা সব ঔষধের বাসে॥
প্রথমে দিলেন জয়া যুবরাজের গায়।
ব্রাহ্মণী ব্রাহ্মণী বল্যা কুমার পলায়॥
যে জনায় অঙ্গে লাগে ঔষধের বাস।
অঙ্গ যোড়া দিয়ে উঠে উলটিয়া পাশ॥"

বাল্মীকির রামায়ণে উক্ত আছে যে, ইন্দ্রজিতের সহিত যুদ্ধে রাম লক্ষ্মণ ও বানর সৈন্যগণ মোহপ্রাপ্ত হইলে হনুমান বিশল্যকরণী, মৃতসঞ্জীবনী, সুবর্ণকরণী ও সন্ধানকরণী নামে চারিটি মহৌষধি আনয়ন করিয়া রাম লক্ষ্মণ ও হতাহত বানর সৈন্যগণকে আঘ্রাণ করাইলে সকলেই সুপ্তোত্থিতের ন্যায় উঠিলেন। রাবণের সহিত যুদ্ধে লক্ষ্মণ শক্তিশেলে বিদ্ধ হইলে হনুমান কর্ত্তৃক আনীত কেবল বিশল্যকরণীর আঘ্রাণে লক্ষ্মণ বিশল্য ও রোগশূন্য হইয়াছিলেন। কৃত্তিবাস বাল্মীকিকে অনুসরণ করিয়া ভাষা-রামায়ণে ঔষধগুলির নাম ও সেগুলির আঘ্রাণে যে ফলোদয় হইয়াছিল তাহা মোটামুটি বিবৃত করিয়াছেন, কেবল উক্ত চারিটি ঔষধের মধ্যে বাল্মীকির সন্ধানকরণী নামে ঔষধের পরিবর্ত্তে অস্থিসঞ্চারিণী নামে ঔষধের উল্লেখ করিয়াছেন। এই দুইটি ঔষধের ফল একই প্রকার। মুকুন্দরামের চণ্ডীকাব্য হইতে উদ্ধৃত উপরোক্ত শ্লোকগুলি পাঠ করিয়া স্পষ্ট বুঝা যায় যে, তিনি কৃত্তিবাসকে অনুসরণ করিয়া চারিটি ঔষধের পরিবর্ত্তে যে তিনটির উল্লেখ করিয়াছেন তাহার মধ্যে অস্থিসঞ্চারিণীর নাম বাল্মীকির রামায়ণে নাই। মুকুন্দরাম যে আলোচ্য শ্লোকগুলিতে বাল্মীকিকে অনুসরণ করেন নাই, এরূপ অনুমান করিবার আরও একটি কারণ আছে। রাম রাবণের যুদ্ধ শেষ হইলে বাল্মীকি বলেন যে, শ্রীরামচন্দ্রের অনুরোধে ইন্দ্র মৃত বানর সৈন্যগণকে পুনর্জীবিত করেন। ইন্দ্র কোনও ঔষধাদি প্রয়োগ বা অমৃত বর্ষণ করেন নাই। ইন্দ্র কহিলেন,—"সংগ্রামে রাক্ষস হস্তে যে সমস্ত ঋক্ষ বানরগণ নিহত হইয়াছে, তাহারা সকলে নীরুজ ও ব্রণশূন্য হইয়া সমুত্থিত হউক।" ইন্দ্র এই কথা বলিবামাত্র "নিহত হরিসকল অক্ষতদেহে গাত্রোত্থান করিয়া যার পর নাই বিস্ময়াবিষ্ট হইল।" কৃত্তিবাস এই ঘটনার অন্যরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

"ইন্দ্রের আজ্ঞায় মেঘ অমৃত সঞ্চারে।
সুধা বৃষ্টি হয় মৃত বানর উপরে॥
কাটা হাত কাটা পদ সব লাগে যোড়া।
চারিধারে সৈন্য উঠে দিয়া গাত্র মোড়া॥"

মুকুন্দরাম যদিও কৃত্তিবাসকে অনুসরণ করিয়া চণ্ডী ও শালিবাহন রাজার যুদ্ধশেষে অমৃত বর্ষণের বন্দোবস্ত করেন নাই, কিন্তু তিনি "অঙ্গমোড়া" শব্দটি ব্যবহার করিয়া কৃত্তিবাসের "গাত্র মোড়া"র ভঙ্গীটি যে অবিকল গ্রহণ করিয়াছেন তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। মুকুন্দরাম যেখানে এইভাবে কৃত্তিবাসকে অনুসরণ করিয়াছেন সেখানে তাঁহার কবিত্ব-শক্তি অনুকরণের বশবর্ত্তী হইয়া আশানুরূপ স্ফূর্ত্তি পায় নাই। মাধবাচার্য্য এই ঘটনাটির যে চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন তাহার সৌন্দর্য্য বাল্মীকি কৃত্তিবাস ও মুকুন্দরামের শিল্পকলাকে ঢাকিয়া দিয়াছে।

"অমৃত নয়ান দিয়া চাহেন মহামায়।
জিয়া উঠে রাজসৈন্য হাতে অস্ত্র ধায়॥"

অনুতপ্ত।

[শ্রীসুশীলকুমার রায়]

(১)

সরোজ কলেজ ছেড়ে একটা হাকিম কিম্বা ঐ রকম একটা কিছু হবে, এ আশা অনেকেই ক'রেছিল, কিন্তু সে যখন তা না হ'য়ে গ্রামে এসে অত বড় একটা চাকুরে আত্মীয়ের বাড়ীতে থেকেও গ্রামের পাঁচ জন ছেলেদের ভেতর পাণ্ডা হ'য়ে একটি সেবক-সঙ্ঘ খুলে ব'সলো, তখন সকলে অবাক হ'য়ে গেল। তার ওপর যখন প্রত্যেক রবিবারে বাড়ী বাড়ী চাল সংগ্রহ, বিধবাদের চরকা কাটতে শেখান, আর পীড়িতদের প্রাণপণ সাহায্য ক'রতে লাগল, তখন গ্রামের মাতব্বর প্রাণধনবাবু এই ক্ষুদে দলটির উচ্ছেদ সাধন করবার জন্যেই যেন উঠে প'ড়ে লেগে গেলেন।

একদিন সকালবেলা প্রাণধনবাবু একখানা র‍্যাপার মুড়ি দিয়ে খড়ম পায়ে একেবারে দীনেশবাবুর বৈঠকখানায় এসে বল্লেন, "ওহে, তোমার ভাইপো আমাদেরও ছাড়িয়ে গেল যে!"

গুড়গুড়ীর নলটা মুখ থেকে সরিয়ে একটু হেসে দীনেশবাবু বল্লেন, "আসুন প্রাণধনবাবু, বসুন; এই রেণু একটা আসন দে।"

"না না, বোসবো না, আমার অনেক কাজ তা— সরোজের একটা ব্যবস্থা কর, নয় সদরেই বেরুতে বল না?"

দীনেশবাবু গম্ভীরভাবে বল্লেন, "আমি ও বিষয়ে অনেক ভেবেছি, যা হ'ক একটা ব্যবস্থা শিগ্‌গীর ক'রতে হবে।"

প্রাণধনবাবু এক গাল হেসে বল্লেন, "আমিও ত তাই ভাবছি, দীনেশ কি আর চুপ ক'রে বসে আছে, হাজার হ'ক হাকিমের ছোট ত বটে। আচ্ছা যাই ভাই, অনেক কাজ আছে। আর একদিন আসবো।"

দীনেশবাবু গুড়গুড়ীর নলে মুখ দিয়ে ঘন ঘন টান দিতে লাগলেন।

সরোজের এই সঙ্ঘ নিয়ে মাতামাতি দীনেশবাবুর একেবারেই ভাল লাগত না। তারপর আজ প্রাণধন বাবুর কথা শুনে তাঁর এতদিনের নিস্তেজ জমাট রাগটা হঠাৎ টগবগ ক'রে ফুটে উঠে চোখ মুখ দিয়ে যেন ঠিকরে বেরুতে লাগল। তাড়াতাড়ি গুড়গুড়ীটা হাতে ক'রে নিয়ে বাড়ীর ভেতর এসে ডাকলেন—"বড় বৌ।"

প্রমোদাসুন্দরী, তখন কাপড় ছেড়ে রান্নাঘরে যাবার যোগাড় করছিলেন, হঠাৎ এই ডাকে বাধা পেয়ে ফিরে দাঁড়িয়ে বল্লেন 'কেন?'

দীনেশবাবু এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে সিধে দাঁড়িয়ে বল্লেন

"আমায় কি তোমাদের জ্বালায় গ্রাম ছেড়ে চ'লে যেতে হবে ?"

প্রমোদা স্বামীর ভাব দেখে একটু ভীত হয়েই বল্লেন "কেন গো, কি হয়েছে ?" দশ বছরের মেয়ে রেণুও ধীরে ধীরে এসে মায়ের আঁচল ধ'রে চুপটি ক'রে দাঁড়িয়ে প'ড়ল।

দীনেশবাবু ঠক্ ক'রে গুড়গুড়ীটাকে মেঝের উপর ঠুকে বসিয়ে বল্লেন "খবরদার, সরোজকে আর বাড়ীর বার হ'তে দিও না। কতকগুলো বখাটে ছোঁড়ার সঙ্গে সে হৈ চৈ ক'রে বেড়াবে, এ আমি পছন্দ করি না।"

প্রমোদার মুখে চোখে এইবার স্বাভাবিক ভাব ফিরে এল। তিনি এইবার একটু জোর দিয়েই বল্লেন, "কেন, ও ত কোন অন্যায় কাজ করেনি। তার ওপর সেদিন বাপ মা হারিয়েছে। আমি ওর মুখের উপর কোন কড়া কথা ব'লতে পারব না। আমি বলি, একটি সুন্দরী মেয়ে দেখে সরোজের বিয়ে দাও, দেখবে দু দিনে ও সব শুধরে যাবে, তখন ঘর থেকে বেরুতে চাইবেই না।"

দীনেশবাবু কি একটা পাল্টা জবাব দিতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু রাগে শুধু মুখখানাই লাল হ'য়ে উঠল, কোন কথাই ফুটে বেরুল না। তিনি একবার গৃহিণীর, একবার মেয়ের মুখের দিকে চেয়ে কোন সহানুভূতি না পেয়ে তাড়াতাড়ি যেমন এসেছিলেন তেমনি বৈঠকখানার দিকে চ'লে গেলেন। ঠিক সেই সময় সরোজের মুখও খিড়কীর দোরের পাশে দেখা গেল।

সন্ধ্যের সময় জ্যাঠাইমার কাছ ঘেঁসে বসে সরোজ বল্লে "আজ রাতে আমি বাড়ী আসব না। ও পাড়ার সেই বিধবা স্ত্রীলোকটি মরণাপন্না, আমাকে তার কাছে রাত-ভোর থাকতে হবে।"

প্রমোদা একটু রেগে বল্লেন, "দিন-ভোর ত' তোর চুলের টিকি দেখতে পাওয়া যায় না, কত ক'রে তোর জ্যাঠামহাশয়কে বুঝিয়ে রেখেছি; আবার রাতভোর যদি বাড়ী না থাকিস ত' কি জবাব দেবো ?"

সরোজের চোকের সামনে বৃদ্ধার কোটরগত চোক, শুকনো মুখ ভেসে উঠল। সে জ্যাঠাইমার পা দুটী জড়িয়ে ধ'রে বল্লে, "আমি যদি না যাই তার মৃত্যুশয্যার পাশে দাঁড়াবার মত ত' আর কেউ নেই।"

প্রমোদাকে এইবার হার মানতে হ'ল। বৃদ্ধার দুঃখের কথা শুনে তার নারী-হৃদয় এমনিই কোমল হ'য়ে গেছল যে তিনি আজ আর নিজেকে শক্ত ক'রে বেঁধে রাখতে পারলেন না। তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে পাঁচটি টাকা এনে সরোজের হাতে গুঁজে দিয়ে বল্লেন, "দেখিস বাবা, যেন কোন রকম অযত্ন না হয়।"

আনন্দে সরোজের চোক জলে ভ'রে এল। সে মাথাটা একবার মাটিতে ঠেকিয়ে তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

(২)

সারারাত ছটফট ক'রে কাটিয়ে সকাল বেলা উঠে প্রমোদা রেণুকে বল্লেন, "যা ত' বোসপাড়ায় শৈলর কাছে খবরটা জেনে আয় কাল কি হ'ল।"

রেণুকা যেন এই কথারই অপেক্ষা করছিল। সে ছুটে খিড়কীর দোর দিয়ে চ'লে গেল।

ঘণ্টাখানেক বাদে সে যখন ফিরে এল তখন তার মুখ কাঁদো-কাঁদো, চোক্ ছল ছল ক'রছে। প্রমোদা বল্লেন—কি হয়েছে রে ? রেণু বল্লে—শৈলদাও কাল রাতে বাড়ী ফেরে নি। তার মা বল্লেন "বুড়ী মারা গেছে।"

প্রমোদা অন্যমনস্কভাবে ঘরের কাজ কর্ম্ম ক'রতে লাগলেন।

বেলা তখন প্রায় বারটা। দীনেশবাবু গম্ভীরভাবে বাড়ীর ভেতর ঢুকে বল্লেন, "আমি চার পাঁচদিনের জন্যে সদরে যাচ্ছি, সরোজ যেন আমার বাড়ী আর না ঢোকে।"

প্রমোদা বিস্ময়ে অবাক হ'য়ে বল্লেন 'কেন ?'

"তোমার আস্কারা পেয়েই সে আজ আমার মুখে চুণ কালি মাখিয়েছে। কাল রাত্তিরে সে বাড়ী ছিল কিনা সে খবর জানো ?" প্রমোদার মাথার ভেতর ঝিম্ ঝিম্ ক'রতে লাগল। তিনি বাঁ হাতে কপালটা জোর ক'রে চেপে ধ'রে মনে একটু জোর এনে বল্লেন, "একজন মরছে, তার সাহায্যের জন্যে যদি একদিন রাতে বাড়ী না আসে তা বলে তাকে ত্যাগ ক'রতে হবে ?"

দীনেশবাবু একটু বিদ্রুপের হাসি হেসে বল্লেন, "তা হ'লে ত' ভাল ছিল, আমিও পাড়ায় বুক ফুলিয়ে দাঁড়াতে পারতুম। আজ সকালে প্রাণধনবাবুতে আর আমাতে সম্বন্ধ ভেঙেছি।"

"সে ক'রেছে কি ?"

"বুড়ীর এক চোদ্দ বছরের ধেড়ে নাত্‌নীকে বিয়ে ক'রব ব'লে হাতে পৈতে জড়িয়ে বুড়ীর মরবার সময় শপথ করেছে। আমার ঘরে আইবুড়ো মেয়ে থাকতে আমিত' এসব বরদাস্ত করতে পারব না।"

"তারা কি আমাদের ঘর নয় ?"

"ঘর হ'লেও ত' বিয়ে হতে পারে না। যে ঘরে দোষ আছে, সে ঘরের মেয়েকে আমি ভিটেতে ওঠাতে কিছুতেই পারব না।"

প্রমোদার আর তর্ক করবার মত শক্তি ছিল না। মাথার ভেতর একটা অসহ্য যন্ত্রণায় সেইখানেই বসে পড়লেন।

দীনেশবাবু গলার স্বর আর এক মাত্রা চড়িয়ে দিয়ে বল্লেন, "এখানে বসে থাকলে কোন ফল হবে না। আমায় ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই বেরুতে হবে।" প্রমোদা আস্তে আস্তে কপাট ধরে' ভেতরে চলে গেলেন।

(৩)

সন্ধ্যার সময় সরোজ এসে খিড়কীর দোরের সামনে দাঁড়িয়ে ধীর গলায় ডাকলে—'রেণু' !

রেণু সেই সময় গলায় আঁচল জড়িয়ে তুলসীতলায় প্রণাম করছিল। দাদার ডাক কানে যেতেই ছুটে এসে দোর খুলে দিলে আর সঙ্গে সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল, "ও মা, দাদা এসেছে।"

প্রমোদা আজ দিনভোর জল গ্রহণ করেন নি। পাশের ঘরে চুপ করে শুয়েছিলেন। সরোজের কথা শুনতেই তাড়াতাড়ি উঠে এসে বাইরে দাঁড়ালেন।

সরোজ আস্তে আস্তে এসে পায়ের কাছে চুপ করে বসল।

প্রমোদা তার মাথায় গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বল্লেন, "সকালেই বাড়ী এলিনি কেন ?" সরোজের চোক থেকে টপ্ টপ্ করে জল গড়িয়ে পড়ল।

রেণু এতক্ষণ পাশে দাঁড়িয়েছিল। দাদার চোখে জল দেখে তার প্রাণের ভেতর কেমন করে উঠল। সে বল্লে, "মা, দাদাকে তুমি আর ছেড়োনা কিন্তু।"

সরোজ মনকে বেশ শক্ত করেই বেঁধেছিল। সে গলার স্বরটা স্বাভাবিক করে বল্লে, "না রেণু, সে অনুরোধ আমায় ক'রোনা। এ বাড়ীতে আর আমার স্থান নেই। তোমাদের সঙ্গে শেষ দেখা করব বলেই আজ চোরের মতন সন্ধ্যেবেলা বাড়ীর ভেতর ঢুকেছি।"

প্রমোদার একবার ইচ্ছে হল বলেন—আমি যদি না যেতে দিই—কিন্তু পরক্ষণেই স্বামীর কঠোর আদেশ মনে পড়ে সমস্ত শরীরটা শিউরে উঠল। হায়! সে যে আজ বড় পরাধীন!

সরোজকে বিদায় দেবার সময় প্রমোদা একটি সোণার নোয়া ও নিজের সঞ্চিত দুশো টাকার নোট কাপড়ের খুঁটে বেঁধে দিয়ে বল্লেন, "এ আমার বিয়ের যৌতুক, এ থেকে যেন আমায় বঞ্চিত করিস নি বাপ।"

সরোজ ক্ষুদ্র পুঁটুলিটা মাথায় ঠেকিয়ে বল্লে, "এ আমার আশীর্ব্বাদ, যতদিন বাঁচবো আপনার এ স্নেহের ঋণ শুধতে পারবো না।"

(৪)

দীনেশবাবু বৈঠকখানায় বসে কাগজ পত্র দেখছিলেন, এমন সময় প্রাণধনবাবু একগাল হেসে সামনে দাঁড়িয়ে বল্লেন, 'কাজ ফতে হে ভায়া!"

দীনেশবাবু যেন এতক্ষণ এইজন্যেই অপেক্ষা করছিলেন, এমন ভাব দেখিয়ে বল্লেন, "কতোর রফা হ'ল ?"

প্রাণধনবাবু ঠকাস্ ক'রে ছাড়টা রেখে বসে পড়ে বল্লেন, "পাঁচশো টাকা নগদ, আর মেয়ের গা সাজান গয়না।"

দীনেশবাবু বিশেষ একটু উৎফুল্ল হয়েই বল্লেন, "তবে শুভস্য শীঘ্রং—কি বলহে, এই মাসেই –"

প্রাণধনবাবু কোন উত্তর না দিয়ে শুধু এমনভাবে হেসে উঠলেন যেন তার মানে "এ আবার বলতে—এই মাসেই।"

"আলোটা এত ক'মে গেল কেন? ঘরের চারদিক এ—ত—কা—লো!"

প্রমোদার ধৈর্য্যের বাঁধ এইবার ভেঙ্গে গেল। তিনি চেঁচিয়ে কেঁদে উঠে বল্লেন, "সরোজ, আর যে তোর জ্যাঠা-মশায়কে রাখতে পারিনা বাবা।"

ঠিক সেই সময় একখানি গাড়ী এসে ঘড় ঘড় শব্দে দরজার সামনে দাঁড়াল। সরোজ ও প্রভা গাড়ী থেকে নেমে ঘরে ঢুকতেই প্রমোদা চেঁচিয়ে উঠলেন, "ওগো চেয়ে দেখ, তোমার সরোজ, বৌমা এসেছে।"

দীনেশবাবুর নিষ্প্রভ চক্ষু ক্ষণিকের জন্য উজ্জ্বল হ'য়ে উঠল। শীর্ণ হাতখানা একটু নড়ে কেঁপে উঠে স্থির হ'য়ে গেল।

সরোজ পায়ের ওপর লুটিয়ে পড়ে ডাকলে—"জ্যাঠামশায়!"

চির দীন।

[শ্রীহেমচন্দ্র বাগচী]

বঙ্কিম পথের রেখা ধীরে ধীরে হ'য়ে আসে লীন।
মহা তীব্র ধূলিঝঞ্ঝা—ধূসর, মলিন,
উড়াইয়া উত্তরীয় জীবনের ক্ষীণপথ 'পরে,
আকীরিয়া ধূলিজালে সুপ্রশান্ত, নিস্তব্ধ অম্বরে—
আমার অন্তরে,
ধীরে আসি' দেখা দিল,—মহারুদ্র, যোগসমাসীন—
দীন, চির দীন।
এই যে পথের ধূলি আপনারে দিয়াছে ছড়ায়ে,
ম্লানিমার মাঝখানে আপনারে ফেলেছে হারায়ে,—
ওগো আমি এরো চেয়ে হীন, অতি হীন,
চির রাত্রিদিন—
সে কথা যে কাহারেও হয় নাই বলা;
প্রাণের রহস্যদ্বার কারো কাছে হয় নাই খোলা!
বলিবারে চাই—
ঘাসে ঘাসে মাঠে মাঠে বলিয়া বেড়াই!
এ চির দীনতা মোর দিকে দিকে দিয়া প্রসারিয়া
গাহিয়া গাহিয়া—
এতটুকু ক্ষোভগ্লানি যদি পারি করিবারে ক্ষয়,
সেই দিনে হ'বে মোর জয়!
সে শুভ প্রভাত—
কবে আসি' দেখা দিবে অরুণের রক্তরাগ-সাথ?
সেই দিনে, সেই শুভক্ষণে,
হৃদয়ের গুরুভার নিবেদিয়া গগনে-পবনে
মুক্তির নিশ্বাস ছাড়ি' বাহিরিব দূরে, অতিদূরে—
পরাণের পাত্রখানি ভরি' ল'ব নব গীতসুরে।

হে দেবতা, এই চির-দীনতার মাঝে
তোমার বাঁশরী-ধ্বনি রহি' রহি' বাজে।
মৃদুল রাগিণী উঠে অনুরণি হৃদয়-আকাশ,—
তাহার আভাস
শতকবি ছন্দে, বক্ষে রেখে দেয় ধরণীর 'পরে
ধীরে—থরে-থরে।
তারপরে কবে সে যে বাজি' বাজি' ধীরে থেমে যায়!
নিস্তব্ধ সন্ধ্যায়—
পাইনাক' কারো সাড়া কারো মৃদু মমতার বাণী;
তাই বুঝি হে রাজেন্দ্র থেমে যায়, তব বাঁশীখানি!
চির দীনতার সুরে তা'রে কেন কর পরিম্লান?
—সারা দিনমান
পথের ধূলির মাঝে সে যে থাকে সব চেয়ে নীচে!
একি আজি হ'বে সবি মিছে?
এই দীনতার বোঝা, উৎসুক মুক্তির আয়োজন—
ইহাদের নাহি প্রয়োজন?
আজি তব রথচূড়া উঠিয়াছে আকাশের গায়!
আজি সে যে তারায়, তারায়
নিবেদিবে ধরণীর ম্লানিমার বাণী—
চির দীনতার কথা, চির বোঝা বহিবার গ্লানি।
মহিমার উচ্চ রথে ওগো তা'রে তুমি তুলে লও,
শোকতাপ লজ্জাভয় আজি হ'তে ওগো তুমি বও।
দূরে, অতিদূরে—
তাহারে তুলিয়া লও তব মধু মর্ম্মহর্ম্ম্যপুরে!
সে কি শুধু দ্বারপ্রান্তে বসি র'বে বিমর্ষ, মলিন—
হায় দীন,—হায় চির দীন!

কুড়ানো ছেলে।

[শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী]

(১)

তাকে প্রথম দেখা গেল নদীর ধারে বড় বটতলাটার নীচে। সে যে কোথা হইতে আসিল তাহা কেহ জানিত না, কিন্তু তাহাকে সবাই দেখিয়া গেল, কেহ একটা কথাও জিজ্ঞাসা করিল না।

বড় শান্ত নদীর ধারটা, আর সেই বটতলাটাও তেমনি মনোরম। সহস্র বাহু বিস্তার করিয়া সে দাঁড়াইয়া। লক্ষ পাখী আসিয়া তাহার কচি কোমল পাতার আড়ালে দেহ লুকাইয়া গান গাহিয়া চলিয়া যায়; শত পথিক রৌদ্রতাপে তাপিত হইয়া শ্রান্তি অপনোদন মানসে সেই বড় বটতলাটার তলে আসিয়া বিশ্রাম করে।

বৈশাখ মাসের সকালবেলা মাত্র, পূবের আকাশ সিঁদূরে লাল হইয়া উঠিয়াছে। নবোদ্গত বটের পাতায় পাতায় তাহার রঙ ফলাইয়া দিয়াছে। গাছের ঘন পাতার অন্তরালে কত পাখী যে গান গাহিতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই! বালক রতন সেই গাছের তলে পা ছড়াইয়া বসিয়া কি দেখিতেছিল, কি ভাবিতেছিল, তাহা সেই জানে।

দেখিতে দেখিতে বেলা বাড়িয়া উঠিতেছিল, রৌদ্রতেজ শুধু সেই বটতলাটা বাঁদ দিয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল, নদীবক্ষে পালতোলা নৌকাগুলা হেলিয়া দুলিয়া চলিয়া যাইতেছিল, রতন হাঁ করিয়া তাহা দেখিতেছিল।

সম্মুখে পথ দিয়া এত লোক আসিল, এত লোক চলিয়া গেল, সবাই পঞ্চম বর্ষীয় বালকের পানে একবার চাহিয়া গেল, কিন্তু কেহ একটাও কথা জিজ্ঞাসা করিল না।

ক্ষুধা পাইয়াছিল; বালক চারিদিকে অপরিচিত লোক দেখিয়া ভয়ে কাঁদিতেও পারে নাই। কিন্তু অবশেষে সে আর কান্না রাখিতে পারিল না, প্রথমে ফুঁপাইয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিয়া শেষে সে মুক্তকণ্ঠে কাঁদিতে লাগিল।

কয়েকটী রমণী স্নানান্তে বাড়ী ফিরিতেছিলেন। দয়ার্দ্রা একজন বলিলেন, "আহা, কাদের ছেলেটা কাঁদছে দেখ!" আর একজন চাহিয়া দেখিয়া নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, "রামোঃ, কোন্ বাগদী চাঁড়ালের ছেলে হবে।"

দয়ার্দ্রা বলিলেন, "বাগদী চাঁড়ালের ছেলে কি মানুষ নয়? আমাদের ছেলেপুলেও যেমন, ওরাও তো তেমনি।"

অপরা তেমনি ঘৃণার সুরে বলিলেন, "শুনে মরে যাই; ছোটবউ ভাই, তোর দয়া দেখে আর বাঁচিনে। নে, ঘরে যাবি তো চল, অত দয়া দেখাতে গেলে সংসার চলে না।"

তাঁহাদের কথা শুনিয়া তিনি আর কথা কহিতে সাহস করিলেন না, বিষণ্ন নেত্রে শিশুর পানে একবার তাকাইয়া চলিয়া গেলেন।

রতনের মনে বুঝি ভরসা আসিয়াছিল, তাই কথা না বুঝিলেও সে চুপ করিয়াছিল। যে মুহূর্ত্তে রমণীরা চলিয়া গেলেন, সেই মুহূর্ত্তে সে আবার মাটীতে আছড়াইয়া পড়িয়া মা-মা বলিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিল।

বেলা প্রায় দশটা এগারটার সময় প্রবোধ স্নান করিয়া ফিরিয়া যাইতে এই শিশুর আর্ত্ত-ক্রন্দনে আকৃষ্ট হইয়া ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। গ্রামের উৎসাহী যুবকবৃন্দের মধ্যে তিনিও একজন। এবারে পাটনা কলেজে প্রফেসর হইয়াছেন।

শিশুকে অনেক জিজ্ঞাসা করিয়া তিনি জানিতে পারিলেন তাহার নাম রতন, তাহার মা ছিল, এইখানে বসিতে বলিয়া সে কোথায় চলিয়া গিয়াছে।

দয়ার্দ্র হৃদয় প্রবোধের প্রাণ গলিয়া গেল, তিনি তাহাকে বলিলেন "আমার বাড়ীতে আয়, খেতে দেব'খন। তোর মা যদি আসে তার সঙ্গে যাস।"

নিকটস্থ লোকদের তিনি বলিয়া দিলেন যদি কোন রমণী তাহার পুত্রের খোঁজে আসে তাহাকে যেন তাঁহার বাড়ীতে পাঠাইয়া দেওয়া হয়।

এই অবোধ সাঁওতাল শিশুকে বাড়ী লইয়া যাইবামাত্র মহা গোলমাল উঠিল। প্রবোধের দুই ভ্রাতৃজায়া মাথা নাড়িলেন—এ কখনই হইতে পারে না। হিন্দু ব্রাহ্মণের গৃহে সাঁওতাল শিশুর আশ্রয় সম্ভবপর নয়।

প্রবোধের স্ত্রী উষারাণী কেবল স্বামীর পক্ষে দাঁড়াইলেন; বলিলেন, "আমি এর সব ভার নেব, এর জন্যে কাউকে ভাবতে হবে না।"

"মধ্যম জা মুখ বক্র করিয়া বলিলেন, "তুমি তো আগেই আনতে চেয়েছিলে ভাই ছোটবউ।"

উষা বলিলেন, "তোমরা আনতে দিলে না মেজদি, কিন্তু ভগবান এনে ফেললেন। বাইরে বাইরে থাকবে, কাজ কর্ম্ম করবে, এতে আমাদের ধর্ম্মের কি ক্ষতি হবে দিদি?"

মধ্যম জা বলিলেন, "ছোঁয়া পড়বে তো?"

একটু হাসিয়া উষা বলিলেন, "আমাদের জাতটা কাচের মত ঠুনকো নয় দিদি, যে সাঁওতালকে ছুঁলেই তা ভেঙ্গে যাবে। যাইহোক, তোমার দেওর যখন এনেছেন, কিছুতেই ওকে ছাড়বেন না। যতদিন ও ছোট থাকবে আমি ওকে নিয়ে তফাতে থাকব, তোমাদের সেজন্যে কোনও ভাবনা নেই।"

পত্নীর হাতে এই অনাথ শিশুটীকে সঁপিয়া দিয়া প্রবোধ ভারি নিশ্চিন্ত হইলেন, কিন্তু বাড়ীশুদ্ধ সকলেই ইহাতে উষার উপর বিরক্ত হইয়া উঠিল।

(২)

এই অশান্ত শিশুকে লইয়া উষার হইয়াছিল বিষম জ্বালা। অবোধ শিশু কোনও কথা বুঝে না। যাহা করিতে নিষেধ করা যায় ঠিক তাহাই করিয়া বসিবে।

উষার সহিত বাড়ীর কাহারও মতের মিল হইত না, কারণ তিনি সহরের শিক্ষিতা মেয়ে। এ অহঙ্কার উষা মোটেই করিতেন না; তিনি সর্ব্বাংশে আপনার জীবনটাকে জায়েদের মতই গড়িয়া লইতে সচেষ্ট ছিলেন। তাঁহার চালচলনে কোনও মতে তাঁহাকে ধনাঢ্য পিতার শিক্ষিতা মেয়ে বলিয়া বুঝাইত না। সর্ব্বপ্রকারে নিজেকে তিনি গড়িয়া লইয়াছিলেন, তাহা সত্ত্বেও জায়েরা কেন যে তাঁহার সহিত মিশিতে সঙ্কুচিতা হইতেন তাহা তিনি মোটেই বুঝিয়া উঠিতে পারিতেন না।

তাঁহার পিতা শুধু রূপবান ও শিক্ষিত ছেলে দেখিয়াই কন্যা দান করিয়াছিলেন। শ্বশুরালয়ে প্রথম কিছুতেই কন্যাকে পাঠান নাই। ইহাতে প্রবোধ একদিন নিজেকে গরীব বলিয়া যে দুঃখ করিয়াছিলেন তাহা উষার অন্তরে প্রবিষ্ট হইয়াছিল, তিনি জোর করিয়া শ্বশুরালয়ে আসিয়াছিলেন। পিতা দাসী দিয়াছিলেন, কন্যা তাহাকে জবাব দিয়াছেন। কোনও রূপে লোকে যেন না জানিতে পারে তিনি বড়লোকের মেয়ে। শিক্ষার গর্ব্ব তাঁহার একেবারেই ছিল না, স্বামী বাড়ী আসিলে রাত্রে তাঁহার সহিত যাহা চর্চ্চা চলিত মাত্র। কিন্তু ইহাতেও তাঁহার নিস্তার ছিল না। জায়েরা তাঁহাকে সকলের কাছে বড়লোকের মেয়ে, বড় শিক্ষিতা, দয়া করে আমাদের ঘরে এসেছেন, ইত্যাদি বলিয়া বড় লজ্জিত করিয়া তুলিত।

এতদিন যে সংযমতাটুকু এ সংসারে ছিল, রতনের আসার পরে তাহা ঘুচিয়া গেল। এটা ছুঁইল, ওটা ছুঁইল —ছোট বউয়ের আদরে সব গেল, ইত্যাদি নানাপ্রকার কলরব উঠিল। জ্বালাতন হইয়া প্রবোধ স্ত্রীকে ডাকিয়া বলিলেন, "এখন উপায় কি উষা?"

স্বামীর বিষণ্ণ মুখখানার পানে চাহিয়া উষা বলিলেন, "কিসের উপায়?"

প্রবোধ বলিলেন, "এই ছেলেটার।"

উষা বলিলেন, "ছেলেটার আবার কি উপায় করবে? সে যেমন আছে তেমনি থাকবে।"

প্রবোধ মাথা নাড়িয়া শুষ্ককণ্ঠে বলিলেন, "তুমি বুঝছ না কিছু। পথে পড়ে আছড়াচ্ছে দেখে তুলে নিয়ে এলুম, ভাবলুম এরপরে এর কোনও আত্মীয় স্বজন এসে একে নিয়ে যাবে। কিন্তু আজ কুড়ি বাইশ দিন এসেছে এর মধ্যে কেউ এসে এর একবার খোঁজও নিলে না। আমি তো আর একে রাখতে পারিনে। দুদিন বাদেই আমায় কাজে চলে যেতে হবে—"

বাধা দিয়া উষা বলিলেন, "তা তুমি যাও না, তাতে ঐ ছোট্ট ছেলেটা কি বাধা দিচ্ছে তোমায়?"

প্রবোধ বলিলেন, "বাধা যথেষ্ট দিচ্ছে। আমাদের এই সঙ্কীর্ণতার মাঝে—"

ঘৃণার সুরে উষা বলিলেন, "তাই তুমি পেছিয়ে যাচ্ছ? কিন্তু না, তুমি স্বচ্ছন্দে আমার মাথায় এ ভার চাপিয়ে চলে যাও, আমি এর সকল ভার সইব। আমি মনে করেছি এ আমারই ছেলে; দুই বছর আগে এসেছিল, আমায় মা বলে ডাকতে পায় নি, তাই এসেছে। নীচজাতি হলেই বা, আমি ওকে নিয়ে তফাৎ হয়ে আছি, তফাৎ হয়ে থাকব।"

তাঁহার বড় বড় দুইটী চোখ জলে ভরিয়া উঠিয়াছিল, তাহা দেখিয়া প্রবোধ ব্যস্তভাবে বলিলেন, "তবে থাক, তুমি যদি রাখতে পার তবে আমার কোনই আপত্তি নেই।"

দুর্দ্দান্ত রতন দৌড়াইয়া আসিতেছিল, দরজার কাঠ বাধিয়া হুমড়ি খাইয়া পড়িয়া কাঁদিয়া উঠিল।

উষা তাড়াতাড়ি গিয়া তাহাকে ধরিয়া তুলিলেন, "কি রে, অমন করে দৌড়াচ্ছিস কেন, কি হয়েছে?"

একখানা ভাঙ্গা বাঁশের টুকরা হাতে বড় জা বিধবা হেমাঙ্গিনী দেখা দিলেন; কর্কশ কণ্ঠে বলিলেন, "যা বল ছোট বউ, আমাকে যা খুসি তাই শুনাতে পার তুমি, কিন্তু তোমার আলালের ঘরের নন্দদুলালের অত্যাচার আমি কোনমতেই সইতে পারব না। তোমরা দুটী হ'লে খিষ্টেন, না মানো জাত, না মানো দেবতা, না মানো কিছু, তা বলে সবাইতো তোমাদের মত জাত হারিয়ে বসে নেই। আর দেখ ছোট্‌ঠাকুরপো, অনেক সহ্যি করেছি, আর সইবার ক্ষমতা আমার নেই তা স্পষ্ট বলে দিচ্ছি। তোমাদের নন্দদুলালকে হয় দূর করে দাও, নচেৎ স্পষ্ট বল, আমি এখান হ'তে চলে যাই।"

উষা শান্ত কণ্ঠে বলিলেন, "কি করেছে দিদি?"

হেমাঙ্গিনী ভগ্ন বাঁশখণ্ড সবেগে আন্দোলন করিয়া তেমনি তীব্রকণ্ঠে বলিলেন, "কি করেছে জিজ্ঞাসা কর ওই ধেড়েকেষ্ট ছোঁড়াকে। ছোটলোক কি সাধে বলে? ছোটলোক চেনা যায় প্রকৃতিতে। ছোঁড়াকে যত বারণ করি ঠাকুরঘরের দিকে যাস নে, মরতে ছোঁড়া ততই ঢুকবে সেই ঘরটায়। এই সকাল বেলা ঘর দোর ধুয়ে পরিষ্কার করে, চান করে এসে পূজার যোগাড়টা করে একটু রান্নাঘরে গেছি, ফিরে এসে দেখি কি মুখপোড়া অলপ্পেয়ে ডেক্‌রা পুজোর আসনে বসে দুই হাতে ফুল বেলপাত তুলে নিজের মাথায় দিচ্ছে। ওমা, দেখে তো আমি অবাক! ছোঁড়া যেমন আমায় দেখেছে, অমনি ভোঁ দৌড়। মনে জানছে এখানে এলে কেউ আর মারতে পারবে না। আচ্ছা, থাক তুই; ফের এবার একটা কিছু দেখব কি গলা টিপে মেরে ফেলব। দেখ ছোটবউ, তোমাকেও বলছি ভাই, তোমার আলালের ঘরের দুলালকে সাবধান করে রেখো, নইলে আমি যা খুসি তাই করব, তখন কোনও কথা বলতে পারবে না কিন্তু।"

গর্ব্বিত পদে তিনি চলিয়া গেলেন।

প্রবোধ স্ত্রীর মুখপানে চাহিয়া বলিলেন, "আরও কি রাখতে চাও একে?"

উষা একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "কি করব, রাখতে হবে বই কি। পথ হ'তে কুড়িয়ে এনেছি, এখন ফেলব কোথায়? অবোধ শিশু, কিছু বোঝে না বলেই যায়, নইলে কি যেত? ও জাত অজাত কি বোঝে? ও যে নীচ সাঁওতাল, আমরা উচ্চ ব্রাহ্মণ, এ পার্থক্য তার কাছে নেই। দেখ, এখনই ভেঙ্গে পড়না, এই তো সবে প্রথম, এখনও সইতে হবে ঢের। দয়া এখানেই তোমার ফুরিয়ে যায়নি, কর্ত্তব্য এখনও তোমার সামনে। এই শিশুকে যখন এনেছ, একে মানুষ করে গড়ে তুলতে হবে, যখন দেখব এ নিজের পায়ে ভর করে দাঁড়াতে শিখেছে, তখন ছেড়ে দেব। তুলে এনে এখন ছেড়ে দেওয়া মানুষের কাজ নয়।"

প্রবোধ বলিলেন, "আমার জন্যে ভাবছিনে উষা, ভাবছি তোমার জন্যে। আমি তো পরশু চলে যাব, আমার সঙ্গে এর সম্পর্ক ফুরাবে; কিন্তু তোমাকে যে নিয়ত একে নিয়ে থাকতে হবে, এদের এই সব কথা তোমায় নিয়ত শুনতে হবে।"

উষা বলিলেন, "আমি তার জন্যে প্রস্তুত হয়ে আছি, তোমায় আমার জন্যে ভাবতে হবে না। আমার জীবন

একদিকে, এই ছেলেটী একদিকে। যদি আমার সেই ছেলেটাই হোতো—তবে—"

আবার সেই প্রসঙ্গই উঠিয়া পড়ে দেখিয়া প্রবোধ তাড়াতাড়ি সরিয়া গেলেন।

(৩)

ইহার পর উষা রতনকে লইয়া পড়িলেন।

কিন্তু কি অস্থির ছেলে, বাস্তবিকই তাহাকে যাহা নিষেধ করা যায়, সে তাহাই করিয়া বসে। উষা ভাবিয়াছিলেন, স্নেহের শাসনে তাহাকে বশীভূত করিবেন। বেশী দুরন্ত ছেলেরা কঠোর শাসনকেও তুচ্ছ করে, কিন্তু স্নেহের শাসনের কাছে তাহারা স্বেচ্ছায় ধরা দেয়। কিন্তু এ ছেলে স্নেহের শাসন মোটেই মানিতে চায় না। কোনও কথা বলিলে মুখভার করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে, কিছুই বলে না। তথাপি উষা তাহাকে ছাড়িলেন না।

প্রবোধ চলিয়া যাইবার পরে যতগুলি পত্র দিয়াছিলেন তাহার সব কয়টীতেই এই দুরন্ত শিশুর কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন; প্রত্যেক দিন যাহা ঘটিত, উষা রাত্রে বসিয়া স্বামীকে লিখিয়া পাঠাইয়া দিতেন, তাহার একখানি এই—

তোমার পত্র পেয়েছি, প্রত্যেক দিনই যথারীতি পাই, আমিও যে উত্তর দেই তা তুমিও পেয়ে থাক। এখানে আর সবাই ভাল আছে। যার কথা বিশেষ করে জানতে চেয়েছ, তার আজ দুপুরের একটা কথা বলি শোন।

ঠাকুরঝি কাল রাত্রে এখানে এসেছেন, তখন ছেলেটার কথা কেউ বলতে সময় পায়নি, কারণ সবাই তখন কাজে ব্যস্ত হয়েছিল। আজ সকালে রতন উঠে বাইরে গিয়ে ঠাকুরঝির ছেলে সুখময়কে দেখে কি মনে করে বাড়ীর ভেতর চলে এল। আমি জিজ্ঞাসা করলুম—কিরে রতন?

সে চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করলে, "মা, ও খোকা কে?"

আমি তাকে জব্দ করে বশ করবার অভিপ্রায়ে বললুম, "তুই ভারি দুষ্ট, বলে আমরা ওই খোকাকে নিয়ে এসেছি, তোকে এবার বাড়ী হ'তে দূর করে তাড়িয়ে দেব।"

সে খানিক দাঁড়িয়ে রইল, তারপর হঠাৎ উচ্ছ্বসিত হয়ে কেঁদে উঠে আমার বুকে মুখ লুকিয়ে বলে উঠল—"না, মা, আর আমি দুষ্টামি করব না। তুমি দেখ, এবার হ'তে আমি খুব ভাল ছেলে হব।"

আমি থাকতে পারলুম না, তাকে একটা চুমো খেলুম, কিন্তু এই জন্যে আমাকে যে কত কথা শুনতে হল তার আর ঠিক নেই। কে যে আমার এই গর্হিত কাজটা দেখেছিলেন, তা আমি জানি নে। সে সাঁওতাল, আমি ব্রাহ্মণ, জাতির পার্থক্যটাই এখানে বিশেষভাবে প্রতিপন্ন হয়ে গেল। তোমার বোন, আমার ঠাকুরঝি, গম্ভীর হয়ে আমায় ডেকে বললেন, "বউ, এ সব খৃষ্টানী মত আমি আমাদের সংসারে চলতে দিতে পারি নে। তুমি বোধ হয় জানো তুমি কার পুত্রবধূ। তোমার শ্বশুর ইংরাজী শিক্ষিত ছিলেন না; তিনি নিষ্ঠাবান তর্কালঙ্কার ঠাকুর ছিলেন। যদি এ রকম খৃষ্টানী মত তুমি চালাতে চাও, তবে তোমার বাপের বাড়ী গিয়ে করলেই তা ভাল হয়।"

আমি মাপ চাইলুম না, কারণ কি কাজ আমি করেছি যাতে মাপ চাইতে হবে? আমি যদি জানতুম এটা গর্হিত কাজ, তা হলে অবশ্যই মাপ চাইতুম।

জানিনে তাঁরা কি মন্ত্রণা করছেন, অবশ্য সেটা এখনও আমার কানে এসে পৌঁছায় নি। শীগগিরই জানতে পারব, যদি আদেশ দাও তবে তা তোমাকেও জানাব।

কিন্তু একটা কথা তোমার কাছে আমার জিজ্ঞাস্য করতে আছে। সত্যি বল তুমি, কাজটা কি আমার অন্যায় হয়েছে? সে সাঁওতাল শিশু, আমি ব্রাহ্মণকন্যা; এই যে আমাদের মধ্যে পার্থক্য, এ কি মরণান্ত কাল পর্য্যন্তই চলবে? মরণের পরপারে গিয়ে—বল আমার একমাত্র দেবতা—সেখানেও কি সে থাকবে সাঁওতাল, আর আমি থাকব ব্রাহ্মণ? সেখানে কি সবই মিশে একাকার হয়ে যাবে না?

আহা, অনাথ শিশু, আমি যদি আজ একে তাড়িয়ে দেই, আবার সকলের সঙ্গে আমার মিলন হয়। আমাদের মাঝখানে বাধা হয়ে আছে সেই অভাগা; কিন্তু সে দাঁড়াবে কোথায়, যাবে কোথায়, কে তাকে আশ্রয় দেবে? যেমন এঁরা সকলে তাকে ঘৃণা করছেন, এমনি তো সকলেই ঘৃণা করবে। না, আমি তাকে তাড়িয়ে দিতে পারব না।

সকলে আমায় ঘৃণা করে করুক, আমি তাকে নিয়ে তফাতে থাকব।" বেশী আর কি বলব। আজকের ব্যাপার এই পর্য্যন্ত, পরে যা হয় লিখব। ইতি।

(৪)

রতনকে ভাত দেওয়া হইত একখানি পিতলের থালায়, প্রাঙ্গণের এক পাশে। যত বড় দুষ্টই হোক না সে, আহারের সময় ভারি ঠাণ্ডা হইয়া পড়িত। বড় বধূ যখন ভাত খাইবার জন্য ডাকিতেন, তখনই সে গোহালের মধ্য হইতে থালাখানা বাহির করিয়া আনিয়া তাহার নির্দ্দিষ্ট স্থানটীতে চুপ করিয়া বসিত; আহার সমাপ্তে তাহাকে থালাখানা তাহার সাধ্যমত মাজিয়া ধুইয়া আবার পূর্ব্বস্থানে রাখিয়া দিয়া আসিতে হইত।

সেদিন সমবয়স্ক সুখময়ের সহিত তাহার খুব ঝগড়া হইয়াছিল, মারামারিও হইয়াছিল, ইহাতে জয়ী হইয়াছিল সুখময়, সে রতনকে বেশ গোটাকত চড় কিল মারিয়াছিল। রতন ঊষার নিকট নালিশ করিতে গিয়া প্রচণ্ড এক তাড়া খাইয়া ফিরিয়া বাহিরে বসিয়া কাঁদিতেছিল।

আহারের সময় বড় বধূ এত ডাকিলেন, রতন কোনও সাড়া দিল না, রাগ করিয়া হেমাঙ্গিনী বলিলেন, "চুলোয় যাক্, আপদ্ গেলেই বাঁচি। খিদে বুঝি হয় নি, নইলে এতক্ষণ ভাতের থালার সামনে বসে গোগ্রাসে গিল্‌ত।"

ঊষার কাণে এ কথা গেল, তিনি তখন বারাণ্ডায় বসিয়া ননদের ছোট মেয়েটীকে জামা পরাইতেছিলেন; তাহাকে তাহার মাতার কোলে দিয়া তিনি বাহিরে আসিয়া দেখিলেন রতন তখনও ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতেছে।

কাছে আসিয়া সস্নেহকণ্ঠে ডাকিলেন "রতন—"

রতন একবার মুখটা তুলিল, তখনই মাথা নত করিল।

ঊষা তাহার মাথায় হাত রাখিয়া তেমনি স্বরে বলিলেন "ভাত খেতে গেলি নে কেন রে? খিদে হয়নি বুঝি?"

রতন এবার উচ্ছ্বসিত হইয়া কাঁদিতে লাগিল।

ঊষা রুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন, "পাগল ছেলে কোথাকার, সে তো অনেকক্ষণ মিটে গেছে, তবে ভাত খাবি নে কেন? এর পর সকলের খাওয়া দাওয়া হয়ে যাবে'খন, কে তোর আছে যে তোর ভাত নিয়ে বসে থাকবে? চল, আমার ঘরে বসে খাবি'খন।"

শিশু ভুলিয়া গেল, তাহার মুখে হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল, সে দুই হাতে চোখের জল মুছিয়া ফেলিল। ঊষা তাহার হাত ধরিয়া গৃহে লইয়া গেলেন।

তাহার থালাখানা হাতে লইয়া তিনি রন্ধন-গৃহের বারাণ্ডার নীচে দাঁড়াইয়া বলিলেন, "দিদি, রতনের ভাত দাও তো।"

মেজ জা সুনীতি মুখ বাড়াইয়া দেখিয়া ঘৃণার হাসি হাসিয়া বলিলেন, "খুব যা হোক ভাই ছোট বউ, সাঁওতাল ভূতটার জন্যে খাটছো খুব; বলি—ও কি তোমায় চাকরী করে এনে খাওয়াবে, মরলে মুখে আগুন দেবে?"

হেমাঙ্গিনী থালায় ভাত তরকারী ঢালিয়া দিতে দিতে ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, "ভূতের ব্যাগার, ভূতের ব্যাগার, নইলে এ আর কি?"

ঊষার মুখখানা শুধু বিকৃত হইল মাত্র, কিন্তু তিনি একটাও উত্তর দিলেন না, একটু হাসিয়া ভাত লইয়া চলিয়া গেলেন।

রতন দ্বারের কাছে কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, ঊষা ডাকিলেন, "ভাত খাবি আয়।"

রতন কি বলিতে যাইতেছিল, ঊষা বলিলেন, "আয়, আমি তোকে খাইয়ে দিচ্ছি।"

রতনকে টানিয়া আনিয়া ঊষা তাহাকে স্বহস্তে খাওয়াইয়া দিতে লাগিলেন।

আজ তাঁহার সেই পুত্রটী যদি থাকিত—সে কত বড় হইত! দুই বৎসরের শিশু—টলমল করিয়া সারা বাড়ীময় খেলিয়া বেড়াইত!

ধীরে ধীরে ঊষার চক্ষু দুইটী সজল হইয়া উঠিতেছিল, ঠিক সেই সময় পিছন্ হইতে ব্যঙ্গ হাসিপূর্ণ কণ্ঠে কে বলিয়া উঠিল, "বাঃ, চমৎকার উন্নতি যা হোক।"

ঊষা ফিরিয়া দেখিলেন তাঁহার ননদিনী।

সুরমা তেমনি হাসি মুখে বলিলেন, "কালে কালে আরও কত যে দেখতে পাব তা বলতে পারিনে। কোথাকার একটা বুনো সাঁওতালের ছেলে, মা বাপের ঠিক নেই

যায়, সে হ'ল তোমার বড় আদরের দুলাল, মা যশোদা হয়ে ভাত খাওয়াতে বসেছ তাকে। এর পর কোন্‌দিন দেখব নিজে খেতে খেতে ওকে খাওয়াচ্ছ।"

উষা শান্তকণ্ঠে বলিলেন, "তোমার পায়ে পড়ি ঠাকুরঝি, এ সময়টায় চুপ কর. এর পর যা খুসি তাই বোলো, ছেলে মানুষ, ভয় পাচ্ছে বড্ড।"

সুরমা নাসা কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, "মুখে আগুন, মুখে আগুন। তোমার জীবনে ধিক! আমাদের হতো তো গলায় দড়ি দিয়ে মরতুম। তুমি বলে তাই আবার লোকের কাছে মুখ দেখাচ্ছ ছোট বউ।"

তিনি চলিয়া গেলেন। উষার দুই চোখ জলে ভরিয়া আসিল, হাতেব ভাত হাতেই রহিল, আড়ষ্ট ভাবে বসিয়া রহিলেন। রতন খানিক নীরবে তাঁহার পানে চাহিয়া রহিল, তাহার পর ধীরে ধীরে উঠিয়া গেল, তাহার আর আহার হইল না, উষাও তাহাকে আর ডাকিলেন না।

(৫)

দিন দিন বড়ই অসহ্য হইয়া উঠিতেছিল। একমাত্র রতনকে উপলক্ষ্য করিয়া দিনরাত উষাকেই নির্য্যাতন করা হইতেছিল, অপরাধিনীর মত তিনি নীরবে সকল অত্যাচার সহিয়া যাইতেন।

ছয় সাত মাস কাটিয়া গিয়াছে, ইহার মধ্যে হতভাগ্য শিশু রতন একদিনও এ বাড়ীর কাহারও কাছে একটা ভাল কথা বা ভাল ব্যবহার পায় নাই। উষার জন্য কেহ তাহাকে প্রহার করিতে পারিতেন না, কিন্তু কথা বলিতেন বড় মর্ম্মঘাতী।

সেদিন মেজ ভাসুর সুবোধ আসিয়া তাঁহার সিগার কেস্ চুরি করা লইয়া উদ্দেশ্যে চোরকে গালাগালি করিতেছিলেন, সেই সময় সুখময় কোথা হইতে আসিয়া বলিয়া দিল, সিগার-কেস্ রতনকে লইতে সে স্বচক্ষে দেখিয়াছে।

রতনকে ধরিতেই সে ভগ্ন সিগার-কেস্ নিজের ভাঙ্গা বাক্স হইতে বাহির করিয়া দিল। দেখিয়া সুবোধ রাগে জ্ঞান হারাইলেন, তাহাকে যতদূর পারিলেন প্রহার করিয়া অবশেষে টানিতে টানিতে উষার কাছে আনিয়া বলিলেন, "দেখ ছোট বউ মা, ছোটলোকের ছেলেকে অত স্পর্দ্ধা দিয়ো না। তোমার সাহস পেয়ে ছেলেটা যা-না-তাই করে যাচ্ছে। তুমি না হয় চোখ বুজিয়ে সব সহ্য করতে পার বলে আর কেউ সহ্য করবে না। এটাকে আঁটতে যদি না পার, দূর করে দাও, আমরা আর একে ভাত দিতে পারব না তা বলে দিচ্ছি।"

পাষাণ মূর্ত্তির মত উষা দাঁড়াইয়া রহিলেন, হতভাগ্য ছেলেটা তাঁহার পায়ের কাছে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল। অনেকক্ষণ পরে একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া তিনি গৃহে প্রবেশ করিলেন।

তাঁহার মনে আজ স্পষ্টতঃ এই জ্ঞানটা জন্মিল তিনি কিছুতেই ইহাদের অধিকারের মধ্যে পদক্ষেপ করিতে পারিবেন না। ইহারা প্রথম হইতে তাঁহাকে যতটা দূরে রাখিয়াছে, বরাবর ঠিক ততটা দূরে রাখিয়াই চলিবে। তিনি যে দীনভাবে তাহাদের দুয়ারে পড়িয়া থাকিতে চান, তাহাদের চোখে ইহাও স্পর্দ্ধাজনক বলিয়া ঠেকে। তাঁহাকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া ধূলার সাথে একেবারে মিশাইয়া দিতে তাহারা চায়, ক্ষুদ্র শিশু রতন সেই মহাস্ত্র—যাহা দ্বারা তাঁহাকে একেবারে ধূলা করিতে পারা যায়।

খানিকটা প্রাণ ভরিয়া কাঁদিয়া তিনি শান্তি পাইলেন, তাহার পর আঘাতপ্রাপ্ত বালককে তুলিয়া আনিয়া তাহাকে খাবার দিয়া ভুলাইলেন।

ইহাকে তিনি রাখিবেন কোথায়? এ সংসারে ইহার থাকা কিছুতেই হইবে না। তবে ইহাকে তাঁহার পিত্রালয়ে পাঠানো চলে, তাঁহারা এই অনাথ বালককে প্রতিপালন করিবেন।

সেই দিনই তিনি পিত্রালয়ে পত্র দিলেন ও প্রবোধকে পত্র দিলেন।

সেদিন সকালবেলা; উষা গৃহ পরিষ্কার করিতেছিলেন, সেই সময় হেমাঙ্গিনীর গৃহে একটা তুমুল কোলাহল উঠিল—অনেকগুলি কণ্ঠ শুনা গেল—ওমা, একি ছেলে গো, কি চোর ছেলে, কি বুকের পাটা। এতটুকু ছেলে, এর পেটে এত সয়তানী চাল। ওমা—কোথা যাব গো, কি হবে গো, এমন নেকলেস ছড়া—ভেঙ্গে চুরমার করেছে?

উষা সম্মার্জ্জনী হস্তে শক্ত কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন, আর কোনও কথা শুনিবার ক্ষমতা তাঁহার ছিল না।

তাঁহার সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণ দিয়া মেজ ভাসুর ছুটিয়া গেলেন, পাড়ার গোটাকত বয়াটে ছোঁড়াও মজা দেখিতে ছুটিল, উষা সমভাবে সেইখানে দাঁড়াইয়া।

"এই নাও বউ মা, তোমার গুণধর দুলাল নাও।"

মেজ ভাসুর রতনকে আনিয়া বারাণ্ডায় ফেলিয়া দিয়া চলিয়া গেলেন, সঙ্গে সঙ্গে সুরমা, হেমাঙ্গিনী প্রভৃতি নারীবৃন্দও আসিয়াছিলেন। সুরমা গালে হাত রাখিয়া বলিলেন, "বাবা, ভালো ছেলে যা হোক। ছোট বউকে রোজগার করে খাওয়াবে বটে। এতটুকু ছেলে—সে কিনা বড় বউয়ের বাক্স হ'তে তার দামী নেকলেস ছড়াটা বার করেছে, সেটাকে ভেঙ্গে চুরমার করে পকেটে পুরে নিয়ে যাচ্ছে। ভাগ্যে দেখা হ'ল নইলে কি হ'ত! আবার ছেলের ঢং দেখ না, দুটো চড় মারতে না মারতে চলে পড়লেন, মুখ দিয়ে আর কথা বেরোয় না, যেন কতই মেরেছে। মরণ আর কি, পড়ে আছে দেখ না, যেন মড়া।"

মড়া কথাটা কাণে আসিবামাত্র উষার প্রাণটা ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল, তিনি অবনত মুখ উন্নত করিলেন।

আহা, ও কি? তাহার মুখ দিয়া রক্ত গড়াইয়া পড়িতেছে, দুটি চোখ নিমীলিত, মুখ একেবারে সাদা হইয়া গিয়াছে যে! আঁ্যা, রতন—রতন—

ব্যগ্রভাবে উষা বসিয়া পড়িয়া তাহাকে তুলিতে গেলেন, সে পড়িয়া গেল। সুরমা বলিলেন, "মরণ আর কি, এতটুকু ছেলের ন্যাকরা দেখ একবার।"

তাঁহার দিকে ফিরিয়া তীব্রকণ্ঠে উষা বলিয়া উঠিলেন "ওগো তোমাদের সকলের পায়ে পড়ি, আমায় একটুখানির জন্যে রেহাই দাও। আমি তোমাদের খুব চিনেছি, আর চিনিয়ে দিয়ো না। আমার বাবা কাল এলেই আমি একে নিয়ে জন্মের মত চলে যাব, আর তোমাদের বাড়ী আসব না। আজকের দিনটা আমায় আর জ্বালিয়ো না, তোমাদের পায়ে পড়ি, তোমরা বিদায় নাও।"

বলিতে বলিতে উচ্ছ্বসিত হইয়া তিনি কাঁদিয়া উঠিলেন।

বকিতে বকিতে সুরমা চলিয়া গেলেন, সঙ্গে সঙ্গে সকলেই চলিয়া গেল। উষা মুমূর্ষু বালককে বক্ষে তুলিয়া গৃহমধ্যে আনিয়া বিছানায় শুয়াইয়া দিলেন।

কিন্তু না, সে আর চোখ চাহিল না, সে আর মা বলিয়া ডাকিল না। দুর্দান্ত শিশু কোথা হইতে আসিয়াছিল আবার কোথায় চলিয়া গেল। চিরদিনই অজানা সে, অজানা ভাবেই থাকিয়া গেল, পরিচয়টাও দিয়া গেল না। দুদিনের জন্য আসিয়া সকলকে জ্বালাইয়া সে গেল। তাহার স্মৃতি রহিল শুধু যাহাকে মা বলিয়া ডাকিয়া কোলে গিয়াছিল তাহার বুকে, আর সকলেই তাহাকে ভুলিয়াছিল কেবল ভুলিতে পারেন নাই উষা। আর কেহই এ জগতে তাঁহাকে মা বলিয়া ডাকিয়া মায়ের শ্রেষ্ঠ আসন দিতে পারে নাই। যে দিয়াছিল তাহার কথা আমরণ কাল তাঁহার মনে জাগিয়া ছিল।

গান।

[শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল বি-এল]

এই আলোর ভরা অসীম আকাশ
সূর্য্য-কিরণ ঢালা,
চিত্তে আমার বাজায় বাঁশি
বসায় মধুর মেলা!

প্রভাত-পাখীর এই কল-তান
চিত্তে জাগায় সুপ্ত সে গান
ফুলের রাশি জাগায় হাসি
ভরায় কুসুম-ডালা!

এ আনন্দ সভামাঝে
চিত্ত আমার গানে বাজে
হৃদয় বাহির জুড়ে দেখি
অরূপ রূপে রাজে!

সেই একে আজ প্রণাম করি
হৃদয় ভুবন গানে ভরি
মধুর ক'রে কাটাই জীবন
ভুলি বেদন-জ্বালা।

হিক্কা ও শ্বাসরোগ এবং দেশীয় মতে তাহার চিকিৎসা।

[কবিরাজ শ্রীইন্দুভূষণ সেনগুপ্ত, এচ, এম, বি]

(পূর্ব্ব প্রকাশিত অংশের পর)

শ্বাসরোগ চিকিৎসা।

(১) বহেড়া চূর্ণ ৵৹ আনা মাত্রায় মধুসহ প্রত্যহ তিনবার করিয়া লেহন করিলে শ্বাসকষ্ট দূর হয়।

(২) পুরাতন গুড় ও সর্ষপ তৈল—সমভাগে মিশ্রিত করিয়া ২১ দিন সেবনে শ্বাসরোগ নষ্ট হয়।

(৩) বিল্বপত্রের রস, বাসকপত্রের রস এবং শ্বেত থুলকুড়িপত্রের রস ও উৎপলের রস সর্ষপ তৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া পান করিলে শ্বাস নষ্ট হয়।

(৪) কনক ধুতুরার ফল, শাখা ও পত্র খণ্ড খণ্ড করিয়া শুষ্ক করিয়া লইতে হইবে। ঐ শুষ্ক দ্রব্য কলিকায় সাজিয়া তাহার ধূম প্রবল শ্বাসের সময় পান করিতে দিলে সদ্য শ্বাসরোগ নিবৃত্তি হয়।

(৫) খানিকটা সোরা জলে ভিজাইয়া সেই জলে এক টুকরা সাদা কাগজ ভিজাইয়া শুষ্ক করিয়া লইয়া তাহার নল প্রস্তুত করিয়া ধূমপান করিতে দিলে প্রবল শ্বাস সদ্য উপশম হয়।

(৬) দেবদারু, বেড়েলা ও জটামাংসী সমান ভাগে লইয়া একত্র বাটিয়া তাহার দ্বারা একটী সচ্ছিদ্র বর্ত্তী প্রস্তুত করিবে এবং উহা শুষ্ক করিয়া সেই বর্ত্তীতে ঘৃত মাখাইয়া চুরুটের ন্যায় তাহার ধূমপান করিতে দিবে। ইহা আশু শ্বাসনিবারক।

(৭) ময়ূরপুচ্ছ ভস্ম ও পিপুল চূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিয়া মধুর সহিত অবলেহ করিলে শ্বাসের উপদ্রব নষ্ট হয়।

(৮) হরীতকী ও শুঁঠ সমানভাগে লইয়া একত্র বাটিয়া গরম জলের সহিত পান করিলে শ্বাস ও হিক্কা নষ্ট হয়।

(৯) গুড়, যবক্ষার ও মরিচ সমানভাগে লইয়া একত্র বাটিয়া গরম জলের সহিত পান করিলে শ্বাস নিবৃত্ত হয়।

(১০) বীজ রহিত বহেড়া গোমূত্র দ্বারা অবলেহ প্রস্তুত করিয়া ৵৹ আনা মাত্রায় মধুর সহিত লেহন করিলে শ্বাস নষ্ট হয়।

(১১) আদার রস দুই তোলা কিঞ্চিৎ মধুর সহিত পান করিলে শ্বাস কাস ও কফ প্রশমিত হয়।

(১২) বচের চূর্ণ ⁄৹ আনা মধুর সহিত লেহন করিলে শ্বাস নষ্ট হয়।

(১৩) বহেড়া বীজের শাঁস ৪।৫টা ও মিছরি ।০ আনা জলের সহিত সেবন করিলে শ্বাস নষ্ট হয়।

(১৪) শুঁঠ, বামনহাটি, কণ্টকারী, হরীতকী ইহাদের কাথ পান করিলে শ্বাস নষ্ট হয়।

(১৫) হরিদ্রা, মরিচ, দ্রাক্ষা, পিপ্পলী, রাস্না, শঠী, গুড় এই সকল চূর্ণ করতঃ সমানভাগে ৵৹ আনা মাত্রায় সর্ষপ তৈলসহ লেহন করিলে শ্বাস নিবৃত্ত হয়।

(১৬) জটামাংসী চূর্ণ ⁄৹ আনা, কুড় ⁄৹ আনা, দুই তোলা তুলসীপাতার রসের সহিত পান করিলে শ্বাস, কাস নষ্ট হয়।

(১৭) দুই তোলা বামনহাটি অর্দ্ধ সের জলে সিদ্ধ করতঃ অর্দ্ধ পোয়া থাকিতে নামাইয়া, ছেঁকিয়া তাহাতে পিপুল চূর্ণ ⁄৹ আনা ও মিছরি চূর্ণ ।০ আনা মিশ্রিত করিয়া পান করিলে শ্বাস ভাল হয়।

(১৮) আদার রসের সহিত পিপুল চূর্ণ ৵৹ আনা ও সৈন্ধব লবণ ৵৹ আনা মিশ্রিত করিয়া প্রত্যহ প্রাতে ও বৈকালে সেবন করিলে বিশেষ উপকার হয়।

(১৯) শোধিত গন্ধক চূর্ণ ঘৃতের সহিত অথবা শোধিত গন্ধক চূর্ণ ও মরিচ চূর্ণ ঘৃতের সহিত সেবন করিলে শ্বাস ভাল হয়।

হিক্কা ও শ্বাসরোগের পথ্যাপথ্য।

দিবসে—পুরাতন দাউদখানি চাউলের অন্ন, মুগ, মসুর, ছোলা প্রভৃতি ডাউল; বড় চিঙ্গড়ি বা বান মৎস্য। পটোল, ডুমুর, মোচা, পক্ক কুষ্মাণ্ড মানকচু, থোড়, উচ্ছে, প্রভৃতির তরকারী। ছাগ, হরিণ, শশক, ঘুঘু, পায়রা প্রভৃতি মাংসের যূষ, ছাগদুগ্ধ, খর্জ্জুর, দাড়িম, পানিফল, কিস্‌মিস্‌, আমলকী, কচিতালশাঁস, মিছরি, নারিকেল, তিল তৈল ও ঘৃতপক্ক ব্যঞ্জনাদি উপকারী।

রাত্রিতে—রুটী বা লুচি। উপরি লিখিত তরকারী অথবা মাংসের যূষ। দুগ্ধ অল্প মাত্রায় খাইতে পারিবেন। যে বেলা মাংসের যূষ খাইবেন সেইবেলা দুগ্ধ খাইবেন না। এই পীড়ায়, ডুমুরের ঘৃতপক্ক তরকারী বিশেষ উপকারী। গরম জল শীতল করিয়া পান করিবেন।

সকল প্রকার তরকারী সর্ষপ তৈলে পাক না করিয়া ঘৃত ও সৈন্ধব লবণসহ পাক করিয়া ব্যবহার করিবেন। অন্নের মধ্যে পাতিলেবু।

জলখাবার—ময়দা, সুজি, ছোলার বেসম, ঘৃত ও অল্প মিষ্ট সংযোগে প্রস্তুত কোন দ্রব্য, যথা—লুচি, মোহনভোগ, মেঠাই, গজা ইত্যাদি।

সহ্যানুসারে গরম জল শীতল করিয়া স্নান করিবেন।

গুরুপাক, তীক্ষ্ণবীর্য্য দ্রব্যসকল, দধি; দধি মৎস্য, রুক্ষ দ্রব্য পান বা ভোজন, লঙ্কার ঝাল, অধিক লবণ, সিম, দেশী কুমড়া, শাক, অম্বল, কলাইয়ের ডাউল মল মূত্রাদির বেগ ধারণ, ব্যায়াম, পথ পর্য্যটন, ধূলিসেবন, হিম লাগান, রাত্রি জাগরণ একেবারে নিষিদ্ধ। নিত্য স্নান, সঙ্গীত, উচ্চ শব্দোচ্চারণ, মৈথুন ও অশ্বাদি যানে ভ্রমণ প্রভৃতিও অত্যন্ত অপকারক।

প্রেমের চিহ্ন।

[শ্রীদ্বিজপদ মুখোপাধ্যায়, বি-এ]

প্রেম-চুম্বন চাহে প্রণয়িনী বলিতে পারে না ফুটে,
বাঁধা-বাহু-পাশ এড়াইতে চায় আলস-আবেশ টুটে।
নব বিকশিত প্রসূন সমীপে আসে যবে শিলী মুখ,
মৃদু কম্পিয়া প্রভাত সমীরে যেন নাহি চাহে সুখ।

মনে হয় যত তত ফুটেনাকো এ কি গো বিষম দায়,
মনে হয় বলি, হয়নাক বলা, গুমরি' মরি যে হায়।
চাহি যারে সদা মরমে মরমে রক্তকণিকাময়,
কাছে এলে সেই প্রিয়তম মম সরম কেন গো হয়?
এলে চুম্বিতে ফিরাই বদন যেতে চাই দূরে সরে,
দূরে গিয়া ভা'বি কাছে যাই পুনঃ মধুর পরশ তরে।

এ নহে ইচ্ছা তব সুন্দরি বুঝিয়াছি আমি সার,
তুমি যে এখন প্রেমের অধীনা আদেশ সাধিছ তার।
প্রণয় তোমার খেলে লুকোচুরি, লুকাতে জানেনা ভালো,
প্রকাশিত করে তাহারে আঁধারে তাহারি হাতের আলো।
মৃদু হাসিমাখা কোমল অধরে রঙ্গিন্‌ গণ্ডোপরে,
সোহাগ মাখান ও দুটী নয়নে যে ভাব প্রকাশ করে—
স্বভাবের দান ও যে প্রেমময়ি লুকাবার কভু নহে,
চিহ্ন নহেক বক্ষ ভিন্ন ভাব যে বাসনা বহে!

অনাহূত।

[শ্রীভবতারণ সরকার, বি-এ]

কেমন ক'রে, কমল বনে কেন ফুটে ফুল,
কেনই বা সে আপন মনে আপনি ঝ'রে যায়?
দিনযামিনী ছুটছে নদী করি কুল কুল,
কেই বা জানে কিসের আশে, কাহার ইসারায়?

সাগর বুকে সোহাগভরে উর্ম্মি পড়ে লুটে,
কার লাগি সে পাগল হাওয়া ছাড়ে দীর্ঘশ্বাস?
নীল আকাশে নিশার কোলে তারার হাসি ফুটে,
উদার প্রাণে কুসুম সদা ছড়ায় নিজ বাস?

ওরে অমনি ক'রেই ফাগুনরাতে কোমল হিয়াখানি
হঠাৎ যেদিন জেগে উঠে আপনি সাড়া দেয়,
কেউ না জানে কেমন ক'রে কোন সে সুরস আনি'
কোন্‌ অজানা মদির পরশ বক্ষে তুলে লয়।

নয় সে তখন ধরার মানুষ—স্বর্গে শুনে সুর,
সেই সুরেতেই গা ঢালিয়ে হৃদয় ভরপুর।

সংগ্রহ ও সঙ্কলন।

বসন্ত রোগের সহজ প্রতিকার।

আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে যাহা শীতলা ও মসূরিকা নামে পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে, বসন্ত রোগ নামে তাহাই জনসাধারণে সুবিদিত। শাস্ত্রে "বসন্ত" বলিয়া কোনও রোগের উল্লেখ না থাকিলেও বসন্ত কালেই এই ব্যাধির সচরাচর অধিক প্রাদুর্ভাব বশতঃই ইহা সর্ব্বত্র "বসন্ত" নামে সুপরিচিত। শীতলা ও মসূরিকা ব্যাধির পরস্পর পার্থক্য কি, এবং ইহার ইতিহাস নিদান ও যথাবিহিত চিকিৎসা প্রভৃতির সম্যকপ্রকার বৈজ্ঞানিক আলোচনা, আমাদের বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে—আমাদের উদ্দেশ্য সাধারণে, যাহা "বসন্ত" নামে বিদিত আছেন, যাহার আক্রমণে প্রতি বৎসর সহস্র সহস্র লোক অকালে কালের করাল-কবলে নিপতিত হয়, সেই ভীষণ ব্যাধির হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিবার কতকগুলি নিয়ম ও মুষ্টিযোগ যাহা প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ বলিয়া বহুদিন হইতে চলিয়া আসিতেছে—তাহারই কিঞ্চিৎ আলোচনা।

জ্বর, যক্ষ্মা ও কুষ্ঠ প্রভৃতি রোগের ন্যায় স্মরণাতীত কাল হইতে এই "বসন্ত" রোগও জগতে নিজ প্রাদুর্ভাব বার্ত্তা জ্ঞাপন করিয়া আসিতেছে ইতিহাস ও পুরাণাদির আলোচনায় আমরা ইহা জানিতে পারি। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে ইহার চিকিৎসা সম্বন্ধেও যথেষ্ট আলোচনা লক্ষিত হইয়া থাকে। "বসন্ত" রোগের প্রতিষেধ ও আরোগ্য সম্বন্ধে আধুনিক বিবিধ প্রকার উপায় আবিষ্কৃত হইলেও, সেই সকল নবাবিষ্কৃত ভেষজাদি হইতে ত্রিকালজ্ঞ আর্য্য ঋষিগণ উপদিষ্ট বহু প্রাচীনকাল হইতে সুপরীক্ষিত যে সকল ভেষজ ও নিয়মাদি প্রচারিত হইয়া আসিতেছে, তাহা যে "বসন্ত" রোগের প্রতিকার সম্বন্ধে সর্ব্বাধিক উপযোগী হইবে, তাহাতে আর সন্দেহের কারণ নাই।

"বসন্ত" রোগের যথাযথ ভাবে চিকিৎসা করিতে হইলে, চিকিৎসককে প্রথমতঃ ইহার নিদান, বাতাদি দোষত্রয়ভেদে প্রকারভেদ, রস-রক্তাদি আশ্রয়ভেদে ইহার বিভিন্ন লক্ষণ প্রভৃতি অপরাপর বহু বিষয়ে সুবিজ্ঞাত হইতে হয়; নচেৎ এই দুরারোগ্য ব্যাধির চিকিৎসা করা সম্ভব নহে; কিন্তু আমরা নিম্নে শাস্ত্র ও প্রত্যক্ষের উপর নির্ভর করিয়া, এমন কতকগুলি প্রতিকারের বিষয় উল্লেখ করিব, যাহা চিকিৎসাশাস্ত্রানভিজ্ঞ সর্ব্বসাধারণের পক্ষে সহজ বলিয়া প্রতীয়মান হইতে পারে।

"বসন্ত" রোগের প্রতিকার সম্বন্ধে প্রতিষেধক ক্রিয়াই আরোগ্য অপেক্ষা অধিক উপযোগী। এই সংক্রামক ব্যাধি যখন জনপদধ্বংসীরূপে চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হয়, তখন সকলের পক্ষেই সর্ব্বাগ্রে শুচি ও সর্ব্ববিষয়ে পবিত্রতা অবলম্বন করা বিশেষ ভাবে কর্ত্তব্য। খাদ্য দ্রব্য, পানীয় জল, শয্যা ও বসনাদির পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার দিকে বিশেষ ভাবে লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য। ধূণা গুগ্‌গুল্ প্রভৃতির দ্বারা প্রত্যহ গৃহ ধূপিত করা উচিত। "বসন্ত" রোগের প্রাদুর্ভাব সময়ে মৎস্য ও মাংস সেবন না করা অধিক মঙ্গলজনক। শাস্ত্রকারগণ বিশেষ ভাবে বলিয়াছেন শিম, শাক, মৌআলু মসূরিকা আনয়ন করে, সুতরাং, এই সকল দ্রব্য সেবন না করাই বাঞ্ছনীয়। প্রত্যহ নিম্বপত্র বা উচ্ছে সেবন বিশেষ হিতকর। গাত্রে চন্দনাদির প্রলেপও তদ্রূপ মঙ্গলজনক। "বসন্ত" রোগের প্রতিষেধক রূপে নিম্নলিখিত কতিপয় মুষ্টিযোগ প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ—

১। পুরুষের দক্ষিণ ও স্ত্রীলোকের বামপার্শ্বে হরীতকীর বীজ ধারণ করিলে বসন্ত রোগের আক্রমণের ভয় থাকে না। শ্বেতকণ্টকারীর মূল হস্তে ধারণ করিলে বসন্ত হয় না। বসন্ত কালে মধুর সহিত হরীতকী প্রত্যহ সেবন করিলেও বসন্ত নিবারিত হয়।

যে কোনও প্রকারেরই বসন্ত হউক নিম্নলিখিত মুষ্টিযোগ ও ভেষজ সকল যথাযথ ভাবে ব্যবহৃত হইলে বিশেষ ফল লাভ হইয়া থাকে।

২। বসন্তের প্রারম্ভেই হেলেঞ্চা শাকের রস অথবা শ্বেতচন্দনের কল্ক পান করিলে উপকার হয়। জয়ন্তীবীজ ও ঘৃত বাসি জলের সহিত পান করিলে উপকার দর্শে। অনন্ত-মূল তণ্ডুলোদক সহ বাটিয়া সেবন করিলে বসন্ত রোগ আরোগ্য হয়।

বসন্ত পাকিয়া উঠিলে নিম্নলিখিত ঔষধ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য—

৩। কুলচূর্ণ গুড়ের সহিত ভক্ষণ করিলে অথবা টাবালেবুর কেশর কাঁজির সহিত বাটিয়া প্রলেপ দিলে "বসন্ত" সকল পরিপক্ক হইয়া উঠে ও দাহ প্রশমিত হয়। বাসি জলের সহিত মধু মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলেও বিশেষ উপকার দৃষ্ট হয়। গুলঞ্চ, যষ্টিমধু, দ্রাক্ষা, ইক্ষুমূল, দাড়িম ও গুড় সংযুক্ত ঔষধ সেবন করিলে "বসন্ত" সকল শীঘ্র পাকিয়া উঠে।

বসন্ত অধিক পূয ও ক্লেদযুক্ত হইলে নিম্নলিখিত ঔষধ উপকারী—

৪। যজ্ঞডুমুর, অশ্বত্থ, পাকুড় ও বেত ইহাদিগের ছাল চূর্ণ করিয়া ক্ষত স্থানে ছড়াইয়া দিতে হয়। বিলঘুঁটে ভস্ম বা চূর্ণও এই উদ্দেশ্যে বিশেষ উপযোগী। ত্রিফলার কাথে গুগ্গুল্ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে পূঁযাদি নির্গত হইয়া বেদনা ও ঘায়ের উপশম হইয়া থাকে।

"বসন্ত" বহির্গত হইয়া পুনরায় মিলাইয়া যাইলে নিম্ন লিখিত ঔষধে বিশেষ উপকার দৃষ্ট হয়—

৫। রক্তকাঞ্চনের ছালের কাথ সহ স্বর্ণমাক্ষিক মিশ্রিত সেবন করিলে ও নিমছাল, ক্ষেত্‌পাপড়া, আকনাদি, পটোলপত্র, করিয়া, কটুকী, বাসক, দুরালভা, আমলকী, বেণামূল, শ্বেতচন্দন ও রক্তচন্দন এই নিম্বাদি কাথে চিনি প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে অন্তর্লীন বসন্ত পুনরায় বহির্গত হইয়া থাকে।

চক্ষু মধ্যে "বসন্ত" হইয়া যন্ত্রণা হইলে নিম্নলিখিত ঔষধে উপকার হইয়া থাকে—

৬। গোরক্ষচাকুলে ও যষ্টিমধু সিদ্ধ করিয়া সেই জল দ্বারা চক্ষু ধৌত করিলে বিশেষ উপকার দৃষ্ট হয়।

নিম্নলিখিত কষায় কয়টী প্রায় সর্ব্বপ্রকার বসন্তে সর্ব্ব-কালেই বিশেষ উপযোগী হইয়া থাকে—

৭। (ক) পূর্ব্বোক্ত নিম্বাদি কাথ। (খ) পটোলাদি কাথ, যথা:—পটোলপত্র, গুলঞ্চ, মুতা, বাসকছাল, দুরালভা, চিরতা, নিমছাল, কটুকী ও ক্ষেত্‌পাপড়া মিলিত ২ তোলা, জল ।।৹ সের, শেষ ।৵ পোয়া। (গ) খদিরাষ্টক, যথা:—খদিরকাষ্ঠ, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, নিমছাল, পল্‌তা, গুলঞ্চ ও বাসকছাল মিলিত ২ তোলা, জল ।।৹ সের শেষ ।৵ পোয়া। বসন্ত পাকিয়া উঠিলে পোস্ত, ঢেড়ির তৈল সর্ব্বাঙ্গে লেপন করিলে দাহ প্রভৃতি প্রশমিত হয়।

৮। রোগীর গৃহে নিম্নলিখিত ধূপ প্রদান করা কর্ত্তব্য—

চিতুল, দেবদারু, সরলকাষ্ঠ, গব্যঘৃত, গন্ধতৃণ, শিব-নির্ম্মাল্য, কটুকী, শ্বেতসর্ষপ, নিম্বপত্র, ময়ূরপুচ্ছ, সাপের খোলস, বিড়ালের বিষ্ঠা, গোশৃঙ্গ, মদনফল, বৃহতী কণ্টকারি, বচ, ধান্যের তুষ, ছাগ বিষ্ঠা, হস্তিদন্ত—এই সকল দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া, ছাগমূত্রে ভাবনা দিয়া, উদূখলে কুটিয়া, মৃত্তিকা পাত্রে স্থাপন করিয়া, রোগীর গৃহে ধূপ প্রদান করিলে বিশেষ উপকার দর্শে।

৯। রোগীর শয্যার উপর বাসকপত্র বা নিম্বপত্র বা কদলীপত্র (কচি) বিস্তার করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য।

কবিরাজ শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ রায়
স্বাস্থ্য, চৈত্র, ১৩২৯।

আমার দেখা লোক।

রো সাহেব এবং ৺লালবিহারী দে।

রো সাহেব হুগলী কলেজের সাহিত্যের অধ্যাপক ছিলেন; ক্লাসে কথাবার্ত্তায় দেখাইতে চাহিতেন যে কিছু বাঙ্গালা জানেন—'শশিমুখী' শব্দটাই অধিক ব্যবহৃত হইত। শুনিয়াছিলাম কৃষ্ণনগরে থাকার সময় সাহেব ধুতি পরিয়া সন্ধ্যার পর বেড়াইতে বাহির হইতেন। সাহেব অনতিদীর্ঘকায় বলবান ব্যক্তি ছিলেন এবং ঘোড়ায় চড়িতে ভালবাসিতেন। একদিন বলিলেন, "দেখ, আমার ঘোড়া টমটমেও চলে, আবার আমিও উহাতে চড়ি। তোমরাও দু-পিঠে ঘোড়ার ন্যায় হইও।" চন্দ্রমোহনের গাড়ী-

ঘোড়া ছিল। সে-ই এ কথায় মুখ ফুটিয়া উত্তর দিল; বলিল, "চড়িবার ঘোড়া টমটমে জুতিলে খারাপ হইয়া যায়, ঊর্দ্ধশ্বাসে ভাল দৌড়িতে পারে না—হয় টক্কর খায়, নয় ঢিমে চাল হয়।" সাহেব বলিলেন, "যদি আমার স্থায় উহার পিঠে অধিক চড় (রাইড) আর কম হাঁকাও (ড্রাইভ্), তবে খারাপ হইবে কেন? গ্লাডষ্টোন অধিক সময়টা লেখাপড়ার কাজ করেন—কম সময় কাঠ কাটেন, দুই কাজই ভাল করিতে পারেন। তোমাদেরও সেইরূপ হওয়া উচিত। পড়াশুনাও করিবে; শারীরিক পরিশ্রমের কার্য্যও করিবে।" কথাটা ভাল লাগিয়াছিল। অনেককে বলিয়াছি; নিজের জীবনেও উহার উপকারিতা উপলব্ধি করিয়াছি।

দু-পিঠে ঘোড়ার সহিত উপমা চন্দ্রমোহনের স্থায় আমাদের সকলেরই অপছন্দ হইয়াছিল; গ্লাডষ্টোনের সহিত তুলনা অবশ্য সকলেরই বেশ ভাল লাগিল।

সাহেবের ভিতর কতক ছেব্লামি, কতক দেশীয়-বিদ্বেষ, আবার কতকটা সরলতা ও মধুরতা ছিল। রো সাহেবের "হিণ্ট্স্" পুস্তকে 'বাবু-ইংলিশে'র উপর বিদ্রূপ বড়ই অপ্রীতিকর হয়। হরিদাস বলে, "কতটা পরিশ্রমে বিদেশীয় ভাষা শিখিতেছি, ভুল সংশোধন করিয়া দাও—তাহার কারণ দেখাইয়া বল যে বাঙ্গালার অনুবাদ করার অভ্যাসের জন্যই এইরূপ ভুলগুলি অনেক বাঙ্গালীর ঘটিয়া থাকে, এজন্য এইগুলিতে বিশেষ সাবধানতা প্রয়োজন। চলিতে শিখিবার সময় ছেলেরা সর্ব্বদা পড়িয়া যায়; হাত ধরিয়া চলানোর পরিবর্ত্তে ঠাট্টা হাসি বড়ই বিসদৃশ।" আমাদের মধ্যেই একজন বলিয়াছিল, "ওহে, 'খোকা সাজিয়া' কৃপার ভিখারী হইয়া কাজ নাই। ইংরাজের ঘৃণায় এখন হইতেই তাচ্ছল্য করিতে অভ্যাস করিয়া লও, যেখানে 'সহানুভূতি' নাই, সেখানে 'অভিমান' কেন? আমরা চীনাবাজারের ইংরাজী বলিয়াও ত 'কাজ' চালাইতেছি।" আমি অমরকোষের একটা গল্প জানিতাম, সেটা বলিয়া আমাদের ঘোরালো ইংরাজী লেখার চেষ্টার উপর ভীতি উৎপাদন করিলাম। গল্পটা এই :—একজন 'কবি-যশঃপ্রার্থী' লিখিয়াছিল, "ছোটে পিচ নাদে বজ্র!" তাহার বন্ধু জিজ্ঞাসা করিল, "পিচ—কিহে?" উত্তর—"ভাই, কথাটা তেমন প্রচলিত নয় বলিয়াই বুঝিতে পারিলে না; ঐ পর্য্যায়ের অপর সকল শব্দগুলিই সুপ্রচলিত—তড়িৎ-সৌদামিনী—বিদ্যুৎ-চপলা-চঞ্চলা'পিচ'।—জাঁকাল লিখিতে গেলেই ভুল হওয়ার সম্ভাবনা অধিক।"

যখন অপর অধ্যাপক ৺লালবিহারী দে মহাশয় রো সাহেবের 'হিণ্ট্স্' মধ্যে ব্যাকরণের ভুল সম্বাদ-পত্রে দেখাইতে আরম্ভ করিলেন, তখন সেই সকল সম্বাদপত্র আমরা আনন্দের সহিত পড়িতাম। রো সাহেবের নিকট আমরা যে উপকৃত হইয়াছিলাম, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। তবে সাধারণ ইংরাজের ধরণ অপ্রীতিকর বলিয়াই প্রসিদ্ধ।

৺লালবিহারী দের 'গোবিন্দ সামন্তে'র বিলাতে প্রশংসা হওয়ায় আমরা বড়ই গৌরব বোধ করিতাম। তিনি আমাদের বলিয়াছিলেন, "ভাল ইংরাজী গল্প সযত্নে সর্ব্বদা পাঠ করিও। যেটা বেশ ভাল লাগে সেটা বরাবর পাঠ করিলে দেখিবে যে নিজের লেখা ব্যাকরণ-শুদ্ধ হইতেছে কি না, 'কানেই' ধরা পড়িবে। কোন্‌টা অশুদ্ধ তাহা বুঝিলেই হইল—সূত্র মনে না পড়িলেও ভুল হইবে না।" ঐ উপদেশ মত অনেকেই চলিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম। ৺লালবিহারী দের ইতিহাস-পাঠনাও বড় সুন্দর ছিল। 'টেলার্স হিষ্টরী' ফার্ষ্ট আর্টসের পাঠ্য ছিল। তিনি বলিলেন, "বইটা নিজেরা বাড়ীতে পড়িয়া পরীক্ষা দিও। তবে বড় নীরসভাবে লেখা। ঐ পাঠ্য বিষয়ে যাহাতে মন পড়ে, তাহা আমি করিয়া দিব; গ্রীক-রোমীয়দিগকে তোমাদের সাক্ষাতে আনিয়া দিব"—ইহা বলিয়া বড়ই সুমিষ্ট ধরণে হাসিলেন। আমরা কিছু বুঝিতে পারিলাম না। কিন্তু দুই বৎসরে বহুসংখ্যক গ্রীক ও রোমীয় নাটক এবং কাব্য পড়াইয়া আমাদের যে কতটা উপকার করিলেন তাহা বলা যায় না। মাসে মাসে ইতিহাসের পরীক্ষা করিয়া দেখিতেন যে বাড়ীতে পাঠ্য পুস্তক আমরা প্রকৃত প্রস্তাবে পড়িতেছি কি না।

একদিন আমাদের পড়িতে বলিয়া, ক্লাসে বসিয়া 'এক্সারসাইজ' (তাঁহার প্রশ্নের উত্তর আমরা যাহা লিখিয়া ছিলাম) সংশোধন করিতেছিলেন। ওরূপ অবস্থায় প্রায়ই পাশাপাশি ছাত্রেরা একটু কথাবার্ত্তা

কয়। চন্দ্রমোহনের দিকে চাহিতে সে চুপ করিল; আবার কথা কহিতে আরম্ভ করিলে বলিলেন—"কোল্ থাওজাও টাইম্‌স্ ওয়াশ্‌ড্ ইজ ষ্টিল্ ব্ল্যাক" (কয়লা হাজার বার ধুইলেও কালোই থাকে)। চন্দ্রমোহন বলিল—"সার (মহাশয়), অঙ্গার শত-ধোতেন মলিনত্বং ন মুঞ্চতি। শত কিন্তু 'থাওজাণ্ড' নয়; আর তা ছাড়া 'ধুইয়া' কয়লা সাফ করার চেষ্টা সফল হইবে কেন? তাহার প্রোসেস্ (প্রক্রিয়া) অন্যরূপ। 'সদ্‌গুরু পাওয়ে ভেদ বতাওয়ে জ্ঞান করে উপদেশ। তব কোয়লা কি ময়লা ছুটে যব আগ্ করে পরবেশ'।" এই উত্তরে ৺লালবিহারী দে হাসিয়া ফেলিলেন এবং বড়ই সন্তোষ প্রকাশ করিয়া বলিলেন, "উদ্ধৃত কবিতাটী ঠিক মানাইয়াছে (এ ভেরি অ্যাপ্‌ট্ কোটেশন)।" ওদিকে চন্দ্রমোহনের ধপ্‌ধপে রং এবং অধ্যাপকের কয়লার মতনই পাকা রং আমাদের চক্ষের উপর থাকায় আমাদের মুচ্‌কি হাসি আর এক দিক দিয়াও আসিতেছিল। অধ্যাপকের মনেও তাহা আসিয়া থাকিবে; তিনি একটু গম্ভীর হইয়া বলিলেন, "হাসি-তামাসা গল্প-গুজব কমাইয়া পড়াশুনা করাই ভাল।" চন্দ্রমোহনকে বলিলাম, "এটা অবশ্য জ্ঞানের উপদেশ। এতে ত্রুটি ধরা চলিবে না।" ক্লাসের ছুটির পর চন্দ্রমোহনের মন পরিষ্কার করার জন্য কলেজের ঘাটে জলে ধুইবার প্রস্তাব হইল। চন্দ্রমোহনের দল হইয়া দুই-একজন অপর সকলকে 'আগ প্রবেশ করা'র—ছেঁকা-পোড়া দিবার—প্রস্তাব করিল।

বিদ্রূপ জিনিসটী ঠিক জায়গায় প্রযুক্ত হইলে বড়ই উপকারী। ষাণ্মাসিক পরীক্ষায় উত্তরের কাগজে মজরুলের অনেকটা কালি পড়িয়া গিয়াছিল। সে কাগজটায় বেশী লেখা ছিল না। কাগজটা বদলাইয়া দেওয়াই উচিত ছিল; আলস্যবশতঃই তাহা করে নাই। রো সাহেব সেইখানটায় একটা জানোয়ারের মূর্ত্তি আঁকিয়া দিয়াছিলেন। মজরুলের রাগ হইল—কিন্তু সেই অবধি খুব সাবধানও হইল। আমার একটা বর্ণাশুদ্ধি ছিল—কলেজের দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে বর্ণাশুদ্ধি প্রকৃতপক্ষেই অমার্জ্জনীয়। সাহেব সেইখানটায় বাঙ্গালা অক্ষরে 'ছি!' লিখিয়া রাখিয়াছিলেন। "যাকে বলে 'ছি' তার রৈল কি?" বাঙ্গালীর এই চলিত বাক্যটী—দোষের জন্য লোক-লজ্জার কথা—বড়ই সুস্পষ্টভাবে তখন মনে পড়িয়াছিল এবং সেই 'ছি' লেখাটীর স্মৃতি আমাকে অসাবধানতা হইতে বরাবরই রক্ষায় সাহায্য করিয়াছে। একদিন রো সাহেব বলিলেন, "রাইস এবং রায়ত" পত্রে 'আই-শেম' (চক্ষুলজ্জা) কথার ব্যবহার করিয়াছে। কথাটী বেশ; চক্ষে চক্ষে মিলাইয়া রূঢ়ভাবে কোন কথার প্রত্যাখ্যান করায় কখন কখন একটু কষ্ট হয় বটে, কিন্তু সাধারণতঃ আমরা উহা কমই অনুভব করি; এজন্য ঐ কথাটী ইংরাজিতে ছিল না।" এরূপ সরলতার জন্য সকলকেই রো সাহেবকে কতকটা ভালবাসিতে হইত। রো সাহেব পরে প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যক্ষ হইয়াছিলেন। শুনিয়াছি, তখন উঁহার পার্শিভ্যাল সাহেবের সহিত বিশেষ ঝগড়া হয়; কিন্তু সেজন্য ডিরেক্টর সাহেব কর্ত্তৃক পার্শিভ্যালের ঢাকায় বদলীর হুকুম হইলে তিনি নাকি লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন—"যদি পার্শিভ্যালের বদলী হয়, তাহা হইলে প্রেসিডেন্সী কলেজকেও তথায় পাঠাইয়া দেওয়া উচিত। পার্শিভ্যাল গেলে ইহাতে থাকিবে কি?"—এরূপ মহত্ত্বের কথা শুনিয়া বড়ই তৃপ্তি হইয়াছিল। ভাল লোকের নিকট পড়াশুনা করিয়াছিলেন, ইহা ভাবিতেই সকলে চায়।

৺মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায়।

ভারতী, ফাল্গুন ১৩২৯।

শ্রীহর্ষের নৈষধচরিত।

[শ্রীগিরীশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ]

বহুদিন পূর্ব্বে 'অর্চ্চনা' পত্রিকার জন্য হিন্দু-সাহিত্যের সমালোচনা লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়া, ভারতচন্দ্রের গ্রন্থ-বিষয়ে সামান্য কিছু লিখিয়াছিলাম। ভারতচন্দ্র ভরদ্বাজ গোত্র ব্রাহ্মণ, তাঁহারই পূর্ব্বপুরুষ কান্যকুব্জাগত যাজ্ঞিক পঞ্চ

ব্রাহ্মণের অন্যতম কবিগুরু শ্রীহর্ষ। শ্রীহর্ষের রীতি নীতি ভারতচন্দ্রের কাব্যেও বংশানুক্রমানুসারে অনুসৃত হইয়াছে, ইহা দেখাইবার অভিপ্রায়ে ভারতচন্দ্রের পরেই শ্রীহর্ষের নৈষধ কাব্যের সমালোচনা করিব, এমত সঙ্কল্প করিয়াছিলাম। কিন্তু "অন্যথা চিন্তিতো হ্যর্থঃ পুনর্ভবতি সোঽন্যথা।" মানুষ যাহা চিন্তা করে, অনেক সময়েই তাহার ফল অন্যরূপ হইয়া পড়ে, আমার ভাগ্যেও তাহাই হইয়াছে। বৎসরের পর বৎসর চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু সঙ্কল্পিত বিষয়ের কিছুই করিতে পারি নাই। অদ্য পুনরায় চিরসঙ্কল্পিত বিষয়ে প্রবৃত্ত হইলাম, দেখা যাউক ভগবৎ কৃপায় কৃতকার্য্য হইতে পারি কি না।

সংস্কৃতমহাকাব্যের মধ্যে ভারবির কিরাতার্জ্জুনীয়, মাঘের শিশুপাল বধ, ও শ্রীহর্ষের নৈষধ চরিত, এই তিনখানা কাব্যকে তুলাদণ্ডে তুলিয়া উৎকর্ষাপকর্ষের বিচার করার রীতি দেখিতে পাওয়া যায়।

লোক পরম্পরায় একটি প্রবচন শুনিতে পাওয়া যায় যে,—

ভারবের্ভা রবে র্ভাতি যাব ন্মাঘস্য নোদয়ঃ।
উদিতে নৈষধে কাব্যে ক মাঘঃ কচ ভারবিঃ॥

এই আভাণকের অর্থ বলিয়া দিতেছে যে, যে পর্য্যন্ত মাঘের শিশুপাল বধ কাব্যের আবির্ভাব না হইয়াছিল, তৎকাল পর্য্যন্ত ভারবির প্রতিভা রবি কিরণের ন্যায় দেদীপ্যমান হইয়াছিল। মাঘের অভ্যুদয়ে ভারবির গৌরব অভিভূত হইয়াছে। কিন্তু নৈষধ কাব্যের অভ্যুদয়ে ভারবি ও মাঘ উভয়ই হতগৌরব হইয়া পড়িয়াছে।

প্রদর্শিত বচনে কালিদাসের নাম দেখা যায় না। তাহার কারণ এই যে, কালিদাসের কবিতায় যেমন সর্ব্বজনীন সুখ সেব্যতা আছে, ভারবি প্রভৃতি কবিত্রিতয়ের কাব্যে তেমন সরলতা নাই।

অপর একটি উদ্ভট কবিতায় বলা হইয়াছে যে,

"উপমা কালিদাসস্য ভারবে রর্থ-গৌরবম্।
নৈষধে পদ-লালিত্যং মাঘে সন্তি এয়োগুণাঃ॥

"ভিন্ন রুচির্হিলোকঃ" আমরা কিন্তু শেষোক্ত কবিতার সর্ব্বাংশের সারবত্তা অনুভব করিতে পারিতেছি না। কারণ —যদিও কালিদাসের লেখনী উপমা বিন্যাসে অসাধারণতার পরিচয় দিয়াছে, তথাপি কতাবাক্যে অন্যের তুলনায় তাহার খর্ব্বতা অনুভূত হয় না। প্রত্যুত নিরতিশয় উৎকর্ষই উপলব্ধ হয়।

নৈষধ কাব্য অর্থগাম্ভীর্য্য-রহিত কেবল সুকুমার পদ বিন্যাসেই শ্রোতার চিত্ত মুগ্ধ করিয়া থাকে; ইহা নৈষধের তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিবার যাঁহার শক্তি আছে, তিনি কিছুতেই স্বীকার করিতে পারেন না। আমরা অনেক সমালোচকের সমালোচনাতেই নৈষধের বিরুদ্ধে তীব্র মন্তব্যের পরিচয় পাই; কিন্তু তাঁহাদের সহিত একমত হইতে পারি না। শ্রীহর্ষের পদাঙ্কানুসরণ করিয়াই, তাঁহার কাব্যের হেয়তাপ্রচারকদিগের প্রতি একটু কটূক্তি না করিয়া পারিতেছি না। কথাটা এই—মানব মাত্রেই ইক্ষু চিবাইয়া তাহার রসাস্বাদ করিতে পারে, অপর জন্তু বিশেষকেও এই রসাস্বাদে সমর্থ হইতে দেখা যায়, কিন্তু ইক্ষুরস হইতে উৎপন্ন গুড় চিনি মিশ্রি প্রভৃতির রসাস্বাদে সভ্য মানবই সমর্থ হইয়া থাকে। ইক্ষুরসের চরম পরিণাম ওলার সরবৎ সুসভ্য মানবের অতীব প্রীতিকর। কিন্তু ওলা ভিজাইয়া সরবৎ করার রীতি যে জানে না, সে ওলা-চর্ব্বণে প্রবৃত্ত হইয়া উহার রসাস্বাদে সমর্থ হয় না, প্রত্যুত জিনিষটার হেয়তা এবং উহার আবিষ্কর্ত্তা শিল্পীর দোষারোপ করিয়া থাকে। নৈষধ কাব্যের পক্ষেও কতিপয় সমালোচকের সমালোচনা ঠিক ইহারই অনুরূপ।

যে যুগে নৈষধ প্রভৃতি কাব্য লিখিত ও সুধী-সমাজে সমাদৃত হইয়াছিল, বর্ত্তমান যুগের রীতি-নীতি সভ্যতা-ভব্যতা শিক্ষা-দীক্ষার সহিত তাহার অনেকাংশেই বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে।

যে উপাদানের সমবায়ে অধুনা কাব্য লিখিত হইতে পারে, উহার দ্বারা সেই যুগের কাব্য লিখা চলিত না। আধুনিক কাব্যের লক্ষ্য শ্রোতার চিত্তের ক্ষণিক চমৎকরণ, পক্ষান্তরে সেকালের কাব্যের লক্ষ্য, শাস্ত্রীয় নীরস বিষয়গুলিকে সরস করিয়া মনোমুগ্ধকর ছাঁচে ঢালিয়া, তাহার সাহায্যে বিনেয়দিগকে চতুর্ব্বর্গের দিকে পরিচালিত করা। সুতরাং সেকালের কাব্যে শাস্ত্রীয় বিষয়-বিন্যাসের পারিপাট্য

সর্ব্বতোভাবে রক্ষিত হইত। বিবিধ শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন ও অভ্যাসলব্ধ-কবিত্ব-সম্পন্ন ব্যক্তিগণই কাব্য লিখিতেন, কাব্যের পাঠকদিগকেও কাব্যপাঠের উপযোগী শাস্ত্রের মর্ম্ম অবগত হইতে হইত।

যে সকল কবি পুরাতন ভাবকে লিপিবিন্যাসে নবীন করিতে কৌশল দেখাইতে পারিতেন, যাঁহাদের অভিনব ভঙ্গী প্রদর্শনে রসিক সমাজ অতীব চমৎকৃত হইতেন, তাঁহারাই সেকালে কবিকুলের মধ্যে সুখ্যাতি লাভ করিতেন। শাস্ত্রবিরুদ্ধ, সমাজবিরুদ্ধ বিষয় কাব্যে স্থান পাইত না।

কবি শ্রীহর্ষের নৈষধে উল্লিখিত গুণরাশির যেমন সমন্বয় দেখা যায়, বর্ত্তমান পরিজ্ঞাত-সংস্কৃত কাব্য সমূহের মধ্যে অনেক গ্রন্থেই তেমন দেখা যায় না। এই নবীকরণ গুণে মুগ্ধ হইয়াই সম্ভবতঃ কোন কবি বলিয়াছেন, "উদিতে নৈষধে কাব্যে ক মাঘঃ ক চ ভারবিঃ"।

কবি নিজেও অষ্টম-সর্গের শেষে বলিয়াছেন যে, তাঁহার এই নৈষধ কাব্য কবিকুলের অদৃষ্টপথের পান্থ, অর্থাৎ তাঁহার লিপিভঙ্গী বিষয়-বিন্যাস প্রভৃতি অন্যান্য কবিদিগের সম্পূর্ণ অপরিচিত।

"তস্যাগাদয়মষ্টমঃ কবিকুলাদৃষ্টাধ্ব-পান্থে"—

ঊনবিংশ সর্গের সমাপ্তিতেও তিনি বলিয়াছেন যে, তিনি অভিনব অর্থ ঘটনা অর্থাৎ নূতন প্রণালী পরিত্যাগ করেন নাই।

"একা নত্যজতো নবার্থ-ঘটনা"—

বিংশ সর্গের সমাপ্তিতেও তিনি বলিয়াছেন যে, তাঁহার কাব্যের রস প্রমেয় অর্থাৎ অলঙ্কার প্রভৃতি বিষয় ও ভণিতি (উক্তি) অন্য কবিদিগের সম্পূর্ণ অপরিচিত।

"অন্যাক্ষুণ্ণ-রস-প্রমেয়-ভণিতৌ"।

তাঁহার কাব্যই তদীয় বাক্যের সত্যতা-প্রতিপাদনে সম্পূর্ণ সমর্থ।

তিনি নৈষধ কাব্যের সর্গসমাপ্তিতে স্বপ্রণীত যাবতীয় গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার উক্তি হইতে জানা যায় যে,—(১) স্থৈর্য্যবিচারণপ্রকরণ, (২) শ্রীবিজয় প্রশস্তি-রচনা, (৩) খণ্ডন-খণ্ড-খাদ্য, (৪) গৌড়োর্ব্বীশ কুল-প্রশস্তি-রচনা, (৫) অর্ণব বর্ণন, (৬) ছিন্দ-প্রশস্তি, (৭) শিবশক্তি-সিদ্ধি, (৮) নব-সাহসাঙ্ক-চরিত, এই আটখানা গ্রন্থ নৈষধের পূর্ব্বে লিখিয়াছিলেন। *

উল্লিখিত গ্রন্থের মধ্যে খণ্ডন-খণ্ড-খাদ্য সুধী সমাজে সুপরিচিত ও সমাদৃত। অন্যান্য গ্রন্থ নামমাত্র শেষ হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

কবি স্বয়ং নৈষধ কাব্যকে সুধীবৃন্দ সমাদৃত অপূর্ব্ব দর্শন খণ্ডন-খণ্ড-খাদ্য অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন।

"ষষ্ঠঃ খণ্ডন খণ্ডতোঽপি সহজাৎ ক্ষোদ-ক্ষমে তন্মহা"—

তাঁহার উক্তির সার্থকতা নৈষধ তাৎপর্য্যবিৎ রসিক পণ্ডিতের হৃদয়ে পদে পদে প্রতিভাত হয়।

কবি শ্রীহর্ষ দর্শন লিখার পর মহাকাব্য নৈষধ লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। বোধ হয় সেকালের রীতিই এইরূপ ছিল যে, অন্যান্য কঠিন বিষয়ের রচনা দ্বারা লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যক্তিগণ কাব্য লিখিতে প্রবৃত্ত হইতেন। বেদ ভাষ্যকার মাধবাচার্য্য-পরাশর ভাষ্য পুরাণ সার সমুচ্চয় টীকা, সর্ব্ব-দর্শন সংগ্রহ বিবরণ প্রমেয় সংগ্রহ প্রভৃতি যাবতীয় গ্রন্থ লিখার পর, সংন্যাস ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া অভিনব কালিদাস নামে আত্মপরিচয় প্রদানপূর্ব্বক শঙ্কর দিগ্বিজয় কাব্য লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

দার্শনিক কবির গ্রন্থে দর্শনের কূটতর্কও স্থান পাইয়া থাকে, তন্নিবন্ধন উপযুক্ত গুরুর উপদেশ ব্যতীত তাদৃশ কাব্যের রসাস্বাদ সাধারণের পক্ষে অসম্ভব। বিশেষতঃ কবিপ্রবর শ্রীহর্ষ ভরদ্বাজ গোত্র ব্রাহ্মণ, মুখুটী বংশের

* তুর্য্যঃ স্থৈর্য্য-বিচারণ-প্রকরণ-ভ্রাতর্য্যয়ং তন্মহা
কাব্যেঽত্র ব্যগলন্নলস্য চরিতে সর্গো নিসর্গোজ্জ্বলঃ। ৪র্থ।
তস্য শ্রীবিজয়-প্রশস্তি-রচনা-তাতস্য নব্যে মহা-
কাব্যে চারুণি নৈষধীয় চরিতে সর্গো নিসর্গোজ্জ্বলঃ। ৫ম।
ষষ্ঠঃ খণ্ডন-খণ্ডতোঽপি-সহজাৎ ক্ষোদক্ষমে তন্মহা। ৬।
গৌড়োর্ব্বীশ-কুল-প্রশস্তি-ভণিতি-ভ্রাতর্য্যয়ং তন্মহা। ৭।
সংদৃব্ধার্ণব-বর্ণনস্য নবম তস্য ব্যরংসীন্মহা। ৯।
যাতঃ সপ্তদশঃ স্বসুঃ সসদৃশি ছিন্দ-প্রশস্তে মহা। ১৭।
যাতোঽস্মিন্ শিবশক্তি-সিদ্ধিভগিনী-সৌভ্রাত্রভব্যো মহা। ১৮।
দ্বাবিংশো নব-সাহসাঙ্ক চরিতে চম্পূকৃতো তন্মহা। ২২।

আদি পুরুষ। ঘটকের কবিতা হইতে জানা যায় যে, মুখুটী বড়ই কুটিল,—

"মুখুটী কুটিল বড় বন্দ্যঘটী শাদা।
তার পাছে বসে আছে চট্ট হারামজাদা॥"

নৈষধ কাব্যের অনেক কবিতায়ই ঘটক বাক্যের সত্যতা প্রতিপন্ন হয়। নেহাৎ সোজা কথাকেও কবি শ্রীহর্ষ ঘুরাইয়া ফিরাইয়া বিন্যাস করিয়াছেন। কিন্তু ইহাতে শ্রবণ মাত্রে অর্থবোধের ব্যাঘাত সত্বেও কাব্যের নিরতিশয় চমৎকারিতা প্রকটিত হইয়াছে।

কাচের আড়ালে চিত্র থাকিলে তাহার সৌন্দর্য্য যেমন অতিমাত্রায় বিকাশ পায়, তেমন কবির লিপি-ভঙ্গীতে সরল কথাও জটিলাকারে নিবদ্ধ হইয়া অসামান্য চমৎকার উৎপাদন করিয়া থাকে।

যেমন—হংস কথা বলিতে আরম্ভ করিল। এই সোজা কথাকেই কবি বাঁকাইয়া সাজাইলেন,—"গিরামুখা-ম্ভোজ মরং মুখোজ" বাক্যের সহিত সে মুখপদ্মের যোগ করিল।

দেবতার বরে রক্ষীদিগের অদৃশ্য হইয়া নলরাজ দময়ন্তীর প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইলেন। প্রথম কাহার সহিত দেখা হইলে জিজ্ঞাসা করা হয়,আপনি কোথা হইতে আসিয়াছেন, আপনার নাম কি? দময়ন্তীও নিষধরাজকে তাহাই জিজ্ঞাসা করিলেন। কিন্তু কবির বৈদগ্ধ্যে তাহার ছাঁচ অন্য রূপ—

"নারি দেশঃ কতমস্বয়াদ্য বসন্ত-মুক্তস্য দশাং বনস্য"।
...প্ত-সংকেততয়া কৃতার্থা শ্রব্যাপি নানেন জনেন সংজ্ঞা॥

৮।২৫

আপনি আজ কোন্ দেশকে বসন্ত মুক্ত-বনের দশায় ...ীত করিয়াছেন? বসন্তের বিরহে বনের যে দুরবস্থা হয়, ...নার অভাবেও দেশের সেই দশা ঘটিয়াছে। সেটি ...্ দেশ? অর্থাৎ আপনি কোন্ দেশ হইতে ...িয়াছেন।

...আপনাতে সঙ্কেতিত হইয়া অর্থাৎ আপনার নামরূপে ...ক্ত হইয়া যে সংজ্ঞা (নাম) কৃতার্থ হইয়াছে, তাহা ...মি শুনিতেও পারি না? অর্থাৎ আপনার নাম কি? ...প সর্ব্বত্রই বক্রোক্তির বাহুল্যে কাব্যের সৌন্দর্য্য ... পরিস্ফুট হইয়াছে।

নৈষধকাব্য অতীব বিস্তৃত। উহা বাইশ সর্গে সম্পূর্ণ। উহার প্রত্যেক সর্গই এক একখানা খণ্ড কাব্যের সমান। পদলালিত্যে আগাগোড়াই পরিপূর্ণ। এমন কি, অন্যান্য কবিতার মধ্যে নৈষধের কবিতা প্রক্ষিপ্ত করিয়া, যদি অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করা যায় যে, ইহাতে নৈষধের শ্লোক কয়টি আছে? তবে তিনি অনায়াসেই নৈষধের অপরিচিত শ্লোকগুলিকেও বাছিয়া বাহির করিতে পারিবেন।

এই কাব্যের উক্তি প্রত্যুক্তি বড়ই কৌশলপূর্ণ, সুতরাং চমৎকারজনক। বর্ণনীয় অংশ অনেক স্থলেই বাহুল্য নিবন্ধন ও ভাবের ঔৎকট্য নিবন্ধন পাঠকের ধৈর্য্যচ্যুতির কারণ হইয়া পড়িয়াছে।

তবে ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য যে, মাঝে মাঝে বর্ণনায় এরূপ সুন্দর স্বভাবোক্তির সমাবেশ আছে, যাহা অনেক কাব্যেই দৃষ্টিগোচর হয় না।

প্রথম সর্গের ১২৭ শ্লোকে রতিশ্রান্ত সুবর্ণ হংসের ঘাড় ফিরাইয়া, পাখের নীচে মাথা রাখিয়া, এক পায়ের উপর অবস্থান পূর্ব্বক নিদ্রার চিত্রটি বড়ই স্বাভাবিক হইয়াছে।

"অথাবলম্ব্য ক্ষণমেকপাদিকাং তদা নিদদ্রাবুপপল্বলংখগঃ।
সতীর্থ্যগাবর্তিত-কন্ধরঃ শিরঃপিধায় পক্ষেণরতিক্লমালসঃ॥"

হংসক্রীড়ার প্রত্যক্ষদর্শী পাঠকের হৃদয়ে বর্ণিত চিত্রটি বড়ই স্বাভাবিকরূপে প্রতিভাত হয়।

নলকর্ত্তৃক ধৃতহংসের আত্মমোচনপ্রয়াসের নিষ্ফলতা নিবন্ধন নৈরাশ্য ও নিরোধকারীর করদ্বয়ে চঞ্চুঘাত বেশ স্বাভাবিক হইয়াছে।

"তদাত্ত মাত্মান মবেত্য সংভ্রমাৎ পুনঃপুনঃ প্রায়সদুৎ-
প্লবায় সঃ।
ততোবিরুত্যোড্ডয়নে নিরাশতাং করৌ নিরোদ্ধুর্দশতিস্ম
কেবলং॥ ১২৭।

সাধারণতঃ দেখা যায়, কোনও পাখীকে হটাৎ ধরিয়া ফেলিলে প্রথমতঃ সে পলাইতে চেষ্টা করে। তাহার প্রযত্ন বিফল হইলে, অনন্তোপায় হইয়া সে কেবল তাহার অবরোধকারীর হাতে ঠোক্‌রাইতে থাকে।

রাজকর্ত্তৃক ধৃত জীবন-নিরাশ হংসের বিলাপটির বড়ই

মর্ম্মস্পর্শিতা অনুভূত হয়। ইহার মধ্যেও জননীর উদ্দেশে নৈরাশ্যপূর্ণ কথা কয়টি অধিকতর চিত্তদ্রবকর।

"মুহূর্ত্তমাত্রং ভবনিন্দয়া দয়া সখাঃ সখায়ঃ স্রবদশ্রবো মম।
নিবৃত্তিমেষ্যন্তি পরং দুরুত্তর স্ত্বৈব মাতঃ সুতশোকসাগরঃ।

হে মা! আমার বন্ধুবর্গ মুহূর্ত্তমাত্রকাল দয়াপরবশ হইয়া সজলনেত্রে সংসারের নিন্দা করিয়া, অর্থাৎ ক্ষণভঙ্গুর দেহ, উহাকে নিয়া সংসারে এত আসক্তি বৃথা, ইত্যাদি কথা বলিয়া, পুনরায় প্রকৃতিস্থ হইবে। কিন্তু মা! তোমার পক্ষেই কেবল পুত্র-শোকসাগর দুরুত্তর অর্থাৎ সারাজীবন ব্যাপী। ক্রমশঃ।

চাঁদপ্রতাপের ব্রত-কথা।

[শ্রীযোগেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী]

(৪) পাটাই ব্রত।

অগ্রহায়ণের শুক্লা চতুর্দ্দশী তিথিতে পাটাই ব্রত করা হয়। এই ব্রত শাস্ত্রোক্ত পাষাণ চতুর্দ্দশী ব্রতেরই নামান্তর মাত্র। ব্রাহ্মণেতর অনেক গৃহেই পৌষ মাসেও এই ব্রত করা হইয়া থাকে।

মাঠ হইতে একটি স-মূল বিন্না ছোবা (খড় বিশেষের গুচ্ছ) তুলিয়া আনিয়া কলার ফেত্তরা (কলা গাছের খোলার কিনারার ফিতার ন্যায় অংশ) দিয়া উহার মূল হইতে শীর্ষভাগ পর্য্যন্ত পেঁচাইয়া বাঁধিয়া কাহারও গৃহাভ্যন্তরে, কাহারও উঠানে প্রোথিত করা হয়। তৎপর উহা নানা ফুলে সজ্জিত করা হইয়া থাকে।*

দুর্গতিনাশিনী দুর্গাদেবীর উদ্দেশে মহিলাগণ পাটাই ব্রত করিয়া থাকেন। পাঁচ প্রকার পিষ্টক ও পঞ্চ ব্যঞ্জনসহ অন্ন এই ব্রতে অবশ্যই দিতে হয়। ইহা ছাড়া নানাপ্রকার উপাদেয় ফল-মূল, দধি-দুগ্ধ মিষ্টান্ন ইত্যাদি খাদ্যোপকরণ অনেক গৃহেই যথাসাধ্য দেওয়া হইয়া থাকে। তণ্ডুল-চূর্ণ দ্বারা প্রস্তুত 'পাটা পুতা' (শিল-নোড়া) কোনও পিষ্টকের সহিত জাল দিয়া এই ব্রতে অবশ্যই দিতে হয়। ইহাই সর্ব্ব প্রধান উপকরণ। 'পাটা'র আকারে পিষ্টক দেওয়া হইয়া থাকে বলিয়াই হয় ত এই ব্রতের 'পাটাই' আখ্যা হইয়া থাকিবে। ব্রত করিতে হয় সন্ধ্যার পর। পুরোহিত দুর্গা পূজার বিহিত পুষ্পাদি দ্বারা যথা-শাস্ত্র দুর্গা দেবীর অর্চ্চনা করিয়া থাকেন।† কোন কোন ব্রাহ্মণ-বাড়ীতে ব্রতিনীগণ নিজেরাই দেবীর পূজা করিয়া থাকেন। পুরোহিত তাহাদিগকে মন্ত্রাদি বলিয়া দিয়া থাকেন। কোন কোন নিম্ন শ্রেণীর গৃহে পুরোহিত উপস্থিত না থাকিলে ব্রতিনীরা নিজেরাই যথা জ্ঞানে পূজা করিয়া থাকেন। সর্ব্বসাধারণের গৃহে দশোপচারে অর্চ্চনা করা হইয়া থাকে। বলা বাহুল্য, উক্ত বিন্না ছোবার স-মূলেই দেবীর অর্চ্চনা করিতে হয়। ব্রতিনীদিগকে ব্রত দিবসে পূজা না হওয়া পর্য্যন্ত অনাহারে থাকিতে হয়। তাহারা পূজা শেষে 'কথা' শ্রবণ করিয়া দেবী-প্রসাদ পাষাণাকার পিষ্টকাদি ভোজন করিয়া থাকেন। যাহাদের 'আস্ত' (পুরুষানুক্রমিক চলিত নিয়ম) নাই, তাহাদের গৃহে এই ব্রত করা হয় না। ব্রতিনীগণ পাটাই ব্রত চিরকালই করিয়া থাকেন, অর্থাৎ এই ব্রতের প্রতিষ্ঠা (কোন নির্দ্দিষ্ট সময় পর্য্যন্ত ব্রত করিয়া ব্রত শেষ করিবার নিয়ম) নাই। পূজা শেষে জনৈকা ব্রতিনী 'কথা' বলিয়া থাকেন। অন্যান্য মহিলাগণ নিবিষ্ট চিত্তে তাহা শ্রবণ করেন। 'কথা' অন্তে সকলে মিলিয়া হুলুধ্বনি করিয়া থাকেন।

* শাস্ত্রে এরূপ কোন কিছু প্রোথিত করিবার বিধি দৃষ্ট হয় না।

† শাস্ত্রেও এইরূপ বিধান আছে। তিথিতত্ত্বে লিখিত,—"বৃশ্চিকস্থে রবৌ শুক্ল চতুর্দ্দশ্যাং রাত্রৌ দুর্গাপূজা, তস্যৈ পাষাণাকার পিষ্টকদানং তদ্ভক্ষণঞ্চ কার্য্যং।" ভবিষ্যৎ পুরাণেও লিখিত আছে,—"বৃশ্চিক শুক্লপক্ষেতু যা পাষাণ চতুর্দ্দশী। তস্যামারাধয়েদ্দেবীং নক্তং পাষাণ ভোজনৈঃ।"

অতি প্রত্যূষে উক্ত 'বিন্না ছোবাটি' জনৈকা ব্রতিনীকে পুকুরের কিনারায় জলে প্রোথিত করিতে হয়।

'ব্রতকথা' সংক্ষেপতঃ এইরূপ :—এক ছিল গৃহস্থ। তাহার মাতা প্রতি বৎসরই ভক্তি সহকারে পাটাই ব্রত করিতেন। দেবীর কৃপায় গৃহস্থের দিন দিন উন্নতি হইতে লাগিল। গৃহস্থ যুবক, কিন্তু অবিবাহিত। সকল সুখের অধিকারিণী হইয়াও, একমাত্র পুত্র বিবাহ না করায় গৃহস্থের মাতার মনে শান্তি ছিল না। এমন দিন যাইত না, যেদিন মাতা পুত্রকে বিবাহ করিতে অনুরোধ না করিতেন। কালক্রমে পুত্রের মত পরিবর্ত্তিত হইল; মায়ের অনুরোধ সে এড়াইতে পারিল না, বিবাহ করিতে সম্মত হইল। ইহাতে মাতা অতিশয় সুখী হইলেন।

এক শুভদিনে শুভলগ্নে গৃহস্থের বিবাহ হইল। পরমা-সুন্দরী বধূ পাইয়া গৃহস্থের মাতার আহ্লাদের সীমা রহিল না।

এবার বৃদ্ধা পুত্রবধূসহ খুব ঘটা করিয়া পাটাই ব্রত করিবেন। তাই গৃহস্থ পূর্ব্ব হইতেই নানা দ্রব্য আনয়ন করিতে লাগিল। ব্রতের দিন শাশুড়ী বধূসহ পিষ্টকাদি প্রস্তুত করিলেন।

বধূ পিতৃগৃহে, এমন কি তথাকার কোন বাড়ীতেই এই ব্রত করিতে দেখে নাই। সে 'পাটাই' নাম শুনিয়া এই ব্রতের প্রতি মনে মনে অবহেলা করিয়াছিল এবং ভাবিয়াছিল যে, ইহাতে কোন লাভ নাই; অনর্থক সারাটা দিন অনাহারে কষ্টে অতিবাহিত করা। পূজার সময় সে ভাবিয়াছিল যে, পূজাটা শীঘ্র হইয়া গেলেই ভাল; নতুবা উপবাস-ক্লেশ ভোগ করিতেই হইবে।

সেই রাত্রেই বধূটি অতি যন্ত্রণাদায়ক পেট ব্যথায় সারা রজনী চীৎকারে ও অনিদ্রিতাবস্থায় যাপন করিল। পরদিন গৃহস্থ চিকিৎসক আনিল। চিকিৎসক রোগিণীকে ঔষধ দিলেন, কিন্তু তাহাতে কোন ফলই পাওয়া গেল না। গৃহস্থ ও তাহার মাতা উদ্বিগ্নচিত্তে কালযাপন করিতে লাগিলেন, আর কেন এমন হইল তাহা ভাবিয়া কূল কিনারা পাইলেন না।

রাত্রিতে গৃহস্থের মাতা স্বপ্নে দেখিলেন—এক জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী বলিলেন—"তুমি যে বউ ঘরে আনিয়াছ, তাহার দেব-দেবীর প্রতি বিশ্বাস ভক্তি নাই। আমার প্রতি সে মনে মনে হেয় জ্ঞান করিয়াছে। মতি পরিবর্ত্তিত না হইলে তাহার কষ্ট দূর হইবে না।"

পরদিন প্রাতে বৃদ্ধা, পুত্র ও বধূর নিকট স্বপ্নবৃত্তান্ত বলিলেন। ইহা শুনিয়া বধূর প্রাণ আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিল। সে তখনই উদ্দেশে দেবীকে ভক্তি সহকারে প্রার্থনা করিল—"মা, আমি অবোধ বালিকা; না বুঝিয়া অন্যায় করিয়াছি; দয়া করিয়া নিজগুণে তোমার এ অধম সন্তানকে ক্ষমা কর মা! আর যে এ দারুণ কষ্ট সহ্য হয় না, কৃপা করিয়া এ অসহ্য ক্লেশ দূর কর মা! তোমার প্রতি আমার ভক্তি অটুট থাকিবে। আমি শাশুড়ী-মাতার সহিত প্রতি বৎসরই নিয়ম নিষ্ঠা সহকারে ব্রত করিব।"

বধূর কাতর প্রার্থনায় দেবীর দয়া হইল। সত্বরই তাহার বেদনা সম্পূর্ণরূপে বিদূরিত হইল। সে বৎসর পবিত্রভাবে খুব ঘটা করিয়া শাশুড়ী পুত্রবধূসহ পাটাই ব্রত করিলেন। তাহাদের কোন দুঃখ রহিল না। তাহারা সুখে শান্তিতে ঘর-সংসার করিতে লাগিল।

গান।

[শ্রীহারাণচন্দ্র রক্ষিত]

মা! কেন তোর লুকোচুরি।
খেল্‌তে সাধ আর নাই মা শ্যামা, ভাবের ঘরে ক'রে চুরি॥
আমার খেলার সাথী ছিল যারা, পালিয়ে গেছে ছিঁড়ে ডুরি,
কর্ম্মফেরে, নেশার ঘোরে, তবু আজও ছুটে মরি॥
সর্ব্বনাশি, সকল নাশি, এখনও তোর রঙ্গ হেরি,
(ওমা) হার মেনেছি ও চরণে, মারিসনে আর বুকে ছুরি॥

কুহু।

[শ্রীমতী প্রতিভা বিশ্বাস]

(১)

ও বসন্তের বার্ত্তাবহ
কিসের খবর নিয়ে—
বেড়াও—কানন-সভার শাখায় শাখায়
আগমনী গেয়ে?
পরি' কচিপাতার বসন
পাতি' শিউলি ফুলের আসন—
আজ্‌কে তোমায় ডাক্‌চে কানন—
দাঁড়াও পিকবর—
কি কথা আজ শুনাও ওগো
বসন্তেরি চর!

(২)

না জানে কি গোপন আছে
তোমার 'কুহু' স্বরে?
যে ডাকেতে সবার মনই
ফেলে পাগল ক'রে'।
আর কি সে গো দেখে চেয়ে?
কোথা যে যায় উধাও হ'য়ে—
পথের দিকেও চক্ষু বুজে
অন্ধ হয়ে থাকে—
তুমি বন্ধ কর চলার সে পথ
আর এক 'কুহু' ডাকে!

(৩)

অবুঝ শিশু কি-ই বা বোঝে
সেও গো তোমার স্বরে,
নূতন কাজের উৎসাহটা
পায় যে দ্বিগুণ ক'রে।
তাই হাততালি দেয় লাফায় ঝাঁপায়
তোমার সুরেই কেবল চ্যাঁচায়—
শিশুর কাছে শিশু হ'য়ে
কর কি আনন্দ দান!
প্রাণ খুলে সেও হেসে তোমায়
দেয় গো প্রতিদান!

(৪)

যৌবনের ঐ অস্থিরতায়—
তোমার 'কুহু' তানে
ঝঙ্কারিয়া—বেসুর কেবল
বাজে হৃদয়-বীণে!
পা দু'খানি মাটীর 'পরে
লুটাতে চায় নিজের ভরে—
বেদনভরা তোমার ও গান
শুন্‌তে না চায় আর—
ভাবে, প্রতীক্ষাতে বসে থাকাই
হ'লো বুঝি সার।

(৫)

প্রৌঢ়া যখন চর্‌কা কাটে
আঙিনাতে বসে'
ও কুহুতান তখন যদি
কানে তাহার পশে—
অতীতের কোন্ স্মৃতি ভেবে
চর্‌কা ফেলে বক্ষ চেপে—
আঁচল দিয়ে চক্ষু হ'তে
মুছে ফেলে জল—
হাত চলে না সুতা কাটায়
হারায় সকল বল।

(৬)

জাগরণেই স্বপ্ন দেখে
বৃদ্ধ 'কুহু' তানে—
চম্‌কে গিয়ে উঠে বসে
তোমার মধুর গানে।
পরপারের ভাব্‌না এসে
মনের মাঝে ওঠে ভেসে—
হে আগন্তুক! ডাক বারেক
মন-মাতান ডাক্
কানন মাঝে চিরানন্দ
কেবল জেগে থাক্!

মধুমক্ষিকা-সমবায়।

[শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত]

(২)

[মৌমাছির দেহের বিশিষ্টতা বুঝিতে হইলে, তাহারা যে জীবশ্রেণীর অন্তর্ভূত, সে জীবশ্রেণী সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা আবশ্যক। তাই আমারই নিজের লেখা 'ষট্পদ' * নামক প্রবন্ধটি এস্থলে উদ্ধৃত করিলাম।]

সংস্কৃত শব্দ ষট্পদ অর্থে মধুমক্ষিকা। কিন্তু উই, পিপীলিকা, ফড়িং, প্রজাপতি প্রভৃতি নানা জাতীয় কীট-পতঙ্গের ছয়টি পদ থাকিলেও তাহাদিগকে ষট্পদ শ্রেণীভুক্ত করা হয় না। ছয়পদ বিশিষ্ট কীট পতঙ্গগুলিকে ইংরাজীতে ইন্‌সেক্ট (Insect) বলা হয়। আমরা এ প্রবন্ধে ষট্পদ শব্দের যোগরূঢ় অর্থ বর্জ্জন করিয়া সকল ছয়পদ বিশিষ্ট কীট পতঙ্গ সম্বন্ধে উহা প্রয়োগ করিব। Insect শব্দের ষট্পদ ভিন্ন অপর কোনও সংস্কৃত শব্দ পাইলাম না বলিয়া ইন্‌সেক্ট জাতীয় জীবের অর্থে 'ষট্পদ' শব্দ ব্যবহার করিতে বাধ্য হইলাম।

ষট্পদ নানা শ্রেণীতে বিভক্ত। এত প্রকারের ছয় পদ বিশিষ্ট কীট পতঙ্গ দেখিতে পাওয়া যায় যে, আমাদের সাধারণ ভাষায় প্রত্যেকের নামকরণ করা হয় নাই। মোটামুটি কতকগুলা নামজাদা কীট পতঙ্গের সহিত আকারের সাদৃশ্য দেখিয়া আমরা অনেকগুলাকে পোকা, ফড়িঙ্, প্রজাপতি, পিঁপড়ে, আরশুলা প্রভৃতি আখ্যা প্রদান করি এবং যথাসম্ভব সেগুলির নিকট হইতে দূরে থাকিতে চেষ্টা করি। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান প্রত্যেক ষট্পদের আকার প্রকার, চাল চলন পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তাহাদিগের নামকরণ করিয়াছে, তাহাদের শ্রেণী বিভাগ করিয়াছে। সাধারণ লোকে যেমন একটা নূতন রকমের কীট বা পতঙ্গ দেখিলে ভয়ে ও ঘৃণায় তাহার নিকট হইতে দূরে থাকিতে পারিলে আপনাকে সৌভাগ্যবান মনে করে, নূতন রকমের ষট্পদ পাইলে ষট্পদ-তত্ত্ববিদ্ বিলাতী পণ্ডিত তেমনি মনে করেন যে তাঁহার ভাগ্য সুপ্রসন্ন। এই শ্রেণীর পণ্ডিত-দিগকে Entomologist বলা হইয়া থাকে। বিলাতে অনেক ষট্পদ-তত্ত্ববিদ্ আছেন। আবার এক একজন এই প্রাণী বিভাগের এক একটী শ্রেণীর ষট্পদের চাল চলন বিশেষত্ব অধ্যয়ন করিয়া জীবন যাপন করিয়াছেন। মাছি, মৌমাছি, উই, পিপীলিকা, ভ্রমর, প্রজাপতি সকল শ্রেণীর ভিন্ন ভিন্ন উপাসক পাশ্চাত্যে অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের দেশের কবির দল দুষ্ট অলিকে লইয়া অনেক ঠাট্টা বিদ্রূপ করিয়াছেন বটে, কিন্তু কেহ তাহাদের রীতি নীতি, চাল চলন লক্ষ্য করিয়া কালাতিপাত করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। সংস্কৃতে ষট্পদপ্রিয় অর্থে নাগকেশর নলিনী প্রভৃতি ভৃঙ্গপ্রিয় কুসুম বুঝায়, অধ্যয়নশীল পণ্ডিত বুঝায় না!

ষট্পদ বা insect জাতীয় কোন জীবকে ব্যবচ্ছেদ করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে সাধারণতঃ তাহাদের দেহ —মুণ্ড, বক্ষ ও উদর এই তিন ভাগে বিভক্ত। বক্ষে তিন জোড়া পদ সংবদ্ধ। ছয়টি পদ কেবল বক্ষেই সংবদ্ধ, উদর অপেক্ষাকৃত লম্বা হইলেও তাহাতে কোনও পদ সন্নিবেশিত নাই। বক্ষে ছয়টি পা ব্যতীত এই জাতীয় জীবের অনেকের দুই জোড়া পক্ষ থাকে। উপরের পক্ষ সাধারণতঃ মোটা এবং কঠিন, নিম্নের ডানা জালের মত। একটা আরশুলা ধরিয়া পরীক্ষা করিলেই একথার যাথার্থ্য বুঝিতে পারা যায়।

আমরা এ প্রবন্ধে কোন্ শ্রেণীর জীবের কথা বলিতেছি, উপরোক্ত দেহের বর্ণনা হইতে তাহা বেশ বোধগম্য হইবে। যে জীবের বক্ষে ছয়টি পদ সংযুক্ত নহে, ষট্পদ বা insect জাতির মধ্যে আমরা তাহাদের শ্রেণীবদ্ধ করিব না। মাকড়সা অষ্টপদ। সুতরাং তাহার ক্রিয়া কলাপ বিশেষত্ব আমাদের প্রবন্ধের বিষয়ীভূত নহে। বৃশ্চিক ক্রমিকীট প্রভৃতিও ষট্পদ শ্রেণীভুক্ত নহে।

* অর্চ্চনা, ১১শ সংখ্যা, পৌষ ১৩২১ সাল।

যেমন মুণ্ড, বক্ষ ও উদর এই তিন ভাগে ষট্‌পদের দেহ বিভক্ত, তেমনি আবার উহার দেহের প্রত্যেক ভাগটি ছোট ছোট গোলাকার চক্রে বিভক্ত। মুণ্ড ও বক্ষের কিম্বা বক্ষ ও উদরের পার্থক্য যেমন সহজেই দেখিতে পাওয়া যায়, প্রত্যেক অংশের চক্রাকার বিভাগগুলা তত সহজে বুঝিতে পারা যায় না। একটু বড় পতঙ্গ ধরিয়া, এমন কি বড় কাঠ পিঁপড়া লইয়া, সামান্য মনোযোগের সহিত দেখিলেই এই সকল চক্রের অস্তিত্ব বুঝিতে পারা যায়। ষট্‌পদ দেহের সমস্ত চক্রের সমষ্টি বিংশতি সংখ্যা অতিক্রম করে না।

উহাদের মুণ্ডে চক্ষু থাকে, এক জোড়া শুণ্ড থাকে এবং ষট্‌পদ ভেদে ওষ্ঠের গঠন বিভিন্ন হইয়া থাকে। এক প্রণালীতে গঠিত হইলেও বিভিন্ন ষট্‌পদ শ্রেণীর মুখের আকার বিভিন্ন। যে শ্রেণী যেরূপ পদার্থ ভোজন করিয়া জীবন ধারণ করে, সেই শ্রেণীর ষট্‌পদের মুখের আকৃতি সেইরূপ পদার্থ আহরণের উপযোগী। মশক প্রভৃতি কতক শ্রেণীর ষট্‌পদের মুখের আকার কেবল দংশনোপযোগী। কাহারও মুখের আকৃতি হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, সে কেবল কুসুমের বক্ষে মুখ দিয়া মধু পান করিতে পারে। প্রজাপতি এই শ্রেণীর জীব। তাহারা কেবল শুঁড় প্রবেশ করিয়া ফুলের মধুটুকু চুরি করিয়া লয়। কিন্তু ভৃঙ্গ আর একটু নির্দ্দয়। সে শুঁড় দিয়া ফুল কাটিতে পারে, কুসুম যেখানে মধু সঞ্চয় করিয়া রাখে দুষ্ট অলি সে ঘরে সিঁদ কাটিয়া মধু অপহরণ করে। তাই তাহার মুখ ছেদন ও অপহরণ উভয় কর্ম্মের উপযোগী। তবে ইহারা কেবল ফুলের কথা সর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়া লয় না। এক ফুলের পরাগ অপর ফুলের গর্ভে প্রবিষ্ট করিয়া উদ্ভিদ জাতির বংশ বৃদ্ধি বিষয়ে সহায়তা করে।

ষট্‌পদের বক্ষ তিন ভাগে বিভক্ত। প্রত্যেক বিভাগে এক জোড়া করিয়া পদ সন্নিবেশিত। অধিকাংশ ষট্‌পদ পক্ষযুক্ত। দ্বিতীয় ও তৃতীয় বিভাগে এক এক জোড়া করিয়া ডানা থাকে। দ্বিতীয় চক্রের পক্ষদ্বয় কঠিন ও চিত্রিত।

ইহাদিগের শোণিত বর্ণহীন ও গাঢ়। এক একটা মশক বা ছারপোকা মারিলে যে লাল রক্ত নির্গত হয় তাহা উহাদের নিজস্ব নহে, তাহা নরশোণিত। মানুষের রক্ত পান করিয়া পরিপাক করিবার পূর্ব্বে নিহত হইলে মশক প্রভৃতির দেহ হইতে লাল রক্ত নির্গত হয়।

অনেক জীবের মত ষট্‌পদের শ্বাস প্রশ্বাসের কার্য্য নাসিকার দ্বারা সাধিত হয় না। ইহাদের সমস্ত দেহে শাখা প্রশাখা যুক্ত ছোট ছোট নল আছে। ইহাদিগের ইংরাজী পরিভাষা Trachæ। এই সকল নলের দ্বারা ইহাদের শ্বাস প্রশ্বাসের কার্য্য সাধিত হইয়া থাকে। উদরের অংশ বিশেষের পরিচালনার দ্বারা ফুসফুসের কার্য্য সম্পাদিত হইয়া থাকে।

ষট্‌পদের জ্ঞানেন্দ্রিয়ের মধ্যে চক্ষু ও শুণ্ড দেখিতে পাওয়া যায়। চক্ষুর দ্বারা ইহারা দেখিতে পায় এবং শুণ্ডের দ্বারা স্পর্শ সুখ অনুভব করে। ইহাদের ওষ্ঠের নিম্নে ক্ষুদ্র জিহ্বা আছে তাহাতে স্বাদ গ্রহণ করিবার ক্ষমতা আছে। ইহারা শব্দ শুনিতে পায়, তাহা সহজ পরীক্ষার দ্বারা বুঝিতে পারা যায়। তাহারা যে আঘ্রাণ করিতে পারে তাহাও নিঃসন্দেহ। কেবল চক্ষের দ্বারা ফুলের অবয়ব দেখিয়া তাহারা বহুদূর হইতে ফুলের মধু আহরণ করিতে আসে—তাহা নহে। কুসুম সুবাস ভৃঙ্গকে আকর্ষণ করে—বহুদূর হইতে ফুলের গন্ধ আঘ্রাণ করিয়া অলিকুল কুসুমের সন্ধান পায়।

নিম্নশ্রেণীর অনেক জীবের মধ্যে স্ত্রী ও পুরুষের বিভিন্নতা নাই। ষট্‌পদদিগের মধ্যে স্ত্রী ও পুরুষের স্বাতন্ত্র্য সুস্পষ্টরূপে বিদ্যমান। স্ত্রী ও পুরুষের আকারের এবং বর্ণেরও পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়। কতকগুলি ষট্‌পদের মধ্যে ক্লীবের অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ করিতে পারা যায়। কিন্তু আধুনিক পর্য্যবেক্ষণের ফলে স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, মধুমক্ষিকা সমাজের ক্লীবেরা প্রকৃতপক্ষে অসম্পূর্ণ দেহবিশিষ্ট স্ত্রী-জাতীয় ষট্‌পদ। এইরূপ ক্লীবদিগকে সামাজিক ষট্‌পদের যৌথ বাসস্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা সমাজের হিতের জন্য প্রাণপাত পরিশ্রম করে—যৌথ বাসস্থান নির্ম্মাণ করে, সকলের জন্য খাদ্য সংগ্রহ করে, সন্তান সন্ততির লালন পালন করে এবং শত্রুর আক্রমণ

হইতে নিজ নিজ সমাজকে রক্ষা করে। মধুমক্ষিকা, উই, পিপীলিকা প্রভৃতি এই শ্রেণীর ষট্‌পদ।

কতকগুলি ষট্‌পদের মধ্যে একটা বড় বিশেষত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। অবশ্য সকল শ্রেণীর জীবই যৌবনে উপনীত হইলে দেহের অবস্থান্তর ঘটে। মানুষের মুখে গুম্ফ, শ্মশ্রুর উদ্গম হয়, ময়ূরের পুচ্ছ জন্মে, গরু ছাগল হরিণ প্রভৃতির মস্তকে শৃঙ্গের উদ্গম হয়। কিন্তু তাহা হইলেও নরশিশুর ও পূর্ণাবয়ব নরের মধ্যে এমন কোনও বিশেষ পার্থক্য নাই যাহাতে নরশিশুকে নর ব্যতীত অপর জীব বলিয়া মনে হয়। সকল জীবই শৈশবে অপূর্ণাবয়ব থাকে, যৌবনে পূর্ণাবয়ব প্রাপ্ত হয়। কিন্তু কতক শ্রেণীর জীবের এমন বিশেষত্ব আছে যে, শৈশবে তাহাদিগকে একেবারে অপর শ্রেণীর জীব বলিয়া মনে হয়। ভেক শিশুকে প্রথমাবস্থায় মৎস্য বলিয়া ভ্রম জন্মে। কিন্তু ক্রমশঃ তাহার শরীরের কতক অংশ পরিবর্ত্তিত হইয়া ভেক শিশু পূর্ণাবয়ব মণ্ডুকে পরিণত হয়। ইহাদের পরিবর্ত্তনে নূতনত্ব আছে। গুম্ফ শ্মশ্রু বর্জ্জিত নরশিশুর গুম্ফশ্মশ্রুশোভিত নরে পরিণতির সহিত, বয়সাধিক্যে ভেকের অবস্থান্তরের তুলনা হয় না। এইরূপ পরিণতির সহিত একেবারে নূতন রকমের কলেবর লাভ অনেক ষট্‌পদের ভাগ্যে ঘটিয়া থাকে। রেশম কীটের দেহ পরিবর্ত্তিত হইয়া যখন প্রজাপতির দেহে পরিবর্ত্তিত হয় তখন রেশম কীট ও প্রজাপতি যে এক শ্রেণীর জীব তাহা মোটেই সম্ভবপর বলিয়া মনে হয় না। অনেক ষট্‌পদ কিন্তু এইরূপ পরিবর্ত্তনশীল। বর্ষাকালের ঘৃণিত কণ্টকাবৃতদেহ শুঁয়া পোকা এক রকম প্রজাপতিতে পরিণত হয়। আমড়া গাছে হরিদ্রা বর্ণের এক প্রকার পোকা জন্মিয়া থাকে। সেগুলার দেহ বড় নরম, বুকে ষট্‌পদ ব্যতীত অনেক পদ, বুকে হাঁটিয়া আমড়ার পাতা ভক্ষণ করিয়া থাকে। কিছু-দিন পরে তাহারা সুন্দর পতঙ্গে পরিণত হয়—বেশ মসৃণ দেহ, শক্ত ডানা—কেমন সুন্দর বর্ণ। তাহার আকার দেখিয়া, দেহের লাবণ্য দেখিয়া, বর্ণ বিন্যাস দেখিয়া মনে হয় না যে, এই উড্ডয়নক্ষম সুন্দর পতঙ্গ শৈশবে বুকে হাঁটিয়া বেড়াইত।

ষট্‌পদদিগের এইরূপ পরিবর্ত্তনশীলতা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া জীবতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ ইহাদিগকে তিনটী প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। এক একটী শ্রেণী আবার নানা শাখা প্রশাখায় বিভক্ত। আমরা এই তিন শ্রেণীর সামান্য পরিচয় দিব।

প্রথম শ্রেণীর ষট্‌পদদিগকে অপরিবর্ত্তনশীল বা Ametabolic বলা হইয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে শিশু ও পূর্ণাবয়বের আকৃতির কোনও পার্থক্য নাই। অপরাপর ষট্‌পদ বৃদ্ধ বয়সে যেমন পক্ষযুক্ত হয় ইহাদের আর তেমন পক্ষ জন্মে না। ডিম ফুটিলেই শাবক পিতার মত দেখিতে হয়—অবশ্য আকারে শিশু পিতার মত বড় হয় না। বয়সের সহিত তাহাদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় মাত্র, কিন্তু তাহাদের দেহের কোনও পরিবর্ত্তন ঘটে না।

এই শ্রেণীর ষট্‌পদদিগকে মুখের গঠন ভেদে নানা প্রকার শাখাতে ষট্‌পদ-তত্ত্ববিদগণ বিভক্ত করিয়া থাকেন। অবশ্য সাধারণ পাঠকের পক্ষে সে সকল শ্রেণী বিভাগ তেমন চিত্তাকর্ষক হইতে পারে না।

ষট্‌পদদিগের দ্বিতীয় শ্রেণী "আংশিক পরিবর্ত্তনশীল" বা Hemimetabolic। ষট্‌পদদিগের এই পরিবর্ত্তন বুঝিবার জন্য আমরা তাহাদের জীবনের বিভিন্ন অধ্যায়গুলা বুঝিতে চেষ্টা করিব। অবশ্য প্রথমতঃ ইহারা ডিম হইতে নির্গত হইয়া এক অবস্থা প্রাপ্ত হয়। সেই অবস্থার ষট্‌পদদিগকে লার্ভা (Larva) বলে। আমি এ শব্দের বাঙ্গালা পরিভাষা দিয়া বিষয়টাকে জটিল করিতে চাহি না। এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য পাঠকদিগের মনে কৌতূহল উদ্দীপিত করিয়া তাহাদিগকে এ বিষয়ে অধ্যয়ন করিতে উৎসাহদান করা। এ বিষয় অধ্যয়ন করিতে গেলে ইংরাজি গ্রন্থের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। সুতরাং আমি ইংরাজি পরিভাষার পরিবর্ত্তে একটা বাঙ্গালা পরিভাষার সৃষ্টি করিতে চাহি না। তাই এ প্রবন্ধে আংশিক ও সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তনশীল ষট্‌পদের শৈশব কালকে লার্ভা বলিয়া বর্ণনা করিব। লার্ভার অবস্থা উত্তীর্ণ হইয়া ষট্‌পদ কীট পতঙ্গ দ্বিতীয় অবস্থায় পরিণত হইলে তাহাদিগকে পিউপা (Pupa) বলা হইয়া থাকে। জীবনের এই দ্বিতীয় অধ্যায় পার হইয়া ইহারা পূর্ণাবয়ব প্রাপ্ত হয়। তখন ইহাদিগকে ইমাগো (Imago) বলা

হয়। পিতার মূর্ত্তি প্রাপ্ত হয় বলিয়া ইহাদিগকে মূর্ত্তিমান বা Imago বলা হইয়া থাকে।

অপরিবর্ত্তনশীল ষট্‌পদদিগের লার্ভা, পিউপা ও ইমাগোর চেহারা এক প্রকারের। আংশিক পরিবর্ত্তনশীল ষট্‌পদদিগের মধ্যে লার্ভা, পিউপা ও ইমাগোর অবয়বের যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। তবে সাধারণতঃ ইমাগোর পক্ষ থাকে, লার্ভার থাকে না। লার্ভা খুব কার্য্যতৎপর, খুব ভোজন করিতে ভালবাসে। লার্ভা পিউপায় পরিণত হইলে একটু বড় হয় এবং পক্ষের স্থলে অর্থাৎ বক্ষের দ্বিতীয় ও তৃতীয় চক্রাকার অংশে পক্ষের সামান্য আভাস পাওয়া যায়। জীবনের দ্বিতীয় অধ্যায়ে এই শ্রেণীর ষট্‌পদ খুব ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়ায়, ভোজন করিয়া দেহ সবল করে। তাহার পর ইহারা পূর্ণাবয়ব প্রাপ্ত হয়। তখন, ইহাদের পক্ষ উদ্গত হয় এবং জননেন্দ্রিয় সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। এই অবস্থায় ইহারা ডিম্বোৎপাদন করে, লার্ভা বা পিউপার সন্তানোৎপাদিকা শক্তি নাই।

এই শ্রেণীর, এক প্রকার ষট্‌পদ লার্ভা ও পিউপা অবস্থায় জলচর, তাহার পর ইমাগো অবস্থা প্রাপ্ত হইলে তাহারা ভূচর ও খেচর অবস্থায় জীবন ধারণ করে। কিন্তু ইহাদিগের অবয়ব তিন অবস্থায় প্রায় একই আকারের। কেবল লার্ভা পক্ষবিহীন, ইমাগো পক্ষযুক্ত। দুই এক প্রকার মক্ষিকা এই শ্রেণীর জীব।

আংশিক পরিবর্ত্তনশীল জীবের মধ্যে উই, আরশুলা, প্রভৃতি নানা প্রকার জীব আমাদের নিত্য সহচর। মুখের আকার ভেদে আংশিক পরিবর্ত্তনশীল ষট্‌পদদিগকেও জীবতত্ত্ববিদ পণ্ডিতেরা নানা ভাগে বিভক্ত করিয়া থাকেন।

তৃতীয় শ্রেণীর ষট্‌পদ সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তনশীল বা Holometabolic। আমাদিগের পরিচিত প্রজাপতি, ঝিঁঝিপোকা, মৌমাছি, বোলতা, ভীমরুল প্রভৃতি এই শ্রেণীর ষট্‌পদ। এই শ্রেণীর ইন্‌সেক্টের জীবনের ইতিহাস বড় বৈচিত্র্যময়। ইহাদিগের ডিম হইতে শেষ পরিণতি অবধি জগদীশ্বরের বিচিত্র সৃষ্টিকৌশল ঘোষণা করে। ইহাদিগের লার্ভার অবয়বের সহিত ইমাগোর অবয়বের কোনও সাদৃশ্য নাই।

এই শ্রেণীর ষট্‌পদ লার্ভা অবস্থায় কৃমিকীটের মত বুকে হাঁটিয়া চলে এবং ষট্‌পদের বিশেষত্ব ছয়টি পদ ব্যতীত এ অবস্থায় ইহাদের বুকে অনেকগুলি পদ থাকে। আবার এই শ্রেণীর কতক প্রকার ষট্‌পদের আদৌ চরণ থাকে না। লার্ভার মুখের খুব জোর থাকে আর এ অবস্থায় তাহারা পেটুকের মত খুব বেশী আহার করে। যাঁহারা রেশম কীট বা পলু পোকার চাষ দেখিয়াছেন, তাঁহারা এ কথার যাথার্থ্য অনুভব করিবেন। ইহারা গোগ্রাসে মাল্‌বেরী বা তুঁতপাতা ভক্ষণ করে। এই অবস্থায় লার্ভা যেমন ভোজন করে তেমনি বর্দ্ধিত হয়। অনেকবার খোলস ছাড়িয়া দেহকে সবল ও যথাসম্ভব বর্দ্ধিত করিয়া লার্ভা পিউপায় পরিবর্ত্তিত হয়। তখন ইহা একেবারে নিষ্কর্ম্ম হইয়া পড়ে। কতক শ্রেণীর ষট্‌পদ এই অবস্থায় আপনাদের শরীরের চারিদিকে মুখের লালা দ্বারা কোয়া নির্ম্মাণ করিয়া তাহার ভিতর নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকে। রেশম কীট, তসর কীট প্রভৃতি এই শ্রেণীর জীব। কতক শ্রেণীর পিউপা অপর পদার্থ আশ্রয় করিয়া নিস্তেজ হইয়া পড়িয়া থাকে। কিন্তু এই সময় তাহাদের অবস্থান্তর হইতে থাকে। রেশম কীট প্রভৃতি রেশমের কোয়ার ভিতর থাকিয়া প্রজাপতিতে পরিণত হয়। এই অবস্থায় ইহাদের শরীরের নানা অংশের পরিবর্ত্তন ও পরিবর্জ্জনের দ্বারা ইহারা এক প্রকার নূতন জীবে পরিণত হয়। সেই নূতন জীবই পূর্ণাবয়ব ষট্‌পদ ইমাগো।

ইমাগো বা পূর্ণাবয়ব ষট্‌পদ সন্তানোৎপাদিকা শক্তি লাভ করে। ইহারা সন্তান উৎপাদন করিয়াই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়। মনে হয় তাঁহার সৃষ্টি বজায় রাখিবার জন্যই জগদীশ্বর এত আয়োজন করিয়া ইহাদের দেহের পূর্ণতা সম্পাদন করেন। এইজন্য পিপীলিকার পক্ষ উদ্গত হয় এবং পক্ষোদ্গম পিপীলিকার মরণ সূচনা করে।

পরিবর্ত্তনশীল ষট্‌পদদিগের মধ্যে সকলেরই পক্ষ বেশ স্পষ্টভাবে উদ্গত হয় না। পিশু (flea) দিগের পক্ষতলে পক্ষের অঙ্কুর মাত্র দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা প্রায় দ্বাদশ দিন ধরিয়া গুটিপোকার মত কোয়া বুনিয়া প্রায় দুই সপ্তাহ পরে ইমাগো অবস্থায় নির্গত হয়। কতক প্রকারের

পরিবর্ত্তনশীল ষট্পদের পিউপা নিস্তেজ অবস্থায় না থাকিয়া জলচর অবস্থায় থাকে এবং ঘুরিয়া বেড়ায়। মশক এই শ্রেণীর জীব।

আমরা চলিত কথায় যাহাদের প্রজাপতি বলি, ইংরাজিতে তাহাদের মধ্যে দুইটি বিভাগ আছে—moths এবং butterflies। অবশ্য সে পার্থক্য এস্থলে আলোচনা করিবার আবশ্যক নাই।

পরিবর্ত্তনশীল ষট্পদের মধ্যে মৌমাছি, পিপীলিকা প্রভৃতি সমাজ গঠন করিয়া যৌথ ভাবে বসবাস করে। আমরা পূর্ব্ব প্রবন্ধে * ঐ সকল যৌথ সমিতির বর্ণনা দিয়াছি—মৌমাছি কি প্রকারে বাসা নির্ম্মাণ করে তাহাও চিত্র দ্বারা বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি, সুতরাং এস্থলে সে কথার পুনরাবৃত্তি করিলাম না।

অনেক শ্রেণীর ষট্পদের মধ্যে আবার পুরুষের পক্ষ থাকে, স্ত্রীলোকের পক্ষ থাকে না।

পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণ ষট্পদ জগতকে অবশ্য প্রধানতঃ তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। কিন্তু এই তিন ভাগ আবার এত শ্রেণীতে বিভক্ত যে তাহার ইয়ত্তা করা কঠিন। ফলতঃ ষট্পদ জাতি যত অধিক শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে এত অধিক শ্রেণীতে অপর কোনও জাতীয় জীব বিভক্ত হয় নাই। এক ঝিঁঝিঁ পোকা (beetles) জাতীয় ষট্পদ ৮০,০০০ রকমের দেখিতে পাওয়া যায়। পণ্ডিতেরা অদ্যাবধি দুই লক্ষ প্রকারের ষট্পদ আবিষ্কার করিয়াছেন এবং তাঁহারা আশা করেন যে, অধ্যবসায়ের ফলে অন্ততঃ দশ লক্ষ রকমের ষট্পদ আবিষ্কৃত হইবার সম্ভাবনা আছে।

ষট্পদদিগের মধ্যে বোধ হয় পিপীলিকা ও মধুমক্ষিকা সর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘজীবী। ইহাদিগের সমাজের কর্ত্রী বা রাণীদিগকে সাত বৎসর অবধি জীবন ধারণ করিতে দেখা গিয়াছে। আবার অনেক রকম ষট্পদ চব্বিশ ঘণ্টা মাত্র জীবন ধারণ করে। কোন কোন ষট্পদ তিন বৎসরে পূর্ণাবয়ব প্রাপ্ত হয়, কিন্তু পূর্ণাবয়ব প্রাপ্ত হইয়া সামান্য কয়েক দিন মাত্র জীবন ধারণ করে। আমাদের গৃহের ভ্যান্‌ভেনে মাছিগুলা গ্রীষ্মকালে শীঘ্র বাড়িয়া উঠে। শীতের প্রকোপে উহারা অত শীঘ্র বাড়িতে পারে না।

জগতে দুই লক্ষ রকমের ষট্পদ থাকিলেও কেবল দুই চারি রকম ষট্পদের দ্বারা আমাদের উপকার সাধন হয়। মৌমাছির অধ্যবসায় ও পরিশ্রমের ফলে আমরা মধুপান করিতে পারি, মোমের বাতী নির্ম্মাণ করিয়া দেবপূজা করিতে পারি। রেশম কীট, তসর কীটের অনুগ্রহে আমরা রেশম ব্যবহার করিতে পারি, এবং কয়েক প্রকার কীটের দ্বারা লাক্ষা প্রস্তুত হয়। পূর্ব্বে এক প্রকার কীটের দেহ হইতে লিখিবার কালি নির্ম্মিত হইত, এখন কিন্তু আর জান্তব কালির দ্বারা লোকে বাণীর আরাধনা করে না।

সর্ব্বভুক নর দুই চারি প্রকারের ষট্পদ ভোজন করিয়া থাকে। অনেক দেশের লোক পঙ্গপাল আহার করে। জনরব আছে যে, চীনবাসীগণের নিকট আরশুলা বড় উপাদেয়, কিন্তু আমি অনেক চৈনিক বন্ধুকে এ বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়াছি যে কথাটা অলীক। অষ্ট্রেলিয়া আফ্রিকা প্রভৃতি দেশের অসভ্য অধিবাসিগণের মধ্যে কেহ কেহ পোকার ডিম খাইয়া থাকে।

অনেক ষট্পদের মুখে বিষ থাকে, তাহাদের দংশনে শরীরে ব্যাধি জন্মে। অনেক ষট্পদ আবার আমাদের কৃষিক্ষেত্রে ফসল নষ্ট করিতে প্রভূত অধ্যবসায় দেখাইয়া থাকে। তবে মোটের উপর ষট্পদের নিকট উদ্ভিদ-জগৎ ঋণী। কারণ অনেকস্থলে তাহারা এক ফুলের পরাগ অপর ফুলে লইয়া না গেলে বীজ জন্মিত না।

জোনাকি পোকার দল ষট্পদ শ্রেণীভুক্ত। ইহাদের আবার নানা প্রকার শ্রেণী আছে। বাঙ্গালার খদ্যোৎ উড়িয়া বেড়ায়। সিমলা পাহাড়ে এক প্রকার জোনাকী দেখিয়াছি তাহারা পক্ষহীন। একজন আমেরিকান পরিব্রাজক বলেন, দক্ষিণ আমেরিকায় এক প্রকার জোনাকি পোকা আছে তাহাদের দেহের উভয় দিকে আলোক দৃষ্ট হয়। তাহারা চলিলে রেলের ইঞ্জিনের মত দেখিতে হয়।

বলা বাহুল্য, ষট্পদ সকল দেশে সকল সময়ে পাওয়া

* অর্চ্চনা, ১১শ বর্ষ, ২১৭ পৃষ্ঠা।

যায়। তবে উষ্ণ দেশেই তাহাদের বাহুল্য। ইহাদের মধ্যে আবার কতকগুলি জলচর কতক জাতীয় ষট্‌পদ পুরজীবী এবং তাহারা জীবজন্তুর শরীরে অবস্থান করিয়া থাকে। রুচিভেদে ইহারা নানা প্রকার পদার্থ ভোজন করিয়া থাকে। তাই সংস্কৃতে কবি বলিয়াছেন—

"মক্ষিকাঃ ব্রণমিচ্ছন্তি মধুমিচ্ছন্তি ভ্রমরাঃ।"

কিছু নয়।

[শ্রীসুহাসিনী ঘোষ]

আঁধারে বিজলী ছটা
বিষাদে সুখের স্মৃতি,
নীরব বিজন বনে
তটিনীর কল-গীতি।
চাঁদের ললিত ছটা,
উষার মধুর হাসি,
সাঁঝের ধূসর ছায়া
কেন এত ভালবাসি।
কিছু নয় যদি তবে
এ সবেতে কেন প্রাণ,
লুটায়ে পড়িতে চায়
বোঝেনাকো কি এ টান।

রবির লালিমা আভা
দখিন মলয় বায়,
পাখীরা ঝঙ্কার তুলি'
কেন নব গান গায়।
দয়া মায়া প্রীতিধারা
সত্য কিছু নহে যদি,
কেন তবে হৃদয়েতে
আসে প্রেম নিরবধি।
যে বলে বলুক ওগো
এই সব কিছু নয়,
তুমি অণু পরমাণু
জানি আমি প্রেমময়।

গ্রন্থ-সমালোচনা।

ভোলানাথের ভুল।—কলিকাতার সরকারী উকীল রায় তারকনাথ সাধু বাহাদুর প্রণীত উপন্যাস। সাধু মহাশয় প্রথম যৌবনে বাণী-মন্দিরে দুই একটি পুষ্পাঞ্জলি দিয়াই কমলা-আরাধনায় ব্রতী হইয়াছিলেন। ইনি ইন্দিরা সেবায় কঠোর সাধনায় আত্ম-নিয়োগ করিয়া রত্ন-সম্পদের সঙ্গে সঙ্গে মনুষ্য-চরিত্র সম্বন্ধে প্রভূত জ্ঞান অর্জ্জন করিয়াছেন। লেখক সেই মনুষ্য-চরিত্রের নানা ভঙ্গী ফুটাইয়া তুলিয়াছেন এই নব-প্রকাশিত পুস্তকে। এক পুস্তকে এতগুলি অসচ্চরিত্র, কুনীতিপরায়ণ কুট-বুদ্ধি, ভণ্ডের সমাবেশ অপর কোনও বাঙ্গালা গ্রন্থে পড়িয়াছি বলিয়া মনে হয় না। সাধু মহাশয়ের সৃষ্ট চরিত্রগুলি অস্বাভাবিক নহে। সমাজে অহরহঃ যাহারা মুখোস পরিয়া সুখে স্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করিতেছে, সাধু মহাশয় তাহাদের মুখোস টানিয়া, মুখের রঙ্‌ পাউডার মুছিয়া দিয়া তাহাদের প্রকৃত সত্তাটাকে লোকচক্ষুর গোচরীভূত করিয়া দিয়াছেন। তাই সমস্ত পুস্তকখানা একটানে নিঃশেষ করিয়া পাঠকের মনে হয়—"তাই ত এ যে পরিচিত লোকের সমাবেশ—অথচ এগুলাকে আগে তো ঠিক্ চিনি নাই।" যেটা মনুষ্য-চরিত্রের বিকৃতি, সেটা মনুষ্য-প্রকৃতি বলিয়াই যেন এ পুস্তকে আঁকা হইয়াছে। গ্রন্থের দোষ

গুণ এইখানে। লোভ, হিংসা, ভণ্ডামি প্রভৃতি মানব-চরিত্রের বিকৃতিগুলাকে এমন জাজ্জ্বল্যভাবে অঙ্কিত করা হইয়াছে যে, মনে হয় গ্রন্থকার সেইগুলাকে মানব-প্রকৃতি বলিয়াই নির্দ্দেশ করিতেছেন। পুস্তকের গুণও ঐখানে—চোখে আঙ্গুল দিয়া লেখক পাঠককে বুঝাইয়াছেন যে, বিকসিত স্নেহ মমতা ভক্তি শ্রদ্ধা পরোপকার ধর্ম্মপ্রাণতাকে চাঁচিলে কঙ্কালে দেখিবে মানবের প্রকৃতিতে লোভ, হিংসা, স্বার্থ, দারুণ ভোগ-লিপ্সা। লেখক আঁকিয়াছেন সে বৃত্তিটাকে প্রকৃতি বলিয়া, কিন্তু নিজের তরফ হইতে সাফাই গাহিয়াছেন যে, এ প্রকৃতির কারণ ধর্ম্ম-মূলক শিক্ষার অভাব। অর্থকরী বিদ্যা ধর্ম্মকে দূরে রাখিয়া মানুষকে দখল করিয়া বসিলে মানুষ এমনই দানব হয়। শিক্ষা অন্তর্নিহিত ক্রূর ও পশু-প্রকৃতিকে মাজে ঘসে পালিস করে। শিক্ষার অভাবে যখন মানুষ দানব হয়, তখন আর না বলিবার উপায় নাই, যে প্রকৃতিতে মানব দানব, শিক্ষায় সে দেবতা হইতে পারে, ইহাই লেখকের ফিলজফি। সুতরাং লেখকের হেতু-নির্দ্দেশ গ্রহণ করিলেও না বলিবার উপায় নাই যে, তাঁহার মতে মানব-প্রকৃতিই মন্দ। এ গ্রন্থ-গত শিক্ষার বিশিষ্টতা এইখানে। তবে কত লোক এ ফিলজফি গ্রহণ করিবেন, তাহা নির্ণয় করা কঠিন।

দীর্ঘ পঞ্চবিংশতি বর্ষ ফৌজদারী আদালতে ঘুরিয়া, সেখানে শীর্ষস্থান লাভ করিতে গিয়া লেখক যে বহুদর্শিতা লাভ করিয়াছেন, তাহার ফল এই গ্রন্থে দেদীপ্যমান। এমন তুলিকায় লেখক চিত্র আঁকিয়াছেন যে, তাহাতে ঘাঘাতের চিত্র প্রকটভাবে নাই, অথচ প্রতি ছত্রে ছত্রে ঘাঘাতের অরুন্তুদ বেদনার গুমরাণী অনুভূত। ভাষা দিয়া লেখক ভেলকীবাজীর চেষ্টা করেন নাই। নিষ্ফল দ্যোতনা-ব্যঞ্জনার উল্লম্ফন নাই, ভাবে ভাষায় বক্সিং লড়াই নাই। ভাষা ভাবকে বহিবার অধিকারী মাত্র এবং এই গুরুভার সাধিয়াই তারকনাথ বাবুর ভাষা খালাস।

ষ্টেসনে অবস্থিত রেলের ইঞ্জিন যেমন গুমরাইয়া ফোঁস ফোঁস করে, আধুনিক বাঙ্গালা উপন্যাসের নায়ক-নায়িকার সেই ফোঁস-ফোঁসানির জ্বালায় অধিকাংশ নবীন লেখকের নভেল অপাঠ্য। একটা ধারণা প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে যে, প্রেম না হইলে নাটক নভেল কবিতা অসিদ্ধ। সাধু মহাশয় সে ধারণার শিরে লগুড়াঘাত করিয়া বুঝাইয়াছেন যে, অ-প্রেমেও খুব সুখপাঠ্য ও উপভোগ্য নভেল প্রণয়ন করা সম্ভব। এ গ্রন্থের পাত্র পাত্রীদের শ্রুতি-মধুর নাম নাই—নামের ঘটা উৎকট। এই উৎকট নামকরণেও লেখক বিশিষ্টতা রক্ষা করিয়াছেন। কানা ছেলেকে পদ্ম-লোচন বলেন নাই, ছাতারে পাখির চন্দনা নাম-করণ করেন নাই।

আমাদের যথেষ্ট আশা আছে যে, তারকনাথ বাবুর এই অভিনব গ্রন্থ বাঙ্গালী পাঠকের নিকট সমাদৃত হইবে, এবং ইহার জলন্ত চিত্রে সমাজের চোখ ফুটিবে। তাঁহার দ্বিতীয় উপন্যাস পাঠ করিবার জন্য আমরা উদ্গ্রীব রহিলাম।

অঙ্কবোধ বর্ণপরিচয়, প্রথম ভাগ। শ্রীযোগেন্দ্রনাথ রায় প্রণীত, মূল্য ।৵০ আনা। মানুষের নামাক্ষর হইতে তাহার স্বভাব ও ভাগ্য প্রভৃতি কিরূপে নির্ণয় করা যায়, তাহা গ্রন্থকার নয়টি সংখ্যা দ্বারা বুঝাইয়া দিয়াছেন। জ্যোতিষশাস্ত্রে প্রবেশ লাভ করিবার ইহা নূতন উপায়। শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, মহাত্মা গান্ধী প্রভৃতির নামাক্ষর হইতে উদাহরণ সংগৃহীত করিয়া গ্রন্থকার পাঠকের কৌতূহল বৃদ্ধি করিয়াছেন। জ্যোতিষের অনুশীলনে যোগেন্দ্রবাবু যে মৌলিকতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা প্রশংসনীয়।

২০শ ভাগ] { জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩০। { [৪র্থ সংখ্যা

মুকুন্দরামের চণ্ডীকাব্যে কৃত্তিবাসের ছায়া।

[শ্রীপ্রিয়লাল দাস, এম-এ, বি-এল]

(৩)

যুদ্ধ-বিগ্রহের কোলাহলে পূর্ণ কলিঙ্গ গুজরাট ও সিংহল হইতে ফিরিয়া আসিয়া আমরা যদি থাস বাঙ্গালার জল বায়ুর মধ্যে মুকুন্দরামের সহিত বিচরণ করি তাহা হইলেও আমরা বুঝিতে পারিব যে, ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে বাঙ্গালীর সামাজিক অবস্থার ইতিহাস মুকুন্দরাম চণ্ডীকাব্যে কি ভাবে লিখিয়াছেন আর ভাষা-রামায়ণের কতটা প্রভাব কবির লেখনী-মুখে প্রকাশ পাইয়াছে। সপত্নী লহনার নির্য্যাতনে খুল্লনার যখন কষ্টের অবধি নাই, সেই সময়ে একদিন দেবকন্যাগণ মর্ত্ত্যে আগমন করিয়া অভাগিনী খুল্লনাকে বলিলেন যে, তাঁহারা পৃথিবীতে চণ্ডীর পূজা করিতে আসিয়াছেন।

"পূজার উচিত স্থান এ ভারত ভূমি।
বিপদ হইবে দূর ব্রত কর তুমি॥"

তাহার পর স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালে যেখানে যিনি চণ্ডীর পূজা করিয়া সৌভাগ্য ফিরিয়া পাইয়াছেন, তাঁহাদের কথা দেবকন্যাগণ খুল্লনাকে শুনাইলেন।

"রাবণ বধের হেতু মিলিয়া দেবতা।
দেবীর বোধন কৈল অকালে বিধাতা॥
ষোড়শোপচারেতে পূজিল রঘুনাথ।
তবে সে রাবণ হৈল সমরে নিপাত॥"

খুল্লনার স্বামী ধনপতি সদাগর শিবোপাসক ছিলেন। চণ্ডীপূজা সম্বন্ধে খুল্লনা ধনপতিকে সিংহলযাত্রায় পূর্ব্বাহ্ণে বলিয়াছিলেন,—

"শ্রীরাম রাবণে রণ, ভয় করে দেবগণ,
বিধি কৈল অকালে বোধন।
চণ্ডী পূজে যেই কাম, রাবণ বধিলা রাম,
করিল সীতার উদ্ধারণ॥"

সিংহলে শালিবাহন রাজার কারাগারে বন্দী ধনপতির পুত্র শ্রীপতি কোটালকে বলিয়াছিলেন,—

"কাটিহ আমারে একদণ্ড বিলম্বনে।
তোমার প্রসাদে করি মন্ত্র স্মরণে॥
কোটাল সাধুর বোলে দিল অনুমতি।
হৃদয়ে ভাবিয়া সাধু পূজেন পার্ব্বতী॥"

সেই ভীষণ কারাগারে পার্ব্বতীকে মনে মনে পূজা করা ছাড়া শ্রীপতির অন্য উপায় ছিল না। সেইজন্য তিনি দেবীকে মনে মনে কহিলেন,—

"ফল জল ফুলে রাম পূজিল কাননে।
তার পূজা নিলে মাতা রাবণ মরণে॥"

শ্রীপতি পিতার সহিত স্বদেশে ফিরিয়া আসিবার পর উজানির রাজার মুখে তাঁহার মৃত্যু-দণ্ডের আদেশ শুনিয়া দেবীর স্তব করিয়াছিলেন।

"রাবণের বধ হেতু মিলিয়া দেবতা।
তোমায় বোধন কৈল অকালে বিধাতা॥
ষোড়শোপচারেতে পূজিল রঘুনাথ।
তবে ত রাবণ হৈল সমরে নিপাত॥"

বলা বাহুল্য, বাল্মীকির রামায়ণে রাবণ বধের জন্য রাম কর্ত্তৃক চণ্ডী পূজার কোনও উল্লেখ নাই। বাল্মীকির রামচন্দ্র অগস্ত মুনির উপদেশানুসারে রাবণ বধের জন্য আদিত্যের স্তব করিয়াছিলেন। কৃত্তিবাসের ভাষা-রামায়ণে রাবণ বধের জন্য রামচন্দ্র কর্ত্তৃক চণ্ডী পূজার বিবরণে বাঙ্গালী কবির সৃষ্টি-ক্ষমতা প্রকাশ পাইতেছে। কৃত্তিবাস বুঝিয়াছিলেন যে, বিধর্ম্মী যবন রাজার অত্যাচার হইতে বাঙ্গালী প্রজাকে রক্ষা করিতে হইলে বঙ্গদেশে শক্তিপূজার নিতান্ত আবশ্যক। মুকুন্দরামও কৃত্তিবাসকে অনুসরণ করিয়া চণ্ডীকাব্যে শক্তিপূজার প্রাধান্য দেখাইয়াছেন। আমাদের মনে হয় যে, মুকুন্দ কবি কৃত্তিবাসের রামায়ণ পাঠ করিয়া বঙ্গদেশে শক্তিপূজার উপকারিতা সম্বন্ধে তাঁহার নিজের ধর্ম্মমতকে দৃঢ়তর করিয়াছিলেন।

মুকুন্দরামের সমসাময়িক বাঙ্গালার ইতিহাস পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, বাঙ্গালী বহু শতাব্দী পরে সেই স্বাধীনতার যুগে অত্যাচারী মুসলমানের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছিল। দেশের পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রভাব যদি কবির কাব্যে প্রকাশ পায় তাহা হইলে মুকুন্দ কবি যে সমসাময়িক বাঙ্গালী সমাজের চিত্র তাঁহার রচিত কাব্যে চণ্ডীপূজার ভিতর দিয়া দেখাইয়াছেন তদ্বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোনও কারণ থাকে না। প্রতাপাদিত্য প্রমুখ বাঙ্গালী বীরেরা যে শক্তিপূজার প্রাধান্য কবির সমকালে বিস্তার করিবার জন্য সচেষ্ট ছিলেন তাহা ইতিহাস পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন। প্রতাপাদিত্য যশোরেশ্বরীর পূজা করিয়া যুদ্ধযাত্রা করিতেন। মুকুন্দরাম কৃত্তিবাসি রামায়ণে বর্ণিত রাবণ বধের জন্য ব্রহ্মা ও দেবগণ কর্ত্তৃক দেবীর অকালে বোধন, ব্রহ্মার উপদেশে শ্রীরামচন্দ্রের অকালে ষোড়শোপচারে চণ্ডীপূজা ও নবমীতে ফল জল পুষ্পে দেবীর সাত্ত্বিকী ভাবেতে পূজার চিত্রগুলি চণ্ডীকাব্যে বারংবার দেখাইয়াছেন। কালাকাল বিচার না করিয়া এই যে দেবীর পূজা বিপন্ন বাঙ্গালীর জাতীয় হৃদয়ের কতটা গূঢ় ধর্ম্মভাব ব্যক্ত করিতেছে! ষোড়শোপচারে দেবীর পূজা, ফল জল পুষ্পে দেবীর পূজা, অন্তরের অন্তরতম স্থানে দেবীর মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া হৃদয়ের দ্বারা দেবীর পূজা ধর্ম্ম-প্রাণ বাঙ্গালী কবির হৃদয়ের কতটা গভীরতার পরিচয় দিতেছে! আমরা অন্ধ, তাই কৃত্তিবাস ও মুকুন্দরামকে চিনিতে পারিলাম না। কৃত্তিবাস কর্ম্মাবতার রামচন্দ্রের দ্বারা চণ্ডীপূজার ব্যবস্থা করিয়া বাঙ্গালীকে প্রবল শত্রুর হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিবার উপায় নির্দ্দেশ করিয়া দিয়া-ছিলেন। কৃত্তিবাসের যুগে বাঙ্গালা চণ্ডীপূজার পক্ষপাতী হইল না। কৃত্তিবাসের পরবর্ত্তী যুগে বৈষ্ণব ধর্ম্ম জন্ম লাভ করাতে শক্তিপূজার উপকারিতা বাঙ্গালা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে নাই। ভাবের জগতে কর্ম্মের স্থান নাই; মুকুন্দ-রামের যুগে কর্ম্মময়তা যখন বঙ্গদেশে জাগিয়া উঠিল, বাঙ্গালী তখন শক্তিপূজার পক্ষপাতী হইল। মুকুন্দরাম কৃত্তিবাসের ভাষা-রামায়ণ হইতে চণ্ডীপূজার চিত্রখানি বাছিয়া লইয়া তাঁহার কাব্যের উপাখ্যানের ভিতর দিয়া এমন দক্ষতার সহিত শ্রোতা ও পাঠকের মানস-চক্ষুর সম্মুখে ধরিয়াছেন যে, আমরা তাঁহার রচিত সুবৃহৎ চণ্ডীকাব্যে কৃত্তিবাসের ছায়া মাত্র দেখিতে পাই। মাধবাচার্য্যের চণ্ডীকাব্যে শ্রীরাম-চন্দ্র কর্ত্তৃক চণ্ডীপূজার কোনও উল্লেখ নাই। মাধবাচার্য্যের শ্রীমন্ত সিংহলের কারাগারে চৌতিশা রচনা করিয়া চণ্ডীর স্তব করিয়াছিলেন। ইহার পূর্ব্বে তিনি কোটালের অনুমতি লইয়া নদীতে তর্পণ করিয়া আসিয়াছিলেন। মুকুন্দরামের নায়ক এই প্রকার অস্বাভাবিক কার্য্য করিতে জানেন না। মাধব কবির সময়ে বোধ হয় বাঙ্গালী পাঠক কৃত্তিবাসি রামায়ণের কথা আগ্রহের সহিত শুনিতেন না। বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রদীপ তখনও নির্ব্বাণোন্মুখ হয় নাই। মুকুন্দরামের নায়ক নায়িকারা ভাষা-রামায়ণ উত্তমরূপ অভ্যাস করিয়া-

ছিলেন। মুকুন্দরামের যুগে বাঙ্গালী স্বাধীন বাঙ্গালায় স্বরাজ্য স্থাপন করিয়াছিল। কর্ম্মাবতার রামচন্দ্রকে তখন সে আদর্শরূপে গ্রহণ করিয়াছে।

মুকুন্দরাম ধনপতির উপাখ্যানে বাঙ্গালী বণিকের সমুদ্রযাত্রার বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া সমসাময়িক বঙ্গীয় সমাজের আর এক দিকের যে চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহারও স্থানে স্থানে কৃত্তিবাসের গুণপণার আভাস পাওয়া যায়। ধনপতি ও তৎপুত্র শ্রীপতি উভয়েই সিংহলের নিকটে হাদিয়াদহ নামে সমুদ্রের অতলস্পর্শ জলরাশিতে নৌকা বাহিয়া আসিয়া পড়েন। "হাদি কাটাইয়া পার হৈল বুহিত্তাল। বাম দিকে সেতুবন্ধ রামের জাঙ্গাল॥" বিপদ-সঙ্কুল হাদিয়াদহ পার হইয়া নৌকার মাঝিরা যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। দীর্ঘকাল নৌকা বাহিয়া সমুদ্রের উপর দিয়া গমন করিতে হইলে যাত্রীরা গল্প করিয়া সময় অতি-বাহিত করিয়া থাকে। রামের জাঙ্গাল দেখিতে পাইয়া শ্রীপতি দাঁড়ি ও মাঝিগণকে সেতুবন্ধের ইতিহাস শুনাইতে আরম্ভ করিলেন। মুকুন্দরাম শ্রীপতির মুখ দিয়া ত্রিপদা ছন্দে গ্রথিত ছত্রিশটি মাত্র শ্লোকে রামের জন্মাবধি রাবণ বধের পর সেতুদর্শন পর্য্যন্ত রামায়ণে বর্ণিত সমুদয় ইতিহাস শুনাইয়াছেন। সেতুবন্ধের কথা শুনিয়া কর্ণধারের ধাঁধা লাগিল। "শুনিয়া সেতুবন্ধ, কর্ণধারে লাগে ধন্দ, সেতু ভঙ্গ কৈল কোন জনে?" শ্রীপতি কহিলেন, রাম এই সেতু-পথে যখন গৃহে ফিরিতেছেন, তখন সমুদ্র তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিলেন,—

"শুন রাম আমার বচন।
মোর মুণ্ডে পাড়ি বাজ, সাধিলে আপন কাজ,
না ঘুচিল আমার বন্ধন॥
আমি চিরকাল বৃত্তি, সগর রাজার কীর্ত্তি,
তুমি হে সগর বংশধর।
রাবণে করিয়া কোপ, নিজ কীর্ত্তি কৈলে লোপ,
শৃগালেতে লঙ্ঘিবে সাগর॥
তুমি কর‍্যা দিলে পথ, পার হবে মূষ যত,
জলচর হবে প্রতিকূল।
ধর্ম্মেতে করিয়া দৃষ্টি, রাখহ আপন সৃষ্টি,
আমার বন্ধন কর দূর॥
আমা লঙ্ঘে হনুমান, সহি আমি অপমান,
কেবল তোমার অনুরোধে।
মোর যত উপবন, ভাঙ্গিলেক কপিগণ,
তোমা দেখি নাহি করি ক্রোধ॥
সমুদ্রের শুনি কথা, শ্রীরামে লাগিল ব্যথা,
আজ্ঞা দিল সুমিত্রা নন্দনে।
লক্ষ্মণ ধনুক হুলে, ভাঙ্গি দিলে সেতু হেলে,
তিন চারি দ্বাদশ যোজনে॥"

সেতুভঙ্গ সম্বন্ধে কৃত্তিবাস লিখিয়াছেন যে, সমুদ্র শ্রীরাম-চন্দ্রকে হাতযোড় করিয়া কহিলেন,—

"আমার বচন শুন প্রভু রঘুনাথ॥
আমারে বান্ধিয়া কৈলা সীতার উদ্ধার।
শ্রীরাম বন্ধন কেন রহিল আমার॥
তুমি যদি না ঘুচাও আমার বন্ধন।
তিন যুগে ঘুচায় এমন কোন জন॥
সাগরের বোলে রাম লক্ষ্মণে নেহালে।
লক্ষ্মণ লইয়া ধনু নামিল জাঙ্গালে॥
ধনু হুলে তিন খান পাথর খসায়।
কৈরি দশ যোজন একেক পথ হয়॥
জাঙ্গাল ভাঙ্গিল জল বহে খর স্রোতে।
লাফ দিয়া লক্ষ্মণ উঠিল গিয়া রথে॥"

বাল্মীকির রামায়ণে সেতু ভঙ্গের কোনও উল্লেখ নাই। শ্রীরামচন্দ্রের নির্ম্মিত সেতু বোধ হয় দ্বাপর বা বর্ত্তমান কলিযুগের কোনও সময়ে অর্থাৎ শ্রীরামচন্দ্রের বহু শতাব্দী পরে সংস্কারাভাবে কিম্বা প্রাকৃতিক উৎপাতে ভগ্ন হইয়া গিয়াছিল। ভাষা-রামায়ণ রচনাকালে এই ভগ্ন সেতুর বিষয় চিন্তা করিয়া বাঙ্গালী বাল্মীকি কল্পনার বলে সেতু ভঙ্গের যে চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন তাহা মূল সংস্কৃত রামায়ণে রক্ষিত হইবার উপযুক্ত। মুকুন্দরাম সেতু ভঙ্গের চিত্রখানি কৃত্তিবাসের রামায়ণ হইতে গ্রহণ করিয়া তাঁহার চণ্ডীকাব্যের নাট্যাংশের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির জন্য সেখানি, যেভাবে ঘটনাবলীর মধ্যে বসাইয়া দিয়াছেন তাহাতে তাঁহার শিল্পকলার প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। মাধবাচার্য্য সেতু ভঙ্গের কথা তাঁহার "জাগরণ" কাব্যে আদৌ উল্লেখ

করেন নাই। মাধবাচার্য্যের শ্লোক: "সেতুবন্ধ বাহি যায় রামের কাছে।" শ্রীরামের সেতু আছে, কি এত দিনে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, তাহা পরীক্ষা করিবার মাধবাচার্য্যের সময় নাই।

মুকুন্দরামের চণ্ডীকাব্যে বর্ণিত বাঙ্গালীর অন্তঃপুরে কৃত্তিবাসের ছায়া কতটা পড়িয়াছে তাহা একবার দেখা যাক্। ধনপতির প্রথমা স্ত্রী লহনা কনিষ্ঠা খুল্লনাকে বলিলেন,—

"যে ঘরে নিবসে সতা, অবশ্য কোন্দল তথা,
বৈরিভাব না ভাবিও মনে।
যার সনে বার মাস, একত্রেতে করি বাস,
অবশ্য কোন্দল তার সনে॥
কৌশল্যা রামের মাতা, কৈকেয়ী তাহার সতা,
দোঁহের কোন্দলে সর্ব্বনাশ।
শ্রীরাম গেলেন বন, সীতা নিল দশানন,
শুনেছি পুরাণে ইতিহাস॥"

ধনপতি একস্থানে লহনাকে বলিতেছেন,—

"আমার বচন রাখ, একভাবে দোঁহে থাক,
না হবে কাহার বিনাশ।
সতিন কন্দল যথা, অবশ্য বিনাশ তথা,
রামায়ণে শুন ইতিহাস॥
কৌশল্যা রামের মাতা, কৈকেয়ী তাহার সতা,
দোঁহের কোন্দলে সর্ব্বনাশ।
রাম গেলা বনবাস, নৃপতি হৈল নাশ,
যথা দ্বন্দ্ব তথাই বিনাশ॥"

বাল্মীকি ও কৃত্তিবাস দশরথের পত্নীগণের মধ্যে বিবাদের উল্লেখ করেন নাই। মুকুন্দরাম তাঁহার সমকালে বহুবিবাহের ফল স্বরূপ বাঙ্গালা দেশে সতা-সতীনের কলহের কথা স্মরণ করিয়া লহনা ও ধনপতির মুখ দিয়া কৌশল্যা ও কৈকেয়ীর মধ্যে কাল্পনিক কোন্দলের কথা শুনাইয়াছেন। মাধবাচার্য্য ষোড়শ শতাব্দীতে বাঙ্গালীর পারিবারিক জীবনে এমন একটি বিশেষ দ্রষ্টব্য ব্যাপারের বর্ণনায় রামায়ণের সাহায্য গ্রহণ করিয়া সতা-সতীনের মধ্যে কোন্দলের সৃষ্টি করেন নাই। মুকুন্দরাম যখনই সুবিধা পাইয়াছেন, বাল্মীকি ও কৃত্তিবাসের চিত্রগুলিতে তাঁহার সমসাময়িক বাঙ্গালী সমাজের অবস্থাবিশেষকে প্রতিফলিত করিয়া দেখাইয়াছেন। মুকুন্দরাম রামায়ণের সুপরিচিত কুব্জার চিত্রের আদর্শে দুর্ব্বলা নামে লহনার এক দাসীকে ধনপতির গৃহে আনিয়াছেন। এই দাসীর কুমন্ত্রণায় লহনা ও খুল্লনার মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হয় ও তাহার ফলে খুল্লনার যে দুর্গতি হইয়াছিল তাহা চণ্ডীকাব্যের পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন। ধনপতি গৌড় দেশ হইতে উজানিতে ফিরিয়া আসিলে খুল্লনা সপত্নীর নির্য্যাতন হইতে রক্ষা পাইয়াছিলেন। খুল্লনার জীবনেতিহাসে মুকুন্দরাম বাঙ্গালী সমাজের আর একটা দিক বেশ সুন্দর ভাবে দেখাইবার সুবিধা পাইয়াছেন। সপত্নীর অত্যাচার হইতে সমাজের অত্যাচার যে কত বেশী পরিমাণে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার পরিপন্থক, কুসংস্কারের পরিপোষক ও আত্মমর্য্যাদার হানিকর তাহা মুকুন্দরাম জীবন্ত চিত্র রচনা করিয়া আমাদিগকে বুঝাইয়া দিয়াছেন। এখানেও কবিকে রামায়ণের সাহায্য গ্রহণ করিতে হইয়াছে। লহনার হাত হইতে রক্ষা পাইলেও খুল্লনা কুৎসাপ্রিয় স্বশ্রেণীর লোকেদের নিকট প্রথমটা অত্যন্ত অপমানিতা হইয়াছিলেন। অত্যাচারের কাহিনীর শেষ অধ্যায়ে খুল্লনা সীতার ন্যায় অগ্নি-পরীক্ষায় জয়লাভ করেন।

নাটকীয় ঘটনাবলীতে সৌষ্ঠব রক্ষা করা যে দুরকার, কবিকঙ্কণ তাহা উত্তম রূপ জানিতেন। সামাজিক উৎপীড়নের প্রথম দৃশ্যটিতে তিনি সেই জন্য অত্যাচারী জ্ঞাতি কুটুম্বগণকে পাঠকের সহিত পরিচিত করিয়া দিয়াছেন। ধনপতি তাঁহার পিতার শ্রাদ্ধ-তিথি উপলক্ষে জ্ঞাতি কুটুম্বগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া নিজের বাটীতে আনাইলেন। আহারের পূর্ব্বে তাঁহারা ধনপতির বাটীর আঙ্গিনায় বসিয়া রামায়ণ পাঠ শুনিতে আরম্ভ করিলেন। এই স্থানে মুকুন্দরাম শ্রীরামচন্দ্র কর্ত্তৃক সাগরে সেতু নির্ম্মাণ হইতে আরম্ভ করিয়া সমুদয় লঙ্কাকাণ্ডের সংক্ষিপ্ত পদ্যময় সংবাদ দিয়াছেন। শ্রাদ্ধাদি সামাজিক ব্যাপার উপলক্ষে কবির সমকালে রামায়ণ পাঠের ব্যবস্থা দেখিয়া আমরা স্পষ্ট বুঝিতে পারি যে, মুকুন্দ কবির চণ্ডীকাব্যে শ্রীরামচন্দ্রের প্রভাব

কেন এত বেশী। পাঠক ঠাকুর জনকনন্দিনীর অগ্নি-পরীক্ষার কথা শেষ করিলে একজন মুখর গন্ধবণিক ঘন ঘন মাথা নাড়িয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন, স্বয়ং রামচন্দ্র যখন অগ্নি-পরীক্ষা দ্বারা সীতাকে সতী জানিয়া গৃহে লইয়াছিলেন তখন রামচন্দ্রের তুলনায় সামান্ত লোক ধনপতি তাহার স্ত্রীর সতীত্বের পরীক্ষা না লইলে জ্ঞাতি কুটুম্বেরা কিরূপে সদাগরের বাটীতে জল গ্রহণ করিতে পারেন? গৌড়দেশে ধনপতির অবস্থিতি কালে খুল্লনা যে বনে ছাগল চরাইতেন সে কথা ধনপতির জ্ঞাতি কুটুম্বেরা শুনিয়াছিলেন। ধনপতির জ্ঞাতি কুটুম্বেরা সুবিবেচক ব্যবসায়ী, আর সেই কারণে তাঁহারা বলিলেন যে, অগ্নি-পরীক্ষার পরিবর্ত্তে ধনপতি যদি একলক্ষ তঙ্কা দেয় তাহা হইলে তাঁহারা খুল্লনার হাতের ভাত খাইতে পারেন। ধনপতি টাকা দিতে প্রস্তুত ছিলেন কিন্তু খুল্লনা জোর করিয়া অগ্নি-পরীক্ষা দ্বারা নিজের সতীত্ব সপ্রমাণ করিলেন। খুল্লনাকে চণ্ডীদেবী অগ্নির দাহিকা শক্তি হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। সীতার পরীক্ষা হইতে খুল্লনার পরীক্ষা ভীষণতর। যে জৌগৃহে খুল্লনা অগ্নি প্রদান করিয়া অক্ষত দেহে জীবিতা ছিলেন, সেই জৌগৃহ বিশ্বকর্ম্মা ও হনুমান চণ্ডীর আদেশে নির্ম্মাণ করেন। রামায়ণের অনেক কথার উল্লেখ খুল্লনার অগ্নি-পরীক্ষার বর্ণনায় আছে। মাধবাচার্য্যের "জাগরণ" নামক চণ্ডীকাব্যেও খড়্গ-পরীক্ষা, ফুলের সাজিতে জল আনয়ন, সর্প-ঘট পরীক্ষা, ঘৃত-কাঞ্চন পরীক্ষা ও সর্ব্বশেষে যৌতুগৃহ পরীক্ষার কথা আছে। ষোড়শ শতাব্দীতে বঙ্গ নারীর সতীত্বের পরীক্ষা মৃত স্বামীর প্রজ্বলিত চিতাশয্যায় হইত। স্বামী জীবিত থাকিতে স্ত্রীর অগ্নি-পরীক্ষার কথা শুনা যায় না। খুল্লনার দৃঢ়তা ও সতীত্বের কাহিনী সীতার অগ্নি-পরীক্ষার সহিত মিশাইয়া দিয়া মুকুন্দরাম আসোরে চীকের অন্তরালে উপবিষ্টা স্ত্রীগণের মধ্যে অগ্নি-প্রবেশের কথার যে উৎসাহ লক্ষ্য করিয়াছিলেন তাহা এক্ষণে আমাদিগকে কল্পনার সাহায্যে অনুমান করিয়া লইতে হয়। কবির সময়ে যাহা শ্মশানের বক্ষে অভিনীত হইত, চণ্ডীকাব্যে তাহার চিত্র মুকুন্দ কবি রামায়ণে বর্ণিত সীতার অগ্নি-পরীক্ষার দৃশ্য হইতে যে অঙ্কিত করিয়াছেন তাহা সুনিশ্চিত। সমসাময়িক বাঙ্গালী জগতের উপযোগী কোন্ দৃশ্যটি যে মুকুন্দরাম রামায়ণ হইতে সংগ্রহ করেন নাই তাহা বলা সুকঠিন। সীতার অগ্নি-পরীক্ষার কথা বাল্মীকি ও কৃত্তিবাস লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। জৌগৃহের কথা মহাভারতে আছে। মুকুন্দরাম তাঁহার কাব্যের নায়িকার সতীত্ব সপ্রমাণ করিবার জন্য রামায়ণ ও মহাভারতে বর্ণিত সকল প্রকার পরীক্ষার দৃষ্টান্ত যে গ্রহণ করিয়াছেন তদ্বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই। বাস্তবিক, মুকুন্দরামের রচিত চণ্ডীকাব্য ছাড়া বাঙ্গালা ভাষায় অন্য কোনও পদ্যময় রচনা নাই যাহাতে রামায়ণে বর্ণিত ঘটনাবলীর এত অধিক উল্লেখ দেখা যায়।

মুকুন্দরাম বঙ্গদেশের ভৌগোলিক বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতে গিয়াও যে কৃত্তিবাসের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াছেন তাহা বেশ বুঝা যায়। কৃত্তিবাসের জন্মভূমি বঙ্গদেশের নানা স্থানের উল্লেখ তাঁহার রচিত ভাষা-রামায়ণে আছে। উক্ত স্থানগুলির নাম পাঠ করিতে করিতে মনে হয় যে, কৃত্তিবাস কবি দেশমাতার গৌরবে নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করিতেন। কৃত্তিবাস সগর বংশের ইতিহাসে গঙ্গার উৎপত্তি ও ভগীরথ কর্ত্তৃক পৃথিবীতে গঙ্গা আনয়নের কথায় নিজের দেশের উল্লেখযোগ্য গঙ্গাতীরস্থ স্থানগুলি বাদ দিয়া বাল্মীকির রামায়ণে বর্ণিত গঙ্গার গতিপথ অনুসরণ করেন নাই। কৃত্তিবাসের ভাষা-রামায়ণে ইন্দ্রেশ্বর, মেড়াতলা, নদীয়া, সপ্তগ্রাম, আকণা, মাহেশ ও বিহরোদের ঘাটের উল্লেখ আছে। বলা বাহুল্য, বাল্মীকির রামায়ণে এই সকল স্থানের নাম গন্ধ নাই। মুকুন্দরাম কৃত্তিবাসকে অনুসরণ করিয়া চণ্ডীকাব্যে সগর সন্তানগণের কথা ত লিখিয়াছেন, তা'ছাড়া তাঁহার সমসাময়িক বঙ্গদেশ-প্রবাহিনী গঙ্গার উভয় তীরস্থ উল্লেখযোগ্য প্রত্যেক স্থানের অস্তিত্ব উক্ত নদীর গতিপথের মানচিত্রে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। মুকুন্দরাম যে কৃত্তিবাসকে অনুসরণ করিয়া গঙ্গার মানচিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহার একটি বিশেষ কারণ আছে। ষোড়শ শতাব্দীতে বাঙ্গালী বণিকের ভ্রমণ-বৃত্তান্তে কবি গঙ্গাতীরস্থ প্রধান স্থানগুলির বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া বাঙ্গালী পাঠক ও শ্রোতার চক্ষে স্বদেশের চিত্র উজ্জ্বল বর্ণে প্রতিফলিত করিবার লোভ তিনি সংবরণ করিতে পারেন

নাই। বাস্তবিক, স্বদেশ-প্রেমিক কৃত্তিবাস ও মুকুন্দরামে মিলিয়া প্রাচীন বঙ্গের ছবিগুলি তাঁহাদের রচিত দুইখানি সুবৃহৎ কাব্য-গ্রন্থে সযত্নে সাজাইয়া না রাখিলে বঙ্গদেশের ষোড়শ শতাব্দীর ইতিহাস সম্বন্ধে আমরা সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ না থাকিলেও সেই সময়কার বঙ্গদেশ সম্বন্ধে নানা উপাদেয় তথ্য আমাদিগের অবগত হইবার অন্য কোনও প্রকৃষ্ট উপায় আজ বর্ত্তমান থাকিত না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। মুকুন্দরামের চণ্ডীকাব্যখানিকে মন্থন করিয়া আধুনিক সময়ে একাধিক বাঙ্গালী ঐতিহাসিক যে সকল তত্ত্ব উদ্ধার করিতেছেন, মুকুন্দ কবি কৃত্তিবাস-প্রদর্শিত পথে গঙ্গাকে অনুসরণ না করিলে তাহা সম্ভবপর হইত না।

ধনপতি ও তৎপুত্র শ্রীপতির সমুদ্রযাত্রা, বিদেশ-ভ্রমণ, ও বাণিজ্যের বৃত্তান্তে বঙ্গদেশের ভৌগোলিক চিত্র সন্নিবিষ্ট হওয়াতে কাব্য-শিল্পের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি হওয়া ছাড়া হ্রাস হয় নাই বলিয়া আমাদের মনে হয়। মুকুন্দরাম ধনপতি ও শ্রীপতির গমন পথের আশে পাশে নানা স্থানের চিত্র অঙ্কিত করিয়া নূতন ধরণের চিত্রাঙ্কণ শিল্পের পরিচয় দিয়াছেন। সেই উন্নতির যুগে বাঙ্গালী নিজের কর্ম্ম-জীবনে যে সাফল্য লাভ করিয়াছিল তদ্বিষয় স্মরণ করিলে কোন্ স্বদেশ-প্রেমিকের হৃদয় আনন্দে উৎফুল্ল না হয়? কাব্য-শিল্পের ভিতর দিয়া জাতীয়-জীবনের গতি পরিস্ফুট করা উচ্চ অঙ্গের শিল্পকলার মুখ্য উদ্দেশ্য। কৃত্তিবাসের সময়ে বাঙ্গালীর জাতীয় জীবন ভাবের মৃদু-স্পর্শণে জাগিয়া উঠিতেছিল। যবন হরিদাস ও অদ্বৈত আচার্য্য সে যুগে বৈষ্ণব ধর্ম্মের মঙ্গল শঙ্খ সবেমাত্র বাজাইতে আরম্ভ করিয়াছেন। কৃত্তিবাস তাই গঙ্গার প্রশ্নের উত্তরে বিষ্ণুকে বলিতে শুনিয়াছিলেন,—"বৈষ্ণবের সঙ্গতি বাসনা করি আমি। বৈষ্ণবের সঙ্গেতে পবিত্র হবে তুমি॥" কৃত্তিবাসের অব্যবহিত পরবর্ত্তী সময়ে শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবে সমুদ্রদেশ-প্রবাহিনী গঙ্গার স্রোত বহু বর্ষ যাবত কৃষ্ণপ্রেমের আকর্ষণে, কেবল উজান বহিয়া নবদ্বীপের ঘাটে বৈষ্ণবের সঙ্গে মিলিত হইবার উদ্দেশে চলিয়াছিল। ইহার পর শত বর্ষের মধ্যে বঙ্গদেশে মোগল-পাঠানের সংঘর্ষে রাজনৈতিক অশান্তি দেখা দেয়। বাঙ্গালী নিজের জীবন রক্ষার্থে ভাবের জগৎ হইতে কার্য্যপরতার কঠোর নিয়মের মধ্যে আসিয়া পড়িতে বাধ্য হয়। মুকুন্দরামের ধনপতি সদাগর সেইজন্য রাজাজ্ঞা পাইবামাত্র শঙ্খ ও চন্দন আনিবার নিমিত্ত সিংহল যাত্রা করিলেন। গর্ভবতী স্ত্রীর কথা তিনি শুনিলেন না। বাটী হইতে বাহির হইয়া পথে নানা অমঙ্গল দর্শন করিলেন, তাহাতেও তিনি ফিরিলেন না। ওঝা আসিয়া বলিয়াছিল,—"ভাল যাত্রা নাহি সাধু দেখি বিপরীত। * * * এমন যাত্রায় গেলে কেহ হয় বন্দী।" ধনপতি ওঝার কথাও শুনিলেন না। সে কথা বলিতে নাই,—ধনপতি চণ্ডীর ঘটে লাথি মারিয়া উল্টাইয়া দিয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইয়াছিলেন। নৌকায় উঠিয়া "ছই ঘর চাপিয়া বসিল সদাগর।" মুকুন্দরাম এই প্রকার ধর্ম্মহীন ক্রিয়াকাণ্ডের আদৌ পক্ষপাতী ছিলেন না। মুকুন্দরামের চণ্ডী সেইজন্য ধনপতিকে শাস্তি দিয়াছেন। সে যাহা হউক, নৌযাত্রার বাঙ্গালী বণিক ও বাঙ্গালী নেয়ের উৎসাহ দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। কালাপানি পার হইলে বাঙ্গালী তখন জাতিভ্রষ্ট হইত না। মুকুন্দরামের ধনপতি এইবার কৃত্তিবাস-প্রদর্শিত গঙ্গার স্রোতোপথ ধরিয়া চলিলেন। ধনপতির পুত্র শ্রীপতিও এই পথে সাগরে আসিয়া পড়িয়াছিলেন। শ্রীপতি কর্ণধারকে গঙ্গার ইতিহাসটি আদ্যন্ত শুনাইয়াছেন। তিনি তাহাকে কিছুদিন পরে রামায়ণে বর্ণিত সগর বংশের ইতিহাসও শুনাইয়াছিলেন। মাধবাচার্য্যের কাব্যেও ধনপতি দুর্গার ঘট পায়ে ঠেলিয়া দিয়াছিলেন, গণককারের কথা শুনেন নাই, যাত্রা করিয়া পথে অমঙ্গল দেখিয়া গৃহে ফিরেন নাই। মাধবাচার্য্যের খুল্লনা স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "তোমাকে এ বুদ্ধি কে দিল?" "রাবণ কুম্ভকর্ণ দেখ পৌলস্ত্যের নাতি। সবংশে সংহার হৈল হরি সীতা সতী॥" এলোমেলো যুক্তিশূন্য অপ্রাসঙ্গিক উপমা। মাধবাচার্য্যের ধনপতি ও শ্রীপতি উভয়েই বাঙ্গালার গঙ্গা বাহিয়া সাগরে পড়িয়াছিলেন কিন্তু তাঁহারা কর্ণধার বা দাঁড়িগণকে গঙ্গার বা সগর বংশের সংক্ষিপ্ত বা বিস্তারিত ইতিহাস শুনান নাই।

মুকুন্দরাম কৃত্তিবাসি রামায়ণে লিখিত সগর বংশের

ইতিহাস হইতে একটি মনোরম ক্ষুদ্র দৃশ্য চণ্ডীকাব্যের পটে আঁকিয়াছেন। ভগীরথের বাল্য-জীবন সম্বন্ধে কৃত্তিবাস লিখিয়াছেন,—

"পাঁচ বৎসরের হৈল হাতে খড়ি দিল।
বশিষ্ঠের বাড়ী পড়িবারে পাঠাইল॥
বালকে বালকে দ্বন্দ্ব যখন বাড়িল।
কুবাক্য বলিয়া গালি এক শিশু দিল॥
মনে ভগীরথ দুঃখী না দিল উত্তর।
বিষাদে আইল শিশু আপনার ঘর॥
সর্ব্বদা অস্থির হয় সজল নয়ন।
শয়ন মন্দিরে শিশু করিল শয়ন॥
আকাশে হইল বেলা দ্বিতীয় প্রহর।
মাতা বলে পুত্র কেন না আইল ঘর॥
শাবক হারায়ে যেন ফুকারে বাঘিনী।
মুনি কাছে কান্দি যায় দিলীপ কামিনী॥
বশিষ্ঠ বলেন মাতা না কর ক্রন্দন।
রোষের মন্দিরে পুত্র পাবে দরশন॥
আসি রাণী ভগীরথে কোলে করি নিল।
নেতের আঁচলে তার মুখ মুছাইল॥
বলিতে লাগিল ভগীরথের জননী।
কোন দুঃখে দুঃখী তুমি কহ যাদুমণি॥
কারে বাড়াইবে কারে করিবে কাঙ্গাল।
বন্দীমুক্ত করি যদি থাকে বন্দীশাল॥
কোন রোগে রোগী তুমি আমি ত না জানি।
এইক্ষণে করি সুস্থ শত বৈদ্য আনি॥
ভগীরথ বলে মাতা করি নিবেদন।
রোগ দুঃখ নহে আজি পাই অপমান॥
বিরোধ বাধিল এক বালকের সনে।
কুকথা বলিয়া গালি দিল সে ব্রাহ্মণে॥
কোন বংশজাত আমি কাহার নন্দন।
ইহার বৃত্তান্ত মাতা কহ বিবরণ॥
পুত্রের হইলে দুঃখ মায়ে লাগে ব্যথা।
পুত্র সম্বোধিয়া মাতা কহে সত্য কথা॥
শুনিয়া মায়ের কথা ভগীরথ হাসে।
হাসিয়া কহিল কথা জননীর পাশে॥
সূর্য্যবংশে ভূপতিরা নির্ব্বোধের প্রায়।
অল্প শ্রমে গঙ্গা দেবী কে কোথায় পায়॥
যদি আমি ধরি ভগীরথ অভিধান।
গঙ্গা আনি করিব সগর বংশ ত্রাণ॥"

(কৃত্তিবাস)

মাতা পুত্রে এই কথোপকথনের উল্লেখ মাত্র বাল্মীকির রামায়ণে নাই। বাল্মীকির রামায়ণের দ্বিচত্বারিংশ সর্গে লিখিত আছে, "মহারাজ দিলীপ ত্রিংশৎ সহস্র বৎসর মাত্র রাজ্য করিয়া নিজ পুণ্যফলে ইন্দ্রলোকে গমন করিলে পর মহারথ ভগীরথ তাঁহার সিংহাসনে অধিরূঢ় হইলেন। মহামতি ভগীরথ নিঃসন্তান ছিলেন কিন্তু তিনি পুত্রোৎপাদনের নিমিত্ত যত্ন না করিয়া মন্ত্রিবর্গের প্রতি রাজ্যভার অর্পণ করিয়া পতিতপাবনী গঙ্গার আনয়নে প্রবৃত্ত হইলেন।" মুকুন্দরামের চণ্ডীকাব্যে বালক শ্রীপতি গুরুর কটুবাক্য শ্রবণে ব্যথিত হইয়া,

"নিমিষেক গেল সাধু আপন ভবনে।
দুয়ারে কপাট দিয়া রহিল শয়নে॥

শ্রীপতির মাতা খুল্লনা

"পঞ্চাশ ব্যঞ্জন অন্নে করিয়া রন্ধন।
পুত্রের বিলম্ব দেখি স্থির নহে মন॥
প্রভাতে চলিল পুত্র গুরুর মন্দির।
বিলম্ব দেখিয়া মোর প্রাণ নহে স্থির॥"

ভাষা-রামায়ণের ভগীরথের মাতার ন্যায় খুল্লনা

"নগর ভ্রমিয়া গেল পণ্ডিতের ঘরে।
চরণে ধরিয়া রামা বলে দ্বিজবরে॥

*　　*　　*　　*

কহ মোরে মহাভাগ,　　কোথা গেলে পাব নাগ,
কুলের বংশধর শ্রীপতি॥"

গুরুমহাশয় কটুবাক্য বলিয়া খুল্লনাকে খেদাইয়া দিলেন খুল্লনা ঘরে ফিরিয়া আসিয়া কপাটের আড়ে থাকিয়া শুনিলেন, সপত্নী লহনা সখীকে বলিতেছেন,—

"আর শুনেছ খুল্লনা আছেন ভাল নাটে।
ঘরের পো ঘরে আছে যায় হাটে বাটে॥"

খুল্লনা এই কথা শুনিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে পুত্রকে ঘরের কপাট খুলিতে বলিলেন। খুল্লনা অনেক কান্না-কাটি করিলে শ্রীপতি ঘরের কপাট খুলিল। মাতা ও দাসীতে মিলিয়া বালকের হাতে মুখে পায়ে জল, মাথাতে নারায়ণ তৈল দিলেও শ্রীপতির ক্রন্দন থামিল না।

"পুত্রে জিজ্ঞাসিল রামা বহু বিবরণ।
শ্রীপতি মায়ের তরে করে নিবেদন॥
পণ্ডিত সমাজে আমি যত পাইনু শোক।
হেন মনে করি আমি ত্যজি জীবলোক॥
পণ্ডিত সমাজে যার পিতা পরিবাদ।
বিফল জীবন মাতা জীতে নাহি সাধ॥"

মাধবাচার্য্য আলোচ্য ঘটনা সম্বন্ধে বলেন যে, জনার্দ্দন পণ্ডিত উপবাস করিয়াছিলেন। শ্রীমন্ত ছেলেদের সঙ্গে হাস্য পরিহাস করিতেছিল। পণ্ডিত মহাশয় তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া শ্রীমন্তকে জারজ বলিলেন। বালক ঘরে আসিয়া দরজা বন্ধ করিল। দুর্ব্বলা দাসী তাহার সন্ধানে পণ্ডিতের বাড়ীতে গিয়াছিল। মুকুন্দরাম কৃত্তিবাসকে অনুসরণ করিয়া খুল্লনাকে পুত্রের অনুসন্ধানে পণ্ডিতের গৃহে পাঠাইয়াছেন। মুকুন্দরামের শ্রীপতি শেষে বলিল, "বাপের উদ্দেশ আশে, চলিব সিংহল দেশে, সাত ডিঙ্গা করিয়া সাজন॥" মুকুন্দরাম মাধবাচার্য্যের উপর তুলি ধরিয়া মাতৃস্নেহের যে সুন্দর ছবিখানি আঁকিয়াছেন তাহার মর্ম্ম মহিলা-শ্রোতা ও মহিলা-পাঠক যেমন বুঝিবেন, অপরে সেরূপ বুঝিবে না। বালক শ্রীপতিকে সকলেই সিংহলে পিতার উদ্দেশে যাইতে নিষেধ করিয়াছিল কিন্তু সে কাহারও কথা শুনিল না। দেশ যখন জাগিয়া উঠে, বালকেরা তখন উৎসাহিত হইয়া প্রৌঢ়ের ন্যায় কার্য্য করে। দেশ যখন ঘুমাইয়া থাকে, প্রৌঢ়েরা তখন শিশুর ন্যায় ঘরের কোণে বসিয়া থাকে। সেই জাগরণের দিনে বাঙ্গালাদেশে বালক হইতে বৃদ্ধ পর্য্যন্ত সকলেই দেশের জন্য কর্ম্মক্ষেত্রে অবতরণ করিয়াছিলেন। মুকুন্দরাম যোড়শ শতাব্দাতে বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনের ছবি আঁকিতে বসিয়া কৃত্তিবাসি রামায়ণের যেখানে যতটুকু কর্ম্ম-জীবনের আদর্শের সন্ধান পাইয়াছেন ততটুকু তিনি গ্রহণ করিয়াছেন আর সেই আদর্শকে চণ্ডীকাব্যের ছাঁচে ঢালিয়া কর্ম্মী বাঙ্গালীর জীবন্ত মূর্ত্তি গড়িয়াছেন। মুকুন্দরামের শিল্পনৈপুণ্যে কৃত্তিবাসের ছায়া ব্যতীত তাঁহার কথায় চণ্ডীকাব্যের কোথাও আমাদের নয়ন-পথে পতিত হয় না। আমরা মুকুন্দরামের চণ্ডীকাব্যে কৃত্তিবাস রূপ মহীরুহের ব্যাপ্তি বা অস্তিত্ব যদিও সর্ব্বদা অনুভব করি না, কিন্তু তাঁহার রচিত এই কাব্যে ভারতব্যাপী কার্য্যক্ষেত্রের প্রত্যেক দর্শনীয় ও বর্ণনীয় স্থানে সেই সুবৃহৎ বৃক্ষের সুস্পষ্ট ছায়া দেখিতে পাই।

আস্তিক্যবাদ।

[শ্রীরামসহায় বেদান্ত শাস্ত্রী]

১ম প্রস্তাব।

১। জড় ও চৈতন্য দুইটি পৃথক্ পদার্থ। ভৌতিক পদার্থ মাত্রই জড়। সৃষ্টির প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত জড়ের একই অবস্থা, একই গতি, একই ধর্ম্ম। পরমাণুপুঞ্জ দ্বারা গঠিত সংহত দ্রব্য মাত্রই জড়। জড়ের যাহা বিধায়ক, সংহত পদার্থের যাহা মূল প্রতিষ্ঠা, তাহাই চৈতন্য। জড়ের মত চৈতন্য নিত্য একরূপ নহে। চৈতন্যের নানা ভাবে বিকাশ। উপলব্ধি, স্মৃতি, অনুভূতি ও প্রত্যভিজ্ঞা প্রভৃতি চৈতন্যের ধর্ম্ম। আমার অনুভূতি, তোমার অনুভূতি এক নহে। একের স্মরণ অপরে করিতে পারে না। চৈতন্য না থাকিলে পরমাণুপুঞ্জের মিলন ঘটিত না; সংহত পদার্থের সৃষ্টিই হইত না। অনিয়মিত ভাবে সংহত হইলেও কোন নিয়ম, কোন শৃঙ্খলাই দেখা যাইত না। চৈতন্য না থাকিলে এই সৃষ্টিশক্তির চেতন ভাব থাকিত না; জীব উৎপত্তির কোন কারণও পাওয়া যাইত না। অন্ধশক্তির কার্য্য অন্ধই হইত।

২। শরীরের চৈতন্য তাহার নিজস্ব নহে। চৈতন্য

শরীরের ধর্ম্ম নহে। শরীরের ধর্ম্ম হইলে মৃতদেহে অর্থাৎ শব-শরীরেও চৈতন্য দৃষ্ট হইত। তাহা হয় না। আর ইন্দ্রিয় বিনাশ হইলেও তদনুভূত বিষয়ের যখন স্মৃতি দেখা যায়, তখন চৈতন্য শরীরের ধর্ম্ম হইতেই পারে না। চক্ষু বন্ধ করিয়া দাও, মানব মনশ্চক্ষুতে দৃষ্ট বিষয় স্মরণ করিবে।

চৈতন্য শরীরের ধর্ম্ম হইলে শরীর বিদ্যমানে সে চৈতন্য তবে কোথায় যায়? ভৌতিক পদার্থই ভূতে বিলীন হয়; চৈতন্য ভৌতিক নহে; কাজেই ভূতে বিলীন হইতে পারে না। বাল্যকালের দৃষ্ট এবং শ্রুত বিষয় এখন যৌবনেও স্মরণ করিয়া থাকি। বাল্যকালের শরীরের মহা পরিবর্ত্তন হইয়া যায়; কিন্তু সেই স্মরণের কোন বৈলক্ষণ্যই জন্মে না।

শরীরস্য ন চৈতন্যং মৃতেষু ব্যভিচারতঃ।
তথাত্বঞ্চেদিন্দ্রিয়াণামুপঘাতে কথং স্মৃতিঃ॥

(ভাষা পরিচ্ছেদ)

চৈতন্যের বিকাশ দেহেই দেখা যায় বলিয়া চৈতন্যকে দেহের ধর্ম্ম বলিতে পার না। কারণ সেই দেহ থাকিতে চৈতন্যের বিলোপও ত দৃষ্ট হয়। রূপাদি দেহের ধর্ম্ম; তাই দেহ যতদিন, রূপাদিও ততদিন। দেহের সঙ্গে রূপাদিরও নাশ প্রাপ্ত হয়। দেহ রহিল অথচ রূপাদি রহিল না, তাহা ঘটে না।

চৈতন্য রূপ রসাদি হইতে পৃথক্ বস্তু। রূপ রসাদির এবং তাহার ধর্ম্মাদির বিকাশ সর্ব্বদাই এক প্রকার। চৈতন্যের এবং তাঁহার ধর্ম্ম অনুভূতি স্মরণাদির নিত্য নানাবিধ বিকাশ। রূপ রসাদি দৃষ্ট হয়, অনুভূত হয়; চৈতন্য ঠিক দৃষ্ট বা অনুভূত হয় না। চৈতন্য ধর্ম্ম স্মরণাদিও কাহা কর্ত্তৃক দৃষ্ট বা অনুভূত হইতে দেখা যায় না। অগ্নি উষ্ণ পদার্থ; আপনাকে সে দাহ করে না। রূপ-রসাদি আপনারা আপনাদিগকে দেখিতে পারে না।

"ন হি রূপরসাদয়োহন্যেন্যং স্বঞ্চ বিন্দেরন্"

(শাঙ্কর ভাষ্য)

৩। নাস্তিকেরা বলেন—"মদে মত্ততাজনিকা শক্তির মত দেহে চৈতন্য নামক শক্তির স্বতঃই জন্ম হয়।" ইহা শাস্ত্র এবং যুক্তিবিরুদ্ধ। মদে মত্ততাজনিকা শক্তি স্বতঃই জন্মে না। মদের উপাদানেই মত্ততাজনিকা শক্তি সূক্ষ্ম ভাবে বিদ্যমান আছে; মদে কেবল স্থূল ভাবে তাহার বিকাশ দৃষ্ট হয় মাত্র। মদের উপাদানে যাহা সূক্ষ্ম ভাবে নাই, মদে তাহা স্থূল ভাবে জন্মিবে না। উপাদানে যাহা নাই, উপাদেয়ে তাহা আইসে না। কারণের গুণ কার্য্যে সংক্রান্ত হইবে—ইহাই নিয়ম। হরিদ্রা ও চূর্ণে সূক্ষ্ম ভাবে লোহিত বর্ণের উপাদান ছিল; নহিলে লৌহিত্য গুণ জন্মিত না। অন্যথা জল ও চূর্ণে জন্মে না কেন? ভাগীরথীর জল লোহিত বর্ণ হইলেই বুঝিতে হয়, পার্ব্বতীয় নদীস্রোত আসিয়া ভাগীরথীতে মিশিয়াছে, এবং সেখানে বৃষ্টিও হইয়াছে। অতএব, কার্য্য দেখিয়া কারণের ইয়ত্তা করিতে হয়। মদে মত্ততাজনিকা শক্তি দেখিয়া বুঝিতে হয় মদের উপাদান তণ্ডুলাদিতেও ঐ মত্ততাজনিকা শক্তি সূক্ষ্ম ভাবে আছে। তাই পুরিয়া অন্ন ভোজন করিলে যে সামান্য আবেশের ভাব দেখা যায়, উহাই সূক্ষ্ম মত্ততাজনিকা শক্তির বিকাশ। অতএব, জড় দেহ হইতে ভিন্ন প্রকৃতিক অজড় চৈতন্য বস্তুর উৎপত্তি হইতে পারে না।

৪। "অচেতন হইতে চৈতন্য জন্মিতে পারে"—ইহা নাস্তিকের কথা। তাঁহারা বলেন—"যখন অচেতন গোময় হইতে চেতন বৃশ্চিকাদির জন্ম দেখা যায়, তখন অচেতন জড় বস্তু হইতে চেতন আত্মা জন্মিবার পক্ষে বাধা কি?" নাস্তিকের এ উক্তিও শ্রুতি এবং যুক্তিবিরুদ্ধ। "গোময় হইতে বৃশ্চিক জন্মে"—এই দৃষ্টান্তটিতে ইহা প্রমাণ হয় না যে, অচেতন হইতে চেতন বস্তু জন্মিল। গোময় ভৌতিক পদার্থ। গোময় রূপ ভৌতিক পদার্থই বৃশ্চিকের দেহের উপাদান। দেহ জড়, তাহার উপাদান ত জড়ই হইয়া থাকে। গোময় হইতে বৃশ্চিকই জন্মে; বৃশ্চিকের আত্মা জন্মে না। বৃশ্চিকের আত্মচৈতন্য গোময়ের ভিতর থাকে, মাত্র। মানবাদির আত্মাও ত শস্যাদিতে সংশ্লিষ্ট থাকে, তাহাতে কি অচেতন হইতে চেতন বস্তুর জন্ম—ইহা প্রমাণিত হয়? আত্মা মাত্রেই চৈতন্য। সেই আত্ম-চৈতন্য জড়ের ভিতর অনুপ্রবিষ্ট ত থাকেই। দেহের মধ্যে রক্তকণিকার ভিতর কত চেতন সূক্ষ্ম জীবাণু বিরাজ করে।

তাহা বলিয়া তাহারা কি অচেতন রক্ত হইতে জন্মে? জননীর জঠর হইতে সন্তান প্রসব হয়; কেহ কি বলিবেন, জননী হইতেই উহার জন্ম হইল?

এখন দাঁড়াইল, অচেতন হইতে চেতন জন্মে না। এরূপ একটি আশঙ্কা উঠিতে পারে যে, গোময়ে যে যে গুণ দৃষ্ট হয়, বৃশ্চিকে সেই সেই গুণ দৃষ্ট হয় না কেন? এ অমূলক আশঙ্কা। একটি সূক্ষ্ম কাটের যে গুণ, মানবেও কি সেই গুণ থাকিবে? নবজাত শিশুর ও বয়স্ক ব্যক্তির গুণ কি সমস্তই এক? কারণের গুণ কার্য্যে সংক্রান্ত হয় বলিয়া কারণের সমস্ত গুণই যে কার্য্যে সংক্রান্ত হইবে, এমত কথা নহে। অতএব, গোময়ে যে গুণ, বৃশ্চিক দেহে যে সেই গুণই দৃষ্ট হইবে, এমত নিয়ম নাই। বৃশ্চিকের আত্মা বা চৈতন্যকে গোময়ের গুণ প্রাপ্ত হইতে হইবে—এ তর্ক ত উঠিতেই পারে না। কারণ, গোময় বৃশ্চিকের আত্ম-চৈতন্যের কারণ নহে। তবে কার্য্যে যে গুণ দৃষ্ট হইবে, তাহা অব্যক্ত ভাবে সূক্ষ্ম রূপে কারণে বিদ্যমান থাকে। কারণের সূক্ষ্ম অব্যক্ত গুণই কার্য্যে স্থূল ভাবে ব্যক্ত হইয়া দেখা দেয় মাত্র। কারণের ব্যক্ত গুণ হয় ত কার্য্যে ব্যক্ত হইল না, অব্যক্ত ভাবেই থাকিল; আবার কারণের অব্যক্ত গুণ হয় ত কার্য্যে ব্যক্ত হইয়া পড়িল, অব্যক্ত রহিল না—ইহাই সিদ্ধান্ত।

শঙ্করার্চ্চনা।

[শ্রীললিতচন্দ্র মিত্র]

বুদ্ধ প্রভাবে ভারতে যখন হইল ম্লান হিন্দু ধর্ম্ম,
দিব্য প্রেরণে লইলে জন্ম, বুঝাতে আবার গুহ্য মর্ম্ম।
ষোড়শ বর্ষে মকর ধৃত, হইলে নদীতে করিতে স্নান,
সন্ন্যাস ধর্ম্ম করিতে গ্রহণ জননী আজ্ঞা করিল দান।
আলোকে তোমার জগৎ মুগ্ধ, আবার দীপ্ত হিন্দু ধর্ম্ম,
শিব অবতার করিত জ্ঞান, হেরিল যাহারা তোমার কর্ম্ম।

নর্ম্মদা পুলিনে ধাইলে স্রোত, করিতে গুরুর সমাধি ভঙ্গ,
করঙ্গে তাহার করিলে বন্ধ, হইল ব্যর্থ জীবন রঙ্গ।
বৃদ্ধা জননী স্নানের জন্য, আনিলে ভবনে নদীর ধারা,
ভক্তিপূর্ণ হইল সকলে সন্দ চিত্ত আছিল যারা।
আলোকে তোমার জগৎ মুগ্ধ, আবার দীপ্ত হিন্দু ধর্ম্ম,
শিব অবতার করিত জ্ঞান, হেরিল যাহারা তোমার কর্ম্ম।

আপন দেহ ত্যজিয়া তুমি, করিলে প্রবেশ নৃপের দেহ,
হিষী স্বজন সকলে তোমার, ছিল না বিদিত ঘটন কেহ।
মনেতে জানিয়া মাতার মৃত্যু, আসিলে ত্বরায় তাহার পাশ,
শেষের কার্য্য করিয়া শেষ যাইলে আবার আপন বাস।
আলোকে তোমার জগৎ মুগ্ধ, আবার দীপ্ত হিন্দু ধর্ম্ম,
শিব অবতার করিত জ্ঞান, হেরিল যাহারা তোমার কর্ম্ম।

ভাষ্য তোমার শাস্ত্র গ্রন্থে নূতন আলোক করিল দান,
প্রতিভা বলে পণ্ডিত মাঝে, পাইলে সবার উচ্চ স্থান।
পণ্ডিত মূর্খ, সবার মর্ম্ম করিয়া স্পর্শ তোমার গান,
মধুর ছন্দে মোহের ধন্দে, করিয়া চূর্ণ মাতায় প্রাণ।
আলোকে তোমার জগৎ মুগ্ধ, আবার দীপ্ত হিন্দু ধর্ম্ম,
শিব অবতার করিত জ্ঞান, হেরিল যাহারা তোমার কর্ম্ম।

ধর্ম্ম সেবী সবল চিত্তে, সতত বৃদ্ধি করিতে জ্ঞান,
ভারতবর্ষে চারিটি প্রান্তে চারিটি মঠ করিলে দান।
অদ্বৈত তত্ত্ব সোহং বাক্য করিলে প্রচার সাধক জন্য,
তোমার শিক্ষা করিয়া লাভ, সমাধি সাধনে হইল ধন্য।
আলোকে তোমার জগৎ মুগ্ধ, আবার দীপ্ত হিন্দু ধর্ম্ম,
শিব অবতার করিত জ্ঞান, হেরিল যাহারা তোমার কর্ম্ম।

পরিবর্ত্তন।

[শ্রীসুশীলকুমার রায়]

সেদিন যোগেশবাবুর ঘরে চায়ের টেবিলে মহা তর্ক বেধে গিয়েছিল—নারী পুরুষের চেয়ে শ্রেষ্ঠ কি না, এই বিষয় নিয়ে।

আমাদের ভেতর অমলবাবু খুব স্পষ্টবক্তা। তাঁকে আমরা চেপে ধরে বল্লুম, 'আপনাকে এর মীমাংসা ক'রতে হবে।'

শিশিরবাবু একটা কাগজ থেকে খানিকটা quote করে বল্লেন, 'পুরুষ হচ্ছে জন্ম জন্মান্তরের এনার্কিষ্ট; এনার্কিজম্ তার গিঁঠে গিঁঠে, স্নায়ুতে স্নায়ুতে উদ্দাম চাঞ্চল্য নিয়ে উন্মুখ হ'য়ে আছে, আর নারী হচ্ছে তার প্রতি-ষেধক।'

অমলবাবু হুঙ্কার দিয়ে বল্লেন, 'মিথ্যে—মিথ্যে, মস্ত বড় একটা মিথ্যে। নারী-চরিত্র সম্বন্ধে কেউ কখন বাঁধা নিয়ম ক'রতে পারে নি—পারবেও না।' তারপর হো হো ক'রে হেসে ঘরের ভেতর যারা ছিল তাঁদের বুকের ভেতর পর্য্যন্ত কাঁপিয়ে দিয়ে বল্লেন, 'এই আমরা তিনজন Old chum হাতে হাতে জিনিষটাকে পরখ করিয়ে দিতে পারি। আমার স্ত্রীর সঙ্গে আমি থাকতে পারি না, কারণ তিনি একটু মুখরা, শিশিরের স্ত্রী ওর কাছে থাকতে চায় না, আর আমাদের যোগেশ ভায়া—তার স্ত্রী ত পালিয়েই গেল।'

অমল টেবিল চাপড়ে যোগেশবাবুর মুখের দিকে চাই-তেই তাঁর হাতথেকে চায়ের পেয়ালাটা প্লেটের ওপর প'ড়ে গিয়ে টুকরো টুকরো হ'য়ে ভেঙ্গে গেল, মুখখানাও মরা লোকের মত ফ্যাকাশে হ'য়ে গেল। যোগেশবাবু সেই অবস্থাতেই এমন তীক্ষ্ণভাবে অমলবাবুর দিকে চাইলেন যাতে বোঝাল যে আমার সামনে তাঁর এরকম বেফাঁস হয়ে যাওয়াটা বড় অন্যায় হ'য়েছে।

অমলবাবু হাত জোড় ক'রে বল্লেন, 'মাপ ক'রো ভাই যোগেশ, প্রমথ যে আছে আমার মনেই ছিল না। তোমার বিয়েতে যখন শিশির আর আমি যাই তখন তোমার স্ত্রীকে আমাদের বড় ভালই লেগেছিল, কিন্তু তার এরকম ব্যবহারে আমার বড় আঘাত লেগেছে।'

শিশির কথাটাকে ঘুরিয়ে নিয়ে বল্লে, 'আমি অনেক সাধ্য সাধনা ক'রেও স্ত্রীর মন পাইনি। এই যে স্বামী-স্ত্রীর মনের গরমিল, এদের মিলনের পথে দাঁড় করান মানুষের শক্তির বাইরে। তবে সুখের বিষয়, এখন সে বিয়ের Code অনেকটা ব'দলে গেছে। যাই হোক ভাই, আমার ছেলেরা বোধ হয় সুখী হবে।'

তারকবাবু এতক্ষণ চুপ ক'রে বসেছিলেন। তিনি এইবার তাঁর লম্বা লম্বা চুলগুলো হাত দিয়ে নেড়ে দিয়ে গম্ভীরভাবে বল্লেন, 'প্রকৃতি আমাদের জীবন দেয়, আর সমাজ আমোদের আনন্দ দেয়।' তারপর যোগেশবাবুর দিকে ফিরে বল্লেন, 'আপনার কি কোন ছেলে আছে?'

যোগেশবাবু যেন ঘুমের ঘোর থেকে জেগে উঠলেন বল্লেন, 'ছেলে—আমার কি কোন ছেলে ছিল?' যোগেশ বাবুর গলা থেকে কথাগুলো এমন ফাঁকা আওয়াজের মত শোনা গেল যে আর কেউ সাহস ক'রে ঐ সম্বন্ধে কথা কইতে চাইলে না।

ভুখুয়া এসে সকলের বাটীতে আবার চা ঢেলে দিয়ে গেল। অমল, শিশির, তারক তিনজনে আস্তে আস্তে চা খেয়ে good night ক'রে চ'লে গেল। যোগেশবাবু অসাড় হ'য়ে ঈজি-চেয়ারে একভাবেই শুয়ে রইলেন। পাশে stove শোঁ শোঁ ক'রে জ্বলছিল।

ঘরে আর কেউ নেই, আমি চুপ ক'রে টেবিলের পাশে বসেছিলাম, এমন সময় যোগেশবাবু ধীরে ধীরে বল্লেন, 'আর তোমার কাছে চেপে রাখতে পারলাম না প্রমথ! আমার জীবনের ইতিহাস শুনবে ত?' আমি ঘাড় হেঁট ক'রে ...

ক'রে বসে রইলাম। তিনি বলে গেলেন—'আমার বিয়ের তিন বছর পরে একদিন সন্ধ্যেবেলা club থেকে এসে বিছানার ওপর একখানা চিঠি পেলাম। দু' একটি কথার পর লেখা ছিল, 'আমি চল্লাম, খুঁজো না।' আমি চিঠি প'ড়ে তখন কেমন হ'য়ে গেছলাম ঠিক মনে নেই। তারপর অনেক দিন বাদে খবর পেয়েছিলাম নদীতে বুঝি নৌকো ডুবে মারা যায়। মনে করলাম সে আপনার সমাধি খুঁজে নিয়েছে।

'সাত বছর একলা কাটিয়েছি—সাত বছর! ... না, আজ এই পর্য্যন্ত প্রমথ, আর পারছি না। তার কথা আবার যখন খুব বেশী মনে প'ড়বে তখন আবার তোমায় ব'লব।' যোগেশবাবু শরীরটাকে আর একটু চেয়ারে এলিয়ে দিলেন। আমি আস্তে আস্তে উঠে পড়লাম।

সেদিন রাতে শুয়ে ভাল ঘুম হ'ল না। যোগেশবাবুর জীবনের এই ঘটনাটা আমার কাছে যেন একটা রহস্য বলেই বোধ হ'ল। তিনি একজন বিলাত-ফেরত উঁচু-দরের ব্যারিষ্টার। দেশের কাছে, দশের কাছে প্রত্যহ সম্মান পাচ্ছেন অথচ তাঁরই জীবনটা আগাগোড়া ধোঁয়ার মত, ধরা ছোঁয়া যায় না! এত সুন্দর, এত উদার যার স্বামী, সেই বা পালিয়ে গেল কেন? আমি বিছানায় শুয়ে শুয়েই যোগেশবাবুর অন্তরের চিরন্তন বেদনার কঠিন স্পর্শ বেশ অনুভব করলাম। উঃ, কি অসহ্য যন্ত্রণাই তিনি দিনরাত ভোগ করছেন! যোগেশবাবুর শুকনো মুখ, জ্যোতিঃহীন চোক, মাথায় এলোমেলো শাদায় কালোয় চুল, তাঁর এই বিবাহিত-জীবনে অবিবাহিতের মত জীবন যাপন সবই যেন করুণ মূর্ত্তিতে আমার চোকের সামনে ভেসে উঠল।

প্রথম আলাপে তাঁর সঙ্গে কতটা ঘনিষ্টতাই না জমে উঠেছিল। আমি যখন তাঁকে Browning প'ড়ে শোনাতাম, তখন তিনি আকুল দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে থাকতেন। সেদিন Last ride প'ড়ে শোনাতে তিনি চেয়ার থেকে উঠে ঘরের ভেতর ঘন ঘন পায়চারী ক'রতে লাগলেন, আমার আর পড়া হ'ল না। তবে কি এখন তাঁর মনে সেই স্ত্রীর অনুরাগ সজাগ হ'য়ে আছে, না একটা নির্মম প্রতিশোধ!

(২)

আবার প্রতি সন্ধ্যায় চায়ের টেবিল সর-গরম হ'য়ে উঠতে লাগল, কিন্তু আমার আর তখন উৎসাহ আসত না। আমি যোগেশবাবুর শান্ত মৌন চেহারাটার দিকে বিস্ময় অবাক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকতাম। উঃ, কি অভিশপ্ত এই জীবন!

একদিন রাতে তিনি আমার ঘরে ঢুকে ধরা গলায় ডাকলেন, "প্রমথ!" আমি টেবিলের ওপর উবুড় হ'য়ে প'ড়ে একখানি খবরের কাগজে গরম খবরের সন্ধান করছিলাম, হঠাৎ যোগেশবাবুর গলার আওয়াজে এক রকম চমকে গিয়ে ফিরে দেখলাম তিনি মোটা লাঠির ওপর ভর দিয়ে সামনের দিকে ঝুঁকে প'ড়ে করুণ দৃষ্টিতে চেয়ে আছেন। আমি তাড়াতাড়ি একখানি চেয়ার এগিয়ে দিয়ে বল্লাম, 'আজ এমন সময়ে—'

তিনি হাত উঁচু ক'রে আমাকে বাধা দিয়ে চেয়ারখানির ওপর বসে পড়ে বল্লেন, 'সেদিন বলেছিলাম তোমায় জীবনের ঘটনা শোনাব, আজ তার সময় হ'য়েছে। রাস্তায়, পায়চারী ক'রে বেড়াতে বেড়াতে তাকে মনে প'ড়ে গেল।' আমি চুপ ক'রে বসে রইলাম। তিনি বলে যেতে লাগলেন—

"আমার বাবার একটি পালিতা কন্যা ছিল। তার নাম শোভা—রূপের ডালী; বয়স তখন বছর ষোল। আমি সেই বছর ব্যারিষ্টারী পাশ ক'রে বিলেত থেকে ফিরে এলাম।

"শোভা তখন মায়ের কোলে শুয়ে সুখের স্বপ্ন দেখত। সংসারের সমস্ত জিনিষ তার কাছে একটা কবিতা। লজ্জার লাল আভা, দুঃখের কালিমা, তার সুন্দর মুখখানির ওপর কখন দাগ ফেলেনি, এক কথায় সে তখনো প্রকৃতির কোলে একটি ছোট্ট শিশু। আমি বাড়ীতে এসে তার সঙ্গে খুব মিশে গেলাম।

"সেদিন বোধ হয় বছরের শেষ। শোভা আমাদের বাগানের ভেতর বাঁধান চৌবাচ্ছার পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে লাল নীল ছোট ছোট মাছেদের ময়দার টোপ খাওয়াচ্ছিল, আমি তার সামনে চৌবাচ্ছার ওপারে দাঁড়িয়ে বলে ফেল্লাম 'আজ তোমায় বড় সুন্দর দেখাচ্ছে শোভা—" তার টাটকা

ফোটা শুভ্র মল্লিকার মত মুখখানিতে লজ্জার গোলাপী ছোপ দেখতে পেলাম না। রাজহংসীর মত ঘাড় বেঁকিয়ে সে আমার দিকে চেয়ে দেখলে। রক্ত কমলের মত লাল কাণের দুল দুটো কেঁপে দুলে উঠল।

"ফিরে বছরে আমাদের বিয়ে হ'য়ে গেল। শোভাকে গাড়ী ক'রে নিয়ে বাগানে হাওয়া খেয়ে আসতাম আর পাঁচজন বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে আলাপও করিয়ে দিলাম।

"ছমাস যেতে না যেতেই আমার এই নবীন উৎসাহের জোয়ারে যেন ভাঁটার টান দেখতে পেলাম। আমাদের এই ভাবের বিয়েতে, স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধে শোভা যেন কুঁকড়ে যেতে লাগল। স্ত্রীর ইচ্ছে স্বামীর ওপর হুকুম চালিয়ে নিজের নারীত্বের সার্থকতা অনুভব ক'রতে, আর এটা তাদের একরকম প্রকৃতিগত। বোধ হয় আমিই প্রথমে ভুল পথে চ'লেছিলাম। প্রথম থেকেই শোভার ওপর আমার যেন পূরো অধিকার, এই ভাবে কথা কইতাম, আবার অপর দিকে তার উদ্দাম প্রকৃতিকে সংযত করবার চেষ্টাও কখন করিনি। মানুষের অন্তরের সুখ আর রাজত্ব দুইই বোধ হয় এই ভাবে নষ্ট হ'য়ে যায়—খুব বেশী বিশ্বাসে অথবা খুব বেশী অবিশ্বাসে।"

যোগেশবাবুর চোক ধীরে ধীরে বুজে এলো। আমি অবাক হ'য়ে এক দৃষ্টিতে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে রইলাম।

প্রায় পাঁচ মিনিট বাদে সেই চোক বন্ধ অবস্থাতেই যোগেশবাবু আবার ব'লতে সুরু ক'রলেন—

"আমাদের সংসারে একটা ওলট-পালট হ'য়ে গেল। আঠারো মাস বাদে আমার বাবা আর তার দু'মাস পরে মা মারা গেলেন। তারপর উঃ—"

যোগেশবাবু ওভার্-কোটটা ভাল ক'রে চেপে গায়ে দিয়ে যেন সহজ ভাবে বলে উঠলেন, 'প্রমথ, দাও ত' ভাই ঐ সামনের জানলাটা বন্ধ ক'রে, বড্ড ঠাণ্ডা আসছে।'

ঘরের ভেতর আমার তখন বেশ গরমই বোধ হচ্ছিল, বুঝলাম তাঁর এ শুধু দুর্ব্বলতার কম্পন। জানলাটি বন্ধ ক'রে দিয়ে চেয়ারে এসে বসে পড়লাম।

যোগেশবাবু আপন মনেই বলে উঠল, 'উঃ, সে রাতটা কি ভীষণ ছিল যে রাতে তার চিঠি পেলাম সে চ'লে গেছে! সমস্ত দুনিয়াটা যেন চোকের সামনে দুলিয়ে গেল। ...জানি না কোন্ কুহকে সে এসব পায়ে ঠেলে চ'লে গেল, আবার ভাবি হয়ত' কোন শয়তান তাকে জোর ক'রে পথের ওপর দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল। হয় ত না...।'

যোগেশবাবুর চোক হঠাৎ যেন একটা আভায় উজ্জ্বল হ'য়ে উঠল। তিনি উত্তেজিত ভাবে বলে উঠলেন, 'প্রমথ তুমি মনে ক'রচ এ রকম ত' হয়, কিন্তু না, আমি তাকে এমন ভালবাসি, যতদিন বাঁচবো সে আমার অন্তরের।'

'ওঃ তোমার চোক বোধ হয় আনন্দে জ্বলে উঠল। না না প্রমথ, আমাকে একজন মস্ত বড়লোক ভেবে তোমার অন্তরের বেদীতে আমাকে বসিও না। আমি অত ভাল নই, ওটা আমার দুর্ব্বলতা। হয় আমি তখন খুব তরুণ ছিলাম, নয় বড় ভালবেসে ফেলেছিলাম তাকে। শোভা আমায় ছেড়ে যাবার পর থেকে আমি আর অপর মেয়ে মানুষের মুখের দিকে ভাল ক'রে তাকাইনি—সেও বোধ হয় আমার দুর্ব্বলতা। হ্যাঁ, একবার ভুলতে চেষ্টা ক'রেছিলাম তখন আমার হাতে অগাধ টাকা, মা লক্ষ্মী তাঁর ভাণ্ডার যেন আমারই জন্যে খুলে দিয়েছিলেন। দিন রাতের ভেতর নাইবার খাবার সময় পেতাম না, দুহাত দিয়ে মক্কেল ঠেলতে হ'ত—কিন্তু সব ছেড়ে দিলাম। শোভা আমাকে পথে বসিয়ে গেছল। টাকা—সে ত পরকালে কিছু কাজে আসবে না, তবু একবার ঐ টাকার জোরে ইহকালটাকে ভুলতে চেষ্টা ক'রেছিলাম, কিন্তু তা'ত হ'ল না। টাকা দিয়ে কি কর্ম্মসূত্র ছিঁড়ে ফেলা যায়? জীবন-ভোর যে সব কাজ ক'রে এসেছি তার জের শেষ নিশ্বাস পর্য্যন্ত যে টেনে নিয়ে যেতে হবে। হায় মূর্খ লোকের দল, ঠাকুরকে টাকা ঘুষ দিয়ে, ব্রাহ্মণকে সন্তোষ ক'রে মনে কর যে কর্ম্মফলের হাত থেকে নিস্তার পাবে?' যোগেশবাবু আপন মনে হো হো ক'রে হেসে উঠলেন।

আমি যেন আজ যোগেশবাবুর অন্তরের মানুষটিকে দেখতে পেলাম, সে যেন উন্মাদ, একেবারে ক্ষেপে র'য়েছে —আর এই বাইরের নকল মানুষটি!

যোগেশবাবু গম্ভীর হ'য়ে বল্লেন, 'প্রমথ, কি আশ্চর্য্য, তুমি দেখতে পেলে না সেই আমার সতেরো বছরের

যৌবনের শোভা মার্ব্বেল পাথরের তৈরী মৌন মূর্ত্তির মতই আমার সামনে ঠিক ঐ জায়গাটিতে এসে দাঁড়িয়েছিল। আর সাত বছর আগে ঠিক ঐ মূর্ত্তিই আমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে, যখনই আমি পাপের পথে নেমে যেতে চেয়েছি।—'

যোগেশবাবু ঘাড় হেঁট ক'রে চুপ ক'রে বসে রইলেন। ঘড়িতে বারটা বেজে গেল। মনে হ'ল ঘরের ভেতর যেন কোন অশরীরি আত্মা চলা ফেরা ক'রছে। আমি ভরসা ক'রে যোগেশবাবুকে ডাকতে পাচ্ছিলাম না।

চেয়ারখানা একবার মড় মড় ক'রে উঠল। যোগেশবাবু তাড়াতাড়ি চোকে দস্তানা-ঢাকা হাতদুটো চাপা দিয়ে উঠে পড়ে বল্লেন, 'দোরটা খুলে দাও ত ভাই, আমি আর এক মিনিট এখানে ব'সতে পাচ্ছি না, এখনি দম বন্ধ হয়ে যাবে।' আমি আস্তে আস্তে দোর খুলে দিলাম। যোগেশবাবু নিস্তব্ধ রাস্তার ওপর বেরিয়ে পড়লেন। গাঢ় অন্ধকার তাঁর সবুজ রঙয়ের ওভার-কোটটার পেছন দিকটা গ্রাস ক'রে নিলে।

(৩)

সকাল বেলা উঠে বেড়াতে বেরিয়েছি। যোগেশবাবুর বাড়ীর বাগানের সামনে দিয়েই রাস্তাটা এঁকে বেঁকে চ'লে গেছে। আমি আস্তে আস্তে বাগানের সামনেটায় পায়চারী ক'রে বেড়াচ্ছিলাম, হঠাৎ ভাঙ্গা পাঁচিলের ফাঁক দিয়ে বাগানের ভেতর নজর প'ড়ে গেল, দেখি কাল রাতের সেই যোগেশবাবু তরুণ যুবকের মত চৌবাচ্ছার চারিদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছেন আর দুটো হাতে হাতে এমন ভাবে ঘষছিলেন যে, বোধ হয় যে কোন একটি হাতের ছাল উঠে যাবে। আমি পেছন দিয়ে ঘুরে বাগানের ভেতর ঢুকে দেখলাম তখনও তিনি সেইভাবে ঘুরছেন। আমি পা টিপে টিপে চৌবাচ্ছার কাছে এগিয়ে এলাম। জুতোয় একটা বুনো লতা জড়িয়ে যাওয়ায় পা-টাকে ছাড়াতে গিয়ে সামনে দু একটা ইটের টুকরো ছিটকে গেল। এই সামান্য একটু শব্দেই যোগেশবাবু যেন চ'মকে আমার দিকে ফিরে দেখলেন। আমি হাত তুলে তাঁকে নমস্কার করলুম। যোগেশবাবু একটু চুপ ক'রে থেকে আনন্দে যেন লাফিয়ে উঠলেন, তারপর দৌড়ে আমার কাছে এসে কাণের কাছে মুখ নিয়ে চুপি চুপি বল্লেন, 'কাল রাতে সে এঁসেছিল।' আমি অবাক হ'য়ে গেলাম। যোগেশবাবু কি নেশা করেছেন? তাঁর মুখের দিকে চেয়ে সে রকম কিছু দেখতে পেলাম না। একটা আনন্দের উচ্ছ্বাসে তাঁর দেহ মন ভরপুর। আমি ইতস্ততঃ করছি দেখে তিনি টপ্ ক'রে লাফিয়ে চৌবাচ্ছার পাড়ের ওপর উঠে বসে বল্লেন, 'কাল তোমার ওখান থেকে উঠে বাড়ীতে এসে মনে হ'তে লাগল সে যেন আজ আসবে। তার হাল্কা পায়ের খস্ খস্ আওয়াজ আকাশে বাতাসে ঘরের মেজেতেও যেন শুনতে পেলাম। তাড়াতাড়ি মোমবাতিটা নিভিয়ে স্প্রীংএর খাটের ওপর অসাড় হ'য়ে শুয়ে পড়লাম ঘুমবার ভাণ ক'রে—যেন তারই প্রতীক্ষায়।

আমি জুতো দিয়ে একটা কাঁকরে ঠোকর মারতে মারতে বল্লাম, 'তারপর—'

"তখন কত রাত জানি না, আমার মাথার শিয়রে চুড়ীর টুং টাং আওয়াজ হ'ল, দেখতে দেখতে একটা শাদা আলোয় ঘর ভ'রে গেল। আমি আস্তে আস্তে চারিদিকে চেয়ে দেখলাম, ঘরের কিছুই নজরে পড়ল না, খালি আলোর ঢেউ। এমন সময় আবার চুড়ীর আওয়াজ পেলাম। সেই দিকে চেয়ে দেখি শোভা—সেই আমার ছেলেমানুষ শোভা যেন শূন্যে দাঁড়িয়ে আছে আর তার চারিদিকে একটা ধোঁয়ার মত ঘোলাটে ঘোলাটে কি! আমি তাকে কত চেঁচিয়ে ডাকলাম কিন্তু সে যেন শুনতে পেলে না, সেই একভাবেই দাঁড়িয়ে রইল। তারপর সে চাইলে। কি স্নিগ্ধ-করুণ সে চাউনি। ধোঁয়ার মত ঘোলাটে ঘোলাটে জিনিষটা গাঢ় হ'য়ে আসতে লাগল। পা থেকে ক্রমে সব আস্তে আস্তে ঢেকে আসতে লাগল। এইবার খালি মুখখানি। সেই আলোর সমুদ্রে যেন ফুটন্ত পদ্মের মত ভাসতে লাগল। ক্রমে তাও মিলিয়ে এল, শুধু চোক দুটী। চাউনি যেন আরো করুণ হ'য়ে এল, যেন বড় বড় দুফোঁটা শিশির বিন্দু চোক থেকে ঝরে পড়ল।

"আমি হাত বাড়িয়ে শোভাকে সেই ধোঁয়ার ভেতর থেকে টেনে বার করে আনতে যাবো অমনি মাথায় বড়

জোরে একটা কি আঘাত লাগল, সঙ্গে সঙ্গে ঘর অন্ধকারে ভ'রে গেল। আমার সমস্ত শরীর যেন হিম হয়ে এল।

"ঘুম ভেঙ্গে দেখি বালিসটা নীচে পড়ে গেছে, মাথার শিয়রের কাছে লোহার ডাণ্ডাটার ভেতর আমার মাথা ঢোকানো, সামনের জান্‌লা খোলা আর তার ভেতর দিয়ে হু হু করে ঠাণ্ডা হাওয়া আসছে।"

যোগেশবাবু তাঁর এই কথাগুলোর একটা উত্তর শোনবার জন্যে আমার মুখের ওপর পূর্ণ দৃষ্টি ফেলে চেয়ে রইলেন।

আমার একবার মনে হ'ল বলি ও সব কিছু নয়, স্বপ্নের একটা খেয়াল, কিন্তু তাঁর উৎসাহ পূর্ণ চোকের দিকে চেয়ে কিছু বলতে ইচ্ছে হ'ল না। এতটা প্রাণের আনন্দ আমার একটু কথার আঘাতে এখনি হয়ত শুকিয়ে, মুষড়ে যাবে। আমি মনের ভাব গোপন রেখে বল্লাম, 'মনের একাগ্রতা থাকলে সবই সম্ভব হয়ে পড়ে।'

যোগেশবাবু গলার স্বরটা একটু কোমল ক'রে বল্লেন, 'তাঁর বোধ হয় এবার অনুতাপ হয়েছে, এইবার হয় ত আসবে, আসবে ত?'

ঘোর নাস্তিক হ'লেও যোগেশবাবুর অন্তরের সংস্পর্শে আমার অন্তরটাও ভাবপ্রবণ ও কোমল হয়ে এসেছিল। আমিও জোর-গলায় বলে ফেল্লাম, 'আসবে বই কি, নিশ্চয়ই আসবে।'

(৪)

আমাদের চায়ের আড্ডা সমান ভাবেই চলছিল। যোগেশবাবুর সেই একভাব, তবে আজ কাল আর একটু যেন গম্ভীর হয়ে পড়েছেন। আমি যোগেশবাবুকে অনেকটা বুঝে নিয়েছিলাম তাই নিজেই হৈ চৈ ক'রে আসর সর-গরম করে রাখতাম—কাউকে তাঁর ভাবান্তর বুঝতে দিতাম না।

সেদিন আড্ডায় এসে যোগেশবাবুকে দেখ্‌তে পেলাম না। দুখুয়াকে জিজ্ঞেস করায় সে গলার আওয়াজটা চেপে কাণের কাছে এসে ফিস্ ফিস্ করে বল্লে, 'আজ সকালে এক সাধু এসেছে। তাঁরই সঙ্গে বাবু ওপরের ঘরে বসে কথা কইছেন।' সে আরো কি বলতে যাচ্ছিল, এমন সময় অমলবাবুকে আসতে দেখে তাড়াতাড়ি কথাটা চাপা দিয়ে বল্লাম, 'যা দুখুয়া, আগে দুকপ্ চা এনে দে দেখি।'

অমলবাবু ঘরে ঢুকতে ঢুকতে আপন মনে বল্লেন, 'এইবার ঠ্যালা সামলাও সব, বাবু ও সব ছেড়ে চল্ল।' আমি বল্লাম, 'কি হ'য়েছে অমলবাবু, ব্যাপার কি?'

'এই যে প্রমথবাবু, এই দুখুয়া মশায় যোগেশবাবুকে তাড়ালে।'

'কি রকম?'

'আর মশায়, তেতলার শোবার ঘরখানি যেন একটি museum বিশেষ ক'রে তুলেছে। কোথাও একখানি ছেঁড়া কাপড়, কোথাও একটু চুলের দড়ি, কসমেটিকের stickটা, হেজলীনের খালি শিশি, এইসব দুখুয়া জোগাড় ক'রে আলমারী ছেয়ে ফেলেছে, আর বাবুও তেমনি, সব থাক্ থাক্—সাজান থাক। এখন বাবাজীকে দেখে বেটার ভয় লেগে গেছে। বলে, বাবু বৈরাগী হবে নাকি?'

'ব্যাপার যা গড়িয়েছে কিছুই আশ্চর্য্য নয়।'

দুখুয়া চা নিয়ে এলো। আমরা দুজনে দুকপ্ চা খেয়ে উঠে পড়লাম। যাবার সময় ওপরের ঘরে উঁকি মেরে দেখি যোগেশবাবু দুটো আঙুলের মাঝখানে একটি crystal ball নিয়ে একদৃষ্টিতে দেখছেন আর স্বামীজি সামনে চক্ষু বুজে চুপ ক'রে বসে আছেন।

আমার প্রাণটা অভিমানে ভ'রে গেল। আমরা এলাম, তিনি একবার ফিরেও তাকালেন না।

পাঁচ ছ'দিন আর যোগেশবাবুর বাড়ী যাইনি। বৈঠকখানা ঘরে আবার পুরোদমে লেখা পড়া নিয়ে লেগে গেলাম। অনেক বই ঘেঁটে সেদিন বিকেল বেলা একটা প্রবন্ধ লিখে খাড়া ক'রেছি, এমন সময় বাইরের দরজার কড়া খট্ খট্ ক'রে ন'ড়ে উঠল। তাড়াতাড়ি গিয়ে দোর খুলে দেখি দুখুয়া, কেঁদে কেঁদে তার চোকগুলো ফুলে গেছে। ধরা গলায় বল্লে, 'বাবু আপনাকে ডাকছেন। আজ রাত্তিরের ডাক-গাড়ীতে তিনি পশ্চিম যাবেন।'

একবার মনে করলাম যাব না, হয়ত' কি কথা ব'লতে কি ব'লে ফেলব, আবার ভাবলাম যাই না দেখেই আসি। গায়ে ওভার-কোটটা ফেলে জুতোটা পায়ে দিয়ে যোগেশ-

বাবুর বাড়ীতে এসে দেখি তিনি গেরুয়া রঙের একটা ঢিলে জামা প'রে চেয়ারের ওপর চুপ ক'রে বসে আছেন, সামনে একটা ছোট চামড়ার ব্যাগ। আমি নমস্কার ক'রে বসতেই তিনি গম্ভীর গলায় বল্লেন, 'সকলের সঙ্গেই দেখা ক'রেছি শুধু তোমার সঙ্গে দেখা হয়নি। তোমার বোধ হয় আমার ওপর অভিমান হ'য়েছে - তা হ'বারই কথা। এইবার বেরিয়ে পড়ছি। এক সঙ্গে এতদিন ছিলাম, বড় ভাল লাগত, কিন্তু এখন দূরে যাচ্ছি আরো অভিমান বাড়বে, প্রাণটা হায় হায় ক'রে উঠবে। সত্যিই তুমি আমায় ভালবাস। এত অভিমান!'

যোগেশবাবু জানলার ফাঁক দিয়ে বাইরের দিকে অভিভূতের মত চেয়ে থেকে আবার আপন মনে ব'লতে আরম্ভ করলেন—'আজ চারদিন ধ'রে যতদূর দৃষ্টি যায় চেয়ে দেখলাম সবটাই অর্দ্ধ চেতন! একটা বিরাট কম্পনে কেবল থেকে থেকে কেঁপে উঠছে—অবোধ জাগতে চায় না!'

হঠাৎ তিনি আমার ওপর স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে বল্লেন, 'প্রমথ, ছুটে একদিকে বেরিয়ে পড়া বড় মজা। -নয়?'

আমি সে কথার কোন জবাব না দিয়ে বল্লাম, 'এই বাড়ী ঘর, জিনিষপত্তর এ সবের কি ব্যবস্থা ক'রে গেলেন?'

'সব সেবাশ্রমে দান ক'রে দিয়েছি। শুধু এই ব্যাগটী আর এর ভেতরের জিনিষগুলো কাউকে দিতে পারব না। ঐ আমার সাথী।'

আমি আবার বলে ফেল্লাম, 'দুখুয়া—'

যোগেশবাবু আমার দিকে চেয়ে একটু করুণ সুরেই বল্লেন, 'তাকে কিছু টাকা দিয়ে বলে দিয়েছি দেশে গিয়ে কোন ব্যবসা ক'রে খেতে,আর যেন কারুর চাকরী না করে।' যোগেশবাবুর চোকের কোণে জল জমে এলো। বোধ হয় তাঁর এতদিনের বাঁধন ছিঁড়তে বড় কষ্ট হচ্ছিল।

আমি চুপ ক'রে বসে রইলাম। মিনিটের পর মিনিট ডিঙিয়ে ঘড়ির কাঁটা টিক্ টিক্ ক'রে চ'লতে লাগল। এমন সময় স্বামীজি আমাদের এই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ ক'রে ঘরের ভেতর ঢুকে বল্লেন, 'যোগেশবাবু আমাদের সময় হ'য়েছে, এইবার বেরিয়ে প'ড়তে হবে।'

যোগেশবাবু আমার দিকে আর একবার ফিরেও তাকালেন না, ব্যাগটি হাতে করে স্বামীজির পেছন পেছন বেরিয়ে পড়লেন। স্বামীজি যাবার সময় আমার দিকে চেয়ে একটু হাসলেন, সে হাসি শুধু তিনিই হাসতে পারেন, আর কেউ না।

আমি সঙ্গে সঙ্গে বাইরে এসে তাঁদের দিকে চেয়ে রইলাম। দু'জনের গেরুয়া রঙের লম্বা ঢিলে জামা আর মস্ত পাগড়ী। অন্ধকারের সঙ্গে কোলাকুলি ক'রতে ক'রতে যেন নিজেকেও তার ভেতর হারিয়ে ফেল্লে।

আমি তাড়াতাড়ি বৈঠকখানা ঘরে ঢুকে যে প্রবন্ধটা লিখেছিলাম সেটাকে টুকরো টুকরো ক'রে ছিঁড়ে ফেলে বিছানার ওপর শুয়ে পড়লাম।

শিশু ও প্রকৃতি

[শ্রীদ্বিজপদ মুখোপাধ্যায় বি-এ]

(১)

সিত শতদল শুভ্রাঞ্চল ভরি'
বকুল-শেফালি-যূথী শত জড় করি',
গাঁথিছে মালিকা অমল হস্ত দিয়া,
নাচিছে আবেগে পুলক-ত্রস্ত হিয়া।

(২)

ঐ দেখা যায় বাঁকা নদীটির ধারে,
ফাগুন সোহাগী বন বীথিকার আড়ে,
প্রকৃতি-দুলাল স্বপন কুহকে ভুলে,
অমল স্বজে কুসুম দিতেছে তুলে।

(৩)

একটার পরে একটা করিয়া ফুল,
সাজান তাহার কখন হ'তেছে ভুল,
মালিকা হইতে কেহবা পড়িছে ঝরি'
কোমল ধবল সিকতা আসনোপরি।

(৪)

চূত শাখা ঢাকা পাপিয়ার মধু গানে,
চটুল দৃষ্টি মালা হ'তে খুলে আনে ;
কভু বা অদূর বেতস কুঞ্জ হ'তে,
শন্ শন্ গীতি প্রবেশে কর্ণ পথে।

(৫)

প্রকৃতির সেই মধুর সৃষ্টি মাঝে,
ব্যস্ত বালক কে জানে কাহার কাজে ;
কাহার লাগিয়া কেন ওই মালা গাঁথা,
পলক বিহীন চপল আঁখির পাতা।

(৬)

বুঝি সুনিপুণ শিল্পী বসেছে আজি,
গাঁথিতে ধরার শ্রেষ্ঠ সুষমা রাজি ;
জানে না শিল্পী কার লাগি এত শ্রম,
লক্ষ্য বিহীন একি এ বিশাল ভ্রম!

(৭)

হলো মালা গাঁথা উঠিল বালক ধীরে,
বন্য লতায় কুসুমিত তরু শিরে,
জড় দেহে মালা জড়ায়ে দেখিল কত,
তৃপ্ত নয়নে চিত্র পুত্তলী মত।

(৮)

কভু সে মালিকা পরিল আপন গলে,
প্রকৃতির সনে বিনিময় পলে-পলে ;—
হ'ল যে কেমন জানে তারা জানে ভালো
উভয়ে উভয়ে বাসে যে এমনি ভালো!

(৯)

নিভৃতের সেই নীরব নিবিড় দেখা,
কুসুম-আঁখরে মালায় রহিল লেখা,
বুঝেনিতো কেউ সেই সে মালাটী তার,
রাখিবে এমন চিহ্ন সকল তার।

(১০)

মৃদু নদীস্রোতে গোধূলি লগনে ভাসি'
ক্রীড়ার অন্তে যায় গাঁথা ফুল রাশি,
দিন যায় ওই হয়ে এল রবি ক্ষীণ,
রক্ত অশোক আঁধারেতে রূপহীন।

(১১)

চাহি—চাহি—চাহি সুদূর স্রোতের টানে,
ফিরিল বালক আপনার গৃহপানে ;
চলিল তবুও কোথা নদীস্রোতে ভাসি'
মিলনের সেই সুমধুর স্মৃতিরাশি ?

মধুমক্ষিকা-সমবায়।

[শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত]

দেহতত্ত্ব।

বলিয়াছি, সকল ষট্‌পদের দেহের মত মৌমাছির দেহ তিন ভাগে বিভক্ত—মুণ্ড, বক্ষ ও উদর। কিন্তু এই এক একটি অঙ্গের মধ্যে এত বিভিন্ন প্রত্যঙ্গ আছে এবং তাহাদের নির্ম্মাণ-কৌশল এত চিত্তাকর্ষক যে, কীট-তত্ত্ববিদ্‌গণ তাহাদের কার্য্য-কলাপ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন। মোটের উপর এটুকু বুঝিতে পারি যে, "যেদিকে জল পড়ে" সেই দিকে ছাতা ধরিবার ব্যবস্থা যে কেবল আমাদের, তাহা নহে। শ্রীবিষ্ণুর সৃষ্টি পালন কর্ম্মের নিয়মও তাহাই। হিংসা না করিলে সিংহ মহাশয় মাংস পান না বলিয়াই তাহার মনের মধ্যে ভগবান হিংসা-বৃত্তি দিয়াছেন, একটা ভীষণ মুখ দিয়াছেন—তীক্ষ্ণ দন্ত, দৃঢ়

চোয়াল, জ্বলন্ত চক্ষু তাহাতে সম্মোহনের শক্তি। ছুটিয়া পলাইতে অসুবিধা হইবে বলিয়া তাহার নখগুলা সাধারণতঃ পায়ের আঙ্গুলের মধ্যে লুক্কায়িত থাকে, কিন্তু ক্ষিপ্র মৃগকে ধরিয়া রাখিবার সময় থাবার ভিতর হইতে নখ বাহির হয় —যেমন তীক্ষ্ণ তেমনি দৃঢ় আর তেমনি কুটিল। আবার "চম্পটে পরিপাটি" না হইলে জীবন-সংগ্রামে মৃগ জাতির উচ্ছেদ নিঃসন্দেহ, তাই বিধির বিধানে তাহারা ক্ষিপ্রপদ। অবশ্য আধুনিক বিজ্ঞান এরূপ ব্যবস্থার কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছে। জীবজন্তু কীটপতঙ্গের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের অভিব্যক্তি হইয়াছে তাহাদের পারিপার্শ্বিক অবস্থার ঘাত-প্রতিঘাতে।

মৌমাছির দেহতত্ত্ব আলোচনা করিলেও এই সত্য উপলব্ধি করিতে পারা যায়। সমবায়ের হিতের জন্য যে সকল কার্য্য প্রত্যেক মধুমক্ষিকাকে সম্পাদন করিতে হয় তাহা তাহাদের মত ক্ষীণ-অঙ্গ হীন-শক্তি ষট্‌পদের দ্বারা সাধিত হইত না যদি তাহাদের ঐ ক্ষুদ্র দেহে অশেষ প্রকার কল-কারখানা না থাকিত। মধুমক্ষিকা শক্তির অপচয় করে না। সে যাহা কিছু করে নিজ নিজ সঙ্ঘের হিতের জন্য। আমার মনে হয় যে, মক্ষি-তাত্ত্বিকেরা মৌমাছির সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ক্রিয়াকলাপ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করিতে সমর্থ হইয়াছেন এই সত্যের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া। আবার তাহাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বিশেষত্ব দেখিয়াই অনুসন্ধিৎসু মানব প্রকৃতি তাহাদের দ্বারা কি বিশেষ কার্য্য সম্পাদিত হইতে পারে তাহার গবেষণায় প্রবৃত্ত হইয়া মধুমক্ষিকা সমবায়ের দৈনিক কর্ত্তব্যের সমাচার লাভ করিয়াছে। মোটের উপর মৌমাছির প্রত্যেক অঙ্গের এক একটা নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য আছে এবং প্রত্যেক অঙ্গটার গঠনও সেই কর্ত্তব্যের উপযোগী।

মৌমাছির মুণ্ড।

চাকের পুরুষ, রাণি ও কর্ম্মী তিন রকম মৌমাছিরই মুণ্ডের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সমান। তবে কর্ম্মীর জিহ্বা বড়, পুরুষের চক্ষু বড়। একটা পায়রা মটর দ্বিখণ্ড করিলে যেমন দেখিতে হয়, আমাদের দেশের সাধারণ মৌমাছির মুণ্ডের আকৃতি তদনুরূপ। কিন্তু এই ক্ষুদ্র গোলকের শিল্প-চাতুর্য্য পর্য্যালোচনা করিলে বিস্মিত হইতে হয়। তাহাদের মুণ্ড নিম্নলিখিত অঙ্গ কয়েকটিতে বিভক্ত। আমি এস্থলে তাহাদের সামান্য পরিচয় দিব।

১। মস্তিষ্ক।
২। চক্ষু।
৩। শুণ্ড।
৪। চোয়াল।
৫। জিহ্বা।

১ মস্তিষ্ক—বলা বাহুল্য যে, আমাদের বাহ্য জগতের সহিত পরিচয়ের এবং আমাদের অন্তর্জ্জগতের ভাবে বহির্জ্জগৎকে পরিবর্ত্তন করিবার প্রধান অঙ্গ মস্তিষ্ক। কথাটা আরও খুলিয়া বলি, আমাদের চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়, রূপ শব্দ গন্ধ রস ও স্পর্শ উপলব্ধি করিতে পারে। কিন্তু তাহারা আপন আপন কর্ম্মের ফল জ্ঞানের বিষয়ীভূত করিতে পারে না, যে অবধি না মস্তিষ্ক তাহাদের কার্য্যের হিসাব লইয়া সেগুলিকে মনের সম্মুখে রক্ষা করে। চক্ষুর সম্মুখে শিশির-স্নাত গোলাপফুল পড়িলে চক্ষের পিছনে যে সকল স্নায়ু আছে তাহারা বিজলির তারের মত সেই গোলাপের রূপের সংবাদ ঘাড়ে করিয়া বহিয়া মস্তিষ্কে লইয়া যায়। খুব একটা অজ্ঞাত রহস্যময় প্রক্রিয়ার দ্বারা মস্তিষ্ক চক্ষুর সেই কর্ম্মের ফলটুকু মনের দপ্তরে পেশ করে।

মন তখন শিশিরসিক্ত গোলাপের রূপ ধারণা করিতে পারে। ধারণা করিয়া যদি বাসনা করে যে গোলাপকে বৃন্তচ্যুত করিয়া তাহার ঘ্রাণ লইবে, তখন আবার সেই রহস্য ঘেরা উপায়ে মন সেই আজ্ঞাটুকু মস্তিষ্কে জারি করে এবং মস্তিষ্ক ও আজ্ঞাকারী স্নায়ুদিগের উপর সেই আজ্ঞা পালন করিবার ভার অর্পণ করে। তখন কার্য্যকরী স্নায়ু-গুলা অশেষ প্রকারে মাংসপেশী সকলকে টান মারিয়া সঙ্কুচিত করিয়া বা প্রসার করিয়া গোলাপ ফুলকে বৃন্তচ্যুত করে। মস্তিষ্ক না থাকিলে কর্ম্মেন্দ্রিয় জড়তা প্রাপ্ত হয়। মস্তিষ্ক নাই বলিয়াই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কথায়—পুত্তলিকার চক্ষু আছে দেখিতে পায় না, কর্ণ আছে শুনিতে পায় না।

জীবের জীবন ধারণ করিবার জন্য নানারূপ বাহ্য

জগতের অনুভূতির আবশ্যক হয়, নানারূপ কার্য্য না করিলে জীবন-সংগ্রামে তাহার মরণ অবশ্যম্ভাবী। মধুমক্ষিকা বড় শিল্পনিপুণ, সে সমাজ বাঁধিয়া সঙ্ঘ গড়িয়া স্বজাতির সহিত এক উদ্দেশ্যে কার্য্য করে, দুধারে তাহার যে স্নায়ু আছে স্নায়ুর দ্বারা সে বাহ্য জগতের রূপ রস শব্দ গন্ধ স্পর্শের তথ্য গ্রহণ করে। মস্তিষ্কের সাহায্যে তাহার অনুভূতি হয়। তাহা সহজেই অনুমেয়। আমাদের মত বাহ্য জগতের সহিত তাহাদের পরিচয় হয় মস্তিষ্কের দ্বারা, তবে বাহ্য জগতের সহিত নিউটন বা এডিসনের পরিচয় ও ক্ষুদ্র মৌমাছির পরিচয়ে খুব বেশী পার্থক্য আছে। বাহ্য প্রকৃতির ভাণ্ডার গৃহ হইতে মৌমাছিকে সুধা লুটিয়া খাইতে হয়, তাহার সমবায়ের ইষ্টের জন্য তাহাকে অনেক শত্রুর সহিত যুঝিতে হয়, সন্তান পালন করিতে হয়, এবং দুর্দ্দিনের জন্য আহার্য্য সংগ্রহ করিয়া তাহা ভারে ভারে মৌচাকের ভাণ্ডার গৃহে সঞ্চয় করিয়া রাখিতে হয়। সুতরাং মৌমাছির মস্তিষ্ককে ক্রিয়াশীল স্নায়ুর উপরও আধিপত্য করিতে হয়। মনুষ্য, শার্দ্দূল বা হস্তীর তুলনায় মৌমাছিকে অতি অল্পই কার্য্য করিতে হয় বটে, কিন্তু বিপুলকায় জীবের মস্তিষ্কের পরিমাণ ও তাহাদের কার্য্যকরী শক্তির পরিমাণ আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, তুলনায় মৌমাছি বা পিপীলিকার স্নায়ুনিচয় এবং তাহাদের ক্ষুদ্র মস্তিষ্ককে অপেক্ষাকৃত অত্যন্ত অধিক কার্য্য করিতে হয়। যাঁহারা বলেন প্রশস্ত ললাট বা বৃহৎ মস্তিষ্ক অধিক বুদ্ধি বা শ্রম-শক্তির পরিচায়ক, তাঁহারা এ বিষয় একটু চিন্তা করিলেই আপনাদের ধারণার ভ্রম বুঝিতে পারিবেন।

আমাদের কার্য্যকরী স্নায়ুগুলা মেরুদণ্ডের ভিতর গিয়া জোট বাঁধে, তাহার পর তাহারা মস্তিষ্কে প্রবেশ করে। মৌমাছিরও ক্রিয়াশীল স্নায়ুগুলা পিঠের ভিতর জোট বাঁধিয়া মস্তিষ্কে প্রবেশ করে। বলা বাহুল্য, সে জোট এত ক্ষুদ্র যে অত্যন্ত শক্তিশালী অনুবীক্ষণের সাহায্যেও তাহাদিগের স্পষ্টরূপে দর্শনলাভ করা যায় না। কিন্তু এই গ্রন্থিগুলাকেও মস্তিষ্কের অংশ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। অবশ্য ইহাদের দ্বারা বাহ্য প্রকৃতির জ্ঞান উপলব্ধি হয় কি না সে প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কঠিন। আমার বিশ্বাস তাহাদের সে শক্তি আছে কারণ মৌমাছির মাথা কাটিয়া ফেলিলে সে দেহ সংকোচ ও সম্প্রসারণ করিতে পারে, এবং সেই অবস্থায় তাহাদিগকে স্পর্শ করিয়া এবং অগ্নির উত্তাপ দিয়া দেখিয়াছি যে, তাহারা আমার ও অগ্নিদেবের নিষ্ঠুর স্পর্শ উপলব্ধি করিয়া দেহের নানাপ্রকার সংকোচ ও প্রসারণ করিয়াছে। অবশ্য মুণ্ডের সহিত দর্শনেন্দ্রিয় প্রভৃতি যে সকল ইন্দ্রিয় থাকে, শির-হীন মধুমক্ষিকার সে সকল শক্তি বর্জ্জিত হয়। কিন্তু তাহাদের শিরচ্ছেদের পরও সে ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইতে পারে। আবার পেট কাটিয়া দিয়া দেখা গিয়াছে যে মৌমাছি আত্মহারা হইয়া মধুপান করিতেছে এবং তাহার ছিন্ন বক্ষ হইতে মধু গড়াইয়া পড়িতেছে।

বহির্ম্মুখী বা ক্রিয়াশীল স্নায়ু গ্রন্থির অদ্ভুত ক্রিয়ার পরিচয় আমরা বাল্যকালে পাই টিকটিকির লাঙ্গুল কাটিয়া দিয়া। তাহার শরীর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াও টিকটিকির লেজ নানা প্রকার কার্য্য করে। আমি পুরুভুজ দেখি নাই। শুনিয়াছি তাহাদের খণ্ড খণ্ড করিলে প্রত্যেক খণ্ড এক একটি পূর্ণ-শক্তি পুরুভুজে পরিণত হয়। এ রহস্যের মূলেও ঐ শক্তি-কেন্দ্রের স্বাতন্ত্র্য। আমাদের যোগ শাস্ত্র ও তন্ত্র শাস্ত্রের ষট্‌চক্র ভেদের রহস্যের সহিত অনেকে এই শক্তি-কেন্দ্রের সংশ্রবের কথা বলিয়া থাকেন।

মধুমক্ষিকার শীতোষ্ণের অনুভূতি যথেষ্ট আছে। সে শীতে কাতর হয়, তাই শীতপ্রধান দেশে শীতকালে মৌমাছি মক্ষিশালা ছাড়িয়া বাহির হইতে পারে না, মক্ষিগৃহে আবদ্ধ থাকিয়া সঞ্চিত মধুপান করিয়া পুষ্ট হয়। গ্রীষ্মে ইহাদের আনন্দ। উষার আলোকে পাতলা চামড়ার ডানা মেলিয়া এক ফুলের বক্ষ হইতে অপর ফুলের বক্ষে উড়িয়া যাইতে মৌমাছির আনন্দ অপার। আমাদের দেশের মৌমাছির বিরক্তি বর্ষায়। যখন প্রাবৃটের নীরদমালায় বাঙ্গালার আকাশ ঘনঘটাচ্ছন্ন হয়, তখন মৌমাছি চাক হইতে বাহির হয় না, তখন সে পূর্ব্ব-শ্রম লব্ধ মধু পান করিয়া দেহ ধারণ করে, সমবায়ে দুর্ভিক্ষ নিরাকরণের জন্য নিষ্কর্ম্মা পুরুষগুলাকে গলা টিপিয়া হত্যা করে। বৃষ্টির সম্ভাবনা আছে কি না সে কথা মৌমাছি খুব বুঝিতে পারে। যদি চাক ছাড়িয়া মৌমাছি বহুদূর চলিয়া যায় তাহা হইলে

মেঘ-ডম্বুরে পৃথিবী ফাটিয়া যাউক আর নীরেন্দ্র-প্রতিম নীরদমালায় দিক ছাইয়া যাউক—দীর্ঘকাল বৃষ্টি হইবে না সে কথা নিঃসন্দেহ। আর যদি কর্ম্মী মাছি কাজে বাহির না হইয়া থাকে, বসিয়া ভ্যান ভ্যান করে, তাহা হইলে মার্ত্তণ্ডদেব অগ্নি বরিষণ করিয়া পৃথিবী ঝলসাইয়া দিলেও বুঝিতে হইবে গগনের কোন্ কোণে কোথায় এক টুকরা মেঘ হইয়াছে, সে অচিরে দিগ্দেশ ছাইয়া ফেলিবে, বারি বরিষণ করিয়া তপ্ত তৃষিত ধরিত্রীকে তৃপ্ত করিবে।

২। চক্ষু—অবশ্য মৌমাছির খঞ্জনে পাখি বা পুঁটী মাছ বা চেরা পটলের মত চক্ষু নাই কিন্তু তাহার সমবায়ের হিতের জন্য মৌমাছিকে যে দর্শনেন্দ্রিয়কে প্রভূত পরিমাণে পরিচালনা করিতে হয় তাহা নিঃসন্দেহ। এ বিষয়েও হারাহারি তুলনা করিলে মনুষ্য প্রভৃতিং পরাজয় হয়। মৌমাছির চক্ষের কার্য্য অত্যন্ত অধিক বলিয়া বিশ্বপিতা তাহাকে পাঁচটি চক্ষু দান করিয়াছেন। অবশ্য বিজ্ঞানের ভাষায় বলিতে গেলে বলিতে হইবে যে, পারিপার্শ্বিক অবস্থার ঘাত-প্রতিঘাতে জীবন সংগ্রামে কৃতিত্ব লাভ করিবার জন্য মৌমাছির পাঁচটি চক্ষুর অভিব্যক্তি হইয়াছে। যাহা হউক, সেই মাছির দৃষ্টিশক্তি যে খুব প্রখর তাহা নিঃসন্দেহ। নিজের চাক হইতে অন্ততঃ এক ক্রোশের মধ্যে যত পুষ্প আছে—সকলগুলির তালিকা মৌমাছিকে স্মরণ করিয়া রাখিতে হয়, এবং তাহাকে প্রত্যহ ঝোঁপে ঝাঁপে, মঞ্চে মালঞ্চে, গাছে গাছে ঘুরিয়া মধু-লাভ করিতে হয়, রেণু লুটিতে হয়। তাহার পর পথ চিনিয়া অন্য চাকে নিজের পরিশ্রম-লব্ধ মধু না রাখিয়া আপনার চাকে ফিরিতে হয়। অবশ্য এ সকল কার্য্য প্রখর দৃষ্টি শক্তি না থাকিলে সম্পন্ন করা যায় না। অনেকের মনে ধারণা ছিল যে, পুষ্পের কেবল ঘ্রাণেই আকৃষ্ট হইয়া মৌমাছি ফুলের ভাণ্ডার-গৃহ লুটিতে পারে। ইহাদের ঘ্রাণশক্তিই বড়, দৃষ্টিশক্তি ছোট। ইহাদের উভয় শক্তিই যে মধু আহরণে সাহায্য করে তাহাতে সন্দেহ নাই। তবে ইহাদের দৃষ্টিশক্তি যে বড় তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় মৌমাছির বর্ণের উপর পক্ষপাতিত্বে।

বিভিন্ন বর্ণের জ্ঞান যে মৌমাছির আছে এবং শাদা ফুলের গন্ধ অধিক হইলেও তাহারা নীল বর্ণের পক্ষপাতী এ সত্য আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং পরীক্ষার দ্বারা স্থিরীকৃতও হইয়াছে। বোনিয়ে (Bonnier) নামক একজন ফরাসী মক্ষিতাত্ত্বিক প্রথমে সে কথা অস্বীকার করিয়াছিলেন ! কিন্তু সার জন্ লাবক (লর্ড আভেবেরী) প্রভৃতি মনীষি অক্লান্ত পরিশ্রম ও প্রভূত বিচক্ষণতার সহিত পর্য্যবেক্ষণ করিয়া এ বিষয় স্থির করিয়াছেন। লাবকের মত পরীক্ষা অনেকেই করিয়াছেন এবং আপনারাও করিতে পারেন। নানা বর্ণের কাগজের টুকরায় এক এক ফোঁটা মধু রাখিয়া লাবক সাহেব সে স্থলে দুই চারিটি মৌমাছি ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। সকল বর্ণের কাগজ ছাড়িয়া মৌমাছি নীল কাগজের উপরই প্রথমে বসে এবং নীলের মধু নিঃশেষ করিয়া তবে অন্য বর্ণের কাগজের মধুপান করে। পুনঃপুনঃ এই পরীক্ষা করিয়া তবে লাবক সাহেব সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যে নীল বর্ণ মক্ষি-প্রিয়। এই পরীক্ষার দ্বারা লাবক সাহেব তাহাদের আর একটা মানসিক বৃত্তির পরিচয় পাইয়াছিলেন—তাহাদের স্মৃতিশক্তি। কেবল এ পরীক্ষার দ্বারাই বা কেন—তাহাদের দৈনন্দিন ক্রিয়াকলাপ পর্য্যবেক্ষণ করিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, মৌমাছির স্মরণশক্তি নিন্দনীয় নয়। নীলের মধু নিঃশেষ করিয়া সঞ্চয়ী মধু-মক্ষিকা যখন তাহার নিজের ভাণ্ডার-গৃহে রাখিতে গিয়াছিল তখন লাবক সাহেব নীল কাগজ খণ্ড উঠাইয়া লইয়া তাহার স্থলে অন্য বর্ণের কাগজ রাখিয়া দিয়াছিলেন। নীল কাগজখানা স্থানান্তরিত করিয়া একটু দূরে রাখিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার মৌমাছি-অতিথি স্মৃতির বলে প্রথমে সেই স্থলেই প্রত্যাবর্ত্তন করিল, কিন্তু নীল কাগজ না দেখিয়া লাবক সাহেবের রসিকতায় একটু বিরক্ত হইয়া শেষে নীল কাগজখানি খুঁজিয়া বাহির করিল। তখন নীলের মধু তৃপ্তির সহিত পান করিয়া সে সন্তুষ্ট।

শুনিয়াছি কাশ্মীরে পদ্ম মধু পাওয়া যায়, তাহার কারণ কাশ্মীরে নীল পদ্মের আধিক্য। একথা কতদূর সত্য তাহা আমি বলিতে পারি না। তবে প্রচুর পরিমাণে মধু পাইলে জীবের সকল পক্ষপাতিত্ব তিরোহিত হয় —একথা মনুষ্য-সমাজে তথা মক্ষিকা-সমাজে সত্য। সিমলা

পাহাড়ে খুব বড় বড় গাছে বড় বড় লাল ফুল হয়। তাহাদের নাম বরাস ফুল—rhododendron. প্রত্যেক ফুলের তলায় অনেকটা করিয়া মধু থাকে; দাঁতে করিয়া ফুলের তলাটি কাটিলেই তাহা বুঝিতে পারা যায়। এ প্রদেশে বরাস ফুলে মধু থাকে বলিয়া লালবর্ণ মৌমাছির প্রিয়। তাই আবার লাল ডালিয়া, লাল গোলাপ, লাল মরসুমি ফুল মাত্রেই মৌমাছির ভিড়। তবে বরাস ফুলের মত মধুময় বড় নীল ফুল তাহাদের সহিত এক পাহাড়ের গায়ে জন্মাইলে বোধ হয় মৌমাছিরা সেই সকল ফুলেই জোট বাঁধিত।

মৌমাছিদের যে দিক্‌জ্ঞান আছে তাহা বোধ হয় এস্থলে বলিলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। কারণ মক্ষিকারা বহুদূর ঘুরিয়া নিজের বাসস্থানে ফিরিয়া যায় নিজের দৃষ্টিশক্তির জোরে। মৌমাছির সহজে দিক্‌ভ্রম হয় না, একথা প্রমাণ করিবার জন্য প্রসিদ্ধ মক্ষিতাত্ত্বিক মুসো ফাবর (Fabre) কয়েকটি বড় মজার পরীক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি নিজের মক্ষিশালা হইতে কতকগুলি মৌমাছি ধরিয়া একটি থলিতে ভরিয়াছিলেন। সেই থলি লইয়া প্রায় এক মাইল দূরে এক চৌমাথার মোড়ে আসিয়া থলিটিকে খুব ঘুরাইতে লাগিলেন। উদ্দেশ্য যে মৌমাছিগুলার দিক্‌ভ্রম হয়। কৃষক রমণীরা জানিত ফাবর খুব পণ্ডিত, সুতরাং তাহাদের মনে কিছুমাত্র সন্দেহ রহিল না যে, অধ্যাপক মহাশয় ভূত ঝাড়িতেছেন বা কোনও অপদেবতাকে তুষ্ট করিতেছেন। তাহার পর আবার মাইলটাক দূরে গিয়া অধ্যাপক ঐরূপে থলি ঘুরাইয়া মৌমাছিগুলিকে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। তাহারা প্রায় সবাই গৃহে ফিরিতে সমর্থ হইয়াছিল।

মক্ষিকার যে দিক্‌জ্ঞান আছে, এখন তাহা সর্ব্ববাদি-সম্মতিক্রমে সিদ্ধ। আর আমাদের সহজ জ্ঞানেও একথা বুঝিতে পারা যায়। মৌমাছির দিক্‌জ্ঞান না থাকিলে তাহাদের পক্ষে চাকের কার্য্য করা অসম্ভব হইত।

ক্রমশঃ।

চাঁদপ্রতাপের ব্রত-কথা।

[শ্রীযোগেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী]

(৫) অরণ্য ষষ্ঠী।

জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লপক্ষে এই ব্রত করা হয়। সন্তান সন্ততির মঙ্গল মানসে হিন্দু মহিলাগণ অরণ্য ষষ্ঠী ব্রত করিয়া থাকেন। ব্রতের দিন প্রাতঃকালে কিংবা তৎপূর্ব্ব দিবস তেষট্টিটি বাঁশের 'কক্কল' (মধ্যস্থিত নবোন্নত বংশ পত্র), উক্ত সংখ্যক দুর্ব্বা সংগ্রহ করিয়া ও একত্রিত করিয়া কলার 'ফেতরা' (কলাগাছের খোলার কিনারার ফিতার ন্যায় অংশ) দিয়া কতকটা অংশ পেঁছাইয়া মোঠা (গুচ্ছ) বাঁধিতে হয়। কয়েকটা আমন ধান ও একজোড়া করঞ্জা ন্যাকড়ার পুটুলিতে উহার সঙ্গে বাঁধিয়া দিতে হয়। ব্রতিনীদের প্রত্যেকেরই একটি করিয়া মোঠা লাগে। ব্রতের দিন সকাল বেলায় প্রত্যেক ব্রতিনী একখানি পাখা, একটি করিয়া পাকা আম ও কলা, একটি সুপারি, একটি পান * ও উক্ত 'মোঠা' লইয়া নদীতে কিংবা পুষ্করিণীতে যাইয়া, অবগাহন স্নান করিয়া, উক্ত জিনিষগুলি সহ পাখার জল-ধারা নাভিদেশে ষাটিবার (৬০) দিয়া হুলুধ্বনি করিতে করিতে বাড়ী ফিরিয়া আইসেন ও বাড়ীর সকলকে, 'ষাট ষাট' বলিয়া উক্ত পাখার বাতাস দিয়া থাকেন। স্নানের পূর্ব্বেই জনৈকা ব্রতিনী মাটি দিয়া ষষ্ঠী ঠাকুরাণীর মূর্ত্তি গড়িয়া কাষ্ঠাসনে স্থাপন করিয়া রাখেন। সাতটি ছেলে মেয়ে গড়িয়া প্রতিমার ক্রোড়ে দেওয়া হয়। প্রতিমার পদদ্বয় গোদের ন্যায় মোটা

* কোন কোন বাড়ীতে সুপারি ও পান লইবার প্রথা নাই।
—লেখক।

করিয়া তৈয়ার করা হয়। দেবীকে পীত বস্ত্র পরাইয়া দেওয়া হয় ও তাহার চরণপ্রান্তে কয়েক গাছি হরিদ্রা বর্ণের সূতা রাখা হয়। কোন কোন বাড়ীতে মূর্ত্তি গঠিত হয় না; একটি বটের ডাল উঠানে রোপন করা হয় ও তাহাতেই কাপড় ও সূতা দেওয়া হয়। কোন কোন বাড়ীতে উক্ত প্রোথিত ডালার সম্মুখে পুকুরের আকারে একটি ছোট গর্ত্ত খনন করা হয়।

স্নানান্তে পবিত্র ভাবে ললনাবৃন্দ পূজার আয়োজনে রত হন। প্রত্যেক ব্রতিনী সাতটি কাঁটাল পাতার প্রত্যেকটায় দুই তিন টুকরা আম, দুই এক রোয়া (কোষ) কাঁটাল, একটি কলা ও কয়েকটি আতপ চাউল পাথার উপর সাজাইয়া দিয়া থাকেন। কোন কোন গৃহে কাঁটাল পাতার পরিবর্ত্তে বটের পাতা ও আতপ চাউলের পরিবর্ত্তে কাওয়ানের (সরিষার ন্যায় ক্ষুদ্র পীতবর্ণ শস্য) চাউল দিবার নিয়ম আছে। উক্ত মোঠাটিও পাথার উপর রাখিতে হয়। কয়েকটি ধামায় (সাজিতে) একটা কাঁটাল, কয়েকটা আম ও কলা এবং একজোড়া কাপড় সাজাইয়া দেওয়া হয়, ইহার নাম 'বোঝা'। পূজা শেষে ব্রতিনীরা তাহাদের ছেলে ও জামাতাদিগকে আশীর্ব্বাদ পূর্ব্বক হুলুধ্বনি করিতে করিতে উহা তাহাদের মস্তকে স্পর্শ করাইয়া হাতে দিয়া থাকেন। যদি কোন কারণে ঐ সময় ছেলেদের কেহ অন্যত্র থাকে ও কোন জামাতা শ্বশুরালয়ে না আসিতে পারেন, তবে তাহাদের কাপড় রাখিয়া দেওয়া হয়। সময়ান্তরে উহা তাহাদিগকে দেওয়া হইয়া থাকে। কোন কোন ব্রতিনীকে 'বোঝা' দিতে দেখা যায় না। প্রতিমার চরণে কিঞ্চিৎ দধি ঢালিয়া দেওয়া হয়। ইহার নাম গোদের বীজ। যাহারা প্রতিমা গড়িয়া থাকেন, তাহাদের প্রায় সকলেরই গৃহাভ্যন্তরে পূজা হইয়া থাকে। নানাবিধ উপাদেয় ফল, মূল, দধি, দুগ্ধ, চিড়া, ছাতু, খৈ, মিষ্টান্ন প্রভৃতি খাদ্যোপকরণ, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, পুষ্প পত্র ইত্যাদি সাজাইয়া দেওয়া হয়। যথাসময়ে শাস্ত্রোক্ত বিধানানুসারে পুরোহিত দেবীর অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। পূজা শেষে ব্রতিনীরা হুলুধ্বনি করিয়া, দেবীকে প্রণাম করিয়া পুরোহিতকে প্রণাম করেন ও আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করেন। তৎপর 'কথা' শ্রবণ করিয়া, বাড়ীর ছেলে মেয়েদিগকে উক্ত 'মোঠার' ধান দূর্ব্বা দ্বারা আশীর্ব্বাদ করিয়া তাহাদের হাতে উক্ত সূতা বাঁধিয়া দেন। এই সূতার নাম 'ডোর'। উক্ত দিবস ব্রতিনীদিগকে দেবী-প্রসাদ চিপিটকাদি ভোজন করিতে হয়।

এই ব্রতে জামাতাদিগকে আহ্বান করা হয় বলিয়াই হয় ত ইহার নাম জামাই-ষষ্ঠী হইয়া থাকিবে। শাস্ত্রে ব্রতিনীদিগকে তালবৃন্ত এবং অন্যান্য দ্রব্যাদি সহ অরণ্যে যাইয়া দেবীকে পূজা ও তদুপাখ্যান শ্রবণ করিবার বিধি আছে। কিন্তু এতদঞ্চলে অরণ্যে যাইয়া ব্রত করিবার রীতি প্রচলিত নাই। এই ব্রতের দিন কুল ললনাগণ সন্তান-সন্ততিদিগের অন্যায় আবদার অম্লানচিত্তে প্রতিপালন করিয়া থাকেন এবং তাহাদিগকে কোন অপরাধের দরুণ শাস্তি ভোগ করিতে হয় না।

কথা।—এক ছিল গৃহস্থ। তাহার বৃদ্ধা মাতা পুত্র ও বধূসহ খুব ঘটা করিয়া অরণ্য-ষষ্ঠী ব্রত করিত। বধূটির ব্রত নিয়মাদিতে বিশ্বাস-ভক্তি ছিল না; সাংসারিক কাজ কর্ম্মে মোটেই উৎসাহ ছিল না; চর্ব্ব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয় খাদ্যাদি ভোজন-স্পৃহা তাহার অতি বলবতী ছিল। শাশুড়ী বধূর কোন ত্রুটীতেই অসন্তুষ্ট হইত না; একমাত্র পুত্রবধূ বলিয়া তাহাকে কন্যার চেয়েও আদর যত্ন করিত।

একদা ষষ্ঠী ব্রতের আয়োজন করিয়া বৃদ্ধা পুত্রবধূকে পূজার ঘরে বসাইয়া রাখিয়া অন্যত্র চলিয়া গেলে, বধূ খাদ্যোপকরণাদি দেখিয়া লোভ সামলাইতে না পারিয়া নৈবেদ্যাদির 'আগভোগ' (অগ্রভাগ) খাইয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। কিয়ৎকাল পর শাশুড়ী তথায় উপস্থিত হইয়া, উপকরণাদি প্রতি লক্ষ্য করিয়া বধূকে জিজ্ঞাসা করায় সে অম্লান বদনে বলিল যে, বিড়ালে 'আগভোগ' খাইয়াছে। শাশুড়ীর চিত্ত সরল, বধূর কথায় তাহার অবিশ্বাস জন্মিল না। বধূটি বিড়ালের ঘাড়ে দোষ চাপাইয়া শশ্রূর চির আদরের পাত্রীই রহিয়া গেল; কিন্তু ষষ্ঠী ঠাকুরাণীর কিছুই অলক্ষ্য রহিল না।

কালক্রমে বৃদ্ধা ইহলীলা সংবরণ করিল। গৃহস্থের স্ত্রীকে বাধ্য হইয়া সংসারের যাবতীয় কাজকর্ম্ম করিতে

হইত। একে বধূটি অলস, তাহাতে আবার গর্ভবতী। ঘর-কন্নায় তাহার ক্লেশের সীমা ছিল না।

যথা সময়ে বধূটির একটি পুত্র সন্তান জন্মিল। ষষ্ঠী-ঠাকুরাণী এত দিনে তাহার পাপের শাস্তি দিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি মায়ায় ভুলাইয়া সন্তানটিকে মাতার ক্রোড়চ্যুত করিয়া লইয়া গেলেন। এইরূপে আরও ছয়টি সুসন্তান ষষ্ঠীদেবী তাহার অঙ্কচ্যুত করিয়া লইয়া গেলেন। একাদিক্রমে সাতটি সন্তান প্রসব করিয়া সাতটিকে হারাইয়া বধূ শান্তিশূন্য জীবন-ভার বহন করিতে লাগিল। অশান্তি শেলের দারুণ আঘাতে তাহার চিত্ত প্রতিনিয়ত ক্ষত বিক্ষত হইতে লাগিল।

এইরূপে অনেক কাল অতিবাহিত হইল। পুত্র-শোকাতুরা জননী প্রায়শঃই বাড়ীর নিকটস্থ বনে যাইয়া বসিয়া বসিয়া কাঁদিয়া চক্ষের জলে বুক ভাসাইত। এক-দিন সে দেখিতে পাইল এক অপরূপ রূপলাবণ্য সম্পন্না জ্যোতির্ম্ময়ী নারী এক বৃক্ষতলে বিষণ্ণ বদনে বসিয়া আছেন। সে অগ্রসর হইয়া দেখিল যে সেই পরমা সুন্দরী রমণীর পায়ে গোদ ও তাহা হইতে পুঁজ বাহির হইয়াছে। তখন সে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল—"কে তুমি মা এখানে বিরস বদনে বসিয়া আছ? তোমার পায়ের যন্ত্রণাতেই তুমি বুঝি কাতর হইয়াছ?" তদুত্তরে তিনি বলিলেন,—"আমি ষষ্ঠীদেবী। বাস্তবিকই আমি গোদের যন্ত্রণায় বড়ই অস্থির হইয়া পড়িয়াছি। যে এই গোদের পুঁজ জিহ্বা দিয়া চাটিয়া ফেলিতে পারিবে, সে যে বর চাহিবে, তাহাকে আমি সেই বর দিব।" গৃহস্থের স্ত্রী অবিলম্বে অম্লান বদনে দেবীর গোদের পুঁজ জিহ্বা দ্বারা উঠাইয়া ফেলিয়া তাঁহার নিকট তাহার সাত পুত্র ফিরিয়া পাইবার বর চাহিল। ষষ্ঠী ঠাকুরাণীর তখন পূর্ব্ব কথা মনে পড়িল। তিনি গৃহস্থের স্ত্রীকে বলিলেন—"তুমি আমাকে অভক্তি করিয়া ও নৈবেদ্যাদির 'আগভোগ' খাইয়া যে অন্যায় করিয়াছিলে, তাহার প্রতিফল তুমি পূর্ণরূপেই ভোগ করিয়াছ। এখন তোমার ছেলেদিগকে অবশ্যই ফিরিয়া পাইবে।"

দেবীর কৃপায় গৃহস্থের স্ত্রী পুত্রদিগকে ফিরিয়া পাইয়া, তাহাদের চাঁদমুখ দর্শনে অতিশয় আহ্লাদিত হইয়া দেবীকে ভক্তিপূতমনে প্রণাম করিয়া এবং তাহাদিগকে লইয়া হৃষ্ট মনে বাড়ী আসিল। পুত্রদিগকে ফিরাইয়া দিবার সময় দেবী বধূকে বলিয়া দিয়াছিলেন যে, সর্ব্ব কনিষ্ঠ পুত্র সে দিন যে অন্যায় কার্য্য করিবে, উহার যেন কোন প্রতি-বিধান না করা হয়, এবং প্রতি বৎসরই ব্রতদিবসে কোন সন্তানকেই অসদাচরণের নিমিত্ত তিরস্কার না করা হয়। ছোট ছেলেটি সেদিন তেলী-বাড়ী যাইয়া তেলের 'মাইট্' (পাত্র) ভাঙ্গিয়া ফেলিল। মাতা তেলীকে টাকা দিয়া তাহার রাগ দমন করিল ও ছেলেকে লইয়া বাড়ী আসিতে আসিতে বলিল,—"ভেঙ্গেছে ভেঙ্গেছে তেলের মাইট্, তবু বাছা আমার ষাইট্ ষাইট্"। ছেলেটি তাহার মাসীর কান ধরিয়া টানিয়া ছিল, মাসী তাহা নীরবে সহ্য করিল। দেবীর আদেশ গৃহস্থের স্ত্রী বর্ণে বর্ণে প্রতিপালন করিল।

গৃহস্থের সংসার শান্তিপূর্ণ হইল। তাহার স্ত্রী প্রতি বৎসর ষষ্ঠী ঠাকুরাণীর ব্রত ভক্তিসহকারে করিত। দেবীর দয়ায় গৃহস্থের দিন দিন উন্নতি হইতে লাগিল। সে স্ত্রী পুত্রাদি সহ সুখে স্বচ্ছন্দে সময় যাপন করিতে লাগিল।*

উপেক্ষিতা।

[শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী]

(১)

সেদিন যখন শ্রান্ত বালক দল ইতস্ততঃ ছড়াইয়া মাঠের মধ্যে বসিয়া শুইয়া বিশ্রাম করিতেছিল, তখন আকাশ মেঘে ভরিয়া আসিয়াছে, বাদল-বায় ধীরে ধীরে বহিতে আরম্ভ করিয়াছে।

সুধীর পার্শ্ববর্তী বন্ধু ললিতকে একটা ধাক্কা দিয়া বলিল, "হাঁ করে দেখছিস কি, বাড়ী যেতে হবে না? দেখছিসনে আকাশ মেঘে ভরে এসেছে?"

---

* "বাঙ্গালার ব্রতকথায়" এই ব্রতের কথা অন্যরূপ।—লেখক।

ললিত একটু হাসিয়া বলিল, "বেশ দেখছি।"

সুধীর রাগতভাবে বলিল, "তবে তুই বসে বসে দেখ, আমি বাড়ী চলছি। এই বৃষ্টিতে ভিজতে আমার মোটেই ইচ্ছে নেই। এই সন্ধ্যাবেলায় বৃষ্টিতে ভিজতে ইচ্ছে কার হয়?"

সে উঠিয়া পড়িল। ললিত তাহার হাতখানা চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "দাঁড়া না বাপু, একটু না হয় বসেই যা। শুকনো মাথায় তো রোজই যাওয়া আসা করি, একদিন না হয় ভিজলুমই বা, তাতে আর সদ্য নিউমোনিয়া এসে ধরবে না।"

সুধীর আবার বসিয়া পড়িল।

টুপ টাপ—টুপ টাপ, বৃষ্টি আসিয়া পড়িল। মাঠে যাহারা ছিল, কেহ কেহ ছুটিতে লাগিল, কেহ বা বৃষ্টি হইতে বাঁচিবার জন্ত গাছতলায় গিয়া দাঁড়াইল।

সুধীর বলিল, "নাও, এখন দাঁড়িয়ে ভেজ এই বৃষ্টিতে। তোর যত বাড়াবাড়ি ললিত—নইলে সাধ করে কেউ বৃষ্টিতে ভিজতে চায়?"

একটী বালিকা একটা ছাতা মাথায় দিয়া দৌড়াইয়া আসিতেছিল। ললিত বলিল, "ভিজতে হবে না, ছাতা আসছে।"

বালিকা নিকটে আসিয়া বলিল, "মা ছাতা পাঠিয়ে দিলেন, শিগগীর বাড়ী যেতে বললেন।"

বৃষ্টিতে তাহার মাথা গা সব ভিজিয়া গিয়াছিল, দৌড়াইতে তাহার মাথার এলো খোঁপা খুলিয়া গিয়া চুলগুলা চারিদিকে পড়িয়াছিল, সেগুলা হইতে জলধারা ঝরিয়া পড়িতেছিল। সে সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করে নাই, গাছতলায় দাঁড়াইয়া দুই হাতে সিক্ত চুলগুলা জড়াইয়া বাঁধিয়া ফেলিল।

তখন বেলা প্রায় অবসান, বুঝিবার যো ছিল না। আকাশ-ভরা কেবল নিকষ-কালো মেঘের সারি, তাহারি ফাঁকে ফাঁকে বিদ্যুতের চিকিমিকি খেলা। চোখ তাহাতে ধাঁধিয়া যাইতেছিল, গুড় গুড় করিয়া মেঘ ডাকিয়া উঠিতেছিল। বৃষ্টি ধরার সম্ভাবনা নাই দেখিয়া মাঠে যাহারা ছিল সকলেই চলিয়া গিয়াছে।

সুধীর বালিকার হাত হইতে ছাতাটা লইয়া বলিল, "মার দেখছি সব দিকেই নজর আছে। চল—ছাতাটা মাথায় দিয়ে যাওয়া যাক।"

দুই বন্ধু ছাতা মাথায় দিয়া চলিল, পিছনে সেই বালিকাটী প্রবল বৃষ্টিতে ভিজিতে ভিজিতে, কাঁপিতে কাঁপিতে চলিল। একটুখানি অগ্রসর হইয়াই সুধীর থমকিয়া দাঁড়াইল; ললিত বলিল, "চল্, দাঁড়ালি যে?"

সুধীর বলিল, "আহা, পেছনে মেয়েটা ভিজতে ভিজতে আসছে, ওকে—"

বাধা দিয়া ললিত বলিল, "ওকে আর অত সহানুভূতি দেখাতে হবে না। ওর আবার ভেজা শুকনো কি?"

সুধীর বলিল, "কেন?"

ললিত বলিল, "ও আমাদের ঝিয়ের মেয়ে। চাকর ঝির কত ভিজতে হয়। ওদের সহানুভূতি দেখাতে গেলে আমাদের মত লোকের চলে না।"

কোমল হৃদয় সুধীর একটু ব্যথা পাইল, বলিল, "ঝি চাকর বলে' তাদের দেহ আর দেহ নয়? তারা চাকরী করতে এসেছে বলে' তাদের দিকে [illegible] আমাদের অন্যায়?"

ললিত তাহার মনের ভাব বুঝিয়া কথাটা উল্টাইয়া লইবার অভিপ্রায়ে বলিল, "ও সব কথা ছেড়ে দাও। ও তো ভিজেইছে, আর আমাদের এ ছাতার মধ্যে একটু জায়গাও নেই। ও বেশ আসছে দেখ, এত বড় বড় বৃষ্টির ফোঁটা যে ওর মাথায় মুখে গায়ে পড়ছে, সে দিকে ওর মোটে দৃষ্টিই নেই। দেখ, কেমন মনের আনন্দে গান গাইতে গাইতে আসছে। ওদের ছোটবেলা হ'তে জলে ভেজা, রোদে পোড়া বেশ অভ্যাস আছে, আমাদের মত সুখী নয় যে একটু বৃষ্টি গায় লাগলে জ্বর আসবে, একটু রোদ লাগলে মাথা ধরবে।"

সুধীর পিছন ফিরিয়া দেখিল বালিকা বেশ প্রফুল্লভাবেই তাহাদের পিছনে পিছনে আসিতেছে, বাস্তবিকই কোন দিকে তাহার দৃষ্টি ছিল না।

ললিতের বাড়ী পথের উপরেই, সুধীরের বাড়ী খানিকটা দূরে। ললিতকে বাড়ী পৌঁছাইয়া দিয়া সুধীর

বলিল, "তোমার ছাতাটা আমি নিয়ে যাচ্ছি, বৃষ্টি ধরলে কাউকে দিয়ে পাঠিয়ে দেব।"

ললিত বলিল, "কাউকে মানে তুমি নিজেই এসে দিয়ে যাবে তো? এই তো শ্রী রয়েছে, যা তো, সুধীরকে পৌঁছে দিয়ে ছাতাটা নিয়ে আসবি।"

বালিকা শ্রী বারাণ্ডার এক পাশে দাঁড়াইয়া অঞ্চল নিংড়াইয়া মাথা মুছিতেছিল, আবার যাইতে হইবে ভাবিয়া তাহার মুখখানা মলিন হইয়া আসিয়াছিল; তাহা লক্ষ্য করিয়া সুধীর বলিল, "থাক, আমিই দিয়ে যাবখন। ছেলে মানুষ বেচারা—এতক্ষণ ভিজে এসেছে—"

প্রচণ্ড ধমকের সুরে ললিত বলিল, "তাই যেতে পারবে না নাকি? ইঃ, ভারি সুখের শরীর হয়েছে দেখছি। যা শ্রী দেরী করিস নে।"

শ্রী রাস্তায় নামিয়া পড়িল। সুধীর বাহির হইয়া করুণার্দ্রকণ্ঠে বলিল, "আমার ছাতার মধ্যে এস, বৃষ্টিতে ভিজলে অসুখ করবে।"

এইটুকু স্নেহ পাইয়া বালিকা শ্রীর হৃদয় বিগলিত হইয়া গেল, তাহার দুই চোখ জলে ভরিয়া উঠিল। মুখ ফিরাইয়া তাড়াতাড়ি চোখ মুছিয়া ফেলিয়া সে বলিল, "না, আমার অসুখ হবে না।"

সুধীর ধাড়ী আসিয়া ছাতাটা তাহার হাতে ফিরাইয়া দিয়া বলিল, "ছাতা মাথায় দিয়ে যাও, আর ভিজো না।"

সে উত্তর করিল না, কিন্তু ছাতাও মাথায় দিল না, সেটাকে মুড়িয়া হাতে লইয়া সে অনাবৃত মাথাতেই চলিল, তখনও মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতেছে।

(২)

অনেক দিন আগে নিঃসহায়া বিধবা মহামায়া সপ্তম বর্ষীয়া বালিকা শ্রীকে লইয়া চাকরী করিতে আসিয়াছিল। তাহার সংসারে এই কন্যাটী ব্যতীত আর কেহ ছিল না। সে নীচ জাতীয়া হইলেও তাহার সৌন্দর্য্য ছিল, সেইজন্যই স্বামীর পরলোকান্তে সে লোকের অত্যাচারে গৃহে বাস করিতে সমর্থ হইল না। গ্রামের মধ্যে সে কাহারও নিকটে সাহায্য পায় নাই, তখন ভিন্ন গ্রামে গিয়া শচীপতি বাবুর নিকট কাঁদিয়া পড়িল।

শচীপতিবাবু কলিকাতায় কাজ করিতেন। বিনা মাহিনায় এই দাসীটিকে পাইয়া তিনি ও তাঁহার স্ত্রী বেশ খুসিই হইয়াছিলেন। শ্রী ও মহামায়া এইখানেই রহিয়া গেল—সুখে নয়, বড় দুঃখে।

শচীপতিবাবুর একটী মাত্র ছেলে ললিত, সে আদুরে গোপাল। যখন মহামায়া আসিয়াছিল তখন ললিত পঞ্চদশবর্ষীয় বালক ছিল, তাহার পর এই চার বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে।

একটু ছুতা পাইলেই ললিত মহামায়াকে যা না তাই বলিত, আর বালিকা শ্রী, সে যতটা প্রহার সহ্য করিত তাহা সেই জানে। তাহার সামান্য ত্রুটী দেখিতে পাইলেই ললিত তাহাকে প্রহার করিত।

শ্রী মার খাইত, নীরবে সহ্য করিয়া যাইত, একটা কথা কখনও কাহাকেও বলিত না। সে জানিত সে গরীব মায়ের সন্তান, মার খাওয়া তাহার একচেটিয়া করা।

ললিত গ্রাম হইতে ম্যাট্রিকুলেশন পাস করিয়া কলিকাতায় আই, এ পড়িতে চলিয়া গেল। বাড়ীটা দিন কতকের জন্য নিঝুম হইয়া পড়িল।

মহামায়া কন্যাকে বুকের কাছে টানিয়া লইয়া একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "দিন কতকের জন্যে একটু বাঁচবি শ্রী, মার খেতে হবে না। আঃ, এই শরীরে কি মারটাই সহ্যি করিস বাছা—"

চোখের সামনে সন্তানকে কেহ যদি প্রহার করে কোন মা-ই তাহা সহ্য করিতে পারে না; কিন্তু মহামায়াকে তাহাও সহ্য করিতে হইত। অভাগিনী মায়ের এমন কোনও ক্ষমতা ছিল না, যাহা দ্বারা সে সন্তানকে রক্ষা করিতে পারে। কন্যা যখন আড়ালে যাইয়া চোখের জল ফেলিত, মা তখন তাহাকে বুকের মধ্যে টানিয়া লইয়া নিজের চোখ মুছিত, তাহার চোখ মুছাইয়া দিত; আর, আকাশ পানে চাহিয়া মনে মনে বলিত, "আর কতদিন ভগবান, আর কতদিন এমনি হেয়ভাবে দিন কাটাইব?"

সে দিনের প্রতীক্ষা করিত, আশা তাহার খুবই ছিল একদিন সে শুভদিন আসিবে। তাহার শ্রী সেদিন কোনও গৃহের গৃহিণী হইবে, সে তাহা দেখিয়া বড় শান্তিতে মরিতে পারিবে। কিন্তু হায়, কবে সেদিন আসিবে?

শ্রী একদিনও সে দিনের প্রতীক্ষা করে নাই। মা যখন তাহাকে বুকে ধরিয়া সেই শুভদিনের ছবি আঁকিত, তখন শ্রী শিহরিয়া উঠিত। না, সে দিনের আশা সে করে না, সে দিন সে চায় না। মা যাহা সুখ বলিয়া ভাবিত, তাহা সে দুঃখ বলিয়াই জানিত।

সেদিন যে ললিত তাহাকে মারিয়া কলিকাতায় চলিয়া গিয়াছে, সেই দিনটাই সে ফিরিয়া পাইবার জন্য ভারি ব্যগ্র ছিল। ললিত তাহাকে মারিত, গাল দিত, নিতান্ত না লাগিলে সে কাঁদিত না। সে নিজে ললিতকে এজন্য মনে মনে নিন্দা করিত, কিন্তু মায়ের মুখে ললিতের নিন্দা তাহার সহ্য হইত না।

ললিত চলিয়া গেলে বাড়ীটা তাহার একেবারেই শূন্য ঠেকিতে লাগিল। সে এ বাড়ী ছাড়িয়া যাইবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিল।

রাত্রে আহারান্তে মা যখন কাজকর্ম্ম সারিয়া শুইতে গেল, তখন সে মায়ের গলা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদ কাঁদ স্বরে বলিল, "মা, চল না, আমরা বাড়ী যাই, আমার আর এখানে থাকতে ভাল লাগছে না!"

দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া মা বলিল, "কোথায় যাব মা? বাড়ী ঘর ছিল, চার পাঁচ বছর চলে এসেছি, এতদিন হয়তো পড়ে গেছে। কোথা গিয়ে দাঁড়াব, কি খাব তার যে কিছু ঠিক নেই মা।"

শ্রী নীরবে মায়ের বুকের মধ্যে মুখ রাখিয়া ঘুমাইয়া পড়িল।

কে জানিত যে ললিতের প্রহারই তাহার কাছে এত ভাল ছিল? বাড়ী শূন্য, হৃদয় শূন্য করিয়া সে কোথায় চলিয়া গিয়াছে, আর যেন তাহার নাগাল পাওয়া ভার।

মেয়ে দিন দিন বড় হইয়া উঠিতেছিল, মায়ের শান্তি ছিল না। সে ভাল করিয়া রাত্রে ঘুমাইতে পারে না; কেমন করিয়া মেয়ের বিবাহ দিবে, কোথায় পাত্র পাইবে!

সেদিন শচীনাথবাবুর স্ত্রী শ্রীকে লক্ষ্য করিয়া মহামায়াকে বলিলেন, "হ্যাঁলা ঝি, তুই করছিস কি বাপু? মেয়েটা যে দিনে দিনে তাল গাছ হয়ে উঠল, ওর পানে তাকাচ্ছিস, না শুধুই গরুর মত গিলে যাচ্ছিস?"

ক্লিষ্ট কণ্ঠে মহামায়া বলিল, "কি করে বিয়ে দেই মা? আমার মত ভিখারী—"

বলিতে বলিতে তাহার চোখ দুইটা জলে ভরিয়া গেল।

গৃহিনী বলিলেন, "তাই বলে চুপ করে থাকবি বাছা? আমাদের ঘরে হ'লে এতদিন কি কাণ্ডই না হতো। ভিখিরীর কি আর বিয়ে হয় না? ভিখিরীর বিয়ে হয় ভিখিরীর সঙ্গে. তারা কি আর বড় ঘরে বিয়ে দেবার ইচ্ছে রাখে? তুই যেমন-তেমন দেখে বিয়ে দে।"

দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া মহামায়া সরিয়া গেল। তাহার হৃদয়ের অগ্নিতে ইহা ইন্ধন যোগাইল, সে অগ্নি আরও ধূ ধূ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল।

সেইদিন রাত্রে মাতার বুকের কাছে মুখ রাখিয়া শ্রী রুদ্ধকণ্ঠে ডাকিল, "মা—"

মা কি ভাবিতেছিল, চমকাইয়া উঠিয়া কন্যাকে বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "কেন মা?"

শ্রী কি বলিতে ইচ্ছা করিতেছিল, কিন্তু কথাটা অনেক চেষ্টা করিয়াও মুখে আনিতে পারিল না।

মা বলিল, "কি বলছিলি বল না মা!"

শ্রী বলিল, "আমি বিয়ে করতে তো চাচ্ছিনে মা, তবে কেন আমার বিয়ের জন্যে তুমি এত ভাবছ?"

"আরে পাগলা মেয়ে!"

মা মুখ নত করিয়া কন্যার ললাটে একটী কোমল স্নেহ চুম্বন দিল, মুখে বড় দুঃখের হাসি ফুটিয়া উঠিল—"তুই বিয়ে করতে চাস নে, তাই কি আমায় চুপ করে থাকতে হবে?"

শ্রী এবার দৃঢ়কণ্ঠে বলিল, "সত্যি আমি বিয়ে করব না মা, আমার বিয়ের জন্যে তোমায় কিছু ভাবতে হবে না।"

মহামায়া একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "বিয়ে করবি নে তবে কি করবি?"

শ্রী বলিল, "এমনিই থাকব।"

মা বলিল, "এমনিই লোকের বাড়ী চাকরী করবি তো?"

শ্রী নীরবে সম্মতি জানাইল।

মা ললাটে করাঘাত করিয়া বলিল, "আঃ, আমার

পোড়া কপাল, তুই তাই মনে ভেবেছিস, শ্রী? কে তোকে বাড়ীতে জায়গা দেবে? তোর চরিত্র সবাই খারাপ বলে জানবে, কেউ তোকে চাকরী দেবে না। ও কথা মনেও আনিস নে শ্রী, মনেও আনিস নে। তোর বিয়েটা দিতে পারলে আমি যে কতটা নিশ্চিন্ত হই তা আর তুই জানবি কি? একটা ঘরের বউ হবি তুই, কত বড় মান তাতে তা একবার ভেবে দেখ। লোকের বাড়ী চাকরী করার কত সুখ তা তো দেখতে পাচ্ছিস?"

মায়ের চোখ দিয়া জল গড়াইয়া অন্ধকারে মেয়ের হাতের উপর পড়িল, শ্রী নীরব হইয়া গেল, মাকে আর কোনও কথা বলিবার সাহস তাহার হইল না।

(৩)

এমনি করিয়াই দিন যাইতে যাইতে সুদীর্ঘ তিনটা বৎসর চলিয়া গেল।

গৃহিনী এই তিন বৎসরই কলিকাতাবাসিনী, ললিত ও শচীনাথবাবুও আসেন নাই, বাড়ী রক্ষা করিতে আছেন ললিতের এক বৃদ্ধা জেঠাই মা ও মহামায়া, শ্রী।

পঞ্চদশবর্ষীয়া শ্রী আর সে শ্রী ছিল না। তাহার সারাদেহে সৌন্দর্য্যের ছটা। কিন্তু এমন রূপ সত্বেও আজও তাহার বিবাহ হয় নাই।

বিবাহ হইবার সবই ঠিক হইয়াছিল, মাকে মিথ্যা নিন্দা হইতে রক্ষা করিবার জন্য শ্রী আত্মসমর্থন করিবার জন্য প্রস্তুতও হইয়াছিল, সেই সময় ভাবি স্বামী সর্পাঘাতে ইহলোক ত্যাগ করিল। অন্যত্র বিবাহের সম্বন্ধ হইতেছিল, এমন সময় মহামায়া কঠিন ব্যারামে পড়িল।

শ্রী প্রাণপণে মায়ের সেবা করিতে লাগিল, কিন্তু কিছুতেই অভাগিনী মাতাকে বাঁচাইতে পারিল না। কন্যার ভবিষ্যৎ চিন্তা করিতে করিতে দুঃখিনী মহামায়া একদিন ইহজগৎ হইতে অদৃশ্য হইয়া গেল!

সেই গ্রীষ্মের বন্ধে শচীপতিবাবু সপরিবারে দেশে ফিরিলেন। ললিত তখন সিক্সথ্ ইয়ারে পড়িতেছিল।

এ ললিত আর সে ললিত ছিল না। পল্লীগ্রামের ছেলে ললিত আর নয়, সে এখন পাকা সহুরে হইয়া পড়িয়াছে। তাহার চোখে সোণার চশমা, হাতে রিষ্ট-ওয়াচ, আঙ্গুলে আংটি, চুল থাকে থাকে সজ্জিত, মুখে স্বদেশী বিড়ি, পরণে মোটা খদ্দর, গায়ে খদ্দরের জামা, পায়ে স্বদেশী জুতা।

শ্রী মুগ্ধ নয়নে চাহিয়া দেখিল তাহার দেবতা আজ কি অভিনব বেশে সাজিয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়াছে। মুগ্ধা শ্রী দুই হাত জুড়িয়া পূর্ণ হৃদয়ে আকাশের পানে চাহিয়া কেবল একটী প্রণাম করিল।

সুদীর্ঘ তিন বৎসর পরে সে ললিতকে দেখিতে পাইল। এই তিন বৎসরের মধ্যে কত মহাঝড় তাহার মাথার উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে, সে তবু পড়িয়া যায় নাই; আশা বুকে লইয়া দাঁড়াইয়া আছে।

ললিত একবার মাত্র তাহার পানে চাহিল, বিদ্রুপের সুরে বলিয়া উঠিল, "বা রে, তুই যে মস্ত বড় হয়ে গেছিস দেখছি!"

মুখখানা অস্বাভাবিক লাল করিয়া শ্রী তাড়াতাড়ি সরিয়া গেল, ললিতের সম্মুখে যাইতেও তাহার কেমন লজ্জা আসিতেছিল।

শচীপতিবাবু শ্রীর পানে চাহিয়া বলিলেন, "উঃ এযে মস্ত বড়টা হয়ে গেছে দেখছি, বিয়েও বোধ হয় হয়নি?"

গৃহিনী নথ নাড়া দিয়া বলিলেন, "বিয়ে হবে কি? মাগী আমাদের গলায় এ ভার ঝুলিয়ে গেছে, পার করতে হবে বোধ হয় আমাদেরই।"

শচীপতিবাবু মুখ ভার করিয়া বলিলেন, "থাকবে অমনিই, আমার এত মাথা ব্যথা পড়েনি।"

কিন্তু তাঁহার মাথা ব্যথা না পড়িলেও গৃহিনীর মাথা ব্যথা পড়িল অত্যন্ত। এই কিশোরী সুন্দরী দাসী তিনি বাড়ীতে রাখিতে একেবারেই নারাজ। কোনও ক্রমে ইহাকে বিদায় করিয়া দিতে পারিলে তিনি বাঁচেন।

খোঁজ লইয়া তিনি জানিলেন শ্রীর বিবাহের সবই ঠিক হইয়াছিল, পাত্র তাঁহারই জনৈক প্রজা অধর কৈবর্ত্ত।

অধরের ইতিপূর্ব্বে তিনবার বিবাহ হইয়া তিন স্ত্রীই গতায়ু হইয়াছে। ষাট বৎসরে পদার্পণ করিয়া সে চতুর্থ পক্ষ অন্বেষণ করিতেছিল, কারণ তাহার সেবা করিবার সংসারে আর কেহই ছিল না।

বিবাহে সে মহামায়াকে ত্রিশ টাকা পণ ধরিয়া দিবে বলিয়াছিল, কিন্তু মহামায়া সে টাকা লইতে স্বীকার করে নাই। তাহার কন্যা যে সুখী হইবে, একটা ঘরের গৃহিণী হইবে, এই আশায় উৎফুল্ল হইয়া সে অধরের বয়সের দিকেও তাকায় নাই, কথা দিয়া ফেলিয়াছিল।

দ্বিগুণ উৎসাহে গৃহিণী বিবাহের যোগাড়ে প্রবৃত্ত হইলেন। শ্রী অন্তরে গুমরিয়া মরিতেছিল, অবশেষে একদিন মুখ ফুটিয়া গৃহিণীর কাছে কাঁদিয়া পড়িল, "আমি বিয়ে করব না।"

বিস্ময়ে গৃহিণী খানিক হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিলেন, তাহার পর বলিলেন, "বিয়ে করবি নে, সে আবার কি কথা রে?"

সে কোনও উত্তর দিল না, নীরবে কেবল কাঁদিতেই লাগিল।

গৃহিণী রাগ করিয়া বলিলেন, "বিয়ে করবি নে কাকে —অধরকে? কেন, সে বুড়ো হয়েছে ব'লে বুঝি?"

শ্রী তাহাতেও উত্তর দিল না।

দ্বিগুণ রাগভরে গৃহিণী বলিলেন, "ঝিয়ের মেয়ের যোগ্য কথা বটে। তুই বসে বসে আমারই ভাত গিলবি যাবজ্জীবন কাল, তাই ভেবেছিস্—না? আমি এ আগুনের ভলা আমার বাড়ী রাখতে পারব না। বিয়ে না করিস, দূর হয়ে যা আমার বাড়ী হ'তে।"

ললিত গৃহ মধ্য হইতে হাসিয়া বলিল, "সাহেবী চাল ত, এ শুধু আমাদের ঘরেই নেই, ছোটলোকের ঘরে পর্য্যন্ত আছে। ও সব আমাদের বাড়ীতে হবে না, একে ও আমাদের বাড়ী থাকার জন্যে লজ্জায় আমার বন্ধুদের কাছে মুখ দেখানো বন্ধ হয়েছে। ওকে দূর করে দাও মা, নইলে আমি মুখ দেখাতে পারব না।"

রাগে ফুলিতে ফুলিতে গৃহিণী কর্ত্তার নিকট গেলেন।

কর্ত্তা গম্ভীর মুখে বলিলেন, "কসবী বেটীকে দূর করে দাও বাড়ী থেকে। যেখানে হয় থাক গিয়ে, আমি আর আমার বাড়ী জায়গা দেব না।"

বলা বাহুল্য, সেইদিনই শ্রী সে বাড়ী হইতে বিতাড়িত হইল। গৃহিণীর, কর্ত্তার পা ধরিয়া কাঁদিয়াও সে সে বাড়ীতে আর থাকিবার অনুমতি পাইল না। দুখানি মাত্র পরিধেয় লইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে সে বাড়ী ত্যাগ করিল।

(৪)

পার্শ্বের গ্রামেই শ্রীর মাতুলালয়, সে সেখানে গিয়া উঠিল, কিন্তু মামীরা কেহ তাহার ভার লইতে চাহিল না, দূর সম্পর্কীয়া এক বৃদ্ধা মাসী তাহাকে বাড়ী লইয়া গেল।

এখানে আসিয়া শ্রী বাঁচিয়া গেল, মাসীও তাহাকে পাইয়া ভারি খুসী হইল।

এখানে আসিবার পর তাহাকে অনেক লোকে অনেক কথা বলিতে লাগিল, শ্রী কোনও কথা কানে তুলিত না। তাহার হৃদয় একেবারে ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল, সে ভগ্ন হৃদয়ে আঘাত আর তত লাগে না।

অত ভালবাসার এই পরিণাম! কি নিষ্ঠুর সেই কথাগুলা! তাহাকে বাড়ীতে রাখিলেও এত দোষ? নিষ্ঠুর—

কিন্তু কে নিষ্ঠুর? যাহাকে ভালবাসিয়াছে সেই নিষ্ঠুর না জগতের লোকমাত্রেই নিষ্ঠুর?

শ্রী যতখানি 'অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছে' তাহাতে জানিয়াছে এই জগৎটাই এমনি নিষ্ঠুর। জগতের জন কেবল লইতে জানে, কিছু দিতে জানে না। যদি কখনও কিছু দেয়, সে আঘাত মাত্র, যে আঘাতে বক্ষ ভাঙ্গিয়া যায়, যে আঘাতে আঘাতপ্রাপ্ত একেবারে মাটীতে পড়িয়া মাটী হইয়া যায়—সেই আঘাত।

ভগবান, কেন তাহাকে গরীব করিয়া পাঠাইলে, কেন তাহাকে কৈবর্ত্তের ঘরে জন্ম দিলে? হায় স্বামী, ভালবাসিতেই কেবল দিয়াছ, অথচ তাহা একেবারেই মিথ্যা? যদি সে উচ্চবংশে জন্মগ্রহণ করিত,যদি তাহার অর্থ থাকিত, সে ললিতকে স্বামী রূপে পাইবার আকাঙ্ক্ষা করিতে পারিত। হায় ভগবান, যাহাকে কখনও পাওয়া যাইবে না, কেন তাহার উপর এ প্রবল আসক্তি, কেন তাহার জন্য এত চিন্তা? সে তো একবারও চোখ তুলিয়া চায় নাই, চাহিবেই বা কেন, মধ্যে যে অসীম ব্যবধান। মরণের পরপারে গিয়া কায়া না বদলাইয়া আসিতে পারিলে এ ব্যবধান ঘুচিবে না।

কত যুগ যুগান্তর ধরিয়া যেন সে তাহার আরাধনা করিয়া আসিতেছে, সকল জন্ম যেমন ব্যর্থ গিয়াছে, এ জন্মও তেমনি একেবারে ব্যর্থ হইল। আগত জন্ম—না, সে জন্ম সে নিষ্ফল হইতে দিবে না, সে জন্মে তাহার প্রিয়তমকে নিশ্চয়ই সে পার্শ্বে পাইবে। এ জন্ম সে কেবল একাগ্রচিত্তে সাধনা করিবে, সে সাধনার ফল পর জন্মে নিশ্চয়ই লাভ করিবে। সে কখনই বিবাহ করিবে না। যে হৃদয় সে দান করিয়াছে, সে হৃদয় কদাচ অন্যকে দিতে পারিবে না।

শ্রী মাটীতে লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিল, কিন্তু বড় আঘাত —"ওগো, বড় আঘাত দিয়াছ! আমার বুক ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, আমার আর সহ্য করিবার ক্ষমতা নাই।"

বৃদ্ধা মাসী মা তাহার মাকে হাতে করিয়া মানুষ করিয়াছিল। সে শ্রীর বিবাহ দিবার জন্য দুই চারিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু শ্রী বুঝাইল বিবাহ তাহার মা যাহার সহিত দিবে বলিয়াছিল, ধর্ম্মতঃ তাহার সহিতই বিবাহ হইয়াছে। সে এখন মরিয়া গিয়াছে, শ্রী আর বিবাহ করিবে না, এই ভাবেই জীবন কাটাইয়া দিবে। মাসীও তাহাই বুঝিয়া তাহার বিবাহ-প্রসঙ্গ একেবারেই ছাড়িয়া দিল।

সেখানে থাকিতে থাকিতে পাড়ায় সকলের সহিতই শ্রীর বেশ আলাপ হইয়া গেল। নীলমণিবাবুর মেয়ে প্রণতির সহিত তাহার বেশ বন্ধুত্ব জন্মিয়া গেল।

নীলমণিবাবু পূর্ব্বে হাইকোর্টে প্লীডার ছিলেন, দেশমাতৃকার সেবায় তিনি আপনাকে উৎসর্গ করিয়াছিলেন, তিনি কার্য্য ত্যাগ করিয়া দেশে আসিয়া দেশের উন্নতিতে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন।

প্রণতি এই মেয়েটীকে বড় ভালবাসিয়া ফেলিয়াছিল। এই দুই বন্ধুর মধ্যে অনেক গোপনীয় কথাও প্রকাশ হইত। চালাক মেয়ে শ্রী নিজের গোপন কথা ব্যক্ত করিয়াছিল অন্য ভাবে, তাহার স্বামী যেন তাহাকে বিবাহ করিবার দিনই পলাইয়াছে, ধর্ম্মসঙ্গত বিবাহ না হইলেও সে জানে সেই তাহার স্বামী, সে, তাই তাহার স্মৃতি বক্ষে লইয়া বাঁচিয়া আছে। আজীবন কাল সেই স্বামীর স্মৃতি লইয়াই সে থাকিবে।

প্রণতি মেয়েটী বড় ভাল ছিল। তাহার মনটা জলে-ধোয়া যুঁই ফুলটীর মতই পবিত্র ময়লাবিহীন। সে শ্রীর সমবয়স্কা, বড় সুন্দরী। যথার্থই সে কোন কথা গোপন করে নাই, তাহাতেই শ্রী জানিতে পারিল তাহার প্রিয়তমের প্রিয়তমা এই প্রণতি।

একবার তাহার বুকখানা যেন জ্বলিয়া উঠিল, সে চক্ষে চারিদিক অন্ধকার দেখিল, পরক্ষণেই সে নিজকে সামলাইয়া লইল, নিজে নিজে ধিক্কার দিল।

ইহাতে কি প্রণতির উপর তাহার হিংসা হওয়া উচিত? না, কখনই না। সে জানে এ জনমে সে ললিতকে পাইবে না, সে আজীবন দুঃখে দিন কাটাইবে, তাই বলিয়া ললিত কেন সুখী হইবে না? ললিত তো জানে না আর কেহ তাহাকে এমনি প্রাণ ঢালিয়া ভালবাসে, আর জানিলেই বা শ্রী এই হেয় বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া কখনই তাহার সান্নিধ্য লাভ করিবার জন্য লালায়িত হইবে না।

আর প্রণতি? সে ললিতকে কতদূর ভালবাসে? ললিতের কথা একদিন বলিয়া ফেলিয়া তাহার মনের কপাট খুলিয়া গেল। সে ক্রমে ললিতের পত্র, ললিতের দেওয়া উপহার, সকলই তাহার সঙ্গীকে দেখাইল। তাহার মনে একটুও একদিনের তরে এ সন্দেহ হয় নাই, যাহাকে সে ললিতের কথা বলিতেছে, সেও ললিতকে ভালবাসে, সেই ভালবাসার স্মৃতিই বক্ষে লইয়া সে আছে।

ভগবান, সুখী কর ইহাদের দুইজনকে, ইহাদের মিলন হউক। শ্রী একবার মাত্র দম্পতিকে দেখিয়া চিরকালের জন্য তাহাদের সম্মুখ হইতে সরিয়া যাইবে, শ্রী বলিয়া যে কেহ ছিল তাহা তাহারা কেহই মনে করিয়া রাখিবে না।

প্রণতির মুখে শ্রী শুনিয়াছিল এতদিন কবে তাহাদের বিবাহ হইয়া যাইত, কিন্তু কি কারণে ললিতের পিতার সহিত নীলমণিবাবুর বিবাদ হয়, তাহাতেই বিবাহ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, বিবাহ যে হইবে এমন আশাও নাই।

প্রণতি এই সখীর কাছে চোখের জল ফেলিয়া বাঁচিত, আর কাহারও নিকট সে এমন করিয়া নিজেকে মুক্ত করিতে পারে নাই।

তাহার দুঃখ ও ললিতের মনোকষ্ট ভাবিয়া শ্রীর

বুকটাও বিদীর্ণ হইয়া যাইত, তাহার চোখে জল আসিয়া পড়িত। হায়, যদি সে মরিলেও এই দুইটী পরিবারে মিলন হয়, ইহারা দুইজন সুখী হয়, সে মরিতে প্রস্তুত। কিন্তু কে সে, দাসী-কন্যা বই তো নয়।

প্রায় সর্ব্বদাই সে প্রণতির কাছে যাইত, প্রণতিও মাঝে মাঝে তাহার কাছে আসিত, সৎচরিত্রা শ্রীর সঙ্গে মিশিতে দিতে কেহই আপত্তি করিত না।

শচীনাথবাবু নীলমণিবাবুর কাণে কি করিয়া উঠাইয়া দিলেন শ্রী তাঁহারই দাসী-কন্যা; দুশ্চরিত্রতার জন্য তিনি তাহাকে বাড়ী হইতে দূর করিয়া দিয়াছেন।

নীলমণিবাবু প্রণতিকে শাসন করিয়া দিলেন; শ্রীর সহিত মিশিলে ভবিষ্যতে তিনি তাহাকে ক্ষমা করিবেন না। শ্রীকেও নিষেধ করিয়া দিলেন যেন সে তাঁহার বাড়ীতে না আসে। শ্রী শুধু একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিল।

(৫)

সকাল বেলা গৃহের দরজা খুলিয়াই শ্রী সামনে যাহাকে দেখিতে পাইল তাহাকে দেখা একেবারেই স্বপ্নাতীত। শ্রী সহসা বিশ্বাস করিতে পারিল না ললিত তাহার চির অভীপ্সিত দেবতা তাহারই প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া।

সে অবাক হইয়া চাহিয়া আছে দেখিয়া ললিত বলিল, "আজ আমাকে দেখে আশ্চর্য্য হয়েছ শ্রী, আমি একটা দরকারে তোমার কাছে এসেছি।"

শ্রী একখানা আসন টানিয়া বারাণ্ডায় পাতিয়া দিল, বলিল, "বসুন।"

ললিত বসিল।

সে কোন কথা কহে না দেখিয়া শ্রী বলিল, "কি দরকার আছে আপনার বলুন।"

ললিত একটু থামিয়া বলিল, 'বড় গোপনীয় কথা; যদি আর কাউকে না বল শ্রী তবে বলতে পারি। তুমি প্রতিজ্ঞা কর আগে—"

শ্রীর মুখখানা বিবর্ণ, মলিন হইয়া গেল, সে দীন নেত্রে শুধু ললিতের পানে একবার তাকাইল।

ললিত হতাশ হইয়া বলিল, "তা হ'লে তুমি পারবে না?"

শ্রী কম্পিতকণ্ঠে বলিল, "ঝিয়ের কথা আপনার বিশ্বাস হবে?"

ললিত চোখ তুলিয়া একবার তাহার পানে চাহিল, বলিল, "বুঝেছি শ্রী, তোমার কোন কথাই আগে আমি বিশ্বাস করতুম না, তোমায় মেরেছিও তেমনি, সেই কথা মনে করেই আজ তুমি একথা বলছ। কিন্তু আজ সেদিন নেই। তুমি সেই ছোট শ্রী নও, আমার ঝিও নও, আমিও সে দুর্দ্দান্ত তোমার মনিব নই। তোমার কথা আমার খুব বিশ্বাস হবে।"

শ্রী বলিল, "তবে বলুন কি আপনার কথা। আমি মরে গেলেও তা অন্যকে বলব না, সে ভয় করবেন না, আমি প্রতিজ্ঞা করছি।"

ললিত পকেট হইতে একখানা এনভেলাপ-বন্ধ পত্র বাহির করিয়া সেখানে রাখিল, শ্রীর পানে আবার তাকাইয়া বলিল, "আমি তোমার প্রতিজ্ঞায় বিশ্বাস করছি শ্রী। আমার এই পত্রখানা তোমায় কোন রকমে প্রণতির কাছে পৌঁছে দিতে হবে।"

শ্রী একটু স্তব্ধ হইয়া রহিল, তাহার পর পত্রখানা তুলিয়া লইয়া বলিল, "আপনার এ কাজ আমি করব, কিন্তু আপনারাই ত আমার সে পথ বন্ধ করেছেন।"

মর্ম্মপীড়িত ললিত বলিল, "আমার কথা সবই তুমি শুনেছ শ্রী, আমার বাপ—"

শ্রী বাধা দিয়া বলিল, "সে আমি জানি, আপনি আজ যান, কাল একবার আসবেন, যদি উত্তর দেয় নিয়ে যাবেন।"

ললিত উঠিতে উঠিতে বলিল, "তোমায় পুরস্কৃত করব শ্রী, যদি আমার তার উত্তরটা এনে—"

শ্রী ব্যগ্র হইয়া বলিয়া উঠিল, "মাপ করবেন; পুরস্কারের লোভে আমি এ কাজ করতে যাচ্ছিনে; আমি শুদ্ধ তাকে ভালবাসি বলেই দেখতে চাই। আমি প্রাণপণ চেষ্টা করছি যাতে আপনার সঙ্গে তার বিয়ে হয়, কিন্তু পুরস্কার আমি চাইনে। আমি যে কোনও উপকার করেছি তা আপনাদের ভুলে যেতে হবে, নইলে আমি কিছুই করব না।"

বিস্মিত ললিত তাহার পানে খানিক তাকাইয়া ধীরে ধীরে সরিয়া গেল।

পত্রখানা বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া শ্রী গৃহমধ্যে লুটাইয়া পড়িল। ভাগ্যবতী তুমিই প্রণতি, এত ভালবাসা তুমি পাইতেছ! আর শ্রী? হায় ভগবান, তাহাকে এ কি পরীক্ষা করিতেছ? দেখিয়ো প্রভু সে যেন একটু বিচলিত না হয়, সে যেন নিজের কাজ অটুট ভাবে করিয়া যাইতে পারে।

সেই দিন দুপুরে যখন প্রণতি উদাসভাবে পুষ্করিণী তীরে চুপ করিয়া বসিয়াছিল, সেই সময় সকলের অজ্ঞাতসারে সে গিয়া সেই পত্রখানা তাহার হাতে দিল।

বিস্মিত প্রণতি বলিল, "তুমি, শ্রী?"

শ্রী বলিল, "হ্যাঁ, আমিই বটে। এই পত্রখানা পড়, এর যা উত্তর দিতে হয় লিখে ঠিক করে রেখো, সন্ধ্যাবেলায় আমি এখানে এসে নিয়ে যাব।"

সে যেমন নিঃশব্দে আসিয়াছিল তেমনি নিঃশব্দে চলিয়া গেল।

সন্ধ্যার তরল অন্ধকার যখন ধরাবক্ষ ছাইয়া আসিতেছিল সেই সময় প্রণতি কাপড়ের মধ্যে পত্রখানা লইয়া পূর্ব্বস্থানে আসিয়া দাঁড়াইল।

একটু পরেই শ্রীকে দেখা গেল, সে নিকটে আসিয়া বলিল, "পত্র এনেছ?"

পত্র তাহার হাতে দিয়া তাহাকে গাঢ়রূপে আলিঙ্গন করিয়া অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে প্রণতি বলিল, "তোমার এ উপকারের কথা আমি কথনই ভুলব না শ্রী।"

শ্রী নীরবে শুধু একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া পত্র লইয়া চলিয়া গেল।

(৬)

দুই পক্ষে এমনি যে পত্রাদি চলিতেছিল, ইহার মূলে ছিল শ্রী। উভয়ের দৌত্যকার্য্য সেই করিত, সে যে নিঃস্বার্থভাবে কেন নীরবে এই দৌত্যকার্য্য করিত তাহা কেহই জানিত না।

সেদিন ললিত বাগানে আসিয়াছিল, প্রণতিরও সেদিন আসিবার কথা ছিল। শ্রী প্রণতিকে সঙ্গে লইয়া বাগানে যাইতে বলিয়া নিজে দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়া রহিল।

তখন সন্ধ্যা বেশ ঘোর হইয়া আসিয়াছে, বাগানের মধ্যে বেশ অন্ধকার হইয়া গিয়াছে। পল্লীপথ জনশূন্য, শৃগাল কুকুর মাঝে মাঝে দেখা দিতেছিল।

শ্রী দুই হাঁটুর মধ্যে মুখখানা রাখিয়া কত কি ভাবিতেছিল।

এ জীবনটা তাহার ভবিষ্যতে কিরূপভাবে চালাইবে তাহাই সে ভাবিতেছিল। সে এদেশে কখনই থাকিবে না, বহু দূরে চলিয়া যাইবে। কি জানি, মানুষের মনকে তো বিশ্বাস নাই, আজ সে শান্ত আছে, চঞ্চল হইতে কতক্ষণ? বিপরীত তরঙ্গ যখন আসিবে, এ স্রোতের বেগও বিপরীত দিকে ফিরিবে। না, মানুষের মনকে বিশ্বাস করিতে পারা যায় না। শান্ত বলিয়া কখনও গর্ব্ব করিতে নাই, অশান্ত হইতে কতক্ষণ? সংযমী বলিয়া যাহার খ্যাতি আছে, তাহারও সময় সময় পদস্খলন হয়।

পথের উপর অশান্ত পদের দুপদাপ শব্দ শুনিয়াই সে মুখ তুলিল—নীলমণিবাবু।

সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইল।

গর্জ্জিয়া উঠিয়া নীলমণিবাবু ডাকিলেন, "শ্রী—"

শ্রী নড়িল না, অকম্পিতভাবে নিজের স্থানেই দাঁড়াইয়া রহিল, দুই হাত দুই দিক্‌কার বেড়ার গায়ে তুলিয়া দিয়া সে সেই অন্ধকারের মধ্যেই নীলমণিবাবুর পানে চাহিল।

নীলমণিবাবু তেমনি গর্জ্জিয়া বলিলেন, "প্রণতি কোথায় তুই জানিস?"

শ্রী ধীরভাবে বলিল, "না, আমি জানিনে।"

ভূমিতে পদাঘাত করিয়া নীলমণিবাবু বলিলেন, "হ্যাঁ, তুই-ই জানিস। তুই লুকিয়ে তার সঙ্গে মাঝে মাঝে দেখা করিস, আমি তা শুনেছি।"

শ্রী চুপ করিয়া রহিল।

নীলমণিবাবু বলিলেন, "তুই সরে' যা, আমি বাগানে যাব।"

শ্রী বলিল, "আমি সরব না, বাগানে এখন যেতে পাবেন না।"

দৃঢ়কণ্ঠে নীলমণিবাবু বলিলেন, "আমি যাবই।"

শ্রী ততোধিক দৃঢ়কণ্ঠে বলিল, "যেতে পাবেন না আমি বলছি। ভাল চান যদি চলে যান।"

থমকিয়া নীলমণিবাবু তাহার মুখখানা দেখিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু অন্ধকারে কিছু দেখা গেল না।

একটু থামিয়া বলিলেন, "দেখ্ শ্রী, আমি তোকে এখান হ'তে তাড়িয়ে দিয়ে এখনি বাগানে যেতে পারি—তা জানিস? এখনও সরে' যা বল্‌ছি।"

শ্রী তেমনি দৃঢ়কণ্ঠে বলিল, "আমিও বলছি জ্যেঠাবাবু, আমায় না মেরে ফেললে আপনি কখনও বাগানে যেতে পারবেন না। বাস্তবিক আমি বলছি, প্রণতি এখানে নেই।"

নীলমণিবাবু বলিলেন, "তবে কে আছে?"

শ্রী মুখ ফিরাইয়া বলিল, "আছে কেউ, আমি তা বল্‌তে পারব না।"

"ভ্রষ্টা, দুশ্চারিণী, এ গ্রামে আর তোর জায়গা হবে না তা জেনে রাখিস।"

নীলমণিবাবু দ্রুতপদে চলিয়া গেলেন।

শ্রীর সর্ব্বাঙ্গ থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল, সে চারিদিক অন্ধকার দেখিয়া সেখানে বসিয়া পড়িল।

পিতা অন্তর্হিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই প্রণতি সেখানে আসিয়া দাঁড়াইল, ব্যগ্রকণ্ঠে বলিল, "বাবা চলে গেছেন শ্রী?"

"হ্যাঁ,"—রুদ্ধকণ্ঠে শ্রী উত্তর দিল।

প্রণতি বলিল, "আমিও চললুম। তোমার সেই দেবতার নামে দিব্য শ্রী, কেউ যেন না শুনতে পায় আমি এসেছিলুম।"

নিমেষে সে ও ললিত অন্তর্হিত হইয়া গেল। শ্রী সেই খানে তেমনি ভাবে বসিয়া রহিল।

(৭)

ইহার পরে শ্রীর সে গ্রামে বাস করাই দুরূহ হইয়া উঠিল। গ্রামে একটা কোলাহল উঠিয়া পড়িল সে যথার্থই দুশ্চারিণী। নীলমণিবাবুকেও সে অপমান করিতে ছাড়ে নাই, এমন স্ত্রীলোক গ্রামে রাখিতে নাই।

মাতব্বর লোকদের কমিটী বসিয়া গেল, ইহাতে স্থির হইল শ্রীর মাথা মুড়াইয়া ঘোল ঢালিয়া দিয়া গ্রাম হইতে বিদায় করিয়া দেওয়া উচিৎ।

বিষাদে শ্রী শুধু একটু হাসিল।

নিজে সে এ কলঙ্ক মাথায় তুলিয়া লইল কাহার জন্য? আজ গ্রামে তাহার মুখ দেখাইবার যো নাই, সে পথে বাহির হইলেই গ্রামের ছেলেরা করতালি দিয়া পিছনে নাচিতে নাচিতে যায়। এ সব কাহার জন্য? কিন্তু হায়, ইহাতে সার্থকতা আছে কি? যাহার জন্য এ কলঙ্ক-বোঝা মাথায় তুলিয়া লওয়া সেও জানে না কেন শ্রী স্বেচ্ছায় এ কলঙ্ক মাথায় লইল।

শ্রী পথে ঘাটে আর বাহির হইত না। মাসীমা যাহা পারিত করিত, অন্য কাজ শ্রী যাহা করিত তাহা সকলের অগোচরে।

ঠিক এই সময় শচীনাথবাবুর সহিত নীলমণিবাবুর বন্ধুত্ব পুনঃ স্থাপিত হইল। কন্যার ভাব দেখিয়া নীলমণিবাবু আর কোথাও তাহার বিবাহের সম্বন্ধ করেন নাই। গৃহিনীর ভর্ৎসনায় বাধ্য হইয়া তাঁহাকে শচীপতিবাবুর কাছেই মাথা নত করিতে হইল, শচীপতিবাবুও তাঁহাকে অন্তরের সহিত আলিঙ্গন করিলেন।

উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে বিবাহের আয়োজন হইতে লাগিল। খুব ধুমধামের বিবাহ, গ্রামে একটা সাড়া পড়িয়া গেল।

এ সংবাদ শ্রীর কানেও পশিল। সে কিছুতেই তাহার দীর্ঘ নিশ্বাসটা রোধ করিতে পারিল না।

খুব জাঁকের সহিত বিবাহ শেষ হইয়া গেল। গ্রামের ইতর ভদ্র সকলেই সে বিবাহে নিমন্ত্রিত হইল—বাদ পড়িল কেবল শ্রী।

এ উৎসবের মধ্যে তাহার কথা ললিত বা প্রণতি কাহারও মনে পড়ে নাই। এটা হওয়া খুবই স্বাভাবিক, কারণ জগতে কয়জন লোক উপকারীর উপকার মনে করিয়া রাখে? ললিত বা প্রণতির ইহাতে দোষ ছিল না।

একবার নব দম্পতিকে চোখের দেখা দেখিবার জন্য তাহার হৃদয়টা ভারি ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু কি হইবে দেখিয়া? তাহাকে সে নিজেই জানে না।

এবার সে চলিয়া যাইবে, জনমের মত এদেশ ছাড়িয়া সে যাইবে, তাহার কার্য্য ফুরাইয়াছে।

বিবাহের পরও দুই তিন দিন ললিত সেখানে ছিল। সেদিন সন্ধ্যাবেলায়—পথ ঘাট যখন লোকশূন্য, তখন শ্রী অন্য দিনের মতই নীলমণিবাবুর পুষ্করিণীতে জল আনিতে গিয়াছিল। পুষ্করিণীটা বাড়ীর পিছন দিকে ছিল, সে যে প্রত্যহ তাহা হইতে সন্ধ্যাবেলায় জল লইতে আসিত তাহা জানিতে পারিলে নীলমণিবাবু বোধ হয় সেখানে পাহারা বন্দোবস্ত করিতেন। বাস্তবিকই সেদিন এই ছোটলোকের মেয়ের ধৃষ্টতা দেখিয়া তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া গিয়াছিল, এবং ইহার উচ্ছেদ সাধনে তিনিই যত্নবান ছিলেন।

সে রাতটা ছিল জ্যোৎস্নামাখা। শুক্লা দ্বাদশীর চাঁদ সন্ধ্যার অনেক আগেই আকাশে ভাসিয়া উঠিয়াছিল। বৈশাখের মৃদুল স্নিগ্ধ বাতাস প্রস্ফুটিত হেনার গন্ধ বুকে লইয়া ছুটাছুটি করিতেছিল। শ্রী জলের মধ্যে নামিয়া গলা পর্য্যন্ত ডুবাইয়া সুনীল আকাশে তারকা-বেষ্টিত হীরক-খণ্ডবৎ চাঁদের পানে চাহিয়াছিল। বাতাস আসিয়া তাহার ললাটোপরি পতিত কুঞ্চিত কেশগুচ্ছ নাচাইয়া দিয়া চলিয়া যাইতেছিল, তাহার হস্তচ্যুত কলসীটাকে ঠেলিয়া লইয়া যাইবার চেষ্টা করিতেছিল। তাহার বাহ্য-জ্ঞান তখন একেবারেই বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল।

সহসা ঘাটের উপর কথা শুনিতে পাইয়া তাহার জ্ঞান ফিরিয়া আসিল, সে তাড়াতাড়ি কলসী ডুবাইয়া লইয়া মুখে অল্প অবগুণ্ঠন টানিয়া সিঁড়ি বাহিয়া উঠিতে লাগিল।

জ্যোৎস্নাধৌত যামিনীতে গৃহ অপেক্ষা উদ্যানে বসিতে ভাল বলিয়া ললিত তাহার এখানকার কয়েকটী বন্ধুসহ ঘাটে আসিয়া বসিয়াছিল।

তাহাদেরই মধ্যে একজন বিদ্রূপ ভঙ্গীতে বলিয়া উঠিল, "আরে, এ যে আমাদের কৈবর্ত্তের বেটী। আজ কোথায় অভিসারে গেছলেন, এত রাতে এসেছেন ঘাটে জল নিতে।"

শ্রী? বিস্ময়ে ললিত মাথা তুলিল।

অপর বন্ধু তাহাকে একটা ঠেলা দিয়া বলিল, "বুঝেছ হে, এমন পাজি স্ত্রীলোক যদি দুটি দেখা যায়। একেই তো মাথা মুড়িয়ে ঘোল ঢেলে গাঁ হ'তে তাড়িয়ে দেবার কথা তোমার শ্বশুর বলছিলেন। বেটি কি সয়তানী—উঃ।"

ললিত শুধু বলিল, "বটে?"

বন্ধু বলিল, "তা বই কি। থাকে ভিজেভিজে বিড়ালটী, খান কিন্তু মাছের মুড়ো। এমন স্ত্রীলোককে গাঁ-ছাড়া করা উচিৎ কি না বল তো?"

উৎসাহিত ভাবে ললিত বলিল, "নিশ্চয়ই উচিৎ—নইলে দৃষ্টান্ত দেখে অন্য লোকে বদ হয়ে যাবে।"

শ্রী একবার ফিরিয়া দাঁড়াইল, অগ্নিস্পর্শী কটাক্ষে একবার ললিতের পানে চাহিল, তাহার পর ধীর পদে বাড়ী চলিয়া গেল।

হাঁ, এই তো যোগ্য পুরস্কার! যাহারা তখন প্রণয়ী প্রণয়িনী ছিল এখন তাহারা স্বামী-স্ত্রী। তাহারা ইচ্ছা-পূর্ব্বক ভাল দিক দেখিতে ভুলিয়া গিয়াছে, উপকারীর উপকার বিস্মৃত হইয়াছে, মনে করিয়া আছে অনুপকারিতা।

সেদিন যখন নীলমণিবাবু আসিয়াছিলেন, তখন সে যদি ভয়ে দরজা ছাড়িয়া দিত, প্রণতি ও ললিতের কি অবস্থা হইত। সে দৃঢ়ভাব সহিত দ্বার রক্ষা করিয়াছিল বলিয়াই আজ তাহার এই দণ্ডের ব্যবস্থা।

খুব হয়েছে, খুব হইয়াছে। নিজের হৃৎপিণ্ড নিজে সে কুচি কুচি করিয়া কাটিয়া অগ্নিতে দগ্ধ করিয়াছে, তবু তো সে মরে নাই। ভালবাসার যোগ্য পুরস্কার সে আজ যথার্থ লাভ করিয়াছে। আর না, সে যথার্থই এস্থান ত্যাগ করিবে। এমন স্থানে যাইবে যেখানে ললিতের চোখে পড়িতে হইবে না, তাহার নাম ললিতের কাণে যাইবে না।

প্রভাতে শয্যা ত্যাগ করিয়াই সে নিজের দুই-চারখানা কাপড় একটা বোচকা বাঁধিয়া লইয়া অপর কক্ষে শায়িতা মাসীমার কাছে গিয়া একটা প্রণাম করিয়া বলিল, "মাসীমা চললুম।"

মাসীমা অবাক হইয়া বলিল, "কোথা যাচ্ছিস?"

"সে এক অজানা দেশে।"

মাসীকে আর কোনও কথা বলিবার অবকাশ না দিয়াই সে বাহির হইয়া পড়িল।

কোথায় কে গাহিতেছিল—

যে দেশে যাইব যে দেশেতে ওগো
কানুর নাম না আছে।

ঝর ঝর করিয়া জলধারা শ্রীর চোখ ছাপাইয়া পড়িল। রুদ্ধকণ্ঠে সে বলিয়া উঠিল, "এ জন্মে নয়, পর-জন্মে তোমার আসনের পাশেই স্থান পাব। এখন তুমি আমায় ঘৃণা কর, পায়ে দলে' যাও, কিন্তু সে-জন্মে তুমি শুধু আমার।"

সংগ্রহ ও সঙ্কলন।

সাঁওতালী ভাষা।

সাঁওতালজাতিকে আমরা জংলী বলে' জানি। কিন্তু জংলী হ'লেও এদের ক্ষুদ্রভাষার মধ্যে একটা পদ্ধতি আছে, এদেরও ভাষা একেবারে ব্যাকরণকে ছাড়াতে পারেনি। তারা কারও কাছে কথা ধার করে' নেয় নি। তাদের বেষ্টনীর মধ্যে যেটুকু জ্ঞান ছিল তা' প্রকাশ করতে তাদের ভাষার অভাব হয় নি। কিন্তু এখন সভ্যতার যেটুকু সংস্পর্শ পেয়েছে, তার মধ্যে আর তাদের নিজস্ব কিছু নেই—সব আমদানী-করা কথা। এখন এদের ভাষার মধ্যে অনেক বিজাতীয় কথা আশ্রয় পেয়েছে। ভারতের যেখানেই সাঁওতাল আছে, তাদের সকলেরই ভাষা এক, তবে হয়ত একটু প্রাদেশিকতা দোষে দুষ্ট হতে পারে।

তারা চিরদিন পাহাড়, জঙ্গল, গাছ, পাতা প্রভৃতি দেখে আসছে, সেইজন্য তাদের ভাষায় ও-সব কথার অভাব হয় না।

যেমন—

গাছ = দারে	জঙ্গল = বীর	মেঘ = রিমিল
পাতা = সাকাম্	পাহাড় = বুরু	চাঁদ = চাঁদোবোঙ্গা
কাঠ = সাহান্	আকাশ = সেরমা	
ফুল = বাহা	নক্ষত্র = ইপিল্	

তাদের ব্যবহার্য্যের মধ্যে ছিল লোহা, সোনা রূপা ছিল না, তাই লোহার সাঁওতালী নাম 'মেড়্হেন'। কিন্তু সোনা-রূপাকে তারা সোনা-রূপাই বলে।

অস্ত্রশস্ত্রের মধ্যে তারা লোহার জিনিষই ব্যবহার করত আর তাতে অনেক রকম জিনিষ হ'ত,

যেমন—

টাঙ্গি = কাপি	কুড়ল = বুড়িয়া
বর্শা = বরছি	কাটারি = দাত্রম্ (সঃ দাত্র = দা)
গাঁইতি = কাকুয়া	কোদাল = কুডি

তাদের খাদ্যও তখন অতি সাদাসিধা ধরণের ছিল। ধানের চাষ তারা জানত, কিন্তু এখনকার মত এত-রকম তরকারি তাদের ছিল না। খাদ্যের মধ্যে তেঁতুল, নুন, মাছ, মাংস, ভাত, বুনো আলু, নানাপ্রকারের শাক। তাদের তরকারির নাম—

বেগুন = বেঙ্গার	মাছ = হাকু	শাক = আড়া
তেঁতুল = যজ	মাংস = জীল	ভাত = দাকা
নুন = বুলুং	ডিম = বিলি	তরকারি = উতু

কিন্তু ডাল, পান, সুপারি, কপি ইত্যাদির নাম তাদের ভাষায় নেই। বোধ হয় শুদ্ধ কলাই সিদ্ধ করে' খেত, তাই কলাইএর সাঁওতালী নাম উপি।

তাদের গৃহপালিত পশুর মধ্যে গাই, বলদ, ঘোড়া, ভেড়া আর মহিষ ছিল, কারণ এগুলির নাম সাঁওতালী ভাষায় পাওয়া যায়।

গাই = ডাংরি	ঘোড়া = সাদোম	কুকুর সীতা
বাছুর = মিহ	ছাগল = মেরম্	মহিষ = কাড়্হা
বলদ = ডাংরা	ভেড়া = মেড়্হি	

তাদের জঙ্গলের মধ্যেও যে-সব জানওয়ার দেখতে পেত, তারও নাম এদের ভাষায় পাওয়া যায়।

ব্যাঘ্র = তারুপ্
শৃগাল = তুইয়্
হনুমান্ = গোড়ি
ইত্যাদি।

এদের পরিধানের শুদ্ধ কাপড় ছাড়া আর কিছু ছিল না, কারণ আর কিছুর সাঁওতালী নাম আমরা পাই না। কাপড় = লুগরি। এ ছাড়া আমরা জামার একটা সাঁওতালী কথা 'দন্ত' পাই। আমার মনে হয় এটা—সাঁওতালরা এক রকম গাছের ছালকে পিটিয়ে গেঞ্জির মত করে' পরে, তা থেকেই উৎপন্ন হয়েছে। এখন তাদের মধ্যে জুতা ছাতা প্রভৃতির চলন হয়েছে, কিন্তু তার সাঁওতালী কথা জুতোম্ আর ছাতোম্।

তেলের মধ্যে এরা সরিষা, কোঁচড়া আর রেড়ীর তৈলই দেখে এসেছে, সুতরাং এই ক'টারই কথা পাওয়া যায়।

তেল = সুনুম্　　কোঁচড়া = কুইণ্ডি
সরিষা = তুড়ি　　রেড়ী = জারা

এরা বোধ হয় বরাবরই চাষ করত, তাই ধান সংক্রান্ত সব কথা এদের ভাষার মধ্যে পাওয়া যায়।

ধান = হড়　　পাকা ধান = গুম
জমি = বৈহাড়　　ধান ঝাড়া = কোচায়
ধানের শিষ = হুড়গেলে　　ধানের আগড়া = পেটেট।

এদের মধ্যে আগে বোধ হয় কোন যানের ব্যবস্থা ছিল না, তাই কোন গাড়ীর কথা এদের ভাষায় পাওয়া যায় না। আরও বোধ হয় এরা পূর্ব্বে লাঙ্গল দিয়ে চাষ করতে জানত না, তাই লাঙ্গলের কোন সাঁওতালী কথা নাই।

ঘরের মধ্যে এদের সব কুঁড়ে-ঘর। সুতরাং তারই কথা এদের ভাষার মধ্যে পাওয়া যায়। কিন্তু পাকা ঘরের বা ইটের কথা এদের ভাষায় পাওয়া যায় না।

ঘর = ওড়া
দড়ি = বাবের
বাঁশ = মাচট্

এদের শোবার জিনিষের মধ্যে শুধু এক খাটিয়া আর যদি থাকে ত কাঁথা। কিন্তু কাঁথাও বোধ হয় তাদের নিজস্ব নয়। কারণ সাঁওতালী খান্থা কথাটা প্রায় কাঁথারই কাছাকাছি।

খাট = পারকোম্,
কাঁথা = খান্থা

এরা মেয়ে-পুরুষ সকলেই বড় সঙ্গীতপ্রিয়। যখন এদের মেয়েরা সারাদিন পরিশ্রমের পর, স্তিমিত সন্ধ্যালোকে পরস্পরের হাত ধরাধরি করে' গান গাইতে গাইতে বাড়ী যায়, তখন এদের সেই শান্ত হাস্যময় মুখছবি দেখে মনে হয় এরাই বুঝি জগতে সুখী। পুরুষেরা মুখে গান খুব কমই গায়, তারা শুধু বাঁশীতে আর একতারায় গান করে।

গান = সেরেঞ্　　বাঁশি = তিরিও।
একতারা = বানাম্।

বর্ত্তমানকালে এদের সব কথায় কাণা যোগ হয়ে থাকে, যথা—

যাচ্ছে = চলাকাণা
খাচ্ছে = জোম্‌কাণা
নিচ্ছে = ইদিকাণা

ভবিষ্যৎ কালে 'য়া' যোগ হয়ে থাকে, যথা—

যাবে = চলায়া
খাবে = জোময়া
নিবে = ইদিয়া

অতীত কালে অকর্ম্মক ও সকর্ম্মক ক্রিয়া অনুসারে 'এনা' ও 'কেয়া' যোগ হ'য়ে থাকে, যথা—

গিয়েছিল = চলাওলেনা (অকর্ম্ম)
খেয়েছিল = জোমকেয়া
নিয়েছিল = ইদিকেয়া

কাউকে কিছু করতে বল্‌বার সময় (অনুজ্ঞায়) 'মে' যোগ হয়ে থাকে, যথা—

যা = চলামে
খা = জোম্‌মে
নে = ইদিমে

প্রথম পুরুষের ভবিষ্যৎ কালে 'আঁই' যোগ হয়ে থাকে, যথা—

যাব = চলা যাঁই
খাব = জোম্ আঁই
নোব = ইদি আঁই

একবচনে ও বহুবচনে সব এক। কিন্তু কাউকে আজ্ঞা

কর্‌বার সময় বর্ত্তমানকালে দ্বিবচনে বিন ব্যবহৃত হয়, যথা—

ঠেল—ঢাকায়বিন্।

বিশেষ্য ও 'কাণা' যোগে ক্রিয়া হ'য়ে থাকে, যথা—

তরকারি—উতু। তরকারি কর্‌ছে—উতুকাণা।

আমাদের যেমন 'থেকে', ওদের তেমনি সেই স্থলে 'থন্' ব্যবহৃত হয়, যথা—

পাহাড় থেকে আন্‌ছি—বুড়্‌থন্ আগুকাণা।

আমাদের 'তা হ'লে' অর্থে ওদের 'খান' ব্যবহৃত হয়, যথা—

কাজ কর নৈলে অনুপাস্থিত কর্‌ব,
কামিমে বাংখান্ নাগা মিয়াই।
ধান শুকালে ভাত হবে, গুড়ু রোহরলেনখান দাকা হুংডয়া

এদের গানের চরণে মিল না থাক্‌লেও একেবারে ভাবের অভাব থাকে না। হাসির গানও এদের মধ্যে যথেষ্ট আছে।

সেদায় ইঙ্গায় তিকিন্, সেদায় নাপুণ তিকিন্
তোয়াতাবিন্ তিকিং হারালিদিয়াকিণ্।

'আর বছর আমার বাবা ছিল, মা ছিল, দুধ চিঁড়া ছিল। এ-বছর কে আমায় খেতে দিবে?'

হাসির গান—

বুড়ুরে সিং আড়া, দাড়ে গে বাং
কচারে লাবোয় গিয়ে তেঙ্গাংগে বাং

'পাহাড়ে সজিনার শাক আছে, তুলতে পার্‌ছি না। ঘরের কোণে মুর্‌গীটা রয়েছে, ভগ্নীপতি নেই যে মেরে দেয়।'

এ গানটা শুন্‌লে এরা হেসে অস্থির হ'য়ে পড়ে।

মোটের উপর আমরা যা দেখ্‌তে পাচ্ছি, তাতে বোঝা যাচ্ছে যে, এই ভাষাটাকে বেশ একটা লিখ্‌বার ভাষায় পরিণত কর্‌তে পারা যায় যদি অক্ষরগুলো তৈরী হয়।

অক্ষর-তৈরী সম্বন্ধেও একটু গোল আছে। আমাদের অক্ষরে লিখ্‌লে, সব কথার উচ্চারণ ঠিক হবে না। দু একটা অক্ষর বদ্‌লাতে হবে। যেমন 'পেরেছিস্—গ্ঙামলেয়া?' এর বানান 'ঙ' দিলে কতকটা হয়, কিন্তু এরা যে নাকের ভিতর থেকে একটা সুর বা'র করে, তা হয় না।

শ্রীকালীপদ ঘোষ
প্রবাসী, বৈশাখ, ১৩৩০।

ব্রাহ্মণের সংজ্ঞা।*

(জৈন-শাস্ত্রের মত)

'যিনি ব্রাহ্মণ বলিয়া অভিহিত হন, তিনি অগ্নির ন্যায় মহিমান্বিত। জ্ঞানিগণ তদ্রূপ প্রকৃত তেজঃসম্পন্ন ব্যক্তিকেই ব্রাহ্মণ বলিয়া অভিহিত করেন। ১৯॥ যিনি কোনও পার্থিব আকর্ষণে আবদ্ধ নহেন; সন্ন্যাস-গ্রহণে কদাচ যাঁহার মনে অনুশোচনা আসে না; সৎকথায়ই যাঁহার আনন্দ;—তাঁহাকেই ব্রাহ্মণ বলে। ২০॥ যিনি রাগ-দ্বেষ-আশঙ্কা প্রভৃতির অতীত, যিনি অগ্নিদগ্ধ সুবর্ণের ন্যায় জ্যোতিঃ-সম্পন্ন;—তাঁহাকেই প্রকৃত ব্রাহ্মণ বলা যায়। ২১॥ যে আত্মসংযমশীল সাধু অস্থি কঙ্কালসার হইয়াও পবিত্রতা-সম্পন্ন নির্ব্বাণ-পথের পথিক,—তাঁহাকেই ব্রাহ্মণ বলা যায়। ২২॥ যিনি সর্ব্বতোভাবে প্রাণি-পর্য্যায়-তত্ত্বে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন, গতিশীল বা গতিহীন কোনও জীবের প্রতিই যিনি কোনও প্রকার অনিষ্টকারী নহেন,—তাঁহাকেই ব্রাহ্মণ বলা যায়। ২৩॥ যিনি ক্রোধে বা পরিহাসচ্ছলে অথবা লোভপরবশ হইয়া বা ভীতিপ্রাপ্ত হইয়া কদাচ মিথ্যা-বাক্য প্রয়োগ করেন না,—তাঁহাকেই ব্রাহ্মণ বলা যায়। ২৪॥ অল্প হউক, অধিক হউক, প্রয়োজনীয় হউক, অপ্রয়োজনীয় হউক, যিনি অদত্ত বস্তু কদাচ গ্রহণ করেন না,—তাঁহাকেই প্রকৃত ব্রাহ্মণ বলা যায়। ২৫॥ চিন্তায়, বাক্যে বা কার্য্যে কোনও মনুষ্যের বা কোনও প্রাণীর প্রতি যাঁহার ইন্দ্রিয় আসক্ত নয়,—তিনিই প্রকৃত ব্রাহ্মণ-পদবাচ্য। ২৬॥ পদ্ম যেমন জলমধ্যে অবস্থিত থাকিয়াও জলে আসক্ত আর্দ্র নয়, সেইরূপ সংসারে সুখের মধ্যে থাকিয়াও যাঁহার চিত্ত সে সুখে কলুষিত নহে,—তাঁহাকেই ব্রাহ্মণ বলা যায়। ২৭॥ যাঁহার লোভ নাই, যিনি অজ্ঞাতবাসে জীবনযাপন করেন, যাঁহার গৃহ নাই বা যিনি কোনও সম্পত্তির অধিকারী নহেন এবং সাংসারিক কোনও ব্যক্তির সহিত যিনি বন্ধুত্ব-বন্ধনে আবদ্ধ নহেন;—তাঁহাকেই ব্রাহ্মণ বলা যায়। ২৮॥ আত্মীয়-স্বজন প্রভৃতির সহিত যাঁহার সর্ব্বরূপ সম্বন্ধ ছিন্ন

---

* সাধারণ পাঠকের অনাবশ্যক বলিয়া আমরা শুধু বঙ্গানুবাদ-টুকুই উদ্ধৃত করিলাম।

হইয়াছে এবং যিনি কোনরূপ সুখের জন্য আদৌ আকাঙ্ক্ষা-যুক্ত নহেন,—তাঁহাকেই ব্রাহ্মণ বলা যায়। ২৯॥'

'কেবল মস্তক মুণ্ডন করিলেই শ্রমণ হওয়া যায় না; কেবল ওঁকার শব্দ উচ্চারণ করিলেই ব্রাহ্মণ হওয়া যায় না; কেবল অরণ্যে বাস করিলেই তাপস হওয়া যায় না। রাগ-দ্বেষ প্রভৃতির প্রতি সাম্যভাব উপস্থিত হইলেই শ্রমণ হওয়া যায়; ব্রহ্মচর্য্য দ্বারাই ব্রাহ্মণ হওয়া যায়; জ্ঞানের দ্বারাই মুনি হওয়া যায়; সংযমের দ্বারাই তাপস হওয়া যায়। কর্ম্মের দ্বারাই ব্রাহ্মণ, কর্ম্মের দ্বারাই ক্ষত্রিয়, কর্ম্মের দ্বারাই বৈশ্য, কর্ম্মের দ্বারাই মানুষ শূদ্র হয়।' যিনি সর্ব্ব-কর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তিনিই প্রকৃত ব্রাহ্মণ—

"সব্ব কম্ম বিনিম্মুক্তং তং বয়ং বুমমাহণং॥ ৩৪॥"

সাহিত্য-সংবাদ, বৈশাখ, ১৩৩০।

চূণ ও স্বাস্থ্য।

ভারতবর্ষে পান খাওয়ার প্রচুর প্রচলন আছে। পানের চূণ শরীরের পক্ষে কতটা উপকারী তাহা সকলেই যে জানেন এমন নহে। শরীর পুষ্টি ও স্বাস্থ্যের জন্য শরীরে উপযুক্ত পরিমাণ খনিজ দ্রব্য বর্ত্তমান থাকা প্রয়োজন। উহা না থাকিলে শরীর পুষ্টির অভাবে রোগ এবং মৃত্যু নিশ্চয়।

খনিজ দ্রব্যের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় চূণ বা তাহার লবণ, উহার অভাবে পুষ্টি হয় না। বর্ত্তমান সময়ে লোকে শরীরে চূণের প্রয়োজন সবে মাত্র বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছে। অনেক সময় দেখা যায় যে, শরীরে চূণের অভাবে রোগ হইয়াছে। চূণ বেশী পরিমাণ না থাকায় শরীরের সকল যন্ত্রে পুষ্টির অভাব ঘটিয়া এরূপ রোগ হয়।

রিকেট রোগ হয় শরীরে চূণের অভাবে। অস্বাস্থ্যকর স্থানে থাকিয়া, সূর্য্যালোকের অভাব প্রভৃতি যে কোন কারণেই হউক না কেন, চূণের অভাব হয়। কতকগুলি যক্ষ্মারোগের যে কারণ চূণের অভাব তাহা নিশ্চিত স্থির হইয়াছে।

প্যারা থাইরয়েড Para thyroid নামে এক গ্রন্থি আছে, উহার কার্য্য থাইরয়েড thyroid গ্রন্থির ঠিক বিপরীত এবং পেশী সকলে চূণ সমাবেশ করা প্যারাথাই-রয়েড গ্রন্থির একটা বিশেষ কার্য্য, সেই জন্য চূণের অভাবে ঐ গ্রন্থি যদি ভাল করিয়া কার্য্য করিতে না পারে, তবে মানুষের স্নায়ু উত্তেজিত হয় ও নানারূপ স্নায়ু সম্বন্ধীয় রোগ হইতে পারে। এক জন রোগীর স্নায়ুরোগের অতিবৃদ্ধি হইলে পর তাহাকে বৃষের ঐ গ্রন্থি চূর্ণ করিয়া সেবন করাইবার ফলে তাহার ঐ রোগ আরাম হইয়াছিল।

শরীরে বিষোৎপাদন হইলে দেখা গিয়াছে যে, ঐ রোগীর রক্তে চূণের ভাগ কম হইয়াছে। চূণ সেবন করিলে রক্ত সঞ্চালন ভাল করিয়া হয় এবং সেইজন্য হজম শক্তিও বাড়ে। চূণ সেবন করিলে যক্ষ্মা রোগীর রাত্রের ঘাম বন্ধ হয়। চূণের অভাবে যেমন স্নায়ু উত্তেজিত হয়, তেমনি চূণ সেবনে উত্তেজিত স্নায়ু সকল স্থির হয়। পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে, যাহার শরীরে চূণের অভাব আছে তাহার শরীর চূণ সেবন করিলে পুষ্টিলাভ করে। শরীরে চূণের অভাব থাকিলে খাদ্যের পরিবর্ত্তন করিলেই রোগ আরাম হইবে না। চূণও সেবন করিতে হইবে। সকল রোগেই শরীর হইতে চূণ বাহির হইয়া যায়। যখন পুষ্টি কম হয়, স্নায়ুর রোগ হইয়া থাকে তখন শরীরে চূণের ভাগ কম থাকিলে পরিপাক ভাল হয় না তজ্জন্য পুষ্টিও হয় না। স্বাভাবিক অবস্থায় শরীরে প্রচুর পরিমাণে চূণের প্রয়োজন রহিয়াছে।

উপাসনা, চৈত্র, ১৩২৯।

কবিতা-কুঞ্জ।

নববর্ষের প্রার্থনা।

[শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল, বি-এল]

ললাট আমার উজল কর
আলোকের এই স্পর্শে,
ভাসাও আমার হৃদয়-হিয়া
তোমার আকুল হর্ষে!
বাতাসের এই ছন্দে
যেন এ প্রাণ স্পন্দে
সোণার ধানে ছেয়ে থাক্ মোর
ক্ষেত্র,—নবীন বর্ষে!
ফুলের সাথে দুলাও আমায়
দুলাও তারার সাথে,
দুলাও কচি নবীন ঘাসে
দুলাও দিবস-রাতে।
দুলাও পাখীর গানে
আমায় দুলাও শাখীর তানে
দুলাও আমায় যেই আনন্দে
ছয়টি ঋতু মাতে!
পূর্ণ কর হৃদয় আমার
বিশ্বধরার গানে,
স্বার্থ দ্বেষ দৈন্য যেন
রয় না কোনও খানে।
সবারে লই বুকে
দুঃখে এবং সুখে
তৃপ্ত করি চিত্ত সবার
ভালবাসার প্রাণে!
এই তো চির আকাঙ্ক্ষা মোর
সফল হবে কবে,
এই আকাশ এবং আলোর সাথে
কবে মিলন হবে'
থাম্ রে আমার কান্না
বইবে প্রেমের বন্যা
সবার ভালবাসার সাথে
সেই সে বাঁধা র'বে।

পারের ডাক। *

[শ্রীঅক্ষয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বি-এ]

আয় রে ত্বরা আয় রে নিয়ে সোণার তরী পারের নেয়ে
আর বেলা নাই ক্লান্তদেহে আস্‌ছি শত যোজন ধেয়ে,
খেয়ার কড়ি যত্ন ক'রে তোরই তরে সাথে সাথে
রেখেছি আয় পার ক'রে দে যেতেই হবে বিপদ্-মাথে।
কারা তোরা ডাক্‌লি এখন কাল জলের আঁধার কূলে
বিপদ-ছায়া-মাখা মেঘে, এলি তোরা পথটা ভুলে,
ভয়চকিত ভাঙা গলার মৃদু কোমল করুণ সুরে
কাঁদিয়ে পরাণ কাহার সাথে যাবি বল্‌না কত দূরে।
সাগর পারের স্বদেশ থেকে বিদেশে আজ দূর প্রবাসে
বড় আশায় প্রাণের জ্বালায় এসেছিলাম এরই পাশে,
অশ্বারোহী আস্‌ছে ধেয়ে খুরের ধূলি আকাশ ছেয়ে
ভয় কিছু নাই কোথা বা মেঘ আয় রে ত্বরা আয় রে নেয়ে
ধরতে যদি পায় রে তারা—মরণ আমার হবেই হবে
এত কোমল, এত কঠোর, এই প্রাণে এর এতই স'বে,
আর না কুমার নাইক দ্বিধা নাইক বাধা তোমার কাজে
চাইনা কড়ি থাকুক পড়ি, সরল আঁখি প্রাণে বাজে।
ভয় কিরে বাপ্ কিসের তরে ভীতি-মলিন আননখানি
উঠুক্ না ঝড় যাবই পারে বৃদ্ধ নেয়ের থাক্‌লে প্রাণি—
ত্বরা করি চল ওরে মাঝি ঘনঘটা আকাশ জুড়ে
লুব্ধ সাগর ক্ষুব্ধ হ'য়ে তরীর 'পরে আছড়ে পড়ে।
(ওগো) ওই শোন ওই ডাক্‌ছে পিতা হাত নেড়ে তাঁর
স্নেহের ভরে,
আয় রে আমার কোলে আয় বাপ্ শাসন তোরে
কর্‌বনা রে।

---

* T. Campbellএর "Lord Ullin's Daughter"এর ছায়ায়

রাণী রাসমণির স্বপ্ন।

[শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক, বি-এ]

(১)

শুধু সারি সারি মন্দির গড়ি'
মিটিবে কি সাধ হরি হে,
অর্থ আমার দিলে যদি প্রভু
দাও সার্থক করি হে।
বড় মনোদুখে দিবস গুজারি
চাহে না কেহই হ'তে যে পূজারি
পূজাহীন মোর দেবতা কি শুধু
মন্দিরে রবে পড়ি' হে।

(২)

দিয়াছ জনম শূদ্রের ঘরে
সেবা যে আমার ধরমই,
মরমের ব্যথা জান হে দেবতা
অন্তর্য্যামী মরমী।
হে দরদী জানো হিয়ার দরদ
বুকে যে কমল ফোটালে শরৎ
চরণে দিবার নাহি অধিকার
ফিরে এনু পেয়ে সরমই।

(৩)

আমাব এ পূজা বিশ্বের রাজা
ব্যর্থ হবে হে কি কারণ,
অবলার লাজ নিবারো হে আজ
তুমি ত লজ্জা নিবারণ।
দেবতা আমার রবে কি ভুখারী
মেলে না পূজারি এ দেশ উঘারি
ব্রাহ্মণ দিল ব্যর্থ করিয়া
প্রাণপণ মোর আয়োজন।

(৪)

কেঁদে কেঁদে রাণী ঘুমায়ে পড়িল
ভক্তিতে বাঁধা শ্রীহরি,
পরাণ তাহার করিল পরশ
উঠিল রমণী শিহরি।
তন্দ্রা-আলোকে হেরে হৃদিরাজ
উদয় হয়েছে আজি হৃদিমাঝ
অমিয় বরষে সে মধু মাধুরী
মিটে না পিয়াসা নেহারি।

(৫)

সুমধুর বাণী কহে ওগো রাণী
পূজারি হবে না খুঁজিতে,
তোমার প্রেমেতে দেবতা যেতেছে
তোমারি দেবতা পূজিতে।
ওরে গরবিনী তোর দেবতায়
অনুরাগী বিনা পুজিতে কে পায়
সেবিত এবার সেবিবারে চায়
সেবকের সুখ বুঝিতে।

(৬)

কণক প্লাবনে প্লাবিল নয়ন
হেরে রাণী মহা পুলকে,
মন্দির তার বিশাল তীর্থ
ভরা দেয়ালীর আলোকে।
দূর দূর হ'তে যাত্রীর দল
পূত আঙিনায় আসে অবিরল
খেপেছে পূজারি ভকতির বলে
অভিনব পুরী ভুলোকে।

(৭)

জীবে শিবে দেয় করি একাকার
এ কি প্রেমধারা ঝরে গো,
এক হাতে সেবে নারায়ণে সেথা
দুই হাতে সেবে নরে গো।
করিয়া ভিক্ষা দীনেরে বিলায়
ঘরে পরে এক সাথেতে মিলায়
মহাপ্রাণতার কুম্ভমেলায়
সব ভেদাভেদ হরে গো।

চরকার গান।

[শ্রীলীলা মিত্র]

পর্ ভাই খদ্দর
ব্রাহ্মণ, শূদ্দর,
চরকায় ঘর্ঘর,
কর্ ভাই দিন্ ভর!
বল্ সব্ এক স্বর্
ছোটলোক্, ভদ্দর,
স্বদেশের যাহা কিছু
সব্ চেয়ে সুন্দর্!

বল্ সব্ ভাই, ভাই,
জাতিভেদ নাই, নাই,
স্বদেশীর দিন্ আজ্
পূত হোক্ অন্তর!
সুন্দর, সুন্দর,
ঘর্, দ্বার, অন্দর,
চৌদিকে তাঁত্ চাল্,
চরকার ঘর্ঘর!

বিবিধ প্রসঙ্গ।

"উদ্যোগিনং পুরুষসিংহমুপৈতি লক্ষ্মীঃ"—এই পুরুষসিংহ বাঙ্গালার ম্যালেরিয়া-দুষ্ট স্থানে দৃষ্ট হয় না। বাঙ্গালায় পুরুষসিংহের দারুণ অভাব। অধিকাংশই চাকুরীজীবী, ফলে নৈব চ নৈব চ। তাহারা পরস্পরকে বিশ্বাস করিতে পারে না, সর্ব্বকর্ম্মে সহযোগিতার অভাব, এবং এমন দিন আসিতেছে যখন বাঙ্গালীর নাম পর্য্যন্ত লুপ্ত হইবে। তাই বাঙ্গালা দেশের মধ্যবিত্ত বেকার লোকের ভবিষ্যৎ ভাবনায় আকুল হইয়া ৺রাধাচরণ পাল প্রমুখ কয়েকজন দেশহিতৈষী একটী সমিতি গঠন করেন। সমিতির কর্ত্তব্য, এই বেকার লোকদিগের অন্নসমস্যার একটা উপায় উদ্ভাবন করা।

কমিটি উপায় উদ্ভাবন করিবে, গবর্ণমেণ্ট তাহা অনুমোদন করিবে এবং সেই পন্থানুবর্ত্তী হইলে কতক বেকার লোকের মুখে অন্ন উঠিবে। ইহা অপেক্ষা লজ্জার বিষয় কি হইতে পারে? এই শস্যশ্যামল বাঙ্গালায় তোমাদের বাস। পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পণ্যবিক্রয়ের দিগন্তবিস্তৃত হাট তোমাদের নয়ন-সমক্ষে পড়িয়া রহিয়াছে। অথচ তোমরা নীরব নিথর, পরমুখাপেক্ষী এবং আত্মবিক্রয় করিয়া আত্ম-প্রতিষ্ঠার গৌরব তোমাদের মুখে ভাষার-ভুবড়ীতে প্রবহমান।

অন্ন-বস্ত্র ভিন্ন বাঙ্গালী ভারতবর্ষের অন্যান্য জাতি অপেক্ষা বিদ্যাবুদ্ধি গরিমায় শ্রেষ্ঠ ছিল, এখন তাহাতেও জাড্যভাব আসিয়াছে। অন্যান্য জাতি বাঙ্গালার ভাব ভাষা লইয়া লোফালুফি করিয়া দিন কিনিতেছে। তাই মহাকবির কথায় বলিতে হয়, "পেছিয়ে পড়ে র'বি কত সঙ্গীরা তোর গেল সবাই"।

*　　*　　*

সম্প্রতি ত্রিবাঙ্কুরের শ্রীযুক্ত এ, আর, পিলে A. R. Pillai & Co. নাম দিয়া জার্ম্মাণীর গোয়েটিন্‌জেন্ (Goettingen, Germany) নগরে আমদানী রপ্তানীর একটী বিস্তৃত ব্যবসায় খুলিয়াছেন। এতাবৎ এই কোম্পানী শুধু ষ্টেশনারী ও পুস্তকাদির ব্যবসায় করিতেন; এখন তাঁহারা ব্যবসায়ের প্রসার করিয়া নিম্নলিখিত সামগ্রীগুলিও ব্যবসায়ে চালাইতেছেন.

1. Printing machinery & materials.
2. Drugs, chemicals & Dyes.
3. Textile machinery & Textile Goods.
4. Electrical machinery, Hardware Goods &c.

সুখের বিষয়, প্রত্যেক বিভাগে একজন করিয়া বিশেষজ্ঞ কর্ম্মচারী ভারতবর্ষীয় ব্যবসায়ীর নির্দ্দেশে কার্য্য করিতেছেন। তাঁহারা উল্লিখিত সামগ্রী অতি সুবিধা দরে সরবরাহ করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন। উদ্দেশ্য সাধু!

*　　*　　*

ভারতবাসী যে এত উদ্যোগী হইয়াছেন, এজন্য আমরা বিশেষ আনন্দিত হইয়াছি ও শ্লাঘাবোধ করিতেছি। ভগবানের নিকট প্রার্থনা মিঃ পিলের প্রয়াস জয়মণ্ডিত হউক।

২০শ ভাগ] { আষাঢ়, ১৩৩০। } [৫ম সংখ্যা

গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী।

(৺দুর্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের রচিত)

[শ্রীপ্রিয়লাল দাস এম-এ, বি-এল]

বঙ্গভাষার অসংখ্য প্রাচীন মঙ্গল-কাব্যের মধ্যে ৺দুর্গা-প্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের রচিত "গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী" নামক গঙ্গা-মঙ্গল কাব্য অপেক্ষাকৃত আধুনিক সময়ে রচিত বলিয়া অনেকের বিশ্বাস। স্বর্গীয় অনাথকৃষ্ণ দেব "বঙ্গের কবিতা" (১) নামক সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থে ১৩১৭-১৮ সালে লিখিয়াছিলেন যে, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে এই মঙ্গল-কাব্য রচিত হইয়াছিল। তাঁহার মতে ইহা সাবেক পাঁচালীর শেষ ভাগ। "৭০।৮০ বৎসর পূর্ব্বে গ্রন্থখানি অনেকের প্রিয় ছিল। বর্ষীয়সী গৃহস্থ বধূগণ ইহার ছড়া কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিতেন।" (১) আমাদের মনে হয় যে, একশত বৎসরের বহু পূর্ব্বেও মঙ্গল-কাব্যের হিসাবে ইহার আদর ছিল। স্বনাম-প্রসিদ্ধ কেরী সাহেবের উদ্যোগে বঙ্গদেশে উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভকালে মুদ্রাঙ্কণ-শিল্প স্থাপিত হইলে যে সকল প্রাচীন পুঁথি মুদ্রিত হইতে আরম্ভ হয় সেগুলি বহু পূর্ব্ব হইতে যে বঙ্গীয় সমাজে লৌকিক ধর্ম্মকে জাগাইয়া রাখিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। একশত সাত বৎসর পূর্ব্বে সন ১২২৩ সালে অর্থাৎ ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে "গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী" সর্ব্বপ্রথম মুদ্রিত হয়। গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের পরিচয়-সম্বলিত প্রথম পৃষ্ঠাটি এইরূপ —

শ্রীশ্রীদুর্গা—

শরণং ॥—

গঙ্গাভক্তি তরঙ্গিণী পুস্তক ॥—

শ্রীভগীরথ গঙ্গা আরাধনা—

শ্রীগঙ্গার আগমন—

সগর সন্তানের উদ্ধার —

ও শ্রীভগীরথের স্বর্গ জাত্রা—

—০০০০।—,০০০৫—

৺দুর্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়—

মহাশয়ের রচিত —

—০০০০।—।০:০০—

সুরধুনিমুনিকন্যে তারয়েৎপুণ্যবন্তংস্বত
রতিনিজপুণ্যৈস্তএকিন্তেমহত্তং। যদি চ
গতিবিহীন ০ তারয়েৎপাপিন ০ মা ০ তদ
পিতনমহত্তং তন্মহত্তং মহত্তং ॥—

মেং ফেরিস সাহেবের আপিষে—
মুদ্রাঙ্কিত হইল—

সন ১২২৩ সাল-

---

(১) "বঙ্গের কবিতা" ১ম সং ২য় ভাগ, ১৩১ পৃ।

পুস্তকের মলাট ও উক্ত প্রথম পৃষ্ঠার মধ্যে মকরবাহিনী গঙ্গার চিত্র আছে। "শ্রীভগীরথ" গঙ্গাতীরে আসনের উপর বসিয়া স্তব করিতেছেন। চিত্র-শিল্পীর নাম রামচাঁদ রায়। চিত্রের নীচে ইংরাজি অক্ষরে ছাপা আছে—"Engraved by Ramchannd Roy."—চিত্রখানি এখনকার উড্ ব্লকের মত কাষ্ঠখণ্ডের উপর অঙ্কিত হইয়া যন্ত্রের সাহায্যে খোদিত ও তৎপরে কাগজে ছাপা হইয়াছিল। (২) একশত বৎসর পূর্ব্বেকার বাঙ্গালী চিত্রকরের শিল্প-নৈপুণ্যের এই নমুনা নেহাত মন্দ নয়।

১৮১৬ খৃষ্টাব্দে "গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী" মুদ্রিত হইবার কত বৎসর পূর্ব্বে ইহা রচিত হইয়াছিল, তাহার সন্ধান লইতে গেলে, প্রথমে রায়বাহাদুর দীনেশচন্দ্র সেন, ডি লিট্ মহাশয়ের "বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে"র আশ্রয় লইতে হয়। "গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী" সম্বন্ধে দীনেশবাবু লিখিয়াছেন,—"অনুমান ১০০ বৎসর পূর্ব্বে 'গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী' লিখিত হয়। সকল দেবতাই ভাষাকাব্যরূপ বাহনে আরোহণ করিয়া বঙ্গীয় গৃহস্থের ঘরে পূজা গ্রহণ করিতে আগমন করিলেন; বোধ হয় শিবের জটার কুটিল ব্যূহে আবদ্ধ গঙ্গাদেবী যথাসময়ে এ সংবাদ জানিতে পারেন নাই, বহু বিলম্বে তাঁহার ধারণা হইল "ভাষায় আমার গান নাই।" তখন কাল গৌণ না করিয়া উলাগ্রামে দুর্গাপ্রসাদের স্ত্রী হরিপ্রিয়ার স্কন্ধে আরূঢ় হইয়া স্বপ্ন প্রচার করিলেন,—'তোমার স্বামীকে কহিয়া আমার জন্য কাব্য লিখাও।' কিন্তু তখন ইংরেজাগমনে দেবদেবীর আফিস বন্ধপ্রায়; যে বৎসর রাজা রামমোহন রায় "হিন্দুগণের পৌত্তলিক ধর্ম্মপ্রণালী" রচনা করেন, সম্ভবতঃ সেই বৎসর স্ত্রীর মারফৎ প্রত্যাদেশ প্রাপ্ত হইয়া দুর্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় 'গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী' লিখিতে প্রবৃত্ত হন।" (৩) কবিরা কি পারিপার্শ্বিক ঘটনার প্রভাব অনুভব করেন না? কাব্য কি কেবল কবির মানস-কন্যা ছাড়া আর কিছুই নয়? কাব্য-ক্ষেত্রে দেবতাবিশেষের আবির্ভাবের সহিত সমাজের অবস্থাবিশেষের কি কোনও সম্বন্ধ নাই? "গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী" সম্বন্ধে দীনেশবাবুর কৌতুকপূর্ণ যুক্তি লইয়া আলোচনা ও এই সকল প্রশ্নের সমাধান করিবার পূর্ব্বে সেইজন্য এই কাব্যের রচনাকাল নির্ণয় করা আবশ্যক। রামমোহন রায়ের উক্ত পুস্তক কোন্ বৎসর রচিত হয়, দীনেশবাবু সে সংবাদ দেন নাই। রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় "বঙ্গের সাহিত্য" (Literature of Bengal) নামক ইংরাজি পুস্তকে রামমোহন রায়ের রচিত উল্লিখিত রচনা সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—"শিক্ষা শেষ হইলে রামমোহন স্বগ্রামে ফিরিয়া আসিলেন এবং ষোল বৎসর মাত্র বয়ঃক্রম কালে, ১৭৯০ খৃষ্টাব্দে, তিনি "হিন্দুগণের পৌত্তলিক ধর্ম্মপ্রণালী" নামক তাঁহার সুবিখ্যাত পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন।" (After completing his education Ram mohun returned to his native village, and at the early age of sixteen, in the year 1790, he wrote his famous work on the Idolatrous Religion of the Hindus.) দীনেশবাবু "বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে"র ইংরাজি সংস্করণে লিখিয়াছেন,—"নদীয়ার অন্তর্গত উলানিবাসী দ্বিজ দুর্গাপ্রসাদ কর্ত্তৃক সর্ব্বসাধারণের প্রীতিকর গঙ্গাদেবীর মাহাত্ম্য বিষয়ক গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। তিনি কাব্যখানি ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে লেখেন। * * * এই কাব্যে যথেষ্ট কবিত্ব শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়।" (The most popular work on Gangadevi is the one written by Dwija Durgaprasad—a native of Ula in Nudia. He wrote his poem about 1778 A. D. * * * This poem shows considerable power.—Bengali Language and Literature.) দ্বিজ দুর্গাপ্রসাদের "গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী"র রচনা কাল দীনেশবাবু "বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে"র ইংরাজি সংস্করণে কেন যে হঠাৎ ১২ বৎসর পিছাইয়া দিলেন তাহার কোনও

(২) এই কৌতুহল পুস্তকখানি লেখকের পারিবারিক প্রাচীন পুস্তক। ইহাতে আরও কয়েকখানি চিত্র ছিল। চিত্র-তস্কর কোনও বালক বা বালিকা কর্ত্তৃক সেগুলি বোধ হয় পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে অপহৃত হইয়া থাকিবে। চিত্রের অপর পৃষ্ঠায় লেখকের পিতামহীর মাতুলের নাম,—Cally churn Doss.—ইংরাজিতে স্বাক্ষরিত রহিয়াছে।

(৩) "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য", ৪র্থ সং।

কারণ নির্দ্দেশ করেন নাই। দীনেশবাবুর রচিত বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের এই সুবিখ্যাত ইতিহাসের বাঙ্গালা ও ইংরাজি সংস্করণে যখন অনৈক্য দেখা যাইতেছে, তখন "গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী"র বয়স নির্ণয় করিতে হইলে কবি নিজে তাঁহার কাব্য সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে একটু আলোচনা করা যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে হয়। কবির নিজের কথা আলোচনা করিবার পূর্ব্বে স্বর্গীয় রামগতি ন্যায়রত্ন "বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব" নামে বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের সর্ব্বপ্রথম ইতিহাসে "গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী" সম্বন্ধে যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা জানা দরকার। উক্ত ইতিহাসে ন্যায়রত্ন মহাশয় সংবৎ ১৯৩০ অর্থাৎ ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে লিখিয়াছিলেন—"অন্নদামঙ্গলের অব্যবহিত পরেই কোন ভাল বাঙ্গালা গ্রন্থ রচিত হইতে দেখা যাইতেছে না। উপরি উল্লিখিত পুস্তক অর্থাৎ গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণীই বোধ হয় অন্নদামঙ্গলের ঠিক পরেই রচিত। এই গ্রন্থ তত উৎকৃষ্ট কবিত্ব-শক্তি সম্পন্ন নহে। কিন্তু ইহা প্রাচীন সম্প্রদায়ের মধ্যে বিলক্ষণ প্রচলিত, ও অনেকের শ্রদ্ধাস্পদ, এবং মনসার ভাসান, চণ্ডী ও রামায়ণের ন্যায় ইহাও চামর-মন্দিরা সংযোগে সঙ্গীত হইয়া থাকে, এইজন্য ইহার বিষয়ে কিঞ্চিৎ লেখা আবশ্যক হইতেছে। নদীয়া জেলার অন্তর্গত উলা নিবাসী ৺দুর্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এই গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি গ্রন্থের প্রারম্ভে এইরূপে নিজ পরিচয় দিয়াছেন,—"নবদ্বীপ নিবসতি, নরেন্দ্র ভূপতি পতি, গোষ্ঠীপতি পতি যারে বলে। ইত্যাদি। দুর্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের প্রপৌত্র বা বৃদ্ধ প্রপৌত্র অদ্যাপি উলায় বাস করেন। প্রচলিত হিসাব ধরিয়া তাঁহাদের ৪।৫ পুরুষের সময় মোটামুটি গণনা করিলে উক্ত পুস্তকের বয়ঃক্রম প্রায় ১০০ বৎসর হয়।" ন্যায়রত্ন মহাশয়ের এই হিসাবে আলোচ্য গ্রন্থ আন্দাজ ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে রচিত হইয়াছিল। কিন্তু এই হিসাবও সম্পূর্ণ অনুমান-সাপেক্ষ। কোনও কোনও বংশে এক পুরুষের বয়স হয়ত ২৫ বৎসর, আবার কোনও বংশে ৫০ বৎসর। কুলীন কায়স্থগণের মধ্যে বর্ত্তমান সময়ে পর্য্যায়ের সংখ্যায় যে তারতম্য দেখা যায় তাহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, একটা আনুমানিক সংখ্যা ধরিয়া লইয়া এই কাব্যের বয়স বাঙ্গালীর জীবনকাল হিসাবে গণনা করা উচিত নয়। এইবার আমরা কবির নিজের কথা আলোচনা করিব। গ্রন্থারম্ভে দুর্গাপ্রসাদ লিখিয়াছেন,—

"শ্রীনাথ গণেশ গঙ্গা সর্ব্বদেবগণ।
বন্দনা করিয়া বলি শুন সর্ব্বজন॥
ঘোসাল বংসেতে জন্ম কৃষ্ণচন্দ্র ধির।
অনুজ গোকুল চন্দ্র পুত্র ভবানির॥
বুদ্ধিকীর্ত্তী নিরূপমা দেওয়ান জির দান।
কাঙ্গালির পিতা জার নামের বাখান॥
তার জেষ্ট শ্রষ্ট তার সুতা হরি প্রিয়া।
গঙ্গা যারে দেখা দিলা সপনে বসিয়া॥
প্রথম গ্রেন্থের সেই সপ্ন উপাক্ষণ।
সুনিলে আপদ খণ্ডে মধুর বচন॥" (৪)

এই কয়টি শ্লোকে কবি সহধর্ম্মিণী হরিপ্রিয়ার পিতৃবংশের পরিচয় দিয়াছেন। আলোচ্য কাব্যের ইহাই পূর্ব্বাভাস। ইহার শেষে যে ভণিতা আছে তাহা হইতে জানা যায় যে, কবির নিবাস উলাগ্রামে। "শ্রীদুর্গাপ্রসাদ জার নিবাস উলায়। করিল জীবন দান তারিণীর পায়॥" গ্রন্থশেষে কবি অনুজ ও আত্মজের উল্লেখ করিয়া গঙ্গাদেবীকে নিবেদন করিয়াছেন,—

"দুষ্টের দমন করো শিষ্টের পালন।
আর এক কথা মাগো করি নিবেদন॥
শিবপ্রসাদ অনুজ সুশীল সুজন।
নিজ দাস দাসে মাগো করিবে গণন॥
পায় ধরি বলি কিছু আমি অভাজন।
এক পুত্র সম সর্ব্ব দেবতা চরণ॥
দীর্ঘজীবী করিবে মা সঁপিলাম পায়।
ধন পুত্রে সুখী মা রাখিবা সর্ব্বদায়॥"

উদ্ধৃত শ্লোকগুলি ছাড়া গ্রন্থের পূর্ব্বভাগে দেবদেবী ও দেশমালার বন্দনা শেষ করিয়া কবি হরিপ্রিয়ার স্বপ্নাদেশ

(৪) "গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী"র প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসু পাঠকের গবেষণার সুবিধার জন্য উল্লিখিত ১২২৩ সালে মুদ্রিত পুস্তকের অশুদ্ধ বানান এই প্রবন্ধে রক্ষা করা হইল।

বর্ণন করিয়া যাহা লিখিয়াছেন তাহাতে তিনি স্পষ্ট করিয়া আত্ম-পরিচয় দিয়াছেন।

"নবদ্বীপ নিবসতি, নরেন্দ্র ভূপতি পতি,
গোষ্ঠীপতি পতি যারে বলে।
তার অধিকারে ধাম, দেবীপুত্র আতমারাম,
মুখটী বিখ্যাত মহীতলে॥
খড়দ কুলের সার, বশিষ্ট তুলনা যাঁর,
জায়া অরুন্ধতী ঠাকুরাণী।
কি দিব উপমা তাঁর, শিব শিবা অবতার,
ব্যবহারে হেন অনুমানী॥
তাঁহার তনয় দীন, শ্রীদুর্গাপ্রসাদ ক্ষীণ,
দারা যার হরিপ্রিয়া সতী।
প্রত্যাদেশ হয় তারে, ভাষা গান রচিবারে,
স্বপনে কহিলা ভগবতী॥"

শেষোক্ত এই কয়টি শ্লোক হইতে জানা যায় যে, কবির পিতার নাম আত্মারাম ও মাতার নাম অরুন্ধতী। গঙ্গার প্রত্যাদেশ অনুসারে যে সময়ে "গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী" কাব্য রচিত হয়, সে সময়ে রাজা নরেন্দ্র নবদ্বীপে বাস করিতেছিলেন। রাজা নরেন্দ্রের অধিকারের মধ্যে কবির পৈত্রিক বাসস্থান। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য, এই রাজা নরেন্দ্র কে? ১২৮৩ সালের "আর্য্যদর্শনে" "মহাপুরুষের নাম" শীর্ষক প্রবন্ধে লিখিত হইয়াছিল, "॥ দুর্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। ইহাঁর কৃত "গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী" বিশেষ প্রসিদ্ধ। ইহাঁরা ফুলিয়া খড়দহ উভয় মেলে মিশ্রিত। ইহাঁর বংশাবলী অদ্যাপি উলাগ্রামে বিরাজ করিতেছেন।" ১২৮৪ সালের "আর্য্যদর্শনে" "মেলমালা" শীর্ষক প্রবন্ধের মতে, "গোপালের পুত্র নরেন্দ্রের পরপুরুষেরা নবলা, সীমলা, আন্দুলে, দুর্গাপুর প্রভৃতি স্থানে বাস করিতেন।" নদীয়ার রাজবংশের ইতিহাস "ক্ষিতীশবংশাবলীচরিতম্" নামক সুপ্রসিদ্ধ পুস্তকের ষষ্ঠ অধ্যায়ে লিখিত আছে,—"অথ শ্রীকৃষ্ণোঽপুত্রকো মসূরিকারোগেণ মৃতঃ। গোবিন্দ রায়শ্চ রাজকর্ম্মণি ন তাদৃক্‌কুশলঃ গোপালরায়শ্চ নানাগুণসম্পন্নঃ সপ্তবর্ষান্ রাজ্যং শশাস। অনন্তরং সোঽপিমৃতঃ তস্য চ ত্রয়ঃ পুত্রা নরেন্দ্ররায় রামেশ্বররায় রাঘবরায় সজ্ঞকাঃ। তেষু চ নরেন্দ্ররায়ো মহাদুর্দান্তঃ প্রজানাং নানুরঞ্জকঃ রামেশ্বরশ্চ ন রাজকর্ম্মণি সম্যক্ কুশলঃ রাঘবরায়শ্চ নিখিলগুণসম্পন্নঃ প্রজাহিতান্বেষী সুপ্রসিদ্ধো রাজা বভূব ভ্রাতৃভ্যাং চ প্রতিমাসিক নিয়মিতব্যয়ং দদৎ সুখ্যাতিমবাপ। জবনাধিপায় যথাযোগ্যং করং দত্বা তস্য বিশ্বাসপাত্রমভবৎ॥" (৫) অস্যার্থঃ—"অতঃপর শ্রীকৃষ্ণ নিঃসন্তান অবস্থায় বসন্তরোগে আক্রান্ত হইয়া মৃত হইলেন। গোবিন্দ রায় রাজ্য পরিচালনাকার্য্যে কুশলী ছিলেন না বলিয়া নানাগুণসম্পন্ন গোপাল রায় সাত বৎসর রাজ্য শাসন করিলেন। অতঃপর তিনি মৃত হইলে তাঁহার তিন পুত্র নরেন্দ্র রায়, রামেশ্বর রায় ও রাঘব রায়ের মধ্যে নরেন্দ্র রায় অত্যন্ত দুর্দ্দান্ত ও প্রজারঞ্জনকার্য্যে অসমর্থ ছিলেন, রামেশ্বরও রাজকার্য্যে সম্যক্ পারদর্শী ছিলেন না। সর্ব্বগুণসম্পন্ন প্রজাহিতৈষী রাঘব রায় সুপ্রসিদ্ধ রাজা হইয়াছিলেন। ভ্রাতাগণকে তিনি নিয়মিত মাসহারা দিতেন, এবং তজ্জন্য তিনি সুখ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। যবন রাজকে যথাযোগ্য কর দিয়া তিনি তাঁহার বিশ্বাসের পাত্র হইয়াছিলেন।" শ্রীযুত কুমুদরঞ্জন মল্লিক মহাশয় "নদীয়া-কাহিনী" নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন,—"কনিষ্ঠ রাঘব সর্ব্বাপেক্ষা কর্ম্মদক্ষ বিষয়ে পিতৃনিদেশানুযায়ী পিতৃরাজ্যের অধিকারী হয়েন। তিনি অতি সুশীল ও ধার্ম্মিক নরপতি বলিয়া খ্যাত।" রাজা রাঘব শান্তিপুর ও কৃষ্ণনগরের মধ্যস্থলে একটি সুদীর্ঘ দীর্ঘিকা খনন করাইয়াছিলেন। এই জলাশয়ের অনতিদূরে তিনি দুইটি মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। মন্দিরের গাত্রে যে শ্লোকটি খোদিত আছে তাহা পাঠ করিয়া জানা যায় যে, ১৫৯১ শকে অর্থাৎ ১৬৬৯ খৃষ্টাব্দে উক্ত মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল। (৬)

"শাকে সোমনবেষু চন্দ্রগণিতে পুণ্যৈক রত্নাকরো
ধীর শ্রীযুত রাঘবো দ্বিজমণি ভূমীভুজামগ্রণীঃ।
নির্ম্মায় স্ফুরদূর্ম্মিনির্ম্মল জল প্রোদ্যাতিনীং দীর্ঘিকাং
তত্তীরে কৃত রম্য বেশ্মনি শিবং দেবং সমাস্থাপয়ৎ॥"

(৫) Pertsch কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও সম্পাদিত "ক্ষিতীশ বংশাবলীচরিতম্" বার্লিন সংস্করণ, ১৮৫২ সাল।

(৬) শ্রীযুক্ত কুমুদরঞ্জন মল্লিক প্রণীত "নদীয়া কাহিনী" দ্রষ্টব্য।

অর্থ—"১৫৯১ শকে (১৬৬৯ খৃষ্টাব্দে) ব্রাহ্মণ-শিরোমণি রাজশ্রেষ্ঠ ধীরমতি রাজা রাঘব এই স্বচ্ছ জল-সঙ্কুল উর্ম্মীময় দীর্ঘিকা খনন করাইয়া ও তত্তীরে এই সুরম্য মন্দির নির্ম্মাণ পূর্ব্বক শিব স্থাপনা করিলেন।" (৬) রাঘবের জ্যেষ্ঠ নরেন্দ্র এই সময়ে যে নবদ্বীপে বাস করিতে-ছিলেন এবং সম্ভবতঃ উলা ও অন্যান্য কয়েকখানি গ্রামের খাজনা হইতে তাঁহার মাসহারা গ্রহণ করিবার বন্দোবস্ত ছিল কিম্বা ঐ সকল গ্রাম রাঘব কর্ত্তৃক তাঁহার তত্ত্বাবধানে রক্ষিত হইয়াছিল, এরূপ অনুমান অসঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। রাজা নরেন্দ্রের সমসাময়িক কবি দুর্গাপ্রসাদ মুখো-পাধ্যায় তাহা হইলে এই হিসাবে সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্য-ভাগে "দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী" রচনা করিয়াছিলেন। ভবানন্দ মজুমদারের বংশে নরেন্দ্র নামে এই একজন মাত্র রাজকুমার জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। উদ্ধৃত শ্লোকে আত্মপরিচয় স্থলে দুর্গাপ্রসাদ যে এই 'নরেন্দ্র ভূপতি'র কথা বলিয়া-ছেন তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। নদীয়ার রাজারা গোষ্ঠীপতি ছিলেন, কিন্তু নরেন্দ্র রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়েন নাই বলিয়া তিনি গোষ্ঠীপতি না হইলেও তাঁহার কনিষ্ঠ রাজা রাঘব তাঁহাকে সম্মান প্রদর্শন করিতেন আর সেই কারণে কবি গোষ্ঠীপতি রাজা রাঘবের সৌজন্যের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন, "গোষ্ঠীপতি পতি যারে বলে।"

"গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী"র রচনা কাল নির্ণয় করিতে হইলে নদীয়ার সমসাময়িক ইতিহাস আলোচনা করা নিতান্ত আবশ্যক। উদ্ধৃত শ্লোকে কবির আত্মপরিচয়ের অর্থ যদিও জটিল নহে, তাহা হইলেও কোনও কাব্যের বয়স সম্বন্ধে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইলে, বিশেষতঃ যেস্থলে কাব্যবিশেষের রচয়িতার অভ্যুদয় সম্বন্ধে বিভিন্ন ভ্রান্ত অভিমত বহুদিন হইতে প্রচলিত আছে সেস্থলে একমাত্র ঐতিহাসিক আলোকের সাহায্য গ্রহণ করা যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে হয়।

আলোচ্য কাব্য-গ্রন্থ যে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে (১৭৭৩-১৭৯৮ খৃঃ অব্দের মধ্যে) রচিত হয় নাই তাহা সুনিশ্চিত। ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৭৮১ খৃষ্টাব্দের মধ্যে নদীয়াধিপতি স্বনাম-প্রসিদ্ধ মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র জীবিত ছিলেন। ১৭৮২ খৃষ্টাব্দে তিনি পরলোক গমন করিলে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শিবচন্দ্র তাঁহার জমিদারী অধিকার করিয়া ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ভোগ দখল করেন। স্বয়ং কৃষ্ণচন্দ্র ১৭২৮ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৭৮২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। এই সুদীর্ঘ সময়ের মধ্যেও যদি "গঙ্গাভক্তি-তরঙ্গিণী" রচিত হইত তাহা হইলে নবদ্বীপাধিপতি কৃষ্ণ-চন্দ্রের নামোল্লেখ ইহার কোনও না কোন শ্লোকে নিশ্চয় পাওয়া যাইত। খাস নবদ্বীপে ভবানন্দের কোনও বংশ-ধর রাজধানী স্থাপন করেন নাই। ভবানন্দ মজুমদার সম্রাট জাহাঙ্গীরের নিকট হইতে নদীয়ার জমিদারী প্রাপ্ত হইলেও বাগোয়ান ও তৎপরে মাটিয়ারিতে প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ভবানন্দের পুত্র গোপালও মাটিয়ারিতেই বাস করিতেন। গোপালের পুত্র রাঘব যিনি "নরেন্দ্রের কনিষ্ঠ" তাঁহার পিতামহ-স্থাপিত মাটিয়ারী প্রাসাদ পরি-ত্যাগ করিয়া রেউই নামক স্থানে রাজধানী স্থাপনা করিয়া উহার চতুর্দ্দিকে পরিখা বেষ্টিত করেন।" (৬) রাজা রাঘবের পুত্র রুদ্র "পিতার স্থাপিত রাজধানী রেউইয়ের ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রীত্যর্থে কৃষ্ণনগর নামকরণ করেন।" (৬) রাজা রুদ্রের পরবর্ত্তী নদীয়ার রাজারা আজ পর্য্যন্ত কৃষ্ণনগরেই অবস্থান করিয়া আসিতেছেন। কবি দুর্গাপ্রসাদ 'গঙ্গা-ভক্তিতরঙ্গিণী'তে ভবানন্দ ও তৎপুত্র গোপালের অধিকৃত রাজধানী মাটিয়ারীর উল্লেখ করিয়াছেন। কবির সম-সাময়িক নদীয়ার রাজা রাঘব রাজধানী মাটিয়ারী হইতে রেউইয়ে সরাইয়া লইয়া গেলেও রাঘবের জ্যেষ্ঠ, আমাদের কবির 'নরেন্দ্র ভূপতি'র বাল্য-স্মৃতির সহিত জড়িত মাটিয়ারীর কথা তখনও লোকে ভুলিয়া যায় নাই। দুর্গাপ্রসাদ গঙ্গার গতি-পথ বর্ণন করিতে গিয়া লিখিয়াছেন,—

"পূর্ব্বধারে মাটীয়ারী রাখিয়া আইলা।
দয়া করি অগ্রদ্বীপে দর্শন দিলা॥"

দুর্গাপ্রসাদ যদি অষ্টাদশ শতাব্দীর কবি হইতেন তাহা হইলে "গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী"তে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র ও নদীয়ার রাজধানী কৃষ্ণনগরের নাম নিশ্চয়ই স্থান পাইত। "অন্নদা-মঙ্গল" ও "বিদ্যাসুন্দর" রচয়িতা ভারতচন্দ্র কৃষ্ণচন্দ্রের সভার উজ্জ্বলতম রত্ন ছিলেন। তিনি "অন্নদা-মঙ্গলে"

(৬) শ্রীযুক্ত কুমুদরঞ্জন মল্লিক প্রণীত "নদীয়া কাহিনী" দ্রষ্টব্য।

সমসাময়িক সকল খ্যাতনামা ব্যক্তিরই উল্লেখ করিয়াছেন। কৃষ্ণচন্দ্রের আত্মীয় ও স্বজনগণের মধ্যে কাহারও নাম তিনি বাদ দেন নাই। ভারতচন্দ্র "অন্নদা-মঙ্গলে" কৃষ্ণচন্দ্রের সভাসদ উলানিবাসী মুক্তিরাম মুখোপাধ্যায়ের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। "মুক্তিরাম মুখুয্যা গোবিন্দ ভক্ত দড়।" কুমুদরঞ্জন বাবু মুক্তিরাম সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, —"নিবাস উলা রসিক বিধায় রাজা তাঁহাকে বৈবাহিক সম্বোধনে আপ্যায়িত করিতেন।" (৬) এরূপ অবস্থায় রাজা নরেন্দ্র ও কবি দুর্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় যদি অষ্টাদশ শতাব্দীতে কৃষ্ণচন্দ্রের রাজত্বকালে কোনও সময়ে জীবিত থাকিতেন তাহা হইলে রাজকবি ভারতচন্দ্র "অন্নদা-মঙ্গলে" তাঁহাদের নাম লইতে ভুলিতেন না। দুর্গাপ্রসাদ কৃষ্ণচন্দ্রের সময়ে জীবিত থাকিলে তাঁহার রচিত "গঙ্গাভক্তি-তরঙ্গিণী"তে কৃষ্ণচন্দ্রের সমসাময়িক কোনও না কোন ঐতিহাসিক ঘটনার আভাসও পাওয়া যাইত।

কুমুদরঞ্জনবাবুর "নদীয়া কাহিনী"তে "রাজা কৃষ্ণচন্দ্র প্রতিষ্ঠিত উলার দিঘী" নামে একখানি আলোক-চিত্র আছে। দুর্গাপ্রসাদ যদি কৃষ্ণচন্দ্রের সময়ের কবি হইতেন তাহা হইলে তিনি নিজ গ্রামের হিতসাধক রাজার বদান্যতার কথা স্মরণ করিয়া চারি সহস্রাধিক ছত্রে রচিত "গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী" কাব্যের কোনও স্থানে তাঁহার প্রশংসা করিতেন। "কথিত আছে মহারাজ প্রায় প্রতি বর্ষেই এই স্থানে সমাগত হইয়া স্বীয় দীর্ঘিকাস্থ জলটুঙ্গিতে অবস্থান পূর্ব্বক ভগবানকে পদ্মপুষ্প প্রদান করিতেন এবং তদুপলক্ষে সমাজস্থ ব্রাহ্মণমণ্ডলীকে আহ্বান করিয়া পরম সমাদর প্রদর্শন করিতেন।" (৬) উলায় কৃষ্ণচন্দ্র কর্ত্তৃক এই দীঘি প্রতিষ্ঠার কথা ভাবিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে, বঙ্গভাষার একাধিক প্রাচীনতর কাব্যে বর্ণিত গঙ্গাতীরবর্ত্তী এই গ্রামখানিকে ছাড়িয়া ভাগীরথী কৃষ্ণচন্দ্রের সময়ে বহুদূরে সরিয়া গিয়াছিলেন। উলা গ্রামবাসিদের জলকষ্ট নিবারণের নিমিত্ত বোধ হয় কৃষ্ণচন্দ্র উক্ত জলাশয় খনন করাইয়াছিলেন। উলা এক্ষণে চূর্ণী নদীর পশ্চিম পারে অবস্থিত। "এক সময়ে ভাগীরথী গঙ্গা এই উলার পার্শ্ব দিয়াই প্রবাহিত হইয়াছিলেন।" (৬) কবি দুর্গাপ্রসাদের সময়ে মাটিয়ারীর ন্যায় উলা যে গঙ্গাতীরে অবস্থিত ছিল তাহা কবির বর্ণনা হইতে স্পষ্ট বুঝা যায়। গঙ্গার গতিপথের বর্ণনায় কবি লিখিয়াছেন,—

"উল্লাসে উলায় গতি, বড় মুলে ভগবতী,
চণ্ডিকা নহেন যথা ছাড়া॥"

"বর্ত্তমান উলার পূর্ব্ব ও দক্ষিণ দিক্ দিয়া ডাকাতের খাল ও বারমাসে খাল বলিয়া যে অতি প্রাচীন এক গভীর নদীর খাতরূপ নিম্ন জলাভূমি দেখিতে পাওয়া যায়, অনেকে অনুমান করেন উহাই বহু পূর্ব্বে অন্তর্হিত গঙ্গার গর্ভখাত।" (৬) "গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী"তে কবি দুর্গাপ্রসাদ নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, এই উলাগ্রাম তাঁহার সময়ে ভাগীরথীর তীরে অবস্থিত ছিল। আলোচ্য কাব্য গ্রন্থখানি তাহা হইলে যে সপ্তদশ শতাব্দীতে রচিত হইয়াছে, তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ থাকে না। ক্রমশঃ

(৬) শ্রীযুক্ত কুমুদরঞ্জন মল্লিক প্রণীত "নদীয়া কাহিনী" দ্রষ্টব্য।

প্রভেদ।

[শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল, বি-এল্]

(সাদি হইতে)

সাধু সজ্জনে দশজনে মিলি'
সুখে বসি' রয় এক তৃণাসনে
দুই নরপতি রাজ্যমাঝে হায়
রহিবারে নারে মিলি এক সনে।

রোটিকাখণ্ড পাইলে সজ্জন
অর্দ্ধখণ্ড দিবে দীন ভ্রাতৃজনে
রাজ্য-অধিপতি হইলে নৃপতি
পররাজ্য লোভ না ছাড়িবে মনে।

যখের ধন।

[শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়]

জমীদার দেবেন চক্রবর্ত্তীর বৈঠকখানার আসরটা যখন নানা গল্পগুজবে বেশ সরগরম হইয়া উঠিয়াছিল, তখন গ্রামের রামতনু উত্তেজিত ভাবে বৈঠকখানা ঘরে প্রবেশ করিয়া বলিয়া উঠিল,—"দেখলে ঠাকুরদা'র আক্কেলটা! বলে কি না,—'আমি ছেলের লেখাপড়ার খরচ জোগাই আর নাই জোগাই, কারও তা দেখবার দরকার নেই,—ছেলে বি, এ পাশ হ'লে পাঁচ হাজার, আর না হ'লে তিন হাজারের এক পয়সাও কমে আমি ছেলের বে' দোবো না।"

বৃদ্ধ বুদ্ধেশ্বর ভট্টাচার্য্যকে গ্রামের সকলে ঠাকুরদা' বলিয়া ডাকিয়া থাকে। ইনি এত বেশী রকমের কৃপণ যে ইঁহার পুত্র রমেশ যখন বৃত্তিলাভ করিয়া মাইনার পাশ করে, তখন ইনি অর্থ ব্যয়ের ভয়ে পুত্রকে ইংরাজি ইস্কুলে না দিয়া জমীদারী সেরেস্তাতে চাকরী করিয়া দিতে অগ্রসর হন। রমেশ বিদ্যাশিক্ষায় যত্নবান, মেধাবী ও সচ্চরিত্র,—তাহার ভবিষ্যৎ এভাবে নষ্ট হইতে দেখিয়া গ্রামের লোকেরা ঠাকুরদা'কে ছি ছি করিতে থাকে। পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের উকিল হরিহরবাবু রমেশের লেখাপড়া করিবার আগ্রহাতিশয্য দেখিয়া তাহাকে নিজের মেয়েদের শিক্ষক হিসাবে বাড়ীতে রাখিয়া তাহার লেখাপড়া শিখিবার ব্যবস্থা করেন। রমেশ যে বৎসর আই, এ পরীক্ষায় পাশ হয়, সেই বৎসর হরিহরবাবু, স্ত্রী এবং অষ্টম ও দ্বাদশ বর্ষীয়া দুই কন্যাকে অকূলে ভাসাইয়া ইহলোক ত্যাগ করেন। রমেশ কলিকাতার মেসে থাকিয়া ছেলে পড়াইয়া কায়ক্লেশে কোনও প্রকারে বি, এ পড়িতে থাকে। হরিহরবাবু মৃত্যুকালে বিশেষ কিছু সম্পত্তি রাখিয়া যাইতে পারেন নাই, এদিকে তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যাও বিবাহ-যোগ্যা, কাজেই হরিহরবাবুর বিধবা পত্নী অনন্যোপায় হইয়া পুত্র-নির্ব্বিশেষে পালিত রমেশকেই কন্যা সম্প্রদান করিতে মনস্থ করেন, এবং দূর সম্পর্কীয় আত্মীয় রামতনুকেই এ বিষয়ে ঘটকালী করিতে অনুরোধ করেন।

রামতনু অনেক সাধ্য সাধনা করিয়াও যখন ঠাকুরদা'কে তিন হাজারের কমে ছেলের বিবাহ দিতে সম্মত করাইতে পারিল না, তখন রাগে গস্ গস্ করিতে করিতে দেবেনের বৈঠকখানায় প্রবেশ করিয়া ঠাকুরদা'র গুণকীর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিয়া দিল।

দেবেন হাসিতে হাসিতে বলিল, "ওহে চট্‌ছ কেন? যে শ্বশুরের মৃত্যুকালে নাবালক শ্যালকের যথাসর্ব্বস্ব আত্মসাৎ করতে পারে, ছোট ভায়ের যা কিছু ছিল সব ফাঁকি দিয়ে বিধবা ভ্রাতৃবধূকে পথে বসাতে পারে, সে কি আর অমন বি, এ পড়া ছেলেব হত্তুকী দিয়ে বিয়ে দেবে আশা কর না কি?—হলাই বা হরিহরবাবু ছেলেকে লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করে গিয়েছেন।"

পরনিন্দা পরচর্চ্চার মত মুখরোচক আলোচনা আর নাই। ঠাকুরদা'র সম্বন্ধে আলোচনা আরম্ভ হইতেই সকলের মধ্যে যেন একটা উৎসাহের সাড়া পড়িয়া গেল। ভূতো ঘরের কোণ থেকে বলিয়া উঠিল,—"পরের পয়সা ফাঁকি দিয়ে যদি নিজের আত্মাকে দেয় তা হ'লেও ত বুঝি। খাবে ত ঐ পুঁইশাক, না হয় কল্মীশাক ভাতে ভাত। যদি বা কোনও দিন কোনও যজমানের বাড়ী থেকে আলু বেগুন কিছু পায়, তাও ঐ ভাতে দিয়ে, না হয় পুড়িয়ে খাবে;—তরকারীর ধার দিয়েও যাবে না, পাছে তেল খরচ হয়। মাথায় দেবার জন্যে যদি তেল দরকার হয়, তাহ'লে ঐ মালক্ষের বাজারে টগরের দোকানে বসে গল্প করবে আর বেলা বারটার সময় ব্যস্ত হয়ে বলবে,—'ওঃ বড্ড বেলা হয়ে গেছে, ওহে টগর, হাতে একটু তেল দাও ত হে, মাথায় দিয়ে গঙ্গা থেকে একটা ডুব দিয়ে যাই'। ঠান্‌দি'র এ দিকে সন্ন্যাসীর মত মাথায় জট পড়ছে। বামুনের মেয়ের পেটে ভাত নেই, পরনে কাপড় নেই,—কষ্টের একশেষ।"

দেবেনের মাসতুতো ভাই ধনঞ্জয় রায় একজন ইঞ্জিনীয়ার, আজ সবেমাত্র মালঞ্চ গ্রামে এই প্রথম আসিয়াছেন,—গ্রামের কাহাকেও তিনি চেনেন না। কাজেই এতক্ষণ ধরিয়া তিনি ইহাঁদের আলোচনা নীরবে শুনিয়া যাইতেছিলেন। এইবার আসল ব্যাপারটা কতক অনুধাবন করিয়া বলিলেন,—"বাজে কথায় দরকার কি? হরিহরবাবুর মেয়ের বিবাহ কি করে হয় সেই কথাই ভেবে দেখ না।"

রামতনু উত্তেজিত ভাবে বলিল,—"তা আবার ভাবাভাবি কি? ছেলেকে ধরে এনে বি'য়ে দিয়ে দেওয়া। ছেলে লেখাপড়া শিখেছে, বাপের মত নয়,—নিমকহারাম হবে না।"

ইঞ্জিনীয়ার ধনঞ্জয় বলিল,—"না হে না, তা ঠিক হয় না। আচ্ছা তোমাদের ঠাকুরদা'র টাকা কোন্ ব্যাঙ্কে গচ্ছিত আছে?"

দেবেন বলিল,—"ব্যাঙ্কে! আরে রাম! সে পাত্রই ও নয়। ও যখের ধনের মত বাড়ীর আনাচে কানাচে কোথাও পুঁতে রেখেছে।"

ধনঞ্জয় বহুক্ষণ যাবৎ কি ভাবিল; তারপর বলিল,—"দেখ, আমায় এই গ্রামে কেউ চেনে না। আমি তোমাদের ঠাকুরদা'কে কায়দা করে এ বিবাহে রাজি করাতে পারি;—অবশ্য তোমরা যদি সকলে আমায় সাহায্য কর।"

সকলে উৎসাহের সহিত বলিয়া উঠিল,—"নিশ্চয়ই—নিশ্চয়ই। তা কি রকম হবে?"

* * *

(২)

অতি প্রত্যুষে ঠাকুরদা গঙ্গার ধারের পথ দিয়া মানিক পোদ্দারের বাগান থেকে কিছু খোড় সংগ্রহের চেষ্টায় যাইতেছিলেন,—হঠাৎ পিছন হইতে আধা বাঙ্গালা আধা হিন্দিতে কে বলিয়া উঠিল,—"তোম্হারা ভাগ্য আভি প্রসন্ন নেহি হ্যায়!" ঠাকুরদা' পশ্চাতে চাহিলেন, দেখিলেন, এক জটাজুট ত্রিশূলধারী সন্ন্যাসী। সন্ন্যাসী তাঁহার দিকে অঙ্গুলী হেলন করিয়া বলিল, "কাল্ ভি তোম্হারা কাপড় কাড়্‌কে বহুৎ লোক্‌সান্ হুয়া—হুঁসিয়ারি সে রহো!"

গতকল্য সন্ধ্যার সময় হারাণ কৈবর্ত্তের ঝোড়ার খোঁচা লাগিয়া ঠাকুরদা'র পরনের কাপড়খানা ছিঁড়িয়া গিয়াছিল। ঠাকুরদা'র পক্ষে এ কাপড়খানা নূতন,—মাত্র ৭।৮ মাস তিনি উহা ব্যবহার করিতেছিলেন; কাজেই ইহাতে তাঁহার প্রাণে কিছু আঘাত লাগিয়াছিল। তাঁহার এই লোকসানে লোকের সহানুভূতি প্রকাশ করা দূরে থাকুক,—'পুঁরোনো কাপড় ছিঁড়েছে তার কি হবে' ইত্যাদি বাক্যে উপেক্ষাই করিয়াছে, কেহ বা বিদ্রূপ কটাক্ষপাত করিতেও দ্বিধা বোধ করে নাই। সন্ন্যাসী এই প্রথম ইহাকে 'বহুৎ লোক্‌সান্' বলিয়া উল্লেখ করাতে, সহজেই ঠাকুরদা'র মন সন্ন্যাসীর দিকে আকৃষ্ট হইল। উপরন্তু ঠাকুরদা ভাবিলেন, সন্ন্যাসী একথা জানিল কি করিয়া,—নিলু গয়লা, পরাণ ঘোষ প্রভৃতি ২।৪ জন কৃষিজীবী ব্যতীত আর ত কেহ সেখানে ছিল না—নিশ্চয়ই সন্ন্যাসী ভূত ভবিষ্যৎ জানে। ঠাকুরদা' ধীরে ধীরে সন্ন্যাসীর দিকে অগ্রসর হইলেন। সন্ন্যাসী হাত নাড়িয়া বলিল,—"তোম্হারা বখৎ আভি বহুৎ খারাপ্ চল্‌তা হ্যায়।"

"ক'দ্দিন আমার এমন খারাপ দশা চলবে বাবা?"

"দেখে তোম্হারা হাত্।"

ঠাকুরদা দক্ষিণ হস্ত বাড়াইয়া দিলেন। সন্ন্যাসী অতি মনোযোগের সহিত হাত দেখিতে দেখিতে বলিল,—"তোম্ বহুৎ ভাগ্যবান্ আছে; লেখেন্ তোম্হারা শনৈশ্চর কা দশা চল্‌তা হ্যায়।"

"আমার ভাগ্য কি ফিরবে বাবা?"

"আলবৎ,—তোম্হারা কুচ্ রূপেয়া হ্যায়, লেখেন্, এক্ কাম্ কর্‌নেসে, শনৈশ্চর কা দৃষ্টি ভি কাট্ যায় গা, রূপেয়া ভি দ্বিগ্‌না তিগ্‌না হো যায় গা।"

ঠাকুরদা উৎসুক ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি কাজ করতে হবে বাবা?"

"ঝুলোন্ কালীমায়ী কি পূজা কর্‌নেসে তোম্হারা জল্‌দি বহুৎ রূপেয়া লাভ্ হোবে,—এবাৎ খুব নিশ্চয় হ্যায়।"

"ঝুলোন কালী কি?"

"কালীমায়ী শূন্যে ঝুলবে। রাত্‌মে আবির্ভূতা হোবে দিন্‌মে চলা যাবে।"

ঠাকুরদা' বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে সন্ন্যাসীর দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"কালীমায়ী শূন্যে আবির্ভূতা হবেন ?"

"হাঁ, তোম্ দেখ্তে পাবে। পরন্তু একাদশী আছে। তোম্ যব্ ছিটাঘাটা কা শ্মশান্মে রাত বার বাজে মেয়া পাশ্ যাবে, তব্ দেখতে পাবে কালীমায়ী শূন্যে খাড়া আছে। একাদশী কা রোজ সঙ্কল্প কর্কে, অমাবস্যা কা রোজ হোম্ কর্নেসে কাম্ বানেগা।"

শূন্যে কালী ঝুলিবে শুনিয়া ঠাকুরদা'র কালী দর্শনের আগ্রহ অত্যন্ত বর্দ্ধিত হইল; কিন্তু ছিটাঘাটার ন্যায় ভীষণ শ্মশানে তিনি একাকী কিরূপে যাইবেন ভাবিতে লাগিলেন। সন্ন্যাসী ঠাকুরদা'র মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়া, তাঁহাকে একটি মাদুলি দিয়া বলিল,—"কুচ্ ভয় কোরবে না, এইঠো হাত্মে বাঁধ্কে চলা যাবে।"

ঠাকুরদা আনন্দের সহিত মাদুলীটি গ্রহণ করিলেন। সন্ন্যাসী আপন মনে চলিয়া গেল।

একাদশীর দিন রাত্রে ঠাকুরদা যথাকালে দুর্গানাম জপ করিতে করিতে ছিটাঘাটার শ্মশানে উপস্থিত হইলেন। এক শাখা প্রশাখাযুক্ত বটবৃক্ষতলে দেখিলেন, এক হস্ত পরিমিত একটি কালীমূর্ত্তি শূন্যে বিরাজমানা, সম্মুখে হোম-কুণ্ড প্রজ্বলিত, সন্ন্যাসী ধ্যানমগ্ন। ঠাকুরদা ভক্তি গদগদ-চিত্তে প্রণাম করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে সন্ন্যাসী চক্ষু উন্মীলন করিল; এবং ঠাকুরদা'কে একটি রাঙচিত্র গাছের ছড়ি দিয়া বলিল,—"এইঠো কালী-মায়ী কি চারিধারমে ঘুমাও, দেখো কালীমায়ী যো শূন্যে রহা,—এ সাচ্ হ্যায় কেয়া ঝুট্ হ্যায়।"

"না না, দেখবার দরকার নেই।" ঠাকুরদা সন্ন্যাসীর মনস্তুষ্টির জন্য একথা বলিলেন বটে, কিন্তু এরূপ অলৌকিক ব্যাপার একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য তাঁহার মন ব্যাকুল হইয়া পড়িল।

সন্ন্যাসী হাসিতে হাসিতে বলিল,—"আলবৎ দেখে নেবে। বিশ্বাস্ কোর্তে হোবে, বিশ্বাস্ নেহি হোনেসে কুচ্ কাম নেহি বানেগা।"

ঠাকুরদা আর দ্বিরুক্তি না করিয়া ছড়িটি লইয়া একবার কালীমূর্ত্তির চতুর্দ্দিকে ঘুরাইয়া লইলেন; দেখিলেন বাস্তবিকই দেবী শূন্যে বিদ্যমানা,—মূর্ত্তির কোনও দিকে কোনও রূপ আধার নাই। তখন তাঁহার ভক্তি ও বিশ্বাস অধিকতর দৃঢ় হইল; তিনি ভক্তি গদগদ চিত্তে সন্ন্যাসীর পার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

সন্ন্যাসী কিয়ৎকাল ধ্যানমগ্ন রহিল; তারপর ধ্যানস্থ অবস্থাতেই জিজ্ঞাসা করিল,—"তোমহারা রূপেয়া যাঁহা হ্যায় কৈ জানে ?"

"না, আমার স্ত্রী পর্য্যন্ত জানে না।"

"বোলো কাঁহা হ্যায়।"

অর্থের সন্ধান বলিবার জন্য ঠাকুরদা প্রস্তুত ছিলেন না; একারণ ক্ষণকালের জন্য তাঁহার হৃদয় কম্পিত হইল। যদিও তাঁহার অবিশ্বাস করিবার কোনও হেতু ছিল না, তথাপি কি জানি কেন, তিনি একবার দেবীমূর্ত্তির দিকে, একবার সন্ন্যাসীর দিকে চাহিয়া ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন।

ঠাকুরদাকে নীরব দেখিয়া সন্ন্যাসী পুনরায় কহিল,—"বোলো, দের্ হোনেসে কাম্ সব্ বিগড়্ যায় গা,—মায়ী কি পাশ কুচ্ ছিপাও মাৎ—লোক্সান্ পৌছে গা।"

আর অপেক্ষা করা চলে না; কাজেই ঠাকুরদা বুকে হাত দিয়া কোনও প্রকারে বলিয়া ফেলিলেন,—"ঘরের কোণে মাচার ওপর যে সব পুঁথি স্তূপাকার করা আছে, তার মধ্যে লাল কাপড়ে জড়ান মুগ্ধবোধের পুঁথির ভেতর নোটের তাড়া আছে।"

সন্ন্যাসী অমনি এক কুশি ঘৃত লইয়া মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে আহুতি দিল,—'হোঁ মুগ্ধবোধ ব্যাকরণাভ্যন্তরস্থিত অর্থানি হ্রীঁ কিলি কিলি হিলি হিলি ফেঁ ফোঁ বর্দ্ধয় বর্দ্ধয় ভাগ্যং পরিবর্দ্ধয় পরিবর্দ্ধয় ক্রাঁ ক্রোঁ হ্রাং হ্রোঁ স্বাহা।"

সন্ন্যাসী কিয়ৎকাল জপ করিয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আউর বোলো।"

ঠাকুরদা এবারেও বুকে হাত দিয়া বলিয়া ফেলিলেন,—"ঘরের কোণে একটা ভাঙ্গা বাক্সের মধ্যে যেন পুরোনো ঘি রয়েছে এই ভাবে একটা বড় ভাঁড়ের ভেতর টাকা মোহর যা কিছু সব আছে।"

সন্ন্যাসী পুনরায় মন্ত্র পড়িতে পড়িতে আহুতি দিল,—

"ঘৃতভাণ্ডান্তস্থিত স্বর্ণানি রৌপ্যানি আং হ্রীঁ ক্রোঁ দ্বিগুণং ত্রিগুণং কারয় কারয় চামুণ্ডে পাত্রং পূর্ণয় পূর্ণয় আং যাং রাং লাং বাং হ্রাং ক্রাং ক্রোঁ স্বাহা।"

অতঃপর সন্ন্যাসী, দেবীকে একবার প্রদক্ষিণ করণান্তর হোমকুণ্ডের পার্শ্ব হইতে কতকগুলি জবাফুল ও বিল্বপত্র লইয়া ঠাকুরদাকে দিয়া বলিল—"তোম্‌হারা সকল্প হোগিয়া। আভি যাকে এহি ফুল বেল্‌পাত্তা তোম্‌হারা ওহি পুঁথি আউর ভাঁড়্‌কা উপর রাখ্‌খো। অমাবস্যা কা রোজ হিঁয়া আকে পূজা হোম্ জপ কর্‌নেসে, রূপেয়া সব্ দ্বিগ্‌না ত্রিগ্‌না হো যায় গা।"

ঠাকুরদা দেবী ও তৎপরে সন্ন্যাসীকে প্রণাম করণান্তর ফুল বিল্বপত্র লইয়া চলিয়া আসিলেন।

(৩)

অমাবস্যার দিন যথাকালে ঠাকুরদা ছিটাঘাটার শ্মশানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, সন্ন্যাসী অতি আড়ম্বরের সহিত যাগ যজ্ঞাদির আয়োজন করিয়াছে। ১০৮ জবাফুল ও ১০৮ বিল্বপত্র স্তরে স্তরে একটি পাত্রে সজ্জিত; তাহার পার্শ্বে একটি মৃৎপাত্রে নরকপাল রক্ষিত, এবং শূন্যে বিরাজমানা দেবীর সম্মুখে হোমকুণ্ড প্রজ্বলিত।

ঠাকুরদা প্রণাম করিয়া দাঁড়াইতেই সন্ন্যাসী বলিল,—"তোম্‌হারা ওয়াস্তে এহি সব্ আয়োজন কিয়া। আভি 'চামুণ্ডে স্তম্ভয় স্তম্ভয় কিলি কিলি হ্রীঁ স্বাহা' মন্ত্র পড়্‌কে এক্ একঠো বেলপাত্তা আগ্‌মে আহুতি দেবে। পিছে ফুল্ ভি এইসা কর্‌কে আহুতি দেবে।"

ঠাকুরদা এক ঘণ্টা ধরিয়া সন্ন্যাসীর নির্দ্দেশ মত ভক্তি-ভরে আহুতি দিলেন। পরে যথাশক্তি জপ, প্রদক্ষিণ, প্রণাম ও বর প্রার্থনাদি করিয়া সন্ন্যাসীর নিকট বিদায় গ্রহণান্তর গৃহ প্রত্যাগত হইলেন।

গৃহে আসিয়া দেখেন, ঠান্‌দি বাহিরে আলো জ্বালিয়া অত্যন্ত উদ্‌গ্রীব ভাবে তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। ঠাকুরদা'কে দেখিয়া ঠান্‌দি অতি ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি হয়েছিল তোমার গা? উপদেবতা-টুপদেবতা কিছু ভর করে নি ত?"

ঠাকুরদা কিছু আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন; বলিলেন, "উপদেবতা ভর করে নি ত মানে?"

"ঐ যে বল্লে তুমি অজ্ঞান হয়ে নাকি পড়ে গিয়েছিলে?"

ঠাকুরদা' অধিকতর আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আমি অজ্ঞান হয়ে পড়ে গিয়েছিলুম! কে বল্লে?"

"কেন, ঐ সন্ন্যাসীর দু'জন চেলা এসে বল্লে, তুমি নাকি অজ্ঞান হয়ে পড়ে গিয়েছিলে।"

ঠাকুরদার মনে কেমন এক সন্দেহ জাগিয়া উঠিল; তিনি উৎসুক ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তারপর?"

"সন্ন্যাসী নাকি ধ্যানে জানতে পেরেছেন যে, তোমার পুঁথির মাচার ওপর লাল কাপড়ে জড়ান ফুল বিল্বপত্র দেওয়া এক পুঁথি আছে; আর ঘরের কোণে ভাঙ্গা বাক্সের মধ্যে ফুল ও বিল্বপত্র দেওয়া পুরানো ঘির ভাঁড় আছে। এই পুঁথি ও পুরানো ঘি দিয়ে, কি সব ক'রে বল্লে, তোমায় বাঁচাতে হবে।"

ঠাকুরদার শ্বাস প্রায় বন্ধ হইয়া পড়িবার উপক্রম হইয়াছিল, পাও বিশেষ রকম টলিতেছিল। তিনি অতি কষ্টে মুখে কথা আনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমিও সেই পুঁথি আর ভাঁড় বার করে দিলে?"

ঠানদি ঠাকুরদার ভাবগতিক দেখিয়া কিছু বিস্মিত হইলেন; বলিলেন,—"আমিও কি ছাই ঐ পুঁথি আর ভাঁড়ের কথা জান্‌তুম। দেখলুম, সত্যিই ফুল আর বিল্বপত্র দেওয়া আছে, তাই তাদের কথা বিশ্বাসও হয়ে গেল। কেন, তাতে কি ছিল?"

"ছিল তোমার মাথা আর আমার মুণ্ডু!" ঠাকুরদা আর ক্ষণকাল অপেক্ষা না করিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে শ্মশানাভিমুখে ছুটিলেন।

* * *

(৪)

আজ শনিবার। দেবেনের বৈঠকখানায় কয়েকজন বসিয়া ঠাকুরদা' সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছে, এমন সময় কলিকাতা হইতে দেবেনের মাসতুতো ভাই ইঞ্জিনীয়ার

ধনঞ্জয় রায় তাঁহার দুইজন সহপাঠি বসন্ত ও শিবচন্দ্র সমভিব্যাহারে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দেবেন তাহার অতিথিগণকে যথাবিধি অভ্যর্থনা করিয়া বলিল,—"বেশ যা হ'ক, একেবারে পনের ষোল দিনের মত ডুব মারতে হয়! আমরা আজ আসেন কাল আসেন করছি। যখন গেল শনিবারও এলেন না দেখলুম, তখন আমরা বড় উদ্‌গ্রীব হয়ে পড়লুম।"

বসন্ত বলিল,—"আর বলেন কেন। সন্ন্যাসী ঠাকুরের চেলা সাজবার চোটে জ্বর হয়ে পড়েছিল।"

ধনঞ্জয় বলিল,—"আমারও কি শাস্তি কম! সন্ন্যাসী হয়ে শ্মশানে বসে ধুনি জ্বালাবার ঠেলায় এক সপ্তাহ আমার গায়ের ব্যথা মরে নি।"

ভুতো ঘরের কোণ থেকে বলিয়া উঠিল,—"আমরা যে সমস্ত রাত সন্ন্যাসী ঠাকুরকে চৌকি দেবার জন্যে অশথ গাছের পেছনে বসে মশার কামড় খেলুম,—কৈ আমাদের ত কিছু হ'ল না।"

ডাক্তার অনিল দে এতক্ষণ মনোযোগ সহকারে চা পান করিতেছিলেন, এইবার মুখ তুলিয়া বলিলেন,—"আপনাদের কাণ্ড কারখানা সব শুনলাম; কিন্তু ঐ কালী শূন্যে ঝোলবার ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারছি না।"

ধনঞ্জয় বলিল,—"ওটা এমন কিছু বিশেষ ব্যাপার নয়। কালীমূর্ত্তিট লোহার তৈয়ারী; বট গাছের চারিদিকের ডালে চারটে বড় বড় Magnet (চুম্বক) লাগিয়ে দেওয়ায়, চারিদিক থেকে লোহার কালীকে আকর্ষণ করতে রইল,—কাজেই কালী শূন্যে ঝুলতে থাকলেন।"

"হাঁ, আপনার ইঞ্জিনীয়ারী বিদ্যে সার্থকের বটে।" ডাক্তার আনন্দে ধনঞ্জয়ের করমর্দ্দন করিলেন।

ধনঞ্জয় বলিল,—"এ দিক্‌কার কি খবর?"

দেবেন অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া বলিল,—"ওই রামতনু আসছে, দেখ কি খবর আনে।"

রামতনু বৈঠকখানায় প্রবেশ করিতে না করিতে সকলে সমস্বরে জিজ্ঞাসা করিল—"কি হ'ল হে?"

"কালী শূন্যে ঝোলালে হবে কি—ঠাকুরদাকে ছেলের বে'তে রাজি করতে বেশ বেগ পেতে হয়েছে। আহা! বেচারী এখনও অর্থশোক ভুলতে পারে নি।"

"কি রকম?"

"আমি বল্লুম, 'ঠাকুরদা যা হবার তা হয়ে গেছে। এখন হরিহরের মেয়ের সঙ্গে ছেলের বে' দিন, যা গেছে তার চেয়ে ঢের বেশী টাকা আসবে।' তাতে বলে কি —'তা আসবে ত বটে ভায়া, কিন্তু ওরা যে সব গয়না-পত্তর ও ছেলের নামে বাড়ী কিনে দেবে বলছ, আমায় নগদ ত বেশী কিছু দেবে না'।"

দেবেন উদ্‌গ্রীব ভাবে জিজ্ঞাসা করিল,—"তাতে তুমি কি বললে?"

"বলব আর কি, অনেক 'লেকচার' দিলুম; বল্লুম,—'আপনি ত টাকা ভোগ করছিলেন না, আপনার অবর্ত্তমানে ছেলে ভোগ করত; এ না হয় আপনার বর্ত্তমানেই ছেলে ভোগ করবে। তাতেও কি হয়, শেষে অনেক কথা কাটাকাটির পর দু' একশ নগদ বাড়িয়ে রাজি করলুম। কাল পাকা দেখতে যাবে।"

ধনঞ্জয় বলিল,—"যাক, যথের ধনের যে একটা সদ্গতি হ'ল, এই যথেষ্ট। তা আপনারা দেরী করবেন না—'শুভস্য শীঘ্রং'—আর আমরাও যেন লুচ্যাংটা ফাঁকি না পড়ি।"

এস চাঁদ।

[শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায়, বি-এ]

এস চাঁদ নেমে এস ধরণী 'পরে—
তোমাতে আমাতে বসি'
অহে গগনের শশি
জাগিব সারাটী রাত্তি গলাটী ধ'রে!
অতীত ত্রিযাম নিশি
নীরব নিথর দিশি
কাঁপিছে বিরহী বাঁশী—আকুল করে'
আমি একা বসি হায়
যামিনী বহিয়ে যায়
কে কোথা ডাকিছে কা'র জনম ভরে'

মহাত্মা রোঁলা ও আচার্য্য শঙ্কর।

[শ্রীসাহাজী]

প্রতীচ্য মহামানব রোঁলার আবির্ভাবের যুগে প্রাচ্য গুরু শঙ্করের মত আলোচনা করিয়া দেখিতে মনে স্বভাবতঃই কৌতূহলের উদয় হয়। উভয়েরই মধ্যে সৌসাদৃশ্য বিদ্যমান। বর্ত্তমান ইউরোপের একক্ষণে যে অবস্থা, বৌদ্ধ যুগের অবসান সময়ে ভারতবর্ষের অবস্থাও সেইরূপ হইয়াছিল। বৌদ্ধ ভারত একদিন উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করিয়াছিল। এই উন্নতি কিন্তু সংঘবদ্ধ হইবারই ফল। বৈষম্যই জগতের স্বরূপ, কাহারও সহিত কাহারও তাই মিল নাই, একথা যেমন সত্য; বৈষম্যের প্রতিষ্ঠা কিন্তু সাম্যেরই উপর, সুতরাং সকলের সহিত সকলের মেলাও তাই সম্ভবপর, এ কথাও আবার তেমনই সত্য। একথা বুঝিতে পারিয়াই ভারতবাসী সেদিন সমস্ত বৈষম্য দূরে পরিহার করতঃ সকলে মিলিত হইয়াছিল। এক হইবার সার্থকতা ও উপযোগিতা তাহারা সেদিন বুঝিতে পারিয়াছিল। ফলতঃ, তাহারা সেদিন "নার্সিসাসের" ন্যায় জাতীয় জীবন জল-তরঙ্গে প্রতিবিম্বিত আপনাদের পূর্ণস্বরূপ সমষ্টি রূপ দর্শন করিয়া আপনারাই মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিল। বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রভাবে, তাহারা পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হইয়া, পরস্পর পরস্পরের প্রয়োজন সাধন করিয়া, পরস্পর পরস্পরের অভাব অভিযোগ মোচন করিয়া, এক অভূতপূর্ব্ব মহা সভ্যতার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। বৌদ্ধ ধর্ম্মই ভারতবর্ষের সর্ব্ব প্রথম সমষ্টির ধর্ম্ম। ভারতীয় ধর্ম্ম এই সময় হইতেই সমাজ-বিষয়িণী উপযোগিতা লাভ করিয়াছিল। হিন্দু ধর্ম্ম ব্যষ্টির ধর্ম্ম, সুতরাং উহা ছিল স্থিতিশীল। কিন্তু ধর্ম্ম একক্ষণে সমষ্টির হইয়া দাঁড়াইল, সুতরাং একক্ষণে উহা প্রচারেরই বিষয় হইয়া পড়িল। হিন্দুর গুহাশায়ী ধর্ম্মকে বুদ্ধই সর্ব্বপ্রথমে মানব জাতির ধর্ম্মরূপে পরিণত করিয়াছিলেন। যে ধর্ম্ম এতদিন পরকাল-সর্ব্বস্ব হইয়া কাননে কন্দরে লোকচক্ষুর অন্তরালে অবস্থিত ছিল, বুদ্ধই সর্ব্বপ্রথমে উহাকে লোকসমাজে টানিয়া আনিয়া, সর্ব্বসাধারণের সেবায় নিয়োজিত করিয়াছিলেন। ব্যষ্টির ধর্ম্ম এইরূপেই সংঘের ধর্ম্ম, নেতার ধর্ম্ম (১) বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিল। (২) "বলীর" ছলনাকারী ত্রিপাদমাত্র ভূমির ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ বটু ত্রিবিক্রমের বিরাট দেহের ন্যায় ধর্ম্মও তাহার এই অভিনব ত্রিমূর্ত্তিতে সমস্ত বিশ্ব অধিকার করিয়া লইয়াছিল। ভারতীয় ধর্ম্মের ইতিহাসে ইহা এক অভিনব অদ্ভুত ব্যাপার। ব্যষ্টি সমষ্টিতে পরিণত হইতে পারিয়াছিল বলিয়াই বৌদ্ধ যুগে ভারতবর্ষের তাদৃশী উন্নতি হওয়া সম্ভবপর হইয়াছিল। * * ব্যষ্টির সমষ্টিতে পরিণত হইতে হইলে, সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন হয় প্রেমের। প্রেমই মিলনের সূত্র। কিন্তু কালক্রমে বৌদ্ধ সমাজে সেই প্রেমের সূত্রই যখন ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল, সুতরাং ভারতবর্ষ তখন বিবাদ বিসংবাদে পূর্ণ হইয়া উঠিল; বর্ত্তমান ইউরোপের ন্যায় তাহারাও তখন পরস্পর পরস্পরের মাংস ছিঁড়িয়া খাইতে লাগিল। সংঘবদ্ধ হওয়ায় যে অত্যদ্ভুত উন্নতি হইয়াছিল, উহারই প্রতিক্রিয়ার ফলে অবনতিও যখন আবার সেইরূপ অতলস্পর্শী হইতে লাগিল, "যত হাসি তত কান্না" রামশর্ম্মার এই তুচ্ছ কথা যখন অক্ষরে অক্ষরে ফলিতে আরম্ভ করিল, তখন—বৌদ্ধ ভারতের সেই চরম অবনতির সময়ে রোঁলার পূর্ণতম সংস্করণ আচার্য্য শঙ্করের আবির্ভাব হইয়াছিল। উভয়েরই যুক্তি তাই সমষ্টিবদ্ধ হইবার—সর্ব্বপ্রকার সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে, এবং উভয়েই তাই ব্যষ্টি-প্রাধান্যেরই পক্ষপাতী। উভয়েরই আবির্ভাবের সময়ে তাঁহাদের স্ব স্ব সমাজের অবস্থাও প্রায় একই রূপ। দেশ কালের বিভিন্নতা যতই

(১) অর্থাৎ, "অবতারের" প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম।

(২) এইজন্যই বৌদ্ধ মণ্ডলে "ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি," "সংঘং শরণং গচ্ছামি," "বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি" ইত্যাদি রূপ ত্রিরত্নের পূজা প্রচলিত হইয়াছিল।

থাকুক, একই প্রকার আবেষ্টনীর মধ্যে জন্ম বলিয়াই উভয়েরই মধ্যে এই প্রকার সৌসাদৃশ্য বর্ত্তমান। (১) History repeats itself ; তাই—

ন মৃত্যুর্ণ শঙ্কা ন মে জাতিভেদঃ
পিতা নৈব মে নৈব মাতা চ জন্ম।
ন বন্ধুর্ন মিত্রং গুরুর্নৈব শিষ্য
শ্চিদানন্দ রূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহম ॥

ইত্যাদি রূপ যে মাভৈঃ বাণী বহু শতাব্দী পূর্ব্বে প্রাচ্য ভারতের গুরু শঙ্করের শ্রীমুখে মেঘমন্দ্রে উদ্ঘোষিত হইয়াছিল, বর্ত্তমান প্রতীচ্য জগতের মহামানব রোঁলার কণ্ঠেও আমরা আজ সেই একই সত্যের অমোঘ বাণী শুনিতে পাইতেছি—"আমি ফরাসীয় নহি, আমি খৃষ্টান নহি, আমি মানব—সর্ব্ব সংস্কারবর্জ্জিত ভূমার ব্যক্তি বিশেষ।"

কিন্তু The European Philosophy ends where the Hindu Philosophy begins. তাই যদিও উভয়েরই দৃষ্টি ভূমার দিকে, তথাপি রোঁলার ভূমা মানব সমাজের পরিধিতেই পর্য্যবসিত, শঙ্করের ভূমা কিন্তু দৃশ্যাদৃশ্য অনন্ত জগৎ অবধি বিস্তৃত। সাম্য সংস্থাপন উভয়েরই উদ্দেশ্য। তবে, একজন মানব সমাজে—মানবে মানবে মাত্র সাম্য সংস্থাপন করিয়াই সন্তুষ্ট; অন্যের আকাঙ্ক্ষা কিন্তু আরও অধিক,—বিশ্বের সর্ব্বত্র—সর্ব্বভূতে সমদৃষ্টি আনয়ন করাই তাঁহার একমাত্র উদ্দেশ্য। উভয়েই বৈষম্য ব্যাধির সুচিকিৎসক। তবে একের উদ্দেশ্য সামাজিক ব্যাধির চিকিৎসা করা—যাহাতে স্বখাদ সলিলে ডুবিয়া মরিতে না হয়, তাহারই শুধু ব্যবস্থা করা; অন্যের উদ্দেশ্য কিন্তু প্রাকৃতিক বৈষম্যের প্রতীকার করা, কেন না, প্রাকৃতিক বৈষম্য সহজ হইলেও, তাঁহার মতে, উহা সাধ্য। রোঁলার লক্ষ্য—কিরূপে মানবের সামাজিক বৈষম্য তিরোহিত হয়। শঙ্করের উদ্দেশ্য—কিরূপে মানবের সামাজিক, তথা প্রাকৃতিক উভয় প্রকার বৈষম্যই দূরীভূত হয়। * * * রোঁলার মতে, সমাজের সকলেই মানব; মালিক ও মজুর, স্ত্রী ও পুরুষ, শ্বেত ও কৃষ্ণ, ভারতীয় ও ইংরাজ ইত্যাকার বৈষম্য কল্পিতমাত্র। পক্ষান্তরে, শঙ্করের মতেও, বিশ্বের সকলেই ব্রহ্ম; উদ্ভিদ, পশু ও মানব ইত্যাকার বৈষম্যও মিথ্যামাত্র। (২) সংকীর্ণ স্বার্থ-বুদ্ধি হইতেই এ সকলের উৎপত্তি। (৩) ভারতীয় ও ইংরাজের মধ্যে যেমন বস্তুতঃ কোনও রূপ শত্রুতা অর্থাৎ ভোক্তা-ভোগ্য সম্বন্ধ নাই; মানব ও উদ্ভিদ ইত্যাকার সর্ব্বভূতের মধ্যেও সেইরূপ কোনও প্রকার খাদ্য-খাদকের সম্বন্ধ নাই। (৪) মানব

(১) কোনও মহাপুরুষেরই ভুঁই ফুঁড়িয়া জন্ম হয় না। কোনও জাতির সময় ও প্রয়োজনোচিত সমবেত চিন্তাশক্তিই তদনুরূপ মহাপুরুষরূপে মূর্ত্তিমতী হয়, ইহা বৈজ্ঞানিক সত্য।

(২) স্বর্গে ও পৃথিবীতে, মানবে এবং দেবতাতেও বস্তুতঃ কোনও প্রভেদ নাই।

(৩) গ্রীস তুরস্কে যুদ্ধ বাধে, আর তৎক্ষণাৎ 'আমরা খ্রীষ্টান" প্রতীচ্য জগতের এই জ্ঞানের নাড়ীতে টনক পড়ে। কিন্তু যখনই ফরাসীয় ও জর্ম্মানে যুদ্ধ বাধে, তখনই "কে খ্রীষ্টান, কে অখ্রীষ্টান?" সে সকল কথা তলে পড়িয়া যায়, বড় হইয়া উঠে তখন "আমরা ফরাসীয়, তাহারা জর্ম্মান'। চিত্ররথ গন্ধর্ব্বের সহিত যখন যুদ্ধ বাধে, পাণ্ডবে দুর্য্যোধনে মিলিয়া তখন হন শত ভাই। কিন্তু যখন কুরুক্ষেত্র কাণ্ড বাধে, তখন সেই ভ্রাতৃভাব থাকে কোথায়, একথা ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকেই জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হয়। ফলতঃ, "নাচি এ তালে ও তালে, যে তালে গৌরাঙ্গ মেলে"—ইহাও যেন ঠিক তাহাই।

(৪) কি শারীর, কি মানস—সর্ব্বপ্রকার ক্ষুধাতৃষ্ণার বহু ঊর্দ্ধে অবস্থিত মানব, সে স্বয়ংই ব্রহ্মস্বরূপ,—মহাপুরুষের যখন এই জ্ঞান উদিত হয়, সর্ব্বভূতের প্রতি তাঁহার যখন প্রেমভাব উৎপন্ন হয়, তখন তাঁহার বৃক্ষের একটি পত্র পর্য্যন্তও ছিন্ন করিবার প্রবৃত্তি হয় না, শরীর ধারণ তাঁহার নিকটে তখন বিড়ম্বনা বলিয়া মনে হয়; কেন না, দেহ যতক্ষণ, ততক্ষণ কোনও না কোনও ভাবে, কাহারও না কাহারও দুঃখের কারণ হইতেই হয়। এইজন্যই শাস্ত্র বলেন, পূর্ণব্রহ্মজ্ঞানীর একবিংশতি দিবসের অধিককাল দেহ থাকে না। নির্ব্বাণ এবং মুক্তির কল্পনাও এইরূপেই ফুটিয়া উঠে। মহাপুরুষ মুক্তি এবং নির্ব্বাণ চাহেন অর্থাৎ এমন মরণ (রবীন্দ্রনাথের ভাষায় "অনন্তমরণ") মরিতে চাহেন যাহাতে পুনর্জন্ম না হয়, কেন না, জন্মিলেই অন্যের কষ্টের কারণ হইতে হয় এবং অন্যের যাহাতে কষ্ট হয়, তদপেক্ষা অধিক কষ্টকর তাঁহার নিকটে আর কিছুই নাই। ফলতঃ, তিনি স্বয়ংই বিশ্ব হইতে নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইতে চাহেন, অন্যকে স্থান করিয়া দিবার জন্য। নির্ব্বাণ এবং মুক্তির ইহাই তাৎপর্য্য।

যখন নিঃস্বার্থ ও নিষ্কিঞ্চন হয় (১), তাহার তখন সর্ব্বভূতে সমদৃষ্টি হয়, সে তখন এরূপভাবে চলিতে সমর্থ হয়, যাহাতে কোনও রূপ বৈষম্যেরই সৃষ্টি হয় না। "আমি খৃষ্টান"—এই সামান্য দুইটি কথার মধ্যে যেমন খৃষ্টের আত্মত্যাগ, নীরোর অত্যাচার,ten crusades—এইরূপ ভাল মন্দ (২) বহু যুগের ইতিহাস লুক্কায়িত, "আমি মানব"—এই সামান্য দুইটি কথার মধ্যেও সেইরূপ যুগ যুগান্তরের অতীত কাহিনী নিহিত। ফলতঃ, একটি ইহজন্মের, অন্যটি জন্মজন্মান্তরের অর্জ্জিত সংস্কারের ফল। সুতরাং, সহজ হইলেও প্রাকৃতিক বৈষম্যও মানবেরই স্ব-কৃত। মানব তাহার যুগ যুগান্তরের চিন্তার অভিব্যক্তি মাত্র। চিন্তার ফলেই তাহার এই বর্ত্তমান মানব রূপ। আবার সেই চিন্তারই ফলে পশু হওয়াও তাহার পক্ষে তাই সম্ভবপর। (৩) মানবের যখন সাম্প্রদায়িকতা বোধ ঘুচিয়া যায়, রোঁলা রবীন্দ্রনাথের ন্যায় তাঁহারও তখন ফরাসীয় ও জর্ম্মাণ, ভারতীয় ও ইংরাজ ইত্যাকার ভেদবুদ্ধি দূর হইয়া যায়, তিনি তখন নিখিল মানব-কল্যাণকামী হইয়া দাঁড়ান। তাঁহার চিত্ত যখন আরও উদার হয়, তখনই তিনি ব্রহ্মস্বরূপ, সুতরাং সর্ব্ব-ভূতের সহিত অভেদ হইয়া যান, বিশ্বহিত-সাধনই তাঁহার তখন একমাত্র ব্রত হইয়া দাঁড়ায়। (৪) রোঁলা ও শঙ্করের মধ্যে ইহাই সম্বন্ধ। শঙ্কর রোঁলার পূর্ণতম প্রকাশ, এই মাত্র। (৫)

আরও একটি লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, প্রতীচ্য জগতে জাতীয় সাম্প্রদায়িকতাই (nationalism) অধিক, ভারতে আবার কিন্তু পারিবারিক সাম্প্রদায়িকতাই অধিক। (এবং সম্ভবতঃ এইজন্যই ভারতবাসীরা সহজে সংঘবদ্ধ হইতে সমর্থ হয় না।) ফলতঃ, ভারতবাসীরা মায়াপ্রবণ, প্রতীচ্য জাতিরা স্বার্থপ্রবণ। রোঁলাকে তাই nationalismএর উচ্ছেদ সাধনে অধিক তৎপর দেখা যায়, শঙ্করকে কিন্তু দেখা যায় পারিবারিক সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধেই অধিক তৎপর। (৬)

ভারতে শঙ্করের জন্ম বস্তুতঃই স্বাভাবিক, কেন না, ভারত ধর্ম্মক্ষেত্র। পদ্মের জন্ম জলাশয়েই হয়। কিন্তু সেই পদ্ম যখন পর্ব্বতশিখরে বিকসিত হয়, ভেদজর্জ্জরিত প্রতীচ্য জগতেও যখন রোঁলার ন্যায় মহাত্মার আবির্ভাব হয়, তখন আমাদের মনে স্বভাবতঃই বিস্ময়ের উদয় হয় এবং আমাদের মস্তক স্বতঃই সেই মহাপুরুষের উদ্দেশে নত হইয়া পড়ে। (৭)

---

(১) বালক নিষ্কিঞ্চন, তাই, স্ত্রী ও পুরুষ, ধনী ও নির্ধন ইত্যাকার সমস্ত বৈষম্যই তাহার নিকটে নিরর্থক। তাহার নিকটে স্বর্ণের অলঙ্কার হইতেও অর্দ্ধ পয়সার ঘুড়ির মূল্যই অধিক। বিবাহ করিতে হইলে তাহার বড় আদরের কাকাবাবুই হয় সম্ভবতঃ তাহার নিকটে অধিক পছন্দসই। ফলতঃ, বালকের ব্যবহার এতই সরল যে, তাহাতে কোনওরূপ বৈষম্যই সৃষ্ট হইবার সম্ভাবনা নাই।

(২) ভাল মন্দ বলিয়া দুই পৃথক বস্তু নাই। যাহা একের নিকটে ভাল, তাহাই আবার অন্যের নিকটে মন্দ। ভাল মন্দ ইত্যাকার ধারণা স্বার্থজনিত।

(৩) লক্ষপতি রঘুনাথ দাসও যেমন ইচ্ছা করিলে নিঃস্ব হইতে পারেন; রাজপুত্র সিদ্ধার্থও যেমন ভিক্ষু হইতে পারেন; সন্ন্যাসী নিত্যানন্দও যেমন সংসারী হইতে পারেন; সেইরূপ, অম্বাও সাধনায় শিখণ্ডী হইতে পারেন; রাজর্ষি ভরতেরও হরিণত্ব লাভ হইতে পারে; রম্ভাও পাষাণী হইতে পারেন; উর্ব্বশীরও লতাজন্ম হইতে পারে। ইত্যাদি।

(৪) এই অবস্থায়, বুদ্ধ সামান্য এক ছাগশিশুর জীবনরক্ষার্থে আপনার অমূল্য জীবন বলি দিতেও কুণ্ঠিত হয়েন না। তাঁহার লাভ ক্ষতির গণনা নাই; তাঁহার নিঃস্বার্থ অভেদ দৃষ্টিতে, মানব ও পশু—উভয়েরই তাই তুল্য মূল্য। এই প্রকার উদার দৃষ্টিবশতঃই, রোঁলাও জর্ম্মাণ যুদ্ধে যোগদান করিতে অসম্মত হন এবং তাহারই ফলে দেশ-দ্রোহী বলিয়া সর্ব্বত্র তাঁহার লাঞ্ছনা ও নিগ্রহ হয়। ভূমাদৃষ্টি যাঁহার, তাঁহার একমাত্র লক্ষ্য হয়, যাহাতে ভূমার কল্যাণ হয়; কেন না, ভূমার কল্যাণেই অন্যের যথার্থ কল্যাণ হয়, কিন্তু অন্যের কল্যাণে কাহারই যথার্থ কল্যাণ হয় না, হওয়াও সম্ভবপর নহে।

(৫) "যা আছে ভাণ্ডে, তা আছে ব্রহ্মাণ্ডে।" ক্ষুদ্র মানব সমাজের পর্য্যালোচনার দ্বারা বৃহত্তম বিশ্বের স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করাও তাই সম্ভবপর হয়।

(৬) শঙ্করের "কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ" "পুত্রাদপি ধন-ভাজাং ভীতি" "পিতা নৈব মে নৈব মাতা ন জন্ম" ইত্যাদি শ্লোক এস্থলে স্মরণ করা কর্ত্তব্য।

(৭) পরস্পর বিবদমান ইউরোপীয় রাজ্যসমূহের সম্মুখে যে প্রকার আদর্শ স্থাপনে রোঁলা আজ অগ্রসর, ভারতবর্ষ যে সেই আদর্শের

ফ্র্যান্সের মহামানব রোঁলার ন্যায় বর্ত্তমান ভারতের ঋষিকবি রবীন্দ্রনাথও ব্যষ্টি প্রাধান্যেরই পক্ষপাতী। কোনরূপ সাম্প্রদায়িকতাই সমর্থনযোগ্য নহে; ইহা ধ্রুব সত্য। কিন্তু তাই বলিয়া সঙ্ঘবদ্ধ হইবার উপযোগিতাও কোনও প্রকারেই অস্বীকার করা যায় না। ব্যষ্টিপ্রধান সমাজে মানবের উন্নতিও যেমন অধিক হয় না, অবনতিও সেইরূপ অধিক হয় না। উহার ভাল মন্দ স্থানবিশেষেই আবদ্ধ থাকিয়া যায়, কিছুই সেরূপ ব্যাপক হইয়া উঠে না। কিন্তু সমষ্টিপ্রধান সমাজে মানবের উন্নতিও যেমন অধিক ও ব্যাপক হয়, উহার অবনতিও সেইরূপ অধিক এবং ব্যাপক হয় এবং এই প্রকার সমষ্টিগত উন্নতি অথবা অবনতি হইতে সময়েরও তাই অধিক প্রয়োজন হয়। যাহা হউক, সমষ্টিবদ্ধ হইবার প্রয়োজন বর্ত্তমান ভারতে যে কত অধিক তাহা প্রত্যেকেরই ভাবিয়া দেখিবার বিষয়। এই জন্যই, রোঁলা বর্ত্তমান ইউরোপের যত বড় আদর্শই হউন, বর্ত্তমান ভারতের আদর্শ কিন্তু তিনি অথবা শঙ্কর কেহই নহেন, ইহাই আমাদের ধারণা। ভারতে রোঁলার পূর্ণতম প্রকাশ শঙ্করের প্রয়োজন হইয়াছিল বৌদ্ধধর্ম্মের পতনের সময়ে—সে যুগ কিন্তু বহুদিন অতীত হইয়া গিয়াছে। বরং বর্ত্তমান ভারতের এই যে ব্যষ্টিপ্রাধান্য—যাহার জন্য উহার এই বর্ত্তমান দুর্দ্দশা—শঙ্করবাদই ইহার জন্য অনেকাংশে দায়ী। * * * মিলনেই সভ্যতার বৃদ্ধি হয়। একমাত্র সভ্যতার বৃদ্ধিই যদি মিলনের উদ্দেশ্য হয়, তবে আর সেরূপ মিলনের ফলে কোনওরূপ বৈষম্যের উৎপত্তি হওয়াও সম্ভবপর হয় না। কিন্তু তাহা যখন হয় না, তখন—মানবমুখে যতই বড়াই করুক,—তাহাদের বর্ত্তমান সমাজের এই যে মিলন, ইহার প্রকৃত উদ্দেশ্য যে অন্যরূপ, তাহা নিঃসন্দেহ। এই প্রকার মিলনের ফলে সাম্প্রদায়িকতার উদ্ভব হওয়াও তাই অনিবার্য্য। নরনারী মিলিত হয় প্রেমে, এই কথাই যদি সত্য হয়, তবে পুরুষের পুরুষকে অথবা স্ত্রীর স্ত্রীকে বিবাহ করিবার প্রবৃত্তি হওয়াও সঙ্গত বলিয়া মনে হয়। প্রেমই যদি নরনারীর মিলনের যথার্থ হেতু হয়, তবে আর divorce আইন, কন্যাপণপ্রথা, বৃদ্ধের পঞ্চম পক্ষ গ্রহণের অধিকার পক্ষান্তরে বিধবা বালিকারও পত্যন্তর গ্রহণের অবিধান—এই সকল বৈষম্যের সৃষ্টি হয় না। সুতরাং নরনারীর এই বিবাহের যথার্থ কারণ কিন্তু অন্যরূপ বলিয়াই মনে হয়, এইজন্যই শাঙ্কর-মতে পুরুষ কুঁজো এবং স্ত্রী কুণো। সুতরাং কুঁজোর বোঝা কুণোর ঘাড়ে এবং কুণোর বোঝা কুঁজোর ঘাড়ে পড়িলে ব্যাপার যাহা হয়, মানবের বর্ত্তমান বিবাহ-পদ্ধতি এবং তাহার সভ্যতাই উহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। এইজন্যই শঙ্করের মতে পরস্পর পরস্পরের সহিত না মেশাই বরং ভাল। তাঁহার মতে তাই সংসারী হওয়া অপেক্ষা নিঃসঙ্গ সন্ন্যাসী হওয়াই অধিকতর বাঞ্ছনীয়। যাহা হউক, প্রবন্ধান্তরে এ সকল বিষয়ের আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল। তবে শাঙ্করবাদের সার্থকতা এই যে, সমানে সমানে ভিন্ন প্রেম হয় না, কর্ষণে ক্ষেত্র যখন সমতা প্রাপ্ত হয়, তখনি উহা বীজ বপনের উপযোগী হয়। সকলেই ব্রহ্মস্বরূপ, সকলেই এক, সকলেই অভেদ।

এইরূপে জ্ঞানাবতার শঙ্কর কর্ত্তৃক সর্ব্বত্র সমতা প্রতিষ্ঠিত হইয়া যখন ক্ষেত্র প্রস্তুত হইয়াছিল, তখনই প্রেমাবতার চৈতন্যদেব আসিয়া প্রেমের বীজ বপন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তিনি তাই কোনও রূপ গোঁজামিলেরই পক্ষপাতী ছিলেন না। বুদ্ধির যেরূপ উৎকর্ষ জন্মিলে পুরুষের পুরুষকে এবং স্ত্রীর স্ত্রীকে বিবাহ করিবার প্রবৃত্তি হয়, যে বুদ্ধিতে বালক তাহার কাকাবাবুকেও বিবাহ করিতে কুণ্ঠিত হয় না (১) সেই শুদ্ধ বুদ্ধিতে—

দিকে বহুদূর অগ্রসর, তাহা নিঃসন্দেহ। বরং ভারতের এই ভালমানুষির সুযোগ অন্য জাতিরা অন্যায় ভাবে গ্রহণ করাতেই তাহার এই বর্ত্তমান দুর্দ্দশা। মানবীয় পশুবৃত্তি করিবার জন্য যে ভারতের এত আগ্রহ, তাহাকে জীবন-সমস্যায় পাতিত করিয়া তাহার সেই পশুভাব এই প্রকারে উত্তেজিত করিয়া তুলা কাহারও কর্ত্তব্য নহে। ইউরোপের সংক্রামক ব্যাধি যাহাতে ভারতেও প্রবেশ করিতে না পারে, তাহার চেষ্টা করা সকলেরই কর্ত্তব্য। ইউরোপেরও কর্ত্তব্য, রোঁলার আদর্শ গ্রহণ করা এবং ভারতবর্ষও যাহাতে শঙ্করের আদর্শ হইতে বিচ্যুত না হয়, তাহাই করা। কিন্তু "চোরা না শুনে ধর্ম্মের কাহিনী।" দূরদৃষ্টিশূন্য, বর্ত্তমান মাত্র সর্ব্বস্ব প্রতীচ্য জাতির কর্ণে রোঁলার বাণীর মূল্য তাই আজ "ভেড়ার কাণে বামুনের বচনের"ই তুল্য।

(১) আমাদের সামান্য দৃষ্টিতে পূর্ণজ্ঞানী এইজন্যই বালকবৎ অথবা মূর্খবৎ প্রতীয়মান হয়। বস্তুতঃ জগতে কে মূর্খ, কে জ্ঞানী

একে স্ত্রী, অন্যে পুরুষ, একথা ভুলিয়া গিয়া—ফলতঃ, বাহ্য বৈষম্যের দিক দিয়া নহে, আত্মার দিক দিয়া উভয়ে যদি মিলিত হয়, তবে সেই মিলনই সার্থক হয়। এবং এই প্রকার মিলনের ফলে যে সভ্যতার উৎপত্তি হয়, তাহাই সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হয়, এবং উহার ধ্বংসও তাই কদাপি সম্ভবপর হয় না। ইহাই ছিল চৈতন্যদেবের অভিপ্রায় এবং তাঁহারই যুগের মানব যেহেতু আমরা, সেই হেতু এ যুগে তিনিই আমাদের একমাত্র অনুসরণীয়। তাঁহার ধর্ম্মও তাই এই যুগেরই উপযোগী। উহা বস্তুতঃই মিলনের ধর্ম্ম —প্রেমের ধর্ম্ম। সুতরাং ভারতবাসীর কর্ত্তব্য এক্ষণে সঙ্ঘবদ্ধ হওয়া—সকলে মিলিত হওয়া, সেই মিলনে—যে মিলন "প্রেমের মিলন, প্রাণের মিলন, মিলনের নাই তুলনা।" শঙ্কর মিলনের পক্ষপাতী নহেন। সুতরাং তাঁহার ধর্ম্মে মিলনের সার্থকতার সন্ধান লইতে যাওয়া বাতুলতা মাত্র। তবে উহার সার্থকতা বুঝিবার জন্য বহুদূর যাইবারও প্রয়োজন হয় না। বৌদ্ধভারতের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে, বৌদ্ধধর্ম্মের সহিত চৈতন্যের ধর্ম্মের তুলনা করিলে উহার উপযোগিতা সহজেই হৃদয়ঙ্গম হয়। কেন না, বৌদ্ধ পূর্ব্ব যুগের সহিত শাঙ্কর যুগের যে প্রকার সাদৃশ্য বিদ্যমান, ঐ দুই যুগ যেমন ব্যষ্টি প্রাধান্যেরই যুগ, বৌদ্ধ ও চৈতন্যের যুগের মধ্যেও সেইরূপ সামঞ্জস্য বর্ত্তমান, এই দুই যুগও সেইরূপ সমষ্টি প্রাধান্যেরই যুগ। বুদ্ধ এবং চৈতন্য উভয়েরই ধর্ম্ম তাই সমষ্টির ধর্ম্ম। বর্ত্তমান প্রসঙ্গে এ কথা বলা বোধ হয় অসঙ্গত হয় না যে, লোকসমাজবিষয়িণী উপযোগিতা কিন্তু বৌদ্ধধর্ম্মের অপেক্ষাও বৈষ্ণব ধর্ম্মেরই অধিক। এই লোক কল্যাণ সাধন বিষয়ে বৈষ্ণব ধর্ম্মের philosophy বৌদ্ধধর্ম্মের philosophy হইতেও উৎকৃষ্টতর। কেন না, বুদ্ধ নিরীশ্বরবাদী, চৈতন্য পরম আস্তিক। বুদ্ধের নিকটে মানব শুধু মানব মাত্র, কিন্তু চৈতন্যের নিকটে জীব "শঙ্করের শিব" অপেক্ষাও অধিক—"নিত্যজীব"। (১)

বুদ্ধের মতে, বাসনার জন্যই জীবের জন্ম, বাসনাক্ষয়েই জন্মক্ষয় এবং উহাতেই নির্ব্বাণ, ইহাই জীবের চরম পরিণাম। সুতরাং এই মতে মানবের সার্থকতা বড় অধিক নহে, সুতরাং তাহার জন্ম কর্ম্ম যাহা কিছু সকলি নিরর্থক অথবা ভ্রান্তিমূলক। (২) চৈতন্যের মতে কিন্তু প্রেমই সৃষ্টির মূল, লীলার জন্যই জীবের জন্ম, তাহার তাই অনন্ত

তাহা বুঝা কঠিন। অনেক বিষয় জানার চেয়ে না জানাই বরং ভাল, অথবা জানিয়াও ভুলিয়া যাওয়াই বুদ্ধিমানের কার্য্য। ফলতঃ, Ignorance is bliss, একথা নিরর্থক নহে। শাস্ত্র বলেন, মহাপুরুষগণকে এইজন্যই লোকে উন্মাদবৎ, পিশাচবৎ, মূকবৎ, জড়বৎ অথবা মূর্খবৎ মনে করিয়া থাকে। সর্ব্বসাধারণের সহিত যাঁহার মিল নাই, তিনি যে সর্ব্বত্রই উন্মাদ বলিয়া বিবেচিত হইবেন, তাহাতে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই। বেগুণ-বিক্রেতার নিকটে হীরার মূল্য পাঁচ সের বেগুণের মূল্যের অধিক কোনও দিনই হয় না।

(১) শঙ্করের শিব—চৈতন্যের জীব-দেহ। এবং চৈতন্যের জীব —শঙ্করের শিব-দেহ। একের অর্দ্ধদৃষ্টি, অন্যের পূর্ণদৃষ্টি। বুদ্ধের সামান্য দৃষ্টি। জীব তাঁহার নিকটে অর্থশূন্য জীবমাত্র।

(২) যাঁহার নির্ব্বাণপ্রাপ্তি ঘটে, তিনিই যথার্থ মানব। তদ্ব্যতীত অন্যান্য সকলেই সামান্য মানব। সুতরাং তাহারা কেহই তাদৃশ শ্রদ্ধার পাত্র হইতে পারে না। ফলতঃ, বৌদ্ধ ও শাঙ্কর দর্শনের মধ্যে পার্থক্য বড় অধিক নহে। বুদ্ধের নির্ব্বাণ এবং শঙ্করের মুক্তি দুইই সমান। এইজন্যই, শাঙ্করবাদকে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধবাদ বলিয়া মনে করা হয়। তবে, শঙ্করের ছিল অদ্ভুত মস্তিষ্ক, বুদ্ধের কিন্তু ছিল মহান্ হৃদয়, তিনি ছিলেন করুণার অবতার। তাঁহার ধর্ম্মের লোকসেবাবিষয়িণী উপযোগিতা এইজন্যই তেমন অধিক হইয়াছিল। পক্ষান্তরে, চৈতন্যের কিন্তু জীবই ছিল একমাত্র উপাস্য—তাঁহার সর্ব্বস্ব। মানব —বুদ্ধের নিকটে "as he should be" রূপে গ্রাহ্য হইয়াছিল। চৈতন্যের নিকটে কিন্তু গ্রাহ্য হইয়াছিল "as he is" রূপেই। জীব তাই তাহার দোষ গুণ অপূর্ণতা যাহা কিছু সব লইয়াই তাঁহার নিকটে পরমসুন্দর হইয়া ধরা দিয়াছিল। বুদ্ধের চেষ্টা ছিল জীবের দুঃখ দূর করিবার জন্য। "সর্ব্বমজ্ঞানং দুঃখস্য নিদানম্", সুতরাং জীবের এই অজ্ঞানতা যাহাতে দূর হইয়া যায়, বুদ্ধের ছিল তাহাই ইচ্ছা। সুতরাং শঙ্করের ন্যায় তিনিও ছিলেন সামান্যতঃ মায়াবাদী। চৈতন্যের মতে ছিল কিন্তু সুখ দুঃখ জ্ঞান অজ্ঞান, সবই তুল্য সার্থক। রাত্রিদিন একই কারণের পরিণাম, একথা জানিতে পারিলে শুধু রাত্রি অথবা শুধু দিন হইল না কেন বলিয়া যেমন দুঃখ হয় না, দিন ও রাত্রি দুইই তখন যেমন উপভোগের বিষয় হইয়া দাঁড়ায়, সেইরূপ সুখ দুঃখ ইত্যাদিতে অভেদ বুদ্ধি জন্মিলে তখন আর জীবের দুঃখ করিবার কিছুই থাকে না। ফলতঃ, চৈতন্য ছিলেন লীলাবাদী। একের বিশ্লেষিণী, অন্যের সংশ্লেষিণী বুদ্ধি।

জন্ম, উহার কদাপি ক্ষয় হয় না। এই লীলার আদিও নাই, অন্তও নাই। জীব নিজেই নিত্য, তাহার লীলাও তাই নিত্য। এক এক সময়ে তাহার এক এক প্রকার জন্ম হয়, এইমাত্র অর্থাৎ সে এক এক সময়ে এক এক রূপ ধারণ করে—লীলারস সম্ভোগ করিবার জন্য। নিত্য নূতন হইতে না পারিলে লীলা মধুর হয় না, সুতরাং উহা সার্থক হইতে পারে না। প্রেমিকের নিকটে কিছুই তাই একঘেয়ে হয় না। "নিতুই নব" হওয়াই প্রেমের ধর্ম্ম। জীবের জন্ম মৃত্যু যাহা কিছু সকলি তাই ইহারই জন্য। সুতরাং তাহার যাহা কিছু সকলি তাই সার্থক। চৈতন্যের মতে ইহাই জীবের পরমাগতি। পক্ষান্তরে, বুদ্ধের মিলনের উৎস, অহিংসা, চৈতন্যের কিন্তু প্রেম। একের মিলনই সাধ্য, অহিংসা তাহার সাধন। অন্যের কিন্তু প্রেমই সাধ্য, মিলনই উহার সাধন। বুদ্ধের ইচ্ছা ছিল, সকলে মিলিত হইয়া সকলের প্রয়োজন সিদ্ধ করুক, উহাতে পরস্পর পরস্পরের উপযোগিতা বুঝিতে পারিবে, এবং তাহারই ফলে তাহাদের মধ্যে প্রেমভাব উৎপন্ন হইবে। চৈতন্যের উদ্দেশ্য ছিল কিন্তু, পরস্পর পরস্পরের প্রতি প্রেমভাব বৰ্দ্ধিত হউক, প্রেমভাব প্রগাঢ় হইলে মিলন তখন আপনিই হইবে। ফলতঃ, একজন post-nuptial loveএর পক্ষপাতী, অন্যজন কিন্তু anti-nuptial loveএর অর্থাৎ অহৈতুক প্রেমের পক্ষপাতী, সুতরাং মিলন বিষয়িনী উপযোগিতা যে বৌদ্ধধর্ম্ম হইতে বৈষ্ণব ধর্ম্মেরই অধিক, তাহা নিঃসন্দেহ। তবে, কার্য্যতঃ কিন্তু বৈষ্ণবধর্ম্ম বৌদ্ধ-ধর্ম্মের ন্যায় সাফল্য লাভ করিতে অদ্যাবধিও সমর্থ হয় নাই। বুদ্ধের ধর্ম্ম একদিন ভারতবর্ষকেই শুধু সার্থক করিয়া তুলিয়াছিল না, পরন্তু সুদূর চীন জাপান এবং সিংহলের সভ্যতার ভিত্তিও গড়িয়া দিয়াছিল। পক্ষান্তরে, বৈষ্ণবধর্ম্ম কিন্তু শুধু সমগ্র ভারতবর্ষকেও একত্রিত করিতে পারে নাই, যদিও মিলনের সূত্রপাত কিন্তু করিয়াছিল এই ধর্ম্মই। তবে, এ কথাও সত্য যে, ভারতভূমির বর্ত্তমান অধঃপতন অত্যন্ত শোচনীয়, বিশেষতঃ, চৈতন্যের ধর্ম্মের পূর্ণ প্রচার এখনও হয় নাই, শাঙ্করবাদের মোহ হইতে ভারতবাসী এখনও মুক্ত হইতে পারে নাই। যদিও রামমোহন, কেশবচন্দ্র, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, দয়ানন্দ প্রভৃতির চেষ্টার ত্রুটি নাই, তথাপি চৈতন্যের আরব্ধ কার্য্য কিন্তু এখনও অৰ্দ্ধ সম্পন্ন মাত্র। তাঁহার কার্য্য সম্পূর্ণ হইবে সেই দিন, যেদিন সমগ্র ভারত 'সূত্রে মণিগণা ইব" মিলিত হইতে সমর্থ হইবে। সুতরাং ভারতবর্ষকে মিলিতে হইবে—প্রতীচ্য জগৎ অথবা অবনত বৌদ্ধ ভারতের ন্যায় পরস্পর পরস্পরের মাংস ছিঁড়িয়া খাইবার জন্য নহে, আলেকজেণ্ডারের ন্যায় সুজলা সুফলা ভারতভূমির শস্য শ্যামল ক্ষেত্র পদপালে সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিবার জন্য নহে অথবা নেপোলিয়ঁর ন্যায় দেশে দেশে মানব শোণিত-সিক্ত রক্তপতাকা উড়াইবার জন্য নহে। মিলিতে হইবে তাহাকে—বুদ্ধের ন্যায় তিব্বত চীনে জ্ঞানের আলোক বিতরণ করিবার জন্য; রামমোহন বিবেকানন্দের ন্যায় ইউরোপ ও আমেরিকায় ত্যাগপূত গৈরিক পতাকা উড়াইবার জন্য: "কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তম্"। ভিক্ষু বুদ্ধ স্থবিরের ভারতবর্ষ সে, সুতরাং তাহাকে চিরদিনই ভিক্ষুক থাকিতে হইবে, ছিন্ন কন্থা এবং ত্যাগের ঝুলিই তাহাকে চিরসম্বল করিতে হইবে। ইহাই মাত্র সম্বল করিয়া বিশ্বে বিলাইয়া দিতে হইবে তাহাকে কিন্তু—তাহার জ্ঞানামৃতের ভাণ্ডার। বিশ্বের হাটে কাহারও "কেনা বেচার অংশী-দার" হইবার জন্য তাহার সৃষ্টি হয় নাই। তুলসীতলে শয়ান মুমূর্ষুকে তারকব্রহ্ম নাম শুনাইবার মহাকর্ত্তব্য তাহারই উপর ন্যস্ত, একথা তাহার ভুলিয়া গেলে চলিবে না। দেওয়া এবং নেওয়াতেই পাওয়ার সার্থকতা, সুতরাং তাহার যাহা আছে, তাহা কৃপণের ন্যায় একাকী শুধু ভোগ করিলে চলিবে না। শ্রীমন্ত একাকী "কমলে কামিনী" দর্শন করিয়াছিলেন, অন্যকে দেখাইতে পারেন নাই; এই জন্যই মশানে তাঁহার প্রাণ যাইবার উপক্রম হইয়াছিল। ভারত তাহার জ্ঞানৈশ্বর্য্যের ভাণ্ডার নিজেই ভোগাধিকার করিয়াছে, অন্যকে তাহার অংশ দিতে চাহে নাই অথবা দিবার কথা ভুলিয়াই গিয়াছিল, তাই তাহার আজ এই শ্মশান-শয্যা। সে যদি যথাসময়ে তাহার জ্ঞানামৃতের ভাণ্ডার বিশ্বের সকলকে পরিবেশন করিত, তাহার বিশ্ব-জনীন মহাবাক্য শুনাইবার উপযুক্ত সমবেত কণ্ঠ আজ যদি

তাহার থাকিত, তাহা হইলে সম্ভবতঃ প্রতীচ্য জগতকে ঐ প্রকারে মারামারি কাটাকাটি করিয়া মরিতে হইত না। সুতরাং বিংশ শতাব্দীর কুরুক্ষেত্রের এই যে হত্যাপাতক, ইহার জন্য দায়ী বিশ্বের বৃদ্ধ পিতামহ এই ভারতবর্ষই। সে কেন যথাসময়ে তাহার শান্তিপর্ব্ব শুনাইয়া সকলকে শান্ত করিতে সচেষ্ট হয় নাই। সুতরাং তাহাকে মিলিতেই হইবে। তবে, অনেকেরই কিন্তু ধারণা, ভারত যেমন আছে, তেমনই থাকুক, রোঁলা প্রভৃতির প্রচারের ফলে অদূর ভবিষ্যতে প্রতীচ্য জগতও ভারতের আদর্শেরই অনুসরণ করিবে। ঈশ্বর করুন, তাঁহাদের এই ধারণা যেন সত্য হয়। তবে, এ কথাও সত্য যে, ব্যষ্টি ভিন্ন যেমন সমষ্টি নাই, সমষ্টি ভিন্ন ব্যষ্টিরও সেইরূপ সার্থকতা নাই। ভূমা চাহে ক্ষুদ্রকে হইতে, ক্ষুদ্র ধায় ভূমারে পাইতে। রাধার জন্য কৃষ্ণ উন্মাদ, কৃষ্ণের জন্য রাধা উন্মাদিনী। "দুঁহু কাঁদে দোঁহার লাগিয়া। সুতরাং ব্যষ্টি ও সমষ্টির মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করাই যথার্থ কর্ত্তব্য। এই পথই প্রকৃত পথ। ভারতকে তাই সঙ্ঘশক্তির কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি করিতে হইবে। প্রতীচ্য জগৎকেও তাই ব্যষ্টিপ্রাধান্যের দিকে কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইতে হইবে। প্রাচ্য, প্রতীচ্য উভয় জগৎকেই তাই বলিতে চাই—হে খৃষ্টের সন্তান, স্বর্গের দিকে—স্বর্গস্থ পিতার দিকে দৃষ্টিপাত কর, ঊর্দ্ধ দৃষ্টি কর, আর হে অমৃতের পুত্র, তোমরাও মর্ত্ত্যের দিকে দৃষ্টি ফিরাও, জানিও, মর্ত্ত্যে যাহা আছে, স্বর্গেও তাহার অধিক নাই। উভয়কেই তাই বলিতে চাই,—

"আগে চল্ আগে চল্ ভাই"।

অপরাধ স্বীকার।

[শ্রীদ্বিজপদ মুখোপাধ্যায়, বি-এ]

(১)

অপরাধী মোর বালক ছাত্রটিরে,
শুধালাম ডাকি' "দোষ করেছিস কিরে ?"
চমকি' আমার ক্রুদ্ধ কণ্ঠস্বরে,
আঁখি দুটী তার রাখিল মুখের 'পরে।

(২)

পলকবিহীন ম্লান আঁখি দুটি তুলি,
"করি নাই দোষ"—কহিয়া ফেলিল ভুলি'।
ভীতিজড়িত চাহনি তাহার আজি,
ঢাকিল আধেক কৃত অপরাধ রাজি।

(৩)

কোমল কণ্ঠে ক'হিনু তখন ধীরে,
"বল্ দেখি তুই দোষ করেছিস কিরে ?"
এই শুনি তার সুস্থির আঁখির তারা,
জল ভরে হ'ল ঊর্দ্ধদৃষ্টি হারা।

(৪)

কোমল তাহার গোলাপ গণ্ড দুটি,
আরো রাঙা হয়ে উঠিল তখন ফুটি',
ক্ষমাশীল মোর সোহাগের মধু বাণী,
ধন্য তাহার নয়নে অশ্রু আনি'।

(৫)

আদরের সেই স্নেহমাখা দুটী কথা,
ক্ষুদ্র হৃদয়ে জাগাল লজ্জা-ব্যথা।
কলুষতা তার যাহা ছিল প্রাণভরা,
কিসের লাগিয়া দিল বল মোরে ধরা ?

(৬)

অশ্রুপ্লাবিত আনত তাহার মুখে,
ঘন স্পন্দিত—ব্যথিত তাহার বুকে ;
অপরাধ আর ক্ষমা প্রার্থনা দুয়ে,
গেল বুঝি শুধু ভাষাহীন ভাব থুয়ে।

দেশীয় ভৈষজ্য তত্ত্ব।

[কবিরাজ শ্রীইন্দুভূষণ সেনগুপ্ত আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রী এচ্, এম, বি]

"ত্রিমদ"।

গত বৎসর 'অর্চ্চনা'য় ধারাবাহিক ভাবে 'দেশীয় ভৈষজ্য তত্ত্ব' সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছিলাম। প্রথমে ভাবিয়াছিলাম, এই গল্প-প্লাবিত দেশে বুঝি আমার এই নীরস 'ভৈষজ্য তত্ত্ব' লোকের রুচিপ্রদ হইবে না। এখন 'উল্টা বুঝিলি রাম' হইয়াছে। 'অর্চ্চনা'য় আমার এই লেখা পড়িয়া, আমার কয়েকজন সাহিত্যিক ও চিকিৎসক বন্ধু অনুরোধ করিয়াছেন, আমি যেন গতবারের ন্যায় এবারও নিয়মিত ভাবে এ সম্বন্ধে আলোচনা করি।

কয়েকখানি খ্যাতনামা মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকার সম্পাদক মহাশয়েরা অনুগ্রহ করিয়া 'অর্চ্চনা'য় প্রকাশিত আমার এই 'ভৈষজ্য তত্ত্ব' তাঁহাদের সম্পাদিত পত্রিকাতে উদ্ধৃত করিয়া আমাকে উৎসাহিত করিয়াছেন।

গত বৎসর প্রথমে 'ত্রিফলা' ও পরে 'ত্রিকটু' সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলাম। এইবার 'ত্রিমদ' সম্বন্ধে আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

"চিত্রক"।

চিতা, মুথা ও বিড়ঙ্গ এই তিনটীর সংযোগকে 'ত্রিমদ' বলে। প্রথমে এই তিনটী দ্রব্যের পৃথক পৃথক গুণ পরিচয় প্রদান করিয়া পরিশেষে 'ত্রিমদ' বিষয় উল্লেখ করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

চিত্রকের বাঙ্গালা নাম চিতা, কোঃ—ধলাওড়া, হিঃ—চিতা, মঃ—চিত্রক, তৈঃ—চিত্রমূলমু, তাঃ—শিবপু, উঃ—ধুবচিতা বলে।

"চিত্রকোঽনলনামা চ পীঠো ব্যালস্তথোষণঃ।"

অর্থাৎ—চিত্রক, অনল, পীঠ, ব্যাল ও উষণ এই কয়টী চিত্রকের নাম।

"চিত্রকঃ কটুকঃ পাকে বহ্নিকৃৎ পাচনো লঘুঃ।
রুক্ষোষ্ণো গ্রহণী কুষ্ঠ শোথার্শঃ কৃমিকাসহৃৎ॥
বাতশ্লেষ্ম হরোগ্রাহী বাতঘ্নঃ শ্লেষ্মপিত্তহৃৎ।"

অর্থাৎ—চিত্রক কটুবিপাক, অগ্নিবর্দ্ধক, পাচক, লঘু রুক্ষ, উষ্ণবীর্য্য, মলরোধক, এবং গ্রহণী, কুষ্ঠ, শোথ, অর্শঃ, ক্রিমি, কাস, যৌগিক বাতশ্লেষ্মা, বায়ু, পিত্ত ও কফ নষ্ট করে।

এইবার আমি ভিন্ন ভিন্ন রোগে চিত্রকের প্রয়োগের উল্লেখ করিলাম:—

'চরক' বলিয়াছেন—"অগ্নিবৃদ্ধিকর, অর্শোহর ও শোথঘ্ন যত দ্রব্য আছে, চিত্রকমূল তন্মধ্যে শ্রেষ্ঠ জানিবে।"

(১) অর্শে চিত্রকমূল—চিত্রকমূল ও শুণ্ঠীচূর্ণ ইক্ষুরস সহ পান করিলে অর্শে উপকার হয়।

(২) কুষ্ঠে চিত্রকমূল—কুষ্ঠরোগী চিতামূল গোমূত্রের সহিত পেষণ করিয়া পান করিলে বিশেষ উপকার পাইবেন।

(৩) গ্রহণীতে চিত্রকমূল—দুই তোলা চিতামূল অর্দ্ধ সের জলে সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোয়া থাকিতে নামাইয়া ছেঁকিয়া সেবন করিলে গ্রহণী প্রশমিত হয়।

(৪) শ্লীপদে চিত্রকমূল—চিতামূল ও দেবদারু কাষ্ঠ গোমূত্রে পেষণপূর্ব্বক শ্লীপদে প্রলেপ দিলে উপকার হয়।

(৫) শোথে চিত্রকপত্র—শোথরোগী শাকার্থে চিত্রক-পত্র পান করিবেন।

(৬) মেদো রোগে চিত্রকমূল—হিতভোজী হইয়া মধুর সহিত চিত্রকমূল লেহন করিলে স্থৌল্য রোগ নিবৃত্তি পাইয়া থাকে।

(৭) ব্রণ শোথদারণার্থে চিত্রকমূল—অপক্ক স্ফোটকে পিষ্ট চিত্রকমূলের প্রলেপ দিলে স্ফোটক বিদীর্ণ হয়।

(৮) অর্শে চিত্রকমূল—দুগ্ধে চিত্রকমূল চূর্ণ নিক্ষেপ পূর্ব্বক দধি প্রস্তুত করিয়া, সেই দধিজাত তক্র পান ও তক্রযোগে পথ্য সেবন করিলে অর্শ ভাল হয়।

"কলিকাতা আয়ুর্ব্বেদ মেডিকেল কলেজের" ভূতপূর্ব্ব ভাইস্ প্রিন্সিপ্যাল স্বর্গীয় স্বনামধন্য কবিরাজ বিরজাচরণ

গুপ্ত কাব্যতীর্থ কবিভূষণ কোচবিহারের মহারাজার পারিবারিক চিকিৎসকরূপে কোচবিহারে অবস্থান কালে চিত্রকের ব্যবহার দৃষ্টে তাঁহার 'বনৌষধি দর্পণে' লিখিয়াছেন যে,—"কোচবিহারের লোক বাতরোগীর স্ফীতসন্ধি স্থানে রক্তচিতার প্রলেপ দেয় এবং প্লীহোদরে, রক্তচিতার রসে সুতা সিক্ত ও শুষ্ক করিয়া, রোগীর বাহূর্দ্ধ দেশে বন্ধন করিয়া রাখে, ফোস্কা পড়িলে সুতা খুলিয়া যায়।"

পাশ্চাত্য মত —

Actions and uses—Alterative and gastric stimulant; given in chronic diarrhœa, dyspepsia and general amarca. Locally as a vesicant the root causes more pain than the ordinary blisters and the vesication does not heal readily. A paste of the root is used as a stimulant application to rheumatic joints, Leprosy, Paralytic limb and to abscesses to promote suppuration. The compound powder is alterative and given in flatulence, rheumatism. The root is acrid and if introduced into the os uteri causes abortion. Lalchitraka is a more powerful vesicant than chitro or safed chitraka and used in the preparation of caustic application. Taken internally it is said to expel the fœtus whether dead or alive. In large doses it is a narocotico irritant poison. (*Materia Medica of India—R. N. Khory, Part II., P. 381*)

অর্থাৎ—চিতামূল, রসায়ন, পাচক ও অগ্নিবর্দ্ধক। ইহা অগম্ভীর শোথ, গ্রহণী, অজীর্ণ ও অগ্নিমান্দ্যাদি পীড়ায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে। পিষ্ট চিত্রকমূলের প্রলেপ দিলে ফোস্কা হয়, ইহা 'ব্লিষ্টার' অপেক্ষা অধিক কষ্টপ্রদ এবং ইহার প্রলেপে যে ক্ষত হয় তাহা সত্বর আরাম হয় না। চিতামূলের প্রলেপ দ্বারা আমবাত রোগীর স্ফীত সন্ধিস্থান কুষ্ঠ এবং বাতব্যাধিগ্রস্ত অঙ্গ প্রলিপ্ত করিবে। অপক্ক স্ফোটক, পিষ্ট চিতামূলের প্রলেপ দ্বারা পক্কতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। 'ষড়ধরণযোগ' (চিত্রক যাহার অন্যতম উপাদান) রসায়ন ইহা উদরাধ্মান ও আমবাতে ফলপ্রদ। চিতামূল যোনিমার্গে প্রবিষ্ট করাইয়া রাখিলে গর্ভস্রাব ঘটে। শ্বেত চিত্রকাপেক্ষা রক্তচিত্রকের প্রলেপ অধিক ফোস্কা উৎপন্ন করে।

রক্তচিত্রক ক্ষার প্রস্তুতার্থ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যোগ্য মাত্রায় * প্রসূতিকে চিত্রকমূল চূর্ণ সেবন করাইলে গর্ভস্থ শিশু (জীবিত বা মৃত) সত্বর বহির্গত হয়। অধিক মাত্রায় সেবন করিয়া বিষক্রিয়া প্রকাশ পায়। (মেটিরিয়া মেডিকা অফ্ ইণ্ডিয়া,—আর, এন, খোরী, ২য় খণ্ড, ৩৮১ পৃঃ)

প্রস্তুত-প্রণালী—

উপরিলিখিত যে ঔষধগুলির প্রস্তুত-প্রণালী দেওয়া হয় নাই, তাহারা মোট দ্রব্য ২ তোলা, অর্দ্ধসের জলে সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোয়া থাকিতে নামাইতে হইবে। পরে ছেঁকিয়া সেব্য।

* মাত্রা—মূলচূর্ণ ½—১ আনা।

বনবাসান্তে।

[শ্রীকালিদাস রায়]

(শ্রীরাম ও সীতা)

আজি সখি অলঙ্কৃত রাঙ্কব শয্যায়
কনক পালঙ্কে করি কেমনে শয়ন,
এ পেলব উপাধানে শির ব্যথা পায়
পরিচিত নহে, যেন কেমন-কেমন।
গৃহ-উপবন হ'তে চূত শাখাচয়
সদ্য ভেঙে এনে সখি শয্যায় বিছাও,
আস্তরণ, চন্দ্রাতপ চীনাংশুকময়,
চামর ব্যজনী সতি, দূরে ফেলে দাও।
হুতবহ পরিণত এ তন্ন দারুণ
মৃগাজিন পাত সখি, এ দেহ জুড়াক।
উপাধানে কিবা কাজ? আনো অসি তূণ,
এ পরিঘ বাহু তব কণ্ঠতলে থাক্।
চাহিনা এ সমারোহ সব গিয়ে ভুলি'
দুর্দ্দিনের সহচর প্রিয় বন্ধুগুলি।

প্রাণের বাঁধন।

[শ্রীসুশীলকুমার রায়]

'কোন জিনিষ যথার্থ উপভোগ ক'রতে গেলে তার চতুর্দ্দিকে অবসরের বেড়া দিয়ে ঘিরে নিতে হয়—তাকে অনেক খানি ছড়িয়ে দিয়ে চতুর্দ্দিকে বিছিয়ে দিয়ে তবে তাকে ষোল আনা আয়ত্ত করা যায়,' মায়াও বোধ হয় তাই তার স্বামীকে রাত্রদিন চোকে চোকে রেখে তার প্রাণের ক্ষুদ্র স্পন্দনটুকু পর্য্যন্ত নিজের প্রাণের ভেতর অনুভব করবার চেষ্টা ক'রত। অনেক সময় মোহন মায়ার হাত দুখানা চেপে ধরে ব'লত, 'আচ্ছা, তুমি আমায় অমন ক'রে আগ্‌লে বেড়াও কেন?' মায়া কোনই জবাব দিতে পারত না, শুধু ছল্ ছল্ চোকে স্বামীর মুখের দিকে চেয়ে থাকত।

২

অবিশ্রান্ত বর্ষণের পর আজ মেঘ কেটে সূর্য্য উঠেছে। বাগানের চারিদিকেই সবুজ—সবুজে ভ'রে গেছে। ঠাণ্ডা হাওয়া ফুর ফুর ক'রে বইছে। গাছে গাছে পাখী। কেমন যেন একটা নতুন ভাব।

মায়া যেন সকাল বেলার হাওয়ার মত এলোচুলে হাল্‌কা পায়ে এঘর-ওঘর ঘুরে বেড়াচ্ছিল।

মোহন নীচে থেকে এসে মায়ার কাছে গিয়ে চুপি চুপি বল্লে, 'ওগো শুনেছ?'

'কি?'

'কাল আমায় পুরুলিয়া যেতে হবে।'

মায়া চ'মকে উঠে বল্লে, 'কেন?'

'আমার একটি বন্ধুর বাড়ী—সকলে মিলে দু' চার দিনের জন্যে বেড়াতে যাবো।'

মায়া ছোট্ট ঘাড় নেড়ে বল্লে, 'আচ্ছা।'

সেইদিন রাতে মায়া স্বপ্ন দেখলে—যেন একটা মস্ত বড় ষ্টেসনের সামনে লোকের খুব ভীড়। কেউ গাড়ী থেকে নাবছে, কেউ উঠছে। এমন সময় একখানা গাড়ী ছেড়ে দিলে। মায়া চেয়ে দেখলে মোহন সেই গাড়ীতে বসে। সে ছুটল, প্রাণে যতটা শক্তি আছে ততটা এক সঙ্গে গুটিয়ে নিয়ে ছুটল। তবু যেন গাড়ীর নাগাল পাওয়া যায় না। হতাশ ভাবে চেয়ে দেখলে গার্ডের গাড়ীর হাতল ধ'রে একটা কালো দৈত্যের মত লোক দাঁড়িয়ে। তার বড় বড় দুটো কালো চোক যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসছে। শেষে সেই কালো চোক দুটো ক্রমে বড় হ'তে লাগল। মায়ার পায়ে পায়ে জড়িয়ে গেল। সে ভয়ে চেঁচিয়ে উঠতেই ঘুম ভেঙ্গে গেল।

মায়া তাড়াতাড়ি উঠে দেখলে ঘামে বুকের কাপড় ভিজে গেছে। আস্তে আস্তে উঠে ঘুমন্ত স্বামীর দিকে একবার ভাল ক'রে চেয়ে জান্‌লার ধারে এসে দাঁড়াল। পুবদিক্ তখন একটু একটু ক'রে রাঙা হ'য়ে আসছে, পাখীরা গাছে গাছে ডাকতে সুরু ক'রে দিয়েছে। মায়ার কিছুই ভাল লাগছিল না। স্বপ্নের সেই বিকট কালো চোক দুটো তখনো তার আশে পাশে যেন ঘুরে বেড়াচ্ছিল।

৩

মোহনের আর পুরুলিয়া যাওয়া হ'ল না। বাড়ী থেকে বেরুবার সময় এমন সব চিঠি ধ'রে বসল যে তা এড়িয়ে মোহনের পক্ষে যাওয়া দুঃসাধ্য। অগত্যা সে অর্গানের কাছে চেয়ারটা টেনে এনে বাজাতে বসে গেল—

"(তুমি) বাঁধিয়া কি দিয়ে
রেখেছ হৃদিয়ে—
পারি না যে যেতে ছাড়ায়ে"

মায়ার চোকের কোণে দু ফোঁটা জল টল টল ক'রতে লাগল।

পরদিন সকাল বেলা বেড়িয়ে এসে মোহন ডাকলে—'মায়া'।

মায়া তখন কুরুশ কাটি দিয়ে আয়নার একটি ঢাকা বোনবার চেষ্টা করছিল। সেগুলিকে আস্তে আস্তে মেঝের ওপর রেখে দিয়ে স্বামীর সামনে এসে দাঁড়াল। মোহন মায়ার হাতে একটা ফর্দ্দ গুঁজে দিয়ে বল্লে, 'আমি বাজারে বলে এসেছি, একটু বেলা হ'লেই জিনিষ পত্র সব এসে প'ড়বে। তোমার কাজ কর্ম্ম সব শিগ্‌গীর সেরে নাও।'

মায়া ফর্দ্দখানা হাতের মুঠোর ভেতর টিপে বল্লে, 'বেশ, কিসের জন্যে যে জিনিষ আসছে তাত' কিছুই বল্লে না?' মোহন আশ্চর্য্যে চোক দুটো বড় বড় ক'রে বল্লে, 'বলি নি বুঝি! আজ যে কাঙ্গালী ভোজন।'

'হঠাৎ গরীবদের ওপর যে এত দয়া!'

'তুমি কাঙ্গালী খাওয়াতে ভালবাস তাই আজ দিনটা ভাল দেখে সব ঠিক ক'রে ফেল্লাম।' মোহন তাড়াতাড়ি নীচে চ'লে গেল। তার মুখ চোকে একটা আনন্দের আভা।

মায়া অবাক হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইল।

৪

মোহনের ছোট বাড়ীখানির নীচের তলায় কাঙ্গালী খাওয়ান হচ্চে। মোহন নিজে কোমরে গামছা জড়িয়ে পরিবেশন কচ্ছিল। মায়া দোতালার জান্‌লায় দাঁড়িয়ে সমস্ত দেখছিল।

পরিতোষ আহারের পর কাঙ্গালীদের ছেলে মেয়েরা তাদের ছোট ছোট হাত তুলে 'জয় মাজীর জয়' বলে চ'লে গেল। দূরে চেয়ারে মোহনের একজন বন্ধু বসেছিল। তার মাথায় পটি-বাঁধা, পায়ে একটা ব্যাণ্ডেজ। সে আস্তে আস্তে মোহনের কাছে এসে বল্লে, 'ভাই, আজ বড় আনন্দ হ'ল। বিপদ কেটে গেলে লোকে ঠাকুর-দেবতার পূজো দেয়, কিন্তু তুমি আজ আসল ঠাকুরের পূজো দিয়েছ।'

মায়ার কানে কথাগুলো যেতেই তার আনন্দোজ্জ্বল মুখখানা মলিন হ'য়ে গেল। তবে কি স্বামীর কোন বিপদ হ'য়েছিল? কৈ, সে ত কিছুই জানতে পারে নি! একটা রুদ্ধ অভিমান তার বুকের ভেতর ফুলে ফুলে উঠতে লাগল।

মায়া তাড়াতাড়ি নীচে এসে ঝিকে ডেকে বল্লে, 'ওঁকে একবার বাড়ীর ভেতর ডেকে দাও ত।'

বন্ধুকে বিদায় দিয়ে মোহন বাড়ীর ভেতর এসে বল্লে, 'কি হ'য়েছে মায়া?' মায়ার তখন কথা কইবার শক্তি নেই, দুরন্ত অভিমানে কণ্ঠরোধ হ'য়ে গেছে। সে ছুটে দোতালায় নিজের ঘরে চ'লে গেল।

* * *

স্ত্রীর খোলা চুলগুলো হাত দিয়ে নাড়তে নাড়তে মোহন ডাকলে "মায়া—"

মায়া খোলা বারান্দায় দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে চেয়ে ছিল। চাঁদের আলোয় তার চোকের কোলে দু' ফোঁটা জল মুক্তাবিন্দুর মত চক্ চক্ ক'রে উঠল। মোহন আরো একটু কাছে সরে এসে কাঁধের ওপর হাত রেখে ডাকলে "মায়া—"

মোহনের প্রত্যেক ডাকে ডাকে মায়ার বুকের পরদা থর থর ক'রে কেঁপে উঠছিল। সে একটু চুপ ক'রে থেকে নিজেকে সামলে নিয়ে হঠাৎ মনের আবেগে বলে ফেল্লে, 'আমায় সব বল নি কেন? আমি কি তোমার দুঃখের ভাগ পাবার কেউ নই?'

মোহন এইবার সমস্ত ব্যাপারটা বুঝতে পেরে হেসে বল্লে, 'তুমিই ত আমার দুঃখের কথা আগে জানতে পেরেছিলে মায়া! আজ তোমারই জন্যে এই কাঙ্গালী ভোজন।'

হঠাৎ কোন্ যাদুমন্ত্রে যেন মায়ার মুখ চোকের ভাব ব'দলে গেল। সে স্বামীর খুব কাছে সরে এসে বল্লে, 'আমায় সব খুলে বল না, আমি কিছু বুঝতে পারছি না।'

মোহন স্ত্রীর কোমল হাতখানা নিজের হাতের ভেতর চেপে ধরে বল্লে, 'যেদিন আমার পুরুলিয়া যাবার কথা, সেদিন তুমি এমন জিদ্ ধরলে যে আমার যাওয়া হ'ল না। বন্ধুরা ঠাট্টা ক'রে চ'লে গেল। কিন্তু পরদিন সকালে ষ্টেসনে বেড়াতে গিয়ে যা শুনলাম তাতে মাথা ঘুরে গেল! যে গাড়ীতে আমার যাবার কথা ছিল সেই গাড়ীর সঙ্গে একখানি মালগাড়ীর ধাক্কা লেগে গেছে। তখন আমার মনের ভাব কি হ'য়েছিল জান মায়া?'

মায়ার হাতখানা মোহনের হাতের ভেতর শিউরে কেঁপে উঠল। তার চোকের সামনে ভেসে উঠল সেদিন-কার স্বপ্নের সেই বিকট কালো চোক দুটো। সে দৃষ্টির ভেতর কত বড় যেন একটা কালো ক্ষুধা হাঁ ক'রে র'য়েছে। মায়ার কাণের কাছে, বুকের স্পন্দনের তালে তালে সেই স্বপ্নের মূর্ত্তি যেন পায়ে ঝাঁঝর বেঁধে নাচতে লাগল ঝম্ ঝম্ ঝম্—

মোহন স্ত্রীকে আরো কাছে টেনে এনে বুকের ওপর মাথাটা চেপে ধ'রে বল্লে, 'কোন কথা কইলে না যে,—এত ঘামছ কেন?'

মায়ার সারা দেহটা মোহনের বাহু বেষ্টনের মধ্যে এলিয়ে প'ড়ল। রাতের স্নিগ্ধ হাওয়া যুগল দম্পতির মাথায়, কপালের ওপর তার কোমল পরশ বুলিয়ে দিয়ে চ'লে গেল। অলক্ষিতে মায়ার প্রাণের কোণে কে যেন চুপি চুপি বলে গেল, 'এ সেই প্রাণের বাঁধন যাতে সাবিত্রী তার প্রিয়তম সত্যবানকে ফিরে পেয়েছিল।'

আত্মদ্রোহী।

[শ্রীঅবনীকুমার দে]

ওই শোন ওই কা'র আর্ত্তকণ্ঠ উঠিয়াছে ভেদি'
দীর্ণ করি পবন গগন
কোন্ অসহায় প্রতিবেশী আজ অন্নবস্ত্রহীন
করে বসি' বিফল রোদন ?
ওই হের ওই গৃহহারা নগ্নলজ্জা বিবসনা
—কাঙ্গালিনী অনাথিনী নারী—
তোমারি জননী বো'ন যাচে শুধু করুণা তোমারি
—অবিরল ঝরে অশ্রুবারি !
দুগ্ধহীন শুষ্কবুকে আকড়িয়া ম্লান শিশুটীরে
জননী দাঁড়ায়ে আছে মহাসিন্ধু মরণের তীরে !

আঁখি মেলি একবার ভাল করে দেখ দেখি চেয়ে
অই যে দাঁড়ায়ে সব ম্লান মুখ
—আশাহীন ভাষাহীন প্রাণহীন পীড়িত জর্জ্জর
শুষ্ক-শীর্ণ-স্তব্ধ-মূঢ়-মূক—
তোমার কি কেহ নহে এরা ? নহে ভ্রাতা নহে ভগ্নি
—পল্লীবাসী আত্মীয় স্বজন,
তব অপচয় হ'তে কিছুমাত্র উহাদের আজ
প্রত্যাশার নাই কি কারণ ?
সরমে কুণ্ঠিতা ওই শাপভ্রষ্টা সতী সিমন্তিনী
তোমারি গৌরব সে ত চিরদিন তোমারি ঘরণী ।

হও তুমি যেবা খুসি রাজা কিম্বা মহারাজেশ্বর
—শ্রীলক্ষ্মীর পুত্র ভাগ্যবান,
না যদি সেবিতে পার আপনার ভাই বোনে আজ
তবে তুমি পতিত সন্তান ।
বিদ্রোহী তোমার নাম আত্মদ্রোহী শত্রু স্বদেশের
—পশুর অধম পশ্বানর,
অনন্ত রৌরবে ভরা মহা কলুষিত আত্মা তব
—ম্রিয়মাণ ঘৃণিত অন্তর ।
ব্যর্থ তব ধন মান খ্যাতি যশ ঐশ্বর্য্য বিপুল
ব্যথিতের তরে যদি নাহি গলে করুণা আকুল !

বলবান বাহু তব ওই দুর্ব্বলের তরে যদি
নাহি কর ব্যগ্র প্রসারণ,
আশা-ভাষা অন্ন প্রাণ স্বাস্থ্য বল নাহি দাও যদি
তবে তুমি কিসে মহাজন ?
বক্ষে তব বেদনার বজ্র যদি নাহি বাজে আজ
সরবস্ব না কর অর্পণ,
ধিক তব শিক্ষা দীক্ষা বিশ্বপ্রেম মহামানবতা
—জাহ্নবীতে দাও বিসর্জ্জন !
আত্মপ্রতারক তুমি আত্মঘাতী মহাপাপী নর
তোমার পরশে জীর্ণা তাপদগ্ধা ধরিত্রী সুন্দর !

যুগে যুগে যা'র তরে মহাপ্রাণ সন্ন্যাসে বরিয়া
বহি' নিজ অন্তর-বর্ত্তিকা—
চলিয়াছে জ্যোতিষ্কের মত ;—যাহার ললাটে জ্বলে
অহরহঃ মহিমার শিখা,
—শত শত নির্য্যাতন লয়েছে যে স্বীয় বক্ষ পাতি,
মরে বাঁচে যাহাদের তরে,
বিশ্বকবি পূজে যা'রে বিরচিয়া লক্ষ লক্ষ গানে
—মহাছন্দে জন্ম জন্ম ধরে'
হে বিদ্রোহি ! একবার ভাব তা'রে মনোপ্রাণ ভরি
সর্ব্ব ক্ষুদ্রতারে আজ একেবারে সর্ব্বস্বান্ত করি ।

অমৃতেরে চাহ যদি —চাহ যদি ধ্রুবের সন্ধান
অমরত্ব-স্বরাট-স্বরাজ
স্বর্গরাজ্য হেথা যদি রচিবারে করেছ মনন
কুহেলিকা ছিন্ন কর আজ ।
সত্যের অমৃত-বিষে লুপ্ত হো'ক দানবের লীলা
স্বমন্ত্রে বাঁধো নিজ প্রাণে,
বিদ্রোহী-বিগ্রহে আজ স্বধর্ম্মের যূপকাষ্ঠে ফেলি'
দ্বিধা কর শাণিত কৃপাণে !
মহাঘটে আছে তব মন্ত্রপূতঃ সঞ্জীবনী বারি
হে বিদ্রোহি ! মুক্ত হ'ও অসত্যের ভাঙ্গ যত জারি !

চাঁদপ্রতাপের ব্রতকথা।

[শ্রীযোগেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী]

(৬) ক্ষেত্রপাল।

অগ্রহায়ণ মাসের শনি কিংবা মঙ্গলবার এই ব্রত করিতে হয়। গৃহকর্ত্রী বাড়ীর অপরাপর মহিলাগণের সহিত ব্রত করিয়া থাকেন। বাড়ীর উঠানে একটী 'বিন্নাছোবা' (সমূল তৃণবিশেষের গুচ্ছ) প্রোথিত করিয়া উহার সম্মুখে একটী পুকুর (পুষ্করিণীর আকারে ক্ষুদ্র গর্ত্ত) খনন করা হয়। একখানি হরিদ্রা-রঞ্জিত বস্ত্রখণ্ড উক্ত তৃণগুচ্ছে দিতে হয়। জলের সহিত চূণ ও হরিদ্রা গুলিয়া উক্ত গর্ত্ত ভরিয়া দেওয়া হয়। ঐ জলের নাম রুধির। অন্য একটী 'বিন্নাছোবা' বাড়ীর বাহিরে প্রোথিত করা হইয়া থাকে। পূজা দিবাভাগে হইয়া থাকে। ব্রতিনিগণ প্রাতঃকালে স্নানাদি করিয়া ব্রতের আয়োজন করিয়া থাকেন। ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, পুষ্পপত্র এবং ছাতু, মুড়ি, কলা, দধি, দুগ্ধ ও অন্যান্য খাদ্যোপকরণ যথাস্থানে স্থাপন করা হয়। সাতটি ভেন্না (ভেরাণ্ডা) পাতায় ও একখানা কলার 'মাইজ' পাতায় খাদ্যোপকরণাদির কিছু কিছু দিয়া পূজাস্থানে সাজাইয়া দিতে হয়। ইহাই সর্ব্বপ্রধান উপকরণ। দুইখানা কলার 'ডাইগের' (কলাপাতার মধ্যস্থিত ছড়ির ন্যায় শক্ত অংশ বিশেষ) প্রত্যেকটায় লাল, সাদা ও হরিদ্রা রঙ্গের 'পিঠালি' (জল-সিক্ত তণ্ডুল চূর্ণ) দ্বারা প্রস্তুত তিনগাছি করিয়া শাখা স্থাপন করিয়া পূজায় দেওয়া হইয়া থাকে। পুরোহিত যথাসময়ে শাস্ত্রানুসারে ক্ষেত্রপালের * পূজা করিয়া থাকেন। এই সঙ্গে বুড়াঠাকুরাণীরও (বনদুর্গার) অর্চ্চনা করা হইয়া থাকে। কলার 'মাইজ' পাতার দ্রব্যাদি বুড়াঠাকুরাণীকে নিবেদন করিয়া দেওয়া হয়। পূজা শেষে জনৈকা ব্রতিনী কথা কহিয়া থাকেন ও আর সকলে ভক্তিসহকারে তাহা শ্রবণ করেন। তৎপর ভেন্নাপাতার দ্রব্যাদি গোশালায় 'ছিটাইয়া' (ছড়াইয়া) দেওয়া হয়। শেষে খাদ্যদ্রব্যাদির কতকটা বাড়ীর বাহিরের বিন্নাছোবার সম্মুখে রাখা হয়। † উক্ত প্রসাদ রাখাল বালকদিগকে দেওয়া হইয়া থাকে। বাড়ীর খাদ্যোপকরণের কিছু কিছু বালকবালিকাদিগকে দিয়া বাকীটা ব্রতিনীগণ আহার করিয়া থাকেন। এই ব্রতের দিন তাঁহারা অন্য কিছুই ভোজন করেন না।

এই ব্রত চিরকালই করিতে হয়। ইহার প্রতিষ্ঠা নাই, অর্থাৎ কোন নির্দ্দিষ্ট সময় পর্য্যন্ত ব্রত করিয়া ব্রত শেষ করিবার নিয়ম নাই। নিম্নশ্রেণীর হিন্দু গৃহে এই ব্রত করিতে দেখা যায় না।

কথা।—এক ছিল গৃহস্থ। সে ছিল অতি দরিদ্র। সংসারে এক স্ত্রী ভিন্ন তাহার আর কেহই ছিল না। গৃহস্থ 'কামলা' (মজুর) খাটিয়া কোনরূপে সংসার চালাইত। সন্তান হইবার বয়স গেল, তবু গৃহস্থের স্ত্রীর কোন সন্তান জন্মিল না। তাই সকলে তাহাকে 'বাঝা' (বন্ধ্যা) বলিয়া ধারণা করিল। এ সংসারে সন্তান লাভের ইচ্ছা সকলেরই

* "বাঙ্গালার ব্রতকথায়" লেখিকা ক্ষেত্রব্রতের প্রারম্ভে লিখিয়াছেন,—"অনেকে অগ্নিদেবকেই ক্ষেত্রঠাকুর বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, আর কেহ কেহ বলেন সূর্য্যদেবই ক্ষেত্রঠাকুর। আমার শেষেরটী সত্য বলিয়া মনে হয়। (৫২ পৃঃ।)" তাঁহার এই মন্তব্য ঠিক নয়। কারণ, শাস্ত্রে অগ্নিদেব, সূর্য্যদেব ও ক্ষেত্রপালের ধ্যান পৃথক পৃথক লিখিত আছে। (পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য মহাশয় কৃত "পুরোহিত দর্পণের" ৩০, ৩৬ ও ৩৯৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।) শাস্ত্রোক্ত বিধানানুসারেই এই তিন দেবতারই পূজা হইয়া থাকে। ইন্দ্রাদি দশদিক্‌পালের ন্যায় ক্ষেত্রপালও দেবতা। অগ্নিদেবকে লেখিকা ক্ষেত্রপাল বলিয়া বিশ্বাস করেন নাই। তিনি সূর্য্যদেবকেই ক্ষেত্রপাল বলিয়া মনে করিয়াছেন। তিনি যে ভ্রমক্রমে এরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই।—লেখক।

† কোন কোন বাড়ীর ব্রতিনীদের বাড়ীর বাহিরের 'বিন্নাছোবা'র নিকটেও পূজা দিবার 'নিয়া' (পুরুষানুক্রমিক চলিত নিয়ম) আছে।
—লেখক

সমান। একে গরীব, তাহাতে আবার নিঃসন্তান; তাই দম্পতির মনে শান্তির লেশও ছিল না।

কয়েক বৎসর পর গৃহস্থের স্ত্রী গর্ভবতী হইল। স্বামী স্ত্রী অতিশয় খুসি হইল। তাহারা মনে করিল যে, দেবতার কৃপায় তাহাদের ভাগ্য পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। যথাসময়ে গৃহস্থের স্ত্রী একটী সুসন্তান প্রসব করিল। পুত্রের চাঁদ-মুখ দর্শনে দম্পতির আহ্লাদের সীমা রহিল না। নিজেরা না খাইয়া তাহারা সন্তানকে খাওয়াইত। ছেলের কান্না শুনিলে, তাহারা দিশাহারা হইয়া পড়িত। এইরূপে দিন যাইতে লাগিল। শিশুটীও ক্রমেই বড় হইতে লাগিল।

কালক্রমে গৃহস্থ ইহলীলা সংবরণ করিল। গৃহস্থের স্ত্রী একমাত্র বালক পুত্রকে লইয়া বিষম মুস্কিলে পড়িল। তাহাদের দিন চলা ভার হইয়া পড়িল। স্বামীর ভিটায় বাস করিবার ইচ্ছা থাকিলেও, পেটের দায়ে অত্যল্প কাল মধ্যেই পুত্রসহ সে তাহার ভাইয়েদের সংসারে গেল। ভ্রাতারা তাহাকে বলিল যে, ছেলের সহিত সে তাহাদের সংসারে আসিয়া ভালই করিয়াছে। ছেলেটির বড় বেশী কাজ করিতে হইত না। বাড়ীর রাখাল কোনদিন অনুপ-স্থিত থাকিলে, সেইদিন তাহাকে গরু চরাইতে হইত। আর প্রত্যহ সময় মত মামাদের জন্য ক্ষেত্রে আহার্য্যদ্রব্য বহন করিয়া লইয়া যাইতে হইত। ভাইয়েরা ভগ্নী ও ভাগিনেয়কে অনাদর করিত না; কিন্তু বধূদের কেহই দেখিতে পারিত না। ছেলেটি মামীদের প্রদত্ত কদর্য্য খাদ্যের যতটা পারিত গলাধঃকরণ করিত; বাকীটা ফেলিয়া দিত। সে সর্ব্বদাই তাহাদের বাক্যবাণে জর্জ্জরিত হইত। মাতা নিজের জ্বালা যন্ত্রণা নীরবে সহ্য করিত, পুত্রকে সান্ত্বনা দিত ও সময় সময় চক্ষের জলে বুক ভাসাইত। ভগ্নী ভ্রাতৃবধূদের কুব্যবহারের কথা ভ্রাতাদিগকে কথনও বলিত না এবং ছেলেকেও একথা কাহারও নিকট প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়াছিল। কিন্তু বধূরা স্বামীদের নিকট ননদ ও ভাগিনেয়ের বিরুদ্ধে অনেক কথাই বলিত। গৃহস্থদেরও ভগ্নী, ভাগিনেয়ের প্রতি আদরের মাত্রা ক্রমেই কমিয়া আসিতে লাগিল।

এইরূপে কয়েক বৎসর অতিবাহিত হইল। একদিন ছেলেটি মামাদের জন্য অন্নব্যঞ্জনাদি লইয়া বাড়ীর বাহির হইয়া একটী ঝোপের নিকট উপস্থিত হইয়া শুনিতে পাইল, কেহ যেন বলিতেছে,—"কে হে তুমি, এ সব উপাদেয় খাদ্যদ্রব্য লইয়া যাইতেছ? আমি অনাহারে বড়ই কষ্ট পাইতেছি। ঐ সমস্তই আমার আহারের নিমিত্ত এখানে রাখিয়া যাও।" বালক বলিল,—"এ সব আমি মামাদের জন্য লইয়া যাইতেছি, তোমাকে দিলে তাহারা খাইবে কি?" ইহার উত্তরে ছেলেটি শুনিল,—"তোমার মামারা ত বাড়ী গিয়া দুপুর বেলায়ও খাইবে। ওগুলি আমাকেই দাও। তোমার মঙ্গল হইবে। ক্ষুধাতুরকে অন্নদান করা মানুষ মাত্রেরই অবশ্য কর্ত্তব্য।" বালক নিজে ক্ষুধায় কাতর থাকিলেও মামাদের খাদ্য হইতে এক-মুষ্টিও সে কখনও মুখে দিত না। কিন্তু অপরের অনাহার কষ্টের কথা শুনিয়া তাহার চিত্ত বিগলিত হইল, সে কর্ত্তব্য-ভ্রষ্ট হইল। তখন সে বলিল,—"অন্নব্যঞ্জনাদি রাখিব কোথায়?" উত্তর হইল,—"রাখিয়া যাও এই 'বিন্না-ঝোপের' কাছে।" বালক তথায় খাদ্যদ্রব্যাদি রাখিয়া বাড়ী ফিরিয়া গেল। ছেলেটি একাদিক্রমে তিন চারি দিন আহার্য্য দ্রব্যাদি উক্তস্থানে রাখিয়া আসায় তাহার মামাদের ঐ কয়দিনই সকালবেলা খাওয়া হইল না। তাহারা প্রতি-দিনই তাহাকে খাওয়ার জিনিস না লইয়া যাওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করায়, সে ভাল-মন্দ কিছুই বলিত না। ক্রমান্বয়ে তিন চারি দিন ক্লেশভোগ করিয়া মামারা রাগে অগ্নিশর্ম্মা হইল। তাহারা একদিন দ্বিপ্রহরে বাড়ী আসিয়া ভাগি-নেয়কে তিরস্কার করিল ও প্রহারে জর্জ্জরিত করিল এবং তাহাকে ও তাহার মাতাকে বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দিল।

মাতা পুত্র কাঁদিতে কাঁদিতে বাড়ীর বাহির হইয়া পড়িল এবং কিয়ৎকাল মধ্যেই সেই ঝোপের নিকট উপস্থিত হইয়া একটী বড় গাছের তলায় উপবেশন করিল। ছেলেটি মায়ের ক্রোড়ে মাথা রাখিয়া তৃণ-শয্যায় শয়ন করিল। মাতা বসিয়া বসিয়া ছেলের শরীরে হস্ত বুলাইতে বুলাইতে কি করিবে, কোথায় যাইবে, ইত্যাদি চিন্তা করিতে লাগিল। উভয়েই নীরবে অবস্থান করিতে লাগিল। হটাৎ সেই ঝোপের নিকট হইতে কে যেন ছেলেটিকে

সম্বোধন করিয়া বলিল,—"হে বালক! তোমাদের দুর্গতির কারণ আমিই। কিন্তু তোমাদের দুঃখের অবসান অচিরেই হইবে। এইখানেই তোমরা সন্ধ্যা পর্য্যন্ত থাক, এবং সন্ধ্যার পর 'বিয়াছোবা'টীর সন্নিকটস্থ মাটী খুঁড়িয়া সাতটী ঘট উঠাইও। দেখিতে পাইবে সাতটীই মোহর-পূর্ণ। সমস্ত মোহরই তুমি লইও এবং রাত্রির মধ্যেই মায়ের সঙ্গে নিজ বাটীতে উপস্থিত হইয়া সেই স্থানেই বাস করিও।" ইহা উভয়েই শুনিল এবং সন্ধ্যার পর দুই জনে মিলিয়া, কথিত স্থান খুঁড়িয়া, সাতটি মোহরপূর্ণ ঘট পাইয়া নিজেদের বাড়ীর দিকে রওনা হ'ল।

গৃহস্থের পুত্রকে এখন আর বালক বলা যায় না। সে এখন যৌবনসীমায় পদার্পণ করিয়াছে এবং প্রাসাদতুল্য সুরম্য অট্টালিকা নির্ম্মাণ করাইয়া তাহাতে মায়ের সহিত বাস করিতেছে। তাহার বাড়ী কর্ম্মচারী ও দাসদাসীতে পূর্ণ; সে এখন বহু স্থানের মালিক। এখন সে সকলের সম্মানের পাত্র, প্রতিপত্তি তাহার যথেষ্ট, সে পরম সুখে সময় যাপন করে। সে এখন নূতন জমীদার বলিয়া পরিচিত। তাহার বাড়ীর সম্মুখে একটি পুষ্করিণী খনন করা হইবে এবং নানাস্থানে জানান হইয়াছে যে, মজুর-দিগকে প্রতি সাঝি মাটীর মজুরি বাবদ সাঝি ভরিয়া কড়ি দেওয়া হইবে।

এদিকে নূতন জমীদারের মামাদের অবস্থা অতিশয় হীন হইয়া পড়িয়াছে। তাহারা উক্ত সংবাদ পাইয়া কড়ির আশায় মাটী কাটিতে আসিল। বাড়ীর সরকার নূতন জমীদারের আদেশানুসারে, যে কেহ মাটী কাটিতে আসিত, তাহাকেই কাজে লাগিবার পূর্ব্বে মনিবের নিকট উপস্থিত করিত। তাহার মামাদিগকেও তাহার নিকটে উপস্থিত করিল। নূতন জমীদার তাহাদিগকে দেখিবামাত্র চিনিতে পারিল, কিন্তু তাহারা কেহই তাহাকে নিজেদের ভাগিনেয় বলিয়া চিনিতে পারিল না। নূতন জমীদার সরকারকে বলিল যে, তাহাদের মাটী কাটিতে হইবে না; তাহাদের পরিধানের নিমিত্ত সত্বর নূতন কাপড় আনিতে ও স্নানের যোগাড় করিয়া দিতে তাহাকে আদেশ দিলেন। তাহারা সন্দেহপূর্ণ চিত্তে স্নান করিয়া কাপড় পরিধান করিবামাত্রই অন্দরমহলে নীত হইল। তখন তাহারা কিছু ভীত হইল। নূতন জমীদারের সহিতই তাহারা আহার করিতে বসিল। কথাপ্রসঙ্গে ভাগিনেয় মামাদিগকে নিজ পরিচয় দিয়া সকল বৃত্তান্ত বলিল। তখনই ভগ্নী আসিয়া ভাইয়েদের সহিত দেখা করিল। ভাগিনেয় ও ভগ্নীর সহিত পরিচিত হইয়া তাহারা বড়ই লজ্জিত হইল। কেন না, তাহারা ভাগিনেয়কে প্রহার করিয়া ও ভগ্নীকে তিরস্কার করিয়া নিজেদের বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দিয়াছিল। সেই দিনই নূতন জমীদার মামি-দিগকে নিজ বাটীতে আনিল। মামিরা ভাগিনেয়ের বাটীতে আসিয়া, সকল দেখিয়া-শুনিয়া পরম পুলকিত হইল। তাহারা তাহাকে খুব আদর যত্ন করিতে লাগিল। এখন ভাগিনেয়েরও সে অবস্থা নাই, মামিদেরও সে কুভাব নাই। নিজেরা রাঁধিয়া সকল ভাল জিনিসই ভাগিনেয়কে খাওয়াইতে পারিলেই এখন মামিরা খুসি হন।

একদিন নূতন জমীদার মাতুলদের সহিত খাইতে বসিয়াছে। মামিরা পরিবেশন করিতেছে। তাহারা ভাল জিনিসের বেশীর ভাগই ভাগিনেয়ের পাতে দিতেছে। যখন সম্পূর্ণ দুধের সরই তাহার পাতে দেওয়া হইল, তখন সে মৃদুহাস্য করিয়া বলিল—"সেই মামা সেই মামি পুকুর পাড়ে ঘর, ভাগ্নেকে দুধ দিতে হাতে রাখ্‌ছ সর?" মামারা এই কথার অর্থ জিজ্ঞাসা করায় ভাগিনেয় মামিদের মন্দ ব্যবহারের কথা বলিল। শুনিয়া মামি ও মামাদের সকলেরই লজ্জায় মাথা হেঁট হইল। কিন্তু নূতন জমীদার ও তাহার মাতা নানা মিষ্ট কথায় তাহাদিগকে তুষ্ট করিলেন।

মাতা এক শুভদিনে শুভলগ্নে পুত্রকে বিবাহ করাইয়া এক অতি সুন্দরী বধূ ঘরে আনিলেন। তাঁহার সকল সাধ পূর্ণ হইল। ক্ষেত্রঠাকুরের কৃপায় তাহাদের কোন দুঃখই রহিল না। বৃদ্ধা জননী পুত্র, পুত্রবধূ সহ পরম সুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন।

সংগ্রহ ও সঙ্কলন।

বঙ্গ রঙ্গালয়ের ইতিহাস।

সান্ন্যাল ভবনে ন্যাসন্যাল থিয়েটার।

কলিকাতা, জোড়াসাঁকো, সান্ন্যাল ভবনে, বঙ্গবাসী-গণের উদ্যোগে সাধারণ (public) বঙ্গ রঙ্গালয় যে সময়ে প্রথম খোলা হয়, সে সময়ে কলিকাতায় ইংরাজদের দুইটী মাত্র পাবলিক থিয়েটার ছিল। ১মটী চৌরাঙ্গিতে অবস্থিত—"থিয়েটার রয়েল", ২য়টী লিণ্ডসে ষ্ট্রীটে অবস্থিত "অপেরা হাউস"। লুইস নাম্নী জনৈক ইংরাজ রমণী "থিয়েটার রয়েল" ভাড়া লইয়া অভিনয় করিতেছিলেন, তাঁহার নামানুসারে সাধারণে ইহাকে "লুইস থিয়েটার" বলিত। নাট্যাচার্য্য অমৃতলাল বাবু বলেন,—"সুলতানা নামক জনৈক আমেরিকাবাসী বেণ্টিঙ্ক ষ্ট্রীটের মোড়ে থাকিতেন; তিনিই "ময়দান প্যাভেলিয়ান" নাম দিয়া এই থিয়েটার প্রস্তুত করিয়াছিলেন। লুইস তাঁহার নিকট থিয়েটার ভাড়া লইয়াছিলেন। রাজপুরুষগণের রঙ্গালয়ে আগমনে এই থিয়েটারের নাম "থিয়েটার রয়েল" হইয়াছিল। পূর্ব্বোক্ত ৭ই ডিসেম্বর, শনিবারে (১৮৭২খৃঃ) ন্যাসন্যাল থিয়েটারে যে সময় নীলদর্পণ অভিনয় হইতেছিল, উক্ত রয়েল থিয়েটারে "এলিজাবেথ" নামক নাটক এবং অপেরা হাউসে "দেবকার্সন সাহেবকা পাক্কা তামাসা" অভিনয় হইতেছিল, সে দিনের সংবাদ পত্রে প্রকাশিত বিজ্ঞাপন পাঠে পাঠক মহাশয়গণ বিস্তৃত অবগত হউন।

১ম। থিয়েটার রয়েলে—

LEWIS'S THEATRE ROYAL.
Chowringhee
Directress—Mrs. G. W. Lewis
Open every evening
Another Great Drama
ELIZABETH.
Empress of all the Russias.
The lioness of the north.
Mrs. G. B. W. Lewis.

This Evening.
Saturday, 7th December, 1872.
will be presented The great adelphi Drama
The Lioness of the North.
Elizabeth—Mrs. G. B. W. Lewis.
To conclude with the successful operatic commeditta
The Swise Cottage
or
Why Don't she marry ?

২য়। অপেরা হাউসে—

Opera House, Lindsay Street
Dave Carson Sahibka Pucka Tumasha !
This evening,
Saturday, 7th December, 1872.
Mr. & Mrs. John L. Hall
In one of their Popular Comedy
Dave Carson
will appear for the first time this season, in
his original Impersonation of
The Bengalee Baboo
The first part will conclude with
Dave Carson's
Anglo-Indian Song entitled
Cooch perwa nie Mari Jahn
(কুচ পরোয়া নাই মেরি যান)

লুইস স্বয়ং প্রতিভাময়ী অভিনেত্রী ছিলেন, প্রায় সকল নাটকেই তিনি নায়িকার ভূমিকা গ্রহণ করিতেন। তাঁহার অভিনয় দর্শনের নিমিত্ত সাহেবগণের খুব ভিড় হইত। শিক্ষিত বাঙ্গালী তথায় অনেকেই যাইতেন। সে সময়ে ইংরাজের সংখ্যা কলিকাতায় এত অধিক ছিল না যে একখানি নাটকে নিত্য নিত্য নূতন দর্শক আকর্ষণ

করিয়া বহু রাত্রি চলিতে পারে; এজন্য লুইসকে ঘন ঘন নূতন নাটকের অভিনয় করিতে হইত। লুইস থিয়েটারের অনুকরণে এবং তৎকালীন টিকিট ক্রয়কারী দর্শকের সংখ্যাও সীমাবদ্ধ হওয়ায় ন্যাসন্যাল থিয়েটারেও ঘন ঘন নূতন নাটকের অভিনয় চলিতে লাগিল।

জামাই বারিকের অভিনয়।

১৪ই ডিসেম্বর (১লা পৌষ) নীলদর্পণের দ্বিতীয়াভিনয় করিয়া ন্যাসন্যাল সম্প্রদায় পর সপ্তাহে ২১শে ডিসেম্বর (৮ই পৌষ) দীনবন্ধু বাবুর "জামাই বারিকের" অভিনয় করেন। "জামাই বারিকের" প্রথমাভিনয় রজনীতে কে কি ভূমিকা লইয়া রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাহা নিম্নে লিখিত হইল;—

বিজয়বল্লভ ও চোর	অর্দ্ধেন্দু শেখর মুস্তফি।
পদ্মলোচন	নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।
অভয়কুমার	কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।
মাধব বৈরাগী	পূর্ণচন্দ্র মিত্র।
কামিনী	অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় (বেল বাবু।)
ভবী ময়রাণী	গোপালচন্দ্র দাস।
হাবার মা	তিনকড়ি মুখোপাধ্যায়।
পাঁচী	ক্ষেত্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়।
বগলা	মহেন্দ্রলাল বসু।
বিন্দুবাসিনী	অমৃতলাল বসু।

নীলদর্পণের মর্ম্মভেদী করুণরসাত্মক অভিনয়ের পর হাস্যরসাত্মক জামাই বারিকের অভিনয়ে দর্শকগণ অতীব আনন্দে যেন হাঁপ ছাড়িয়া উঠিয়াছিলেন।

"বিজয়বল্লভের" ভূমিকাভিনয়ে অর্দ্ধেন্দুবাবু সে কালের বৃদ্ধ জমীদারের চালচলন, ভাবভঙ্গি নিখুঁত করিয়া দেখাইয়াছিলেন। 'বগলা' ও 'বিন্দুবাসিনী' দুই সতীনের কলহে মহেন্দ্রলাল বসু এবং শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয়দ্বয় সতীনের ঈর্ষা জীবন্তভাবে ফুটাইয়া তুলিতেন। 'পদ্মলোচনের' ভূমিকাভিনয়ে দুই স্ত্রীর হতভাগ্য স্বামীর লাঞ্ছনার চিত্র নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সুন্দররূপে প্রদর্শন করিয়াছিলেন। এই প্রবল হাস্যরসাত্মক দৃশ্যটী এত জমাট হইত যে, উত্তরকালে "জামাই বারিক" হইতে এই দৃশ্যটী লইয়া "জেনানা-যুদ্ধ" নামে স্বতন্ত্র একখানি প্রহসন থিয়েটারে অভিনীত হইতে থাকে। ক্ষেত্রমোহন বাবু 'পাঁচীর' ভূমিকাভিনয়ে বড় লোকের বাড়ীর ঝিয়ের একটী নিখুঁত ছবি দেখাইয়াছিলেন। যে সময়ে জামাতাগণকে একে একে পাশ বিতরণ করিতেন, সে সময়ে তাঁহার অভিনয়-চাতুর্য্যে দর্শকগণ বিশেষরূপে আমোদলাভ করিতেন। যতবার 'পাশ' দিতেন, ততবারই তিনি এক একটী নূতন ভঙ্গী প্রকাশ করায় দর্শকমণ্ডলীর আনন্দোচ্ছ্বাস উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকিত। জামাইগণের মধ্যে একজন জামাই নগেন্দ্রবাবু সাজিয়া 'সপ্তকাণ্ড রামায়ণ' বর্ণনে এবং আর একজন জামাই অর্দ্ধেন্দু বাবু সাজিয়া "মাণিক পীরের গানে" দর্শকগণকে মাতাইয়া তুলিতেন।

নবীন তপস্বিনীর অভিনয়।

তৃতীয় ও চতুর্থ রজনী জামাই বারিক অভিনয়ের পর ৪ঠা জানুয়ারী (২১শে অগ্রহায়ণ) পঞ্চম রজনীতে 'নবীন-তপস্বিনী' নাটকের অভিনয় হয়। প্রথমাভিনয় রজনীর অভিনেতাগণের নাম:—

রমণীমোহন	নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।
জলধর	অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী।
বিনায়ক	কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।
মাধব	কালিদাস সান্ন্যাল।
বিদ্যাভূষণ	গোপালচন্দ্র দাস।
রতিকান্ত	অবিনাশচন্দ্র কর।
বিজয়	অমৃতলাল বসু।
মল্লিকা ও গুরুপুত্র	অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় (বেল বাবু)
মালতী	ভোলানাথ বসু।
জগদম্বা	মতিলাল সুর।
সুরমা	যদুনাথ ভট্টাচার্য্য।
তপস্বিনী	মহেন্দ্রলাল বসু।
কামিনী (নবীন তপস্বিনী)	ক্ষেত্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়।

নাট্যাচার্য্য অমৃতলাল বাবুর মুখে শুনিয়াছি, 'নবীন

তপস্বিনী' নাটকে প্রথমে তাঁহার 'মালতীর' ভূমিকা ছিল, কিন্তু তিনি স্ত্রী-চরিত্রের ভূমিকাভিনয়ে অসম্মত হওয়ায়, সম্প্রদায়স্থ সকলে বলেন, 'মালতী' ভূমিকাভিনয়ের আর যোগ্য লোক পাই কোথায়? তিনি বাগবাজার, বসুপাড়া-নিবাসী ভোলানাথ বসু নামক একটী পরিচিত বালককে লইয়া যান, ইনি পূর্ব্বে শ্যামবাজার প্রিপেরেটারী (Preparatory) স্কুলে পড়িতেন, ইহাঁর থিয়েটার করিবার খুব সখ ছিল। ভোলানাথ বাবুকে 'মালতীর' ভূমিকা দিয়া ইনি 'বিজয়ের' ভূমিকা গ্রহণ করেন। সকলের ভূমিকাই চমৎকার হইয়াছিল।

মতিলাল সুর মহাশয় 'জগদম্বার' ভূমিকা অতি দক্ষতার সহিত অভিনয় করিয়াছিলেন,—জলধরের ভূমিকা যেরূপ অতুলনীয়,—জগদম্বাও অঙ্গভঙ্গিতে তৎসমতুল্য হওয়ায় "যেমন হাঁড়ি তেম্‌নি সরা" হইয়াছিল। বিজয় ও কামিনীর ভূমিকায় শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু এবং শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় নায়ক ও নায়িকার বিশুদ্ধ প্রেমাভিনয়ের মনোমুগ্ধকর ছবি দেখাইয়া নাট্যানুরাগী দর্শকবৃন্দ এবং গ্রন্থকার দীনবন্ধু বাবুর বিশেষ প্রীতি-ভাজন হইয়াছিলেন। ক্ষেত্র বাবুই ন্যাসন্যালে পুন-রভিনীত লীলাবতী নাটকে লীলাবতীর ভূমিকা অভিনয় করিতেন। দীনবন্ধু বাবু মুগ্ধ হইয়া ক্ষেত্রবাবুকে বলিয়া-ছিলেন,—"তুমি আমার নাটকের নায়িকার জীবন দিবার জন্যই জন্মিয়াছ।" অর্দ্ধেন্দুবাবুর 'জলধরের' ভূমিকাভিনয় দর্শনে দর্শকগণ হাসিয়া গড়াইয়া পড়িত। 'জলধর' ভূমিকাভিনয়ে এ পর্য্যন্ত কেহই তাঁহার সমকক্ষ হইতে পারেন নাই। হাস্যরসাভিনয়ে অর্দ্ধেন্দুবাবু বঙ্গ রঙ্গালয়ে অদ্বিতীয় ছিলেন। ন্যাসন্যাল থিয়েটারের প্রথমাবস্থায় অভিনয়ের উল্লেখকালে নাট্যসম্রাট গিরিশচন্দ্র "অর্দ্ধেন্দু জীবনী"তে লিখিয়াছেন,—"আমি শুনিয়াছিলাম, দেখি নাই, কারণ ন্যাসন্যাল থিয়েটারের সহিত প্রথমে আমার সম্বন্ধ ছিল না। ক্রমে ক্রমে দীনবন্ধু মিত্র মহাশয়ের নাটক ও প্রহসনগুলির অভিনয় চলিতে লাগিল। প্রতি গ্রন্থে অর্দ্ধেন্দু প্রধান ও অতুলনীয়। তন্মধ্যে নবীন তপস্বিনীর 'জলধরের' অভিনয় অতুলনীয় মধ্যে অতুলনীয়।" অন্যত্র লিখিয়াছেন, "অর্দ্ধেন্দুশেখর গ্রন্থ-কারের কথায় যোগদান করিয়া নাটকের উৎকর্ষ সাধন করিতেন।" একটা দৃষ্টান্ত দিই, নাটকে জলধর কবিতা রচনা করিয়াছেন,—

"মালতী মালতী মালতী ফুল,
মজালে মজালে মজালে কুল।"

জলধর অর্দ্ধেন্দু কবিতার একছত্র রচনা করিয়াছেন—

মালতী মালতী মালতী ফুল

মিলশুদ্ধ দ্বিতীয় ছত্র আর হইয়া উঠিতেছে না—নানা প্রকার চেষ্টা হইতেছে, বহুকষ্টে দ্বিতীয় ছত্র রচিত হইল—

"বিঁধেছে পাপড়িতে বোলতার হুল"

কিন্তু ছত্রটী জলধরের মনোনীত হইতেছে না কারণ 'পাপড়ি' এ কথাটি 'বিঁধেছে'র দিকে দেওয়া যায়, কি বোলতার হুলের দিকে দেওয়া যায়? এই পাপড়ি এ-দিকে কি ও-দিকে দেওয়া যাইবে, ইহার আলোচনা পুনঃ পুনঃ হইতে লাগিল। পাপ্‌ড়িতে পাপ্‌ড়িতে উঁহুঁ জলধরের মনোনীত হয় না। শেষে বিদ্যুৎ চমকের ন্যায় মনে উঠিল,—

মজালে মজালে মজালে কুল।

যখন পাপ্‌ড়ি লইয়া ব্যাকুল, তখন দর্শক আকুল হাসিয়া গিরিশ বাবু অন্য স্থলে লিখিয়াছেন—"অর্দ্ধেন্দুর অভিনয় এই,—অর্দ্ধেন্দু কি ভূমিকা লইয়া রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিয়াছেন, অর্দ্ধেন্দু তাহা দর্শককে দেখিতে দিতেন না। দর্শক দেখিত—অর্দ্ধেন্দুবাবু আসিয়াছেন। যতবার প্রবেশ করিতেন, ততবারই দর্শক আগ্রহের সহিত বলাবলি করিতেন—অর্দ্ধেন্দুবাবু আসিয়াছেন। দর্শক দেখিতেন অর্দ্ধেন্দু, কি ভূমিকা তাহা নয়। এইরূপ শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি একক দর্শকের সম্পূর্ণ প্রীতি জন্মাইতে পারে। দৃশ্যপট, অভিনেতা প্রভৃতির বিশেষ সাহায্য প্রয়োজন হয় না। কলিকাতায় 'দেবকাসন' নামক এক ইংরাজ এই উচ্চশাঙ্গের নিয়ংস্থ শক্তিসম্পন্ন হইয়াও ইংরাজ মণ্ডলীকে বিমুগ্ধ করিয়াছিলেন।"

বিয়ে পাগলা বুড়োর অভিনয়।

তৎপরে ন্যাসন্যাল থিয়েটারে দীনবন্ধু বাবুর "বিয়ে পাগলা বড়ো" পুনরভিনীত হয়। পাঠকগণের বোধ হয় স্মরণ আছে, "বাগবাজার অ্যামেচার থিয়েটারে" সধবার একাদশীর সঙ্গে "বিয়ে পাগলা বুড়ো" চোরবাগানে স্বর্গীয় লক্ষীনারায়ণ দত্ত (পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ও দেশবিখ্যাত অভিনেতা স্বর্গীয় অমরেন্দ্রনাথ দত্তের পিতামহ) মহাশয়ের বাটীতে অভিনীত হইয়াছিল। রাজীবলোচন, পেঁচোর মা, গৌরমণি ইত্যাদির ভূমিকা যথাক্রমে অর্দ্ধেন্দুবাবু, গোপালচন্দ্র দাস, এবং ধর্ম্মদাস সুর অভিনয় করিয়াছিলেন। রাধামাধব কর মহাশয় ন্যাস-ন্যাল থিয়েটারে এ সময়ে না থাকায়, তাঁহার "রতা নাপ্তের" ভূমিকা বেলবাবু গ্রহণ করিয়াছিলেন! অভিনয়ে সকলেই কৃতিত্ব দেখাইয়াছিলেন, হাসিতে হাসিতে দর্শকগণ অস্থির হইয়া উঠিতেন।

মুস্তফি সাহেবকা পাক্কা তামাসা।

"বিয়ে পাগলা বুড়ো" ১৫ই জানুয়ারী (৩রা মাঘ) বুধবারে অভিনীত হয়। ন্যাসন্যাল থিয়েটারে বুধবারে অভিনয় এই প্রথম আরম্ভ হইল। বিয়ে পাগলা বুড়োর সঙ্গে আর কয়েকখানি রঙ্গনাট্যও অভিনীত হইয়াছিল। তন্মধ্যে "মুস্তফি সাহেবকা পাক্কা তামাসা" বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই রঙ্গাভিনয়ের ইতিহাস এই :—

আমরা পূর্ব্বেই 'অপেরা হাউসে" দেবকার্সন সাহেবের অভিনয়ের উল্লেখ করিয়াছি। রঙ্গ নাট্যাভিনয়ে ইনি সুবিখ্যাত ছিলেন। দেবকার্সন সাহেব কলিকাতায় আসিয়া নভেম্বর (১৮৭২ খৃঃ) মাসের মাঝামাঝি হইতে অপেরা হাউস ভাড়া লইয়া তাঁহার রঙ্গাভিনয় দেখাইতে থাকেন। "দেবকার্সন সাহেবকা পাক্কা তামাসা" বলিয়া তিনি বিজ্ঞাপন দিতেন। দেবকার্সন সাহেবের "The Bengalee Babu" "Professor," "The School Master, "The Blind Beggar," "The Bombay Parsee." "Deve Carson in the Police court" Deve Carson's Anglo Indian Song, entitled the Dak Gharry (ডাক গাড়ী) Cooch perwa nie Meri Jan (কুচ পরোয়া নেই মেরি জান) প্রভৃতি রঙ্গাভিনয় দর্শনে ইংরাজ দর্শকগণ বিলক্ষণ আমোদ উপভোগ করিতেন।* বহু সংখ্যক বাঙ্গালী দর্শক দেবকার্সনের এই কৌতুকাভিনয় দেখিতে অপেরা হাউসে যাইতেন। দেবকার্সনের অনুকরণে অর্দ্ধেন্দু বাবুও "মুস্তফি সাহেবকা পাক্কা তামাসা" বলিয়া ন্যাসন্যাল থিয়েটারে রঙ্গাভিনয় আরম্ভ করিলেন। দেবকার্সন সাহেব তাঁহার "বেঙ্গলী বাবু" অভিনয়ে যেমন—

"I am very good Bengalee Babu
I keep my shop at Radhabazar,
I live in Calcutta, eat my Dal-Vat
And smoke my Hookkha" ইত্যাদি গাহিয়া

বাঙ্গালী বাবু লইয়া ঠাট্টা করিতেন, অর্দ্ধেন্দু বাবুও সেইরূপ সাহেব সাজিয়া বেহালা হাতে গান করিতেন,—

"হাম বড়া সাব্ হ্যায় দুনিয়া মে,
None can be compared হামারা সাথ ;—
মিষ্টার মুস্তাফি name হামারা
চাট গাঁওমে মেরা বিলাত।
কোর্ট পিনি প্যাণ্টুলন পিনি
পিনি মোরা ট্রাউজার,
Every two years new suit পিনি
Direct from Chandny Bazar,
Dirty nigger hat হামারি
বড় ময়লা আছে হোঃ হোঃ ইত্যাদি"

* ১৮ই ডিসেম্বর পর্য্যন্ত দেবকার্সন সাহেব অপেরা হাউসে অভিনয় করিয়াছিলেন। ১৬ই জানুয়ারী District Grand Lodge of Bengal এবং The Masonic Brotherhood in Calcutta দেবকার্সন সাহেবের সম্মতি লইয়া উক্ত রঙ্গালয়ে তাঁহাকে একটী Farewell Benefit প্রদান করেন। সে রাত্রে তিনি Bengalee Babu ও Bombay Parsee রঙ্গাভিনয় এবং তাঁহার 'ডাক গাড়ী' সঙ্গীতটী গাহিয়াছিলেন। তৎপর দিবস সংবাদ পত্রে বাহির হয় :—"The Opera House is quite full last night on the occasion of Dave Carson's fare-well benefit this season. Dave's performances were very applauded and he was twice called before the curtain.

সাহেবী পোষাক পরিয়া নগেন্দ্র বাবু ও অবিনাশচন্দ্র কর উভয়ে অর্দ্ধেন্দু বাবুর সহকারী হইয়া বাহির হইতেন। বেহালা বাজাইয়া গান ও পলকা নাচ চলিত। তিন জনেই নানা ভঙ্গিতে একটা নূতনত্ব দেখাইয়াছিলেন।

দেবকার্সন সাহেবের ব্যঙ্গ-বিদ্রুপের এই পাল্টা জবাবে বাঙ্গালী দর্শকেরা যৎপরোনাস্তি আনন্দলাভ করিয়াছিলেন। সেই সময় হইতে "মুস্তাফি সাহেব" বলিয়া অর্দ্ধেন্দু বাবুর নাম বাহির হয়।

মজলিস চৈত্র, ১৩২৯ শ্রীঅবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়।

বোম্বাই বনাম কলিকাতা।

এবার বোম্বাই যাইয়া আমার পুনঃ পুনঃ কলিকাতার কথা মনে পড়িয়াছে। কলিকাতা ও বোম্বাই দুইটিই ভারতের প্রধান নগর। বিশেষতঃ কলিকাতাকে আমরা এসিয়ার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নগর বলিয়া গর্ব্ব করিয়া থাকি। কিন্তু দেশবাসীর দিক্ হইতে বোম্বাই ও কলিকাতায় কত প্রভেদ। কলিকাতা বাংলার রাজধানী। কিন্তু কলিকাতার বাঙ্গালীর কতটুকু অধিকার? কোনও বৈদেশিক কলিকাতায় আসিলে প্রথমেই তাঁহার মনে প্রশ্ন হইবে, আমি কি বাঙ্গালীর দেশে আসিয়াছি? তিনি যদি বড়বাজার অঞ্চলে যান, তবে তাঁহার ধারণা হইবে, এটি মাড়োয়াড়ীর দেশ। তিনি যদি ক্যানিং ষ্ট্রীট, মুর্গীহাটা, প্রভৃতি অঞ্চল ঘুরিয়া আসেন, তাহা হইলে তিনি ভাবিবেন, একি দিল্লীওয়ালা, নাখোদা, মুসলমানের দেশ? এজরা ষ্ট্রীট, পোলক ষ্ট্রীট প্রভৃতির মধ্যে প্রবেশ করিলে তাঁহার মনে হইবে, ইহা ভাটিয়া বোম্বেওয়ালার দেশ। তারপর ক্লাইভ ষ্ট্রীট, চৌরঙ্গী প্রভৃতি পথের উভয় পার্শ্বের রাজপ্রাসাদতুল্য সৌধশ্রেণী দেখিয়া তিনি হয়ত মনে করিবেন, ইহা য়ুরোপীয়ান বণিকের দেশ। বস্তুতঃ, সহরের বড় বড় রাস্তা, ব্যবসাবাণিজ্যের প্রধান প্রধান কেন্দ্র, কল কারখানা যেখানেই তিনি যান, দেখিবেন, বাঙ্গালীর সংখ্যা খুবই কম—ইংরাজ, মাড়োয়ারী, ভাটিয়া, দিল্লীওয়ালা, মুসলমান, প্রভৃতি অ-বাঙ্গালী আসিয়া ঐ সকল স্থান দখল করিয়া আছে। এতদ্ভিন্ন সেয়ার মার্কেট, ষ্টক এক্‌চেঞ্জ, প্রভৃতি ঐ শ্রেণীর একচেটিয়া। সূতার, মুচি, বেহারা, পাচক, হালুইকর, পানচুরুটওয়ালা, মোটরচালক, এ সব কাজেও বাঙ্গালী নাই। বাঙ্গালীর দেশে আসিয়া সকল শ্রেণীর লোকই স্বাধীন ব্যবসা দ্বারা লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জ্জন করিতেছে, কেবল বাঙ্গালী ছাড়া। কলিকাতার বড় বড় রাজপথে বাঙ্গালীর বাস নাই বলিলেও চলে। সাধারণতঃ বাঙ্গালীরা যেখানে বাস করে, সেগুলি অধিকাংশই বদ্ধ। অন্ধকার, স্যাঁৎস্যাতে—গলি গলি তস্য গলি। বাংলার মফস্বলেও একই ব্যাপার, মাড়োয়ারী প্রভৃতি যাইয়া মফস্বলের ব্যবসাবাণিজ্য প্রায় একচেটিয়া করিয়া ফেলিতেছে।

অন্যদিকে বোম্বাইবাসীর—বড় বড় ব্যবসাবাণিজ্যের কেন্দ্র, কলকারখানা, সেয়ার মার্কেট, ষ্টক একচেঞ্জ সর্ব্বত্রই ঐ দেশবাসীর পূর্ণ আধিপত্য। বোম্বাইর সমুদ্র-সৈকতে, এপলো বন্দর, মালাবার পর্ব্বত, প্রভৃতি সহরের উৎকৃষ্ট স্থানগুলিতে যে সকল বৃহৎ বৃহৎ প্রাসাদতুল্য অট্টালিকা আছে, তাহাতে বোম্বাইবাসী ধনকুবের, ক্রোড়পতি বণিক, কাপড়ের কলের মালিক, প্রভৃতি মহাধনীগণ বাস করেন। পার্শী, ভাটিয়া, বোরা, প্রভৃতি জাতীয় বোম্বাইবাসিগণ য়ুরোপীয় প্রতিযোগিতায় জয়লাভ করিয়া উচ্চশির হইয়া বাস করিতেছেন। সমগ্র এসিয়ার মধ্যে সর্ব্ববৃহৎ হোটেল বোম্বাইয়ে, এবং তাহার মালিক ও তত্ত্বাবধায়ক বোম্বাইবাসী। বোম্বাইর বড় বড় রাস্তাগুলি দেখিয়া আমার লণ্ডনের কথা মনে পড়ে। বোম্বাই সহরে এক হিন্দুদের জন্যই ২০০০ রেস্তোরাঁ বা ভোজনাগার আছে। তা-ছাড়া, পার্শী, মুসলমান প্রভৃতি অন্যান্য জাতির ত আছেই। বোম্বাইর সর্ব্বত্রই শিল্প ও ব্যবসাবাণিজ্যের কল-কোলাহলে মুখরিত। আর এই জন্যই বোম্বাইয়ে কলিকাতার ষ্টেটসম্যান, ইংলিশম্যানের ন্যায় বৃহৎ বৃহৎ দৈনিক খবরের কাগজ দেশীয় ভাষায় পরিচালিত হইতে পারিয়াছে। 'সাঝ বর্ত্তমান' প্রভৃতি কয়েকখানা দৈনিক আছে, তাহাতে প্রত্যহ ডবল ডিমাই ৮ হইতে ১২ পৃষ্ঠা বিষয় থাকে। ঐ সকল কাগজ কোন বিষয়েই ইংরাজের অধীনে

পরিচালিত কাগজ অপেক্ষা ন্যূন নহে। বাংলা ভাষায় ঐরূপ খবরের কাগজ এ পর্য্যন্ত একখানাও হয় নাই, শীঘ্র হইতে পারিবে কি না সন্দেহ।

বোম্বাইবাসী কেবল ধন উপার্জ্জন করিয়াই ক্ষান্ত নহে, কি ভাবে ধনের সদ্ব্যবহার করিতে হয়, তাহাও তাঁহারা বিলক্ষণ অবগত আছেন। বোম্বাইবাসিগণ এক একটি সদনুষ্ঠানে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া থাকেন। খুলনা দুর্ভিক্ষ ও উত্তর বঙ্গের বন্যাপীড়িতদের জন্য তাঁহারা কিরূপ অকাতরে অর্থদান করিয়াছেন, তাহাও কাহারও অবিদিত নাই। সম্প্রতি গুজরাট জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের দরুণ তাঁহারা অতি অল্প সময়ের মধ্যে দশ লক্ষাধিক টাকা উঠাইয়াছেন।

আমরা বাঙ্গালীরা গর্ব্ব করিয়া থাকি, শিক্ষা বিষয়ে বাঙ্গালী ভারতের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া আছে। কিন্তু বাঙ্গালীর এ গর্ব্বও টিকিতেছে না। যদি শিক্ষা বলিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপমারা গ্রাজুয়েট তৈরী বুঝায়, তবে হয়ত বাঙ্গালীদের গর্ব্ব এখনও টিকিতে পারে, কিন্তু যদি শিক্ষা বলিতে প্রকৃত শিক্ষা বুঝায়, তবে বলিতে হইবে, বাঙ্গালা, বোম্বাই ও গুজরাটবাসীদের নিকট হটিয়া যাইতেছেন।

বোম্বাই আমেদাবাদে জাতীয় শিক্ষার যেরূপ প্রচার দেখিলাম, বাংলায় সেরূপ নাই। এমন একটী মাত্র জাতীয় বিদ্যালয় আছে কি, যাহাতে ২০০০ ছাত্র আছে? কিন্তু বোম্বাইয়ে এরূপ একটী বিদ্যালয় দেখিয়াছি। ওখানে জাতীয় বিদ্যালয়ের সংখ্যাও অনেক। বাংলায় জাতীয় শিক্ষার দুর্দ্দশার কারণ বাঙ্গালীর চাকরী-লোলুপতা। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপমারা না হইলে চাকুরী হয় না, ওকালতী করা যায় না, এই জন্য এখানে জাতীয় বিদ্যালয়ে ছাত্র জুটে না। কিন্তু বোম্বাইবাসিগণ চাকুরী ঘৃণা করে, স্বাধীন ভাবে ব্যবসাবাণিজ্য দ্বারা জীবিকার্জ্জনকে তাহারা গৌরবজনক বলিয়া মনে করে, তাই তাহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া প্রকৃত শিক্ষার দিকেই দৃষ্টি করে। আমি যখন বোম্বাইয়ে ছিলাম, তখন বোম্বাইয়ের স্বনামধন্য ব্যবসায়ী সোবাবজী গোকুলদাসের পুত্র আসিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করে। যুবকটির বয়স মাত্র ২১।২২ বৎসর। আমি তাহাকে পড়াশুনার কথা জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল, Secondary Standard পর্য্যন্ত পড়িয়া, সে দেড় বৎসর ইয়ুরোপ ঘুরিয়া আসিয়াছে এবং এক্ষণে পিতার কারবার দেখিতেছে। আলাপ করিয়া বুঝিলাম, যুবকটির জ্ঞানের প্রসারতা আমাদের দেশের বি-এ, এম-এর অপেক্ষা অনেক বেশী।

স্ত্রীশিক্ষাবিষয়েও বোম্বাইবাসী আমাদের অপেক্ষা অনেক অগ্রে চলিয়াছে। তথায় পর্দ্দাপ্রথা না থাকায় ছেলে-মেয়েরা একত্র পড়াশুনা করে। তথায় বালিকা-বিদ্যালয়ের সংখ্যাও অনেক। আমাকে 'বনিতা বিশ্রম' নামে একটি বালিকা-বিদ্যালয় দেখান হয়। তথায় নিয়ম এই যে, প্রত্যেক বালিকাকে সপ্তাহে চরকায় ২ তোলা করিয়া সূতা কাটিয়া আনিতে হইবে। আমি বিদ্যালয়ে উপস্থিত হইলে প্রত্যেকটি মেয়ে ফুলের মালার বদলে ১ তোলা সূতার একটি করিয়া পেটি আমার গলে পরাইয়া দিল।

বাংলার কয়টি বালিকা-বিদ্যালয়ের এরূপ বাধ্যতামূলক সূতাকাটার নিয়ম প্রবর্ত্তিত হইয়াছে?

বোম্বাইর ন্যাশনেল মেডিকেল কলেজটিও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সহরের একটি প্রধান রাস্তার উপর একটি প্রকাণ্ড অট্টালিকায় ইহা অবস্থিত। বাড়ীর ভাড়া মাসে ২৫০০৲ হাজার টাকা। সহরের প্রধান প্রধান চিকিৎসকগণ কলেজটির জন্য অকাতরে পরিশ্রম করিতেছেন। কলিকাতার জাতীয় আয়ুর্বিজ্ঞান বিদ্যালয়টি এখন যে অবস্থায় আছে, তাহা আমাদের পক্ষে গৌরবের নহে।

তাহার পর খদ্দরের কথা। খদ্দর বিষয়ে বোম্বাই ও বাংলার কোন তুলনাই হয় না, বোম্বাই ও আমেদাবাদে শত শত কলের প্রতিযোগিতা সত্ত্বেও যেরূপ অপর্য্যাপ্ত খদ্দর প্রস্তুত হইতেছে, তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। আমেদাবাদে খদ্দর ডিপোতে সর্ব্বদা তিন লক্ষ টাকার খদ্দর মজুত থাকে, তা ছাড়া, বহু স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খদ্দর ডিপো আছে। বোম্বাইবাসীগণ খদ্দরের উপযোগিতা ভালরূপ বুঝিয়াছেন, তাই তাঁহারা খদ্দর উৎপাদনের দিকে বিশেষ

জোর দিতেছেন। বোম্বাইয়ে আমি শ্রীযুক্ত ব্যাঙ্কারের বাড়ী অতিথি ছিলাম। এই ব্যাঙ্কার, মহাত্মার অনুচর শ্রীযুক্ত শঙ্করলাল ব্যাঙ্কারের কনিষ্ঠ সহোদর। শঙ্করলাল ব্যাঙ্কার অকৃতদার; কিন্তু তাঁহার পত্নী গ্রাজুয়েট। ব্যাঙ্কার আমাকে বলিলেন, খদ্দর গ্রহণ করিলে কত বাজে খরচ যে কমিয়া যায়, তাহার ইয়ত্তা নাই। অর্থনৈতিক হিসাবে খদ্দরের উপযোগিতা অত্যন্ত অধিক। এইজন্যই বোম্বাইর ধনী দরিদ্র সকলেই খদ্দর ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছে।

আজ ভারতের সকল জাতিই আগে চলিয়াছে, বাঙ্গালীই কি কেবল পিছে পড়িয়া থাকিবে?

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়

—সময়, ১৩৩০

কয়েকটী খাঁটি কথা।

আমাদের দেশে একজনের কর্তৃত্বে কাজ এক রকম চলে। দশজনের দশ মতে, দশ হস্তে তাহার দশমাংশের একাংশ কার্য্যই হইয়া থাকে। যত প্রভু তত ব্যয়াধিক্য, তত কার্য্য-স্বল্পতা ও কার্য্যের অসুবিধা।

*　　*

ধর্ম্মহীন শিক্ষা প্রকৃত প্রস্তাবে শিক্ষাপদবাচ্যই নয়। কেবল দশখানা পুস্তক পড়িলে বা পাঁচটা ভাষা শিখিলে প্রকৃত শিক্ষা হয় না। কেবল ভাষাশিক্ষা পশুপক্ষী বা বনমানুষের শিক্ষা হইতে পারে, অসভ্যকে সভ্য করিতে পারে, কন্তু মানুষকে খাঁটি মানুষ করিতে পারে না। তাহার জন্য ধর্ম্মশিক্ষার প্রয়োজন। ইহার অভাবে আমরা সৎপুত্র, উত্তম পিতা, উপযুক্ত ভ্রাতা, শ্রেষ্ঠ দেশবাসী হইতে পারি না। ক্ষিপ্র হস্ত, দ্রুতগামী পদ, তীব্র নাসিকা, প্রখর মুখ, ক্ষুদ্র চক্ষু আর লম্বা জিহ্বা থাকিলে মনুষ্য মনুষ্য-পদবাচ্য হয় বটে, কিন্তু যতদিন না ধর্ম্মশিক্ষা হয়, যতদিন না সেই হস্ত পদ নাসিকা মুখ চক্ষু ও জিহ্বা ধর্ম্মশিক্ষায় শোধিত হয়, ততদিন কেবল হস্ত পদ নাসিকা মুখ জিহ্বা বিশিষ্ট মনুষ্য যথার্থ মনুষ্য হয় না। যেমন সুবর্ণ অগ্নি দ্বারা শোধিত না হইলে তপ্তকাঞ্চন হয় না, তেমনি মনুষ্য ধর্ম্ম-শিক্ষায় শোধিত না হইলে যথার্থ মনুষ্যপদবাচ্য হয় না।

*　　*　　*

অর্থকৃচ্ছ্রতা হেতু অভাবে স্বভাব সঙ্কীর্ণ হয়।

*　　*　　*

একদল লোক আছে যাহারা পিপীলিকাকে সুজি ও চিনি দেয়, গরু ঘোড়াকে জিলিপী খাওয়ায়, পায়রাকে ছোলা দেয়। সুনামের জন্য মনুষ্যের সুবিধার নামে, ধর্ম্মশালা করিয়া দেয়, দুর্ভিক্ষে চাঁদা দেয়। স্বাস্থ্যকর খাদ্যের সহিত অস্বাস্থ্যকর দ্রব্য মিশাইয়া লক্ষ লক্ষ লোক মারিয়া, সেই পয়সায় পিপীলিকা, গরুঘোড়াকে খাওয়ায়। আর ধর্ম্মশালা নির্ম্মাণ করে, দুর্ভিক্ষে চাঁদা দেয়। নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য আটা ময়দার পরিবর্ত্তে পাথরচূর্ণ খাওয়ায়, ঘিয়ের পরিবর্ত্তে সর্পচর্ব্বি দেয়, খাঁটি সর্ষপ তৈলের পরিবর্ত্তে বিষাক্ত বীজের তৈল চালায়। ধর্ম্মের দোহাই দিয়া অনেক অধর্ম্ম হজম করে। তাহাদের পক্ষে, এই ধর্ম্মের ভাণ অধর্ম্মের হজমীগুলি। এই ধর্ম্মের ভাণে অনেক পাপ কার্য্য বেমালুম সাফ হজম করে, সমাজে একটা কৃষ্ণবিষ্ণু হইয়া বেড়ায়, আর অনেক কার্য্যে মুরুব্বিয়ানা করে।

*　　*　　*

শেয়ার মার্কেট অতি ভয়ঙ্কর স্থান। এখানে কত সহস্র সহস্র লোকের ধ্বংস হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। * * * অনেক সময়ে বুঝা দায় যে, এখানে লোকের বেশী সর্ব্বনাশ হয়, না হাইকোর্টের উকিলপাড়ায় বেশী সর্ব্বনাশ হয়? * * * যতদিন মানবের লোভ, অবৈধ লালসা, অল্প আয়াসে অতিশয় লাভের মোহ থাকিবে, ততদিন মানুষ শেয়ার মার্কেটে পুড়িয়া মরিবে।

শ্রীতারকনাথ সাধু-প্রণীত

"ভোলানাথের ভুল" হইতে উদ্ধৃত।

বিসর্জ্জন।

[শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী]

(১)

তখন সবেমাত্র শুক্লা তৃতীয়ার ক্ষীণ চাঁদখানার আলো গোধূলীর মৃদুচ্ছায়াযুক্ত ধরার গায়ে আসিয়া পড়িয়াছিল, সে আলো ভাল করিয়া তখনও ফুটিতে পারে নাই। পাখীরা অনেক আগে নিজ নিজ গৃহে ফিরিয়া গিয়াছে। নদীর ওপারে অন্ধকারলিপ্ত ঝোপটার মধ্যে তখনও অসংখ্য শালিক পাখীর কলরব শ্রবণপথে ভাসিয়া আসিতেছিল।

বিধবা দিবসের কার্য্যাবসানে ঘাটে আসিয়া একটু দাঁড়াইলেন, শ্রান্তভাবে একবার আকাশ পানে তাকাইলেন। সুন্দর আকাশ নদীর ওপারে সূর্য্যাস্তের শেষ রক্তিমরেখা এখনও জাগিয়া, তাহার আভা আসিয়া পড়িয়া এ পারকে শ্রী-যুক্ত করিয়া তুলিতেছে, ওপার ধীরে ধীরে অন্ধকারের কোলে ঢলিয়া পড়িতেছে। নদীর মাথার উপর ক্ষীণ চাঁদখানা, একটু বাম পার্শ্বে হেলিয়া মলিননেত্রে চাহিয়া আছে। শস্য কাটা শেষ হইয়া গিয়াছে, ওপারের মাঠ সব খালি পড়িয়া।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস সুষমার বক্ষ ভেদ করিয়া বাহির হইয়া পড়িয়া প্রবহমান বাতাসের সহিত মিলিয়া গেল। তাঁহার জীবনেও একদিন সূর্য্যের আলো প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল; এমনি সন্ধ্যার মৃদু, তরল অন্ধকার হটাৎ কোথা হইতে আসিয়া পড়িয়া ক্রমে ক্রমে জমাট বাঁধিয়া দাঁড়াইয়া সেই অন্ধকারেই এখন চিরজীবনের সাথী, আলোর কথা অতীতে ডুবিয়া গিয়াছে। হায় মানুষের ভাগ্য!

আবার একটা নিশ্বাস ফেলিয়া সুষমা ঘাটে নামিতে লাগিলেন। এ ঘাট পল্লীগ্রামের মেটে ঘাট। বর্ষায় গঙ্গা যখন উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে, জল তখন নদীবক্ষ ছাপাইয়া কূলে কূলে ভরিয়া উঠে, বর্ষা অবসানে তাহা নামিতে নামিতে অনেক নিচে পড়িয়া যায়। এই মাঘ মাসে গঙ্গার জল অনেক নামিয়া গিয়াছে, বক্র নিম্নে গঙ্গা একটী রজত-রেখার ন্যায়ই পড়িয়া আছে।

গঙ্গাবক্ষে নৌকা ভাসিতেছিল, মাঝি গাহিতেছিল—
'হরি দিন তো গেল, সন্ধ্যা হ'ল পার কর আমারে।'

কলসী নামাইয়া সুষমা জলে নামিতেছিলেন; থমকিয়া দাঁড়াইয়া একাগ্রচিত্তে গানটী শুনিতে লাগিলেন। তাঁহার প্রাণের সঙ্গে গানটা ঠিক বাজিতেছিল, চোখেও তাই জল আসিয়া পড়িল।

ক্ষুদ্র একটী বালিকা উপর হইতে তীর গতিতে নিচে নামিতেছিল, তাহার হাসির সুরে চমকিতা হইয়া সুষমা মুখ ফিরাইলেন। ব্যগ্র কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "ওরে অত জোরে ছুটিস নে, আস্তে নাম, পড়ে মরবি'খন। এর ওপর থেকে পড়লে আর আস্ত থাকবি নে। এই সন্ধ্যাবেলা কে তোকে ঘাটে আসতে মাথার দিব্যি দেছে বল দেখি?"

মায়ের কথায় কর্ণপাত না করিয়া শুভ্রা তেমনিই ছুটিয়া নামিয়া পড়িয়া একেবারে মাকে জড়াইয়া ধরিল।

সুষমা তাহার আলিঙ্গনপাশ হইতে নিজেকে ছাড়াইয়া লইয়া রাগতঃ সুরে বলিলেন, "তোর কি একটু আক্কেল নেই শুভ্রা। আমি এখনও কাপড় কাচি নি, আমায় ছুঁলি তুই কেমন করে বল দেখি?"

শুভ্রা থতমত খাইয়া বলিল, "তা, কমদাদা আমায় মারতে এল কেন, তাই তো আমি দৌড়ে এসেছি।"

সুষমা বলিলেন, "কমনীয় তোকে মারতে এসেছে কেন? নিশ্চয়ই তুই কিছু অন্যায় কাজ করেছিস।"

শুভ্রা কুঞ্চিত কেশযুক্ত ক্ষুদ্র মস্তক দুলাইয়া বলিল, "হ্যাঁ, অন্যায় কাজ করেছি না আরো কিছু। কুল খাচ্ছিলুম, কমদাদা চাইল, আমি দেই নি, তাই মারবে। নিজে যে আজ দুপুরে এতগুলো কুল পেড়ে নুন লঙ্কা দিয়ে খাচ্ছিল, আমি চাইলুম—তা একটা দিলে না। আমি কেন দেব আমার কুল?"

কন্যার বুদ্ধির পরিচয় পাইয়া মা একটু হাসিলেন, বলিলেন, "কই, কতগুলো কুল তোর, দেখা দেখি।"

কন্যা পিছন দিকে বার কত চাহিয়া সাবধানে কক্ষতল হইতে কুলের পুঁটলি বাহির করিল। সুষমা বলিলেন, "এত কুল খেয়ে মরবি? নিত্যি সর্দ্দি জ্বর তো লেগেই আছে, এগুলো খেলে আর দেখতে হবে না। দিলি নে কেন চারটী তাকে?"

শুভ্রার চোখে একেবারে জল আসিয়া পড়িল, সানুনাসিক স্বরে সে বলিল, "আমিই কি সব একলা খাব নাকি? আজ তোমার একাদশী গেল, কাল তুমি অম্বল করে খাবে বলে এনেছি। আরবারের একাদশীর দিন তুমি বলেছিলে বলেই তো, নইলে আনবার কি দরকার ছিল আমার?"

মায়ের হৃদয় দ্রব হইয়া গেল; অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া চকিতে চোখের জল মুঁছিয়া শান্তকণ্ঠে বলিলেন, "তা বেশ করেছিস মা, সত্যিই আমি খেতে চেয়েছিলুম। তুই যে আমার সে কথা ভুলিস নি, তাই দেখেই আমি আশ্চর্য্য হচ্ছি। একটু দাঁড়া, আমি চট করে কাপড়খানা কেচে নেই।"

তিনি জলে নামিয়া গেলেন। কুলের পুঁটলিটী ক্রোড়ে লইয়া শুভ্রা সেখানে বালুকারাশির উপর বসিয়া রহিল। মা নীরবে কাপড় কাচিতে লাগিলেন, আর সে আপনার মনে বকিয়া যাইতেছিল।

অনেকক্ষণ চাঁদ, আকাশ, নদীর জল লইয়া বাজে বকিয়া হটাৎ সে জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা মা, সুনিদিদি বলছিল আমি নাকি বিধবা, সত্যি কি না জিজ্ঞাসা করতে বলেছে তোমায়। আমি খুব ঝগড়া করেছিলুম, কিন্তু সুনিদিদির মা ও-ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বললে, আমি বিধবা। সত্যি নাকি মা?"

এতদিন এই সত্যটাকে কন্যার কাছে লুকাইয়া রাখিয়াও আজ তাহা অতর্কিত একটী আঘাতে বাহির হইয়া যাইতে দেখিয়া সুষমা যেন কেমন থতমত খাইয়া গেলেন; তথাপি সে ভাবটা সামলাইয়া লইয়া বলিলেন, "সনদা একথা বলেছে? কি বললে সে?"

শুভ্রার এলোচুলের খোঁপা খুলিয়া গিয়াছিল, বাতাসে চুলগুলা উড়িয়া তাহার মুখে চোখে পড়িয়া তাহাকে বড় ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিতেছিল, সে কুল কোলে ফেলিয়া দুই হাতে যেমন-তেমন করিয়া চুলগুলা জড়াইতে জড়াইতে বলিল, "সুনিদিদি আর তার মা তোমায় কত কথা বলছিল, সব কি আমার মনে আছে? হ্যাঁ মা, সত্যি আমি বিধবা নাকি? তা যদি হই, তাহ'লে আমার হাতে চুড়ি আছে কেন, তোমার মতন একাদশী করিনে কেন?"

বেদনায় মায়ের হৃদয় টনটন করিতেছিল, হৃদয় ফাটিয়া একটী মাত্র শব্দ বাহির হইয়া পড়িল—ঠিক! সেটা ঠিক দীর্ঘনিশ্বাসের মতই শুনাইল। একবার আকাশের পানে চাহিয়া তখনই চোখ ফিরাইয়া তিনি বালিকা কন্যার মুখ পানে চাহিলেন। সত্য চাপা পড়িয়া গেল, রুদ্ধকণ্ঠে তিনি বলিলেন, "তুই ওদের কথা শুনিস কেন শুভ্রা, ওরা সব অমনি করে মিছে কথা বলে। তোর এখনও বিয়েই হয়নি। তোকে যে হাজার বার বলি ওদের বাড়ী যাসনে, কেন আবার গেছ্‌লি? তুই যদি সত্যি বিধবা হতিস, তা হ'লে তোকেও তো আমার মত থান পরতে হ'ত, একাদশী করতে হ'ত। ও সব কথা শুনিসনে, এখন বাড়ী চল, রাত হয়ে গেল।"

মায়ের পিছনে পিছনে চলিতে চলিতে শুভ্রা বলিল, "আমি কিন্তু আজ খুব ঝগড়া করেছি মা। কাল আরও বেশী করে ঝগড়া করব, কেন ওরা মিথ্যে করে যা নয় তাই বলবে?"

মা একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "ঝগড়া করবার কি দরকার মা? ওরা যা খুসি তাই বলুক গে, তুমি কোনও কথা কাণে তুলো না। তোমায় বারণ করছি ওদের বাড়ী যেয়ো না।"

শুভ্রা মায়ের কাছে সরিয়া আসিয়া বলিল, "আর যাব না মা।"

(২)

হৃদয় দত্ত এককালে বেশ সঙ্গতিপন্ন লোক ছিলেন। কলিকাতায় কোনও আফিসে কাজ করিতেন, স্ত্রীর গাত্র-ভরা অলঙ্কার দিয়াছিলেন, পিতৃপিতামহের বাড়ীখানার সংস্কার ও আরও দু একখানা গৃহও নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

কয়েক বৎসর এমনি ধুমধামে কাটানোর পর হটাৎ

একদিন তাঁহার নামে তহবীল-তসরূপের দাবী দণ্ডায়মান হইল, চাকরী গেল, জেল হইতে রক্ষা পাইবার জন্য মোকর্দ্দমার খরচ চালাইতে তাঁহার স্ত্রীর গায়ের সব অলঙ্কার গেল, বাগান পুকুর গেল, দুখানি মাত্র ঘর বাদে আর সব ঘর গেল, তৈজস পত্রাদিও গেল। সর্ব্বস্ব এই যজ্ঞে আহুতি দিয়া হৃদয় দত্ত অব্যাহতি পাইলেন, কিন্তু এক বৎসরের মধ্যেই স্ত্রী, কন্যা ও ভগিনীকে অপার দুঃখ-সাগরে ভাসাইয়া দিয়া অনন্ত-পথের যাত্রী হইলেন।

সুষমা বড় শান্ত প্রকৃতির ছিলেন, তাঁহাকে সহজে বিচলিত করিতে পারা যাইত না। শোক দুঃখের অবিশ্রান্ত ঢেউগুলা তিনি এমন প্রশান্ত ভাবে গ্রহণ করিতেছিলেন, যেন চিরকালই এই ঢেউগুলা এমনই করিয়া আসিয়া তাঁহাকে আঘাত করিয়া কঠিন করিয়া দিয়াছে। তিনি কিছুতেই ভাঙ্গিয়া পড়েন নাই, ভগবানের আদেশরূপে সব আঘাতই অসীম ধৈর্য্যের সহিত গ্রহণ করিয়াছিলেন।

কিন্তু ননদিনী সুভা সে প্রকৃতির মেয়ে ছিলেন না। তিনি অল্পেতেই আত্মহারা হইয়া পড়িতেন, এবং চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া কাটিয়া সারা পাড়াখানা তোলপাড় করিয়া তুলিতেন। সুষমার সহিত তাঁহার মিল কখনও হয় নাই। সুষমা যাহার পক্ষপাতিনী, তিনি ঠিক তাহার বিরুদ্ধে কাজ করিতে ভালবাসিতেন। সুষমাকে লোকের কাছে অপদস্থ করিবার ইচ্ছাটা তাঁহার কিছু প্রবল ছিল, কেন না সব সময়ে তিনি ভ্রাতৃবধূকে আয়ত্তে আনিতে পারিতেন না। তিনি জানিতেন তিনি যাহা করিবেন বা বলিবেন, তাহাই যথার্থ সত্য, আর সবই মিথ্যা। সুষমা ঠিক এটা বুঝিতে পারিতেন না বলিয়াই তাঁহার অদৃষ্টে অনেক লাঞ্ছনা জুটিত। তাঁহার মতে সুভার যে কথাটী ভাল বোধ হইত, সেইটাই তিনি শুনিয়া যাইতেন, মন্দ যেটা, সেটা কিছুতেই শুনিতে পারিতেন না।

সুষমার অজস্র নিন্দা করিলেও সুভা তাঁহাকে একটু ভালবাসিতেন। সুষমার অসুখ হইলে তাঁহাকে একটু উৎকণ্ঠাকুল দেখা যাইত।

এই বালবিধবার হৃদয়ের সমস্ত স্নেহটুকু উপভোগ করিতে পাইয়াছিল শুভ্রা একা। সুভা তাহাকে নিজে মানুষ করিয়া তুলিয়াছিলেন, তাঁহার সতর্ক দৃষ্টি সর্ব্বদা তাহার উপর নিপতিত থাকিত।

মেয়েটী যখন চতুর্থ বর্ষীয়া, তখনই তাহার বিবাহ হইয়া যায়। সুষমার এ বিবাহে আদৌ মন ছিল না, কেবল মাত্র সুভার জেদেই এ বিবাহ হয়। ছেলেটী সুভার দেবরের পুত্র। লুপ্তপ্রায় শ্বশুরালয়ের সম্পর্কটা ঝালাইয়া লইয়া নূতন করিবার আগ্রহ সুভার মনে জাগিয়া উঠিয়াছিল, সেই জন্য তিনি দ্বাদশ বর্ষীয় দেবর-পুত্রের সহিত চতুর্থ বর্ষীয়া ভ্রাতৃকন্যার বিবাহ দিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন।

সুষমার কোনও আপত্তি টিকিল না, একদিন শুভ্রার বিবাহ সমাপ্ত হইয়া গেল। বিবাহের দশ বার দিন মাত্র পরে বালক স্বামী ইনফ্লুয়েঞ্জায় ইহলোক ত্যাগ করিলে, শুভ্রার নাম বাঙ্গলার বিধবা শ্রেণীর মধ্যে পরিগণিত হইল।

ইহাতে সুষমার যে কি অবস্থা হইল তাহা অবর্ণনীয়; আর সুভার কথাও বেশী বলা বাহুল্য।

কিন্তু যাহার বিবাহ হইল ও বিধবা হইল—সে কিছুই জানিল না। দু' বছর যাইতে না যাইতে সে বিবাহের সেই উৎসাহময় রাত্রির কথাটাও একেবারে ভুলিয়া গেল। যেমন অন্য মেয়েরা খেলা করে, বেড়ায়, আনন্দ করে, সেও তেমনি হাসিয়া খেলিয়া আনন্দ করিয়া বেড়াইতে লাগিল।

তাহার খেলার প্রধান সাথী ছিল কমনীয়। কমনীয় গ্রামের জমীদার রামনাথ রায়ের ভাগিনেয়। শৈশবে পিতৃহীন হইয়া সে মায়ের সহিত মাতুলালয়ে আসিয়াছিল ও সেই পর্য্যন্ত এখানেই থাকিয়া গিয়াছিল।

ছেলেটী ওস্তাদ বদমাইস ছিল। এমন কোনও কাজই ছিল না যাহা করিতে পশ্চাৎপদ হইত। গ্রামের অতি বড় দুর্দ্দান্ত ছেলেও ইহার নিকট বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিল। নিত্যই জমীদার বাবুর কাছে ইহার নামে অনেক নালিশ উপস্থিত হইত, সকলগুলির উপযুক্ত দণ্ড দিতে গেলে তাহাকে আর আস্ত থাকিতে হইত না, সেইজন্য সে নেহাৎ বড় অপরাধগুলির জন্যই দণ্ডিত হইত, অপরগুলিতে কাণমলা নাকে খত দিয়া খালাস পাইত।

একবার যাহারা নালিশ করিয়াছে, তাহারা আর নালিশ করিতে সাহস পাইত না, কারণ সে এমন ভাবে অত্যাচার করিত যে, স্বয়ং জমীদারবাবুও ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িতেন, সে যেন ক্ষুদ্র একটী নবাব, সে যাহা খুসি তাহাই করিবে, তাহার উপর যে কথা বলিতে আসিবে তাহারই সে সর্ব্বনাশ করিবে।

তাহার ব্যাঘ্র প্রকৃতির পরিচয় গ্রামের সকলেই পাইয়াছিল, সেই জন্য এখন তাহাকে কেহ বড় একটা কিছু বলিত না। সে নিজের মনে এখন নিরুপদ্রব অত্যাচার করিয়া বেড়াইত, কেহ তাহাকে বারণও করিত না। এ জন্যও তাহার মনে শাস্তি ছিল না, সে চায় হিংসাব তাড়নায় কাজ করিতে, অহিংস নীতিতে পরিচালিত হওয়া তাহার পক্ষে বেজায় রকম কষ্টকর ছিল।

রামনাথ বাবুর একটীমাত্র পুত্র তুষার, খুব ঠাণ্ডা প্রকৃতির ছিল, এবং এই দুর্দ্দান্ত বালকটীকে সে খুব ভাল বাসিত। এই দুর্দ্দান্ত বালকও আর কাহারও কাছে বশ্যতা স্বীকার করিত না, কেবল তুষারের কাছে সে অবনত হইয়া থাকিত। তুষারের কথামত সে ভবিষ্যতে খুব শান্ত হইবে বলিয়া কতবার প্রতিজ্ঞাও করিয়াছে, কিন্তু কখনও তাহার সে প্রতিজ্ঞা স্থায়ী হয় নাই।

তুষার কলিকাতায় মামার বাড়ী থাকিয়া লেখাপড়া করিত। ছুটির সময় ব্যতীত সে বাড়ী আসিতে পাইত না। যে সময় সে বাড়ী আসিত, সেই সময় কমনীয় দুর্দ্দান্ত প্রকৃতি ত্যাগ করিয়া শান্ত শিষ্ট বালকের মত তাহার সঙ্গে ঘুরিত। তখন তাহাকে দেখিয়া কেহই তাহার দুর্দ্দান্ত চরিত্র হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিত না। কমনীয়ের মা, তুষার বাড়ী আসিলে নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিতেন। যদিও তুষার সপ্তদশবর্ষীয় কিশোর, এবং কমনীয় হইতে মাত্র দুই বৎসরের বড়, তথাপি তাহার প্রভাব বড় বেশী রকমের ছিল।

শুভ্রা ছিল এই ছেলেটীর একটী অনুগত ভক্ত। কমদাদা যাহা বলিবে তাহা তাহার নিকট বেদবাক্য, কমদাদা যাহা করিবে, তাহা তাহার চোখে অনিন্দ্যনীয়। কমদাদার নিকট প্রহার সহ্য করিতেও হইত, দৈবাৎ সে যদি আদরের সুরে একটা কথা বলিত, শুভ্রা তাহা সৌভাগ্য জ্ঞান করিত।

কমনীয় এই ভক্তটীর উপর অবধি কর্ত্তৃত্ব চালাইয়া লইত। শুভ্রা নহিলে তাহার একদণ্ডও চলিত না, অথচ বেশী উৎপীড়নও চলিত তাহার উপরে।

শুভ্রার মায়েরও এজন্য কথা শুনিতে হইত মন্দ নয়। শুভ্রা যে সেই বদমাইস ছেলেটার সঙ্গে মিশিয়া তাহার কার্য্যের সহায়তা করে, ইহা উৎপীড়িত গ্রামবাসীর ক্রোধ উৎপাদন করিত এবং তাহারা শুভ্রার মাকে পিসীকে বেশ দশ কথা শুনাইয়া দিত। সুভা গায়ের ঝাল ঝাড়িতেন নিতান্ত ভালমানুষ সুষমার উপর দিয়া। অথচ শুভ্রাকে তিনি নিজেও মারিতেন না, তাহার মাতাকেও মারিতে দিতেন না। লোকে কোনও অভিযোগ করিতে আসিলে তিনি সব দোষ সুষমার স্কন্ধে চাপাইয়া দিতেন, কেবলমাত্র মায়ের দোষেই যে সে এমনই বহিয়া গিয়াছে, তাহা বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিতেন। সুষমা নীরবে তাঁহার সেই কঠোর কথাগুলা শুনিয়া যাইতেন, একটীও উত্তর করিতেন না। তিনি জানিতেন উত্তর করিলেই এখনি বিবাদ বাধিয়া যাইবে, সুভা কাঁদিয়া পাড়া মাথায় করিয়া তুলিতেন।

দশমবর্ষীয়া বালিকা শুভ্রা ঝগড়া বিদ্যায় অপরিসীম অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিল। লোকে একটা কথা বলিলে সে দশটা কথা শুনাইয়া দিয়া আসিত, শুধু এই গুণটির জন্তই সে কমদাদার প্রিয়পাত্রী হইয়াছিল। অত্যন্ত আশ্চর্য্যের কথা এই যে, অমন যে মুখরা চপলা বালিকা, কমনীয়ের কাছে একেবারে মুক হইয়া যাইত। কমনীয় শত অত্যাচার, উৎপীড়ন করিলেও সে তাহা প্রকাশ করিত না।

প্রতিবেশিনী কন্যা ইতি তাহাকে ঈর্ষা করিত। সে কমদাদার প্রিয়পাত্রী হইবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিল, কমদাদাও তাহার গৃহের ভাণ্ডার হইতে চুরি দ্বারা আনীত নানাপ্রকার আচার, আমসত্ত্ব প্রভৃতি পরিতৃপ্ত ভাবে খাইয়াছে, কিন্তু তাহা শুভ্রার দারুণ বিরক্তি উৎপাদন করিয়াছে। তাহার কমদাদাকে যে ইতি লইবে, এ কল্পনাও তাহার অসহ্য ছিল।

ইতি শুভ্রার উপর হাড়ে হাড়ে চটিয়াছিল। সে শুভ্রাকে

প্রহার ও গালি খাওয়াইবার মতলবে ঘুরিত, অনেকবার শুভ্রা তাহার জন্য লাঞ্ছিত হইয়াছে বড় কম নয়। সময় সময় কমনীয়ও ইহাতে জড়াইয়া পড়িয়া লাঞ্ছিত হইত। ইতি প্রাণপণে তাহাকে বাঁচাইবার চেষ্টায় ফিরিত, কিন্তু তাহার দ্বারা দুই একবার লাঞ্ছিত হইয়া কমনীয় তাহাকে একেবারেই দেখিতে পারিত না।

(৩)

জ্যৈষ্ঠ মাসের বন্ধে তুষার বাড়ী আসিয়াছে। কমনীয় এই কয়টা দিন নিজের দুষ্টামী একটু সংযত করিয়া ফেলিয়াছে।

দুপুর বেলা দুই ভাইয়ে উপরের ঘরে বসিয়া গল্প করিতেছিল। তুষার কলিকাতার আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য গল্প বলিতেছিল, আর কমনীয় হাঁ করিয়া সেই গল্পগুলা গিলিতেছিল। তুষার এখন আই-এ পড়িতেছিল, আর কমনীয় গ্রাম্য স্কুলের ফোর্থ ক্লাসে উঠিয়াছিল।

কবে তুষার চলন্ত ট্রাম হইতে লাফাইয়া পড়িয়াছিল, ট্যাক্সিতে উঠিয়া মনুমেণ্ট দেখিতে গিয়াছিল, এরোপ্লেনে উঠিয়া সারা কলিকাতাটা বেড়াইয়াছিল, ইত্যাদি সে কত রকমের গল্প। আর ম্যাডানের বায়স্কোপ, হিপো সার্কাস, মনমোহন থিয়েটার ইত্যাদি কত কি সে দেখিয়া আসিয়াছে, সেই সব গল্প শুনিতে শুনিতে কমনীয়ের দুই চোখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিতেছিল। সে পড়িয়া আছে এই পল্লীগ্রামে, সে চেনে কেবল পল্লীর খোলা মাঠ, পল্লীর বনঘেরা অপরিচ্ছন্ন পথ, পুষ্করিণী আর নদীটি। আর তাহার দাদা কলিকাতার সব দেখিয়া আসিল!

নিজের দীনতাতে সে নিজেই ভারি সঙ্কুচিত হইয়া উঠিতেছিল। একবার জিজ্ঞাসা করিল, "ট্রাম কি রকমের দাদা?"

তুষার মহা উৎসাহের সহিত ট্রামের বর্ণনা আরম্ভ করিল, সে যেন বাস্তবিক একখানি ছবি তৈয়ার করিয়া কমনীয়ের সামনে ধরিয়া দিল।

অনেকক্ষণ বকিয়া শ্রান্ত হইয়া তুষার বলিল, "আমার বড় ঘুম আসছে, তুই ততক্ষণ এই বইখানা পড়গে যা, আমি খানিক ঘুমিয়ে নেই। পড়ে দেখ কি চমৎকার বই। বই পড়তে জানিসনে এমনি বোকা তুই। কেবল বজ্জাতি করে বেড়াবি, চাষা গাঁয়ের ছেলেদের মতন। বই না পড়তে জানলে সহুরে হ'তে পারবি নে কখনও। আজ কাল দেখতে পাবি, সব ছেলের পকেটে, বুড়োর হাতে নভেল একখানা আছেই। নভেল যে পড়ে না, সে আবার মানুষ, ছ্যাঃ—"

একখানা পাখা লইয়া সটান সে শুইয়া পড়িল। তাহার এই ধিক্কারটা কমনীয়ের বুকে বড় বেশী রকম বাজিল, সে সহুরে মানুষ হইবার জন্য বইখানা বগলে লইয়া উঠিয়া পড়িল।

তাহার নিভৃত স্থান দরকার, যেহেতু আজ সে মন দিয়া নভেল পড়িবে। বাড়ীতে নির্জ্জন স্থান পাওয়া দুরূহ, কাজেই সে বই লইয়া একেবারে বাগানে গিয়া পড়িল। আমগাছের ছায়া চারিদিকে, মাঝে মাঝে গাছের ঘন পাতা ভেদ করিয়া সূর্য্যকিরণ আসিয়া পড়িয়াছে। আম বাগানের নীচে দিয়া শুষ্ককায়া গঙ্গা বহিয়া যাইতেছে। গাছের ঝোপে ঠাণ্ডায় বসিয়া অনেক পাখী নানাপ্রকার কলরবে বাগানখানি ভরাইয়া রাখিয়াছে।

বসিবার জন্য আমবাগানের মাঝামাঝি খানিকটা জায়গা বাঁধাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। একটা সুপক্ক আম তাহার উপর পড়িয়াছিল। অত্যন্ত অন্যমনস্ক ভাবে সেই আমটা তুলিয়া লইয়া তাহার আগার দিকে একটা ছোট ছিদ্র করিয়া চুষিয়া সহজে রস টানিতে টানিতে কমনীয় সেখানেই বসিয়া পড়িল। বইখানা কোলের উপর রাখিয়া অনাবশ্যক পাতাগুলা উল্টাইতে লাগিল। পাঠ্যপুস্তকের সঙ্গে সম্পর্ক তাহার খুবই কম, যেটুকু পড়ে তাহা কেবল মামার মাথা কিনিয়া দিবার জন্যই মাত্র। আজ যে এই বইখানা পড়িবে, সে ইচ্ছা তাহার মনে বিলক্ষণ থাকিলেও সে পড়িতে পারিতেছিল না।

মনটা নেহাৎ উদাস হইয়া গিয়াছিল, মনে জাগিতেছিল কলিকাতার কথা। গতবারে পৌষমাসে যখন তুষার আসিয়াছিল, সে তাহার সহিত কলিকাতা যাইবার জন্য খুব কাঁদাকাটা করিয়াছিল, কিন্তু কঠিন হৃদয় মামা কিছুতেই সে অনুমতি দেন নাই। পলাইয়া যে যাইবে, তাহার টাকা দরকার, অথচ তাহার একটা পয়সাও নাই।

বইখানা অনাদরে কোলের উপর পড়িয়া রহিল, সে আম চুষিতে চুষিতে নানা ভাবনায় ডুবিয়া গেল। চিন্তাটা বোধ হয় আজই প্রথম খুব বেশী, সেইজন্য তাহা কিছু মরিয়াত্মক-গোছের হইয়াছিল।

পিছন দিকে পা টিপিয়া টিপিয়া ইতি আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার হাতে একটা ঠোঙ্গায় নানা প্রকারের আচার। মা রৌদ্রে দিয়াছিলেন, সে চুরি করিয়া লুব্ধ কমদাদার জন্য আনিয়াছে।

কমদাদার কোলে বই দেখিয়া সে একেবারে আশ্চর্য্য হইয়া গেল, কারণ একমাত্র সকাল এক ঘণ্টা ও রাত্রি এক ঘণ্টা মামার সামনে বইয়ের সহিত তাহার পরিচয় হইত। বিস্ময়টা সে দমন করিতে পারিল না, তাই বলিয়া উঠিল, "অ্যাঁ কমদা, তুমি—না—ওকি—"

কমনীয় অস্বাভাবিক চমকাইয়া উঠিল, তাহার হাতের রসশূন্য শুধু খোসা ও আঁটিযুক্ত আমটা পড়িয়া গেল। সে পিছন না ফিরিয়া, হাতখানা চট্ করিয়া কাপড়ে মুছিয়া ফেলিয়া অত্যন্ত গম্ভীর ভাবে বই খুলিয়া তাহাতে চোখ দিল।

ইতি ভাবগতিক দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া রহিল, প্রথমটা কথা কহিতেই পারিল না। এদিকে কমনীয় চটপট খান তিনেক পাতা এক নিশ্বাসে পড়িয়া ফেলিল। সাহসে ভর করিয়া ইতি একবার গোঙানোসুরে ডাকিল "কমদা"।

কমনীয় গম্ভীর মুখে উত্তর করিল, "বিরক্ত করিসনে ইতি, মার খেয়ে মরবি এখনি, দেখছিসনে বই পড়ছি; যা পালা এখান থেকে।"

ইতি শঙ্কিত হইয়া গেল। আচারগুলি এখন সে করিবে কি? বাড়ী লইয়া গেলে প্রহার যে অবশ্যম্ভাবী, তাহাতে তিলমাত্র সন্দেহ নাই। ইতি প্রায় কাঁদ কাঁদ ভাবে বলিল, "এই আচার এনেছিলুম তোমার জন্যে।"

আচার—নামটা শুনিয়া লুব্ধ বালকের জিহ্বাগ্রে জল আসিয়া পড়িল, সে একবার মুখটা নাড়িয়া লইল, কিন্তু হালকা হইতে পারিল না; তেমনই গম্ভীর মুখেই বলিল, "আচার; আচ্ছা থাচ্ছি। নিয়ে আয়, দেখি কয় রকমের আচার এনেছিস্।"

ইতি খুব সহজ একটা নিশ্বাস ফেলিয়া সামনে আসিয়া বসিল, খুব বিনীতভাবে বলিল, "মা এখন মাত্র তিন রকমের আচার দিয়েছে, বেশী দিতে পারে নি তাই—"

প্রচণ্ড একটা তাড়া দিয়া কমনীয় বলিয়া উঠিল, "বেশী বকিস্‌নে ইতি, দেখছিস্ নে বই পড়ছি এখন; আমি হাত বাড়াব আর তুই আমার হাতে একটু একটু করে দিবি—বুঝেছিস্ তো?"

ইতি সভয়ে তাহাই স্বীকার করিল। সে অবিশ্রান্ত আচার দিতে লাগিল আর কমনীয় অবিশ্রান্ত মুখ চালাইতে চালাইতে বই পড়িতে লাগিল। আশ্চর্য্যের কথা এই যে, সেই টক আচারগুলা মুখে দিয়া সে একটুও মুখ বিকৃতি করিল না। ইতি কমদাদার এই আশ্চর্য্য শক্তি দেখিয়া মোহিত হইয়া গিয়াছিল, এবং মনে মনে কমদাদার প্রশংসা করিতেছিল।

আচার যখন ফুরাইয়া আসিল, তখন কমনীয় আবার হাত পাতিতে ইতি সভয়ে মৃদুকণ্ঠে বলিল, "আর তো নেই কমদা—"

কমনীয় বই হইতে মুখ তুলিয়া আচারের শূন্য ঠোঙার পানে চাহিল,—"আর নেই? আচ্ছা, কাল আবার এমনি সময়ে খুব বেশী করে আন্‌বি, বুঝেছিস্? এখন তোর আঁচলখানা দে, হাতটা মুছি। আর তুই আমার পিঠের ঘামাচিগুলো মেরে দে খুব ভাল করে, যেন একটু লাগে না।"

মহানন্দে ইতি তাহার পরিচর্য্যা করিতে বসিল। আজ যে কমদার সেবা করিবার অধিকারিণী হইয়াছে, এ আনন্দ সে আর চাপিয়া রাখিতে পারিতেছিল না।

ঠিক এমনি সময়ে তাহার সুখশত্রু শুভ্রা কোথা হইতে ঝড়ের মত বেগে আসিয়া পড়িল। ইতিকে যে কমদাদার সেবাকার্য্যে নিযুক্তা দেখিবে, তাহা সে মোটেই আশা করে নাই। আজ সে খুব ভাল করিয়া কমদার জন্য আমের আচার তৈয়ারী করিয়া আনিয়াছে, মাছ ধরিবার জন্য ময়দা মাখিয়া আনিয়াছে। কমদা যে এরূপ বিশ্বাসঘাতকতা করিবে তাহা সে স্বপ্নেও ভাবে নাই। সে ব্যাঘ্রীর মত খানিকটা ইতির পানে চাহিয়া রহিল। ক্রমে তাহার

চোখের সে ভীষণ ভাব পরিবর্ত্তিত হইয়া আসিল, আয়ত চোখ দুটি জলে ভরিয়া উঠিল। উচ্ছ্বসিত হইয়া কাঁদিয়া উঠিয়া সে আমের আচার ও ময়দা মাখা ইতি ও কমনীয়ের গায়ে ফেলিয়া দিয়া দ্রুতপদে ফিরিয়া চলিল।

সঙ্কুচিত হইয়া ইতি হাত সরাইয়া লইল, বিস্মিত হইয়া কমনীয় জিজ্ঞাসা করিল, "শুভ্রা কেঁদে পালাল কেন রে ইতি?"

ইতি থামিয়া থামিয়া বলিল, "আমি তোমার ঘামাছি মেরে দিচ্ছি কি না, তাই ওর রাগ হয়েছে।"

কমনীয় একটু হাসিল, তখনি গম্ভীর হইয়া বলিল, "যা দেখি, ওকে ফিরিয়ে নিয়ে যায়। বলগে যা আমি ডাকছি।"

ইতি শুভ্রাকে ডাকিতে ডাকিতে ছুটিল, কিন্তু সে তাহার নিকটবর্ত্তিনী হইবামাত্র শুভ্রা ব্যাঘ্রীর মত তাহার ঘাড়ে লাফাইয়া পড়িয়া তাহাকে আঁচড়াইয়া কামড়াইয়া মারিয়া মাটিতে ফেলিয়া দিল, তাহার পর কাঁদিতে কাঁদিতে চলিয়া গেল।

শান্তপ্রকৃতি ইতি পড়িয়া কেবল মার খাইল। সে বরাবর ঝগড়া করিতে পারে না, কেহ মারিলে উল্টিয়া মারিতে পারে না। খুব নিঃশব্দে সে কাঁদিয়া ফেলিল।

কমনীয় নিকটে আসিয়া তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া তুলিয়া করুণ কণ্ঠে বলিল, "বড্ড লেগেছে নাকি রে ইতি? আহা, আমিই তোকে মার খাওয়ালুম। ও বজ্জাত মেয়ের সঙ্গে কি তুই পারিস? ওর সঙ্গে আর কখ্‌খনো আমি খেলব না, তুইও খেলিসনে। কাঁদিসনে, আয়, তোকে আমার সেই রবারের পুতুলটা দেবখন।"

কমনীয়ের নিকট হইতে তাহার বড় আদরের রবারের পুতুলটা উপহার পাইয়া ইতি প্রহারের ব্যথা ভুলিয়া গেল। নাচিতে নাচিতে বাড়ী ফিরিয়া যাইবার সময় পথে শুভ্রাকে দেখিতে পাইয়া সে পুতুলটা দেখাইয়া—কমদা যে একেবারেই তাহাকে এটা দিয়া দিয়াছে, তাহা সগৌরবে বলিয়া—সে বাড়ী চলিয়া গেল। শুভ্রা হিংসায় জ্বলিয়া মরিতে লাগিল। ক্রমশঃ।

আঁখি।

[শ্রীভবতারণ সরকার বি-এ]

আজি এ বরষা রাতে,
ঝর ঝর বারিপাতে,
নিভৃত-নিশীথে জাগি'
ভাবি সেই আঁখি রে, কাল দু'টী আঁখি!

হৃদয়ের কোণে কোণে,
সে যেন গো সঙ্গোপনে,
আঁকিয়া দিয়াছে সেই
স্মৃতিকণা মাখি রে, স্মৃতিকণা মাখি।

একদিন কোথা হ'তে,
আসিয়া বিজন পথে,
দেহ-মন-প্রাণ মোর
সকল(ই) লইলে কাড়ি, কি রেখেছ বাকী?

ঐ আঁখি ছল ছলে,
ব'লে যায় কত ছলে,
সোহাগে বা অভিমানে
হৃদয় দিয়াছে পায়, হৃদয়েতে থাকি।

প্রণয়-কুসুম-হারে,
সাজায়ে আদরে তারে,
সাধের প্রতিমাখানি
দিবানিশি প্রীতিভরে, বুকে ধ'রে রাখি;

শয়নে বা জাগরণে,
তাই শুধু পড়ে মনে,
সজল জলদনিভ
সেই দু'টী আঁখি রে, কাল দু'টী আঁখি।

২০শ ভাগ] { শ্রাবণ, ১৩৩০। } [৬ষ্ঠ সংখ্যা

গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী।

(পূর্ব্বানুবৃত্ত)

[শ্রীপ্রিয়লাল দাস এম-এ, বি-এল]

যে সকল প্রাচীনতর বাঙ্গালা কাব্যে উলাগ্রাম গঙ্গার তীরে অবস্থিত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, সেই কাব্যগুলি পাঠ করিলে বঙ্গদেশে ভাগীরথীর উভয় তীরস্থ নানা প্রাচীন স্থানের সংবাদ পাওয়া যায়। বাস্তবিক, গঙ্গার প্রাকৃতিক ইতিহাসের সহিত বঙ্গদেশ সংক্রান্ত জ্ঞাতব্য প্রায় সকল বিষয়েরই একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। ধর্ম্ম-বিপ্লব, রাষ্ট্রবিপ্লব, বাণিজ্যের উন্নতি অবনতি, প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সভ্যতার সংঘর্ষ প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ের তথ্য বঙ্গদেশ-প্রবাহিনী ভাগীরথীর তীরদেশে অবস্থিত প্রাচীন গ্রামগুলির ইতিহাসের সহিত সংশ্লিষ্ট। "মনসা" ও "মনসার ভাসান" নামক দুইখানি কাব্যে কবি বিপ্রদাস চাঁদ সদাগরের জল-যাত্রা বর্ণন করিয়া ভাগীরথীর উভয় তীরস্থ যে সকল গ্রামের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে উলার নাম নাই, কিন্তু "গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী"তে কবি দুর্গাপ্রসাদ অপর যে সকল স্থানের উল্লেখ করিয়াছেন তাহাদের মধ্যে অনেকগুলির নাম পাওয়া যায়। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটির অধিবেশনে "হুগলী নদীর তীরদেশ" (The Banks of the River Hugli) শীর্ষক যে প্রবন্ধটি পাঠ করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি বলিয়াছেন যে কবি বিপ্রদাস ১৪৯১ খৃষ্টাব্দে উক্ত কাব্য দুইখানি রচনা করিয়াছিলেন। (৭) "বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে" কবি বিপ্রদাসের নাম নাই। উইলসন সাহেব বঙ্গদেশে ইংরাজের আগমনের যে বিবরণ লিখিয়াছেন, তাহাতে কবি বিপ্রদাসের উক্ত কাব্যের উল্লেখ ও শাস্ত্রী মহাশয়ের ইংরাজি অনুবাদের কতকটা অংশ আছে। অন্যান্য কয়েকখানি বঙ্গদেশ সংক্রান্ত ইংরাজি গ্রন্থে ও ডিষ্ট্রীক্ট গেজেটিয়ারে এই প্রাচীন কবি ও তাঁহার রচিত উক্ত কাব্যের কথা লিপিবদ্ধ হইয়াছে। কবি বিপ্রদাসের কাব্য রচিত হইবার পূর্ব্বে কৃত্তিবাসের রামায়ণ রচিত হইয়াছিল। এই রামায়ণে ভাগীরথীর গতিপথের বর্ণনায় উলার নাম নাই, কিন্তু অন্যান্য কয়েকটি স্থানের নাম আছে। কবি দুর্গাপ্রসাদ কর্ত্তৃক রচিত "গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী"তে ভাগীরথীর যে ইতিহাস লিখিত হইয়াছে তাহা বুঝিতে হইলে এই কবির পূর্ব্ব যুগে লিখিত উক্ত ইতিহাসের কথা জানা বিশেষ দরকার। এতদ্দ্বারা আলোচ্য কাব্যের রচনাকাল নির্ণয় করাও অনেকটা সহজ হইতে পারে। (ক) কৃত্তিবাসের রামায়ণ পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে রচিত হইয়াছিল।

(৭) Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, 1892, page 193.

অজয় নদী ও ভাগীরথীর সঙ্গমস্থল পশ্চাতে রাখিয়া ভগীরথ চলিলেন। "অজয় গঙ্গার জল হইল দর্শন। শঙ্খধ্বনি করেন যতেক দেবগণ॥" ইহার পর নিম্নলিখিত স্থানগুলির উল্লেখ আছে।

(ক) কৃত্তিবাস।

ভাগীরথীর পশ্চিম তীর	ভাগীরথীর পূর্ব্বতীর
ইন্দ্রেশ্বর ঘাট	
মেড়াতলা	
সপ্তগ্রাম	নবদ্বীপ
আকনা	
মাহেশ	বিহারাদের ঘাট

ইহার পর কৃত্তিবাসের রামায়ণে অপর কোনও স্থানের নাম পাওয়া যায় না। ভাগীরথী খানিক দূর অগ্রসর হইয়া "যেইখানে আছিল কপিল মহামুনি।" "হইলেন শতমুখী গঙ্গা সেই স্থলে॥" ইহার পর "বংশ মুক্তি হইল দেখিয়া ভগীরথে। গঙ্গাকে প্রণাম করি লাগিল নাচিতে॥ গঙ্গা বলে দেশে যাও রাজার নন্দন। সাগরের সঙ্গে আমি করিগে মিলন॥ মহাতীর্থ হইল সে সাগর সঙ্গম। তাহাতে কতেক পুণ্য কে করে কথন॥ যে গঙ্গাসাগরে নর স্নান দান করে। সর্ব্ব পাপে মুক্ত হয়ে যায় স্বর্গপুরে॥" কৃত্তিবাসের রামায়ণের পর (খ) কবি বিপ্রদাসের "মনসা" ও "মনসার ভাসান" নামক ১৪৯৫ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে রচিত কাব্যে চাঁদ সদাগর গঙ্গার উভয় তীরস্থ যে সকল স্থান দর্শন করিয়াছিলেন তাহাদের নাম পর পর নিম্নে প্রদত্ত হইল। ভাষা-রামায়ণের ন্যায় এই কাব্যেও ভাগীরথী ও অজয় নদীর সঙ্গমস্থল পশ্চাতে রাখিয়া চাঁদ সদাগর যাত্রা করিলেন।

(খ) বিপ্রদাস।

ইন্দ্রঘাট	নবদ্বীপ
	অম্বিকা কালনা
গুপ্তিপাড়া	ফুলিয়া
মৃজাপুর	কুমারহট্ট
ত্রিবেণী	ভাটপাড়া
সাতগাঁ	কাঁকনাড়া
হুগলী	মুলাজোড়
বোরো	গাঁড়ুলিয়া
পাইকপাড়া	ইছাপুর
চাঁপদানি	বাঁকিবাজার
নিমাইতীর্থ	চানক
রামনান	খড়দহ
আকনা	সুকচর
মাহেশ	কোতরং
রিষড়া	কামারহাটি
কোন্নগর	আড়িয়াদহ
বিটোর	ঘুষুড়ি
	চিৎপুর
	কলিকাতা
	ধলন্দা (আলিপুরের নিকট, ২৪ পঃ)

ইহার পর কবি বিপ্রদাসের চাঁদসদাগর আদি-গঙ্গায় প্রবেশ করেন ও কালিঘাট, চুড়াঘাট, জয়াচুলি, ধনস্থান ও বারুইপুর দর্শন করিয়া হুনিয়া নদীতে গিয়া পড়েন। সেখানে ছত্রভোগ ও হাতিয়াগড় দর্শন করিয়া তিনি শতমুখীতে প্রবেশ করেন। শতমুখী দিয়া তিনি চৌমুখীতে প্রবেশ করেন ও তৎপরে সমুদ্রে তাঁহার নৌকা গমন করে। কবি বিপ্রদাসের পর (গ) ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে মাধবাচার্য্য কর্তৃক ১৫৭৯ খৃষ্টাব্দে রচিত "জাগরণ" নামক চণ্ডীকাব্যে ধনপতির উপাখ্যানে গঙ্গার উভয় তীরস্থ অনেক স্থানের নাম পাওয়া যায়। এই নামের তালিকায় কবি যে স্থানের নাম "উলুয়া" বলিয়াছেন, তাহা যে "উলাগ্রাম" তাহাতে সন্দেহ নাই।

(গ) মাধবাচার্য্য।

ইন্দ্রাণী	নবদ্বীপ
আচীনগর	গৌরিয়ার পাঠ
মাহীনগর	কুমারহাট
	উলুয়া
সপ্তগ্রাম	নিমাইদত্তের ঘাট
ত্রিবেণী	চাঁপানগর
	ভূরীশ্বর
	খড়দহ
কোন্নগর	পেঙ্গাটি
	আগড়পাড়া
	ক্ষীরাইতল
	বরাহনগর
	চিৎপুর
	কুচীনান

ইহার পর কালিঘাট, আড়িয়াল, সৈদপুর, ছেপলা, খালিয়া, মদনপুর, মেখলি, হাদিয়াদহ ও মকরার নাম পাওয়া যায়। মাধবাচার্য্যের অব্যবহিত পরে সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভকালে (ঘ) মুকুন্দরাম কর্তৃক রচিত "অভয়ামঙ্গল" নামে চণ্ডীকাব্যে ভাগীরথীর উভয় তীরস্থ গ্রামগুলির নামে ধারাবাহিকতা দৃষ্ট হয়।

(ঘ) মুকুন্দরাম।

ইন্দ্রাণী বা	মেট্যারি
ইন্দ্রঘাট	চণ্ডীগাছা
ভাণ্ডসিংহের ঘাট	খলেনপুরের ঘাট
মীরজাপুর	পূর্ব্বস্থলী
সাম্বুয়া	নবদ্বীপ
গুপ্তিপাড়া	পাড়পুর
	সমুদ্রগড়ি
ত্রিবেণী	শান্তিপুর
সপ্তগ্রাম	উলা
গরিফা	খিসমা
গোন্দলপাড়া	ফুলিয়া
জগদ্দল	বাণপুর

(ঘ) মুকুন্দরাম।

নপাড়া	কোদালের ঘাট
নিমাই তীর্থের ঘাট	ইছাপুর
মাহেশ	খড়দহ
কোন্নগর	কোতরঙ্গ
কুচিনান	চিত্রপুর
সালিখা	কলিকাতা

ইহার পর বালিঘাটা হইয়া ধনপতি আদি-গঙ্গার উপর কালীঘাট দর্শন করেন। তারপর মাইনগর, নাচনগাছা, বারাসত, ছত্রভোগ, অবলিঙ্গ, হাতাগর, মগরা হইয়া তিনি মোহানায় পড়েন। ধনপতির পুত্র শ্রীমন্তও পিতার নৌকার গতিপথ অনুসরণ করিয়াছেন, কেবল কলিকাতার পর "বেতড়েতে উত্তরিল অবসান বেলা।" তাহার পর আর এক খানি নূতন গ্রাম—ধনস্তগ্রাম—ছাড়িয়া বালিঘাটায় পৌছিলেন ও সেখান হইতে কালিঘাট প্রভৃতি স্থান দর্শন করিয়া গঙ্গার মোহানায় পড়িলেন। শ্রীমন্ত মেট্যারির পর বেলনপুরের ঘাটে গিয়াছিলেন, কিন্তু চণ্ডীঘাট খলেনপুরের ঘাট ও পূর্ব্বস্থলী না দেখিয়া তিনি নবদ্বীপে পৌছিয়াছিলেন। পিসমা বা খিছিমার পর মহেশ্বরপুর নামে আর একখানি গ্রামের উল্লেখ শ্রীমন্তের ভ্রমণ বৃত্তান্তে পাওয়া যায়। কবি কঙ্কণের চণ্ডীকাব্য যে সময়ে রচিত হইয়াছিল, ভবানন্দ মজুমদার সে সময়ে প্রতাপাদিত্যের বিরুদ্ধে মানসিংহকে সাহায্য করিতেছিলেন। ভবানন্দের পৌত্র "নবেন্দ্র ভূপতি"র সময়ে (ঙ) যখন দুর্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক "গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী" রচিত হয় সে সময় গঙ্গার উভয় তীরে যে সকল গ্রাম বর্ত্তমান ছিল সেগুলির নাম কবি ভগীরথের গঙ্গা আনয়নের বিবরণে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। পাঠকের আলোচনার সুবিধার জন্য কবির ভাষা উদ্ধৃত করিবার পূর্ব্বে এস্থলে উক্ত স্থানসমূহের নাম পর পর প্রদত্ত হইল।

(ঙ) দুর্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়।

	চুনাখালি
	সয়দাবাজ
কাঁটোয়া	পলাশী
রহাট ইন্দ্রাণী	মাটীয়ারী
পাটুলি	অগ্রদ্বীপ
	নবদ্বীপ
অম্বিকা	শান্তিপুর
গুপ্তিপাড়া	উলা
	চাকদহ
রাণীনগর	কুমারহট্ট
গোঁদলপাড়া	ভাটপাড়া
	মুলাজোড়
ভদ্রেশ্বর	দীর্ঘাঙ্গ
বালি	খড়দহ

ইহার পর আদি-গঙ্গার উপর কালীঘাট, অম্বুলিঙ্গ, ছত্রভোগ ছাড়িয়া সগর সন্তানগণের ভস্ম যেখানে ছিল সেইদিকে ভাগীরথী চলিলেন। ভাগীরথীর উভয় তীরে অবস্থিত গ্রামগুলির উপরোক্ত পাঁচটী তালিকা মিলাইয়া দেখিলে জানা যায় যে, দুর্গাপ্রসাদের জন্মস্থান বা বাসস্থান "উলা" ষোড়শ শতাব্দীর শেষে মাধবাচার্য্যের সময়ে, সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে মুকুন্দরামের যুগে ও সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে কবির নিজের জীবনকালে গঙ্গার

তীরে অবস্থিত ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীতে গঙ্গার পূর্ব্ব তীরস্থ অনেকগুলি গ্রাম যে বসিয়া গিয়াছে তদ্বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই। আমরা আপাততঃ উদাহরণ স্বরূপ "পলাশী"র উল্লেখ করিব। "পলাশী"র উল্লেখ দুর্গাপ্রসাদের কাব্যে সর্ব্বপ্রথম দেখা যায়। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধ হয়। ইহার পর পলাশীর যুদ্ধস্থল হইতে উক্ত নামের গ্রামখানি ধ্বংস হইয়া যায় আর ইতিহাসে বর্ণিত ইহার সুবিখ্যাত আম্রকাননও লোপ পায়। এক্ষণে নূতন "পলাশী গ্রাম" গঙ্গাতীর হইতে ও উক্ত যুদ্ধস্থলের বহুদূরে দক্ষিণে অবস্থিত। তাহা হইলে দুর্গাপ্রসাদ ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে প্রাচীন "পলাশীগ্রামখানিকে" গঙ্গাতীরে অবস্থিত দেখিয়াছিলেন। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, "গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী" ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে রচিত হইয়াছিল। দুর্গাপ্রসাদের উপরোক্ত তালিকায় কলিকাতার নাম নাই। ইহার কারণ ইংরাজগণ দুর্গাপ্রসাদের সময়ে কলিকাতায় দুর্গ নির্ম্মাণ করেন নাই। কলিকাতা তখনও বঙ্গদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে জন্মলাভ করে নাই। ১৬৯৮ খৃষ্টাব্দে ইংরাজেরা সর্ব্বপ্রথম কলিকাতা নামে গ্রামখানির মালিক হইয়াছিলেন। উইলসন সাহেব বলেন যে, এই বৎসর জুলাই মাসে ইংরাজেরা কলিকাতা, সুতানটি ও গোবিন্দপুর নামে তিনখানি গ্রাম খরিদ করিয়াছিলেন। (৩৮) উইলসন সাহেবের মতে ১৬৮৫-১৬৯০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ইংরাজেরা বঙ্গের বাহিরে নানাস্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন এবং এই সময়ে নবাব কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া অবশেষে তাঁহারা বঙ্গদেশে ফিরিয়া আসেন। (In the period looking from 1685 to 1690 the English in Bengal are in a state of flux. They wander from one policy to another policy and from one station to another station. At last after repeated trials, they return to Bengal at the invitation of the Nabob. * * * In the fourth period, which begins from 1690, the settlement thus reached takes definite shape. English trade is established in Bengal partly through the good will of the inhabitants and with the acquiescence of the native government, and partly by the powerful position which the English had acquired). (৮) বাস্তবিক, ১৬৯৮ খৃষ্টাব্দের বহু পূর্ব্বে কলিকাতার অস্তিত্ব কবি বিপ্রদাস স্বীকার করিলেও, এই স্থানটির নাম বাঙ্গালী বণিকগণ ব্যতীত অপর কেহ বিশেষভাবে জানিতেন বলিয়া মনে হয় না।

সেই কারণে, কলিকাতার উল্লেখ আমরা "গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী"তে দেখিতে পাই না। কলিকাতার নাম আলোচ্য কাব্যে নাই বলিয়া যে ইহার অস্তিত্ব এই কাব্য রচনাকালে ছিল না, কিম্বা সেই কারণে এই কাব্য বহু প্রাচীন সময়ে রচিত, এমন কথা আমরা বলি না। গ্রামবিশেষ কোনও নদীর তীরে অবস্থিত বলিয়া কাব্য বিশেষে উক্ত হইলে বুঝিতে হইবে যে, কাব্য-রচয়িতা বিনা কারণে সেই স্থানটির নাম তাঁহার কাব্যে লেখেন নাই। কলিকাতার নাম আমরা সর্ব্বপ্রথমে ১৪৯৫ খৃষ্টাব্দে রচিত বিপ্রদাসের কাব্যে দেখিতে পাই। যে স্থানটি এক সময়ে ভারতের রাজধানী ছিল, তাহার সম্বন্ধে সেইজন্য এস্থলে একটু আলোচনা করা দরকার বলিয়া আমাদের মনে হইতেছে।

বিপ্রদাসের রচিত "মনসা" ও "মনসার ভাসান" নামক কাব্য দুইখানি এ পর্য্যন্ত মুদ্রিত হয় নাই। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী পুঁথি দৃষ্টে স্থির করিয়াছেন যে, এই কাব্য দুইখানি পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে রচিত। উপরে যে পাঁচটি তালিকা প্রদত্ত হইয়াছে, তাহার মধ্যে পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে রচিত কৃত্তিবাসের রামায়ণে কলিকাতার উল্লেখ নাই। কৃত্তিবাসের পর বিপ্রদাস যে সর্ব্বপ্রথম কলিকাতার উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার কারণ এই কবি চাঁদসদাগরের ভ্রমণ বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। বণিকের জল-যাত্রার বিবরণে গঙ্গার উভয় তীরস্থ স্থানগুলির নাম প্রকাশ পাওয়াই স্বাভাবিক বলিয়া মনে হয়। আমরা সেই কারণে সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভকালে রচিত মুকুন্দরামের চণ্ডী-কাব্যেও কলিকাতার নাম দেখিতে পাই।

(৮) Early Annals of the English in Bengal, by C. R. Wilson, (1895).

কিন্তু বিপ্রদাসের পরবর্ত্তী ও মুকুন্দরামের পূর্ব্ববর্ত্তী যুগে রচিত মাধবাচার্য্যের "জাগরণ" নামক কাব্যে কলিকাতার নাম যখন নাই, তখন মনে হইতে পারে যে, হয়ত বিপ্রদাসের উক্ত কাব্য দুইখানি মুকুন্দরামের কিম্বা তাঁহার পরবর্ত্তী যুগে রচিত। বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের যতগুলি প্রচলিত ইতিহাস আছে তাহাতে কেতকা-ক্ষেমানন্দ বা ক্ষেমানন্দ-কেতকাদাসের রচিত "মনসার ভাসান" নামক কাব্য সপ্তদশ শতাব্দীতে রচিত বলিয়া স্থির হইয়াছে। এই কাব্যে চাঁদ-সদাগরের বাণিজ্যের যে বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে তাহা মুকুন্দরামের অনুকরণ বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে। বাস্তবিক, মুকুন্দরামের চণ্ডীকাব্যের ধনপতি ও তৎপুত্র শ্রীমন্ত গঙ্গার তীরে সর্ব্বপ্রথম কলিকাতা নামে প্রাচীন ক্ষুদ্র গ্রামখানিকে দেখিয়াছিলেন, কিম্বা বিপ্রদাসের "মনসার ভাসানের" চাঁদসদাগর সর্ব্বপ্রথম দেখিয়াছিলেন, তৎসম্বন্ধে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইলে কবি বিপ্রদাসের পুঁথি পাঠ করা দরকার। আপাততঃ সাধারণের অগোচর এই পুঁথি সম্বন্ধে শাস্ত্রী মহাশয় যাহা লিখিয়াছেন তাহার উপর নির্ভর করিয়া বলিতে হয় যে, গঙ্গার তীরে ১৪৯১ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার অস্তিত্ব অসম্ভব নহে। মোগল সম্রাট আকবরের সময়ে টোডরমল্ল ১৫৮২ খৃষ্টাব্দে "তুমার জমা" নামে বঙ্গদেশের রাজস্বের যে হিসাব প্রস্তুত করেন, তাহাতে ও "আইন-ই আকবরী"তে বর্ণিত উনিশটি সরকারে বিভক্ত বঙ্গদেশের অন্যতম বিভাগ "সরকার সাতগাঁ"র অধীনে কলিকাতার নাম পাওয়া যায়। ব্লক্ম্যান্ সাহেব বলেন,—"Sarkar Satgaon extended in the south to Hathiagarh below Diamond Harbour. To this Sarkar belonged mahall Kalkatta (Calcutta) which together with twenty other mouzas paid in 1582 a land revenue of Rs. 23905" (১) আকবর বঙ্গের শেষ পাঠান রাজা দাউদের বিরুদ্ধে ১৫৭৫ খৃষ্টাব্দে হুসেন কুলী খাঁ ও টোডর মল্লকে প্রেরণ করেন। দাউদ রাজমহলের পাহাড়ে যখন লুকাইয়া প্রাণরক্ষা করিতেছিলেন, সেই সময়ে তাঁহার মন্ত্রী রাজা বিক্রমাদিত্য টোডর মল্লকে বঙ্গদেশের রাজস্ব সংক্রান্ত হিসাবের কাগজাদি অর্পণ করেন। এই সকল দলিল হইতে যে টোডর মল্ল "তুমার জমা" প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। তাহা হইলে পাঠান রাজত্বের শেষাবস্থায় বঙ্গদেশের রাজস্ব সংক্রান্ত হিসাবের কাগজে যে কলিকাতার নাম ছিল এরূপ অনুমান অসঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। ১৫৭৫ খৃষ্টাব্দের কত বৎসর পূর্ব্বে উক্ত জমাবন্দী কাগজ প্রস্তুত হয়, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে, ১৪৯৫ খৃষ্টাব্দে কবি বিপ্রদাস যদি গঙ্গার তীরে উপরোক্ত (খ)-চিহ্নিত তালিকার গ্রামগুলি দেখিয়া থাকেন, তাঁহা হইলে বলিতে হয় যে, মজাফর সাহের রাজত্ব কালে রাজস্বের হিসাবের কাগজ পত্র ছিল। এই মজাফর সাহের প্রধান মন্ত্রী সুপ্রসিদ্ধ হুসেন সাহ ১৪৯৭ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ বিপ্রদাসের "মনসার ভাসান" কাব্য লিখিত হইবার দুই বৎসর পরে বঙ্গের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। হুসেন সাহ হিন্দু বিদ্বেষী ছিলেন না। তিনি বাঙ্গালা সাহিত্যের উৎসাহদাতা বলিয়া বঙ্গীয় সাহিত্যের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া আছেন। তাঁহার অধীনে অনেক হিন্দু উচ্চ রাজকর্ম্ম করিতেন। হুসেন যেরূপ সুশৃঙ্খলার সহিত রাজ্যশাসন করিতেন, তাহাতে মনে হয় যে, তিনি মজাফর সাহের সময়ে মন্ত্রীর পদে অবস্থিত থাকিয়া রাজস্ব সংক্রান্ত হিসাবের কাগজাদি রক্ষা করিতেন। পাঠান রাজাদের দপ্তরখানায় রক্ষিত জমাবন্দী কাগজ হইতে বিপ্রদাস যে গঙ্গার তীরে অবস্থিত সমসাময়িক গ্রামগুলির নাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, ইহা আমরা বলিতে চাই না, কিন্তু এই সকল কাগজ পত্র দৃষ্টে যে সকল মৌজা ও মহলের খাজনা বৎসর বৎসর আদায় হইত, সেই সকল স্থানের নাম লোকমুখে প্রচারিত হওয়াই সম্ভব। এতদ্ব্যতীত, বাণিজ্য ও তীর্থ-ভ্রমণে বহির্গত হইয়া যাহারা বহুদিবস পরে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করে তাহাদের মুখে কবিরা নানা স্থানের ও নানা বিষয়ের বিবরণ শুনিয়া থাকেন। কবি বিপ্রদাস এইরূপ কোনও সূত্রে যে কলিকাতার কথা শুনিয়াছিলেন, তাহা কল্পনা করা যাইতে পারে।

(১) Geography and History of Bengal by H. Blochmann (1873).

বিপ্রদাস গঙ্গার পশ্চিম তীরে অবস্থিত বাদুড়িয়া নামক স্থানের নিকট বটগ্রামে বাস করিতেন। বাদুড়িয়া হইতে গঙ্গা পার হইলে কলিকাতার দক্ষিণে মেটিয়াবুরুজে আসা যায়। বিপ্রদাসের সময়ে যদিও মেটিয়াবুরুজের নাম শুনা যায় না, কিন্তু এই কবি নিজ বাসস্থান বটগ্রাম হইতে কালীঘাটে যে কোনও সময়ে আসিয়াছিলেন, ইহা নেহাৎ কল্পিত কথা না হইতে পারে, আর সেই কারণে তিনি যে কালীঘাটের অনতিদূরে অবস্থিত কলিকাতাতেও আসিতে পারেন, কিম্বা ইহার কথা শুনিয়া থাকিতে পারেন, ইহাও অসম্ভব নহে। কবি বিপ্রদাসের উক্ত পুঁথি সম্বন্ধে এস্থলে একটি কথা উল্লেখ করা দরকার। শাস্ত্রী মহাশয় বলেন যে, এই কবির কথা হইতে জানা যায় যে, উক্ত "মনসা" ও "মনসার ভাসান" কাব্য যে সময়ে রচিত হইয়াছিল, সে সময়ে অর্থাৎ ১৯৯৫ খৃষ্টাব্দে হুসেন সাহ বঙ্গদেশের রাজা ছিলেন। "The author mentions Hussain Shah as the reigning Sultan of Bengal." (৭) ইতিহাস কিন্তু একথা বলে না। প্রচলিত প্রামাণিক গ্রন্থ ও ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে, হুসেন সাহ ১৪৯৭ খৃষ্টাব্দে মজাফর সাহকে হত্যা করিয়া বঙ্গের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। তাহা হইলে, শাস্ত্রী মহাশয় কর্তৃক সংগৃহীত উক্ত পুঁথির উপর নির্ভর করিয়া কোনও সিদ্ধান্তে কিরূপে উপনীত হওয়া যাইতে পারে? তথাকথিত প্রাচীন পুঁথি আজ কাল বেশ একটি ব্যবসার সামগ্রী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ঐতিহাসিক সত্যের আলোচনায় যাঁহারা অর্থ ব্যয় করিয়া থাকেন, তাঁহারা যদি কবি বিপ্রদাসের উক্ত পুঁথি মুদ্রিত করিয় সাধারণের গবেষণার সুবিধা করিয়া দিতে পারেন, তাহা হইলে কলিকাতার প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে আমরা একটা স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি।

ক্রমশঃ।

বিসর্জ্জন।

(উপন্যাস)

[শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী]

(৪)

এমনি করিয়া ছেলেমানুষিতে দিন কাটাইতে কাটাইতে তিন চার বছর কাটিয়া গেল। কমনীয় ফার্ষ্ট ক্লাসে উঠিয়া পড়িল, অনেকটা সে শান্ত হইয়া উঠিল। আজকাল সে সেরূপ ছেলেমানুষি করাকে ঘৃণা করিতে শিখিয়াছে। ছোট ছোট উপায়ে প্রতিহিংসা চরিতার্থ করা সে আর চায় না, সে নিজেও যেমন বড় হইয়াছে, তাহার ইচ্ছাও তেমনি নূতন নূতন ফন্দি আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছে। সে ছোট ছিপে, নালার ধারে, খালের পাড়ে বসিয়া ছোট পুঁটি খলসে শীকার করিতে এখন রাজি নয়, সে এখন হুইল লইয়া নদীর ধারে বড় রুই কাতলা শীকার করিতে বসিয়া যায়। যেখানে সেখানে তাহার নাগাল পাওয়া ভার, যেমন তেমন করিয়া তাহাকে আচার খাওয়ানো মুস্কিল। প্রবীণত্বের অভিমান আজকাল তাহাকে অনেকটা উঁচুতে তুলিয়া দিয়াছে। তুষার তাহাকে নভেলের যে নেশা ধরাইয়া দিয়াছিল, সে এখন তাহাতে পূরা মাতাল। নভেল নইলে তাহার একটা দিনও কাটে না। গ্রামের লাইব্রেরী সে কতবার খালি করিয়া ফেলিয়াছে তাহার শেষ নাই।

নিজের দৈহিক উন্নতির দিকেও তাহার দৃষ্টি পড়িয়াছে। তাহার গা হাত পা এখন পরিষ্কার ধবধবে। পরণের কাপড়খানা এখন ময়লা হয় না, কারণ সে আর শূকরের মতন মাটিতে গড়ায় না, মুখখানি প্রত্যেক দিন সাবান দিয়া পরিষ্কার করা হয়। মাথার চুল ভেস্লিন সংযোগে স্তবকে স্তবকে কুঞ্চিত হইয়া গেছে। দিনের মধ্যে

অন্যূন সাত আটবার চুল গুলাকে সে ঠিক করিয়া লয়। যৌবন তাহার দেহে মুখে চোখে যথার্থই নূতন শ্রী আনিয়া ফেলিয়াছে, তাহাকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া একেবারে নূতন করিয়া গঠিয়া লইতেছে।

তুষার এবার বি, এ পাস করিয়া এম,এ ক্লাসে সবেমাত্র ভর্ত্তি হইয়াছে। মাঝে মাঝে সে কলেজের বন্ধু বান্ধব লইয়া এখানে আমোদ করিতে আসে। কয়েকদিন বোটে গান গাহিয়া ফিরিয়া বন্দুক লইয়া বনে বনে শীকার করিয়া তাহারা চলিয়া যায়। যতদিন তাহারা এখানে থাকে, কমনীয় তাহাদের সহিত দিনরাত মিশিয়া থাকে, তখন তাহার পুরাতন সঙ্গীরা পর্য্যন্ত তাহাকে ডাকিয়া দেখা পায় না। সে সর্ব্বাংশে এই সহুরে কলেজের ছেলেদের অনুকরণ করিতে শিখিতেছিল। তুষার এই ভাইটির উপরে খরদৃষ্টি রাখিয়াছিল। যাহাতে কমনীয় একটা মানুষের মত মানুষ হয়, তাহার মত নব্য ভাবে চলিতে শিখে, এইটি তাহার প্রধান লক্ষ্য ছিল। এই বৎসর কমনীয় ম্যাট্রিকুলেসান পাস করিতে পারিলেই সে তাহাকে কলিকাতায় নিজের কাছে লইয়া গিয়া রাখিতে পারিবে, কলিকাতার সব তাহাকে দেখাইবে, এমনি নান আশা দিয়া তাহাকে সে উৎফুল্ল করিয়া রাখিতেছিল।

শুভ্রা আর বড় একটা কমনীয়ের দেখা পায় না। সে আমের সময় আমের আচার, কুলের সময় কুলমাখা, লেবুর আচার আনিয়া বাগানে দাঁড়ায়, কমনীয় বাগানের দিকেও আসে না। হঠাৎ যদি দেখা হইয়া যায়, শুভ্রা অত্যন্ত রাগ করিয়াই আর তাহাকে ডাকে না, সাধিয়া খাওয়াইতে প্রাণপণ করে না। কমনীয়কে দেখাইয়া দেখাইয়া সে আচার, জাম প্রভৃতি তাহার লোভনীয় বস্তুগুলি খাইতে থাকে, কমনীয় কেমন যেন উদাস ভাবে চলিয়া যায়।

তাহার এই ভাব দেখিয়া শুভ্রার বুক ফাটিয়া কান্না আসে। সে ভাবিয়া পায় না, তাহার সেই কমদা কেন এরূপ হইল, কোন্ আবর্ত্তের টানে পড়িয়া সে এতদূরে সরিয়া গেল; সভ্যতার আলোক যে কমদাকে মুগ্ধ করিয়া ফেলিয়াছে তাহা সে জানে না, সে তাই তাহার চির শত্রু ইতির উপর আরও রাগিয়া উঠে, সে ঠিক জানে ইতি তাহার বিরুদ্ধে সকলের কাছে লাগাইয়া সকলের মন ভারি করিয়া দেয়, কেবলমাত্র ইতির এই লাগান-ভাঙ্গানর জন্যই সে এত ভাল হইয়াও সকলের কাছে বজ্জাত, দস্যি নামে খ্যাত। ইতি যে কমনীয়ের কাছেও কিছু লাগাইয়া তাহার মন ভাঙ্গিয়া দেয় নাই, এমন কথাই হইতে পারে না।

হিংসায় শুভ্রার হৃদয়খানা জ্বলিয়া পুড়িয়া যাইতে লাগিল কিন্তু সে একেবারে নিরুপায়। ইতির দেখা পাইলেও না হয় কিছু করা যাইতে পারিত, কিন্তু ইতি আর বড় একটা বাড়ীর বাহির হয় না। সে এখন গৃহকর্ম্ম, শিল্প প্রভৃতিতে মন দিয়াছে, বেড়াইবার অবকাশ তাহার মোটেই নাই। একদিন ইতিদের বাড়ী গিয়া সে ঢিল মারিয়া তাহাদের ওয়ালল্যাম্পটা ভাঙ্গিয়া পলাইয়া আসিয়াছে, তাহার পর হইতে সে আর তাহাদের বাড়ীর সীমানাও মাড়ায় না।

ইতিকে খুব কড়া কথা না শুনাইতে পাইয়া, সে ছট্‌ফট্ করিতেছিল। সে শুধু এই একটা উদ্দেশ্য লইয়া সারাদিনই প্রায় বেড়াইয়া কাটাইত, কিন্তু ইতিও তাহার আবরণ ভেদ করিয়া কোন দিনই প্রকাশ হইয়া পড়ে নাই।

শুভ্রা, তুষারকে ও তাহার কলিকাতা হইতে আগত, বন্ধুবর্গকে দুই চোখে দেখিতে পারিত না। তুষারকে সে গোপনে ভেটকি মাছ উল্লেখ করিত। ভেটকি মাছের সহিত তুষারের কি সম্পর্ক ছিল, তাহা কেবলমাত্র সেই জানিত, আর কেহই ইহার সন্ধ খুঁজিয়া পাইত না। তুষারও তাহার এই নূতন নামকরণ শুনিয়াছিল, সে খুব হাসিয়াছিল এবং শুভ্রার নাম দিয়াছিল টেংরা মাছ। অবশ্য টেংরা মাছের যাবতীয় গুণই শুভ্রাতে বর্ত্তমান ছিল, কাঁটা হানিতে সে ওস্তাদ ছিল। এ নামটী শুভ্রার পক্ষে সহনাতীত ছিল। তুষার তাহাকে দেখিলেই তাহার নূতন নামে সম্বোধন করিত, কিন্তু সে তুষারকে যে সামনা সামনি ভেটকি বলিয়া হারাইয়া দিতে পারিত না, এইটীই তাহার পক্ষে অত্যন্ত কষ্টকর ছিল।

পূজার বন্ধে তুষার বাড়ী আসিয়াছিল, সঙ্গে তাহার কতিপয় বন্ধুও আসিয়াছিল। পূজার কয়দিন পরে দ্বাদশীর দিন শুভ্রা তাহাদের বাড়ী বেড়াইতে যাইবার জন্য বাহির হইতেছিল।

সুষমা তখন কাপড় কাচিয়া আসিয়া সন্ধ্যাহ্নিক করিতে যাইতেছিলেন, তাহাকে বাহির হইতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথা যাচ্ছিস্ শুভ্রা ?"

শুভ্রা উত্তর করিল, "কমদা'দের বাড়ী।"

জননীর মুখ গম্ভীর হইয়া উঠিল, কঠোর সুরে তিনি বলিলেন, "ঘরে যা, কাজ কর গে। কমনীয়দের বাড়ী যেতে হবে না।"

শুভ্রা বিমর্ষ ভাবে বলিল, "জেঠিমা বলেছে যেতে।"

জেঠিমা তুষারের মাতা ; কিন্তু সুষমা তীব্র কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "বলুক জেঠিমা, তুই আর কথখনো যেতে পাবি নে ওদের বাড়ী, যখন-তখন কেন যাবি ? চৌদ্দ পনের বছর বয়েস হ'ল তোর, আর কি তুই ছেলে মানুষ আছিস্ যে যখন-তখন রাস্তায় যাবি, কমনীয়ের সঙ্গে খেল্‌বি ? লোকে যে হাজার মুখে নিন্দে করে, শুন্‌তে পাস্‌নে ? বয়েস কি বড় তোর কম হয়েছে ? আমার অমন বয়সে সংসার মাথায় পড়েছিল।"

শুভ্রা আনত বদনে দাঁড়াইয়া রহিল। আর সে এক পাও অগ্রসর হইতে পারিল না। রাগে দুঃখে তাহার চোখে জল আসিতে লাগিল, সে উঠিয়া গৃহে চলিয়া গেল।

সন্ধ্যাহ্নিক সারিয়া সুষমা পূজার গৃহ হইতে বাহির হইয়া আসিতে দেখিলেন সে মেঝেয় পড়িয়া কাঁদিতেছে। মাতৃহৃদয় বিগলিত হইয়া গেল, তিনি কন্যার পার্শ্বে আসিয়া বসিলেন, তাহার গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে প্রবোধের সুরে বলিলেন, "কাঁদছিস্ কেন শুভ্রা, আমি তো মন্দ কথা কিছু বলিনি মা ; লোকে ভারি নিন্দে করছে এর জন্যে। তোর পিসীমা দিনরাত আমায় বক্‌ছে। আর একটা কথা—"

তিনি থামিয়া গেলেন। যে শেলসম কথা তাঁহার বক্ষে দিনরাত বাজিতেছিল, তাহা তিনি প্রকাশ করেন কিরূপে, অথচ প্রকাশ না করিলেও যে নয়। শুভ্রা যতদিন ছোট ছিল, তিনি প্রাণপণ যত্নে একথা গোপন করিয়া রাখিয়াছিলেন, এ জন্য কত লোকের কাছে অনুনয় বিনয়ও করিয়াছেন, কোনও মেয়ের সহিত তাহাকে খেলিতে দেন নাই, একমাত্র তুষারদের বাড়ী ছাড়া আর কাহারও বাড়ীতে তাহাকে যাইতে দেন নাই। আজ সে কথা প্রকাশ করিতেই হইবে, আজ শুভ্রার স্বরূপ তাহার সম্মুখে প্রকাশ করিতেই হইবে, নহিলে আর রক্ষা নাই, নহিলে শুভ্রার সর্ব্বনাশ হইয়া যাইতেও পারে। শুভ্রার মনের অবস্থা তিনি বুঝিতে পারিয়াছেন, এই সময়ে তাহার মনের দাগ উঠাইয়া ফেলিতে পারা যায়, কিন্তু ইহার পর আর কিছুতেই তাহা মুছিতে পারা যাইবে না।

কিন্তু বলা যায় কিরূপে ? এই যে প্রস্ফুটিত কমলটী, কেমন করিয়া ইহাকে তিনি মলিন করিয়া তুলিবেন, তাহার হৃদয়ের সকল আনন্দ মা হইয়া হরণ করিবেন ?

শুভ্রা নীরবে পড়িয়া রহিল, কোন কথা জিজ্ঞাসাও করিল না। সুষমা একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "কেমন করে বল্‌বো মা, কোন্ মুখে বলবো তোকে সে কথা, বল দেখি ? তুই যে বিধবা ; ওরে হতভাগী, ওরে সর্ব্বনাশী ! তুই যে সব দিক খেয়ে বসে আছিস্। নিজেকে সাম্‌লা, নিজের পানে তাকা। আনন্দভরা জগতে তোর স্থান কোথায় রে সর্ব্বনাশী, তোর স্থান শুধু তোর মার, তোর পিসীমার বুকে, এখানে আয় মা, আর কোন দিকে যাস নে।"

তাঁহার চোখ দিয়া ঝর ঝর করিয়া জল ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। কন্যাকে বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া রুদ্ধ কণ্ঠে তিনি আবার বলিলেন, "তাই বলছি মা, তুই এমন করে পথে ঘাটে ছুটিস্ নে, কমনীয়ের কাছে আর যাস্‌নে। তাকে তুই পরম শত্রু বলে মনে কর। ভাব, তার মত শত্রু তোর আর এ জগতে নেই। আমি বলছি, এ জগতে সবাই তোর শত্রু, কেউ তোর আপনার লোক নয়, সবাই তোকে বিপদগ্রস্ত করবার চেষ্টায় আছে।"

শুভ্রা কেবল মাত্র একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল, সে দীর্ঘনিশ্বাসের শব্দ মায়ের কাণ এড়াইয়া গেল না। উভয়েই অনেকক্ষণ নীরব। শুভ্রার মনের অবস্থা কল্পনা করিয়া সুষমাও একটী কথা কহিলেন না।

অনেকক্ষণ পরে শুভ্রা ধীর কণ্ঠে বলিল, "কিন্তু মা, আমার মনে পড়ছে, অনেকদিন আগে একদিন যখন ও পাড়ার সুনিদি আমায় এ কথাটা বলেছিল, আমি এসে

তোমায় জিজ্ঞাসা করেছিলুম, কিন্তু তুমি এ কথা একেবারেই উড়িয়ে দেছলে।"

সুষমা মলিন মুখে বলিলেন, "হ্যাঁ, তা দেছলুম।"

অকস্মাৎ দীপ্ত হইয়া শুভ্রা বলিল, "কেন দেছলে? আমি যে বিধবা, ছোটবেলা হ'তে সেটা কেন ভেবে দেখতে দাওনি আমায়? আমার যে কিছুতেই অধিকার নেই, আমি যে জগতের বাইরে, সেটা কেন জানাও নি আমায়? আমায় তোমাদের মত সাজে সাজাওনি কেন, তা হ'লে আজ আমায় এমন ভয়ানক ভাবে ঘা পেতে হ'ত না। আমি য, তা আমায় না করে কেন আমায় কুমারীর সাজে সাজিয়েছ তোমরা, আমার মনটাকে কেন কুমারীর ভাবেই গড়ে তুলেছ? আমি তা হ'লে—"

বলিতে বলিতে সে আকুল ভাবে কাঁদিয়া মায়ের বুকে মুখ লুকাইল।

আজ সে স্পষ্টই যেন মায়ের সামনে আপনাকে উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছিল। সে নিজেই জানিত না সে কমনীয়কে ভালবাসে, কমনীয়কে না দেখিতে পাইলে তাহার হৃদয় আকুল হইয়া উঠে। নিজের বুদ্ধিতে সে ঠিক জানিয়াছিল কমনীয়কে ছাড়া সে আর কাহাকেও পছন্দ করে না। অন্য মেয়েদের বিবাহের কথা সে শুনিত, নিজের বিবাহ সম্বন্ধে সে কোনও কথা কাহার মুখে না শুনিতে পাইলেও নিজের বিবাহ সে কল্পনা করিয়া লইয়াছিল। তাহার স্বামী কে হইবে তাহাও সে নির্ব্বাচন করিয়া রাখিয়াছিল। আজ হঠাৎ যখন মায়ের মুখে শুনিতে পাইল সে বিধবা, জগৎ হইতে সে চিরনির্ব্বাসিতা, তখন যেন সে পর্ব্বতের শৃঙ্গ হইতে নীচে পড়িয়া গেল, তাহার আশা ভরসার তার ছিঁড়িয়া গেল, তাহার হৃদয় হাহাকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

সুষমার চোখ দিয়া নিঃশব্দে জলধারা গড়াইয়া তাহার মাথার 'পরে ঝরিয়া পড়িতে লাগিল, তিনি নিজের ভুল বুঝিতে পারিয়া বড় অনুতপ্ত হইয়া উঠিলেন।

শুভ্রা খানিক কাঁদিয়া মুখ তুলিল, তখন সে শান্ত হইয়াছে। সে নিজের দুর্ব্বলতায় লজ্জিত হইয়া একটু হাসিল, বলিল, "যাক্‌গে, বিধবা আমি, তাতে এত দুঃখ কিসের? ভালই তো, আমায় কখনো শ্বশুরবাড়ী যেতে হবে না, কাজ করতে হবে না। ইতির বিয়ে হ'লে শ্বশুরবাড়ী গিয়ে কাজ করতে করতে মরতে হবে, বাপের বাড়ী আর আসতে পাবে না, না মা?"

মা রুদ্ধকণ্ঠ যথাসম্ভব পরিষ্কার করিয়া বলিলেন, "তা বই আর কি।"

শুভ্রা নিজের হাতের পানে চোখ রাখিয়া বলিল, "কিন্তু মা, এ চুড়িগুলো তোমায় খুলে নিতে হবে তো?"

বিস্মিত হইয়া সুষমা বলিলেন, "কেন?"

হাসি-মুখে শুভ্রা বলিল, "বিধবায় কখনও গয়না পরে নাকি? তুমি, পিসিমা, কেউ গয়না পর না, আমি কেন পরব? না মা, এগুলো খুলে নাও, আমার এ মোটে ভাল লাগছে না।"

সুষমা কিছুতেই খুলিতে চাহেন না, সেও জেদ ছাড়ে না। অগত্যা চোখের জল ফেলিতে ফেলিতে সুষমা তাহার হাতের সোনার চুড়ি কয়গাছি খুলিয়া লইলেন। শুভ্র নিটোল সুগোল হাত দুখানি ঘুরাইয়া ফিরাইয়া স্মিতমুখে শুভ্রা বলিল, "এবার কিন্তু খাস দেখাচ্ছে মা।"

মা চোখ মুছিতে মুছিতে উঠিয়া গেলেন।

গঙ্গাস্নান সারিয়া সিক্তবস্ত্রে এক কলসী জল বক্ষে লইয়া সুভা বাড়ী ফিরিলেন। কলসীটা নামাইয়া রন্ধনগৃহের পানে চাহিয়া হাসিমুখে বলিলেন, "এ আবার কি? আজ যে মা অন্নপূর্ণা নিজে গিয়ে ভাত চড়াচ্ছেন।"

সুষমা চাপা সুরে উত্তর করিলেন, "আজ থেকে শুভ্রা সব করবে ঠাকুর ঝি, সংসার আজ হ'তে ওরই।"

শুভ্রা হাসিমুখে চাল ধুইবার জন্য গৃহের বাহির হইল। তাহার শূন্য হাত ও পরণে শুভ্র থান দেখিয়া সুভা ভ্রাতৃবধূর পানে চাহিয়া রুদ্ধকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "বউ—"

সুষমা অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া বলিলেন, "সত্যকে আর চেপে রাখতে পারলুম না ঠাকুরঝি, বাধ্য হয়ে প্রকাশ করে ফেলতে হ'ল। শুভ্রা নিজের সাজ নিজে তুলে নেছে।"

আজ সুভার মনে পুরাতন শোক নূতন হইয়া জাগিয়া উঠিল; তিনি সিক্ত বস্ত্রেই রোয়াকের উপর আছাড় খাইয়া পড়িলেন। সুষমা চোখ মুছিতে মুছিতে সরিয়া গেলেন।

(৫)

কিছুদিন খুব আনন্দে কাটাইয়া, গ্রামবাসিগণকে সন্ত্রস্ত করিয়া তুষারের ভূত প্রেত বন্ধুগুলি বিদায় লইয়া গেল। কলেজ খুলিবার কিছু বিলম্ব ছিল, সেইজন্য তুষার এখন পড়িল না।

বেলাটা তখন প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, সূর্য্যাস্তের আরক্তিম আভা দ্বিতলের বারান্দার উপর আসিয়া পড়িয়াছে। সেখানে দুখানি চেয়ারে দুই ভাই বসিয়া কল্পনায় বিভোর হইয়াছিল।

তুষার একটু কবি-ধরণের ছিল, মাঝে মাঝে সে কবিতা লিখিত, এবং মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিতও হইত। একটু চাঁদ উঠিলে, কিম্বা কোথাও কোকিল পাপিয়া ঝঙ্কার দিলে তাহার প্রাণ একেবারে বিভোর হইয়া যাইত। তখন তাহার নিকটে এমন একটা লোকের থাকা দরকার যে তাহার ভাবটা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে অথচ খুঁত ধরিতে না পারে। এই শ্রেণীর লোক ছিল কমনীয়। তুষারের কথায় সে একটা খুঁত ধরিতে পারিত না, তুষারের পাণ্ডিত্যে সে একেবারে মুগ্ধ। তুষারের লিখিত পদ্যগুলি সে সযত্নে রাখিয়াছিল; সেগুলি যখন পড়িত, তখন তাহার দাদাকে সে বাঙ্গালা কবি রবীন্দ্রনাথ, ইংরাজ কবি শেলি, বায়রণের চেয়েও বড় বলিয়া ধারণা করিত। প্রকৃত ভক্ত যাহাকে বলে, সে তাহাই ছিল।

আজিকার লোহিত আভাযুক্ত আকাশের পানে চাহিয়া তুষার অনর্গল বকিয়া যাইতেছিল, আর কমনীয় মুগ্ধ হইয়া তাহার মুখপানে চাহিয়া বসিয়াছিল। অনেকক্ষণ বকিয়া বকিয়া তুষারের যখন শ্রান্তি ধরিয়া গেল, তখন সে কমনীয়ের পানে তাকাইয়া গম্ভীর ভাবে বলিল, "আচ্ছা, তুইও তো কবি হ'তে পারিস কমনীয়! দেখনা একটু চেষ্টা করে।"

কমনীয় বিমর্ষভাবে বলিল, "হাঃ, আমি কি কবি হ'তে পারি দাদা? মাথা ভেঙ্গে মরলেও আমার কথা বার হয় না, আমি নাকি আবার কবি হব!"

তুষার দর্পের সহিত বলিল, "কেন হবি নে, ঠিক হবি। তবে একটু চেষ্টা চাই বই কি। কথা পরস্পর সাজাতে পারলে আর মিল থাকলেই হ'ল কবিতা, যে তৈরি করে সেই হ'ল কবি। আজকাল হাজার হাজার কবি হচ্ছে, তুই হ'তে পারবিনে এমন কি কথা থাকতে পারে? চেষ্টা কর দেখি একবার।"

কমনীয় বিনয়ের সুরে বলিল, "না দাদা, আমি কবি হ'তে পারব না। তুমি বলো আমি শুনব মাত্র। নিজে তৈরি করা আমার দ্বারা কখনো হবে না। তুমি তো আছ দাদা। দশটা লোকে যখন তোমার নাম করে, তখন আমার বুকটা দশ হাত ফুলে ওঠে, আমার তাই ভাল।"

তুষার মুরুব্বিয়ানা ভাবে হাসিয়া বলিল, "তবে থাক, নিতান্তই যখন পারবিনে তখন আর কি বলব? কিন্তু লিখলে লিখতে পারতিস, কবি হ'তে পারতিস। এই তো আকাশ, এই তো সন্ধ্যা, চিরকাল পৃথিবীর সব লোকেই এ দেখে আসছে। কেউ বা সে ভাবটা কিছুতেই আঁকিয়ে তুলতে পারে না, কেউ বা সেটা আঁকিয়ে তোলে। যে স্পষ্ট আঁকতে পারে সেই কবি। চেষ্টা থাকলে অনেকেই আঁকতে পারে, কারণ ভগবান ক্ষমতা তো সবারই দেছেন, কেউ তো ক্ষমতাহীন নয়। ইচ্ছাই ক্ষমতা; সেই ইচ্ছাশক্তি কারও বেশী, কারও কম, এই মাত্র প্রভেদ। যাই হোক, সে শক্তিকে স্বাধীনভাবে না ছাড়তে পারলে কোন দিকেই সুবিধে নেই। তুই সেটাকে চেপে রেখেছিস বলেই কবি হ'তে পারলি নে।"

বেশ ভাবে বসিয়া সে সিগারকেস হইতে দুইটা সিগারেট বাহির করিয়া একটা কনিষ্ঠের হাতে দিল, অপরটা ধরাইয়া নিজে টানিতে লাগিল। এ সভ্যতাটা সে বন্ধুবর্গের কাছে শিখিয়াছে। এটা না কি ইউরোপীয়ান সভ্যতা, সেই জন্য তুষার চকিতে ইহা আয়ত্তের মধ্যে আনিয়া ফেলিয়াছে। ইউরোপীয়ান সভ্যতা বলিতে যাহা কিছু বুঝায়, তুষার তাহা সবই করিতে প্রস্তুত। সে অতিরিক্ত সভ্যতার পক্ষপাতী ছিল, এবং সকলকেই এই সভ্যতার পক্ষপাতী করিয়া তুলিবার আগ্রহ তাহার খুব বেশী রকম ছিল।

সিগারেট টানিতে টানিতে তুষার বলিল, "আচ্ছা, বল্‌তে পারিস্ কমনীয়, সে টেংরা মাছটা আর আসে না কেন? বোধ হয় আজ সাত আট দিন তাকে দেখি নি। আমার তো মনে হয় এমন দিন যায় নি যেদিন সে আমাদের বাড়ী

না এসেছে। তার গা'ল না খেয়ে দিনটা সুবিধায় যায় না।"

কমনীয়ের মনে পড়িয়া গেল বাস্তবিক তাহাকে কয়েকদিন দেখা যায় নাই। যাহাকে সহস্র অপমান প্রহার করা সত্ত্বেও কাছ-ছাড়া করা যাইত না, সে যে এমন করিয়া হঠাৎ আসা বন্ধ করিল, ইহা বাস্তবিকই অত্যন্ত বিস্ময়ের কথা বটে। সেদিন দেখা হইয়াছিল বটে, বিজয়ায় যেদিন সে ঠাকুর বিসর্জ্জন দিতে চলিয়াছিল। পথের পাশে সে দাঁড়াইয়াছিল, কিন্তু সে তো ঠাকুরের পানে চায় নাই, সে যেন তাহারই মুখ পানে চাহিয়াছিল। তাহার সেই মুগ্ধ দৃষ্টি হইতে লুকাইবার জন্য কমনীয় অন্যদিকে সরিয়া গিয়াছিল।

তবে কি শুভ্রার অসুখ করিয়াছে? কমনীয়ের প্রাণটা মোচড় দিয়া উঠিল। নিশ্চয়ই তাই, নহিলে সে আসে নাই কেন?

সে উঠিয়া পড়িল—"দেখে আসব দাদা?"

দাদা একমুখ ধূম ছাড়িয়া দিয়া বলিল, "আচ্ছা যা, দেখে আয়। আমার খাতাখানা আর দোয়াতদানটা দিয়ে যা, ততক্ষণ চট্ করে একটা পদ্য লিখে ফেলি।"

শুভ্রা তখন কলসীটা লইয়া খাওয়ার জল আনিবার জন্য ঘাটে যাইতেছিল। কমনীয় একেবারে তাহার সামনে আসিয়া পড়িল, সামনে স্ত্রীলোক দেখিয়া সে পাশ কাটাইয়া দাঁড়াইতে গিয়া শুভ্রাকে চিনিতে পারিল; বিস্ময়ে বলিয়া উঠিল, "এ কি; শুভ্রা? আমি তো তোকে মোটে চিনতেই পারি নি। হাত খালি করেছিস্, থান কাপড় পরেছিস্ কেন রে?"

শুভ্রার রুদ্ধ অভিমান উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতে চায়, চোখ ফাটিয়া জল আসিয়া পড়ে; কোনও ক্রমে সে ভাবটা সে দমন করিয়া লইয়া পাশ কাটাইয়া যাইতে গেল। সে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল আর কখনো এই অকৃতজ্ঞ কমদার সঙ্গে সে কথা বলিবেই না।

সে চলিয়া যায় দেখিয়া কমনীয় তাহার হাত চাপিয়া ধরিল—"বড় যে পালাচ্ছিস্; তোর ইচ্ছে হয়েছে বুঝি চুড়ি খুলতে, থান পরতে? আচ্ছা, রোস্, আমি মামীমাকে বলে তোকে আচ্ছা করে মার খাওয়াব তুই যাস নে কেন রে আমাদের বাড়ী আর?"

শুভ্রা ঠোঁট উল্টাইয়া বলিল, "আমার ইচ্ছে আমি যাব না, তোমার তাতে কি?"

শুভ্রা যে তাহার মুখের উপর এমন কড়া উত্তর দিতে পারিবে, ইহা কমনীয়ের স্বপ্নেরও অতীত। সে জানে শুভ্রা চিরকাল তাহার কাছে প্রহার খাইবে, গালি সহ্য করিবে, একটা কথাও সে বলিতে পারিবে না। সে অন্য লোকের কাছে ঝগড়াটে মেয়ে নামে খ্যাত হইলেও তাহার কাছে মূক। আজ সেই জন্য শুভ্রার মুখে এই স্পষ্ট উত্তর শুনিতে পাইয়া সে প্রথমটা থতমত খাইয়া গেল; তাহার পরেই তাহার ক্রোধ অতিরিক্ত রকমের বাড়িয়া উঠিল। "তবে রে, আজ কাল তোর বড্ড মুখ হয়েছে যে, দেখবি তবে—"

কথাটা সমাপ্ত করিবার সঙ্গে সঙ্গে সে শুভ্রার পৃষ্ঠে গোটাকত কীল বসাইয়া তাহাকে ভীষণ একটা ধাক্কা দিয়া ফেলিয়া দিয়া দ্রুতপদে চলিয়া গেল।

শুভ্রা পড়িয়া গেল, হাতের কব্জিতে ও অন্যান্য জায়গায় লাগিয়াছিল খুব বেশী রকম, তাই সে উঠিতে পারিল না।

অন্যদিন হইলে সে কাঁদিত, অন্য কেহ হইলে গা'ল দিয়া চীৎকার করিয়া সে এতক্ষণ চারিদিক কাঁপাইয়া তুলিত, কিন্তু আজ সে সম্পূর্ণ নীরব, দু ফোঁটা চোখের জল বাহির হইয়া পড়িয়া আপনিই শুখাইয়া গেল।

অতি কষ্টে সে উঠিয়া বসিল। হাতের কব্জি সঙ্গে সঙ্গে ফুলিয়া উঠিয়া অসহ্য যন্ত্রণা দিতে লাগিল। শুভ্রা আর ঘাটে যাইতে পারিল না, পা ফাটিয়া রক্ত পড়িতেছিল, কোনও ক্রমে বাম হস্তে ঘড়াটা লইয়া খুঁড়াইতে খুঁড়াইতে বাড়ীতে আসিয়া বসিয়া পড়িল।

তাহাকে এরূপ ভাবে খালি ঘড়া লইয়া আসিতে দেখিয়া সুভা বিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হয়েছে, অমন করে ফিরে আস্‌লি যে?"

শুভ্রা উত্তর দিল না।

সুষমা নিকটে আসিয়া বলিলেন, "পড়ে গেছিস্ বুঝি? পা কেটে রক্ত পড়ছে যে; ঠাকুরঝি, পাখানা বেঁধে দিতে পার্‌লে হ'তো কিন্তু।"

সুভা তাড়াতাড়ি উঠিয়া নেকড়া আনিয়া তাহার পা বাঁধিয়া দিতে দিতে বলিলেন, "হতভাগা মেয়ে, হাঁটবে পথে চোখ দুটো আকাশ পানে তুলে। পথে তো সবাই হাঁটে, কারও তো এমন দশা হয় না।"

শুভ্রা নীরব হইয়া রহিল, একটী কথাও বলিল না। কিন্তু সেদিন সমস্ত রাত্রি সে হাতের যন্ত্রণায় ঘুমাইতে পারে নাই, সমস্ত রাত ছটফট্ করিয়াছিল।

ক্রমশঃ।

জৈন শাস্ত্রের কথা।

[অধ্যাপক শ্রীহরিহর শাস্ত্রী]

জৈন শাস্ত্র মতে 'উৎসর্পিণী' ও 'অবসর্পিণী' এই দুইটী সংজ্ঞায় কাল বিভক্ত। 'উৎসর্পিণী' কালে প্রাণীদিগের আয়ুঃ এবং শরীরাদির পরিমাণ বৃদ্ধি হইয়া থাকে, আর 'অবসর্পিণী' কালে তাহার ক্রমশঃ হ্রাস হয়। এই দুইটী কালের প্রত্যেকটীই আবার ছয় ভাগে বিভক্ত। অবনতি-রূপ 'অবসর্পিণী' কালের ১ম বিভাগ—সুষমা-সুষমা। এই সময়ে মনুষ্যের শরীরের উচ্চতা তিন ক্রোশ পরিমাণ (১২০০০ গজ)। এই কালের মনুষ্যের মধ্যে সকলেই সুন্দর ও সরলচিত্ত। তিন দিন অন্তর লোকের ভোজনেচ্ছা হয়, আর ইচ্ছামাত্রেই কল্পবৃক্ষ হইতে বিবিধ খাদ্য সামগ্রী পাওয়া যায়—তাহার জন্য কোনও আয়াস স্বীকার করিতে হয় না। এই সময়ের মনুষ্যদিগের মলমূত্র ত্যাগের প্রয়োজন হয় না এবং কোনও রূপ ব্যাধিও তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে পারে না। এই যুগে স্ত্রী ও পুরুষ যুগপৎ এক গর্ভ হইতে উৎপন্ন হয় এবং যৌবন প্রাপ্ত হইলে উভয়ে পতি পত্নীর ন্যায় ব্যবহার করে। পুত্র কন্যা ভূমিষ্ঠ হইলেই মাতাপিতা তৎক্ষণাৎ দেহত্যাগ করেন; শিশু নিজের অঙ্গুষ্ঠ লেহন করিয়া ৪৯ দিনেই পূর্ণ যৌবন প্রাপ্ত হয়। মৃত্যু—স্ত্রী পুরুষের এক সময়েই হইয়া থাকে।

২য় বিভাগ—সুষমা। এই কালে মনুষ্যের উচ্চতা দুই ক্রোশ (৮০০০ গজ), দুইদিন অন্তর ভোজনের ইচ্ছা হয় এবং পূর্ব্ববৎ কল্পবৃক্ষ হইতেই ভোজ্য দ্রব্য পাওয়া যায়। কালের এই দুই বিভাগেই (সুষমা-সুষমা ও সুষমা) কোনও রাজা মহারাজের অস্তিত্ব থাকে না। সিংহাদি হিংস্র জন্তুও শান্ত স্বভাবে বিরাজ করে।

ইহার পর অবসর্পিণী কালের ৩য় বিভাগ—সুষমা—দুঃসমা। কালের এই বিভাগে মনুষ্যের শরীরের উচ্চতা এক ক্রোশ (৪০০০ গজ); এই সময়ে মানুষ একদিন অন্তর আহার করে। এই কালেও লোকে বিনা পরিশ্রমে কল্পবৃক্ষ হইতে উপভোগের সকল সামগ্রী প্রাপ্ত হয়। এই 'সুষমা-দুঃসমা' কালের শেষ অংশে প্রতি-শ্রুত, সন্মতি, ক্ষেমঙ্কর, ক্ষেমন্ধর সীমঙ্কর, সীমন্ধর, বিমল-বাহন, চক্ষুষ্মান্, যশস্বান্, অভিচন্দ্র, চন্দ্রাভ, মরুদেব, প্রসেনজিত, নাভিরায়—এই চতুর্দ্দশ কুলকর (মনু) ক্রমশঃ জন্ম লাভ করেন। ইঁহারা কুল-প্রবাহের প্রতিষ্ঠা করিয়া-ছেন, এই জন্য ইঁহাদিগকে 'কুলকর' বলা হয়। এই কুল-করেরা অপরাধী মনুষ্যের দণ্ডের ব্যবস্থা করিয়াছেন বলিয়া 'মনু' নামেও অভিহিত। কুলকরগণের উৎপত্তির পূর্ব্বে মনুষ্যদিগের কোনও নাম ছিল না—স্ত্রীলোকেরা পুরুষ-দিগকে 'আর্য্য' আর পুরুষেরা স্ত্রালোককে 'আর্য্যে' বলিয়া সম্বোধন করিতেন। চতুর্দ্দশতম কুলকর মহারাজ নাভিরায়ের সময়ে কল্পবৃক্ষসমূহ প্রায় নষ্ট হইয়া গিয়া-ছিল। নাভিরায়ের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত পৃথিবী ভোগভূমি ছিল, এইবার কর্ম্মভূমির প্রারম্ভ হইল—এখন হইতেই লোকে জীবিকার জন্য কৃষি বাণিজ্যাদি কর্ম্মের আবশ্যকতা অনুভব করিল। কিন্তু মানুষ তখন কি করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে হয়, তাহার উপায় সম্বন্ধে একেবারেই অজ্ঞ। যদিও এই সময়ে স্বয়ং ধান্যাদি বৃক্ষের অঙ্কুরোদ্গম হইয়াছিল, কিন্তু তাহার উপযোগিতা সম্বন্ধে মানুষের কোনই জ্ঞান ছিল না। এইজন্য তাৎকালিক মনুষ্যেরা

মহারাজ নাভিরায়ের নিকটে নিজেদের ক্ষুধাদি কষ্টের কথা নিবেদন করিল এবং স্বয়ং উৎপন্ন বৃক্ষ সমূহের প্রয়োজন জানিতে চাহিল। মহারাজ নাভিরায় তাহাদিগকে ধান্যবৃক্ষ হইতে কি ভাবে তণ্ডুল নিষ্পত্তি হয়, সে বিষয়ে উপদেশ দিলেন। এই কর্ম্মভূমির প্রারম্ভ-সময়ে মানুষের নিকটে রন্ধন-ভোজনাদির কোনও পাত্র ছিল না—নাভিরায়ই তাহাদিগকে স্বয়ং নির্ম্মাণ করিয়া মৃৎপাত্র প্রস্তুত করিবার প্রণালী শিখাইলেন।

মহারাজ নাভিরায়ের মহিষীর নাম মরুদেবী। ইঁহার গর্ভে কর্ম্মভূমির প্রবর্ত্তক, জৈন আদি তীর্থঙ্কর, ভগবান্ ঋষভদেব জন্ম লাভ করেন।

৪র্থ বিভাগ—দুঃসমা-সুষমা। এই কালের আদি অবস্থায় মানুষের আয়ুঃ ৮৪ লক্ষ আর শরীরের উচ্চতা ১১০০ গজ। এই সময় হইতেই রাজত্ব, বাণিজ্য, বিবাহ, বিদ্যাধ্যয়নাদি কার্য্যের সূচনা হইল। এই কালের নাম 'সৎযুগ'। এই যুগেই চতুর্ব্বিংশতি তীর্থঙ্কর, দ্বাদশ চক্রবর্ত্তী, নব নারায়ণ, নব প্রতিনারায়ণ, নব বলভদ্র এই—৬৩ শলাকাপুরুষ আবির্ভূত হন। ইহা ছাড়া ৯ নারদ, ১১ রুদ্র ও ২৪ কামদেবও এই সময়ে উৎপত্তি লাভ করেন।

তীর্থঙ্কর।

তীর্থঙ্করগণ, স্বর্গ হইতে কোনও রাজার ঔরসে ও পট্ট মহিষীর গর্ভে আসিয়া জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহারা 'কেবল জ্ঞান' লাভ করিয়া সমগ্র দেশে ধর্ম্মোপদেশের দ্বারা জীবগণকে মোক্ষমার্গের অধিকারী করেন এবং শেষে নিজেও মুক্ত হন।

চতুর্ব্বিংশতি তীর্থঙ্করের মধ্যে প্রথম তীর্থঙ্কর ঋষভদেবের পিতামাতার নাম পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে। ইঁহার চরণে বৃষের চিহ্ন ছিল। চৈত্র মাসের কৃষ্ণা নবমীতে উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্রে অযোধ্যা নগরীতে ঋষভদেবের জন্ম হয়। ইঁহার শরীর কাঞ্চনবর্ণ এবং উচ্চতায় দুই হাজার হস্ত পরিমাণ (৫০০ ধনুঃ।)

ঋষভদেব যৌবন প্রাপ্ত হইলে পিতা নাভিরায়, কচ্ছ ও মহাকচ্ছ নামক দুই রাজার যশস্বতী ও সুনন্দা নাম্নী দুই কন্যার সহিত তাহার বিবাহ দিয়াছিলেন।

মহারাণী যশস্বতীর গর্ভে ঋষভদেবের প্রথম পুত্র ভরত জন্ম লাভ করেন। ভরতের পর বৃষভসেন, অনন্তবিজয়, মহাসেন, অনন্তবীর্য্য, অচ্যুত, বীর, বীরবর, শ্রীসেন, গুণসেন, জয়সেন, প্রভৃতি ৯৯ পুত্র ও ব্রাহ্মী নামে এক কন্যারও ইঁহারই গর্ভে জন্ম হয়।

মহারাণী সুনন্দার গর্ভে ঋষভদেবের বাহুবলী নামক এক পুত্র ও সুন্দরী নামে এক কন্যা মাত্র উৎপন্ন হয়।

ভগবান্ ঋষভদেবই প্রজাগণকে কৃষি, বাণিজ্য, যুদ্ধবিদ্যা, শিল্পকলা প্রভৃতি শিক্ষা দেন। এই সময় হইতেই কর্ম্মানুসারে ক্ষত্রিয়াদি বর্ণ ব্যবস্থার আরম্ভ হয়, ইহার পূর্ব্বে জাতি বর্ণের কোনও নিয়ম ছিল না।

ভগবান্ ঋষভদেব, এক এক সহস্র রাজার উপরে এক এক মহামণ্ডলেশ্বরের ব্যবস্থা করেন। এইরূপ চারিজন মহামণ্ডলেশ্বর ছিলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে প্রথম মহামণ্ডলেশ্বর হরি হইতে হরিবংশ, অকম্পন হইতে নাথবংশ, কাশ্যপ হইতে উগ্রবংশ ও সোমপ্রভ হইতে কুরুবংশের প্রতিষ্ঠা হয়।

কিছুকাল পরে ঋষভদেব, ভরতকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া নিজে 'সিদ্ধার্থ' নামক বনে তপস্যা করিতে গেলেন। এক লক্ষ এক হাজার বর্ষ বয়সে ঋষভদেব, কৈলাস পর্ব্বতে মাঘ মাসে পদ্মাসনে মোক্ষলাভ করেন।

জৈনশাস্ত্রমতে ঋষভদেবের প্রথম পুত্র ভরতের নামানুসারেই এই দেশের নাম ভারতবর্ষ।

দ্বিতীয় তীর্থঙ্কর—অজিতনাথ। ইঁহার পিতার নাম জিতশত্রু, মাতার নাম বিজিতসেনা। অজিতনাথের শরীরের উচ্চতা ৪৫০ ধনুঃ। * জন্মস্থান—অযোধ্যা। ইনি খড়্গাসনে মুক্তিলাভ করেন।

তৃতীয় তীর্থঙ্কর—সম্ভবনাথ। পিতার নাম দৃঢ়রথ, মাতার নাম সুসেনা দেবী। জন্মস্থান—শ্রাবস্তী নগরী। শরীরের উচ্চতা ৪০০ ধনুঃ।

চতুর্থ তীর্থঙ্কর—অভিনন্দন। পিতা—স্বয়ম্বর, মাতা সিদ্ধার্থা। জন্মস্থান—বিনীতা নগরী। শরীরের উচ্চতা ৩৫০ ধনুঃ।

---

* এক ধনুর পরিমাণ ৪ হস্ত।

পঞ্চম তীর্থঙ্কর—সুমতিনাথ। পিতা—মেঘরথ, মাতা মঙ্গলাদেবী। জন্ম নগরী—বিনীতা। শরীরের উচ্চতা ৩০০ ধনুঃ।

ষষ্ঠ তীর্থঙ্কর—পদ্মপ্রভ। পিতা—ধরণি, মাতা সুসীমা দেবী। জন্মস্থান—কৌশাম্বী নগরী। দেহের দীর্ঘতা ২৫০ ধনুঃ।

সপ্তম তীর্থঙ্কর—সুপার্শ্বনাথ। পিতা—সুপ্রতিষ্ঠিত, মাতা পৃথ্বীসেনা। জন্মস্থান—অসিঘাট (ভদৈনী) কাশী। শারীরিক উচ্চতা ২০০ ধনুঃ।

অষ্টম তীর্থঙ্কর—চন্দ্রপ্রভ। পিতা—মহাসেন, মাতা লক্ষ্মণা। জন্মভূমি—চন্দ্রপুরী। শরীরের উচ্চতা ১৫০ ধনুঃ।

নবম তীর্থঙ্কর—পুষ্পদন্ত। পিতা—সুগ্রীব, মাতা জয়বামা। জন্মস্থান—কাকন্দীপুর। শরীরের উচ্চতা ১০০ ধনুঃ।

দশম তীর্থঙ্কর—শীতলনাথ। পিতা—দৃঢ়রথ, মাতা সুনন্দা। জন্মস্থান—ভদ্দলপুরী (গোয়ালিয়র জেলার অন্তর্গত ভেলসা নগরী)। দৈহিক দীর্ঘতা ৯০ ধনুঃ।

একাদশ তীর্থঙ্কর—শ্রেয়াংসনাথ। পিতা—বিষ্ণুরাজ, মাতা নন্দাদেবী। জন্মস্থান—সিংহপুরী (সারনাথ)। শরীরের উচ্চতা ৮০ ধনুঃ।

দ্বাদশ তীর্থঙ্কর বাসুপূজ্য। পিতা—বসুরাজ, মাতা জয়াদেবী। জন্মস্থান চম্পাপুর। দৈহিক দীর্ঘতা ৭০ ধনুঃ।

ত্রয়োদশ তীর্থঙ্কর—বিমলনাথ। পিতা—কৃতবর্ম্মা, মাতা শ্যামা। জন্মস্থান—কম্পিলাপুর। শরীরের উচ্চতা ৬০ ধনুঃ।

চতুর্দ্দশ তীর্থঙ্কর—অনন্তনাথ। পিতা—সিংহসেন, মাতা জয়শ্যামা। জন্মস্থান—কৌশলপুর। শরীরের উচ্চতা ৫০ ধনুঃ।

পঞ্চদশ তীর্থঙ্কর—ধর্ম্মনাথ। পিতা—ভানুরাজ, মাতা সুপ্রভাদেবী। জন্মস্থান—রতনপুর। শারীরিক উচ্চতা ৪৫ ধনুঃ।

ষোড়শ তীর্থঙ্কর—শান্তিনাথ। পিতা—বিশ্বসেন, মাতা ঐরাদেবী। জন্মস্থান—হস্তিনাপুর। দেহের দীর্ঘতা ৪০ ধনুঃ।

সপ্তদশ তীর্থঙ্কর—কুন্থুনাথ। পিতা—শূরসেন রাজা, মাতা শ্রীকান্তা। জন্মস্থান—হস্তিনাপুর। শরীরের উচ্চতা ৩৫ ধনুঃ।

অষ্টাদশ তীর্থঙ্কর—অরনাথ। পিতা—সুদর্শন রায়, মাতা মিত্রসেনা। জন্মস্থান—হস্তিনাপুর। শরীরের উচ্চতা ৩০ ধনুঃ।

ঊনবিংশ তীর্থঙ্কর—মল্লিনাথ। পিতা—কুম্ভরাজ, মাতা প্রজাবতী। জন্মস্থান মিথিলা। শরীরের উচ্চতা ২৫ ধনুঃ।

বিংশ তীর্থঙ্কর—মুনিসুব্রত। পিতা—সুমিত্র, মাতা সোমাদেবী। জন্মস্থান—রাজগৃহ। শরীরের উচ্চতা ২০ ধনুঃ।

একবিংশ তীর্থঙ্কর—নমিনাথ। পিতা—বিজয়রাজ, মাতা—বিপুলারাণী। জন্মস্থান—মিথিলা। শরীরের উচ্চতা ১৫ ধনুঃ।

দ্বাবিংশ তীর্থঙ্কর—নেমিনাথ। পিতা—সমুদ্রবিজয়, মাতা শিবাদেবী। জন্মস্থান—দ্বারকা নগরী। আয়ুঃ এক হাজার বৎসর। শরীরের উচ্চতা ১০ ধনুঃ (৪০ হাত)।

ত্রয়োবিংশ তীর্থঙ্কর—পার্শ্বনাথ। পিতা—অশ্বসেন, মাতা বামাদেবী। জন্মস্থান—ভেলুপুরা, কাশী। আয়ুঃ ১০০ বৎসর। শরীরের উচ্চতা ৯ হাত।

চতুর্ব্বিংশ তীর্থঙ্কর—বর্দ্ধমান। ইহাঁর নামান্তর মহাবীর স্বামী। পার্শ্বনাথের নির্ব্বাণ লাভের ২৫০ শত বৎসর পরে বিদেহ দেশের অন্তর্গত কুণ্ডপুরে রাজা সিদ্ধার্থের ঔরসে ত্রিশলাদেবীর গর্ভে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইহাঁর 'মহাবীর' ও 'বর্দ্ধমান' নামকরণ সম্বন্ধে আচার্য্য সকল কীর্ত্তি "মহাবীর পুরাণে" বলিয়াছেন,—

"অয়ং স্বাম্যহতাং বীরঃ কর্ম্মারাতিনিকন্দনাৎ।
শ্রীবর্দ্ধমান নামাসৌ বর্দ্ধমানগুণাশ্রয়াৎ॥"

(৮৯ শ্লোক)

মহাবীর ৩০ বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত সংসারাশ্রমে ছিলেন, তাহার পরই তাঁহার বৈরাগ্যের উদয় হয়। তিনি তখন রাজভবনকে কারাগারের ন্যায় দুঃখপ্রদ মনে করিলেন, তাই রাজলক্ষ্মী পরিত্যাগ করিয়া তপোবনে যাইবার জন্য উদ্যত হইলেন।—

"কারাগারসমং গেহং জ্ঞাত্বা রাজ্যশ্রিয়া সমম্।
ত্যক্ত্বং তপোবনং গন্তুং প্রোত্তমং পরমং ব্যধাৎ॥"—
(মহাবীরপুরাণ, ১০৫ শ্লোক)

পিতা সিদ্ধার্থ জ্ঞানী ছিলেন, তিনি পুত্রের সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণে তত বিচলিত হইলেন না, কিন্তু মাতা ত্রিশলা, শোকার্ত্তচিত্তে আত্মীয় বন্ধুগণের সহিত বিলাপ করিতে করিতে পুত্রের অনুগমন করিলেন।

"রোদনঞ্চেতি কুর্ব্বাণা বন্ধুভিঃ সমমার্ত্তধীঃ।
বিলাপৈর্বহুভির্দুঃখাৎ সা পুত্রমনুনির্যযৌ॥"

দেবী ত্রিশলা নগরের বহির্দেশ পর্য্যন্ত আসিলে বিজ্ঞ বৃদ্ধেরা এই বলিয়া তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিলেন যে,

"দেবি কিং বেৎসি নাস্যেদং চরিত্রং ত্বং জগদগুরোঃ।
অয়ং ত্রিজগতীভর্ত্তা সুতস্তেহদ্ভুতবিক্রমঃ॥
ভবাব্ধৌ স্বপতৎ পূর্ব্বমুদ্ধৃত্যাত্মানমাত্মবিৎ।
পশ্চাদ্ ভব্যান্ বহূন্ জন্তূন্ সুদ্ধরিষ্যতি তীর্থরাট্॥
অত্যাসন্নভবং প্রাপ্তো জগদুদ্ধরণক্ষমঃ।
ত্বৎসুতো দীনবদ্ গেহে শুভে কুর্য্যাৎ কথং রতিম্॥"

দেবি, তুমি কি এই জগদ্গুরুর চরিত্র জান না? অদ্ভুতবিক্রম তোমার এই পুত্র, ত্রিজগতের রক্ষক হইবেন। ইনি নিজেকে সংসার-সমুদ্র হইতে উদ্ধার করিয়া বহু ভব্য প্রাণীকে নিস্তারের পথ নির্দ্দেশ করিয়া দিবেন। হে শুভে, জগদুদ্ধারে সমর্থ তোমার এই পুত্র, কেন দীনের স্তায় গৃহাশ্রমের প্রতি অনুরাগী হইয়া থাকিবেন?

এই মহাপুরুষের বাক্যে ত্রিশলা দেবী গৃহে ফিরিয়া গেলেন।

মহাবীর তখন দিগম্বর বেশ ধারণ করিয়া নানা দেশ পর্য্যটন করিলেন, শেষে জৃম্ভিকাগ্রামের প্রান্তভাগে 'ঋজুকূলা' নদীতটে এক শালবৃক্ষের তলে ধ্যানস্থ হইলেন। তপস্তায় সিদ্ধি লাভ করিয়া মহাবীর ৩০ বৎসর কাল দেশদেশান্তরে অহিংসা ধর্ম্মের প্রচার করেন। এই সময়ে মহাবীরের কণ্ঠ হইতে যে সকল উপদেশ-বাণী ধ্বনিত হইয়াছিল, তাহাই আচারাঙ্গ প্রভৃতি দ্বাদশ ভাগে তাঁহার প্রধান শিষ্য গৌতম স্বামী (অন্য নাম ইন্দ্রভূতি) কণ্ঠস্থ করিয়া রাখেন। এই সকল সিদ্ধান্ত অনুসরণ করিয়া কুন্দকুন্দ, সমন্তভদ্র স্বামী, বিদ্যানন্দী, প্রভাচন্দ্র প্রমুখ আচার্য্যগণ, পঞ্চাস্তিকায়, আপ্তমীমাংসা, অষ্টসহস্রী, প্রমেয়কমলমার্ত্তণ্ড প্রভৃতি বিচারবহুল গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

মহাবীর স্বামী কার্ত্তিক মাসের অমাবস্তায় প্রাতঃকালে বিহার প্রদেশের পাবাপুরীতে মোক্ষলাভ করেন। বর্ত্তমান সময়ে পাবাপুরের (পোখরপুর) জৈন মন্দিরে মহাবীরের চরণ-পাদুকা রক্ষিত আছে। প্রতি বৎসর কার্ত্তিকী অমাবস্তায় এখানে বিরাট উৎসব হইয়া থাকে। আজ ২৪৪৯ বৎসর হইল মহাবীরের নির্ব্বাণ লাভ হইয়াছে।

মহাবীরের নির্ব্বাণ-তিথি এই কার্ত্তিকী অমাবস্তায় জৈন সম্প্রদায় দীপাবলীর উৎসব ও লক্ষ্মীপূজার আয়োজন করেন।

চক্রবর্ত্তী।

১ম চক্রবর্ত্তী ভরত—আদি তীর্থঙ্কর ঋষভদেবের পুত্র। ২য় সগর। জৈন পুরাণের মতে সগরের পিতার নাম—সমুদ্রবিজয়, মাতার নাম সুবালা। সগরের ৬০ হাজার পুত্র। তাহার মধ্যে ভগীরথ নামক পুত্রকে রাজ্য সমর্পণ করিয়া তিনি তপোব্রত ধারণ করেন। পিতার মোক্ষলাভের পর ভগীরথ কৈলাস পর্ব্বতে গঙ্গাতীরে শিবগুপ্ত মুনির নিকটে দীক্ষিত হন। ভগীরথের চরণের সহিত গঙ্গার সংযোগ হওয়ায় গঙ্গার ভাগীরথী নাম হয়। সেইদিন হইতে জৈন সম্প্রদায়ের কাছে গঙ্গা পবিত্র তীর্থ।

৩য় চক্রবর্ত্তী—মঘবা। ৪র্থ সনৎকুমার। ৫ম শান্তিনাথ। ৬ষ্ঠ কুন্থুনাথ। ৭ম অরনাথ। ৮ম সুভৌম। ৯ম পদ্মনাথ। ১০ম হরিসেন। ১১শ জয়সেন। ১২শ ব্রহ্মদত্ত।

নারায়ণ।

নারায়ণেরা সন্ন্যাস-দীক্ষা গ্রহণ করেন না। রাজ্যাবস্থাতেই তাঁহাদের মৃত্যু হয়, এ জন্ত তাঁহারা নরকগামী হন। নরক ভোগ পূর্ণ হইলে নারায়ণেরা তীর্থঙ্করাদিরূপে জন্ম লাভ করিয়া মুক্ত হন। নারায়ণগণের নাম :—

১। ত্রিপিষ্ট। ২। দ্বিপিষ্ট। ৩। স্বয়ম্ভু। ৪। পুরুষোত্তম। ৫। নরসিংহ। ৬। পুণ্ডরীক। ৭। দত্তদেব। ৮। লক্ষ্মণ। ৯। কৃষ্ণ।

প্রতিনারায়ণ।

প্রতিনারায়ণেরাও সেই জন্মে মোক্ষ লাভ করিতে পারেন না—জন্ম-পরম্পরায় মুক্তির অধিকারী হন। নারায়ণের হস্তে সুদর্শন চক্র দ্বারা প্রতিনারায়ণগণের মৃত্যু হয়। এ পর্য্যন্ত নিম্নলিখিত ৯ জন প্রতিনারায়ণ উৎপন্ন হইয়াছেন:—

১। অশ্বগ্রীব। ২। তারক। ৩। মেরুক। ৪। নিশুম্ভ। ৫। মধুকৈটভ। ৬। প্রহ্লাদ। ৭। বলি। ৮। রাবণ। ৯। জরাসিন্ধু।

বলভদ্র।

নারায়ণের বিমাতার গর্ভে বলভদ্রগণ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতারূপে জন্মগ্রহণ করেন। বলভদ্রগণের নাম:—১। বিজয়। ২। অচল। ৩। ধর্ম্মপ্রভ। ৪। সুপ্রভ। ৫। সুদর্শন। ৬। নন্দী। ৭। নন্দিমিত্র। ৮। পদ্ম (রামচন্দ্র) ৯। বলদেব। ইনি নবম নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। দ্বাবিংশ তীর্থঙ্কর নেমিনাথের পিতৃব্য বসুদেবের ঔরসে দেবকীর গর্ভে শ্রীকৃষ্ণ ও রোহিণীর গর্ভে বলদেব উৎপন্ন হন। বলদেব, নেমিনাথেরও জ্যেষ্ঠ। শ্রীকৃষ্ণ, জরাসিন্ধুকে বধ করিয়াছিলেন এবং যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চ পাণ্ডবের সহিত তাঁহার পরম মিত্রতা ছিল।

বেদমূলক পুরাণাদি শাস্ত্রের সহিত জৈন শাস্ত্রের এই-রূপ কৌতূহলজনক ঐক্য ও অনৈক্য, প্রণিধানযোগ্য। পাঠক-পাঠিকাগণ অনুমোদন করিলে ভবিষ্যতে জৈন শাস্ত্র সম্মত রামচরিত্র, কৃষ্ণচরিত্র প্রভৃতি পৌরাণিক ইতিবৃত্ত বিস্তৃতভাবে প্রকাশ করিব।

বর্ত্তমান সময়ে 'অবসর্পিণী' কালের ৫ম বিভাগের প্রারম্ভ হইয়াছে। এই বিভাগের নাম—'দুঃসমা', ইহার স্থায়িত্ব ২১ হাজার বৎসর। এই কালে মানুষের আয়ুঃ, বল, দৈহিক দীর্ঘতা প্রভৃতি সকলই হ্রাস প্রাপ্ত হইবে। এই যুগের প্রারম্ভে মানুষের আয়ুঃ ১২০ বৎসর ও দৈহিক উচ্চতা ৭ হাত পরিমাণ ছিল। প্রতি হাজার বৎসরে ৫ বর্ষ হিসাবে আয়ুঃর হ্রাস হইতেছে এবং সর্ব্বশেষে দুই হাত পরিমাণ শরীর ও ২০ বৎসর আয়ুঃ হইবে। এই সময়ে ধর্ম্মের একেবারে অভাব হইয়া পড়িবে।

'অবসর্পিণী' কালের ৬ষ্ঠ বিভাগ—দুঃসমা-দুঃসমা। ইহা আরও অবনতির সময়। এই কালের ৩৯ দিন অবশিষ্ট থাকিতে পৃথিবীতে মহান্ উপপ্লবের সৃষ্টি হইবে। পশু, পক্ষী, মনুষ্য, গৃহ, গ্রাম, নগর—সমস্তই এই সময়ে ধ্বংস-মুখে পতিত হইতে থাকে। জৈন মতে ইহাই প্রলয়-কাল। এই সময়েই অবনতিরূপ 'অবসর্পিণী' কালের সমাপ্তি।

'অবসর্পিণী' কাল পূর্ণ হইলে উন্নতিরূপ 'উৎসর্পিণী' কালের আরম্ভ। ইহারও ছয়টী বিভাগ। প্রত্যেক বিভাগই ২১ হাজার বৎসর স্থায়ী। এই কালের ১ম বিভাগ—দুঃসমা-দুঃসমা। পূর্ব্বকালের যাহা কিছু পশু পক্ষী মনুষ্য প্রভৃতি কোনওরূপে আত্মরক্ষা করিতে পারিয়াছিল, তাহারা এই কালে উন্নতি লাভ করিতে থাকে। ২য় বিভাগ—দুঃসমা। এই কালে মনুষ্যের আয়ুঃ ও শরীর পরিমাণাদির ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতে থাকে। তৃতীয় বিভাগ—সুষমা-দুঃসমা। এই কালে 'অবসর্পিণী' কালের চতুর্থ বিভাগের ন্যায় পুনর্ব্বার চতুর্ব্বিংশতি তীর্থঙ্কর ও চক্রবর্ত্তী, নারায়ণ, প্রতিনারায়ণাদি ৬৩ শলাকাপুরুষ আবির্ভূত হন * এবং মানুষের ধর্ম্মপ্রবৃত্তি বাড়িতে থাকে। ইহার পর ৪র্থ দুঃসমা-সুষমা, ৫ম সুষমা ও ৬ষ্ঠ সুষমা সুষমা বিভাগ পরিপূর্ণ হইলে 'উৎসর্পিণী' কালের সমাপ্তি হয় এবং আবার পূর্ব্ববৎ 'অবসর্পিণী' কালের আরম্ভ। এই ভাবে প্রতিনিয়ত কাল-চক্রের গতি পরিবর্ত্তিত হইতেছে।

---

* এই যুগে শলাকাপুরুষগণের নামের পরিবর্ত্তন হয়। নিম্নে ভবিষ্যৎ তীর্থঙ্কর প্রভৃতির নাম প্রদত্ত হইল।—

তীর্থঙ্কর—মহাপদ্ম, সুরদেব, সুপার্শ, স্বয়ম্প্রভ, সর্ব্বাত্মভূত, দেব-পুত্র, কুলপুত্র, উদঙ্ক, প্রোষ্ঠিল, জয়কীর্ত্তি, মুনিসুব্রত, অর, উপায়, নিষ্কষায়, বিপুল, নির্ম্মল, চিত্রগুপ্ত, সমাধিগুপ্ত, স্বয়ংবর, অনিবর্ত্তী, বিজয়, বিমল, দেবপাল, অনন্তবীর্য্য।

চক্রবর্ত্তী—ভরত, দীর্ঘদন্ত, মুক্তদন্ত, গূঢ়দন্ত, শ্রীষেন, শ্রীভূত, শ্রীকান্ত, পদ্ম, মহাপদ্ম, বিচিত্রবাহন, বিমলবাহন, অরিষ্টসেন।

বলভদ্র—চন্দ্র, মহাচন্দ্র, চক্রধর, হরিচন্দ্র, সিংহচন্দ্র, বরচন্দ্র, পূর্ণ-চন্দ্র, সুচন্দ্র, শ্রীচন্দ্র।

নারায়ণ—নন্দি, নন্দিমিত্র, নন্দিসেন, নন্দিভূতি, সুপ্রসিদ্ধবল, মহাবল, অতিবল, ত্রিপৃষ্ঠ, বিভু।

গুণভদ্রাচার্য্যের "উত্তরপুরাণে" এই সকল নাম আছে। কিন্তু অনেক অন্বেষণ করিয়াও 'প্রতিনারায়ণে'র নাম পাই নাই।

বৈদিক শাস্ত্রমতেও সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি—এই চারিযুগ ক্রমশঃ আবর্ত্তিত হইতেছে। কলির পর আবার সত্যাদি যুগের প্রারম্ভ হইবে এবং পূর্ব্বের ন্যায় যথাযথ অবতারাদি আবির্ভূত হইবেন। আবার রাম-রাবণের যুদ্ধ, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ প্রভৃতি সংঘটিত হইবে—ভবিষ্যৎ আবার অতীতের গর্ভে প্রবেশ করিবে।

অর্চ্চনার "সাহিত্য প্রসঙ্গে"র প্রতিবাদ।

[শ্রীগোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়]

'অর্চ্চনা' পত্রিকায় বিগত বর্ষের চৈত্র সংখ্যার বঙ্গীয় কর্ম্মকার সম্মিলনীর অধিবেশনে শ্রীযুক্ত প্রিয়লাল দাস এম, এ, বি, এল মহাশয়ের অভিভাষণের মর্ম্মানুসারে নিজ মন্তব্যযুক্ত শ্রীযুক্ত কৃষ্ণদাস চন্দ্র মহাশয় লিখিত "সাহিত্য প্রসঙ্গ" শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠে আমরা সন্তোষ লাভ করিতে পারি নাই। কেবল আমরা বলিয়া কেন, নিরীহ, সদনুষ্ঠানে প্রবৃত্তিপরায়ণ কর্ম্মার-ক্ষত্রিয় সমিতির ধর্ম্মপ্রাণ সভ্যগণের বিরুদ্ধে যে সকল অযৌক্তিক, অপ্রাসঙ্গিক ও তাচ্ছিল্যভাবব্যঞ্জক অযথা আক্রমণ করা হইয়াছে, তৎপাঠে নিরপেক্ষ শিক্ষিত ব্যক্তমাত্রেই আন্তরিক দুঃখ ও বিরক্তি-প্রকাশ করিয়াছেন ও করিতেছেন। নিদর্শন-স্বরূপ বিক্রমপুর তারপাশা কুলীন সমাজপতি পূর্ব্ববঙ্গ সারস্বত সমাজভুক্ত সুপ্রসিদ্ধ অধ্যাপক ও পূর্ব্ববঙ্গের প্রসিদ্ধ কবি, ইন্দুমতী কাব্য, গন্ধর্ব্ব-নন্দিনী কাব্য (পদ্য কাদম্বরী) ও ক্ষত্রিয় ক্রিয়া-কৌমুদী ইত্যাদি গ্রন্থ-প্রণেতা পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রসিকচন্দ্র রায় মহাশয় সাহিত্যার্ণব কবিরত্ন মহোদয় লিখিত নিম্নোক্ত প্রতিবাদ দর্শনে উহা ব্যক্তিমাত্রেই উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

আমরা বিশেষরূপ অবগত আছি যে, কর্ম্মার ক্ষত্রিয় বা ক্ষত্রিয়-কর্ম্মার সমিতির হিংসা দ্বেষাদি জঘন্য বৃত্তির পরিচয় প্রদান করা বাঞ্ছনীয় নয়, কিন্তু "সাহিত্য প্রসঙ্গ" প্রবন্ধ পাঠে উক্ত জাতীয় ব্যক্তিগণ মধ্যে যদি কেহ প্রবন্ধ মরীচিকার মায়াজালে বিমোহিত হইয়া বিপথে পরিচালিত হন সে আশঙ্কায় বর্ণিত পণ্ডিত মহাশয়ের লিখিত প্রতিবাদ প্রচার করিতে বাধ্য হইলাম।

"সাহিত্য-প্রসঙ্গ" শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠে হাস্যতরঙ্গের লীলা বৈচিত্র্য দর্শনে প্রতিবাদ ছলে লিখিতে বাধ্য হইলাম যে, প্রবন্ধটী যেমন হাস্যরসাত্মক,নামটীও তেমন "সাহিত্য প্রসঙ্গ নাটক" বা "ব্যঙ্গ-প্রসঙ্গ" লিখিলে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইত। কারণ, রঙ্গমঞ্চে যেমন একই ব্যক্তির দ্বারা বিভিন্ন সাজে বিভিন্ন প্রকার রসের অবতারণা হইয়া থাকে,সেইরূপ প্রবন্ধটী একই লক্ষ্যবিষয়ক হইলেও পরস্পর-বিরুদ্ধ তিনটী ভাবের অবতারণা করায় আদর্শ সংক্ষিপ্ত নাটকস্থানীয় হইয়াছে সন্দেহ নাই। প্রবন্ধে উপদেশের ছাঁচে লিখিত হইয়াছে যে, "কায়স্থ জাতি ত্রিশ বৎসর যাবৎ আন্দোলন করিয়াও যখন আজ পর্য্যন্ত নিজেদের ললাট হইতে শূদ্রত্বের ছাপ অপসারিত করিতে পারিলেন না, তখন শিল্পজাতি কর্ম্মকারগণ যদি ক্ষত্রিয়ত্বের টীকা পরিলেই ক্ষত্রিয় হইবার আশা করিয়া থাকেন, তাহা হইলে সে আশা যে কতদূর ফলবতী হইবে, তাহা আমার সামান্য বুদ্ধি ঠিক করিয়া উঠিতে অক্ষম।"

সভাপতি দাস মহাশয়, শুধু ক্ষত্রিয়বাদী ক্ষত্রশ্রেণীর কর্ম্মকারদিগের উপর নয়, প্রসঙ্গক্রমে ক্ষত্রিয়বাদী কায়স্থ শ্রেণীর উপরও কুটিল কটাক্ষপাত করিয়াছেন। সম্ভ্রান্ত কায়স্থবর্গ বা কর্ম্মকারশ্রেণী বিশেষ (ক্ষত্রী কর্ম্মকারবর্গ) আপনাদিগের পূর্ববর্ণ বা জাতিমতে যথাসাধ্য সমাজ-সংস্কার আদি করিতে সচেষ্ট হইয়াছেন, ইহাতে দাস মহাশয়ের বিদ্বেষ প্রকাশের কি রহস্য আছে তাহা বুঝিতে পারি না। প্রাচীন আর্য্য হিন্দুসমাজে চাতুর্ব্বর্ণ্যের সামঞ্জস্য ছিল, বর্ত্তমানে বঙ্গীয় হিন্দুসমাজে ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-মূলক শ্রেণীগুলির যে পুনর্ব্বিকাশের আবশ্যক, একথা দাস মহাশয় তাঁহার তথাকথিত "সামান্য বুদ্ধিতে" বুঝিতে না পারুন, হিন্দুসমাজের প্রায় সর্ব্বজাতীয় হিতৈষী নেতৃবৃন্দ বুঝিয়াছেন।

সকল জাতি বা শ্রেণীর মধ্যেই অল্পবিস্তর জাতিতত্ত্বের আন্দোলনাদি হইতেছে ও হইবে। অন্যান্য মধ্যে কবীন্দ্র শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহার "ভারতবর্ষ" নামক সন্দর্ভে যে প্রসঙ্গ করিয়াছেন, তাহার মর্ম্ম এই যে, বঙ্গীয় হিন্দুসমাজে কোন কোন জাতি যে ক্ষত্রিয় বৈশ্য-মূলত্ব লইয়া আন্দোলন করিতেছে, ইহা দেশ ও সমাজের পক্ষে হিতকর। এইরূপ হিন্দুসমাজের কল্যাণকামী প্রত্যেক ব্যক্তিই সবিশেষ চিন্তা করিয়া দেখিলে এই মূল্যবান অভিমতের সারত্ব উপলব্ধি করিতে পারিবেন। ক্ষত্রিয়কর্ম্মার সমাজ কালের তরঙ্গাবর্ত্তে পূর্ব্বগৌরব ও গুণকর্ম্মের বিস্মৃতি-ফলে অনাচার তমসাচ্ছন্নতা হইতে নিজ জাতিকে পুনরুদ্ধার করিবার জন্য যে প্রয়াসী হইয়াছেন, তাহা যুক্তিযুক্তই হইয়াছে। নদীয়া বিশ্বমানন্দ মহামণ্ডলের জ্ঞানবৃদ্ধ ও বয়োবৃদ্ধ পণ্ডিতমণ্ডলী, কাশী, প্রয়াগ ও বিক্রমপুর প্রভৃতি ভারতের নানাস্থানের সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণ শাস্ত্রীয় যুক্তি সংযোজিত করিয়া বর্ণিত সদনুষ্ঠানের জন্য ক্ষত্রিয়-কর্ম্মার সমাজকে উৎসাহিত ও প্রশংসিত করিয়াছেন।

(নিম্নে বিশ্বমানন্দ মহামণ্ডলের অভিমত উদ্ধৃত করা হইল)

কল্যাণনিকেতন মান্যবর শ্রীযুক্ত রাধারমণ রায় বর্ম্মণ,

মহাশয় ক্ষেমাস্পদেষু।

কুশলালয়েষু,—

"গুণ এবং কর্ম্মের স্বরূপ বিবেচিত হইলে বর্ণ বিনির্ণীত হয়। যাহার যাদৃশ কর্ম্ম এবং যদ্রূপ গুণ তাহার তদনুগত বর্ণ ইহা শাস্ত্রীয় অভিমত। সম্প্রতি ভারতবর্ষীয় হিন্দু সমাজে বর্ণ-সাঙ্কর্য্য নিবন্ধন হিন্দুধর্ম্মের প্রধান বিশেষত্ব বর্ণ-বিশ্লেষণ কার্য্য দুঃসাধ্য হইয়া পড়িয়াছে। তাহার প্রধান কারণ স্ব স্ব বৃত্তি-বিচ্যুত পরধর্ম্মাশ্রিত বর্ণবৃন্দ আত্ম-বৈশিষ্ট্য বিসর্জ্জন দিয়া পরবৃত্ত্যাশ্রয়ী হইয়াছেন। কে কোন্ বর্ণান্তর্ভুক্ত তাহার কার্য্যপটুত্ব ও গুণবত্তা দর্শনে নির্দ্দেশিত হইতে পারে, কিন্তু বর্ত্তমানকালীন বিভিন্ন দেশীয় ভাব প্লাবনে নর্ত্তিত হিন্দু সমাজে স্ব স্ব পূর্ব্ব পৌরুষেয় আনুক্রমিক ধারানুবর্ত্তী ব্যক্তির সংখ্যা বিরল হইয়া যাইতেছে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই বর্ণ চতুষ্টয়ের মধ্যে ক্ষত্রিয় বর্ণই অন্যতম প্রধান বর্ণ। ব্রাহ্মণানুগত ক্ষত্রশ্রেণী চতুর্ব্বর্ণের রক্ষণী-শক্তি বলিয়া খ্যাত। ক্ষত্রশ্রেণীর সহায়তাই হিন্দুসমাজের উৎকর্ষের মূলীভূত কারণ। কালের তরঙ্গাবর্ত্তে এই উত্তম বর্ণটী আত্ম-স্বরূপ বিস্মৃত হইয়া নিজেদের জ্যোতির্ম্ময় দিব্য মহিমা উপলব্ধির পরিবর্ত্তে শূদ্র পর্য্যায়ে ধারণা করিয়াছিলেন। প্রকৃতপক্ষে ব্রাহ্মণের যেরূপ শ্রেণী-বৈচিত্র্য আছে ক্ষত্রিয়গণেরও সেইরূপ শ্রেণী-বৈচিত্র্য আছে। কর্ম্মকার নামাভিধেয় অস্ত্রনির্ম্মায়ক শ্রেণী বিশেষ ক্ষত্রকুল সম্ভূত হইলেও এ যাবৎ তাঁহারা শাস্ত্র-সন্ধান বিমুখ থাকায় ক্ষত্রিয়ত্ব বিষয়ে সন্দিগ্ধ ছিলেন, অনুসন্ধানও করেন নাই। কিন্তু উপস্থিত সন্ধিক্ষণে হিন্দুধর্ম্মের তমোময় যবনিকা উন্মোচিত হওয়ায় একটা সামাজিক নবজাগৃতি প্রলক্ষিত হইতেছে। সকলেই স্ব স্ব মাহাত্ম্য দর্শনে হর্ষযুক্ত ও সন্ধানানুরক্ত হইতেছেন। প্রোক্ত কর্ম্মকার শ্রেণীর গুণ ও কর্ম্ম বিচার মূলে দেখিতে পাই তাহারা লৌহাদির শিল্পী। অস্ত্র যন্ত্রাদির গঠন এই শ্রেণীর প্রধান কার্য্য। যদি অস্ত্র শস্ত্রাদি ইহাদের গঠিত বস্তু হয়, তবে ইহাও উপমিতির দ্বারা নির্ণয় করা যায়, যে ইহারাই স্ব-বিসৃষ্ট অস্ত্রাদির অস্ত্রী ছিলেন। যদি উপবীতপ্রাপ্ত ব্রাহ্মণগণ নিজেদের পূর্ব্বপুরুষগণকে বেদ-বিরচক বলিতে পারেন, অনুরূপ প্রবর্ত্তনায় ঐ কর্ম্মার-বৃন্দও ক্ষত্রিয়ত্ব প্রমাণিত করিতে পারেন, যেহেতু তাঁহারা অস্ত্রশস্ত্রাদির উদ্ভাবক ও প্রণেতা, অতএব তাহার ব্যবহর্ত্তাও তাঁহারাই। বীরত্ব-প্রকাশক মহাবলযুক্ত বিষম সমরজয়ী অস্ত্রযন্ত্রাদি স্রষ্টাগণই এককালে পৃথিবীর রাজা ছিলেন; রাজা হইবার অধিকার ক্ষত্রিয় ভিন্ন পুরাকালে আর কাহারও ছিল না, অতএব বীর পরাক্রমে যাহাদের গুণ এবং পরাক্রান্ত অস্ত্রাদি গঠন যাহাদের কর্ম্ম তাঁহারা অবশ্যই পরাক্রান্ত ক্ষত্রিয় ইহা ঘাতসহ বিচার। আমরা শাস্ত্র প্রমাণেও প্রবীকর্ম্মকার বা কর্ম্মার ক্ষত্রিয় সংসদের ক্ষত্রিয়ত্ব সম্বন্ধীয় অনেক সদযুক্তি সঙ্কুল কথা লক্ষ্য করি। প্রবীকর্ম্মকার বা কর্ম্মার ক্ষত্রিয়গণ নিশ্চয় ক্ষত্রিয়কুল সঞ্জাত এবং ঋষিবংশ, ইহাই আমাদের মন্তব্য।

অবসাদের হিমময় কর্দ্দম-কুণ্ড হইতে সোদ্যমে উত্থিত হইয়া উৎসাহের আগ্নেয় স্রোতে নিজেদের ভাসাইয়া দিয়া বাত্যাবেগে সার্থকতার সর্ব্বতোরণকূলে উপনীত হওয়াই

মনুষ্যত্ব। জাগরণই বীরত্ব, স্তিমিতনিদ্রায় ক্লৈব্য। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে কর্ম্মার ক্ষত্রিয় ভ্রাতৃবৃন্দের কার্য্যে অভিমত প্রদান করিলাম। তাঁহারা নিজেকে চিনিয়াছে, ইহা বড়ই পুলকের কথা। পথ ভিন্ন হইলেও চারিবর্ণ মনুষ্যেরই গন্তব্য কেন্দ্র সেই বিবুধবন্দিত বিষ্ণুপাদমূলে,—চল ভাই,—সোৎসাহে আর্য্যধর্ম্মের বিজয়-কেতন স্কন্ধে লইয়া হিন্দু ধর্ম্মকে জয়যুক্ত করিতে প্রয়াসী হই। "অভয়"কে বুকে ধরিলে আমরা জয়ী হইব, ইহা সত্য।—বিজ্ঞপ্তিরেখা।

শুভার্থিণঃ—পরিব্রাজক—শ্রীনারায়ণ দাস চট্টোপাধ্যায় বিদ্যাভূষণ, ভারতী, তত্ত্ব বাচস্পতি কৃতি-নিধি, তর্ক চিন্তামণি, সিদ্ধান্ত-বিশারদ, প্রণবকণ্ঠ দেবশর্ম্মণঃ।

স্থানাভাবে উক্ত মতের সমর্থনকারী মাত্র কতিপয় সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত ও বিশিষ্ট ব্যক্তির নাম প্রদত্ত হইল।

১। দেশপূজ্য শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'বেঙ্গলী"র সম্পাদক। ২। ৺মতিলাল ঘোষ 'অমৃত-বাজার' পত্রিকার সম্পাদক। ৩। সার্ভেণ্ট, নব্যভারত, বঙ্গরত্ন, সময়, মানসী, মালঞ্চ ও সারথী প্রভৃতি অন্যান্য কতিপয় পত্রিকার সম্পাদকবর্গ। ৪। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, প্রিন্সিপাল, সংস্কৃত কলেজ। ৫। ৺উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন। ৬। শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ কাব্যতীর্থ। ৭। শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার কাব্যতীর্থ। ৮। শ্রীযুক্ত রাধাবল্লভ দেবশর্ম্মা,রাজকীয় সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক, স্মৃতি ব্যাকরণ (জ্যোতিষ শাস্ত্রী)। ৯। শ্রীযুক্ত জগচ্চন্দ্র স্মৃতিতীর্থ। ১০। শ্রীযুক্ত রামশঙ্কর শাস্ত্রী বেদান্ততীর্থ। ১১। শ্রীযুক্ত তারকনাথ বিদ্যারত্ন। ১২। শ্রীযুক্ত রসিকচন্দ্র সাহিত্যার্ণব, কবিরত্ন, কাব্যবিনোদ। ১৩। শ্রীযুক্ত কালীপদ রায় মহাশয় কাব্য ব্যাকরণ শাস্ত্রতীর্থ। ১৪। কাশীর শ্রীযুক্ত শ্রীমন্ত গোস্বামী। ১৫। শ্রীযুক্ত হরিনাথ বিদ্যারত্ন। ১৬। শ্রীযুক্ত দামোদর শাস্ত্রী কাব্য-ন্যায়রত্ন সাহিত্য দর্শনাচার্য্য। ১৭। শ্রীযুক্ত রামদেব বাচস্পতি। ১৮। শ্রীযুক্ত কালীকান্ত কাব্যতীর্থ। ১৯। শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র ন্যায়রত্ন। ২০। শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্করত্ন। ২১। শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রনাথ জ্যোতিষশাস্ত্রী। ২২। শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন জ্যোতির্ভূষণ। ২৩। শ্রীযুক্ত দেবনাথ কাব্যতীর্থ। ইত্যাদি। এতদ্ভিন্ন মহামান্য ভারতের যুবরাজ প্রিন্স অব্ ওয়েলস্, মহামান্য ডিউক অব্ কনট্, মহামান্য লর্ড রীডিং, লর্ড কারমাইকেল, লর্ড রোনাল্ডসে ও লর্ড লিটন্ এই বঙ্গীয় কর্ম্মার সমিতির প্রতি বিশেষ সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত প্রিয়লাল দাস মহাশয়ের প্রোক্ত অভিভাষণের স্থান বিশেষে লিখিত আছে, "আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি একাধিক ক্ষত্রিয়বাদী কর্ম্মকার 'দেব' 'বর্ম্মণ' প্রভৃতি উপাধি পৈত্রিক পদবীর শেষে জুড়িয়া দিয়া পোষ্টকার্ড ও চিঠির কোণে বসাইয়া আস্ফালন করিতেছেন। * * * এতদ্ব্যতীত মুষ্টিমেয় ক্ষত্রিয়বাদী কর্ম্মকারের উক্ত প্রকার কপটতার ফলে লোকসমাজে সমগ্র কর্ম্মকার জাতির দুর্নাম রটিবে ইত্যাদি।"

ইহার উত্তরে আমি বলিতে চাই সব শ্রেণীর কর্ম্মকারগণ একই বর্ণ বা জাতিমূলক নহে। সার হার্ব্বার্ট রিজ্‌লীর ইংরাজি-ভাষায় লিখিত বঙ্গজাতিমালা গ্রন্থ ও গভর্ণমেণ্টের সেন্সাস্ রিপোর্টগুলি পাঠেও ইহা অবগত হওয়া যায়। কর্ম্মকার বা ইহার অপভ্রংশ "কামার" নামে ক্ষত্রিয়েতর শূদ্রাদি বর্ণমূলক শ্রেণীও আছে। এমন কি, এই নামীয় কোন কোন অনাচরণীয় হীন শূদ্র শ্রেণী দৃষ্ট হইতেছে। ক্ষত্রী বা প্রধীশ্রেণীর কর্ম্মকারগণ কখনও সবশ্রেণীর কর্ম্মকার বা কামার নামে পরিচয়প্রদ অন্যেতর শ্রেণীগুলিকে স্বজাতীয় মনে করেন না। সুতরাং ক্ষত্রিয় কর্ম্মকার শ্রেণীর ক্ষত্রিয়ত্ব প্রচারে বা কোন কোন বিলুপ্ত সংস্কার পুনর্গ্রহণে ভিন্ন বা বর্ণেতর শ্রেণীর কর্ম্মকারদিগের দুর্নাম বা অপদস্থতা সহ্য করিবার কোনই সঙ্গত কারণ নাই। আর এক কথা, ক্ষত্রিয় শ্রেণীর কর্ম্মকারদিগের সংখ্যা শ্রীযুক্ত দাস মহাশয়ের কষ্ট কল্পনাপ্রসূত বা তথাকথিত মুষ্টিমেয় নহে—বর্ণেতরবাদী বা শূদ্রদাসবাদী কর্ম্মকার শ্রেণী কয়েকটীর সংখ্যার চেয়ে ইহাদের সংখ্যা আদৌ ন্যূন বলিয়া মনে হয় না। আমরা বাংলার অনেক জেলায় কর্ম্মকারদিগকে প্রধী বা ক্ষত্রিয় শ্রেণীর কর্ম্মকার বলিয়া পরিচয় দিতে বা স্বীকার করিতে শুনিয়াছি। এ সব বিষয় দাস মহাশয় বিশেষ প্রণিধানপূর্ব্বক দেখিবেন। উপাধি পরিবর্ত্তন বা উপাধি

গ্রহণ বহুকালাবধি আব্রাহ্মণ শূদ্র অন্ত্যজ জাতির নানা শ্রেণীর লোকের মধ্যেই ঘটিয়া আসিতেছে। কান্যকুব্জ হইতে আদি-শূর আনীত পঞ্চ সাগ্নিক ব্রাহ্মণের পূর্ব্ব উপাধি পশ্চিম দেশীয় পণ্ডিতের উপাধির ন্যায় উপাধ্যায় ছিল। বল্লালী ছাপ পাড়-বার সময় নবগুণ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ কুলীন এবং অষ্টগুণ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ শ্রোত্রীয় ও কতিপয় বংশজ শ্রেণীভুক্ত হন। তখন তাঁহাদের বংশধরগণের ঠাকুর, চক্রবর্ত্তী, ইত্যাদি উপাধি ছিল। তৎপর বিষ্ণু ঠাকুরের বংশধরগণ 'মুখোপাধ্যায়', রঘুরাম চক্রবর্ত্তীর চৌদ্দ পুত্র 'বন্দ্যোপাধ্যায়' ইত্যাদি উপাধি ধারণ করেন। আমরা জানিয়াছি, যাহারা বর্ত্তমানে দাস মহাশয়ের নেতৃত্বাধানে বঙ্গীয় কর্ম্মকার সম্মিলনীর বিশিষ্ট সভ্য, তাঁহাদের অনেকেই উপাধি-পরিবর্ত্তন করিয়াছেন এবং উপাধি ব্যবহারে দাস মহাশয়ের প্রসঙ্গিত কপট লুকোচুরি খেলিতেছেন। বাংলার অনেক সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ, বৈদ্য পরিবারে নিত্য ব্যবহৃত দলিল দস্তাবেজগত পারি-বারিক উপাধি "রায়" "চৌধুরী", "মজুমদার" ইত্যাদি আছে। কিন্তু ইহারা বৈদিক ক্রিয়াকলাপে বা সামাজিক চিঠি পত্রাদিতে এবং আবশ্যক মত অন্যস্থলে বর্ণগত সাধারণ উপাধি "দেবশর্ম্মণ" "গুপ্ত" বা অপর কুলগত উপাধি ব্যবহার করিয়া থাকেন। এমতে ক্ষত্রিয় শ্রেণীর কর্ম্মকার-গণ যদি ঐরূপ স্থলে বর্ণগত 'বর্ম্মণ' উপাধি বা উহাদের কাহারও কুলগত 'দেব' উপাধি ব্যবহার করেন তাহাতে বিস্ময়ের কোনই কারণ নাই। শ্রীযুক্ত প্রিয়লাল দাস মহাশয়ের লিখন-ভঙ্গীতে বুঝা যায়, তিনি ক্ষত্রিয় শ্রেণীর কর্ম্মকার নন, ভিন্ন শ্রেণীর কর্ম্মকার। আমরা যতদূর জানি, তাহাতে বলিতে প্রয়াস পাই যে, দাস মহাশয়ের ব্যঙ্গমূলক লিপির ইঙ্গিতে আভিজাত্যবোধী ক্ষত্রিয় শ্রেণীর কর্ম্মকারবর্গ কখনও টলিবে না ও টুটিবে না।

উপসংহারে আমাদিগের বড়ই দুঃখের বিষয় 'অর্চ্চনা'র মাননীয় অন্যতম সম্পাদক শ্রীযুক্ত কৃষ্ণদাস চন্দ্র মহাশয় সামাজিক ব্যাপারটী আদ্যোপান্ত সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে না বুঝিয়া শুনিয়া প্রোক্ত দাস মহাশয়ের অভিভাষণ-অংশ ও তৎসহ নিম্ন টিপ্পনী পত্রিকাস্থ করিয়াছেন। এইরূপ বিদ্বেষ-ব্যঞ্জক লিখন প্রকাশে অর্চ্চনারই পবিত্রতা-রক্ষণে ত্রুটি ঘটিবে। কিমধিকমিতি। *

* স্থানাভাবে এ সংখ্যায় এই প্রবন্ধ সম্বন্ধে বক্তব্য প্রকাশিত করিতে পারিলাম না।—শ্রীকৃষ্ণদাস চন্দ্র।

চাঁদপ্রতাপের ব্রতকথা।

[শ্রীযোগেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী]

(৭) নিরাকুলী।

কোন বিপদ-আপদ হইতে রক্ষা পাইবার আশায় ললনাবৃন্দ নিরাকুলী * ব্রত করিয়া থাকেন। কোন কোন গৃহে বিবাহাদি কর্ম্মের পরও এই ব্রত করা হয়। যে কোন মাসের রবি কিম্বা বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার পর ব্রত করিতে হয়। ব্রতিনী দিবাভাগেই ব্রতের আয়োজন করিয়া থাকেন। সাধ্যানুযায়ী সোয়া এক গণ্ডা (পাঁচটা), সোয়া পাঁচ গণ্ডা কিম্বা সোয়া শত নিখুত পান, কয়েকটী 'আস্ত', (অকর্ত্তিত) সুপারি, কিছু খয়ের ও বাতাসা, সাধ্যানুসারে সন্দেশাদি মিষ্টান্ন, এক পাত্র তৈল, কিয়ৎ পরিমাণ সিন্দুর, কয়েকটা ধান ও দুর্ব্বা একখানি থালায় সাজাইয়া দিতে হয়। একটী 'পুতা' (নোড়াপেষণি) পরিষ্কৃত গৃহে একখানি আসনে স্থাপন করিতে হয়। তৎপর উহাতে তৈল ও সিঁদুরের ফোটা দেওয়া হইয়া থাকে। উহার সম্মুখে আম্র পল্লবাদি দ্বারা একটী ঘট স্থাপন করা হইয়া থাকে। ব্রতিনী যথাসময়ে মহিলাগণকে ব্রত-স্থানে ডাকিয়া আনিয়া

* কোনও কোনও অঞ্চলে "নিরাকালী"ও বলা হয়।—লেখক।

থাকেন। বালক বালিকারাও বিনা আহ্বানেই তথায় সমবেত হইয়া থাকে। জনৈকা মহিলা ভক্তি সহকারে 'কথা' বলিয়া থাকেন। 'কথা'র কিছু বাকী থাকিতে উপকরণাদি নিরাকুলী (ভগবতী) দেবীকে নিবেদন করিয়া দেওয়া হয়। 'কথা' শেষে ললনাগণ এক 'ঝাক' (বার) হুলুধ্বনি করিয়া থাকেন। তৎপর পান বাতাসা ইত্যাদি সকলকে দেওয়া হইয়া থাকে। সধবা স্ত্রীলোকদের মাথায় তেল এবং সিঁথিতে ও কপালে সিঁদূর দেওয়া হয়। এই পান যাঁহারা চর্ব্বণ করেন, তাঁহারা উহার কিছুই ফেলিতে পারেন না।

'কথা'।—এক ছিলেন রাজা। তাহার এক মহিষী ও এক পুত্র। ধর্ম্ম কর্ম্মে রাণীর যেমন মতি ছিল, রাজার তেমন ছিল না।

একদা রাণী নিরাকুলী ব্রতের আয়োজনে রত আছেন। সেই সময় রাজা রাণীর সহিত দেখা করিবার ইচ্ছায় অন্দর-মহলে আসিয়া, তাঁহাকে এধর-ওধর খুঁজিয়া না দেখিতে পাইয়া ক্রোধান্বিত হন এবং অবশেষে তাঁহার দেখা পাইয়াও ডাকিয়া উত্তর না পাইয়া ব্রতের উপকরণাদি লাথি মারিয়া নষ্ট করিয়া ফেলেন। দেবীর কোপে সুখ ঐশ্বর্য্য সকলই তাঁহার অচিরে বিনষ্ট হইল। রাজা নামে মাত্র রাজা রহিলেন। তাঁহার দিন চলা ভার হইয়া উঠিল। একদিন তিনি স্ত্রী পুত্র সহ রাজ্য ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন। রাণী ছিলেন তখন গর্ভবতী।

একদেশে এক বনের ভিতর কুড়ে বাঁধিয়া রাজা,রাণী ও পুত্রের সহিত অতি কষ্টে কালযাপন করিতে লাগিলেন। একদিন রাণীর প্রসব বেদনা উপস্থিত হইল, ও নিরাপদে একটী পুত্র সন্তান জন্মিল। রাণীর তখন জলের নিতান্ত প্রয়োজন হইল। রাজা জল আনিতে নদীর দিকে চলিলেন।

এদিকে সেই দেশের নিঃসন্তান রাজার কাল হওয়ায় রাজহস্তী রাজসিংহাসনে বসাইবার নিমিত্ত কপালে রাজ-টীকাওয়ালা মানুষ অনুসন্ধান করিতে করিতে সেই রাজার সম্মুখীন হইয়া তাঁহাকে নিজ পিঠে উঠাইয়া লইয়া গেল।

রাজা, স্ত্রী-পুত্রাদির কথা বিস্মৃত হইলেন। রাণী রাজার প্রত্যাগমন প্রতীক্ষায় অনেকক্ষণ বৃথা বসিয়া থাকিয়া শেষে নবজাত শিশুটীকে জ্যেষ্ঠের নিকট রাখিয়া নিজেই জল আনিতে গেলেন। তিনি নদীর ঘাটে যাইয়া দেখিলেন এক সদাগরের নৌকা ঘাট আগলাইয়া রহিয়াছে, ও মাঝিরা উহা ভাসাইবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু কিছুতেই উহা স্থানচ্যুত হইতেছে না। জল লইবার ইচ্ছায় রাণী মাঝিদিগকে সত্বর নৌকা সরাইতে বলিলেন। তাহারা বলিল যে,সেই অভিপ্রায়ও তাহাদের, কিন্তু তাহারা কৃতকার্য্য হইতে পারিতেছে না। রাণী তাহাদের নিষ্ফল চেষ্টার কথা শুনিয়া বলিলেন যে, তিনি একাই অনায়াসে নৌকা ভাসাইয়া দিতে পারেন। মাঝিরা এ কথা শুনিয়া অবিশ্বাসের হাসি হাসিল এবং কোন উত্তরই দিল না; কিন্তু নৌকার ভিতর হইতে সদাগর ইহা শুনিয়া রাণীকে নৌকা ভাসাইতে অনুরোধ করিলেন। রাণী নিরাকুলী দেবীকে স্মরণপূর্ব্বক নৌকা স্পর্শ করিবা মাত্রই উহা ভাসিয়া গেল। সদাগর ইহা দেখিয়া অতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন এবং ভবিষ্যতে উপকারের আশায় রাণীকে নৌকায় উঠাইয়া লইলেন। সতীত্ব রত্ন রক্ষার উদ্দেশে দেবীকে রাণী কুরূপ ও কুষ্ঠব্যাধির প্রার্থনা করিলেন। সুরূপা রাণী অচিরেই কুরূপা হইলেন, ও কুষ্ঠব্যাধিতে তখনই তাঁহার সর্ব্বশরীর আক্রান্ত হইল। হঠাৎ তাঁহার দেহের এরূপ পরিবর্ত্তন দেখিয়া নৌকার সকলেই অত্যন্ত বিস্মিত হইল।

পিতামাতা উভয়েই জল আনিতে গিয়া ফিরিয়া না আসায় জ্যেষ্ঠ রাজকুমার নবজাত ভাইটীকে লইয়া ভয়ে দিশাহারা হইল। এদেশের রাজবাড়ীর নিকটেই এক গোয়ালার একটী 'কবিলেশ্বরী' গাই ছিল। গোয়ালা রোজই চরিয়া খাইবার জন্য গাইটীকে বনের দিকে ছাড়িয়া দিত। সেইদিন গাইটি হঠাৎ রাজকুমারদের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। বড় ভাই ছোট ভাইকে পেট ভরিয়া গাইয়ের দুধ খাওয়াইল। সেই দিন হইতে রোজই গাইটি তথায় যাইত। কুমারেরা উহার দুধ খাইয়াই বাঁচিয়া রহিল। শীঘ্রই গোয়ালা উহা টের পাইল। একদিন সে গাইয়ের পশ্চাদনুসরণ করিয়া ছেলে দুইটীর নিকট উপস্থিত হইল এবং তাহাদিগকে দেখিয়া পরম পুলকিত হইল। তখনই সে তাহাদিগকে নিজ বাটীতে লইয়া গেল। গোয়ালা

নিঃসন্তান ছিল। তাহার পরামর্শানুসারে গোয়ালিনী ছোট ছেলেটীকে লুকাইয়া রাখিল ও ঘরে ঘরে ঘোল বেচিবার অছিলায় নিজের দশম মাস গর্ভাবস্থার কথা প্রচার করিল। কালক্রমে বড়টীকে পালিত ও ছোটটিকে নিজ গর্ভজাত পুত্র বলিয়া গোয়ালিনী সকলকে জানাইল।

অনেক কাল চলিয়া গিয়াছে। রাজপুত্রদ্বয় লেখাপড়া শিখিয়া ঘাট-সরকারের কাজে লাগিয়াছে। নদীর তীরে একখানা ঘরে থাকিয়া তাহারা কাজ কর্ম্ম করে। একদিন সন্ধ্যার পর সেই সদাগরের নৌকাখানি সেই ঘাটে আসিয়া লাগিল। এই খানেই উহা সারারাত্রি রহিবে।

এই নৌকাতেই সেই অবস্থাই রাণী ছিলেন। তিনি স্বপাক ভোজন করিতেন। নদীতীরে তিনি রন্ধন করিতেছিলেন। সেই সময় কথাপ্রসঙ্গে বড় ভাই কনিষ্ঠকে, তাহারা যে গোয়ালার ছেলে নয় একথা এবং তাহাদের বাপ মা, বাড়ী ঘর ইত্যাদির কথা সবিস্তার বলিল। রাণী ইহা শুনিতে পাইয়া দৌড়িয়া তাহাদের কাছে গেলেন। তখনই তিনি নিজ পরিচয় দিয়া আদরে তাহাদিগকে জড়াইয়া ধরিলেন। বলা বাহুল্য যে, ছেলেদের সম্মুখীন হইবার পূর্ব্বেই, তিনি পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কুরূপ কুব্যাধি তাঁহার শরীরে ছিল না। গোয়ালা ও গোয়ালিনী খবর পাইয়া অবিলম্বে তথায় উপস্থিত হইল। রাণী ও গোয়ালিনী উভয়েই কুমারদ্বয়কে নিজ পুত্র বলায়, বিচারার্থ তাহারা সকলেই রাজার নিকট নীত হইল। রাজা, রাণী ও গোয়ালিনীকে পুষ্করিণীর এক পারে ও ছেলে দুইটীকে অপর পারে দাঁড়াইতে বলিলেন এবং রাণী ও গোয়ালিনীকে সেই স্থান হইতেই ছেলে দুইটীকে দুধ দিতে আদেশ করিলেন। গোয়ালিনীর স্তন হইতে এক ফোটা দুধও বাহির হইল না; কিন্তু রাণীর স্তনের দুধে দুই পুত্রের মুখ ভরিয়া গেল। রাজা তখন জ্যেষ্ঠ কুমারের মুখে নিজেদের কথা শুনিয়া আনন্দের সহিত রাণী ও পুত্রদ্বয়ের নিকট নিজ পরিচয় দিলেন। বিচারে গোয়ালিনীর হার হইল; কিন্তু রাজা গোয়ালা-গোয়ালিনী পুত্রদ্বয়ের জীবন রক্ষা করিয়াছে বলিয়া, তাহাদিগকে চিরকৃতজ্ঞতা জানাইয়া, বহু ধনবস্ত্র দান করিয়া বিদায় দিলেন। তিনি অনতিবিলম্বে স্ত্রী ও পুত্রদ্বয়সহ নিজ পৈত্রিক বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলেন। রাণী বাড়ী আসিয়াই খুব ঘটা করিয়া নিরাকুলা ব্রত করিলেন। দুই রাজ্যের অধিপতি রাজা স্ত্রী পুত্রাদিসহ পরম সুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন।

আগাছা।

[শ্রীপ্রফুল্লকুমার মণ্ডল বি-এল]

বিকালবেলার কাজকর্ম্ম সারিয়া গা ধুইয়া রেণুকা তখন সবেমাত্র একখানি বাংলা উপন্যাস লইয়া নিজের ঘরের একটা কোণে আসিয়া বসিয়াছে, ঠিক সেই সময় বাহিরে জুতার শব্দ হইল। এ সময়ে কে আসিতেছে, তাহা রেণুকার বুঝিতে বাকী রহিল না। তাড়াতাড়ি বইখানা বিছানার উপর উপুড় করিয়া রাখিয়াই সে দ্রুতপদে বাহিরে যাইতেছিল, কিন্তু ঠিক দ্বারের নিকট আসিয়া বাধা পাইয়া ঘোমটা টানিয়া দিয়া একপাশে সরিয়া দাঁড়াইল। সতীশ মৃদু হাসিয়া জুতা খুলিতে-খুলিতে কহিল,--পালাচ্ছিলে যে? কাজ আছে?

রেণুকা তেমনি ঘোমটা দিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কথায় বা ইঙ্গিতে কোনো-কিছুই প্রকাশ করিল না। সতীশ কাছে আসিয়া স্ত্রীর মুখের ঘোমটা তুলিতে গেল, কিন্তু রেণু তাহা দাঁত দিয়া চাপিয়া রহিল। সতীশ তাহাকে ছাড়িয়া দিয়া কহিল,—আচ্ছা যাও, কোন কাজ থাকে ত অনর্থক বিরক্ত কর্ব্বো না। কাজ শেষ হ'লে একটীবার এসো। রেণুকা হাঁ-না কোন কিছুই না বলিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

মাস ছয়েক হইল, সতীশের সহিত রেণুকার বিবাহ হইয়াছে। তবে, এ বিবাহের ভিতর একটু ইতিহাস

ছিল। রেণুকার পিতামাতা গরীব হইলেও মেয়েটীকে যথাসাধ্য লেখাপড়া শিখাইয়াছিলেন, এবং কন্যা তের পার হইয়া চৌদ্দ বৎসরে পা দিলেও একেবারে হতাশ হইয়া মাথায় হাত দিয়া বসেন নাই। কেহ জিজ্ঞাসা করিলে যোগীনবাবু বলিতেন,—কি জান দাদা, ও খোঁজা-খুঁজিতে বিশেষ কিছু হয় না। সময় হ'লে বর আপনি এসে জুটবে।

এই উত্তরে তাঁহার আত্মীয়-স্বজন বা পাড়াপড়শী কেহই সন্তুষ্ট হইতেন না; কিন্তু যোগীনবাবুর সেদিকে বড় ভ্রূক্ষেপ ছিল না। তাঁহার মনে মনে এই গর্ব্বটাই খুব বেশী ছিল যে, লক্ষ্মীর মত তাঁহার এই মেয়েটী এই রূপ ও গুণের পসরা লইয়া অতি বড় ধনীর গৃহে গিয়াও আলো করিয়া থাকিবে। স্বামীর মুখে এত অহঙ্কারের কথা শুনিয়া গৃহিণী প্রবল তৃপ্তি বুকে চাপিয়াও মাঝে মাঝে কৃত্রিম শ্লেষের সহিত বলিতেন, অত গুমোর ভাল নয় গো! আমাদের রেণু আবার বড়লোকের ঘরে পড়বে! তেমনি বরাত কি না!

কিন্তু, রেণুর বয়স যখন পনের'র কাছাকাছি, সেই সময় সত্য সত্যই এক ঘটক কোন একজন খুব বড় জমীদারের ঘর হইতে রেণুর বিবাহের সম্বন্ধ করিতে আসিল। রেণুর পিতামাতা যেন আকাশের চাঁদ হাতে পাইলেন। ঘটকের কথামত যোগীনবাবু কন্যাকে সঙ্গে করিয়া রসুলপুরে বসুবাবুদের বাটীতে পদার্পণ করিলেন।

এত বড় বাড়ী রেণু বোধ করি তাহার জন্মাবধি দেখে নাই। ঐশ্বর্য্যের এই বিরাট লীলায় তাহার দুই চক্ষু ধাঁধিয়া গেল, এবং ঠিক তারই সঙ্গে সঙ্গে একটা কেমন-যেন প্রীতিময় স্বচ্ছন্দ অনুভূতি তাহার তরুণ হৃদয় আপ্লুত করিয়া তুলিল, যখন মনে হইল, এই বাড়ী ঘর, পুকুর বাগান শীঘ্রই একদিন সে নিজের বলিতে পারিবে। কল্পনায় সেই অদূর ভবিষ্যতের একটা অস্পষ্ট ছবি তাহার চোখের সামনে ফুটিয়া উঠিতেই তাহার আপাদমস্তক রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল।

বাড়ীর সকলেরই প্রায় রেণুকাকে পছন্দ হইল। অবশেষে, কয়েকটী হাস্যময়ী যুবতী তাহার হাত ধরিয়া যখন একখানি ছোট ঘরে টানিয়া আনিল, তখন রেণু দেখিল, ঘরের দেওয়াল-জোড়া একখানা বড় আয়নার সাম্‌নে দাঁড়াইয়া একটী সুন্দর যুবক প্রসাধনে ব্যস্ত। যুবতীদের একজন কহিল,—ইস্, আজ যে ঠাকুরপোর সাজগোজ আর শেষ হয় না গো! চেয়েই দেখ একবার! কি, পছন্দ হয়?

যুবক খানিকক্ষণ নিষ্পলকনেত্রে রেণুর দিকে চাহিয়া রহিল। মাটির দিকে চক্ষু নত করিয়াও রেণুকা যেন তাহার প্রতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে সেই চাহনির দীপ্ত স্পর্শটুকু অনুভব করিতেছিল। যুবক কহিল,-তা বেশ। বলিয়া মুচ্‌কি হাসিয়া জুতা পায়ে দিয়া সে বরাবর নীচে নামিয়া গেল। অপর একজন যুবতী রেণুর চিবুকটী তুলিয়া ধরিয়া কহিল,—তবে আর কি ভাই! তাহ'লে তুমি ত শীগ্‌গীর আমাদের কাছে আস্‌ছ!

রেণুকার মুখ-চোখ লাল হইয়া উঠিল। পনের বৎসরের তরুণীর বুকে তখন বিশাল সাগর-তরঙ্গের মত কত কি কথা উঠিতেছিল, তাহা সেই জানে; তবে, সেদিন এই ধনীর গৃহ ছাড়িয়া পিতার সহিত সে পুনরায় যখন নিজেদের গ্রাম্য আবাসে ফিরিয়া আসিল, তখন সেখানকার দৈন্যটাই যেন সব চেয়ে বেশী করিয়া তাহাকে পীড়ন করিতে লাগিল।

কিন্তু, যাহার অদৃষ্টের ফলেই হোক্, এ বিবাহ হইল না। যোগীনবাবু কন্যা লইয়া ফিরিবার পূর্ব্বেই বিবাহের দিন স্থির করিয়া আসিয়াছিলেন, এবং সেই সঙ্গে ভাবী বৈবাহিক মহাশয়ের নিকট ইহাও প্রতিজ্ঞা করিয়া আসিয়াছিলেন, যেমন করিয়া হোক্, তিনি নগদ তিন হাজার মুদ্রা ও ৯০ ভরি সোণার গহনা দিয়া কন্যা জামাতাকে বরণ করিবেন। একমাস পরে বিবাহের দিন স্থির হইয়াছিল; এই এক-মাসের ভিতর যোগীনবাবু কর্জ্জ ইত্যাদি করিয়া প্রতিশ্রুত টাকা এবং গহনার যোগাড় করিতে লাগিলেন। গৃহিণী একবার বলিয়াছিলেন,-তা হ্যাঁ গা, এত টাকা এখন কোত্থেকে যোগাড় কর্ব্বে? যোগীনবাবু তাহাতে কিঞ্চিৎ উষ্ণ হইয়া বলিয়াছিলেন,—যেমন ক'রে হোক্, তাতে ভিটেটা পর্য্যন্ত বাঁধা দিতে হয়, তাও দেওয়া যাবে। তুমি কি মনে কর গিন্নি, আমার মত এমন সৌভাগ্য যার-তার কপালে হয়? রেণুর মত মেয়ে তাই—

পিতামাতার নিকট এই ধরণের কথা রেণুকা অন্তরালে থাকিয়া প্রায়ই শুনিতে পাইত,' এবং তাহার ফলে সে তাহার তরুণ বুকের মাঝখানে আপনার মনেই একটা পুষ্পিত মাণঞ্চের সৃষ্টি করিয়া তুলিয়াছিল। আপনার মনেই সে সেই রাজসংসারের রাণীর আসনে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত দেখিত; এবং তাহার বিবাহিতা সঙ্গিনীদের বিবৃত প্রেম-কাহিনীর ছাঁচে ঢালিয়া মনে-মনে একটা ভাঙ্গা-চোরা প্রেমকাব্য রচনা করিতেও সুরু করিয়াছিল।

কিন্তু, বিবাহের দিন পর্য্যন্ত যোগীনবাবু দুই হাজারের বেশী নগদ টাকা যোগাড় করিতে পারিলেন না। তবু, তিনি নিজে বুঝিয়া শঙ্কিতা গৃহিণীকেও এই বলিয়া বুঝাইলেন, বিয়ের পরই যখন বাকী টাকাটা যোগাড় করে দোব, তখন কি আর তাঁরা কিছু আপত্তি করতে পারেন? তাঁরা অতবড় লোক, তেমন মানুষই নন্, বুঝলে গিন্নি?

কিন্তু, গিন্নির বোঝাবুঝিতে বড় কিছু যায়-আসে না। যাহাদিগকে বোঝানটাই সব চেয়ে বেশী দরকার, বিবাহ রাত্রিতে তাঁহাদিগকে কিছুতেই বোঝান গেল না। পাত্রের পিতা তাহার বিরাট ভুঁড়ি এবং বেঁটে হাত দুখানি নাড়িয়া যোগীনবাবুকে সুস্পষ্ট বুঝাইয়া দিলেন যে, মাত্র তিনটে হাজার টাকা বাহির করিবার মত যার সামর্থ্য নাই, তাহার ঘরে তাঁহার মত লক্ষপতির ছেলের বিবাহ কখনই হইতে পারে না।

বরকর্ত্তার হুকুম মত বর এবং বরযাত্রীর দল ছাদ্‌না-তলা পরিত্যাগ করিল। যোগীনবাবু মাথায় হাত দিয়া বসিলেন। অন্দরের ভিতর চাপা কান্না শুনা গেল। বাড়ীময় হুলুস্থূল পড়িয়া গেল। উপরে জানালার গরাদে ধরিয়া লাল-চেলী-পরা রেণুকা ছবিখানির মত স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ব্যাপারটা তাহার বুদ্ধির বাহিরে গিয়া পড়িয়াছিল।

বহুক্ষণ ধরিয়া বিবাহ বাড়ী যেন মৃতের মত নিৰ্জ্জীব। কিন্তু, শেষরাত্রে আবার সানাই বাজিল; এয়োতীরা আবার হুলুধ্বনি দিল। রেণুকা উঠিয়া বসিল। কয়েক-জন আসিয়া একরকম টানিতে টানিতেই তাহাকে নীচে লইয়া গেল।...... শুভদৃষ্টির সময় চোখ খুলিয়া রেণু দেখিল, এ তাহাদেরই গ্রামের দত্তদের সতীশবাবু!

(২)

বিবাহ হইয়া গেল। কিন্তু, রেণুকার মনে হইতে লাগিল, —এ যেন ঠিক তাহার পিতামাতা রীতিমত একটা বোঝার মত তাহাকে ঘাড় হইতে নামাইয়া দিয়া নিজেরা হাঁফ্ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে কোনক্রমে যে এই ভীষণ দায় হইতে উদ্ধার হইয়া তাঁহারা তাঁহাদের জাতিরক্ষাটা করিতে পারিলেন, এইটুকুই সকলে দেখিল, এই নির্ব্বাক মেয়েটীর পানে চাহিবার ফুরসৎ কাহারও একবার হইয়া উঠিল না। কিন্তু, সে তো এখন আর নগণ্য বালিকাটী নহে যে, যাহার হাতে হোক্ ফেলিয়া দিলেও ভাল-মন্দ ভাবিবার শক্তি তাহার একবিন্দুও থাকিবে না! তাহার বয়স হইয়াছে; যৌবনের রঙ্গীন স্বপ্ন তাহাকে সোণার তরীতে উঠাইয়া কত পরীদের দেশে ঘুরাইয়া আনিয়াছে। বিশেষতঃ, এই মাসখানেক ধরিয়া সে যে তাহার বর্ত্তমান বয়সকে অতিক্রম করিয়া ভবিষ্যতেরও অনেকখানি জীবন তাহার কল্পনার তুলিতে আঁকিয়া ফেলিয়াছিল! কোথায় সেই দীপ্তিময় রাজপ্রাসাদ, আর কোথায় সতীশের এই খড়ে ছাওয়া সামান্য ঘর দুখানি!... রেণুকার যেন কান্না আসিতে লাগিল।

ফুলশয্যার রাত্রে সতীশ যখন দুই বাহু দিয়া নববধূকে নিজের বুকের কাছে টানিয়া লইল, রেণুকা তখন চোখ বুঁজিয়া মৃতের মত পড়িয়াছিল। সতীশ ডাকিল,—রেণু, তাহ'লে সত্যিই তুমি আমার হ'লে?

রেণুকা যেন চমকিয়া উঠিল। হাঁ, সত্যই ত আজ হইতে সে তাহারই! এই লোকটীই আজ থেকে তাহার সর্ব্বস্ব,—ইহকালেও পরকালেও। বধূর কাণের কাছে মুখটী আনিয়া সতীশ স্নিগ্ধস্বরে কহিল,—রেণু, আমায় ভালবাসতে পার্ব্বে ত?

রেণু নিজেকে মুক্ত করিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, কি করে জানব?

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া সতীশ কহিল,—তা সত্যিই বটে! ভালবাসতে পারা-না-পারা, সেটা ঠিক নিজের হাতের জিনিষও ত' নয়! এমন অনেক স্বামী-স্ত্রী আছে, যারা জীবনভোর একসঙ্গে থেকেও পরস্পরকে ভালবাসতে পারেন না।

রেণু কোন কথা কহিল না। একটা যেন অজ্ঞাত শঙ্কায় তাহার বুকখানা কুঞ্চিত হইয়া উঠিল। সতীশ কহিল, শুনেছি, এটা এমন জিনিষ যে, ইচ্ছে কর্‌লে দেওয়াও যায় না, আবার হাজার চেষ্টা করলে নেওয়াও যায় না। নয় কি ?

আমি কি জানি!

সতীশ হাসিতে হাসিতে তাহার মাথাটি শক্ত করিয়া বুকের উপর চাপিয়া ধরিয়া বলিয়া উঠিল—তা বটে! কিন্তু আমি কি ভাব্‌চি জানো? অমন একজন বড়লোকের ছেলের সঙ্গে বিয়ে হ'তে হ'তে শেষে আমার হাতে ছিট্‌কে এসে প'ড়ে তুমি কি আমায়—

রেণুকা জ্বলিয়া উঠিয়া কহিল,—যাও!

ছি, রাগ করে কি! বলিয়া বধুর কোমল গণ্ডে প্রথম প্রণয়চুম্বন মুদ্রিত করিতে গিয়া সতীশ দেখিল, তাহার চোখের কোণ ভিজিয়া উঠিয়াছে। সতীশ বিস্মিত হইয়া কহিল,—ছিঃ, একটা সামান্য ঠাট্টা সইতে পারো না তুমি? আচ্ছা, এবার আমায় মাপ কর, আর কথ্‌খনো বল্‌বো না।

ইহারই মাস দুই পরে সতীশ তাহার মাতা ও রেণুকাকে লইয়া তাহার কর্ম্মস্থান কলিকাতায় চলিয়া আসিল। এখানে আসিয়া নিত্যকার এই মিলনের ভিতর দিয়া সতীশ তাহার হৃদয়ের সমস্ত উন্মুখ ভালবাসা লইয়া রেণুকার হৃদয়ের সন্ধান করিল, কিন্তু সন্ধান মিলিল কি? সতীশের মুখ দেখিয়া তাহা বড় একটা ধরা যাইত না; কেন না, রেণুকার মুখের একটু হাসি—একটু সোহাগ পাইতে পারিলেই এই লোকটী নিজের হৃদয়ের সমস্ত ভালবাসাকে চরিতার্থ মনে করিত। কিন্তু, রেণুকা যেন থাকিয়া থাকিয়া স্বামীর এই অপরিসীম ভালবাসার নীচে একটা অনিবার্য্য সঙ্কোচ এবং কুণ্ঠা অনুভব করিত। যখনই সে ভাবিত, তাহার স্বামী—তাহার সুখ, তাহার মুখে হাসিটুকু দেখিবার জন্য প্রত্যহ প্রভাত হইতে সন্ধ্যা, সন্ধ্যা হইতে প্রভাত পর্য্যন্ত কেমন করিয়া সচেষ্ট হইয়া রহিয়াছে, তখনই যেন তাহার বুকের একটা স্থানে আপনা-আপনি মোচড় দিয়া উঠিত। মাঝে মাঝে সে নিজের মনেই প্রতিজ্ঞা করিত—না, এখন হইতে সেও তাহার স্বামীকে ঠিক এমনি প্রাণ দিয়া ভালবাসিবে, তাঁহার সুখের জন্য এমনি করিয়াই নিজেকে মগ্ন করিয়া দিবে। কিন্তু, শেষ পর্য্যন্ত এ প্রতিজ্ঞা টিকিত না। তাহার যুবতী-হৃদয়ের কোন্ এক নিভৃত কোণে একটা কণ্টকময় আগাছা এমন করিয়া বাড়িয়া উঠিয়াছিল যে, তাহাকে সে কোনমতেই উপড়াইয়া দূরে ফেলিতে পারিতেছিল না। ইহার জন্য সে হয়ত কতদিন-কত অব্যক্ত অনুশোচনার তীব্র দংশন সহ্য করিয়াছে, তবু নিজের হৃদয়কে বশে আনিতে পারে নাই। তাহার উপর, সতীশ যখন নিজের পরিপূর্ণ প্রেমের বন্যায় উদ্বেলিত হইয়া গভীর তৃপ্তির সহিত হাসিতে-হাসিতে বলিত, রেণু, কতজন্মের সুকৃতি আমার ছিল যে, তোমার মত একটী স্ত্রীরত্ন পেয়েছি,—তখন যেন রেণুকা মরমে মরিয়া যাইত। নিজের মনেই সে অস্থির হইয়া বলিতে চাহিত—ওগো, অমন করে' আর আমায় খোঁচা দিও না। তোমার হাতে পড়বার আগে সে সর্ব্বনেশে কুহকস্বপ্ন আমি কেনই বা দেখ্‌লুম!......এম্‌নি একটা অপরাধের বোঝা রেণুকাকে যেন নিত্য নিয়ত পীড়ন করিতে লাগিল।

সেদিন আকাশে বেশ ফুট্‌ফুটে চাঁদনী ফুটিয়াছিল। রাস্তার দিকের খোলা জানালাটা দিয়া তাহারই খানিকটা আসিয়া রেণুকার বিছানার উপর ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। সতীশ কি একখানা বাংলা মাসিকপত্র হইতে একটা গল্প পড়িয়া রেণুকাকে শুনাইতেছিল; রেণুকা চুপ করিয়া পড়িয়া শুনিতেছিল। খানিকটা দূরে আসিয়াই সতীশ পড়িল, গল্পের নায়ক বলিতেছেন—'মুনিরাই বলে গেছেন দেখ না, পুরুষের ভাগ্য আর স্ত্রীজাতির চরিত্র—এ স্বয়ং দেবতাও বল্‌তে পারেন না।'—এই পর্য্যন্ত পড়িয়াই সতীশ বইখানা উপুড় করিয়া রাখিয়া রেণুর মুখের পানে চাহিয়া কহিল, কি জঘন্য কথা, দেখ্‌ছ রেণু? স্ত্রীজাতির চরিত্র সম্বন্ধে এরকম সন্দেহ যিনি কর্ত্তে পারেন করুন, আমি পারিনে! এতই কি ঠুন্‌কো তাদের সতীত্ব, যার জন্যে তাকে বরাবর সন্দেহের চোখেই দেখতে হবে!

রেণুকা নিস্পন্দ হইয়া পড়িয়াছিল। ভাল করিয়া দেখিলে দেখা যাইত, তাহার মুখখানা বেশ একটু বিবর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। ইহার পর গল্প আর জমিল না। রেণু ঘুমাইবার ছলনা করিয়া পাশ ফিরিয়া শুইল।

(৩)

সতীশের জননী বধূকে এখানে রাখিয়া দিনকতকের জন্য গ্রামে গিয়াছিলেন। সেদিন শনিবার। সকাল-সকাল আফিস হইতে ফিরিয়া সতীশ হাসিতে-হাসিতে রেণুকার সামনে আসিয়া কহিল—আজ মাসকাবার। হাতে অনেক-গুলো টাকা এসেছে। কাল কোথাও বেড়াতে যাবে?

রেণুকা স্বামীর কথার ভঙ্গীতে একটুখানি মুচ্‌কি হাসিয়া পুনরায় নিজের কাজে মন দিল। সতীশ কহিল—বল না, কোথায় যাবে?

পানের খিলি মুড়তে মুড়িতে রেণু কহিল, যেখানে তোমার খুসী! কতদিন থেকে কালীঘাট যাবো বলেচি—

কালীঘাট? আচ্ছা, সে মা এলে আর একদিন হবে। কাল চল, তোমায় দক্ষিণেশ্বরে কালীবাড়ী দেখিয়ে নিয়ে আসি। অমন জায়গা কখ্‌খনো দেখনি তুমি!

পরদিন বিকালবেলা সতীশ একখানি ভাড়াটিয়া গাড়ীতে রেণুকে লইয়া উঠিয়া বসিল। গাড়ী যখন রাণী রাসমণির প্রসিদ্ধ বাগানের ভিতর প্রবেশ করিল, তখন বেলা প্রায় পাঁচটা বাজে। সতীশ রেণুকে লইয়া প্রথমে মন্দির-প্রাঙ্গণের ভিতর বিভিন্ন মন্দিরগুলিতে ঘুরিয়া পরে বাগানের নানা স্থান দেখিয়া বেড়াইল। শেষে, গঙ্গার তীরের উপর একটা বড় গাছের তলে আসিয়া দুইজনে বসিল। সূর্য্য তখন গঙ্গার অপর পারের বনরাজির মাথার উপর ডুবু-ডুবু করিতেছিল; তাহারই রক্তরশ্মির খানিকটা আসিয়া রেণুকার মুখের উপর পড়িয়াছিল। রেণু একদৃষ্টে ভাগীরথীর এই শান্ত সৌন্দর্য্য দেখিতেছিল; আর সতীশ দেখিতেছিল; বুঝিবা তার চেয়েও মহিমাময় একটী দৃশ্য—রেণুকার সেই দীপ্তিময় মুখখানি!

খানিকটা দূরে তীরের নীচে হঠাৎ একটা উচ্ছ্বসিত হাসির হর্‌রা শুনিয়া দুইজনে চমকিয়া উঠিল। রেণু কহিল,—কি ও?

দেখি—বলিয়া সতীশ উঠিয়া দাঁড়াইল। দুই এক পা আসিয়া তাহারা দুইজনেই দেখিতে পাইল, সেখান হইতে প্রায় হাত পনের নীচে একখানা পান্‌সি আসিয়া তীরে লাগিয়াছে। ছাউনির ভিতর হইতে একে একে চার পাঁচজন পুরুষ ও দুইটি রমণী বাহির হইয়া আসিল। রমণী-দের পরণে রঙ্গীন সেমিজের উপর জালের মত একখানা করিয়া ফুলদার শাড়ী; মাথার কবরী আলুথালু হইয়া ঘাড়ের কাছে লুটাইতেছে, এবং বড় বড় টানা চোখগুলিতে কেমন এক জঘন্য অলস চাহনি। ঘৃণায় রেণুকার মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত জ্বালা করিয়া উঠিল। কয়েকজন পুরুষ তীরে নামিয়া সেই মখমলের মত কচি ঘাসের উপর আড় হইয়া শুইয়া পড়িল।

উপরে দাঁড়াইয়া সতীশ রেণুকাকে কহিল,—এই দেখ রেণু! যে জন্যে আমি কালীঘাট ছেড়ে এই জায়গাটাকে বেশী পছন্দ করি, এখানেও তার একেবারে অভাব নেই। সকলেই এরা ভদ্রলোকের ছেলে, অথচ, সকলেই যে বড়-লোক, তাও নয়! অনেকেই এর ভেতর এত গরীব যে, বাড়ীতে তাদের মা-বোন্‌-স্ত্রী-ছেলে না খেতে পেয়ে শুকিয়ে মর্‌ছে!

একজন রমণী নৌকার ভিতর হইতে একটা লোকের হাত ধরিয়া টানিয়া বাহিরে আনিল। তাহার গায়ে পরিষ্কার ধব্‌ধবে জামা কাপড়, চেহারা সুন্দর—সুকুমার যুবা। সতীশ কতকটা আপনার মনেই যেন কহিল,—এইটি হচ্ছেন দলের বাবু! এঁরই পয়সায় অপর সকলের খোরাক হচ্ছে। বলিয়া আরও কি বলিতে গিয়া স্ত্রীর মুখের পানে চাহিতেই দেখিল,—তাহার মুখখানা যেন হঠাৎ বড় বেশী ফ্যাকাশে হইয়া পড়িয়াছে। সতীশ তাহার হাত ধরিয়া কহিল,—কি গা, কোন কষ্ট হচ্ছে?

রেণু তাড়াতাড়ি স্বামীর একখানা হাত শক্ত করিয়া চাপিয়া ধরিয়া কহিল,—না না, চল, আমরা ঐখানেই গিয়ে বসিগে!

পুনরায় সেই নির্জ্জন গাছের তলায় বসিয়া সতীশ গভীর স্নেহে স্ত্রীর কপালের উড়ো চুলগুলি সরাইয়া দিতে দিতে কহিল,—সংসারেরই এই নিয়ম রেণু! নিজে সেধে কারুর মুখে অমৃত এনে ধর, তাতেও সে তৃপ্ত না হ'য়ে বিষের পাত্র টেনে নেবে। ঐ যে কোন্ বড়লোকের দিব্যি ফুটফুটে ছেলেটীকে মাগীরা মাতাল অবস্থায় টেনে বার করলে, হয়ত ওরই বাড়ীতে গিয়ে দেখ্‌বে, সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর মত সুন্দরী

স্ত্রী তার, তিনদিনের ভেতর স্বামীকে একবার চোখে না দেখতে পেয়ে দারুণ মনকষ্টে ছটফট্ করছে, হয়ত বা আত্ম-হত্যার কল্পনা করছে। কিন্তু, এ পথের এই অবস্থা। রেণু! এ সংসার সত্যিই স্বর্গ হ'তে পার্‌ত, যদি মনের মিল বলে' জিনিষটা সকল স্বামী-স্ত্রীর ভেতরই অটুট হ'য়ে থাক্‌ত'। তা নইলে কিছুতেই কিছু নয়!

রেণুকা পাথরের মূর্ত্তির মত বসিয়াছিল। তাহার বুকের সর্ব্বত্র যেন তীব্র বিষের জ্বালায় জ্বলিয়া যাইতেছিল। একান্ত বুদ্ধিহীনার মত ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া সে স্বামীর মুখের পানে তাকাইয়া রহিল। সতীশ কহিল,—কি দেখ্‌ছ? পরে হাসিয়া স্ত্রীর চিবুকটী ধরিয়া আদর করিয়া কহিল,—আমার এ মুখখানাতেও দেখ্‌বার মত কিছু আছে নাকি রেণু?

রেণু ধীরে ধীরে চোখ নামাইয়া লইল। মনে মনে বোধ করি সে ইহার জবাব দিল; বোধ হয় বলিল,—আছে। এতদিন তা দেখ্‌তে পাইনি, কিন্তু আজ পেয়েছি। হঠাৎ তাহার চোখের সামনে যেন তার বিবাহ রাত্রির ঘটনাগুলো ছায়াচিত্রের মত প্রতিফলিত হইয়া উঠিল। রেণু আপনার মনে শিহরিয়া উঠিল। সেদিন যাহাকে সে স্বর্গের দেবরাজের সঙ্গে তুলনা করিয়াছিল, আজ—আজ যেন সে তাহাকে এই মর্ত্ত্যের মানুষের আসনে বসাইতেও কুণ্ঠা বোধ করিতে লাগিল। আর, তাহার সামনেই এই যে স্থির সৌম্য হাস্যময় মূর্ত্তিখানি বসিয়া রহিয়াছে, আজ তাহার মনে হইতে লাগিল, তাহার মত একটা নগণ্য নারীকে ইনি যে সোণার সিংহাসনে বসাইয়া রাখিয়াছেন, সে ত' তাহার একবিন্দুও যোগ্য নহে!

হঠাৎ আবেগভরে রেণু নত হইয়া স্বামীর পা দু'খানির উপর নিজের মাথাটা চাপিয়া ধরিল; এবং কতকটা তার নিজের অজ্ঞাতেই তাহার দুই চোখ দিয়া অশ্রুরাশি ঝরিয়া সতীশের পা দু'খানা সিক্ত করিয়া দিল। সতীশ মহাবিস্মিত হইয়া তাহাকে তুলিয়া ধরিয়া কহিল,—ওকি, কি কচ্ছ রেণু?

সেই জলে-ভেজা দুটী চোখ স্বামীর মুখের উপর তুলিয়া ধরিয়া রেণু কহিল,—কিছু না, চল, বাড়ী যাই। কিন্তু মনে মনে বারম্বার সে বলিতে লাগিল,—আজ তোমায় বল্‌তে পার্‌লুম না, কিন্তু আশীর্ব্বাদ কর, যেন একদিন পারি। তোমায় না বল্‌তে পারলে যে আমি কোনদিনই স্বস্তি পাব না!

সংগ্রহ ও সঙ্কলন।

ঈশ্বর গুপ্ত ও "সংবাদ-প্রভাকর"

বারাণসী-শাখা-সাহিত্য-পরিষদের গ্রন্থাগারে ১২৬৪ ও ১২৬৫ বঙ্গাব্দের 'প্রভাকরের' কতিপয় সংখ্যা সংগৃহীত আছে। এই সংখ্যাগুলি হইতে ঈশ্বরগুপ্ত ও 'সংবাদ-প্রভাকর' সম্বন্ধে যে বিবরণ সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, তাহা আপনাদিগের নিকট উপস্থাপিত করিলাম।

১২৬৪ সালের প্রথম সংখ্যা ২রা বৈশাখ সোমবার প্রকাশিত হয়। ইহার ক্রমিক সংখ্যা ৫৭৯১। 'প্রভাকরের' আকার, বর্ত্তমান 'এডুকেশন গেজেটের' মত—ইহাতে তিনটী কলম থাকিত। আলোচ্য সংখ্যাখানি ৪২ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ, তাহা ছাড়া এই সংখ্যার সহিত ৯ পৃষ্ঠা 'বাৎসরিক সংবাদ-প্রভাকরের ক্রোড়পত্র' নিবদ্ধ আছে। সর্ব্বশেষে মুদ্রিত আছে,—"এই প্রভাকরপত্র রবিবার ব্যতীত প্রতি-দিবস কলিকাতা সিমুলিয়ার অন্তঃপাতি হোগোলকুড়িয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রীটে ৪২নং ভবনে প্রকাশ হয়। অগ্রিম মূল্য ১০৲ টাকা। বৈশাখমাসের মাসিক পত্রের মূল্য ১ টাকা। তদ্ব্যতীত আর সকল মাসিকপত্র ৷৷০ আনা, অগ্রিম ৬ টাকা মাত্র।

"Printed and published by Hurrynarain Dass, at the Probhaker Press for the Proprietor."

আলোচ্য সংখ্যার তৃতীয় পৃষ্ঠায় সম্পাদকীয় স্তম্ভে লিখিত আছে,—

"হে পরমপূজ্য পরমাত্মন্! তোমার অনুকম্পায় অদ্য এই প্রভাকরের বয়ঃক্রম ২৭ সপ্তবিংশতি বৎসর উত্তীর্ণ হইল, আমি তোমার অভয় চরণ শরণ লইয়া বাঙ্গালা ১২৩৭ সালের ১৬ই মাঘ শুক্রবারে ইহার জন্ম প্রদান করি, তৎকালে সপ্তাহে কেবল একবার করিয়া প্রকাশ হইত, ১২৪৩ সালের ২৭শে শ্রাবণ বুধবারাবধি ১২৪৬ অব্দের ৩০শে জ্যৈষ্ঠ পর্য্যন্ত সপ্তাহে বারত্রয়িকরূপে প্রকাশ হইয়া তৎপরদিবসেই অর্থাৎ ঐ সম্বতের ১লা আষাঢ় হইতে অদ্য দিবস পর্য্যন্ত ক্রমশই যথানিয়মে দৈনিকরূপে প্রকাশ হইয়া আসিতেছে। এই দীর্ঘকালের মধ্যে কোন দিবস কোনরূপ বিপদ অথবা বিড়ম্বনার ঘটনা হয় নাই, তোমার আশীর্ব্বাদে আমরা অতি সুন্দররূপেই সম্ভ্রম রক্ষা করিতেছি, আমাদিগের এই লেখনী অদ্যাবধি সর্ব্বসাধারণের কল্যাণকারিণী সন্তোষসঞ্চারিণী এবং সম্ভ্রমদায়িনী নামেই বিখ্যাত আছে, কাহারও অসন্তোষকারিণী ও পীড়াদায়িনী হয় নাই, সুতরাং সকলেই এ বিষয়ের গৌরব করিয়া আমাদিগের প্রতি যথোচিত স্নেহ প্রকাশ করিয়া থাকেন। হে দীনদয়াময়! আমার এই স্বভাবের যেন অভাব না হয়, আমার মন যেন পাপপথে ধাবিত হইয়া অশিবকর নিন্দাবাদে প্রবর্ত্ত না হয়, আমি যেন স্বকার্য্যসাধন সম্বন্ধে সমাজে ঘৃণিত ও উপহাস্য না হই, তুমি সদয় হইয়া আমাকে যে সম্পাদকীয় ব্রতে ব্রতী করিয়াছ, আমি ধর্ম্মে ধর্ম্মে সেই ব্রত উদ্‌যাপন করিতে পারিলেই রক্ষা পাই, আমি এই পদে থাকিয়া যাহাতে পদে থাকিতে পারি তাহাই কর। আমি সম্পদ চাহি না, ঐশ্বর্য্য চাহি না, কেবল তোমার কৃপাকটাক্ষ এবং জগতীয় যাবতীয় লোকের স্নেহমাত্র প্রার্থনা করি, হে নাথ! তোমার প্রসন্নতা ব্যতিরেকে কোন মতেই শ্রীবৃদ্ধিসাধন ও সুখসম্পাদন হইতে পারে না, অতএব এই প্রভাকরের যে কিছু কল্যাণ ও উন্নতি এবং তদ্দ্বারা আমাদিগের যে কিছু সুখ সৌভাগ্য সম্ভোগ হইয়াছে, তজ্জন্য কেবল তোমারি গুণের ঋণে যাবজ্জীবন বিক্রীত রহিব।"

এই সংখ্যাতেই ঈশ্বরগুপ্ত, শ্রীকৃষ্ণমিশ্রের রচিত সংস্কৃত 'প্রবোধচন্দ্রোদয়' নাটক অনুসরণ করিয়া বাঙ্গালা গদ্যে এবং পদ্যে একখানি নাটক লিখিতে আরম্ভ করেন। এই গ্রন্থ পৃথক্ মুদ্রিত দেখি নাই, তবে ঈশ্বরগুপ্তের কনিষ্ঠ সহোদরের দৌহিত্র মণীন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্তের সম্পাদকতায় গুপ্ত-কবির যে গ্রন্থাবলী মুদ্রিত হয়, তাহার প্রথমখণ্ডে ১৫৭ পৃষ্ঠায় 'কামের উক্তি' নামে একটা কবিতা মুদ্রিত হইয়াছে; তাহার পাদটীকায় লিখিত আছে—"কবিবরের প্রবোধচন্দ্র নাটকনামক পুস্তকে কামের উক্তিতে ইহার সমস্ত অংশ পাঠ করিতে পারিবেন। এ স্থলে সংক্ষেপে দেওয়া গেল।"

আলোচ্য সংখ্যার সহিত সংশ্লিষ্ট "বাৎসরিক সংবাদ-প্রভাকরের ক্রোড়পত্রে" '১২৬৩ সালের সমস্ত ঘটনার সংক্ষেপ বিবরণ' প্রদত্ত হইয়াছে। এই বিবরণ হইতে কতিপয় উল্লেখযোগ্য ঘটনা লিপিবদ্ধ হইল।—

বৈশাখ—"বোম্বাই রাজধানীতে হিন্দুদিগের যে সভা আছে তাহার মেম্বর মহাশয়েরা হিন্দু বিধবার বিবাহ বিষয়ক প্রস্তাবের বিপক্ষতাচরণ করেন।"

"আহিরীটোলার ঘাটের নিকটে গঙ্গার উপর পুল নির্ম্মাণ হইবেক তাহার সমুদয়ানুষ্ঠান হইতেছে।"

"মেদিনীপুরের অন্তঃপাতি ঘাটালের নিকটে তুপরাজপুর গ্রামে এক তেলীর বাটীতে একটী খেজুরবৃক্ষ প্রাতঃকালাবধি দুইপ্রহর পর্য্যন্ত দক্ষিণদিগে অবনত হইয়া ভূমিশায়ী হয়, এবং পরে ক্রমশঃ পরিমাণে উত্থিত হইয়া অপরাহ্ণ পাঁচ ঘটিকার সময়ে আপন স্বভাব প্রাপ্ত হইল।"

জ্যৈষ্ঠ—"রেইল রোডের গাড়ি চালনা শিক্ষার জন্য একটা কালেজ স্থাপিত হইবার কল্পনা হয়।"

শ্রাবণ—"এডুকেশন গেজেট ও সাপ্তাহিক বার্ত্তাবহ ইত্যাখ্যেয় একখানি সংবাদপত্র প্রকাশ হয়।"

"বাবু বঙ্কিমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (চট্টোপাধ্যায়?) দ্বারা "ললিতা ও মানস" নামে একখানি ক্ষুদ্র গ্রন্থ প্রকাশ হয়।"

"মাইকেল মধুসূদন দত্ত মান্দ্রাজনগরে কনিষ্ঠ মাজিস্ট্রেটের ক্লার্কের পদাভিষিক্ত হয়েন।"

"অরুণোদয় নামে একখানি পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশারম্ভ হয়।"*

* ষোড়শ বর্ষের (১৩১৬ বঙ্গাব্দের) সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দ, পাক্ষিক অরুণোদয় পত্রিকার প্রকাশ-কাল বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। 'প্রভাকরে'র বিবরণ অনুসারে ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দই অরুণোদয় পত্রিকার প্রকাশের কাল বলিয়া জানিতে পারা যায়।

"সর্ব্বতত্ত্ব-প্রকাশিকা নাম্নী একখানি মাসিকপত্রিকা প্রকাশ হয়।"

আশ্বিন—"রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর, রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ, হরচন্দ্র ঘোষ বাহাদুর, বাবু অমৃতলাল মিত্র, প্রাণনাথ রায়চৌধুরী, বাবু রামরত্ন রায়, বাবু রাজেন্দ্র দত্ত, বাবু নৃসিংহ দত্ত, বাবু ভবানীপ্রসাদ দত্ত, বাবু রমাপ্রসাদ রায়, বাবু কালীপ্রসাদ ঘোষ মৃত মহাত্মা বিটন সাহেবের স্থাপিত বিদ্যালয়ের ম্যানেজার, সি, বিডন সাহেব সভাপতি এবং পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সম্পাদকের পদে অভিষিক্ত হয়েন।"

"গভর্ণর জেনরল সাহেবের প্রাইবেট সেক্রেটারীর বেতন ৩০০০ টাকা নির্দ্দিষ্ট ছিল, লর্ড কেনিং বাহাদুর তাহা ২০০০ টাকা করিয়াছেন।"

অগ্রহায়ণ—"২৩ অগ্রহায়ণ রজনীতে শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র ন্যায়রত্ন (বিদ্যারত্ন ?) প্রথম বিধবার পাণিগ্রহণের পথাবলম্বী হয়েন।"

"২৩ অগ্রহায়ণ দিবা পূর্ব্বাহ্ণ সাত ঘটিকায় নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ শ্রীশচন্দ্র রায় বাহাদুর মায়াময় মর্ত্ত্যলীলা সম্বরণ করেন।"

পৌষ—"ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে কোম্পানীরা কেবল আরোহির ভাড়াদ্বারা ৩০শে নবেম্বর তারিখ পর্য্যন্ত ৭৩৩০০০ টাকা লভ্য করেন।"

"ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেইলওয়ে কোম্পানীরা বিলাতে একপ্রকার সেতু নির্ম্মাণারম্ভ করিয়াছেন, ঐ সেতু প্রস্তুত হইলে শোণ নদে স্থাপিত হইবেক।"

"আলাহাবাদ হইতে কানপুর পর্য্যন্ত রেইলরোড খোলা হইয়াছে।"

ফাল্গুন—"বারাণসীনগরে শান্তিরক্ষাকার্য্য অতি কদর্য্য হওয়াতে প্রায় প্রতিদিবস তথায় তস্করি ব্যাপার ঘটিতেছে।"

ইহার পরবর্ত্তী সংখ্যাগুলি, অধিকাংশই ৪ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ, কোনও কোনও সংখ্যাতে ৬ পৃষ্ঠা ও ৮ পৃষ্ঠাও দেখিতে পাওয়া যায়।

৩রা বৈশাখের (১৪ই এপ্রেল, ১৮৫৭) 'প্রভাকরে' সংস্কৃত কালেজ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছিল।—

"সংস্কৃত কালেজের প্রিন্সিপেল শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় উক্ত কালেজের ইংরাজী ডিপার্টমেণ্টে অধিক ইংরাজী শিক্ষক নিযুক্তকরণ প্রার্থনায় গভর্ণমেণ্টে অনুরোধ করাতে লেপ্টেনাণ্ট গভর্ণর বাহাদুর তাঁহার প্রার্থনা পূরণ করিয়াছেন। সংস্কৃতকালেজে পূর্ব্বে যে প্রকার সংস্কৃত বিদ্যার পাঠনা হইত, এইক্ষণে আর তদ্রূপ হয় না, ইংরাজী পাঠনাই অধিক হইতেছে, বোধ হয় অতঃপর সংস্কৃতবিদ্যালয়ের সংস্কৃত পাঠনাকার্য্য এককালে উঠিয়া যাইবেক।"

'প্রভাকরে'র কোনও কোনও সংখ্যায় প্রথম ৬ কলম, বিজ্ঞাপনেই পরিপূর্ণ থাকিত।

১২৬৪ সালের ৭ই বৈশাখের (১৮ই এপ্রেল, ১৮৫৭) 'প্রভাকরে' প্রকাশিত হইয়াছে যে, শ্রীরামপুরের 'তমোহর' যন্ত্রালয় হইতে কালীপদ চট্টোপাধ্যায়, হরিশ্চন্দ্র দে চৌধুরীর সহায়তায় বৈশাখ মাস হইতে 'বিজ্ঞানমিহিরোদয়' নামে একখানি মাসিক পত্র বাহির করিতেছেন।

১০ই বৈশাখের সংখ্যায় বিজ্ঞাপন-স্তম্ভে তারাশঙ্কর তর্করত্ন রচিত বাঙ্গালা কাদম্বরী গ্রন্থের উল্লেখ আছে।

এই সময় হইতে 'প্রভাকর'পত্রে W. L. Carpenter বরফের উপকারিতা ঘোষণা করিয়া বিজ্ঞাপন প্রচার আরম্ভ করেন।

২১শে বৈশাখের 'প্রভাকরে' হিন্দু মেট্রোপলিটান কলেজের কলেজ-ডিপার্টমেণ্টের ছাত্র যদুনাথ ঘোষের রচিত 'কাব্য এবং ইতিহাস পাঠের ফল কি ?" ইতিশীর্ষক একটী প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধ রচনা করিয়া লেখক, ভূকৈলাসের রাজপরিবার-প্রদত্ত মাসিক ১০৲ টাকা ছাত্রবৃত্তি পাইয়াছিলেন। রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর এই প্রবন্ধের পরীক্ষক ছিলেন।

এইবার ঈশ্বর গুপ্তের সম্পাদকতা কার্য্যের প্রণালী সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ পরিচয় দিবার চেষ্টা করিব। বর্ত্তমান কালের পত্রিকা-সম্পাদকগণ প্রায় নামেই 'সম্পাদক'—কাজে তাঁহারা 'প্রকাশক' মাত্র। পরের লেখা কাটিয়া ছাঁটিয়া সুন্দরভাবে প্রকাশ করিবার সাহস বা যোগ্যতা, অধিকাংশ সম্পাদকেরই নাই; অনেকে আবার ক্ষমতা

থাকিলেও পরিশ্রমের ভয়ে প্রবন্ধ ভাল করিয়া না পড়িয়াই প্রেসে দেন। সুরেশচন্দ্র সমাজপতির সাক্ষ্যে আমরা জানিতে পারি যে, বঙ্কিমচন্দ্র, ভাল করিয়া না দেখিয়া কোনও লেখা "বঙ্গদর্শনে" ছাপিতেন না। 'সেকালের স্মৃতি'তে সমাজপতি লিখিয়াছেন,—

"বঙ্কিম বাবু বলিলেন, তোমরা কি ভয়ে লেখকদের লেখা কাটো না? আমি ত 'বঙ্গদর্শনের' অনেক প্রবন্ধ নিজে আবার লিখিয়া দিয়াছি, বলিলেও চলে।......এখন লেখকেরা এ দিকে বড় উদাসীন। তোমাদের 'সাহিত্যে'ও দেখি,—অনেক প্রবন্ধ দেখিয়া মনে হয়, একটু অদল বদল করিলে, কাটিয়া ছাঁটিয়া দিলে বেশ হয়। কেন কর না? লেখকেরা কি রাগ করেন?

"......আমি খুব ভাল করিয়া 'রিভাইজ' না করিয়া কাহারও কাপী প্রেসে দিতাম না।" *

বঙ্কিমচন্দ্রের কাব্য-গুরু ঈশ্বরচন্দ্রেরও এই সম্পাদকীয় গুণ, বিশেষভাবেই বিদ্যমান ছিল। তিনি 'প্রভাকরে' গদ্য এবং পদ্য উভয়বিধ লেখাই সংশোধন পূর্ব্বক প্রকাশ করিতেন। ঈশ্বর গুপ্ত, অধিকাংশ রচনার প্রকাশকালে এই সংশোধন-কার্য্যের উল্লেখও করিয়াছেন।

"ছাত্রের বিরচিত পূর্ব্বোক্ত কয়েকটি কবিতা সংশোধন পূর্ব্বক প্রকটন করিলাম, এই রচনা অতি উত্তম হইয়াছে।" —('প্রভাকর' ২পৃঃ, ১৭ই মাঘ, ১২৬৪)।

"ছাত্রপ্রণীত এই পত্রখানি সংশোধনপূর্ব্বক সাদরে প্রকটন করিলাম। প্রার্থনা করি ইনি শীঘ্রই সুকবি হউন।"—('প্রভাকর,' ৩পৃঃ, ৬ই ফাল্গুন, ১২৬৪)।

কোন্ অংশ, কি ভাবে সংশোধন করিলেন, ঈশ্বর গুপ্ত তাহা অনেক সময়ে বিস্তারিতভাবে কাগজে প্রকাশ করিতেন। আমরা তাঁহার সংশোধনের প্রণালীর পরিচয় প্রসঙ্গে কোনও কোনও স্থান উদ্ধৃত করিলাম।

"পত্রপ্রেরক মহাশয়ের প্রার্থনামতে আমরা নিম্নস্থ পত্রখানি প্রকটনপূর্ব্বক তাঁহার প্রণীত পদ্যের প্রত্যেক চরণের দোষ ও গুণ ব্যাখ্যা করিলাম.........

"নির্ব্বিকার, নিরাধার, নিরাকার হবি।
দিলা জয়, সমুদয়, শক্রভয় হরি॥"

এই দুইটী চরণের সর্ব্বাঙ্গই সুন্দর...... ..

প্রঃ সং।

"দিল্লিরাজ, দিল্লিমাঝ, প্রাপ্তলাজ হয়ে।
অনুদিন, হৈল দীন, শেষ দিন চেয়ে॥"

এই দুই চরণের "হোয়ে, চেয়ে" মিলের দোষ হইয়াছে।

প্রঃ সং।

"......পয়ারাদি ছন্দের কবিতায় সকলপ্রকার দোষের অপেক্ষা মিলের দোষ অতি গুরুতর দোষ। যথা "মসি, বসি, হরি, কবি। বারি, ভারি, পারি, মারি। দীন, হীন......ধন্য, গণ্য, রঙ্গ, অঙ্গ,......বরণ,চরণ, মানস, তামস ইত্যাদি অকারে অকারে, আকারে আকারে, একারে একারে, ওকারে ওকারে, উকারে উকারে, ঔকারে ঔকারে মিল রাখিতে হইবে, যে সকল কবিতায় এতদ্রূপ মিলের পারিপাট্য না থাকে, সে কবিতা কবিতাই নহে। পূর্ব্বতন ও আধুনিক অনেকগুলীন বাঙ্গালা কবিতা-পুস্তকে এবম্প্রকার ছন্দ মিলের দোষ থাকাতে নবানুরাগি রচক ভ্রাতারা তাহার অনুকরণ অর্থাৎ তদনুরূপ পথাবলম্বন করাতে এবং সুকবি উপদেশকের নিকট স্বরূপ উপদেশ না পাওয়াতেই স্বরূপ রচনায় বিরূপ করিতেছেন।'—('প্রভাকর' ১-২ পৃঃ, ১১ই মাঘ, ১২৬৪।)

"বল বল ধনি, ওলো বিনোদিনি,
কিসের লাগিয়ে মান?"

"বল বল ধনি ওলো বিনোদিনি", মিলের দোষ হইল, ইহার পরিবর্ত্তে

"বল বল ধনি মুখে নাই ধ্বনি,
কিসের লাগিয়ে মান?

এরূপ হইলে কত উত্তম হয়। প্রঃ সং।"—

('প্রভাকর,' ১ম পৃঃ, ৭ই ফাল্গুন, ১২৬৪)

কেবল শেষ অক্ষরের মিল হইলেই যে মিত্রাক্ষর পদ্যের নিয়মরক্ষা হয় না—উপান্ত্য বর্ণের স্বরের মিল থাকা যে সবিশেষ আবশ্যক, এ কথা কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ, কবি বিহারীলালের কাব্য-সমালোচনা-প্রসঙ্গে স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন।

* "নারায়ণ," ১ম খণ্ড, ৪র্থ সংখ্যা, ফাল্গুন, ১৩২১

তিনি লিখিয়াছেন,—"সাময়িক কবিদিগের সহিত বিহারীলালের আর একটি প্রধান প্রভেদ তাঁহার ভাষ। ভাষার প্রতি আমাদের অনেক কবির কিয়ৎপরিমাণে অবহেলা আছে। বিশেষত মিত্রাক্ষর ছন্দের মিলটা তাঁহারা নিতান্ত কায়ক্লেশে রক্ষা করেন। অনেকে কেবলমাত্র শেষ অক্ষরের মিলকে যথেষ্ট জ্ঞান করেন এবং অনেকে "হ'য়েছে" 'করেছে" "ভুলেছে" প্রভৃতি ক্রিয়াপদের মিলকে মিল বলিয়া গণ্য করিয়া থাকেন। মিলের দুইটি প্রধান গুণ আছে, এক তাহা কর্ণতৃপ্তিকর আর এক অভাবিতপূর্ব্ব। অসম্পূর্ণ মিলে কর্ণের তৃপ্তি হয় না, সে টুকু মিলে স্বরের অনৈক্যটা আরও যেন বেশি করিয়া ধরা পড়ে এবং তাহাতে কবির অক্ষমতা ও ভাষার দারিদ্র্য প্রকাশ পায়। ক্রিয়াপদের মিল যত ইচ্ছা করা যাইতে পারে—সে রূপ মিলে কর্ণে প্রত্যেকবার নূতন বিস্ময় উৎপাদন করে না, এই জন্য তাহা বিরক্তিজনক ও 'একঘেয়ে' হইয়া ওঠে।"

('আধুনিক সাহিত্য,' ২৬ পৃঃ।)

রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং ছন্দের রাজা হইলেও তিনিও কিন্তু সকল স্থলে মিলের মাধুর্য্য রক্ষা করিতে পারেন নাই। আমরা দৃষ্টান্তস্বরূপ 'চয়নিকা' (২য় সং) হইতে কয়েকটী স্থল প্রদর্শন করিলাম।—

'হয় ত বা কাছে এস, হয় ত বা দূরে ব'স,"
—('নারীর উক্তি,' ৪০ পৃঃ)

"প্রান্তরের পান্থ দেশে মেঘে বনে যেত মিশে,"
—('বাক্প্রেম' ৬০ পৃঃ)

"সহসা চকিত হ'য়ে আপন সঙ্গীতে
চমকিয়া হেরিলাম—খেলাক্ষেত্র হ'তে"
—('মানস-সুন্দরী,' ১২১ পৃঃ)

রবীন্দ্রনাথ ক্রিয়াপদের মিলকেও কিন্তু অনেকস্থলে 'মিল' বলিয়া গণ্য করিয়াছেন। যথা—

"সুখ দুঃখ ভাগ হ'য়ে প্রতিদিন যায় ব'য়ে
গোপন স্বপন ল'য়ে কাটে বিভাবরী।"
—('বাক্প্রেম,' ৬০ পৃঃ)

"মুখ ফিরাতেছ, সখা, আজি কি বলিয়া!
ভুল করে' এসেছিলে?
ভুলে ভালো বেসেছিলে?
ভুল ভেঙ্গে গেছে তাই যেতেছ চলিয়া?"
—('বাক্প্রেম,' ৬১ পৃঃ)

"শত শত' প্রাণ ফেলে ভুল করে' কেন এলে"
—(ঐ, ৬১ পৃঃ)

"—ভৃত্যগণ ব্যস্ত হ'য়ে
বাঁধিছে জিনিষপত্র দড়াদড়ি ল'য়ে,"
—('যেতে নাহি দিব,' ১০২ পৃঃ)

"নাই বা বুঝিনু কিছু, নাই বা বলিনু,
নাই বা গাঁথিনু গান, নাই বা চলিনু"
—('মানস সুন্দরী,' ১২৪ পৃঃ)

"শুধু তরঙ্গের মত ভাঙ্গিয়া পড়িব
তোমার তরঙ্গ পানে বাঁচিব মরিব"—ঐ)
"জীবন করিয়া পূর্ণ, কথা না বলিয়া
উন্মত্ত হইয়া যাই উদ্দাম চলিয়া।"
—(ঐ ১২৫ পৃঃ)

"আজ বাদল হাওয়ায় কোথা কে তুই
গন্ধে মেতেছে?
লুপ্ত তারার মালা কে আজ লুকিয়ে রেখেছে?"
—(বর্ষা সন্ধ্যা, ২২০ পৃঃ)

সংস্কৃত সাহিত্যে 'যমক' অলঙ্কার স্থলে শুধু স্বরের মিল নহে, ব্যঞ্জনের পর্য্যন্ত ঐক্য আছে। যাঁহারা এই বৈচিত্র্য অনুভব করিতে চাহেন, তাঁহারা "শিশুপাল বধ" মহাকাব্যের উনবিংশ সর্গে

"কৃত্বা শিনেঃ সাধচমূং সপ্রভাবা চমূর্জ্জিতাম্।
সসর্জ্জ বক্ত্রঃ কুল্লাজসপ্রভা বাচমূর্জ্জিতাম্॥"

ইত্যাদি শ্লোক দৃষ্টি করিবেন। অন্ত্যানুপ্রাস স্থলেও সাহিত্য-দর্পণকার স্বরের অনুবৃত্তির কথা লিখিয়াছেন। যাঁহার আবিষ্কৃত ছন্দের অনুসরণে বঙ্গীয় কাব্য-সাহিত্য, অভিনব সম্পদের অধিকারী হইয়াছে, সেই জয়দেবের 'গীত গোবিন্দে' কোথায়ও মিলের দোষ নাই। তাঁহার—

"কথিতসময়েঽপি হরিরহহ ন যযৌ বনম্।
বিফলমিদমমলমপি মম রূপযৌবনম্॥"

ইত্যাদি কবিতার মিল, সত্যই কর্ণতৃপ্তিকর এবং অভাবিত-পূর্ব্ব।

ঈশ্বর গুপ্ত, ছন্দের মিল ছাড়া অন্যান্য বিষয়েও লেখক-দিগের রচনার দোষ গুণ আলোচনা করিতেন। 'মান-ভঞ্জন' নামক একটী পদ্যের আলোচনায় তিনি লিখিয়া-ছেন,—

"শুনি বলি সার, বাঁধিব না আর,
জীবনে দিব জীবন।
এত বলি ধনী অশ্রুতে অমনি,
ভেসে গেল দুনয়ন॥"

"জীবনে তেজি (দিব?) জীবন" যতিভঙ্গ দোষ হইয়াছে, কারণ প্রথমে তিন, মধ্যে দুই এবং শেষে তিন অক্ষর হইলে লঘু ত্রিপদীর ছন্দ থাকিবে না, অতএব ইহার পরিবর্ত্তে এরূপ হইলে ভাল হয়।

"শুন বলি সার, জীবন আমার,
তেজিব করেছি পণ।"

তথা "অশ্রুতে অমনি" ইহার পরিবর্ত্তে "কাঁদিল অমনি" হইলে ভাল হয়।"—

('প্রভাকর,' ২ পৃঃ, ৭ই ফাল্গুন, ১২৬৪)

ঈশ্বর গুপ্ত, সমালোচনা-প্রসঙ্গে ছন্দের নিয়ম সম্বন্ধেও কখনও কখনও উপদেশ করিয়াছেন। তিনি দীর্ঘ ত্রিপদীর বিষয়ে লিখিয়াছেন,—

"২৬টী অক্ষরে একটী চরণ, তাহা তিন ভাগে বিভক্ত। আট, আট, দশ অক্ষর, সেই দুই ভাগের আট অক্ষরে চারি চারি আট, দুই দুই দুই দুই, আট। চারি, দুই দুই, আট। দুই দুই, চারি আট। অথবা তিন তিন দুই অক্ষরে আট। এবং শেষে দশ অক্ষর চারি চারি দুই। তিন তিন চারি। দুই দুই দুই দুই দুই। চারি দুই দুই দুই। চারি দুই চারি। অথবা চারি তিন তিন অক্ষর। উদাহরণ—

"নিরাধার, নির্ব্বিকার, সর্ব্বসার, মূলাধার,
সর্ব্বাধার, সত্য, সনাতন।
বিভু, বিনা, গতি, নাই, সবিশেষ, বলি, তাই,
লহ, তাঁর, চরণ, শরণ।
কাননে, কোকিল, সবে, সুমধুর, কুহু, রবে,
গান, করে, স্বরে, হরে, প্রাণ।
গুণ, গুণ, ধ্বনি, তুলে, ফুলে, ফুলে, ফুলে, ফুলে,
মধুকরে, মধু, করে, পান॥

"কিন্তু ইহার কিঞ্চিৎ অতিক্রম হইলেই ছন্দ ভঙ্গ হইবেক। উদাহরণ—

"শ্রীদুর্গা, বল, বদনে, গেলে কালের সদনে
নরকে হবে ডুবিতে শেষে।

ইহাতে সেই ২৬টী অক্ষর আছে, কিন্তু রচনা দোষে ছন্দ ভঙ্গ হইল, কিন্তু "শ্রীদুর্গা বদনে বল" তথা "নরকে ডুবিতে হবে শেষে" এরূপ লেখা হইলে আর কোনরূপ দোষ থাকে না।"— ('প্রভাকর,' ৩ পৃঃ ১১ই মাঘ, ১২৬৪)

বঙ্গসাহিত্যে যাহাতে সুলেখকের সংখ্যা বৃদ্ধি হয়, এই উদ্দেশ্যে ঈশ্বর গুপ্ত লেখার সংশোধন-প্রসঙ্গে নবীন লেখক-দিগকে বিবিধ উপদেশ দিতেন। এই কার্য্যে যথেষ্ট পরিশ্রম হইলেও তিনি তাহাতে পরাঙ্মুখ হইতেন না। তিনি একবার লিখিয়াছিলেন,—

"এক একখানি রচনা সংশোধন করিতে বসিলে গায়ের রক্ত জল করিতে হয়, ইহাতে ভাবনা, চিন্তা এবং পরিশ্রম করিয়া যেরূপে সময় সংহার করিতে হয়, তাহা সুবোধের অবোধের বিষয় কি? ঐ সময়ের মধ্যে বিস্তর নূতন রচনা হইতে পারে, তথাচ আমরা সেই কষ্টকে কষ্টই জ্ঞান করি না, এবং সময়ের সার্থকতাই হইতেছে এইরূপ বিবেচনা করি, কারণ একটী গদ্যলেখক কিম্বা একটী পদ্যলেখক প্রাপ্ত হওয়া অতি দুষ্কর। অপর সকলে যেরূপ বিবেচনা করেন, করুন, কিন্তু আমরা লেখকের সংখ্যাবৃদ্ধি হওয়াকেই দেশের সৌভাগ্য এবং শ্রীবৃদ্ধিসাধনের একটী সোপান বলিয়া গণনা করি।"

('প্রভাকর,' ২ পৃঃ ৭ই ফাল্গুন, ১২৬২)

এই লেখাটী পড়িলে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, বঙ্গ-সাহিত্যের অভ্যুদয়ের জন্য ঈশ্বর গুপ্তের কিরূপ আন্তরিক কামনা ছিল।

ঈশ্বর গুপ্তের সংশোধন কার্য্যে লেখকগণ রুষ্ট হওয়া দূরে থাকুক, বরং কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেন। আমরা একজন লেখকের পত্র উদ্ধৃত করিলাম,—

"সম্পাদক মহাশয়! মাঘ মাসের একাদশ দিবসীয় প্রভাকরে মদ্রচিত কতিপয় পঙ্‌ক্তি সদুপদেশের সহিত প্রাপ্ত হইয়া মহাশয়ের নৈপুণ্য কারুণ্য ও অন্যান্য গুণের প্রাধান্য এবং ব্যবহারের সাধুতা দয়াপরতা প্রভৃতি গুণ-শৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়া কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি এবং তদুপদেশানুসারে নিম্নাঙ্কিত কতিপয় পঙ্‌ক্তি প্রেরণানন্তর ভরসা করি কৃপাবলোকনে প্রকাশ করিয়া তদ্রূপ বাধ্য করিবেন।"

(প্রভাকর ৩০ ফাল্গুন, ১২৬৪)

ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা-সমালোচনায় একবার কেদারনাথ দত্ত নামক একজন লেখক কিন্তু খুব অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। তিনি 'প্রভাকর' সম্পাদককে লিখিয়াছিলেন,—

"মহাশয় মদীয় নলিনীকান্ত নামক গ্রন্থমধ্যে—

"বিপদ সময়ে লোক জ্ঞান হারা হয়।
সুপথ দেখিলে তবু কুপথেতে যায়॥
সোজা পথ দেখাইলে বক্রে যায় চলি।
হিতবাক্য বুঝাইলে সব যায় ভুলি॥"

"এই ছন্দ চতুষ্টয়ের মিলন উপযুক্ত জ্ঞান করেন না, আপনার মতে কবিতাছন্দের অন্তে "হয়" তন্নিয়ে "যায়" এবং "চলি" তন্নিয়ে "ভুলি" উত্তম মিল হয় না "হয়" নিয়ে "হয়" ইত্যাদি, এবং "চলি" নিয়ে "কলি" "বলি" অথবা এরূপ যাহা হউক, এ রূপ রচনা আপনি সুরচনা বিবেচনা করেন এবং কহেন ভারতচন্দ্র কখনও তদ্বিপরীত লেখেন নাই।…. …..

"হয়" পরে "যায়" আপনি কবিতার মিলের এই দোষ ধরিয়াছেন তাহা আমার অভিপ্রায়ে দোষ নহে তদ্বিষয়ে কেহ প্রতিবাদী হইলে তাহার দৃঢ় উত্তর আছে।"—

শ্রীকেদারনাথ দত্ত।

কলিকাতা ১২৬৪। ফাল্গুন।"

ঈশ্বর গুপ্ত ইহার উত্তরে লেখেন,—

…. কেদারনাথ বাবু নলিনীকান্তে সর্ব্বাগ্রে যে চারিটী চরণ প্রকাশ করিয়াছেন, সকলেই তাহার দোষ গুণ বিবেচনা করুন। যথা……

তাঁহার ঐ নিজের চারিটি পদের পরিবর্ত্তে এরূপ হইলে কিরূপ হয়, যথা :—

"বিপদ সময়ে লোক জ্ঞানহারা হয়।
সুপথ দেখিলে তবু কুপথেই রয়॥
সোজা পথ দেখাইলে বাঁকা পথে চরে।
হিতবাক্য বুঝাইলে বিপরীত করে॥"

"বাঁকা পথে চলে।
বিপরীত বলে॥"

……তিনি……আমরা যেরূপে কবিতা-রচনা বিষয়ের পদ্ধতি পথ প্রকাশ করি, তদ্বিষয়ে যাহা লিখিয়াছেন, তাহার নিশ্চিত নিরাকরণ ও বিশেষ বিচার নিমিত্ত সর্ব্বসাধারণ পাঠকপুঞ্জের বিবেচনার অধীনে অর্পণ করিলাম, যে পক্ষের ভ্রম থাকে, তাঁহারাই ভঞ্জন করিবেন……. "

—(প্রভাকর, ২—৪ পৃঃ ৫ই চৈত্র, ১২৬৪।)

সম্পাদকের এই আহ্বানে হিন্দুস্কুলের একজন ছাত্র লিখিয়াছিলেন,—

প্রিয় সম্পাদক মহাশয়!

"এ তাবৎকাল পর্য্যন্ত আমার এ মত এক দৃঢ় সংস্কার ছিল যে, পদ্য রচনা করা অতি কঠিন কর্ম্ম, কেন না ভাবার্থ রক্ষা করিয়া চরণে চরণে মিলন করা অনিবার্য্যরূপে প্রয়োজন কিন্তু তাহা সর্ব্বস্থানে সুসম্পন্ন করা দুরূহ, এ প্রযুক্ত আমি পদ্য রচনা বিষয়ে একান্ত পরাঙ্মুখ হইয়া কখনো কখনো কেবল সামান্য গদ্য লিখিয়া মনের আক্ষেপ নিবারণ করিতাম, ভয়প্রযুক্ত গদ্যের নিকটেও গমন করিতাম না, কিন্তু অধুনা আপনকার বর্ত্তমান মাসের পঞ্চম দিবসীয় প্রভাকরপাঠে আমার সেই অলীক আশঙ্কা দূরীভূত হইয়াছে, যে হেতু কেদারনাথ নামক জনেক মহাত্মা অনুকম্পাপূর্ব্বক পদ্য লিখিবার পথ পরিষ্কার করিয়া দিয়াছেন। তাঁহার অনুগামী হইয়া কবিতা রচনা করা অত্যন্ত সহজ বোধ হইতেছে, কারণ তিনি বলেন "চলি" "ভুলি" "হয়" "যায়" এ রূপ মিলে কোন দোষ নাই। অতএব পশ্চাল্লিখিত কতিপয় পঙ্‌ক্তি যথাসাধ্য রচনা করিয়া

প্রেরণ করিলাম, তাহা সংশোধনের জন্য আপনাকে অনুরোধ করি না, কেবল ত্বরায় আপনকার সর্ব্বব্যাপী প্রভাকর পত্রে প্রকটন করিয়া বাধিত করিবেন এবং বোধ করি তাহা পাঠ করিয়া আমার অভিনব গুরু মহাশয় কেদারনাথ বাবুও যথেষ্ট সন্তুষ্ট হইবেন। যথা।—

"মেঠায়ের ঠোঙা লয়ে, যায় ব্রজলাল্।
"ছো মেরে" জিলিপি তুলে, উড়ে গেল চিল॥
জলধর বলে ভাই শুন হলধর।
ও বাড়ীর পুরন্দর, কেমন সুধীর॥
পিপাসায় চাহিলাম, এক ঘটি জল।
তাড়াতাড়ি এনে দিলে আদ্‌খানা বেল॥
বাবুদের বলরাম, বড় বলবান্।
দেবীদাস দুঃখ পেয়ে, দিন দিন, দীন॥
বিদেশে যাইলে দেবী, নাহি হয় স্থির।
কেমন করিয়া তাঁর দুঃখ হবে দূর॥"………

পু. চ. ব.
হিন্দুস্কুল।"
(প্রভাকর ১২ই চৈত্র, ১২৬৪)
শ্রীহরিহর শাস্ত্রী
—বঙ্গসাহিত্য, ১ম সংখ্যা, ১৩২৯

বাঙ্গলায় কথা।*

(১০)

কথা ও কাব্যের উৎপত্তি এক জায়গায়। বাস্তব জগতের বাঁধাবাঁধির ভিতর চিত্তে যে অতৃপ্তি আসে, যে অপরিতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা মনের ভিতর বসিয়া যায় তাই কল্পলোকে কথা ও কাব্যরূপে আকারিত হইয়া উঠে। এমন যদি কোনও ঘটনা ঘটে যা আমরা আয়ত্ত করিতে পারি না, যাহার ব্যাখ্যা করিতে গিয়া বুদ্ধি ব্যর্থ হইয়া যায়, তখন আমাদের চিত্ত চুপ করিয়া বসিয়া থাকে না, কল্পনার সাহায্যে তার একটা ব্যাখ্যা দিয়া নিশ্চিন্ত হয়।

আধুনিক মনস্তত্ত্বে স্বপ্ন সম্বন্ধে অনেক আলোচনা হইয়াছে। মনের ভিতর যে সব আকাঙ্ক্ষা ও প্রবৃত্তি চাপা পড়িয়া যায়, হয় তো বা সংবিতের ভিতর আসিতেই পারে না, মগ্ন-চৈতন্যের সেই সব প্রবৃত্তি ও আকাঙ্ক্ষা প্রতীকের সাহায্যে স্বপ্নে ফুটিয়া উঠে ইহা ফ্রয়েড প্রমাণ করিয়াছেন। কাব্য ও কথা জাগ্রত স্বপ্ন বই আর কিছুই নয়। যেটা মনে হয় হওয়া উচিত ছিল, অথচ হইল না বলিয়া মনে একটা অতৃপ্তি রহিয়া গেল, যে আকাঙ্ক্ষাটা পরিতৃপ্ত হইল না তাহা লইয়াই কথা, তাহা হইতেই কাব্য। যে সব প্রতীক আশ্রয় করিয়া এই আকাঙ্ক্ষাগুলি ফুটিয়া ওঠে তার ভিতরও এই মগ্ন-চৈতন্যের আকাঙ্ক্ষার আবেষ্টনের ক্রিয়া দেখা যাইতে পারে।

একটা দৃষ্টান্ত দিয়া আমি আমার কথাটা বুঝাইয়া বলিব। একবার কোনও রেলওয়ে ষ্টেশনে একটা কুলী একটা সাহেবের মাল ফেলিয়া দিয়াছিল। অতিকায় সাহেব তৎক্ষণাৎ কুলীকে পশ্চাৎ হইতে লাথির পর লাথি মারিয়া শাস্তি দিল। নিরীহ কুলীর উপর এই অত্যাচার দেখিয়া আমার বড়ই রাগ হইল, কিন্তু কিছুই করা আমার পক্ষে সম্ভব মনে হইল না। আমি মনে মনে গজরাইতে লাগিলাম। সাহেবকে খুব ঘা কয়েক দিবার জন্য আমার হাত নিশ্‌পিশ্ করিতে লাগিল; কিন্তু অশক্তি এবং এমন কাজের ফলাফল বিবেচনা প্রভৃতি নানা কারণে আমি চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম। কিন্তু আমার মন তাই বলিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল না। আমি কল্পনা করিতে লাগিলাম, আমি মহা শক্তিশালী! আমি গিয়া ওই সাহেবের সঙ্গে তকরার করিতে গেলে সে যেই আমাকে মারিতে আসিল, অমনি তার ঘুষিটা ধরিয়া তাহাকে উল্টাইয়া ফেলিয়া এমন মার দিলাম যে বাছাধন বুঝিয়া গেলেন। তারপর পুলিস আসিয়া আমাকে গ্রেপ্তার করিল, আদালতে আমার বিচার হইল। সাক্ষীর পর সাক্ষী আসিল, জেরা, জবানবন্দী হইল, আমি আমার বক্তব্য বলিলাম—এমনি করিয়া একটা লম্বা জাগ্রত স্বপ্ন আমার মনের ভিতর ভাসিয়া উঠিল। এ স্বপ্নের মূল আমার রুদ্ধ আকাঙ্ক্ষা, কিন্তু সে আকাঙ্ক্ষা যে প্রতীকের আশ্রয় লইয়া স্বপ্ন হইয়া উঠিল, তাহার মূল আমার মগ্ন-চৈতন্যে, আমার সমস্ত চরিত্রে, সমস্ত জীবনের শিক্ষা ও

* বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের চতুর্দ্দশ অধিবেশনে পঠিত।

সংস্কারে। তার একটা পরিচয় এই যে, এই সব জাগ্রত স্বপ্নে আমার মনে চট্ করিয়া আইন আদালতের কথা যেমন করিয়া আসিয়া পড়ে আর বিশদভাবে ফুটিয়া ওঠে, তাহা যে আইন-ব্যবসায়ী নয়, তার হইতে পারে না।

এমনি করিয়া রুদ্ধ আকাঙ্ক্ষা বা বুদ্ধির অতৃপ্তি হইতে সংস্কারের আশ্রয়ে গড়িয়া উঠে—কথা ও কাব্য। মূলে এ দুইটির ভিতর প্রভেদ অনেক সময় বুঝিয়াই ওঠা যায় না। পৃথিবীর প্রথম কাব্য ও প্রথম কথা বোধ হয় myth বা অলৌকিক কথা। কঙ্গোর নিগ্রোদের বিশ্বাস, সূর্য্য একটি বৃদ্ধ; সে সারাদিন পাহারা দিয়া শেষে সন্ধ্যা বেলায় পশ্চিমের পাহাড়ে তার কুঁড়ে ঘরে বিশ্রাম করে। আমাদের বেদে সূর্য্য ও উষা সম্বন্ধে নানা উপাখ্যান আছে। কত রকম কত উপাখ্যান আছে। এগুলি কাব্যও বটে, কথাও বটে, এগুলি কাব্য ও কথা দুইয়েরই মূল।

সেই আদি কবিগণ আকাশে সূর্য্য দেখিতেন, রোজ তার উদয়াস্ত দেখিতেন, দিবা নিশা উষা ও সন্ধ্যার পারম্পর্য্য দেখিতেন, কিন্তু ইহাদের কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ বুঝিতেন না। কিন্তু না বুঝিয়া চুপ মারিয়া যাওয়া মনের স্বভাবই নয়, তাই তাঁহাদের চিত্ত তাঁহাদের সম্মুখে এই সব প্রাকৃতিক ব্যাপারকে অলৌকিক মানবরূপে আঁকিয়া দিত; তাহাদের লীলা খেলার ছবি আঁকিয়া বুদ্ধির আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত করিত। আজও কবি তেমনি ফুলের মুখে হাসি, হাওয়ার ভিতর প্রেম ও পাগলামি দেখিয়া চিত্তের ঠিক এই একই খেয়াল পরিতৃপ্ত করেন। আবার বৈজ্ঞানিক ঠিক এই আকাঙ্ক্ষাকেই লাগাম পরাইয়া Hypothesis গড়িয়া আপনার কাজে লাগাইয়া দেন।

মনের ভিতর যে সব অসম্পূর্ণতা ও অতৃপ্তি জমাট বাঁধিয়া থাকে তাহা হইতে একটা আকাঙ্ক্ষার সৃষ্টি হয়। কবি ও শিল্পীর মনে সেই আকাঙ্ক্ষা একটা পরিপূর্ণ প্রতীক হইয়া দেখা দেয়; এমন একরূপে দেখা দেয় যাহাতে সেই আকাঙ্ক্ষা সম্পূর্ণ না হইলেও অনেকটা পরিতৃপ্তি লাভ করে। অন্যের মনে সে আকাঙ্ক্ষা হয় তো তেমন তীব্র হয় না, না হয় তো তাহা প্রকাশের যোগ্য প্রতীক খুঁজিয়া পায় না, তাই তাহা চিত্তের ভিতর গুপ্ত হইয়া থাকে। কিন্তু যখন কবি বা শিল্পী তাঁর কল্পনাকে ভাষায় বা চিত্রে গাঁথিয়া তাহার কাছে উপস্থিত হন তখন তার অন্তরের গুপ্ত কন্দর হইতে এই সব আকাঙ্ক্ষা ছাড়া পাইয়া বাহির হইয়া তৃপ্তি লাভ করে। যার মনে প্রকাশ বা প্রচ্ছন্ন ভাবে এই একই আকাঙ্ক্ষা কেবল আত্মপ্রকাশের প্রতীক খুঁজিতেছিল, সেই কেবল এ তৃপ্তি লাভ করিতে পারে, তার কাছেই কবি বা শিল্পীর কলার আদর হয়, অন্যের কাছে হয় না।

কিন্তু শিল্পীর বা কবির অন্তরের আকাঙ্ক্ষা ষোল আনাই তাঁর নিজস্ব নয়। তাঁর ভাব, চিন্তা, ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষার কতখানি যে অতীত ও বর্ত্তমান হইতে ধার করা, তাহা আমরা ভাবিয়া দেখি না। আনাতোল ফ্রাঁস বলেন, "We do not pay enough heed to the fact that a writer, even if he is very original, borrows more than he invents... ..His very thought is inspired into him from all sides. He has received the colours, he only brings the shades, though these are, I know, infinitely precious. Let us be sensible enough to recognise it : our works are far from being all ours. They grow in us, but their roots are every where in the nourishing soil. Let us admit that we owe a good deal to every body and that the public is our collaborator." যে সব রুদ্ধ অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা আমার মগ্ন-চৈতন্যের ভিতর প্রতীক খুঁজিয়া ফিরিতেছে তার অনেকটাই আমার সমধর্ম্মী সমসাময়িকের সঙ্গে এক, তার অনেকটা আমি তাদের কাছেই পাইয়াছি। তাই, যে প্রতীক আশ্রয় করিয়া তাহা কল্পনায় ফুটিয়া উঠিতেছে তাহা যেমন আমার আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি সম্পাদন করে, তেমনি তাহাদেরও আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত করিবার সম্ভাবনা। সেইজন্য কবি ও শিল্পীর চিত্তের আকাঙ্ক্ষা যে কল্পনায় তৃপ্ত হয় প্রায়ই তাহা তাঁহার সমসাময়িক সমাজের আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত করিতে পারে। কিন্তু কবির বিশেষত্ব এই যে, তাঁর চিত্ত সমসাময়িক সমাজ হইতে অল্পবিস্তর অগ্রসর। তাঁর কল্পনা কেবল সমাজের আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত করে না, সাধারণের চিত্তের ভিতর নূতন আকাঙ্ক্ষা ধ্বনিত করিয়া তুলে। সে

তত বড় কবি, যে পাঠকের অন্তরে বেশী করিয়া নূতন ভাবের ধারা বহাইতে পারে। কিন্তু এই ভাব-প্রেরণা (suggestion) দিবার শক্তি কবির হয় শুধু এই জন্য, যে কবি যুগসমাজের চিত্তের আকাঙ্ক্ষার সহিত যোগ রাখিয়া কল্পনা করেন এবং সেই কল্পনা এমন রূপে উপস্থিত করেন যাহাতে সমাজের চিত্ত তৃপ্ত হয়।

কাব্যের মত কথা-সাহিত্যেরও সফলতার মূল এই সহানুভূতি, লেখকের সঙ্গে পাঠকের এই আকাঙ্ক্ষার যোগ। যেখানে এই সংযোগ নাই সেখানে লেখকের কথা আদর পায় না, যেখানে এই সংযোগ আছে সেখানে তাহা সমাদর পায়। শিশুর কাছে রাজারাণীর কথাই মনোরম, উচ্চ অঙ্গের কাব্যের তলায় যে পরিণত চিত্ত ও আকাঙ্ক্ষা আছে শিশুর চিত্তে তাহা নাই, তাই শিশু, রবীন্দ্রনাথের ভাষায় সত্য সত্যই বলে,—

বাবা নাকি বই লেখে সব নিজে!
কিছুই বোঝা যায় না লেখেন কি যে!
সেদিন পড়ে শোনাচ্ছিলেন তোরে,
বুঝেছিলি, বল্ মা সত্যি করে!
এমন লেখায় তবে
বল্ দেখি কি হবে?
তোর মুখে মা যেমন কথা শুনি
তেমন কেন লেখেন না কো উনি?
ঠাকুর মা কি বাবাকে কখ্খনো
রাজার কথা শোনায়নিকো কোন?
সে সব কথা গুলি
গেছেন বুঝি ভুলি?

শিশুকালে রূপকথা শুনিয়া যে আনন্দ পাইয়াছি আজকার শ্রেষ্ঠ উপন্যাসে তার চেয়ে বেশী পরিমাণে আনন্দ পাই কি? অথচ সেই আনন্দের সন্ধানে যদি আজ আমরা রূপকথা পড়িতে বসি তবে তৃপ্তি পাইব না। এক বয়সে Scott এর উপন্যাসের সব বীরকীর্ত্তিতে আত্মহারা হইয়া বার বার পড়িয়াছি, আজ সে বইয়ে সে তৃপ্তি পাই না। পরিণত বয়সের লোকের ভিতরও favourite author লইয়া মতভেদ আছে, লেখার ভালমন্দ বিচার লইয়া মতভেদ হয়। সব সময়েই, বিশেষ করিয়া যুগসন্ধি স্থলে, এক একটী লেখক সম্বন্ধে লোকের মত যে কত রকম হইতে পারে তাহা বলাই বাহুল্য। সমসাময়িক লেখকদের কথা ছাড়িয়া দিলেও, আজও আমাদের মধ্যে এমন লোক দেখা যায় যাঁরা স্কটকে জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক বলিয়া মনে করেন। পক্ষান্তরে এমন লোকও আছেন যাঁহারা মনে করেন যে স্কট অতীত যুগের লেখক, বর্ত্তমানের সাহিত্যে তাঁর স্থান নাই বলিলেও চলে। এর একটাও আমার নিজের মত বলিয়া বলিতেছি না, এ সব মত আমি অপরের কাছে শুনিয়াছি। এ মতভেদের হেতুও ঐ আকাঙ্ক্ষার ভেদ। আজকালকার সমাজে এত রকম বিভিন্ন স্রোত, এত নানাবিধ Culture এর ধারা বহিয়া চলিয়াছে, সমাজের ভিতর এত বিচিত্র শক্তি নানারূপে ক্রিয়া করিতেছে, যে এই সমুদয় কারণের বিবিধ সংমিশ্রণে নানাচিত্তে নানাবিধ আকাঙ্ক্ষার, সংশ্লেষের (complex) সৃষ্টি হইয়াছে। তাই যাহা একের তৃপ্তি সম্পাদন করে তাহা অন্যের কাছে বিস্বাদ লাগে।

তবু মানবের আকাঙ্ক্ষার এই বিচিত্র সংযোগ-বিয়োগের ভিতর কতকগুলি ব্যাপার আছে যাহা চিরদিন সবার ভিতর এক। মানব-সমাজের অপূর্ব্ব বিচিত্রতার ভিতর, তার নানা অনুষ্ঠান-বৈচিত্র্য, নানা ভাব-বৈচিত্র্যের ভিতর, মানবত্বের একটা প্রকাণ্ড সাধারণ ধারা বহিয়া চলিয়াছে। সেটা এত প্রকাণ্ড ও এত সাধারণ যে তাহা সহজে অনুমান করিতে পারা যায় না। অত্যন্ত অসভ্য বর্ব্বর বলিয়া যাদের আমরা মনে করি, সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র সভ্যতার ভিতর পরিপুষ্ট বলিয়া যাহাদের দূর বলিয়া মনে করি, দূরতম অতীতের লোক বলিয়া যাদের সঙ্গে আমাদের কোনও সংযোগ নাই বলিয়া মনে করি, তাদের সকলের সঙ্গে আমাদের অন্তর যে কতটা এক তাহা ভাবিতে অবাক্ হইতে হয়। এই সাধারণ মানব চরিত্র বলিতে যে আকাঙ্ক্ষার সংশ্লেষ বুঝায় তাহাকে আশ্রয় করিয়াই স্থায়ী কাব্য, কথা বা শিল্প রচিত হয়। তাই Homer বা ব্যাস সুদূর অতীত হইতে আমাদের হৃদয়-তন্ত্রীতে আঘাত করিতে পারেন, তাই সেক্সপীয়ার জগতের কবি, তাই শকুন্তলার সৌন্দর্য্যে জর্ম্মাণীর কবি মুগ্ধ, তাই চণ্ডীদাসের প্রেমের কবিতা পড়িয়া আজকার বাঙ্গালী চক্ষের জল ফেলে।

সাহিত্যের এই সার্ব্বজনীনতা লাভ করিতে হইলে যে সকল প্রাদেশিকতা বর্জ্জন করিতে হয় তাহা নহে, প্রাদেশিক আচার অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়াই চিরন্তন মানবের অন্তর ফুটিয়া উঠে, যদি শিল্পী কুশলী হয়, যদি সে সেই শাশ্বত মানবের আকাঙ্ক্ষার ভিতর তুলি ডুবাইয়া সে লিখিতে জানে। তাই নিতান্ত প্রাদেশিকভাবে যে সব গান বা ছবি বা কথা রচিত হইয়াছে তাও আজ সমগ্র বিশ্ববাসীকে মুগ্ধ করিতেছে।

ক্রমশঃ

শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, এম-এ, ডি-এল্।

হিসাবী লোক।

(নীতিমূলক গল্প)

[শ্রীগিরীশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ]

রামরূপ দত্ত নিজের অধ্যবসায় এবং মিতব্যয়ের ফলে একশরীরে ধনকুবের হইয়াছিলেন। কিন্তু প্রভূত ধনের অধীশ্বর হইয়াও তিনি প্রয়োজনাভাবে এক কপর্দ্দক ব্যয় করিতেও কুণ্ঠিত হইতেন। সৎকার্য্যে তিনি মুক্তহস্ত ছিলেন, আবশ্যকমত দান করিতে তাঁহার বেশ মতি গতি ছিল। কিন্তু অপব্যয় না করার দরুণ সাধারণতঃ জনসমাজে তিনি কৃপণ বলিয়া পরিচিত ছিলেন। অনেকে তাঁহার বিরুদ্ধে অনেক প্রকার অতিরঞ্জিত কার্পণ্য প্রকাশ করিত। তাঁহার একমাত্র পুত্র পাঁচুগোপাল রূপে গুণে আদর্শ পুরুষ; অতুল ঐশ্বর্য্যের ভাবী অধিকারী; সুতরাং তাহার ১৪।১৫ বৎসর বয়স হইতে না হইতেই আত্মীয়স্বজন পাঁচুর বিবাহের জন্য তাহার পিতাকে খুব পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল। কিন্তু তাহার পিতা এত অল্প বয়সে পুত্রের বিবাহ দিতে সহসা সম্মত হইলেন না, তাহাতে অনেকেই বিবাহে অর্থ ব্যয়ের সম্ভাবনা নিবন্ধনই পিতার অসম্মতি মনে করিয়া দত্ত মহাশয়ের কৃপণতা সম্বন্ধে আরও অনেক প্রকার অতিরঞ্জন আরম্ভ করিল। পাঁচুর বয়স ১৯ বৎসর পূর্ণ হইলে, নিমচাঁদ পালের কন্যা ষোড়শীবালার সহিত তাহার বিবাহ স্থির হইল। নিমচাঁদ বাবুর কন্যার বয়স তখন ১২ বৎসর। তাহার রূপ গুণের অভাব ছিল না, অধিকন্তু পাঁচ ভ্রাতার সর্ব্ব কনিষ্ঠা একমাত্র ভগিনী, ভ্রাতাদিগের অত্যন্ত আদরের পাত্র রূপে লালিত হইয়াছিল।

বিবাহ স্থির হইবার সময়ে রামরূপ দত্তের কার্পণ্যের কথা খুবই প্রচারিত হইয়াছিল। তাহাতে কন্যার মাতা এমন কৃপণের ঘরে জীবনসর্ব্বস্ব মেয়েকে বিবাহ দিতে অসম্মতি প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু উপযুক্ত ঘরে আর বরের সম্ভাবনা ছিল না। সেকালে মেয়ে বয়স্থা করিয়া রাখা নিতান্ত পাপের কাজ বলিয়া বিবেচিত হইত। অগত্যা তাঁহাকে সম্মতি দিতে হইয়াছিল। শুভদিনে শুভক্ষণে ষোড়শীর বিবাহ সম্পন্ন হইল, ধুমধাম মিটিয়া গেল। বিবাহের মাসেই দ্বিরাগমন কার্য্যও নিষ্পন্ন হইল। সেকালে পাক-করা-ঠাকুরের প্রথা কোন বাঙ্গালা সমাজেই প্রচলিত ছিল না, যত বড় ধনীর মেয়েই হউক না, প্রত্যেককেই নিজে রন্ধন করিতে হইত। রন্ধনের কৌশল, শ্বশুর শাশুড়ীর শুশ্রূষা প্রভৃতিই তখন কুলবালাদিগের সুনামের কারণ বলিয়া গণ্য হইত। ষোড়শীও বাল্যকালে রান্না-ভান্নার কাজই যথারীতি শিক্ষা করিয়াছিল। শ্বশুরালয়ে যাওয়ার পর হইতেই নিজে রান্না করিয়া শ্বশুর প্রভৃতিকে খাওয়াইত। বৃদ্ধ শ্বশুর তাঁহার নির্দ্দিষ্ট কামরায় আহার করিতেন। একমাত্র পুত্রবধূই তাঁহার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত ছিল। একদিন ষোড়শী তাহার শ্বশুরের ভাত পরিবেশন করিয়া স্বতন্ত্র একটি ছোট পাথরের বাটীতে ঘি দিয়া শ্বশুর মহাশয়ের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিল। এমন সময় তাহার শ্বশুর আসিয়া পীড়িতে বসিয়াই দেখিতে পাইলেন যে, ঘিয়ের বাটীতে একটি মাছি পড়িয়া ধড়ফড় করিতেছে।

তিনি ইহা দেখিবামাত্র মাছিটাকে ধরিয়া নিংড়াইয়া তাহার পাক হইতে ঘিয়ের সূক্ষ্মতম অংশ ভাতের উপর ছড়াইয়া মাছিকে দূরে নিক্ষেপ করিলেন। দত্ত মহাশয়ের কার্পণ্যের কথা পূর্ব্বেই ষোড়শীর কর্ণগোচর হইয়াছিল; তাহার উপর এই সূক্ষ্ম হিসাব দর্শনে তাহার মনের অবস্থা বড়ই খারাপ হইয়া গেল। অন্য দিনের মত আর আহারের প্রবৃত্তি হইল না। রাত্রিতে ভালরূপ ঘুম হইল না, কি যেন একটা চিন্তার ঢেউ তাহাকে তোলপাড় করিতে লাগিল। পর দিনের অবস্থা আরও খারাপ হইল, দেখিতে দেখিতে ৪।৫ দিনের মধ্যেই অত্যন্ত দুর্ব্বল ও বিবর্ণ বিশীর্ণ হইয়া পড়িল। দত্ত মহাশয়ের একটা প্রধান গুণ ছিল যে, নিজের পরিবার-বর্গের মধ্যে কাহারও কোন রোগ হইলে তিনি তৎক্ষণাৎ যথাশক্তি চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতেন। সুতরাং পুত্রবধূর এই অবস্থা দর্শনে তিনি নানাস্থান হইতে ঔষধ মন্ত্রের ব্যবস্থা করিলেন; কিন্তু কিছু হইল না। দিন দিনই সোণার কমল শুকাইয়া যাইতে লাগিল।

বধূমাতার অনির্ব্বচনীয় রোগের গুরুত্ব বুঝিয়া দত্ত মহাশয় অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইলেন, ক্রমে তাঁহার বন্ধুবর্গ আসিয়া নানা প্রকার উপদেশ দিতে লাগিল। কিন্তু কিছুতেই তিনি নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন না। একদিন অকস্মাৎ তাঁহার বাল্যবন্ধু মধু নাপিত আসিয়া উপস্থিত হইল। দত্ত মহাশয় তাহাকে দেখিয়া বড়ই আনন্দিত হইলেন এবং অল্প সময়ের মধ্যেই পূর্ব্বাপর সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করিলেন। মধু প্রামাণিক প্রত্যুৎপন্নমতিতার দরুণ প্রসিদ্ধ ছিল। সে তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিল, রূপদাদা! আপনার কোন ভয় নাই, চলুন বধূমাতাকে দেখিয়া আসি, আর একটা কথা এই যে, আমি যাহা বলিব, আপনি তৎক্ষণাৎ তাহার উপযুক্ত অর্থ ব্যয়ের প্রতিশ্রুতি দিবেন। দত্ত মহাশয় বলিলেন, ভাই! তোমার কথার উপর আমার আর কিছু বলিবার নাই, চল একবার ভিতর বাড়ীতে যাই। এই বলিয়া উভয়ে অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। মধু, বধূমাতার আপাদমস্তক পর্য্যবেক্ষণ করিয়া একটা বড় রকমের ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া ফেলিল। ইহাতে হীরা-মুক্তা-সোণা-প্রবাল প্রভৃতি বহুমূল্য জিনিস কিছুই বাদ পড়িল না।

অন্যান্য সরঞ্জামও খুব প্রচুর পরিমাণই ফরমাইস্ করা হইল। লাখ সোয়া লাখ টাকার তালিকা লেখা হইল। দত্ত মহাশয় প্রফুল্ল মুখে তাহা অনুমোদন করিলেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে লোহার সিন্দুক হইতে টাকার ছালা বাহির করিয়া খরচের জন্য বাহির বাড়ীতে লইয়া গেলেন। এদিকে ষোড়শীর অবস্থাও সেইদিন হইতে ক্রমে ভাল হইতে লাগিল। ক্রমে ঔষধের জন্য খুবই ধূমধাম পড়িয়া গেল। হীরা মুক্তা পরীক্ষার জন্য জহরী আসিল, চিকিৎসক আনাগোনা করিতে লাগিলেন। পাঁচ ছয় দিনের মধ্যে ষোড়শী রোগমুক্ত হইয়া স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হইল। বলা বাহুল্য যে, কোন ঔষধই তাহার ওষ্ঠ-সংযোগ হইল না। বধূমাতার আরোগ্য দর্শনে দত্ত মহাশয়ের আনন্দের আর সীমা রহিল না। কিন্তু ঔষধের ব্যবস্থাতেই রোগ সারিয়া গেল, ইহার রহস্য ভেদ করিতে না পারিয়া তিনি বড়ই বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। মধু প্রামাণিকও তখন স্থানান্তরে চলিয়া গিয়াছে, সুতরাং তাহার কাছে জিজ্ঞাসা করিয়া কৌতূহল নিবৃত্ত করিবারও কোন উপায় ছিল না। একদিন দত্ত মহাশয় অগত্যা বধূমাতাকেই জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা! তোমার অবস্থা আমি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। তুমি হঠাৎ কাতর হইয়া পড়িলে, ঔষধ সেবনে কোনও ফল হইল না। কিন্তু মধু নাপিত আসিয়া ঔষধের ব্যবস্থা করার সঙ্গে সঙ্গেই তোমার রোগ সারিতে লাগিল। ব্যাপার কি?" তখন ষোড়শী সরলভাবে বলিতে লাগিল, "বাবা! আমার আর কিছুই রোগ হয় নাই, কেবল আপনাকে মাছির পাক নিংড়াইয়া ঘি বাহির করিতে দেখিয়া আমি বড়ই চিন্তিত হইয়াছিলাম। আমার মনে এই ভয়ের সঞ্চার হইয়াছিল যে, যিনি এমত হিসাব করিয়া চলেন, তিনি কখনও আমার উৎকট পীড়া হইলে অর্থ ব্যয় করিবেন না, সুতরাং আমাকে রোগ-যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে। এই চিন্তাতেই আমি কাতর হইয়া পড়িয়াছিলাম। পরে আপনাকে অক্লেশে অর্থব্যয় করিতে দেখিয়া নিজের ভুল বুঝিতে পারিয়াছি। আমার রোগও সারিয়া গিয়াছে।" তখন দত্ত মহাশয় হাসিয়া বলিলেন, "মা! যে জন পাঁচ গণ্ডা কড়ির অপব্যয়-কেও সহস্র সুবর্ণ মুদ্রার তুল্য জ্ঞান করে, পক্ষান্তরে উপযুক্ত সময়ে কোটী টাকা খরচ করিতেও কষ্ট বোধ করে না, সেই শ্রেষ্ঠ মানবকে লক্ষ্মী কখনও পরিত্যাগ করেন না। নীতিশাস্ত্রকার বলিয়াছেন—

যঃ কাকিণী মপ্যপথ প্রপন্নাং
সং সেবতে নিষ্ক সহস্র-তুল্যাম্।
কালেষু কোটিষ্বপি মুক্ত হস্ত
স্তং মর্ত্ত্যসিংহং ন জহাতি লক্ষ্মীঃ॥

পল্লী-রাণী।

[শ্রীদ্বিজপদ মুখোপাধ্যায় বি-এ]

১

বিশ্বধাতার গৌরবময়ী চির-নব ছবিখানি,
চির সারল্য মণ্ডিতা অয়ি বঙ্গপল্লী রাণি ;
যুগ-যুগ ধরি স্নেহ-মমতার,
খুলিয়া রেখেছ ভাণ্ডার-দ্বার,
রচেছ স্বর্গ আবাসে তোমার
পুণ্য-গরিমা আনি'।

২

নন্দন রচি' রেখেছ তোমার বন-বিথীকার মাঝে,
কুঞ্জে কুঞ্জে মাধবীলতায় শত পারিজাত রাজে ;
তরু-লতিকায় অটুট বাঁধন,
বন-যূথিকায় মাতায় পবন,
বিহগ-কাকলী কল-গুঞ্জন
নিত্য সকাল-সাঁঝে।

৩

অক্ষয় তব বিশাল বটের স্নেহশাখা বাহুগুলি,
রেখেছে যতনে যুগ যুগান্তের সুমধুর স্মৃতি তুলি,'
ব্রীড়া-রক্তিম অশোকের শাখে,
কোকিল পাপিয়া থাকি থাকি ডাকে,
কল্পনাময়ী ছবি তব দেখে
তরুণ নয়ন খুলি'।

৪

সরসী বক্ষে রচেছে আসন বিকচ কমল ফুলে,
প্রেমের জোয়ার বক্ষে ধরিয়া নদী উঠে ফুলে ফুলে,
তটিনীর বাঁকে টিটিভের দল,
ক্রীড়া কৌতুকে পুলক-চপল,
ফেনরাশি ভাসে কুন্দ-ধবল
মরালের মত কূলে।

৫

ক্ষেত্র তোমার শস্য শ্যামল, গোষ্ঠে তোমার ধেনু,
শ্যামল-প্রকৃতি-শ্যাম যমুনায় রাখাল বাজায় বেণু
বেণুর কুঞ্জ দোলে দুল্ দুল্
বন-মর্ম্মরে বিহগ ব্যাকুল,
মন্দ অনিল-পরশ-অতুল,
ঝরায় পিয়াল-রেণু।

৬

শীতল তোমার অঙ্ক তেয়াগি' দূরে গেছে কত জন,
সাধের তোমার সাজান ভবন হ'য়ে গেছে বটে বন,
ঢাল তবু তুমি এখনও অয়ি,
পূত স্নেহাশীষ কল্যাণময়ি,
শ্রান্ত কৃষক তব কৃপা বহি'
শান্ত করে যে মন।

৭

বিশ্বের তুমি অণু পরমাণু নিঃস্বের তুমি প্রাণ,
সত্যের তুমি জন্মদাত্রী ব্যথিতের তুমি ত্রাণ,
ললাটে তোমার কালের কালিমা,
অকৃতী মোরাই দিয়েছি জানি মা,
ভাতিবে কি পুনঃ অমল চাঁদিমা,
হবে অমা অবসান!

৮

তোমার স্বভাব অন্নসত্র অভাবের লীলা ভূমি,
বিলাসী মোদের অন্দরে হায় মলিনা জননী তুমি.
তবু কেন স্নেহ ? দাও অভিশাপ,
পূর্ণ হউক পাপ-পরিতাপ,
করিয়াছি তব দান অপলাপ,
সহিও না আর তুমি।

২০শ ভাগ] ভাদ্র, ১৩৩০। [৭ম সংখ্যা

গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

[শ্রীপ্রিয়লাল দাস এম-এ, বি-এল]

এক্ষণে "গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী" রচিত হইবার কারণ সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করিয়া আমরা কবির মানচিত্রে গঙ্গার গতি অনুসরণ করিব। মানসিংহ কর্ত্তৃক প্রতাপাদিত্য পরাজিত হইলে মোগলেরা যখন বারভূঁইয়াদিগকে দিল্লির শাসনাধীনে আনয়ন করিলেন, সেই সময়ে বঙ্গের সর্ব্বপ্রধান হিন্দুরাজা ভবানন্দ মজুমদার ও তাঁহার পরে তাঁহার পুত্র ও প্রপৌত্র সুখে ও শান্তিতে কিছুদিন রাজত্ব করিবার সুবিধা পাইয়াছিলেন। এই সময়ে অর্থাৎ সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে বঙ্গদেশ উপদ্রবশূন্য হওয়াতে উক্ত হিন্দু রাজারা দেবালয়াদি নির্ম্মাণ করিয়া এদেশে আবার হিন্দুর প্রাধান্য বিস্তার করিবার জন্য সচেষ্ট হইয়াছিলেন। দুর্গাপ্রসাদের সমসাময়িক নদীয়ার রাজা রাঘব দীঘনগরে "রাঘবেশ্বর" নামে দুইটি প্রসিদ্ধ শিব প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। স্বয়ং ভবানন্দ রাজধানী মাটিয়ারীতে যে শিবমন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন তাহা এখনও "স্বস্থানে দণ্ডায়মান রহিয়া অতীত ইতিহাসের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।" (৬) রাঘবের পুত্র রাজা রুদ্রও "তাঁহার পিতার ন্যায় লোকহিতার্থে বহু জলাশয় খনন, রাজবর্ত্ম প্রস্তুত প্রভৃতি অশেষ সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করেন। ইনি নবদ্বীপে এক মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া একটি শিবলিঙ্গ স্থাপনা করেন।" (৬) শ্রীচৈতন্যের সময়ে শান্তির যুগে বঙ্গদেশ কৃষ্ণপ্রেমে ডুবিয়া গিয়াছিল। প্রতাপাদিত্যের সময়ে অশান্তি ও যুদ্ধ বিগ্রহের মধ্যে স্বাধীন বাঙ্গালী শক্তিপূজার পক্ষপাতী হইয়াছিল। মোগলের অধীনে দেশে আবার শান্তি ফিরিয়া আসিলে বাঙ্গালী মঙ্গলময় শিবের পূজা করিতে শিখিয়াছিল। শিবপূজার সহিত গঙ্গোদকের যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে, তাহা হিন্দুমাত্রেই অবগত আছেন। দুর্গাপ্রসাদের সময়ে শিবপূজার সঙ্গে সঙ্গে গঙ্গাস্নানের যোগগুলিও যে বঙ্গের নরনারীর চিত্তাকর্ষণ করিয়াছিল তাহার বিস্তর প্রমাণ কবির কাব্যেই রহিয়াছে। প্রতাপের বিরুদ্ধে যে মোগলবাহিনীর সাহায্যে মানসিংহ অভিযান করিয়াছিলেন, গঙ্গা পার হইবার সময়ে তাহাদিগকে ঝড় বৃষ্টিতে যে ভয়ানক কষ্ট পাইতে হইয়াছিল তাহা ইতিহাস স্বীকার করে। "অন্নদামঙ্গলে" এই ঘটনা লইয়া ভারতচন্দ্র "বর্দ্ধমান হইতে মানসিংহের প্রয়াণ" ও "মানসিংহের সৈন্যে ঝড় বৃষ্টি" শীর্ষক যে দুইটি বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা বঙ্গভাষার পাঠকমাত্রেই অবগত আছেন।

"সাঙ্গ হৈল বিদ্যাসুন্দরের সমাচার।
মজুন্দারে মানসিংহ কৈলা পুরস্কার ॥
মজুন্দারে কহিলা করিব গঙ্গাস্নান।
উত্তরিলা পূর্ব্বস্থলী নদে সন্নিধান ॥
আনন্দে গঙ্গার জলে স্নান দান কৈলা।
কনক অঞ্জলি দিয়া গঙ্গাপার হৈলা ॥
পরম আনন্দে উত্তরিলা নবদ্বীপ।
ভারতীর রাজধানী ক্ষিতির প্রদীপ ॥"

মানসিংহ "বাইশ লস্কর সঙ্গে, কচুরায়ে লয়ে রঙ্গে" বাঙ্গালায় আসিয়াছিলেন। তাঁহার সঙ্গে "যত রজপুত, যেমন যমের দূত, নানা জাতি মোগল পাঠান" আসিয়াছিল। অসংখ্য গাড়ী, গঙ্গা পার হইবার জন্য বহুতর নৌকা, তাম্বু প্রভৃতি উক্ত বাইশ লস্করের উপযোগী সকল প্রকার সরঞ্জাম মানসিংহের ছিল।

"ঝড়ে উড়ে কানাত দেখিয়া উড়ে প্রাণ।
কুঁড়ে ঠাট ডুবিল তাম্বুতে এল বাণ ॥
সাঁতারিয়া ফিরে ঘোরে ডুবে মরে হাতি।
পাঁকে গাড়া গেল গাড়ী উট তার সাথি ॥
ফেলিয়া বন্দুক জামা পাগ তলবার।
ঢাল বুকে দিয়া দিল সিপাই সাঁতার ॥
খাবি খেয়ে মরে লোক হাজার ২।
তল গেল মাল মাত্তা উক্ত দুবাজার ॥
বকরী বকরা মরে কুঁকড়ী কুঁকড়া।
কুজড়ানী কোলে করি ভাসিল কুজড়া ॥
ঘাসের বোঝায় বসি ঘেসেড়ানী ভাসে।
ঘেসেড়া মরিল ডুবে তাহার হাভাষে ॥
* * *
ডুবে মরে মৃদঙ্গী মৃদঙ্গ বুকে করি।
কালোয়াত ভাসিল বীণার নাট ধরি ॥
বাপ বাপ মরি মরি হায় হায় হায়।
উভরায় কাঁদে লোকে প্রাণ যায় ২ ॥
কাঙ্গাল হইনু সবে বাঙ্গালায় এসে।
শির বেচে টাকা কবি সেহ যায় ভেসে ॥
এইরূপে লস্করে দুষ্কর হৈল বৃষ্টি।
মানসিংহ বলে বিধি মজাইল সৃষ্টি ॥
গাড়ী করি এনেছিল নৌকা বহুতর।
প্রধান সকলে বাঁচে তাহে করি ভর ॥
নৌকা চড়ি বাঁচিলেন মানসিংহ রায়।
মজুন্দার শুনিয়া আইলা চড়ি নায় ॥"

প্রতাপের সহিত যুদ্ধে জয় হইলে "দল বল সঙ্গে, পুনরপি রঙ্গে, চলে মানসিংহ রায়।" ফল কথা, কবি দুর্গাপ্রসাদের "নরেন্দ্র ভূপতি"র পূর্ব্বপুরুষ ভবানন্দ মজুমদারের সময় হইতে বঙ্গদেশ-প্রবাহিনী গঙ্গার ঐতিহাসিক কাহিনী বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনের সহিত মিলিয়া গিয়াছিল। বাঙ্গালার ইতিহাসের পরিবর্ত্তে যদি কেহ "গঙ্গার ইতিহাস" এই নাম দিয়া বঙ্গদেশের সপ্তদশ শতাব্দার ঐতিহাসিক বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন তাহা হইলে সেই গ্রন্থের নামকরণ যে, গ্রন্থে বর্ণিত বিষয়ের উপযোগী হইবে তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। ভাষা-রামায়ণ রচয়িতা কৃত্তিবাসের সময়ে উপরোক্ত (ক) চিহ্নিত তালিকায় যে সকল স্থানের নাম পাওয়া যায় তাহাদের মধ্যে অধিকাংশ স্থান যে হিন্দুর তীর্থস্থান বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল, কৃত্তিবাস নিজেই আমাদিগকে বলিয়া দিয়াছেন। অজয় ও গঙ্গার সঙ্গমস্থলের পর কৃত্তিবাসের মতে বঙ্গদেশ-প্রবাহিনী গঙ্গার তীরে ইন্দ্রেশ্বর প্রথম তীর্থস্থান।

"গঙ্গা লয়ে ভগীরথ চলিল সত্বর।
নিমেষেতে আইলেন নাম ইন্দ্রেশ্বর ॥
গড়া জলে যথা ইন্দ্র করিলেন স্নান।
ইন্দ্রেশ্বর বলি নাম হইল সে স্থান ॥
ইন্দ্রেশ্বর ঘাটে যেবা নর স্নান করে।
সর্ব্ব পাপে মুক্ত হয়ে যায় স্বর্গপুরে ॥" (কৃত্তিবাস)

ইন্দ্রেশ্বরের পর মেড়াতলা। ইহা যদিও ভাষা-রামায়ণে তীর্থ বলিয়া উক্ত হয় নাই, কিন্তু মেড়াতলার ঘাটেরও একটুখানি ইতিহাস আছে।

"মেড়ায় চড়িয়া বৃদ্ধ আইল ব্রাহ্মণ।
মেড়াতলা বলি নাম সেই সে কারণ ॥" (ঐ)

তাহার পর "আসিয়া মিলিল গঙ্গা তীর্থ যে নদীয়া।"

কৃত্তিবাসের সময়ে অর্থাৎ শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের বহু পূর্ব্ব হইতে নবদ্বীপ তীর্থস্থান বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। ইহার পর সপ্তগ্রাম—

"সপ্তগ্রাম তীর্থ জান প্রয়াগ সমান।" (ঐ)

ইহার পর আকনা, তৎপরে মাহেশ ও শেষে বিহরোদের ঘাট। এই তিনটি স্থান যদিও কৃত্তিবাসের রামায়ণে তীর্থ বলিয়া উক্ত হয় নাই, কিন্তু এই সকল স্থানে যে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য গঙ্গার ঘাট ছিল, তাহা শুধু অনুমান-সাপেক্ষ বলিয়া মনে হয় না। কৃত্তিবাসের সময়ে বঙ্গদেশে সকল তীর্থের শ্রেষ্ঠ তীর্থ ছিল সাগরসঙ্গম। এই তীর্থে স্নান করিবার জন্য যে ভারতের নানাস্থান হইতে যাত্রীরা প্রতি বৎসর পৌষ সংক্রান্তিতে সমাগত হইত, তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। কপিল মুনির মূর্ত্তি এই স্থানে এখনও বর্ত্তমান আছে। কৃত্তিবাস বলেন, "হইলেন শতমুখী গঙ্গা সেই স্থলে।" কৃত্তিবাসের পর কবি বিপ্রদাসের সময়ে উপরোক্ত (খ) চিহ্নিত তালিকায় যে সকল স্থানের নাম পাওয়া যায় তাহাদের মধ্যে অনেকগুলি তীর্থস্থান বলিয়া ও অন্যান্য স্থানগুলি বিদ্যাশিক্ষার আর না হয় ব্যবসাবাণিজ্যের কেন্দ্র বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। বিপ্রদাসের সময় হইতে আরম্ভ করিয়া মাধবাচার্য্যের সময়ে উপরোক্ত (গ) চিহ্নিত ও মুকুন্দরামের সময়ে উপরোক্ত (ঘ) চিহ্নিত তালিকা দুইটিতে যে সকল স্থানের নাম পাওয়া যায়, তীর্থস্থান ও ব্যবসাবাণিজ্যের হিসাবে সেই স্থানগুলি বঙ্গদেশের তৎকালীন ইতিহাসে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছিল। বিদেশী বণিকেরা এই সময় হইতে এদেশে কারখানা ও কুটী স্থাপিত করিয়া গঙ্গাবক্ষে পাশ্চাত্য বাণিজ্যকে যেভাবে প্রকট করিতেছিলেন তাহার অনুরূপ কোনও কিছু বাঙ্গালী পূর্ব্বে দেখে নাই। চাঁদসদাগর, ধনপতি ও তৎপুত্র শ্রীপতি ষোড়শ শতাব্দীতে বাণিজ্য উপলক্ষে কেবল যে গঙ্গার উভয় তীরস্থ প্রসিদ্ধ স্থান সকল দর্শন করিয়াছিলেন তাহা নহে। তাঁহারা, উপরোক্ত পাঁচটি তালিকায় যে সকল তীর্থস্থানের নাম পাওয়া যায়, সেই সকল স্থানে একদিন দুইদিন তিনদিন বা তদধিক দিবস বাস করিয়া তীর্থযাত্রীর অবশ্যকর্ত্তব্য কার্য্য সকল সমারোহের সহিত সম্পন্ন করিয়াছিলেন। সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে কবি দুর্গাপ্রসাদের সময়ে বাঙ্গালাদেশে গঙ্গার উভয় তীরস্থ প্রধান স্থানগুলি যে সমগ্র বাঙ্গালী জাতির ধর্ম্ম ও কর্ম্মযোগের সিদ্ধিস্থলে পরিণত হইয়াছিল তাহা কবির বিবরণ হইতে স্পষ্ট বুঝা যায়। দুর্গাপ্রসাদ খামখেয়ালের বশবর্ত্তী হইয়া গঙ্গার মাহাত্ম্য বর্ণন করিবার জন্য লেখনী ধারণ করেন নাই। এদেশের স্ত্রীলোকেরা তীর্থাদি দর্শন উপলক্ষে যেরূপ উৎসাহিতা হইয়া থাকেন তাহাও কাহার অবিদিত নাই। দুর্গাপ্রসাদের সময়ে বঙ্গদেশ-প্রবাহিনী গঙ্গার তীরবর্ত্তী তীর্থস্থানগুলি তৎকালীন নদীয়ার জমিদারগণের কৃপায় দেশের সর্ব্বত্র বর্ত্মাদি নির্ম্মিত হওয়াতে যে সুগম হইয়াছিল তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। তীর্থদর্শনাভিলাষিণী কবির সহধর্ম্মিণী হরিপ্রিয়া যে স্বপ্নে গঙ্গার প্রত্যাদেশ লাভ করিয়াছিলেন, সেকথা সেইজন্য সম্পূর্ণ কবি-কল্পিত না হইতে পারে। বাঙ্গালায় রাজনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাসে গঙ্গাদেবীর লীলাভিনয় যখন বাঙ্গালীমাত্রেরই চিত্তাকর্ষণ করিয়াছিল, সেই সময়ে কবি দুর্গাপ্রসাদ পতিতপাবনী দ্রবময়ী ভাগীরথীর তরল প্রেমের আশ্চর্য্য মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রভাব যদি কবির কাব্যে প্রকাশ পায় তাহা হইলে দুর্গাপ্রসাদ কেন যে "গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী" কাব্য রচনা করিয়াছিলেন তাহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না। বঙ্গদেশে ভাগীরথীর আগমনের যে বৃত্তান্ত কবি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে বেশ বুঝা যায় যে, কবির সমকালে গঙ্গাস্নানে মোক্ষলাভ হয় এই ধারণা ধর্ম্মপ্রাণ বাঙ্গালীর হৃদয়ে জাঁকিয়া বসিয়াছিল। শুধু বাঙ্গালী কেন, বঙ্গদেশবাসী মুসলমানগণও গঙ্গার মাহাত্ম্য অনেক সময়ে কীর্ত্তন করিয়াছেন। অম্বিকাচরণ গুপ্ত প্রণীত হুগলীর ইতিহাসে লিখিত আছে,—"কেহ কেহ বলেন যে বঙ্গের পাঠান রাজা জাফর খাঁ বা হুমায়ুন জাফর খাঁ, আর কেহ কেহ বলেন দফর খাঁ গাজী নিম্নলিখিত গঙ্গাস্তোত্রটি রচনা করিয়াছিলেন।"

"সুরধুনী মুনিকন্যে তারয়েৎ পুণ্যবন্তং।
স তরতি নিজপুণ্যে স্তত্র কিন্তে মহত্বং॥

যদি চ গতিবিহীনং তারয়েঃ পাপিনং মাং।
তদপি চ তন্মংস্থং তন্মহস্থং তন্মহস্থং ॥"

জাফর খাঁ ১৭১৩ খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত ১৫ বৎসরকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন। দুর্গাপ্রসাদ উক্ত শ্লোকটি "গঙ্গাভক্তি-তরঙ্গিণী' কাব্যে গ্রন্থকারের নাম পরিচয়াদি সম্বলিত প্রথম পৃষ্ঠায় বোধ হয় লিখিয়াছিলেন, আর সেই কারণে উক্ত কাব্যের মুদ্রিত সংস্করণে ইহা সেইভাবে রক্ষিত হইয়াছে। আলোচ্য কাব্যের প্রাচীন পুঁথি প্রাপ্ত না হইলে অনেক বিষয়ের সমাধান হওয়া সুকঠিন। তবে, আপাততঃ "গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী"র কলেবরে এই প্রাচীন রচনার অস্তিত্ব হইতে ইহাই অনুমান করা যাইতে পারে যে, কবির সময়ে গঙ্গার মাহাত্ম্য বঙ্গদেশের সর্ব্বস্থানে ও সকল শ্রেণীর মধ্যে প্রচারিত হইতেছিল। প্রাচীন গ্রীক কবিদের কাব্যেও গঙ্গার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ইংরাজ কবিরা প্রকারান্তরে অসংখ্য বার গঙ্গার গুণকীর্ত্তন করিয়াছেন। ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভকালে রচিত ইংরাজি কবিতাতে আমরা গঙ্গার কথা শুনিতে পাই। ষ্টিফেন হয়িস্ (Stephen Hawes) লিখিয়াছিলেন—

"Of whyche there flowed foure ryvers
ryght clere;
Sweeter than Nylus or Ganges was ther
odoure,"—
(*Percy's Reliques of Ancient Poetry*).

সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে দুর্গাপ্রসাদ যখন "গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী" রচনা করিতেছিলেন, সেই সময়ে ইংরাজ কবি মিল্টনও (Milton) তাঁহার সুবিখ্যাত কাব্য-গ্রন্থ "স্বর্গচ্যুতি" (Paradise Lost) রচনা করিতেছিলেন। ইংরাজি ভাষার এই মহাকাব্য ১৬৬৭ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। ইহার দুই স্থানে গঙ্গার উল্লেখ আছে। "Ganges of Hydaspes Indian Streams", (Book III. 436)—"thence to the land where flows Ganges and Indus, (Book IX. 82) মিল্টন উক্ত মহাকাব্যে বাঙ্গালাদেশেরও উল্লেখ করিয়াছেন,—"Close sailing from Bengala," (Book II. 638)—মিল্টনের সময়ে ইংরাজ বণিক্ বঙ্গদেশের সহিত ব্যবসা বাণিজ্য আরম্ভ করিয়াছিলেন, আর সেই কারণে তাঁহার ও তাঁহার সমসাময়িক ইংরাজি কাব্য সাহিত্যে গঙ্গার কথা স্থান পাইয়াছে। সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ১৬১৫ কিম্বা ১৬৫৬ খৃষ্টাব্দে জব্ চার্ণক (Job Charnock) ভারতবর্ষে পদার্পণ করিবার বহু পূর্ব্বে ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে পর্ত্তুগীজ পরিব্রাজক জোয়াও ডি বারস্ (Joao De Barros) বঙ্গদেশে আগমন করিয়াছিলেন। ডি বারস্ এই সময়ে গঙ্গার যে মানচিত্র অঙ্কিত করিয়াছিলেন তাহা এখন পর্যন্ত প্রামাণিক দলিল স্বরূপ ঐতিহাসিকেরা উল্লেখ করিয়া থাকেন। বাস্তবিক, ষোড়শ শতাব্দী হইতেই বঙ্গদেশ-প্রবাহিনী গঙ্গার প্রতি য়ুরোপীয় পরিব্রাজকগণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে বাঙ্গালী দাঁড়ি-মাঝিরা যখন পণ্যদ্রব্যে ভরা নৌকা লইয়া সিংহলের পথে বঙ্গোপসাগরে গমন করিত, তখন যে তাহারা য়ুরোপীয় জলদস্যু হার্ম্মদের ভয়ে অতিশয় সতর্কতার সহিত নৌকায় অবস্থান করিত, সে কথা মুকুন্দরামের চণ্ডীকাব্যে স্পষ্ট করিয়া লিখিত হইয়াছে। গঙ্গার তীরবর্ত্তী স্থান সমূহের অধিবাসীরা সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে সাগরযাত্রী ও তীর্থযাত্রীদের অসংখ্য নৌকা প্রতিদিন ভাগীরথীর জলে বাহিয়া চলিয়াছে দেখিতে পাইতেন। এই সময়ে ব্রহ্মদেশের সহিত ভারতবর্ষের ঘনিষ্টতা বৃদ্ধি পাওয়াতে গঙ্গার গতিপথে ব্রহ্মদেশ-যাত্রীরাও মাঝে মাঝে দেখা দিতেন। ঔরঙ্গজেবের ভ্রাতা সাহ সুজা যখন নৌকা-যোগে ব্রহ্মদেশে পলায়ন করিতেছিলেন, বঙ্গোপসাগরে হার্ম্মাদগণ তাঁহাকে আক্রমণ করিয়াছিল। দুর্গাপ্রসাদ গঙ্গাতরঙ্গে বাঙ্গালী-হৃদয়ের ভক্তিধারা মিলিয়া মিশিয়া যাইতে স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন। বঙ্গদেশের প্রত্যেক স্থান হইতে, এমন কি সুদূর ওড্রদেশ (উড়িষ্যা) হইতেও হিন্দুরা ত্রিবেণীতে আগমনপূর্ব্বক শ্রাদ্ধাদি কার্য্য সম্পন্ন করিতেন। উদার কবি দুর্গাপ্রসাদের কবি-হৃদয় পারিপার্শ্বিক সামাজিক অবস্থার প্রভাব উপেক্ষা করিতে পারে নাই। এক্ষণে আমরা কবির ভাষায় বঙ্গদেশ-প্রবাহিনী গঙ্গার গতিপথ বর্ণনা করিব।

"যখন আইলে গঙ্গা দক্ষিণ সমাপ্ত।
কোথা ছিল চুনাখালি কোথা সয়দা বাজ ॥
পলাসী রহিল বামে কাঁটোয়া দক্ষিণে।
বারহাট ইন্দ্রাণী আইলা সেই দীনে ॥
পূর্ব্বধারে মাটীয়ারী রাখিয়া আইলা।
দয়া করি অগ্রদ্বীপে দর্শন দিলা ॥
এখনো সেখানে আছে অপূর্ব্ব মন্দির।
গোপীনাথ বিরাজ করেন সদা স্থির ॥
কিবা মূর্ত্তি কিবা সেবা কি অপূর্ব্ব লীলা।
শ্রীগোবিন্দ ঘোষ কত পুণ্য করেছিলা ॥
ঘোষের সমান পুণ্যবন্ত কেবা আর।
গোপীনাথ আপনি করিলা শ্রাদ্ধ যার ॥
একবার নন্দ যশোদারে করে ধন্য।
অপর প্রকাশ এই ভকতের পুণ্য ॥
প্রভুর দয়ার অন্ত জানে কোন জন।
কোন ভাবে কারে কবে করেন তারণ ॥
শ্রীদুর্গাপ্রসাদ বলে শুন নারায়ণ।
দয়া করি মুক্ত কর এ ভব বন্ধন ॥"

(ক্রমশঃ)

(শ্রাবণের "অর্চ্চনা"র ২০৫ পৃষ্ঠায় ত্রয়োদশ ছত্রে "ষোড়শ" এই শব্দের পরিবর্ত্তে "সপ্তদশ" হইবে।)

বিসর্জ্জন।

[শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী]

(৬)

বীরত্বপূর্ণ কাজটা করিয়া আসিয়া কমনীয়ও বড় কম অনুতপ্ত হয় নাই। মাথাটা ঠাণ্ডা করিয়া সে ভাবিয়া দেখিল কাজটা তাহার অত্যন্ত অন্যায় হইয়া গিয়াছে। তাহার বুদ্ধি এ কাজটায় আদৌ খেলে নাই, সে অত্যন্ত হালকা হইয়া পড়িয়াছে।

আর শুভ্রা তো বিশেষ কোনও মন্দ কথা বলে নাই। সেও তো বড় হইয়াছে, তাহারও তো স্বতন্ত্র একটা ইচ্ছা, জ্ঞান আছে; চিরকালই যে সে তাহার ইচ্ছাই নিজের ইচ্ছা বলিয়া চালাইয়া লইবে, এমন কোনও কথা হইতে পারে না।

তাহাকে এমনভাবে নির্দ্দয়রূপে প্রহার করাটা কমনীয়ের পক্ষে অত্যন্ত খারাপ কাজ হইয়াছে সন্দেহ নাই।

মুখখানা অত্যন্ত ভারি করিয়াই সে বাড়ী ফিরিয়া গেল। তুষার টেংরা মাছের কথা ভুলিয়া গিয়াছিল, কাজেই কমনীয় তাহার সম্বন্ধে কথা বলার হাত এড়াইল।

বেশ একঘুম দিয়া রাত্রিটা কাটাইয়া সে যখন শয্যা-ত্যাগ করিল তখন বেলা হইয়া গিয়াছিল। তুষার চেয়ারে বসিয়া টেবিলের উপর পা দুখানা তুলিয়া দিয়া একখানা বই গভীর মনোনিবেশের সহিত পড়িতেছিল।

কমনীয় একটা আড়ামোড়া দিয়া উঠিয়া পড়িল। তুষার তাহার পানে তাকাইয়া বইখানা টেবিলের উপর রাখিয়া বলিল, 'তবু ভাল যে এতক্ষণে উঠলি। কলকাতায় গিয়ে চলবি বুঝি এমনি করে? সেখানে যে ভোর ছয়টার সময় ঘুম হ'তে উঠতে হবে, নইলে চলবেই না।"

কমনীয় একটু হাসিয়া বলিল, "কাল রাত্রে ভাল করে ঘুম হয়নি, তাই উঠতে আজ একটু দেরী হয়ে গেল।"

তুষার বলিল, "একটু দেরী? তাকিয়ে দেখ ঘড়ির দিকে, সাড়ে আটটা এখন। আর বলছিস যে রাত্রে ঘুম হয়নি, তাহা মিথ্যে কথা। আমি রাত্রি বারটা পর্য্যন্ত বসে বই পড়েছি, রাত্রে একবার ঘুম হ'তে উঠেছি, তোর কোনও সাড়াও তো পাই নি।"

কমনীয় আর কথার উত্তর না দিয়া আস্তে আস্তে বাহির হইয়া যাইতেছিল, তুষার বলিল, "কাল টেংরা মাছের বাড়ী গেছলি?"

চপলা চঞ্চলা বালিকা শুভ্রাকে সে ভালবাসিত, তাহার অনুপস্থিতিতে সে একটু কষ্ট বোধ করিতেছিল। কমনীয় অবহেলার ভাব দেখাইয়া বলিল, "গেছলুম বই কি; সে বেশ ভাল আছে দেখলুম।"

তুষার বলিল, "বড় হয়েছে বলে তার মা পিসী বোধ হয় তাকে আটক করে ফেলেছে, আর আসতে দেবে না, না?"

কমনীয় বলিল, "বোধ হয়, কিন্তু আমি কাল তাকে খুব মেরেছি দাদা, একটা ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়ে এসেছি।"

বিস্মিত হইয়া তুষার বলিল, "মেরে এসেছিস, সে আবার কি রে?"

কমনীয় দৃঢ়ভাবে বলিল, "হ্যাঁ, সত্যিই মেরে এসেছি। একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে সে এমন কড়া উত্তর দিলে যে, আমি কোনও মতে রাগ সামলাতে পারলুম না।"

জ্ঞানীর মত তুষার বলিল, "তাই বলে তুই মারলি তাকে? ছিঃ, কতদিন না বুঝিয়েছি তোকে, এখন তুই বড় হয়েছিস, এখন তোকে শান্ত শিষ্ট হ'তে হবে, ভাল মন্দ বিবেচনা করতে হবে। কোথায় এখন ছোট ছেলেদের সামনে আদর্শ হবি তুই, তাদের সভ্যতা শিক্ষা দিবি, আর কোথায় আজ কি না তুই-ই এমনি মন্দ ব্যবহার করছিস? আবার কি না মেয়েমানুষের গায় হাত তুলে এসেছিস, ছিঃ, তোকে আর বুঝাব কি করে বল দেখি; নাঃ, তোকে আর আমি পারলুম না। যা তুই, যা খুসি কর গিয়ে, আমি আর একটা কথাও তোকে বলব না।"

কমনীয় উত্তর না দিয়া বাহিরে চলিয়া গেল।

প্রাত্যহিক কার্য্য শেষ করিয়া সে বাড়ীর বাহির হইয়া পড়িল। শুভ্রার অবস্থাটা দেখিয়া, তাহাকে দুইটা মিষ্ট কথা শুনাইয়া আসাই তাহার অভিপ্রেত ছিল।

মনটা তাহার অত্যন্ত সরল ছিল, কোনও কারসাজির মধ্যে সে প্রবেশ করিতে পারিত না। যে কাজটা সে করিত, ঝোঁকের মাথায় করিয়া যাইত, কাহারও মানসিক ভাবের দিকে সে চাহিয়াও দেখিত না।

সে যে শুভ্রাকে মারিয়াছে, তাহাতে যে সে একেবারে শয্যাশায়িনী হইয়া পড়িয়াছে, তাহা সে জানিত না। বরাবর সে যখন শুভ্রাদের বাড়ীতে আসিয়া পৌঁছাইল, তখন সুষমা বা সুভা কেহই বাড়ী ছিলেন না। শুভ্রা কোনও ক্রমে বারাণ্ডা পর্য্যন্ত আসিয়া বসিয়া পড়িয়াছে। তাহার বাম হাতের কব্জি বেজায় রকম ফুলিয়া উঠিয়াছে, পা-টাও ফুলিয়াছে, ও তাহাতে পটি বাঁধা।

কমনীয় হাঁ করিয়া খানিক তাহার পানে চাহিয়া থাকিয়া বলিল, "তোর হাতে পায়ে কি হয়েছে রে শুভ্রা?"

শুভ্রার চোখে জল আসিয়া পড়িল, সে অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া তাড়াতাড়ি চোখ মুছিয়া ফেলিল।

কমনীয় বলিল, "ওই দেখ, ওইতেই তো আমার রাগ হয়। কথা জিজ্ঞাসা করলে একটা উত্তর যদি দিস্।"

শুভ্রা রুদ্র কণ্ঠে দীপ্ত হইয়া উত্তর দিল, "আহা, যেন কিছু জানেন না, নিজেই মেরে ফেলে দিয়ে গেলেন, আবার জিজ্ঞাসা করতে আসতে একটু লজ্জাও করে না—"

এবার সে স্পষ্টই কাঁদিয়া ফেলিল।

কমনীয় ভারি মুস্কিলে পড়িয়া গেল। তাহার মারাটা যে এমন ভীষণ হইয়া পড়িবে, তাহা সে জানে নাই। একটুখানি নীরব থাকিয়া সে বলিল, "কিন্তু তুই যদি সে রকম কড়া করে উত্তর না দিতিস শুভ্রা, তা হ'লে তো মার খেতিস নে। নিজের দোষে নিজেই মার খেয়ে মরলি। দেখি তোর হাতখানা—"

হাতখানা টানিতেই শুভ্রা উঃ করিয়া উঠিল। কমনীয় করুণভাবে বলিল, "ইস, ফুলে উঠেছে। বড্ড ব্যথা হয়েছে, না রে?"

শুভ্রা হাত সরাইয়া লইয়া বলিল, "না, ব্যথা হয় নি।"

কমনীয় বিস্মিত নয়নে খানিক তাহার পানে তাকাইয়া রহিল, তাহার পর আর একটীও কথা না বলিয়া বাহির হইয়া গেল।

বাড়ীতে ফিরিয়া সে একটা নূতন কথা শুনিতে পাইল। ইতির সহিত তাহার দাদার বিবাহের কথা হইতেছে। জড়সড় ভাবাপন্না ইতিকেও সে রন্ধনগৃহের বারাণ্ডায় দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিল।

সে সেখানে দাঁড়াইবামাত্র মামীমা বলিলেন, "বল দেখি কম, কাজটা কেমন হয়?"

মা অবজ্ঞাভরে বলিলেন, "হাঁ, ও আবার মানুষ, ওর আবার কথা।"

মায়ের এই নির্ম্মম কথা তাহার মাথায় আগুন ধরাইয়া দিল, সে কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু মামীমা বলিলেন, "মানুষ নয় কিসে ঠাকুরঝি? এখন তো বড় হয়েছে, জ্ঞানও হয়েছে, ওর একটা মত আছে বই কি। তুই বল রে, তোর মার কথা শুনিস নে।"

আপ্যায়িত হইয়া কমনীয় বলিল, "দাদার সঙ্গে ইতির বিয়ের কথা বলছ তো? সে তো খুব ভালই হয়। কিন্তু মামীমা, আমি কক্ষনো ইতিকে বউদি বলে ডাকতে পারব না, তা বলে দিচ্ছি।"

মামীমা একটু হাসিয়া বলিলেন, "সে দেখা যাবে পরে, আগে বিয়েই হোক তো। বেশ মেয়েটী, বিয়ে দিলে বেশ মানাবে। তোর দাদাকে জিজ্ঞাসা করে দেখিস তো এ মেয়েটীকে তার পছন্দ হয় কি না, বুঝেছিস তো?"

কমনীয় সম্মতি দিয়া ইতির পানে চোখ ফিরাইয়া দেখিল সে প্রায় কাঁদ কাঁদ হইয়া গিয়াছে। তাহাকে মুক্তি দিবার জন্য সে বলিল, "তা তুই এখানে এখনও দাঁড়িয়ে আছিস কেন রে ইতি? বাড়ী যেতে চাস যদি—যা।"

মামীমা বলিলেন, "ওকে ওর মা পাঠিয়ে দেছে। আমরা ভাল করে দেখতে চেয়েছিলুম, তাই এই দোক্তা দেবার নাম করে পাঠিয়ে দেছে। খাসা মেয়ে, আমার তুষারের সঙ্গে বিয়ে হ'লে খাসা মানাবে। যাও মা, এখন বাড়ী যাও।"

ধীরপদে ইতি চলিয়া গেল। কমনীয় উপরে চলিয়া গেল।

তুষার একটু হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি কথা হচ্ছিল?"

কমনীয় সার্ট খুলিয়া হুকে ঝুলাইয়া রাখিয়া বলিল, "তোমার বিয়ের কথা হচ্ছিল। শীগ্‌গিরই আমাদের বাড়ীতে একটা ভোজ আসছে।"

তুষার মাথা দুলাইয়া বলিল, "বটে? পাত্রী কে?"

কমনীয় বলিল, "ইতি।"

তুষার হাসিয়া বলিল, "খাসা পাত্রী যোগাড় হয়েছে। ওকে বোবা বললেও তো চলে। একটা কথা বলতে সে জানে না—"

কমনীয় বলিল, "কেন, বেশ কথা বলে তো।"

তুষার বলিল, "আমি তো একদিনও ওর একটা কথা শুনতে পাইনি। আমায় দেখলেই জড়সড় হয়ে কোথায় লুকাবে তা ভেবে পায় না।"

কমনীয় বলিল, "একটু লাজুক আছে বটে, কিন্তু খুব ভাল মেয়ে। তোমার পছন্দ হয় না দাদা?"

তুষার গম্ভীর ভাবে মাথা নাড়িল।

(৭)

ইহার পরও দীর্ঘ দুইটী বৎসর কাটিয়া গেছে। কমনীয় এন্‌ট্রান্স পাশ করিয়া মেডিক্যাল কলেজে ভর্ত্তি হইয়াছে, তুষার এম, এ, পাশ করিয়া বাঁকিপুর কলেজের প্রফেসার হইয়া গিয়াছে।

সকলেরই পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, পরিবর্ত্তন ঘটে নাই কেবল শুভ্রার। সেই গ্রামখানির গণ্ডী পার হইয়া সে বাহির হইতে পারে নাই। তাহার জীবনের সুদীর্ঘ সপ্তদশ বর্ষ এখানে অতিবাহিত হইয়াছে, ভবিষ্যৎ কালও যে এখানে কাটিবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

ক্রমে ক্রমে সে আপনার অবস্থা বেশ বুঝিতে পারিয়া ভাবি সঙ্কুচিতা হইয়া পড়িয়াছে। এখন সে সকলের চোখের আড়ালে থাকিতে চায়, বাহির জগৎ যেন না জানিতে পারে সে বাঁচিয়া আছে।

শুভ্রা নামে যে একটী দুর্দ্দান্ত প্রকৃতির বালিকা একদিন এই গ্রামের বুকে ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইয়াছে, লোককে জ্বালাতন করিয়া মারিয়াছে, সকলে সে কথা প্রায় ভুলিয়া আসিয়াছিল। ইচ্ছা করিয়াই সে সকলকে এ কথা ভুলিতে দিয়াছিল। সে যে বিধবা, সে যে জগৎ হইতে বহুদূরে অবস্থিতা। এ জগতের সহিত তাহার সম্পর্ক কি?

তাহার বাল্যসঙ্গিনী যাহারা ছিল তাহারা সবাই বিবাহিতা হইয়া শ্বশুরালয়ে চলিয়া গেছে। আছে কেবল ইতি, আজও তাহার বিবাহ হয় নাই।

একদিন তুষারের মা যে এই মেয়েটীকে দয়া করিয়া পুত্রবধূ করিতে চাহিয়াছিলেন, সেই কথাটাই ইতির মা মমতার প্রাণে থাকিয়া গিয়াছিল। তিনি স্বামীকে এ কথা জানাইয়া সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিয়া মেয়েকে অবিবাহিতা রাখিয়াছিলেন। তাহার পর হঠাৎ তাঁহার একদিন ওপার হইতে ডাক আসিল, তিনি স্বামী কন্যা পুত্র ও সংসার ফেলিয়া চলিয়া গেলেন। ইতির পিতা শ্রীপতিবাবু ব্যবসাদার লোক ছিলেন, কলিকাতায় তাঁহার দোকান ছিল।

স্ত্রীর মৃত্যুর পরেই দোকান ফেল পড়িয়া গেল। নিজের যথা সর্ব্বস্ব গেল, ধর্ম্মভীরু শ্রীপতিবাবু বাড়ী ঘর, কন্যা ও মৃতা স্ত্রীর অলঙ্কারাদি বিক্রয় করিয়া আগে দেনা শোধ করিয়া দিলেন, নিজে একখানি খড়ের ঘরে কিশোরী কন্যা ও নবম বর্ষীয় পুত্র মনীন্দ্রের সহিত বাস করিতে লাগিলেন।

কিন্তু স্বাস্থ্যও তাঁহার একেবারে ভাঙ্গিয়া গেল। যিনি কখনও কষ্টের মুখ দেখেন নাই, তিনি হঠাৎ কষ্টে পড়িলে সে ধাক্কা কোনও মতে সামলাইয়া উঠিতে পারেন না। লক্ষ্মীরূপিণী স্ত্রীর সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্মী দেবীও অন্তর্হিতা হইয়া গেলেন, শ্রীনাথবাবু একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িলেন।

আত্মাভিমান তাঁহার খুব বেশী ছিল। যদিও তিনি জানিতেন রামনাথবাবু ও তাঁহার স্ত্রী উভয়েই একদিন তুষারের সহিত ইতির বিবাহ দিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছিলেন, তথাপি তিনি আজ তাঁহাদের কাছে সে কথার উল্লেখ করিতে পারিলেন না। যদি তাঁহার অর্থ থাকিত, তিনি এ প্রস্তাব অসঙ্কোচে করিতে পারিতেন, কিন্তু আজ যে তিনি অর্থহীন, এই সঙ্কোচটাই তাঁহাকে অত্যন্ত বিঁধিতেছিল।

প্রতিবেশিনী বিমলা সম্পর্কে তাঁহার ভ্রাতৃজায়া হইতেন। তিনি কথাটা আগাগোড়াই জানিতেন। দুঃস্থ পিতাকে কন্যাদায় হইতে নিষ্কৃতি দিবার জন্য তিনিই এক দিন জমিদারবাড়ী গিয়া কথাটা পাড়িলেন।

তুষারের মা শৈলজা একটু ভাবিয়া বলিলেন, "তা দিদি, বিয়ে দিতে তো আমারও খুব ইচ্ছে। অমন ঘর-আলো-করা বউ হবে আমার এ তো সৌভাগ্যের কথা, তবে কি—"

বিমলা এই অর্দ্ধোক্তিতেই সব কথা জানিয়া লইলেন, তথাপি বলিলেন, "থামলে যে?"

শৈলজা বলিলেন, "না, বলছিলুম কি, ওদের অবস্থা এখন বড় খারাপ হয়ে গেছে, কিছু যে দিতে পারবে এমন আশাও নেই। বল দিদি, তুমিই বল একটু; আমার এম, এ, পাস ছেলে, একটা কলেজের প্রফেসর, সে কি সাধারণ? হাজার লোকে মেয়ে দেবার জন্যে সাধাসাধি করছে আমায়, কেবল ছেলের পছন্দ অপছন্দের জন্যেই আমি হঠাৎ মত দিতে পারছি নে। তবে যখন আমি কথা দিছি, নিশ্চয়ই চেষ্টা করব। ওঁকে বলব'খন, উনি যা' বলেন, বিকেলে তোমায় জানাব। কিছু মনে কর না দিদি, আমার কি অসাধ যে—"

বিমলা আর কথা না বলিয়া চলিয়া আসিলেন। শ্রীনাথবাবুকে সব কথাগুলি তিনি বিস্তারিত করিয়া বলিয়া শেষে বলিলেন, "জমীদারের ঘরে মেয়ে দেবার আশা ত্যাগ কর ঠাকুরপো, ওরা বড় মানুষ, বড় মানুষের সঙ্গেই কুটুম্বিতা করবে, এমন গরীবের সঙ্গে কুটুম্বিতা করা কি ওদের মানায়?"

শ্রীনাথবাবু একটা নিশ্বাস ফেলিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, "আমি কি তোমায় বলিনি বউ, কেন তবে তাদের বাড়ী গেছলে তুমি? আমার উঁচু মাথাটা যে কতদূর হেঁট করে দিলে, তা আর তুমি জানবে কি? আমার এই কুঁড়েঘরে বাস করেও আমি উঁচু হয়ে থাকতুম, কোন দিনই কারও কাছে আমি নিজের অবস্থা জানাতে যাই নি, কারও কাছে —খেতে না পেলেও হাত পাততে যাই নি। সে সব জেনেও তুমি আমায় আজ এমন নিচু করে দিয়ে এলে বউ?"

বিমলা একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "কিন্তু ঠাকুরপো, চিরকাল তো একসমান কাটে না। তোমার যত অর্থ ছিল, জমিদারের ঘরেও তা ছিল না, এক কথায় তা চলে গেল। মনের এমন জোরও তো থাকবে না যখন মেয়ে রয়েছে গলায়। মেয়ে যখন জন্মেছে, তখন হতেই তোমার মনে করা উচিত ছিল এবার তোমার মাথা নিচু করতেই হবে, এখন তোমায় পরের কথা শুনতেই হবে। একে বাংলার ঘরের মেয়ে ঠাকুরপো, যেমন করেই হোক বিয়ে দিতেই হবে। বাংলার মেয়ে যেমন হতভাগী, তার মা বাপও তেমনি।"

শ্রীনাথবাবু অনেকক্ষণ নীরব হইয়া রহিলেন, তাহার পর বলিলেন, "ইতি যেমন দরিদ্রের মেয়ে, তেমনি দরিদ্রের হাতেই পড়বে। বড় ঘরে তার বিয়ে দেবার ইচ্ছে আর আমি রাখি নে।"

বিমলা আর কথা না কহিয়া চলিয়া গেলেন।

ইতি দ্বারের আড়ালে দাঁড়াইয়া পিতা ও বিমলার

কথা শুনিতেছিল। সেই যে পিতার উচ্চ মস্তক আজ নত করিবার হেতু, ইহা ভাবিতে তাহার সুন্দর মুখখানা লাল হইয়া উঠিল। এই সে বাংলার মেয়ে, কি অদৃষ্ট লইয়াই সে জন্মগ্রহণ করিয়াছে! বিধাতার অভিশাপ যে বাংলার মেয়ের মাথায় ন্যস্ত!

ভাবিতে ভাবিতে তাহার দুই চোখ জলে ভরিয়া উঠিল, সে উদ্বেলিত অশ্রু কোনও ক্রমে চাপিতে চাপিতে রন্ধন-গৃহে চলিয়া গেল। সেখানে সে দুই হাতের মধ্যে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

হায়, মৃত্যু এত লোককে গ্রহণ করিতেছে, তাহাকে গ্রহণ করে না কেন? তাহা হইলে সেও বাঁচে পিতাও নিষ্কৃতি পান। পিতার মুখে নিজ হস্তে সেই যে অপমানের কালিমা লেপন করিয়া দিতেছে। পথে ঘাটে বাহির হইলে লোকে তাহাকে দেখিয়া শিহরিয়া উঠে, কত ইসারা চলে, কেহ কেহ সামনেই কত কথা বলিয়া যায়। সে ভাবে, আর বাহির হইবে না, কিন্তু না বাহির হইলেও যে উপায় নাই। দিনের মধ্যে পঞ্চাশ বার যে ঘাটেই যাওয়া চাই।

আজ শুভ্রার নিরুপদ্রব অবস্থাটা সে ভাবিয়া দেখিল। বেশ আছে সে। ইতিও কেন তাহার মত হইয়া থাকিল না? সে পিতার ও ছোট ভাইটার সেবা করিয়া বেশ সুখে দিন কাটাইয়া দিতে পারিত, তাহার অন্তর্ধ্যান ভাঙ্গিয়া দিতে কেহই সাহসী হইত না।

পিতার জন্য তামাক সাজিতে আসিয়া দিদিকে কাঁদিতে দেখিয়া মণি একেবারে আশ্চর্য্য হইয়া গেল। খানিক স্তম্ভিত ভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, "দিদি, কাঁদছ কেন?"

ইতি তাড়াতাড়ি অঞ্চল দিয়া মুখ চোখ বেশ করিয়া মুছিয়া ফেলিয়া বলিল, "দূর, কাঁদব কেন? কাঁচা কাঠ, বড্ড ধোঁয়া উঠছে, তাই চোখ দিয়ে জল বার হচ্ছে।"

মণি আর প্রশ্ন না করিয়া কলিকায় আগুন তুলিয়া লইয়া পিতার নিকট গিয়া বলিল, "বাবা, দিদি বড্ড কাঁদছে।"

চিরস্নেহশীল পিতার হৃদয় ব্যগ্র হইয়া উঠিল, "কেন রে, কাঁদছে কেন?"

মণি মাথা নাড়িয়া বলিল, "তা দিদি কিছু বললে না।"

পিতা উদ্বেগের সহিত বলিলেন, "ডেকে নিয়ে আয় তো তাকে আমার কাছে।"

মণি ইতিকে গিয়া জানাইল, "বাবা ডাকছে।"

ইতি তখন লজ্জিত ভাবে মুখে চোখে জল দিয়া অশ্রুর চিহ্ন উঠাইয়া ফেলিয়াছিল; অসঙ্কোচেই সে পিতার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

পিতা তাহাকে নিকটে বসিতে বলিয়া স্নেহভরে হাত-খানা তাহার মাথায় বুলাইয়া দিতে দিতে বলিলেন, "কাঁদছিলি মা? বিমলার কথা বুঝি শুনেছিস, মনে বড্ড দুঃখ হয়েছে পাগলী? ও রকম কত কথা লোকে বলে থাকে, ভালও বলে, মন্দও বলে, তাই কি কাঁদতে আছে ছেলে মানুষের মত? ছি মা, ও রকম করে কান্না—"

পিতার আদরে কন্যার চোখে আবার জল আসিয়া পড়িল; সে পিতার পা কোলে টানিয়া লইয়া টিপিয়া দিতে দিতে রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "আচ্ছা বাবা, আমি একটা কথা বলি, তুমি রাগ করবে না?"

শ্রীনাথ বাবু বলিলেন, "কি কথা মা?"

ইতি বলিল, "বিয়ে না করলে কি হয় বাবা?"

শ্রীনাথ বাবু একটু হাসিয়া তখনই গম্ভীর হইয়া বলিলেন, "কেন মা, এ কথায় তোমার কি সম্পর্ক আছে?"

ইতি চোখ মুছিয়া বলিল, "আমি বিয়ে করব না।"

পিতার মুখে আবার একটু হাসি খেলিয়া গেল। ইতি তাহা লক্ষ্য করিয়া দীপ্তকণ্ঠে বলিল, "না, সত্যি বাবা, তুমি সকলকে বলে দিয়ো আমি বিয়ে করব না। বিয়ে না করলেই যে জাত যাবে এমন কোনও কথা নেই। লোকে তো আমাদের অবস্থা বুঝবে না, তারা জোর করে বলে বিয়ে করতেই হবে। কত কথা বলছে তারা, তোমায় কত নিন্দে করছে বাবা, আমি আর তা সহ্য করতে পারছি নে। না বাবা, আর আমি সহ্য করব না, তুমি সকলকে বলো, তুমি আমার বিয়ে দেবে না, তুমি আমায় কুমারী করে রাখবে।"

হঠাৎ উচ্ছ্বসিত হইয়া কাঁদিয়া সে পিতার পায়ের উপর মথখানা অবনত করিয়া ফেলিল।

অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া শ্রীনাথ বাবু বলিলেন, "ওকি, কাঁদছিস্ কেন ইতি? ছি ছি, পাগল মেয়ে, কাঁদিস নে, মুখ তোল্।"

ইতি কোনও ক্রমে মুখ তুলিল না; পিতা সান্ত্বনার সুরে বলিলেন, "আচ্ছা যা, তাই হবে; নেহাৎ যদি পাত্র না পাই, তবে কুমারী হয়েই থাকবি, আর যদি পাত্র পাই তবে বিয়ে হবে। কাঁদিস নে বলছি, এর পরে জ্বর আসবে'খন অত কাঁদলে।"

ইতি মুখ তুলিয়া চোখ মুছিল। শান্তভাবে বলিল, "আজ তোমার জন্যে কি রাঁধব বাবা?"

আদরের দুলালী সে, এ পর্য্যন্ত কোনও কাজ সে করে নাই, হঠাৎ সংসারের চাপ মাথায় পড়িলেও কিশোরী আত্মহারা হইয়া পড়ে নাই; ধীরে ধীরে সে সকল কষ্টকেই আয়ত্তে আনিয়া ফেলিয়াছিল। প্রথম রন্ধন করিতে গিয়া সে দু'দিন হাত পুড়াইয়া ফেলিয়াছিল, কয়েকদিন লবণ ও মসলার আন্দাজও বুঝিতে পারে নাই। ক্রমে ক্রমে সে সব শিখিয়া ফেলিয়াছিল, আজ কাল তাহার লবণ মসলা ঠিকই পড়ে, তরকারী সিদ্ধ হয়।

শ্রীনাথ বাবু বলিলেন, "কি আর রাঁধবি মা? তোদের দু'টি ভাই বোনের যা হয়, আমাকেও তাই দিবি। আমার জন্যে আলাদা ভাল করে রাঁধবার কিছু দরকার নেই। আমি বোধ হয় প্রত্যেক দিন হাজার বার করে' এ কথাটা তোকে বলছি। তবু রোজ তুই আলাদা রাঁধতে যাস কেন?"

ইতি বলিল, "তুমি যে যা তা খেতে পার না বাবা, তোমার যে খাওয়ার বড্ড কষ্ট হয়। চিরকাল রাজার মত খেয়েছ তুমি, আজ কেমন করে সামান্য শাক ভাত তোমার কোলে দেই বাবা?"

তাহার কণ্ঠস্বর অত্যন্ত করুণ হইয়া আসিয়াছিল। শ্রীনাথ বাবু একটু হাসিয়া বলিলেন, "কেবল এই জন্যেই তুই আমার জন্যে আলাদা তরকারী রাঁধতে যাস ইতি? তুই ছেলেমানুষ, জানিস নে, অবস্থার অনুযায়ী মানুষের রুচিও বদলে যায়। একদিন দোতালার ঘরে গদীর 'পরে টানা-পাখার নিচে শুয়েও যে আমার ঘুম আসত না সামান্য একটা ত্রুটী হ'লে, আর আজ দেখ দেখি, এই খড়ের ঘরে, সামান্য একটা তক্তাপোষের উপর সামান্য বিছানায় শুয়ে কেমন শান্তিতে আমি ঘুমুচ্ছি। শোওয়ার কষ্টকে যদি আয়ত্তে এনে থাকতে পারি, খাওয়ার কষ্টকে আর পারব না? আমার সব রুচি বদলে যাক, আমার সব অহঙ্কার চলে যাক, সব গিয়ে মনের মধ্যে আমার এই শান্তিটা থাক—আমি অঋণী; আমি কারও কাছে মাথা পাতিনি। বড় দুঃখের মধ্যেও বড় শান্তি এটা, তা জানিস ইতি?"

ইতি একটা খুব বড় রকমের দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল।

ক্রমশঃ।

পরকালের এক পাতা।*

[শ্রীরামসহায় বেদান্তশাস্ত্রী]

শিশুরা যেমন জলৌকার মত স্থূলদেহ পরিত্যাগ করিয়া অপর স্থূলদেহ আশ্রয় করে, সাধারণ বয়স্ক ব্যক্তিরা সেরূপ মৃত্যুর পরই স্থূলদেহ আশ্রয় করিতে পায় না। শিশুদের বর্ত্তমান জন্মে কোন প্রকার পাপ-পুণ্য অনুষ্ঠিত হয় না বলিয়া বর্ত্তমান জন্মের অদৃষ্টই জন্মে না। আর তদ্ভিন্ন অতি শৈশবে দেহের উপর কোন প্রকার সংস্কার লইয়া যায় না বলিয়াও শিশুরা স্থূলদেহের অনুরূপ ছায়া গ্রহণ করে না।

প্রায়শঃ বয়স্ক ব্যক্তিরা সাধারণ পাপ-পুণ্যকারী। সেই পাপ-পুণ্য-নিবন্ধন তদনুরূপ স্থূলদেহ লাভ তাহাদের করিতে হয়। কৃতকর্ম্মানুরূপ জন্মগ্রহণই তাহাদের পক্ষে অবশ্য বিধান।

"যথা প্রজ্ঞং হি সংভবঃ"

"যথা কর্ম্ম প্রপদ্যন্তে শরীরত্বায় দেহিনঃ"

* ২রা আষাঢ় কাঁটালপাড়া বঙ্কিম-সাহিত্য-সম্মিলনে পঠিত।

মৃত্যুকালে বয়স্ক ব্যক্তি মাত্রেরই "আমার এইরূপ দেহ" এইরূপ একটী সংস্কার থাকে। সেই সংস্কার লইয়া তাহাদের যাইতে হয়। যেমন স্বপ্নে দেহী আপনার স্থূলদেহের সংস্কারবশতঃ তদনুরূপ ছায়াদেহ লইয়াই দ্রষ্টব্য স্থান দর্শন করে, মৃত্যুর পরও দেহী সেইরূপ স্থূলদেহের সংস্কার বশতঃই তদনুরূপ ছায়াদেহ লইয়া প্রস্থান করে। এই সংস্কার এবং পাপ-পুণ্য লইয়া গমন করে বলিয়াই মৃত্যুর পর বয়স্ক ব্যক্তিরা শিশুদিগের মত তৎক্ষণাৎ স্থূলদেহ গ্রহণ করে না।

স্থূলদেহানুরূপ ছায়াদেহেরই নাম প্রেতদেহ। দুই চারি মাস বা এক বৎসরের মধ্যে হউক বা পরেই হউক, প্রকৃতির নিয়মানুসারে ঐ ছায়াদেহ ক্রমে সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর, সূক্ষ্মতম হইয়া স্বপ্নদৃষ্ট দেবমূর্ত্তির মত বিলীন হইয়া যায়, "ছায়া মূর্ত্তিশ্চিন্তা মূর্ত্তিবদবলীয়তে" ছায়ামূর্ত্তি চিন্তামূর্ত্তির মত বিলয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

প্রকৃতির নিয়মানুসারে শিশুরা ছায়াদেহ গ্রহণ করিতে পারে না, এই কারণে তাহাদের শাস্ত্রীয় দাহ নাই বা শ্রাদ্ধ-তর্পণাদি কিছুই নাই। আবার প্রকৃতির নিয়মানুসারে বয়স্ক ব্যক্তিরা ছায়াদেহ গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়; আর ঐ প্রকৃতির নিয়মানুসারেই আপনা-আপনিই তাহাদের এই ছায়াদেহ বিচ্যুতিও ঘটে। শ্রাদ্ধ-শ্রাদ্ধাদি আধ্যাত্মিক চিকিৎসা। চিকিৎসা না করিলে রোগ হইলেই কি মানব মৃত্যুমুখে পতিত হয়? অথচ চিকিৎসার উপযোগিতায়া মানাও যায় না। তদ্রূপ, আধ্যাত্মিক চিকিৎসা দাহ শ্রাদ্ধাদি না করিলে যে মৃত মানব চিরদিন প্রেতদেহে থাকিয়া যাইবে, তাহা নহে; তথাপি দাহ-শ্রাদ্ধাদির উপযোগিতাও আছে। প্রকৃতির নিয়মানুসারে নিজ ক্ষমতায় যদি ঐ প্রেতদেহ-চ্যুতি না ঘটে, তবে সন্তানেরা কি যত্ন করিলে ঐ প্রেতদেহ-চ্যুতি করাইতে পারে না? মহামনীষী আর্য্য ঋষিগণ ব্যবস্থা করিয়াছেন—"হাঁ, এমন প্রক্রিয়া আছে, যাহার দ্বারা সন্তানগণের যত্নেও ঐ প্রেতদেহ বিচ্যুতি ঘটিতে পারে।"

প্রেতদেহ ছায়াদেহের নামান্তর। প্রেতদেহ বলিতে এখানে ভৌতিক দেহ বা ভৌতিক যোনি কেহ বুঝিবেন না। প্রেতদেহ বা ছায়াদেহ, কি পুণ্যবান্ কি পাপী সকলকেই ধারণা করিতে হয়, ছায়াদেহে ফলভোগ দ্বারা কৃত পাপ-পুণ্য ঠিক ক্ষয় প্রাপ্ত হয় না। তবে তাহাদের অবশ্য পাপ-পুণ্যাত্মিকা প্রকৃতির বশে সংস্কারমূলক ক্ষুধা তৃষ্ণার বোধ এবং মোটামুট সুখ দুঃখের অনুভূতি বর্ত্তমান আছে। ছায়াদেহে অবস্থিতি বিচারার্থ আবদ্ধ ব্যক্তির হাজতবাসের মত। ভৌতিক দেহ ভৌতিক যোনি। ভৌতিক যোনি ভৌতিক জন্ম। উহা মহাপাপের ফলে ঘটে। মহাপাপী মহাপাপের বিষয় চিন্তা করিতে করিতে যদি মৃত্যুলাভ করে, দুরদৃষ্ট ক্রমে তিথি নক্ষত্রের দোষ পায়, এবং দাহ শ্রাদ্ধাদি দ্বারা কোন উপকার না লাভ করে, তবে সেই মহাপাপী উৎকট চিন্তার ফলে পাপার্জ্জিত ভৌতিক যোনি লাভ করে। ভৌতিক যোনির দেহ সাধারণ লিঙ্গদেহ অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিকতর পার্থিবোপাদান যুক্ত।

সাধারণ পাপ পুণ্যকারী ব্যক্তি মৃত্যুর পর ছায়াদেহ আশ্রয় করতঃ ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়ায়, স্থূলদেহের সংস্কারানুযায়ী ক্ষুধা তৃষ্ণা ভোগ করিতে থাকে; মায়াবশে কখন কখন প্রিয়জনের নিকট আসিয়াও পড়ে। ঐ ক্ষুধা তৃষ্ণার বোধটি এবং ঐ বোধজন্য দুঃখানুভূতিটি মানবসংস্কার-বিশেষ মাত্র। সংস্কারবশেই দুঃখ, আবার সংস্কারবশেই সেই দুঃখের নাশ। সন্তানেরা ইচ্ছাশক্তি ও মন্ত্রশক্তি সাহায্যে মৃতের চিত্তে ইচ্ছানুরূপ সংস্কার উৎপাদন করিয়া দিতে পারে।

বলপূর্ব্বক সংস্কার উৎপাদন করা হয় বলিয়াই—"এতত্তে পিণ্ডং" এই তোমার পিণ্ড দিলাম লও, এই জল দ্বারা পিতৃগণ তৃপ্ত হউক, এইরূপ ভাবের প্রেরণা দেখিতে পাওয়া যায়।

তবে ইহাও সত্য, মৃত্যুর পর "কোথায় স্থূলদেহ" এই-ভাবে জীব তাহার সন্ধানেই ব্যস্ত থাকে। স্থূলদেহের অভাবে একটি অশান্তি বোধ করে। আমার দেহ ত রহিয়াছে, অথচ সেই স্থূলদেহও ঠিক এ দেহ নহে—এইরূপ অশান্তিবশতঃই তাহাদের অবস্থা, অনেকটা ক্ষিপ্ত শৃগালাদির মত হয়। কাজেই সে সময়ে "কে আমার প্রিয়জন" ইত্যাকার বোধ বা তজ্জন্য অভাববোধ জন্মে না।

পারলৌকিক পুণ্যকারী ব্যক্তিরা স্বর্গে, অত্যুৎকৃষ্ট পাপকারী ব্যক্তিরা যে নরকে ভোগদেহ গ্রহণ করে, পশ্চাৎ সুখ দুঃখ ভোগ করিতে বাধ্য হয়—ইহারা সাধারণ পুণ্য পাপকারী নহে। ছায়াদেহের পর স্বর্গ নরকগামীরা ভোগদেহ প্রাপ্ত হয়; সাধারণগণ ছায়াদেহে কিছুদিন থাকিয়া একেবারেই জীবাণু আবার লাভ করিয়া স্থূলদেহ ধারণ করে।

দাঁড়াইল—শিশুরা মৃত্যুর পরই জন্মগ্রহণ করে অর্থাৎ জন্মিবার অবস্থায় উপনীত হয়। সাধারণ পুণ্য পাপকারী ব্যক্তিরা সংবৎসর মধ্যে বা অব্যবহিত পরেই মর্ত্তে জন্ম লাভ করে। পাপ লৌকিকার্থ পুণ্যকারী অত্যুৎকৃষ্ট পাপকারী মানবেরা কিছুদিন ছায়াদেহে থাকিয়া পশ্চাৎ ভোগদেহে পুণ্য পাপানুরূপ সুখ দুঃখ প্রাপ্ত হয়; তৎপরে পুণ্যক্ষয়ে তাহাদের মর্ত্তে জন্ম।

বঙ্কিম প্রতিভার একটী দিক।*

[শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র চৌধুরী]

বন্দে মাতরম্।
সুজলাং সুফলাং মলয়জশীতলাম্
শস্যশ্যামলাং মাতরম্।

মহেন্দ্র গীত শুনিয়া কিছু বিস্মিত হইল, কিছু বুঝিতে পারিল না—সুজলা, সুফলা, মলয়জশীতলা, শস্যশ্যামলা মাতা কে? জিজ্ঞাসা করিল, "মাতা কে?" উত্তর না করিয়া ভবানন্দ গায়িতে লাগিলেন,—

"শুভ্রজ্যোৎস্না-পুলকিত-যামিনীম্
ফুল্লকুসুমিত দ্রুমদল শোভিনীম্
সুহাসিনীং সুমধুরভাষিণীম্
সুখদাং বরদাং মাতরম্।"

মহেন্দ্র বলিল,—"এ ত দেশ, এ ত মা নয়—"

ভবানন্দ বলিলেন, "আমরা অন্য মা মানি না, জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী। আমরা বলি, জন্মভূমিই জননী, আমাদের মা নাই, বাপ নাই, ভাই নাই, স্ত্রী নাই, পুত্র নাই, ঘর নাই, বাড়ী নাই, আমাদের কাছে কেবল সেই সুজলা, সুফলা, মলয়জসমীরণশীতলা, শস্যশ্যামলা—"

তখন বুঝিয়া মহেন্দ্র বলিলেন, "তবে আবার গাও।"

ভবানন্দ আবার গাহিলেন,—

বন্দে মাতরম্।
সুজলাং সুফলাং ইত্যাদি।

বত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে যেদিন ধ্যানরত ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের চিত্তে দেশমাতৃকার সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা, বহুবলধারিণী সুস্মিতা ভূষিতা মূর্ত্তিখানির প্রথম উদ্বোধন হইয়াছিল এবং তাঁর প্রত্যাদেশে মুগ্ধ সন্তান গাহিয়া উঠিয়াছিলেন,—

বন্দে মাতরম্।
সুজলাং সুফলাং মলয়জশীতলাম্
শস্যশ্যামলাং মাতরম্।

সেদিন সাধারণ বাঙালী মহেন্দ্রের মতই বিস্মিত হইয়া কিছুই বুঝিতে পারে নাই,—সুজলা, সুফলা, মলয়জশীতলা, শস্যশ্যামলা মাতা কে? সেও সেদিন একই ভাবে প্রশ্ন করিয়াছিল,—"এ ত দেশ, এ ত মা নয়—"

সেদিনকার বাঙালীর এই অজ্ঞতার ভিতরেই তাহার দুর্দ্দশার কাহিনী আমরা স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি। যে হিন্দু তেত্রিশ কোটি দেবতার আরাধনা করিয়া আসিতেছিলেন, যে হিন্দু দশপ্রহরণধারিণী দুর্গা, কমলদলবিহারিণী কমলা, বিদ্যাদায়িনী বাণীর চরণতলে যুগ যুগান্তর ধরিয়া পুষ্পাঞ্জলি দান ও স্তোত্রপাঠ করিয়া আসিতেছিলেন, তাঁহার চিত্তেও যে দেশমাতৃকার স্বরূপটীকে সহস্রদলে বিকশিত করিয়া তুলিবার প্রয়োজন রহিয়াছে, একথা হিন্দুসাধক এযাবৎ ভুলিয়াই গিয়াছিলেন। "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী" এই মন্ত্রটীর ভিতরে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া, জননীর ন্যায় জন্মভূমিকেও সাধারণের চক্ষে সহ

* ২রা আষাঢ় কাটালপাড়া বঙ্কিম-সাহিত্য-সম্মিলনে পঠিত।

করিয়া তুলিতে হইলে এই হিন্দুর দেশে যে তাঁহাকে মূর্ত্তিমতী করিয়াই গড়িবার প্রয়োজন, মূর্ত্তির পূজারী ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র একথা প্রথম উপলব্ধি করেন।

হিন্দু আমরা—সীমার মাঝে অসীমের প্রতিচ্ছবিখানি আমাদের প্রাণের পূজা চিরদিনই আকর্ষণ করিয়াছেন। মূর্ত্তির পূজারী আমরা—জীবনে যত কিছু সত্যের স্বপ্ন দেখিয়াছি, সে সকলকেই আমরা মূর্ত্তিমান্ করিয়া গড়িয়া তবেই তাহার স্বরূপকে শাশ্বত করিয়া তুলিয়াছি।

মূর্ত্তির পূজারী হিন্দুর জাতীয় মনের এই পরিচয় লাভ করিয়াই বঙ্কিমচন্দ্র বুঝিয়াছিলেন যে, আমাদের মাতৃভূমিকে কেবলমাত্র ভৌগোলিক চৌহদ্দি পরিবেষ্টিত ভূমিখণ্ডমাত্র বলিয়া দেখিলে তাঁহার সহিত আমাদের অন্তরের যে নাড়ীর টানটী, তাহার মাধুর্য্য উপলব্ধি করা সম্ভব নহে। তাই মন্দিরে মন্দিরে দেশমাতৃকার এই প্রতিমা গড়িবার প্রেরণায় বঙ্কিমচন্দ্র চঞ্চল হইয়া উঠিলেন—সন্তান বঙ্কিম তাঁহার ধ্যাননেত্রে মাতৃভূমির তিনখানি প্রতিচ্ছবি পর পর দেখিতে পাইলেন—"মা—যা ছিলেন"—"মা—যা হইয়াছেন"—"মা—যা হইবেন।"

মা যা ছিলেন, "এক প্রকাণ্ড চতুর্ভুজ মূর্ত্তি, শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী, কৌস্তুভশোভিত-হৃদয়, সম্মুখে সুদর্শনচক্র ঘূর্ণ্যমান প্রায় স্থাপিত। মধুকৈটভ-স্বরূপ দুইটি প্রকাণ্ড ছিন্নমস্তক মূর্ত্তি রুধিরপ্লাবিতবৎ চিত্রিত হইয়া সম্মুখে রহিয়াছে। বামে লক্ষ্মী আলুলায়িত-কুন্তলা শতদলমালামণ্ডিতা ভয়ত্রস্তার ন্যায় দাঁড়াইয়া আছেন। দক্ষিণে সরস্বতী পুস্তক, বাদ্যযন্ত্র, মূর্ত্তিমান্ রাগ-রাগিণী প্রভৃতি পরিবেষ্টিত হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন। বিষ্ণুর অঙ্কোপরি এক মোহিনী-মূর্ত্তি—লক্ষ্মী ও সরস্বতীর অধিক সুন্দরী, লক্ষ্মী সরস্বতীর অধিক ঐশ্বর্য্যান্বিতা। গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, দেব, যক্ষ, রক্ষ, তাঁহাকে পূজা করিতেছে।"

মা যা হইয়াছেন, সে এক কালীমূর্ত্তি—"কালী-অন্ধকারসমাচ্ছন্না কালিমাময়ী। হৃতসর্ব্বস্ব, এইজন্য নগ্নিকা। আজ দেশে সর্ব্বত্রই শ্মশান—তাই মা কঙ্কালমালিনী। আপনার শিব আপনার পদতলে দলিতেছেন—হায় মা!"

মার এই বর্ত্তমান দুর্দ্দশার ম্লান বীভৎস মূর্ত্তিখানি দেখিয়া ব্রহ্মচারীর ন্যায় আমাদেরও চক্ষে দরদর ধারায় অশ্রু ভাঙ্গিয়া পড়ে। মার এ হৃতসর্ব্বস্ব, এ নগ্নিকা মূর্ত্তিকে আমরা সহিতে পারিব না—আমরা মার সেই নবারুণ কিরণে জ্যোতির্ম্ময়ী হাস্যময়ী মূর্ত্তিখানি দেখিতে চাই—

"দশভুজ দশদিকে প্রসারিত, তাহাতে নানা আয়ুধরূপে নানা শক্তি শোভিত, পদতলে শত্রুবিমর্দ্দিত, পদাশ্রিত বীরকেশরী নিপীড়নে নিযুক্ত। দিগ্‌ভুজা—নানা প্রহরণধারিণী শত্রুবিমর্দ্দিনী বীরেন্দ্র-পৃষ্ঠ-বিহারিণী—দক্ষিণে লক্ষ্মী ভাগ্যরূপিনী—বামে বাণী বিদ্যা-বিজ্ঞান দায়িনী—সঙ্গে বলরূপী কার্ত্তিকেয়, কার্য্যসিদ্ধিরূপী গণেশ।" এই মাকেই আমরা মা বলিয়া ডাকিতে চাই—

ত্বং হি দুর্গা দশপ্রহরণধারিণী
কমলা কমলদল-বিহারিণী
বাণী বিদ্যাদায়িনী নমামি ত্বাং
নমামি কমলাং অমলাং অতুলাম্
সুজলাং সুফলাং মাতরম্,
বন্দে মাতরম্।
শ্যামলাং সরলাং সুস্মিতাং ভূষিতাম্
ধরণীং ভরণীম্ মাতরম্॥

নিপুণ ভাস্কর বঙ্কিমচন্দ্র মার এই ওজস্বিনী মূর্ত্তিখানি আমাদের চক্ষে ধরিয়া, অন্তরে প্রতিষ্ঠা করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, সঙ্গে সঙ্গে মার পুত্র এবং কন্যার মূর্ত্তিও গড়িয়াছেন। মানুষ আমরা—অমৃতের শিশু আমরা দেবত্বের সীমায় কিরূপে পৌঁছিয়া আমাদের মনুষ্যত্বকে মহীয়ান্ করিয়া তুলিতে পারি, উজ্জ্বল করিয়া তুলিতে পারি, এ পথ তিনি প্রদর্শন করিয়াছেন তাঁহার অলৌকিক প্রতিভার অতুল সৃষ্টি শান্তি ও জীবানন্দের চরিত্রের ভিতর দিয়া। তাই তিনি একস্থানে অন্তরের উচ্ছ্বসিত আবেগে কাঁদিয়া অশ্রুভাবে প্রশ্ন করিয়াছেন,—"হায়! আবার আসিবে কি মা! জীবানন্দের ন্যায় পুত্র, শান্তির ন্যায় কন্যা আবার গর্ভে ধরিবে কি?"

বঙ্কিম-প্রতিভার বিশেষত্ব এই, তাহা বাংলাদেশের সন্তানকে বাঙালী করিয়াই গড়িয়াছে। বঙ্গভূমির বক্ষের শিশুকে বিশ্বমানবরূপে সৃষ্টি করে নাই।

রবীন্দ্রনাথের পরেশ বা নিখিলেশের মুখ হইতে বাংলা-ভাষা কাড়িয়া লইয়া, অন্য যে কোনো দেশীয়ের পরিচ্ছদে তাঁহাদিগকে সুসজ্জিত করিয়া, সেই দেশের ভাষায় তাঁহাদের কথা শুনিলে বুঝিতে পারিব না যে ইঁহারা বাঙালী। সুজলা শ্যামলা বাংলার মাটী, বাংলার জলে তাঁহাদের দেহ পুষ্টি হইলেও তাঁহাদের হৃদয়-মনে যে সেই মাটী-জলেরই স্পর্শটী লাগিয়াছে, এ কথা বোধ হয় মুক্তকণ্ঠে বলা চলে না। পরেশ এবং নিখিলেশের প্রেম ও ধর্ম্মে উদারতার যথেষ্ট পরিচয় পাই, বিশ্বমানবতার সমগ্র লক্ষণই তাহাতে বিদ্যমান, কিন্তু তাঁহাদিগকে বিশেষ কাল বা বিশেষ দেশের মানুষ বলিয়া চিনিবার কোন উপায় নাই।

বঙ্কিম-প্রতিভা দেশ-কালের অতীত এমন কোনও চরিত্রই গড়ে নাই। বাংলা দেশকে যাঁহারা চেনেন, বাঙালীকে যাঁহারা দেখিয়াছেন, লক্ষকোটী মানবের মহা-মেলার ভিতরেও বঙ্কিমের সৃষ্ট নরনারীকে তাঁহারা চিনিতে পারিবেন। অবশ্য, আমরা এ মতের পোষকতা করিতে পারি না যে,বঙ্কিম-প্রতিভার বিশ্বমানব-চরিত্র গড়িবার শক্তি ছিল না। বিশ্বমানবকে আঁকিবার শক্তিও যে বঙ্কিমের ছিল সে পরিচয় আমরা পাই তাঁহারই হাতেগড়া চরিত্রবিশেষের হৃদয়-ভাবের অভিব্যঞ্জনায়। তাঁহার ভবানীঠাকুর দেবীকে বুঝাইয়াছেন,—

"অখ্যাতি কি? এ বরেন্দ্রভূমে আজিকালি কে এমন আছে যে, ঐ নামে লজ্জিত? কিন্তু সে কথা যাক্— ধর্ম্মাচরণে সুখ্যাতি খুঁজিবার দরকার কি? অখ্যাতির কামনা করিলেই কর্ম্ম আর নিষ্কাম হইল কৈ? তুমি যদি অখ্যাতির ভয় কর, তবে তুমি আপনার খুঁজিলে, পরের ভাবিলে না। আত্ম বিসর্জ্জন হইল কৈ?"

স্থানান্তরে দেবীর মুখে শুনিতে পাই,—

"* * * কিন্তু যাই হউক নিশি—এক কথা সার। আমার স্বামীর প্রাণ বাঁচাইবার জন্য এত লোকের প্রাণ নষ্ট করিবার আমার কোন অধিকার নাই। আমার স্বামী আমার বড় আদরের—তাদের কে?"

ভবানীঠাকুর এবং দেবীর উদ্ধৃত এই কথাগুলির ভিতরে কি বিশ্বমানবেরই প্রাণের কথার প্রতিধ্বনি শুনিতে পাওয়া যাইতেছে না?

দেশ এবং কালের অতীত শাশ্বত বিশ্বমানবের মূর্ত্তি গড়িবার শক্তিকে উপেক্ষা করিয়াই বঙ্কিমচন্দ্র যেন তাঁহার সৃষ্ট নর-নারীকে বাংলার শিশু করিয়াই গড়িয়াছেন। মানুষ যখন ব্যক্তিগত স্বরূপবোধটী হারাইয়া বসে তখনই সে শক্তিহীন। তখনই সে কস্তুরীমৃগের ন্যায় অন্ধ হইয়া বিশ্বের পথে পথে নিজেরই গুণের সন্ধানে ঘুরিয়া নিজেরই শক্তির অপব্যয় করিয়া থাকে। পরবশগত, পরপদদলিত বাঙালী জাতিরও যে বাহুতে শক্তি এবং হৃদয়ে ভক্তি আছে,এই সত্যটাই তিনি মুমুক্ষু-বাঙালীসন্তানের কাছে প্রত্যক্ষ করিয়া তুলিবার প্রয়াস করিয়াছেন। তাই তিনি বাংলার শিশুকে মানুষ করিয়া গড়িতে গিয়া বাঙালী করিয়াই গড়িয়াছেন।

বঙ্কিমচন্দ্র অমরত্বের ভিক্ষাঝুলি কাঁধে বহিয়া সাহিত্য-সৃষ্টি করেন নাই। অমৃতের কামনা তিনি করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহা নিজের জন্য নহে, সমগ্র দেশবাসীরই জন্য। এই সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা ভারতভূমির বক্ষে যে জাতি অনাদি উষার স্বপ্নভঙ্গের পর হইতে এযাবৎ কাল ধর্ম্মে-কর্ম্মে, জ্ঞানে-অবদানে স্বকীয় সাধনাকে সহস্রদলে বিকশিত করিয়া আসিতেছিল, সে জাতির এই আকস্মিক অধঃপাতের দিনে বঙ্কিমের প্রতিভা তাহাকে আনন্দমঠের মাতৃমন্দিরে আপনার অন্তরের ঐশ্বর্য্যের সন্ধানেই আহ্বান করিয়াছে। মুমূর্ষু হিন্দুর কণ্ঠে মুক্তির সঙ্গীত দান করিয়া, বঙ্কিমচন্দ্র হিন্দুর নিকট তাহার জাতীয়তাকেই বৃহৎ করিয়া, মহীয়ান করিয়া দেখাইয়াছেন। হিন্দু জাতি যদি কোন দিন ধরিত্রীবক্ষে আত্মপ্রতিষ্ঠা দ্বারা আবার নিজের অধিকারকে অটুট অবিনশ্বর করিয়া তুলিতে পারে,তবে সেইদিন বঙ্কিমের দেবত্বের আসনটীও রচিত হইয়া উঠিবে হিন্দুজাতির অন্তরের মন্দিরে মন্দিরে। সেইদিনই আমরাও শ্রীঅরবিন্দের বাণীতে তাঁহার স্তোত্র গাহিব,—

"His nature kingly was and as a god
In large serenity and light he trod
His daily way, yet beauty, like soft flowers
Wreathing a hero's sword, ruled all his
hours."

যজ্ঞোপবীত *

[শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়]

আমাদের দেশে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন বর্ণ আর্য্যবংশসম্ভূত; এবং একারণ এই তিন বর্ণই বংশ-পরিচয় দিবার জন্যই হউক, অথবা ধর্ম্মার্থেই হউক, আজও পর্য্যন্ত গলদেশে উপবীত ধারণ করিয়া থাকেন। কোন্ সময় হইতে এবং কিরূপে যে আর্য্যাদিগের মধ্যে এই উপবীত ধারণ প্রথা প্রচলিত হয়, তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। যে জাতি যত প্রাচীন, তাহার ইতিহাসও ততই তমসাচ্ছন্ন। সুতরাং বৈদিক গ্রন্থাদি হইতে এ সম্বন্ধে অনুমান করা ব্যতীত, তথ্য নিরূপণের অন্য কোনও উপায় বিদ্যমান নাই। অতি প্রাচীন কালে আর্য্যদিগের মধ্যে বর্ণাশ্রম বিভাগ ছিল না; একারণ অনেকে অনুমান করেন, আর্য্যগণ যখন ভারতবর্ষে আসিয়া এখানকার আদিম অধিবাসী অনার্য্যদিগের সহিত একত্র বাস করিতে আরম্ভ করেন, তখন অনার্য্যদিগের সহিত নিজেদের একটা স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিবার জন্য, তাঁহাদের উপবীত ধারণ করিবার প্রয়োজন হইয়াছিল। জানি না, এ কথাটার মধ্যে কতটা সত্য নিহিত আছে, তবে বেদাঙ্গ ব্রাহ্মণ ও সংহিতাদি গ্রন্থে দেখা যায়, আর্য্যগণ যজ্ঞার্থই উপবীত ধারণ করিতেন, সুতরাং অধুনা ইহা ব্রাহ্মণ শূদ্র চিনিবার উপায় স্বরূপ হইয়া পড়িলেও, ইহা বর্ণাশ্রম বিভাগের চিহ্নস্বরূপে কল্পিত হইয়াছিল বলাটা বোধ হয় সমীচীন হয় না।

আমরা উপবীত ধারণ করিবার সময় মন্ত্রপাঠ করি,—"যজ্ঞোপবীতমসি, যজ্ঞস্য ত্বা যজ্ঞোপবীতে—নোপনেহ্যামি।" 'যজ্ঞোপবীতমসি' অর্থাৎ তুমি যজ্ঞোপবীত। যজ্ঞ ও উপবীত এই দুই শব্দের সংযোগে যজ্ঞোপবীত। ইহার দুই প্রকার অর্থ হইতে পারে,—যজ্ঞের জন্য উপবীত এবং যজ্ঞের উপবীত। যদিও কেহ কেহ যজ্ঞের জন্য উপবীত এরূপ অর্থ করিয়াছেন বটে; কিন্তু অধিকাংশ স্মার্ত্তকার ইহাকে যজ্ঞের উপবীত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। পারিজাত স্মৃতিসারে কথিত আছে,—

যজ্ঞাখ্যঃ পরমাত্মা য উচ্যতে চৈব হোতৃভিঃ।
উপবীতং যতোস্যেদং তস্মাদ্যজ্ঞোপবীতকম্॥

অর্থাৎ হোতৃগণ যে পরমাত্মাকে যজ্ঞ নামে অভিহিত করিয়া থাকেন, ইহা তাঁহারই উপবীত, এবং সেই জন্যই ইহার নাম যজ্ঞোপবীত। তারপর উপবীত ধারণের মন্ত্রে কথিত আছে,—"যজ্ঞস্য ত্বা যজ্ঞোপবীতেনোপনেহ্যামি"। স্মার্ত্তকারগণ এই মন্ত্রের যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাতে ইহা যে যজ্ঞেরই উপবীত, সে সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ থাকে না। স্মার্ত্তকারগণ ইহার এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—'ত্বা' ত্বাং 'যজ্ঞস্য' যজ্ঞপুরুষস্য সম্বন্ধিনা যজ্ঞোপবীতেন 'উপনেহ্যামি' অধিকং বধ্নামি একীভূতং করোমীত্যর্থঃ। অর্থাৎ তুমি যজ্ঞপুরুষের উপবীত, তোমার সহিত যজ্ঞপুরুষের সম্বন্ধ রহিয়াছে, একারণ তোমাকে আমি ধারণ করিয়া আমিও যজ্ঞপুরুষের সঙ্গে এক হইয়া যাই। অতএব এখন স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, যদিও আর্য্য ঋষিগণ যজ্ঞ সম্পাদনের জন্য উপবীত ধারণ করিতেন, উহা যজ্ঞপুরুষেরই উপবীত,—যজ্ঞপুরুষের উপবীত হইতেই আমাদের এই উপবীত কল্পিত।

এখন দেখা যাউক, এ যজ্ঞপুরুষ কে। এ বিষয় আলোচনা করিতে হইলে, অয়ন-চলন সম্বন্ধে সংক্ষেপে দুই একটি কথা বলা প্রয়োজন। প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে বিষুবন বা অয়ন বিন্দু (অর্থাৎ সূর্য্যের গতিপথের যে কল্পিত বিন্দুতে সূর্য্য অবস্থান করিলে দিবা ও রাত্রি সমান হয়) সূর্য্য সিদ্ধান্ত মতে ৬৬⅔ বৎসর অন্তর এক অংশ করিয়া পশ্চাদ্ভাগে সরিয়া আসিতেছে। অতি প্রাচীন বৈদিক যুগে আর্য্য ঋষিগণ পুনর্ব্বসু নক্ষত্রে সূর্য্যের অবস্থানকালীন দিবা ও রাত্রি সমান হইতে দেখিয়া, তদনুসারে যজ্ঞাদি সম্পাদনের জন্য বৎসরাদি গণনার সূত্রপাত করেন। পরে

---

* এই প্রবন্ধের মূল উপকরণ স্বর্গীয় বালগঙ্গাধর তিলক প্রণীত ওরায়ণ (Orion) গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত হইয়াছে।

যখন তাঁহারা বসন্তাদি ঋতুর পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে দেখিতে পাইলেন, তখন তাঁহারা লক্ষ্য করিলেন যে, পুনর্ব্বসু নক্ষত্রে দিবা ও রাত্রি সমান না হইয়া তাহা হইতে প্রায় দুই নক্ষত্র পশ্চাতে মৃগশিরা নক্ষত্রে সূর্য্যের অবস্থান কালে দিবা ও রাত্রি সমান হইতেছে। কাজেই তাঁহারা বৎসরাদি গণনার পরিবর্ত্তন করিয়া মৃগশিরা হইতেই যজ্ঞাদি সম্পাদনের কাল গণনা আরম্ভ করিলেন। এই সময় বৈদিক যুগের একটা উল্লেখযোগ্য কাল। এই সময় আর্য্যদিগের মধ্যে সভ্যতার অনেকটা বিকাশ লাভ করিয়াছিল, এবং আমাদের ঋগ্বেদও প্রায় পূর্ণ কলেবর প্রাপ্ত হইয়াছিল। এই সময় আর্য্যদিগের মধ্যে বিজ্ঞানচর্চ্চার একটা আগ্রহ দেখা দিয়াছিল; এবং তাহারই ফলে, কেন যে ঋতু বৎসরাদির পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে তাহা সম্যক উপলব্ধি করিতে না পারিলেও বিষুববিন্দু যে পশ্চাতে মৃগশিরা নক্ষত্রে সরিয়া আসিয়াছে তাহা তাঁহারা লক্ষ্য করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন এবং তাহা লইয়া ঋগ্বেদে কয়েকটি আখ্যানও রচনা করিয়া গিয়াছেন।

তৈত্তিরীয় সংহিতায় পুনঃ পুনঃ কথিত হইয়াছে,—"যজ্ঞো বৈ প্রজাপতিঃ", "সম্বৎসরঃ প্রজাপতিঃ"। অর্থাৎ যজ্ঞের এক নাম প্রজাপতি এবং সম্বৎসরের নামও প্রজাপতি। অতএব দেখা যাইতেছে যে, বৈদিক গ্রন্থাদিতে যজ্ঞ, সম্বৎসর ও প্রজাপতি এই তিনটি শব্দ একই অর্থে ব্যবহৃত। মৃগশিরা নক্ষত্রে সূর্য্যের অবস্থানকালীন দিবা ও রাত্রি সমান হইত বলিয়া আর্য্য ঋষিগণ এই নক্ষত্র হইতে বৎসরাদি গণনা ও যজ্ঞাদি সম্পাদনের কাল নিরূপণ করিতেন। একারণ এই মৃগশিরা নক্ষত্রই সম্বৎসর; ইহাই আমাদের আলোচ্য যজ্ঞপুরুষ; এবং যেহেতু ইহা যজ্ঞপুরুষ ও সম্বৎসর, সেজন্য ইহা প্রজাপতি নামে অভিহিত। (১) এই নক্ষত্রপুঞ্জের এইরূপ যজ্ঞপুরুষ বা প্রজাপতি নামকরণ করিয়াই যে আর্য্য ঋষিগণ ক্ষান্ত ছিলেন তাহা নহে, ইহার সবিশেষ বিবরণ বিশদরূপে বর্ণনা করিবার অভিপ্রায় বেদে ও বেদাঙ্গ ব্রাহ্মণ ও সংহিতাদি গ্রন্থে কয়েকটি উপাখ্যানও রচনা করিয়া গিয়াছেন; এবং কালে সেই উপাখ্যানগুলি রূপান্তরিত হইয়া পুরাণ মধ্যে সন্নিবেশিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয় "আমাদের জ্যোতিষী ও জ্যোতিষ" গ্রন্থে বিশেষ প্রমাণ সহকারে দেখাইয়াছেন যে, বেদের ইন্দ্র কর্ত্তৃক বৃত্রসংহার বা নমুচি বধ অথবা সংহিতার রুদ্র কর্ত্তৃক প্রজাপতির শরবিদ্ধ হওয়া প্রভৃতি উপাখ্যান এই মৃগশিরা বা যজ্ঞপুরুষ নক্ষত্র সম্বন্ধে রচিত। পুরাণের দক্ষ একজন প্রজাপতি, তাঁহার ছাগমুণ্ড, অপর পক্ষে মৃগশিরা নক্ষত্রও প্রজাপতি, তাহার আকার মৃগের মস্তকের মত, ইহা একটা আকস্মিক ব্যাপার নহে।

এই নক্ষত্রপুঞ্জের সমষ্টি হইতে যেমন একটি কতকটা মনুষ্যাকৃতি যজ্ঞপুরুষ কল্পনা করা হয়, সেইরূপ ইহা হইতে একটি পূর্ণাবয়ব মৃগও কল্পিত হইতে পারে। যজ্ঞপুরুষের দুই স্কন্ধের দুইটি উজ্জ্বল তারা এবং দুই চরণের দুই তারা হইতে মৃগের চারি চরণ কল্পনা করা যায়; কিন্তু এরূপ মৃগাকার কিছু কষ্ট-কল্পিত হয় বলিয়াই বোধ হয় আর্য্যগণ ইহাকে মৃগ নামে উল্লেখ না করিয়া মৃগশিরা নামেই অভিহিত করিয়াছেন। মৃগের মস্তক ও যজ্ঞপুরুষের শিরোদেশ একই; এবং এই জন্যই বোধ হয় পুরাণে দক্ষের ছাগমুণ্ড কল্পিত। যজ্ঞপুরুষের কটিদেশে সমসূত্রপাতে তিনটি উজ্জ্বল তারা দেখিতে পাওয়া যায়। উহাই যজ্ঞপুরুষের মেখলা। এই মেখলার পার্শ্ব হইতে লম্বমান কতকগুলি নক্ষত্রপুঞ্জ দেখা যায়। উহাই যজ্ঞপুরুষের দণ্ড।

কেবল যে হিন্দুরাই আকাশে এইরূপ যজ্ঞপুরুষ কল্পনা করিয়াছেন, তাহা নহে; গ্রীক, ইরাণী প্রভৃতি প্রাচীন আর্য্য জাতির মধ্যেও এরূপ কল্পনা দেখিতে পাওয়া যায়। এই যজ্ঞপুরুষকে গ্রীকভাষায় ওরায়ণ (Orion) বলে। গ্রীকদিগের ওরায়ণের মূর্ত্তি প্রায় আমাদের যজ্ঞপুরুষেরই মত। গ্রীক পুরাণ মতে ওরায়ণের মূর্ত্তি রাক্ষস সদৃশ,—কটিদেশে মেখলা, ও তৎসঙ্গে অসি লম্বমান, হস্তে গদা এবং পরিধেয় ব্যাঘ্রচর্ম্ম (২) আমাদেরও যজ্ঞপুরুষের কটিদেশে

(১) এই যজ্ঞপুরুষের অপর নাম কালপুরুষ। এই নক্ষত্রপুঞ্জকে কালপুরুষ নক্ষত্রও বলা হয়।

(২) 'ওরায়ণ' (orion) শব্দ অগ্রহায়ণ শব্দের অনুরূপ। মৃগশিরা নক্ষত্রের অপর নাম অগ্রহায়ণ। "মার্গশীর্ষে মহামার্গ আগ্রহায়ণিকশ্চ সঃ"—অমরকোষ।

মেখলা, হস্তে দণ্ড এবং পরিধেয় ব্যাঘ্রচর্ম্মের পরিবর্ত্তে মৃগ-চর্ম্ম, মৃগের শির ত আছেই। ইরাণীরা যজ্ঞপুরুষকে হওম (Haoma) বলে। মৃগশিরার অধিপতি চন্দ্র, হওমেরও অধিপতি চন্দ্র। ইরাণীদের ধর্ম্মপুস্তক 'হওম ইয়াস্ত' গ্রন্থে কথিত আছে, ঈশ্বর হওমকে 'কস্তি' (মেখলা) প্রদান করিয়াছেন। এই 'কস্তি' অতি পবিত্র; এ কারণ আমাদের যজ্ঞোপবীত ধারণের ন্যায় পারসীরা কটিদেশে 'কস্তি' (মেখলা) ধারণ করিয়া থাকে। (৩)

পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে যে, আমাদের যজ্ঞোপবীত যজ্ঞপুরুষেরই উপবীত। যজ্ঞপুরুষের কটিদেশস্থ তিনটি উজ্জ্বল তারাই উহার মেখলা; এবং এই মেখলা হইতেই আমাদের যজ্ঞোপবীত এবং পারসীদের 'কস্তি' কল্পিত। এমন কথা হইতে পারে, যজ্ঞপুরুষের মেখলাই যদি আমাদের যজ্ঞোপবীত কল্পনার কারণ হয়, তাহা হইলে উহা পারসী-দের মত কটিদেশে ধারণ না করিয়া গলদেশে ধারণ করা হয় কেন? বৈদিক গ্রন্থাদি পাঠে জানা যায়, পূর্ব্বকালে ঋষিগণ যজ্ঞাদি সম্পাদন করিবার সময় কটিদেশে বস্ত্রখণ্ড বন্ধন করিয়াই উপবীত ধারণ করিতেন; এখনকার মত সূত্র-নির্ম্মিত উপবীত গলদেশে ধারণ করিবার প্রথা তখন ছিল না। তৈত্তিরীয় সংহিতায় তিন প্রকার উপবীত ধারণের কথা উল্লেখ আছে,—উপবীত, প্রাচীনাবীত ও নিবীত। মনু এই তিন প্রকারের এইরূপ অর্থ করিয়াছেন,—উদ্ধৃতে দক্ষিণে পাণাবুপবীত্যুচ্যতে দ্বিজঃ। সব্যে প্রাচীন আবীতী নিবীতী কণ্ঠসজ্জনে॥—মনুসংহিতা ২।৬৩ অর্থাৎ যজ্ঞসূত্র বা বস্ত্র বাম স্কন্ধে ধারণ করিয়া তন্মধ্য দিয়া দক্ষিণ বাহু নিষ্ক্রান্ত হইলে উপবীতী, দক্ষিণ স্কন্ধে ধারণ করিয়া তন্মধ্য দিয়া বাম বাহু নিষ্ক্রান্ত হইলে প্রাচীনাবীতী, এবং উভয় স্কন্ধে ধারণ করিয়া মালার ন্যায় দোলায়মান থাকিলে নিবীতী বলা হইয়া থাকে। যদিও এখন আমরা শ্রাদ্ধ তর্পণাদি ক্রিয়া বিশেষে মনুর এই তিন প্রকারই উপবীত ধারণ করিয়া থাকি; কিন্তু বাস্তবিক ইহা প্রাচীন কটিদেশস্থ যজ্ঞোপবীত সম্বন্ধে কথিত হয় নাই; আধুনিক সূত্র-নির্ম্মিত উপবীত বা উত্তরীয় সম্বন্ধে শ্রেণী বিভাগ করা হইয়াছে। স্মৃতিতে এমন কয়েকটি বচন দেখিতে পাওয়া যায়, যাহাতে যজ্ঞোপবীতের সহিত কটিদেশের সম্বন্ধ আছে (৪)। এই স্মৃতির বচন অনুসারে আজ কাল ঋগ্বেদীয় ব্রাহ্মণগণ গলদেশ হইতে কটির ঊর্দ্ধে ও স্তনের নিম্ন পর্য্যন্ত উপবীত ধারণ করিয়া, প্রাচীন ও আধুনিক উভয় প্রথাকে বজায় রাখিবার প্রয়াস পাইয়া-ছেন। সন্দেহ হইতে পারে, যদি এই নিবীতাদি প্রাচীন কটিদেশস্থ উপবীত সম্বন্ধে বলা না হইয়া থাকে, তাহা হইলে তৈত্তিরীয় সংহিতায় এ সকল উক্তি কোথা হইতে আসিল? আর্য্যগণ যজ্ঞপুরুষের মেখলা হইতে যেমন যজ্ঞোপবীত কল্পনা করিয়াছিলেন, সেইরূপ যজ্ঞপুরুষের শরীর মৃগের মত দেখিয়া অথবা উহার মৃগশির দেখিয়া, মৃগচর্ম্মের উত্তরীয়ও ধারণ করিতেন। উপবীত, প্রাচীনাবীত ও নিবীত এই উত্তরীয় সম্বন্ধেই কথিত হইয়াছে, অন্যথা সংহিতাদির অন্যান্য বাক্যের সহিত ইহার কোনও সামঞ্জস্য থাকে না। মনু নিবীতকে কণ্ঠে মালার মত করিয়া ধারণ করিতে বলিয়াছেন; সুতরাং ইহাও এক প্রকার উত্তরীয়। কিন্তু এমন এক সময় ছিল, যখন এই নিবীতকে কেহ উত্তরীয় হিসাবে গলদেশে, আবার কেহ বা যজ্ঞোপবীত হিসাবে কটিদেশে ধারণ করিতেন। কুমারিল ভট্ট বলেন,—"নিবীতং কেচিদ্গলবেণিকাবন্ধং স্মরন্তি। কেচিৎ পুনঃ পরিকরবন্ধং। তত্র গলবেণিকাবন্ধো যুদ্ধাদন্যত্র ন প্রাপ্নোতি। পরিকরবন্ধস্তু সর্ব্ব কর্ম্মস্বব্যগ্রতা করত্বাৎ প্রাপ্ত ইতি।" অর্থাৎ নিবীত কেহ গলদেশে ধারণ করেন, কেহ বা কটি-দেশে ধারণ করেন; কিন্তু যুদ্ধের সময় ব্যতীত অন্য সময় গলদেশে ধারণ করাটা অসুবিধাজনক, অপর পক্ষে কটি-দেশে ধারণ করিলে সকল কার্য্যেই সুবিধা হইয়া থাকে।

(৩) 'হওম' শব্দ আমাদের 'হোম' শব্দের অনুরূপ। যজ্ঞের সঙ্গে হোমের সম্বন্ধ আছে। পারসীরা 'স' কে 'হ' বলে; এ কারণ 'সোম' শব্দ হইতেও 'হওম' শব্দের উৎপত্তি হইতে পারে। হওমের অধিপতি চন্দ্র।

(৪) পৃষ্ঠবংশে চ নাভ্যাং চ ধৃতং যদ্বিন্দতে কটিং।
তদ্ধার্য্যমুপবীতং স্যান্নাতিনাম্বং ন চোচ্ছ্রিতং॥ ইতি
কাত্যায়ণ।
স্তনাদূর্দ্ধমধোনাভেঃ নৈব ধার্য্যং কদাচন॥ ইতি দেবল।

অতএব দেখা যাইতেছে যে, যদিও আমরা উপবীত, প্রাচীনাবীত ও নিবীত কর্ম্মবিশেষে ব্যবহার করিয়া থাকি, কিন্তু প্রাচীন কালে উহা কতকটা লোকের সুবিধা অসুবিধার উপর নির্ভর করিত।

আমরা এখন সর্ব্বদা সূত্র-নির্ম্মিত যজ্ঞোপবীত বাম স্কন্ধে উপবীতী হইয়া ধারণ করি এবং কর্ম্মবিশেষে প্রাচীনাবীতী ও নিবীতী হইয়া থাকি; কিন্তু বৈদিক গ্রন্থাদির কুত্রাপি সূত্র-নির্ম্মিত যজ্ঞোপবীতের উল্লেখ পাওয়া যায় না; বা গলদেশে ধারণ করিবারও ব্যবস্থা নাই। ন্যায়মালা বিস্তারে তৈত্তিরীয় অরণ্যকের বাক্য উদ্ধৃত করিয়া বলা হইয়াছে, —"অত্র প্রতীয়মানং নিবীতাদিকং বাসো বিষয়ং ন ত্রিবৃৎ-সূত্র বিষয়ং। 'অজিনং বাসো বা দক্ষিণতঃ উপবীয়' ইত্যনেন সদৃশত্বাৎ বস্ত্রস্য চ নিবীতং সৌকর্য্যায় প্রাপ্তম্।" অর্থাৎ তৈত্তিরীয় অরণ্যকে যে বলা হইয়াছে, 'অজিন বা বস্ত্র উত্তরীয় হিসাবে দক্ষিণ দিকে পরিধান করিবে' ইহা হইতে বেশ প্রতীয়মান হইতেছে যে, নিবীতাদি বস্ত্র সম্বন্ধে বলা হইয়াছে, সূত্র সম্বন্ধে নহে, যেহেতু সূত্র অপেক্ষা বস্ত্রখণ্ড কটিদেশে বন্ধন করা সুবিধাজনক। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, বৈদিক অজিন বা মৃগচর্ম্মের উত্তরীয়, কালে বস্ত্রখণ্ডে পরিণত হইয়া কখন বাম স্কন্ধে, কখন দক্ষিণ স্কন্ধে, আবার কখনও বা উভয় স্কন্ধে অথবা কটিদেশে স্থান লাভ করিত। ইহা যজ্ঞপুরুষের মেখলা নয়,—তাঁহারই অজিন বা উত্তরীয়, —সৌকর্য্যার্থে কালে এইরূপ রূপান্তরিত হইয়া পড়িয়াছে। যখন প্রাচীন মৃগচর্ম্মের উত্তরীয় সুবিধার জন্য কালে বস্ত্রখণ্ডে পরিণত হইল, তখন এরূপ মনে করা যাইতে পারে যে, এই বস্ত্রখণ্ড পরবর্ত্তী কালে যে সূত্রে পরিণত হইয়াছে তাহাও ঐ ন্যায়মালার উক্তি অনুসারে 'সৌকর্য্যায় প্রাপ্তম্' সুবিধার জন্য করা হইয়াছে। সুতরাং আমাদের আধুনিক সূত্র-নির্ম্মিত উপবীত প্রাচীন যজ্ঞোপবীত নয়,—উহা প্রাচীন উত্তরীয় (৫)। আমাদের উপবীতের এরূপ পরিবর্ত্তন ঘটিলেও, আমরা প্রাচীন প্রথাকে একেবারে পরিত্যাগ করি নাই। আমাদের উপনয়ন সংস্কার কালে, আমরা কটিদেশে মুঞ্জ-মেখলা, গলদেশে অজিন বা মৃগচর্ম্মখণ্ড এবং হস্তে দণ্ড ধারণ করিয়া থাকি। কেবল ইহাই নহে, মধ্য যুগে যে মৃগচর্ম্ম বস্ত্রখণ্ডে পরিণত হইয়াছিল, তাহাও আমরা পরিত্যাগ করি নাই,—আমরা সূত্র-নির্ম্মিত উপবীত ধারণ করা সত্ত্বেও, পূজা পাঠাদি কালে বস্ত্রের উত্তরীয় ধারণ করিয়া থাকি।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, বৈদিক যুগে কটিদেশে যজ্ঞোপবীত ধারণ করা হইত। আর্য্য ঋষিগণ যজ্ঞাদি সম্পাদন কালে কটিদেশে বস্ত্রখণ্ড, গাত্রে মৃগচর্ম্ম এবং হস্তে দণ্ড ধারণ করিতেন। তাঁহাদের এই বেশ কোথা হইতে কল্পিত হইয়াছিল? আমরা যজ্ঞপুরুষ বা মৃগশিরা নক্ষত্রের অবিকল এইরূপ আকৃতি দেখিতে পাই। সুতরাং মনে হয়, যজ্ঞের সহিত প্রজাপতির সম্বন্ধ আছে বলিয়াই, বৈদিক যুগে যজ্ঞের জন্য যজ্ঞপুরুষের বেশ ধারণের প্রয়োজন হইয়াছিল; এবং সেই কারণে আজও পর্য্যন্ত আমরা উপনয়ন সংস্কার কালে, ব্রহ্মচারীকে মুঞ্জমেখলা, অজিন ও দণ্ড ধারণ করাইয়া অবিকল যজ্ঞপুরুষই সাজাইয়া থাকি। মৃগশিরার শিরদেশস্থ তিনটি উজ্জ্বল তারা যজ্ঞপুরুষের মেখলা, এবং উহা হইতেই প্রাচীন আর্য্যদের ত্রিবৃত যজ্ঞোপবীত কল্পনা; যজ্ঞপুরুষ মৃগরূপী, সেকারণ আর্য্যদের মৃগচর্ম্মের উত্তরীয় পরিধান; এবং যজ্ঞপুরুষের কটিদেশ হইতে লম্বমান নক্ষত্রপুঞ্জকে উহার দণ্ড কল্পনা করিয়া, তদনুসারে আর্য্যদের মধ্যে বিল্ব বা পলাশের দণ্ড ধারণ প্রথা প্রচলিত। এক কথায়, আর্য্য ঋষিগণ যজ্ঞের জন্য যজ্ঞপুরুষেরই বেশ ধারণ করিতেন; এবং তাহা হইতেই আমাদের যজ্ঞোপবীত পরিকল্পিত হইয়াছে।

এখন দেখা যাউক, কোন্ সময়ে আমাদের এই যজ্ঞোপবীত ধারণের প্রথা প্রচলিত হইয়াছে। মৃগশিরা বা যজ্ঞপুরুষ নক্ষত্রপুঞ্জের আকৃতি অনুসারে যখন আমাদের এই যজ্ঞোপবীত পরিকল্পিত, তখন স্বীকার করিতে হইবে যে, যে সময় মৃগশিরা নক্ষত্রে বিষুববিন্দু থাকিত অর্থাৎ দিবা ও রাত্রি সমান হইত, সেই সময় হইতেই এই যজ্ঞোপবীত ধারণের প্রথা প্রচলিত হইয়াছে। অধুনা বিষুববিন্দু অশ্বিনী নক্ষত্র হইতে প্রায় ২২ অংশ পশ্চিমে

(৫) ইহা প্রাচীন যজ্ঞোপবীত না হইলেও, ইহা যজ্ঞপুরুষেরই উত্তরীয় এবং এই হিসাবেও ইহা যজ্ঞোপবীত।

উত্তর ভাদ্রপদ নক্ষত্রে অবস্থিত। অশ্বিনী হইতে মৃগশিরার দূরতা প্রায় চারি নক্ষত্র অর্থাৎ ৪×১৩⅓=৫৩⅓ অংশ এবং বর্ত্তমান বিষুববিন্দু হইতে ইহার দূরতা প্রায় ৫৩⅓+২২=৭৫⅓ অংশ। সূর্য্য সিদ্ধান্ত মতে বিষুববিন্দু ৬৬⅔ বৎসরে এক অংশ করিয়া পশ্চিমে সরিয়া যায়; সুতরাং এই ৭৫⅓ অংশ সরিয়া আসিতে উহার প্রায় ৭৫⅓×৬৬⅔=৫০২২⅔ বৎসর সময় লাগিয়াছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, খৃষ্টের জন্মের প্রায় ৩০০০ হাজার বৎসর পূর্ব্বে আমাদের এই যজ্ঞোপবীত ধারণের প্রথা প্রচলিত হইয়াছিল। (৬)

কোন্ সময় হইতে যে আমাদের বর্ত্তমান সূত্র-নির্ম্মিত যজ্ঞোপবীত পরিকল্পিত হইয়াছে, তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। অশ্বালয়ন গৃহ্যসূত্রে যে উপনয়নের বিস্তারিত পদ্ধতি লিখিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে দেখা যায়, মাত্র মেখলা, অজিন ও দণ্ড সম্বন্ধেই ব্যবস্থা করা হইয়াছে;—সূত্র-নির্ম্মিত যজ্ঞোপবীতের কথা কোথাও উল্লিখিত হয় নাই। অধুনা সামবেদী ব্রাহ্মণগণের উপনয়ন ভবদেব লিখিত পদ্ধতি অনুসারে হইয়া থাকে। ভবদেব তাঁহার পদ্ধতিতে মেখলা ধারণের পর যজ্ঞোপবীত ধারণের কথা বলিয়াছেন বটে; কিন্তু উহা সূত্রনির্ম্মিত অথবা বস্ত্রের উত্তরীয় হইবে, তাহা বিশেষ করিয়া কিছু বলেন নাই। গোভিলও যজ্ঞোপবীতের কথা কিছু উল্লেখ করেন নাই। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, অতি প্রাচীন কালে অর্থাৎ পৌরাণিক যুগের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সূত্রনির্ম্মিত যজ্ঞোপবীতের ব্যবহার ছিল না। আমরা মনুসংহিতায় সূত্রনির্ম্মিত যজ্ঞোপবীতের কথা উল্লেখ পাই। মনু বলিয়াছেন,—"কার্পাসমুপবীতঃ স্যাদ্বিপ্রস্যোর্দ্ধবৃতং ত্রিবৃৎ।" অর্থাৎ ব্রাহ্মণের উপবীত কার্পাস-সূত্রে তিন গাছি সূতায় উর্দ্ধাধোভাবে অবলম্বিত থাকিবে। পৌরাণিক যুগের প্রথমেই মনুসংহিতা রচিত হইয়াছিল। একারণ মনে হয়, পৌরাণিক যুগ হইতেই আমাদের এই সূত্রনির্ম্মিত যজ্ঞোপবীত ধারণের প্রথা চলিয়া আসিতেছে। বৈদিক যুগে যজ্ঞাদি সম্পাদন কালে উপবীত ধারণ করা হইত; কিন্তু আর্য্যগণ যখন ভারতবর্ষে আসিয়া অনার্য্যদের সহিত একত্র বসবাস করিতে আরম্ভ করেন, তখন এই অনার্য্যদের সঙ্গে নিজেদের একটা স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিবার জন্য সদা সর্ব্বদা তাঁহাদের উপবীত ধারণের প্রয়োজন হয়। সর্ব্বদা বস্ত্রখণ্ড ধারণ করা অসুবিধাজনক; এবং এই কারণেই বোধ হয় সূত্রনির্ম্মিত যজ্ঞোপবীতের পরিকল্পনা। স্মৃতিতেও বস্ত্রাভাবে সূত্রনির্ম্মিত যজ্ঞোপবীত ধারণের ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। স্মৃতিতে এইরূপ আছে,—"তৃতীয়মুত্তরীয়ং বা বস্ত্রাভাবে তদিষ্যতে।" অর্থাৎ তৃতীয় উপবীত বস্ত্রাভাবে উত্তরীয় হিসাবে ধারণ করিবে। অধুনা আমরা তিন গাছি সূত্রের উপবীত ধারণ করিলেও উপরন্তু ব্রত-পূজাদি অনুষ্ঠান কালে বস্ত্রের উত্তরীয় ধারণ করিয়া থাকি। এই বস্ত্রের উত্তরীয়ই আমাদের বৈদিক মৃগচর্ম্মের অজিন বা যজ্ঞোপবীত।

আমাদের বর্ত্তমান আচার ব্যবহার বৈদিক যুগের তুলনায় সম্পূর্ণরূপ বিভিন্ন হইয়া পড়িলেও, আমরা বৈদিক প্রথাকে একেবারে পরিত্যাগ করিতে পারি নাই। স্মার্ত্তকারগণ উপনয়ন পদ্ধতিতে ব্রহ্মচারীকে মুঞ্জমেখলা, অজিন (মৃগচর্ম্মের উত্তরীয়) এবং হস্তে বিল্ব বা পলাশ দণ্ড ধারণ করিতে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আমাদের বর্ত্তমান আচার এতদূর বিকৃত হইয়া গিয়াছে যে, আমরা ইহাও সম্যক পালন করি না। বঙ্গদেশে আজ কাল মুঞ্জমেখলার অভাবে শরের পৈতা করিয়া ব্রহ্মচারীর গলদেশে ধারণ করান হইয়া থাকে। ভবদেব পদ্ধতিতে স্পষ্টাক্ষরে "ত্রিবৃতাং মৌঞ্জমেখলাং পরিধাপয়েৎ" * * কথার উল্লেখ থাকা সত্ত্বেও ভট্টাচার্য্যগণ কেন বা মেখলা গলদেশে ধারণ করিতে নির্দ্দেশ করেন, জানি না। কোমরে হার পরার ন্যায় গলায় মেখলা পরা বাস্তবিকই অসঙ্গত ব্যাপার। ভারতের অন্যত্র এরূপ গলায় মেখলা পরার ব্যবস্থা নাই। তারপর মৃগচর্ম্মের উত্তরীয় ধারণের কথা। আমরা উপনয়ন কালে কোনরূপ কর্ম্মের উত্তরীয় ধারণ করা ত দূরে থাক্, বস্ত্রখণ্ডও মন্ত্রপাঠের সঙ্গে ধারণ করি না; মাত্র একগাছি পৈতার সঙ্গে অতি সামান্য একখণ্ড মৃগচর্ম্ম বাঁধিয়া দিয়া থাকি। কিরূপে যে আচার-ব্যবহার বিভিন্নাকার ধারণ করে, ইহাই তাহার একটী প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

(৬) পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের বিষুববিন্দু প্রায় ৭১ বৎসর অন্তর এক অংশ করিয়া পিছাইয়া পড়ে। এই হিসাবে মৃগশিরা যুগের কাল খঃ পূঃ প্রায় ৩৫০০ বৎসর পাওয়া যায়।

মঙ্গলা।

[শ্রীসুশীলকুমার রায়]

(১)

ঝুপ্ ঝুপ্ ক'রে বৃষ্টি প'ড়ছে। দূরে নদীর ধারের গাছগুলো কুয়াসা-ঘেরার মত অস্পষ্ট। নিতাই মাঝি তার মেটে ঘরের দাওয়ায় উপু হ'য়ে ব'সে ডাবা হুঁকোয় ঘন ঘন টান দিচ্ছিল, আর বাইরের দিকে এক একবার উঁকি মেরে দেখছিল।

সন্ধ্যের সময় বৃষ্টিটা একটু ধরণ ক'রে এলে সে প্রদীপটায় একটু গাব তেল ঢেলে দিয়ে আলো জ্বেলে হুঁকোটাকে একপাশে ঠেলে সরিয়ে রেখে ঘরের কোণে চুপ ক'রে বসে রইল। বোধ হয় চির কালের প্রিয় হুঁকোটাও তার কাছে আর ভাল লাগছিল না। এমন সময় বাইরে থেকে কে ডাকলে "নিতাই——"

নিতাই অন্ধকারাচ্ছন্ন কোণ থেকে টপ্ ক'রে লাফিয়ে উঠে দরজার কাছে এসে মুখ বাড়িয়ে বল্লে, "কে, বিশে ?"

"হ্যাঁ—" বলেই বিশে ঘরের ভেতর ঢুকে ছেঁড়া চেটাইটা টেনে নিয়ে বসে প'ড়ল।

কিছুক্ষণ দু'জনের ভেতর কোনই কথা হ'ল না। অনেকক্ষণ পরে বিশে সরু গলার ওপর বসানো বড় ঝাঁকড়া মাথাটা দু'বার নেড়ে বল্লে, "ভেবে কি ঠিক করলি ?"

"ভেবে কিছুই ঠিক ক'রতে পারছিনে বিশে। যতই ভাবছি ততই মঙ্গলার কথা বেশী ক'রে মনে প'ড়ছে।" কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নিতাইয়ের দীর্ঘ নিশ্বাসটা বেশ স্পষ্টই শুনতে পাওয়া গেল।

বিশে একবার এদিক্ ওদিক চেয়ে বল্লে, "কিন্তু বিলাসী—সেও দেখতে বেশ।"

নিতাইয়ের শুকনো তোবড়ান মুখখানা আনন্দে উজ্জ্বল হ'য়ে উঠল। তারপর একটা ঢোক গিলে বল্লে, "আমি কিন্তু তাকে এখন কোন কথা দিই নি।"

"বেশ ক'রেছিস। যত দিন না তাকে ভাল ক'রে বুঝতে পারিস, ততদিন কোন কথা দিস নি। জানিস ত' মুখের কথা আর হাতের ঢিল একবার ফ'সকে গেলে আর ফেরান যায় না।"

নিতাইয়ের মুখখানা ফ্যাকাশে হ'য়ে গেল। সে বিশের কাছে আর একটু সরে এসে চাপা গলায় বল্লে, "তাহ'লে আমি ত' একজনকে কথা দিয়েছি।"

বিশে কোটরে-বসা চোক দুটো বড় বড় ক'রে বল্লে, "কাকে রে ?"

নিতাই মাথাটা নিচু ক'রে বল্লে, 'মঙ্গলাকে,—যখন আমি ময়নাপোতায় এসে এই ঘর তুলি তখন মঙ্গলাই আমাকে অনেক সাহায্য ক'রেছিল। তারপর যখন নদীতে খেয়া দিতে লাগলাম, সে তখন আমার ঘরের অনেক কাজ করে দিত।"

বিশে মাথাটা হাঁটু দুটোর মাঝখানে গুঁজে ভাবতে লাগল। আজ প্রায় দু'বছর হ'ল নিতাই পার-ঘাটায় খেয়া দিচ্ছে। যা রোজগার করে, সবই নিয়ে এসে তার হাতে দেয়। খরচা বাদে তার এক কুড়ি টাকা জ'মেছে, কিন্তু নিতাই যদি হিসেব রাখে তাহ'লে টেনে টুনে আরো আধকুড়ি বাড়িয়ে ফেলবে। উঁ—হুঁ। বিলাসী এলে আর ও-সব খাটবে না।

বিশের মাথার ভেতর দুষ্ট মতলব খেলতে লাগল। সে আস্তে আস্তে মাথাটা তুলে বল্লে, "আমি ভেবে দেখলাম তোর কথাই ঠিক। মঙ্গলার কাছ থেকে কথা না নিয়ে বিলাসীকে কিছু বলা ঠিক না। কিন্তু সে ত' এখন কুসুমপুরে।"

নিতাই উঠে ঘরের ভেতর পায়চারী ক'রতে লাগল। বিলাসী আর মঙ্গলা দু'জনে মিলে আজ তার মনটাকে যেন দুদিক থেকে টানছে। সে মনে মনে প্রতিজ্ঞা ক'রলে যে এর একটা হেস্তনেস্ত ক'রে ফেলবেই। হয় বিলাসী নয় মঙ্গলা, এদের ভেতর এক জনকে তার চাই—চাই। সে তাড়াতাড়ি একটা পুঁটুলি বেঁধে বল্লে, "বিশে, পাঁচটা টাকা দিবি ?"

"কেন ?"

"আজই কুসুমপুর যাবো।"

"এই রাত্তিরেই ?"

"হ্যাঁ।"

বিশে মাথা নেড়ে কপাল কুঁচকে বল্লে, "অত টাকা কোথা পাব্বো এখন ?"

"কেন, আমার যা জমা আছে—তাই থেকে দিবি।"

বিশে নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বে উঠে পড়ে বল্লে, "আচ্ছা আয়।"

(২)

দু'দিন নৌকা বেয়ে আর একদিন গাছতলায় কাটিয়ে নিতাই কুসুমপুরে এসে মঙ্গলার বাড়ীর সামনে দাঁড়াল। মঙ্গলা তখন একটা ছাঁকনী জাল হাতে ভিজে কাপড়ে বাড়ী ফিরছিল। নিতাইকে দেখেই তার অপ্রসন্ন মুখখানা প্রসন্নতায় ভ'রে উঠল। একগাল হেসে বল্লে, "এতদিন পরে আজ বুঝি মনে প'ড়েছে নিতাই ?"

নিতাই মুখে কিছুই ব'লতে পারলে না, তবে পুঁটলি হাতে একটু বিব্রত হ'য়ে প'ড়ল।

মঙ্গলা ঘরের দরজা খুলে তালপাতার বোনা একখানা চেটাই পেতে দিয়ে, কাপড় ছেড়ে একবাটি মুড়ি আর খানিকটা গুড় রেখে দিয়ে বল্লে, "সামনের পুকুর থেকে পা হাত ধুয়ে এসে মুখে একটু জল দে, আমি আসছি।"

মঙ্গলা পাড়ার দোকান থেকে একটা ডাবা হুঁকো, ক'লকে, টিকে, একটু তামাক এনে নিতাইয়ের সামনে রেখে দিয়ে পা ছড়িয়ে বসে বল্লে, "সত্যি ক'রে বল্ত' কি মনে ক'রে ময়নাপোতা থেকে এ'লি ?"

নিতাইয়ের জল খাওয়া হ'য়ে গিয়েছিল। টিকে ধরাতে ধরাতে মঙ্গলার কালো নিটোল মুখখানার দিকে চেয়ে বল্লে, "তোকে নিয়ে যাবার জন্যে।"

"আমায় নিয়ে যাবার জন্যে ? ইস্, ঠাট্টা করিসনে নিতাই।"

তামাক টানতে টানতে নিতাই এদিক-ওদিক চেয়ে বল্লে, "এ জায়গাটা তত' ভাল নয়। ঘরখানাও বিশ্রী। আবার ময়নাপোতায় ফিরে চ' মঙ্গলা।"

"ও আমার পোড়া কপাল! এ ঘর বিশ্রী! এ যে আমার বাপের ভিটে নিতাই। এতদিন কোন্ মোহে যে মামীর ঝেঁটা খেয়ে ময়নাপোতায় প'ড়েছিলাম তা জানি না ......না নিতাই, তুই ফিরে যা। আমি আর সেখানে যাবো না।"

নিতাই এবার একটু জোর দিয়েই বল্লে, "তবু তোকে যেতেই হবে মঙ্গলা। আমার সংসারে কেউ নেই। চির কালটা খড় কুটোর মত কি ভেসে ভেসেই বেড়াবো ? তুই আমায় আটকে রাখতে পারবি নি।"

মঙ্গলার মুখের ভাব ব'দলে গেল। সেই একদিন আষাঢ়ের আসন্ন সন্ধ্যায় পারঘাটার পাশে দাঁড়িয়ে নিতাই এমনই ভাবে বলেছিল, "মঙ্গলা, তোর জন্যেই ময়নাপোতায় ঘর বেঁধেছি, আবার খেয়া দিচ্ছি, তুই আমায় যেন ছেড়ে যাস্‌নে !"

মঙ্গলা বাঁ হাতের কাঁচের চুড়ী ক'গাছা ডান হাতের আঙুল দিয়ে নাড়তে নাড়তে বল্লে, "আমার যে এখানে দেনা আছে, না চুকিয়ে ত' যেতে পারবো না।"

নিতাই উৎসাহের ঝোঁকে প'ড়ে বল্লে, "কত ?"

"তিন টাকা।"

পাঁচটা টাকা ট্যাঁক থেকে বার ক'রে মঙ্গলার সামনে রেখে দিয়ে বল্লে, "এইবার রাজি আছিস ?"

কৃতজ্ঞতাপূর্ণ চোক দু'টি তুলে মঙ্গলা বল্লে, "আছি।"

(৩)

"ও মাঝির পো ?"

নিতাই তাড়াতাড়ি দোর খুলে বাইরে এসে বল্লে, "এনেছিস ?"

বিশে চোকদুটো কপালে তুলে বল্লে, "কি ?"

"টাকা।"

"টাকা কি গাছে ফ'লছে ?"

"কেন, আমার ত' এখন এককুড়ি টাকা তোর কাছে আছে।"

বিশে তার ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুলের ভেতর আঙুল চালাতে চালাতে বল্লে, "আছে বলেই কি সব খরচ ক'রতে হবে নাকি ?"

গলার স্বরটা নাবিয়ে নিতাই বল্লে, "মঙ্গলাকে এনেছি, এইবার একটা পাকাপাকি কিছু ক'রে ফেলতে হবে ত? ওর মামী ত' সেইদিন থেকে পাড়ায় কাক চিল বসতে দিচ্ছে না।"

বিশে মাথাটা দুলিয়ে বল্লে, "তার ওপর বিলাসী—"

নিতাই বাধা দিয়ে বল্লে, "কেন, আমি ত' তাকে কথা দিই নি?"

"কথা ত' দিস নি, কিন্তু যখন সে হাটে যায় তখন তুই এমন ভাবে তার দিকে চেয়ে থাকিস যে—"

নিতাই খপ্ ক'রে তার মুখে হাতখানা চাপা দিয়ে বল্লে, "খবরদার! বাড়ীর সামনে দাঁড়িয়ে—"

পেছন ফিরে নিতাই দেখলে মঙ্গলা কপাটের শিকলিটা চেপে ধরে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে। চোখের ভেতর যেন আগুন জ্বলছে।

বিশে মাথা দুলিয়ে আবার কি একটা কথা ব'লতে যাচ্ছিল, কিন্তু এবার সে তাকে অস্পৃশ্যের মতই দু'হাতে জোরে ঠেলে ফেলে দিয়ে বাড়ীর ভেতর ঢুকে পড়্ল।

* * *

"তুই আমার হবি নি?"

"না"।

"কেন?"

"আমি দেখতে খারাপ।"

মঙ্গলা ঘাড় হেঁট ক'রে চুপ ক'রে রইল। নদীর জল ছল্ ছল্ ক'রে পায়ের কাছে আছড়ে পড়ে ফিরে যাচ্ছে। সন্ধ্যার তরল আঁধার ধীরে ধীরে ঘন হ'য়ে আসছে। পারঘাটা জনশূন্য।

নিতাই একবার সন্ধ্যা তারার দিকে, একবার মঙ্গলার মুখের দিকে চেয়ে বল্লে, "আমি ত তোকে কোন দিন খারাপ বলি নি?"

"বিলাসী আমার চেয়ে দেখতে ভাল।"

নিতাই চুপ করে বসে রইল।

মঙ্গলার চোখের ভেতর আবার সেদিনকার মত আগুন জ্বলে উঠ্ল। তারপর সোজা দাঁড়িয়ে উঠে বল্লে, "তুই তাকে ভালবাসিস্। তাকে নিয়েই ভাল হ'।...আমি কুসুমপুর ফিরে চল্লুম।"

নিতাই কাতরস্বরে বলে উঠ্ল, "মঙ্গলা যাস্নি দাঁড়া।"

শূন্য পারঘাটার বুকের ওপর তার আকুল আহ্বান শুধু লুটিয়ে পড়'ল। মঙ্গলা তখন অনেক দূরে চ'লে গেছে।

রাত্রে, ঝড়ে।

[স্বর্ণময়ী দেবী]

সন্ সন্ সন্ বহিছে পবন,
তর-তর-তর পাতার ডাক;
দূর হ'তে ডাকে প্রবল তুফান,
গরজি গর্ব্বে দিতেছে হাঁক।
নীড়ে থাকি পাখী ঝাপটি ঝাপটি
আবার ধরিছে আঁকড়ি সাবটি,
কুসুম উলটি, ধরাতলে লুটি'
গিয়েছে তাহার রূপের জাঁক,
লতিকা সভয়ে কাঁপিছে ঘন
বিচলিত সব বন,

গুড়ু গুড়ু গুড়ু ঘন গরজন,
ঘন ঘন ঘন মেঘের ডাক।
চমকে চপলা থাকি থাকি থাকি,
জগতের রূপ সে আরসী রাখি,
দেখায় ধরারে দেখলো নিরখি,
তোমার যে বড় রূপের ডাক!
তখন দেখিয়া নিজ মুখখানি,
নিজেই লজ্জিত সে ধরা-রমণী;
নম্র নত শিরে প্রণমে তখনি,
আর না পবন প্রণমি, থাক্।

ভারতীয় সেবা-ধর্ম্ম ও তাহার দুই বিশিষ্ট রূপ।

[শ্রীসাহাজি]

সেবা বলিতে আমরা বুঝি ঈশ্বরের সেবা, তাই সেবা, আমাদের নিকটে, ধর্ম্ম। সেবা করা যায় মানবের; কিন্তু ঈশ্বরের সেবা করা যায়, এমন কথা এক ভারতবর্ষ ভিন্ন অন্য কেহই বলে না। ঈশ্বরের সেবা?—ইহাও কি সম্ভবপর?—ইহা যেন উন্মাদের প্রলাপ-উক্তি বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু গভীর দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ভারতের নিকটে জীব-সেবা যথার্থই শিবসেবা। বিশ্বসেবা, তাহার নিকটে, যথার্থই বিশ্বেশ্বরেরই সেবা। জীব, তাহার দৃষ্টিতে, শুধু অর্থশূন্য জীবমাত্র নহে, ইনি শিব—'নিত্য জীব''। অনন্ত আত্মার অনন্ত ভাবরূপ। জগৎ, তাহার দৃষ্টিতে, শুধু নিরর্থক জগৎমাত্র নহে, উহা বিশ্বেশ্বরেরই বিশ্ব রূপ। অনন্ত ভগবানের অনন্ত জগৎ রূপ। ফলতঃ, জীব ও জগৎ তাহার নিকটে, গভীর অর্থসূচক—অনন্ত রহস্যমণ্ডিত। এই দিব্য দৃষ্টি লইয়াই আমরা জীবসেবা, বিশ্বসেবা করিয়া থাকি। তাই আমাদের পক্ষে উহা সাধারণ সেবামাত্র না হইয়া হয় ঈশ্বরেরই সেবা। অন্য দেশে যাহা মানবসেবা, আমাদের দেশে তাহা "জীব" সেবা—(১) যাহা একদিক দিয়া শিবসেবা হইতেও মহত্তর, কেন না, শিব স্বয়ং পূর্ণ, সুতরাং তাঁহার সেবা নিষ্প্রয়োজন, "জীবের" মধ্যে "শিব" আছেন, কিন্তু "শিবের" মধ্যে "জীব" নাই; (২) যাহা আবার অন্য দিক দিয়া মানবসেবা হইতেও মহত্তর, কেন না, মানব শুধু অর্থশূন্য মানব মাত্র, সুতরাং দয়া বা উপ-চিকীর্ষা প্রবৃত্তিই সেরূপ সেবার উৎস; কিন্তু যথার্থ সেবার সহিত নিষ্কিঞ্চন প্রেমের ভাব বিজড়িত। ইহাই ভারতীয় সেবা-ধর্ম্মের বিশেষত্ব।

* * *

ভারতীয় ভক্তবাদ, আমাদের এই সেবা-ধর্ম্মেরই একটি বিশিষ্ট রূপ।

কি যেন কি এক দৈব দুর্ব্বিপাকে আমাদের মধ্যে যখন বিবিধ অনর্থের উৎপত্তি হয়, ব্যথিতের ক্রন্দনে, আর্ত্তের হাহাকার ধ্বনিতে যখন গগন বিদীর্ণ হইতে থাকে, তখন এক এক অতিমানব মহাপুরুষ যেন ঈশ্বর-প্রেরিত হইয়াই আমাদের মধ্যে আবির্ভূত হন, সহানুভূতি ও সমবেদনায় গলিয়া আমাদের পরিত্রাণ সাধন করিবার জন্য নিঃশেষে কায় মনঃ প্রাণ অর্পণ করেন। এমন বিশ্বাত্ম বোধসম্পন্ন ব্যক্তির প্রতি গভীর শ্রদ্ধায় কাহার না হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠে? যাহাদের চক্ষে সামান্য একটি জীব পর্য্যন্তও শিব—"নিত্য জীব", তাঁহারাই যে এই সকল মহাত্মাকে ঈশ্বরের অবতার বলিয়া গ্রহণ করিবেন, তাহা বিস্ময়ের বিষয় নহে।

পরমহংসদেব বলিয়াছেন, অবধূতের ব্যাধ, চিল, বক, মৌমাছি প্রভৃতি বহু গুরু ছিলেন। যাঁহার নিকট হইতে কিছু শিক্ষা করা যায়, তিনিই গুরুপদবাচ্য। আজন্ম মৃত্যুকাল মানব জগতের যাহা কিছু পদার্থ হইতেই কিছু কিছু শিক্ষা পাইয়া থাকে, সুতরাং এই বিশ্ব জগতই কি তাহার গুরু নহেন? তথাপি এই জ্ঞান-জগতে মানব গুরুই সর্ব্বপ্রধান। কেন না, মানবের নিকট হইতেই আমরা জীবনের চরম সার্থকতা প্রদায়িনী পরম শিক্ষা লাভ করিয়া থাকি। বিশ্বের সকল বস্তুতেই বিশ্বেশ্বর বিরাজিত আছেন। মনুষ্যের মাঝে তাঁহার সেই বিকাশ সমধিক। আবার, সেই মনুষ্য সমাজের মধ্যে গুরু যিনি—

> অখণ্ড মণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্।
> তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

এমন ব্যক্তির প্রতি

> গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণুর্গুরুরেব মহেশ্বরঃ।
> কৃষ্ণ রুষ্ট হলে গুরু রাখিবারে পারে।
> গুরু রুষ্ট হলে কৃষ্ণ রাখিবারে নারে॥
> ভক্ত ভগবান মধ্যে ভক্ত হয় বড়।
> ভক্ত হৃদে জন্ম তাঁর, এ রহস্য দড়॥

ইত্যাদি রূপ ভক্তির বাণী- সূক্ষ্মদর্শী ভারতবর্ষের পক্ষে

বস্তুতঃই অত্যুক্তি নহে। এইরূপে, ভারতবর্ষে একদিন ভক্ত, গুরু এবং অবতারবাদের প্রতিষ্ঠা হয়। ভক্ত "the epitom of the" ভগবান—ভগবানের সংক্ষিপ্ত সার, ভক্ত হৃদয়েই ভগবানের জন্ম হয়, সুতরাং ভক্তের সেবা করিলে ভগবানেরই সেবা করা হয়, এই মত সর্ব্বত্র গৃহীত হয়।

সকল সত্যেরই মূলে গভীর উদ্দেশ্য নিহিত থাকে। মানব যখন প্রাণে সত্যানুভূতির প্রেরণায় উহা গ্রহণ করে, তখনই উহা সার্থক হইয়া উঠে। নতুবা যখন উহা সংস্কার-মাত্রবশতঃ গতানুগতিক ভাবে অনুসৃত হয়, তখন ইহা প্রাণহীন অনুষ্ঠান মাত্রে পর্য্যবসিত হইয়া অশেষ অকল্যাণের হেতু হইয়া দাঁড়ায়। অমন সুন্দর গভীর অর্থমূলক ভক্তবাদেরও তাই আজ এই শোচনীয় দুর্দ্দশা। আজ গুরুও অধঃপতিত, শিষ্যও তথৈবচ। শিষ্যসেবা—যাহার অন্য নাম মনুষ্য গঠন—সেই শিষ্যসেবা রূপ গুরুর অমন দায়িত্বপূর্ণ কঠিন কার্য্য আজ ব্যবসায়ীর "গুরুগিরিতে" পরিণত! পূর্ব্বে মহাপুরুষেরা সেবকত্বের অগ্নি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া যে দুর্লভ অবতারত্ব অর্জ্জন করিতেন, তাহা এক্ষণে উপাধিমাত্রে পর্য্যবসিত হইয়া ধর্ম্মের হাটে যত্র তত্র বিক্রীত! অমন ব্রহ্মারও দুর্লভ গুরুভক্তিও তাই আজ অন্ধভক্তিতেই পরিণত! তাই আজ অবতারের (?) পৌত্রীর "পাকা দেখায়" কুটুম্ব ভোজনের জন্য দুই মণ মৎস্য ও তদুপযোগী ভোজ্যদ্রব্য সংগ্রহ করিয়া দিয়া তদীয় ভক্তবৃন্দ "আপনারা ঈশ্বরসেবার সৌভাগ্য অর্জ্জন করিলেন" বলিয়া মনে করেন। তাই আজ দেশের ধনীর নিঃসন্তানা বিধবারা শাস্ত্র-জ্ঞানহীন সমর্থ গুরুকে (?) সপরিবারে প্রতিপালিত করিয়া আপনাদিগকে অক্ষয় স্বর্গের অধিকারিণী ভাবিয়া হর্ষ প্রকাশ করেন! তাই আজ সমাজের ধনবান্ জমিদারেরা গুরুদেবের (?) বাস্তু-ভিটায় চকমিলান কোঠা বাড়ী করিয়া দিয়া, প্রতিবৎসর "মা ঠাকুরাণী"র হীরার নথ হইতে আরম্ভ করিয়া তাঁহার গৃহমার্জ্জনার ঝাড়ুগাছি পর্য্যন্ত কিনিয়া দিয়া, এই সহস্র অভাবগ্রস্ত দরিদ্র দেশে অর্থের চরম সদ্ব্যয় হইল বলিয়া মনে করিয়া থাকেন! উপযুক্ত একদা দিবসে দুইবার ভিক্ষা করিয়াছিলেন, এই সামান্য কারণে তিনি গুরু কর্ত্তৃক "তুমি অন্য ভিক্ষুকদের মুখের গ্রাস হরণ করিতেছ" বলিয়া তিরস্কৃত হইয়াছিলেন। কিন্তু একালের মানব জাতির কর্ণধার (!) ঈশ্বরস্থানীয় এই সকল "গুরুঃ শিষ্য বিত্তাপহা"দিগকে তাহা হইলে কি বলিয়া তিরস্কার করা সঙ্গত, তাহা ভাবিয়া দেখিবার বিষয়। এই সকল গুরুর কল্যাণে ভারতের কি পরিমাণ অর্থের প্রতিবৎসর অপব্যয় হয়, তাহার একবার হিসাব লইয়া দেখিলে ভাল হয়। কাহারও অন্ন মারা পরমহংসদেবের উদ্দেশ্য ছিল না, তাই তিনি ইঁহাদের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষভাবে কিছু না বলিয়া বিবেকানন্দ প্রভৃতির ন্যায় আদর্শ গুরু সৃষ্টির দিকেই—ধ্বংস অপেক্ষা গঠনের দিকেই বিশেষ করিয়া মনোযোগ দিয়াছিলেন। কিন্তু তথাপি তিনি "হেগো গুরুর পেদো শিষ্য" ইত্যাদি বাক্যে তাঁহাদের প্রতি কটাক্ষ করিতেও কুণ্ঠিত হয়েন নাই। কাহারও অন্নমারা আমাদেরও উদ্দেশ্য নহে। তবে, আমাদের মনে হয়, কর্ম্মহীন অলস জীবন যাপন করতঃ মিথ্যা ও কপট আচরণের দ্বারা জীবিকা-র্জ্জন করা অপেক্ষা জুতা সেলাই করিয়া কষ্টে সৃষ্টে দিনপাত করাও সহস্রগুণে শ্রেয়ঃ। কিন্তু হায়! কি পরিতাপের বিষয়, ব্রহ্মনিষ্ঠ সত্যদর্শী (?) তাঁহারাই আবার "সিদ্ধাবস্থায় সাধকের কর্ম্ম থাকে না" এই মহাজন বাক্যের অসঙ্গত কুব্যাখ্যা দ্বারা আপনাদের ঐ প্রকার অকর্ম্মণ্য অলস জীবন যাপনেরই পোষকতা করিয়া থাকেন। পক্ষান্তরে, হতভাগ্য শিষ্যদেরও চৈতন্য নাই, এ প্রকার গুরুকে ভক্তি করিলে ভগবানেরই অবমাননা করা হয়; যে সম্মান ভগবানের প্রাপ্য, তাহা অযোগ্যকে দিলে প্রত্যবায়েরই ভাগী হইতে হয়। "Beware of false prophets, for many shall come in name, saying that I am Christ."—প্রভু যিশুখ্রীষ্টের একথা প্রত্যেক শিষ্যেরই স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। * * * এদিকে এই গুরু-গিরির যেমন মা বাপ নাই, অন্যদিকে অবতারেরও সেইরূপ আজ কাল আর অন্ত নাই। আজ কাল পথে ঘাটে অব-তারের ছড়াছড়ি। ছেলেরা ধুলাকাদা লইয়া "অবতার" করে, ইহাই জানিতাম। কিন্তু আজ দেখি, ধর্ম্মের পথেও

এই অবতারেরই খিটকেলি। যদি প্রকৃত গুরু পাইয়া থাক, তবে তাঁহাকে অবতার বলিতে পার, অবতার বলিয়া তাঁহাকে বিশ্বাস করিতে পার, তাঁহার পূজা করিতে পার; কিন্তু অবতার বলিয়া তাঁহাকে প্রচারিত করিতে পার না। সতী পতিকে ঈশ্বর বলিয়া পূজা করিতে পারেন, কিন্তু তাহা বলিয়া স্ত্রী-সমাজে "আমার পতিই ঈশ্বর, অতএব তাঁহারই ভজনা কর" এরূপ কথা প্রচার করা তাঁহার কর্ত্তব্য হইতে পারে না। বিবেকানন্দেরও তাই পরমহংস-দেবকে লোকসমাজে অবতার বলিয়া প্রচারিত করিবার নিষেধ ছিল। ফলতঃ, কাহারও ব্যক্তিত্বই প্রচারের বিষয় নহে, যথার্থ প্রচারের বিষয় তাঁহার উপদেশ—তাঁহার বাণী। * * * বর্ত্তমান সময়ে অনেক যুবক পরীক্ষা দিবার ভয়ে মাথা মুড়িয়া সাধুর দলে মিশিতে যান, বৃদ্ধ পিতা-মাতাকে বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শন করাইয়া সন্ন্যাসী সাজেন, আর দল পাকাইয়া আপন আপন গুরুকে অবতার বলিয়া ঘোষণা করেন, এবং গুরুর সেই অবতারত্ব প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য অপর দলের সঙ্গে বাগ্‌যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। কিন্তু কি দুঃখের বিষয়, বিদ্যালাভের কষ্ট সহিবার সামর্থ্য নাই যাঁহার, তিনি করিবেন ধর্ম্মলাভের জন্য কৃচ্ছ্রসাধন! পিতামাতাকে তুষ্ট করিতে সমর্থ নহেন যিনি, তিনি তুষ্ট করিবেন জগতের পিতামাতাকে। ধর্ম্মপথের পথিক যিনি, সন্ন্যাসী যিনি, তিনি মারামারি করেন দল পাকাইয়া, গুরুর অবতারত্ব লইয়া! কি বিড়ম্বনা! আমরা সংসারী, "খোলাখাপরা" লইয়া ঝগড়া করি, তাঁহারা না হয় ঝগড়া করেন ধর্ম্ম (?) লইয়া। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, তাঁহাদের এই ঝগড়া করিবার প্রবৃত্তির নিবৃত্তি কোথায়? * * * অন্য দিকে, বৃদ্ধেরা আবার গুরুনামের নিতান্ত অযোগ্য, গুরুনামের কলঙ্কস্বরূপ ভণ্ড ভক্ত বিটকেল গুরুর চরণে অন্ধভক্তিবশে বারংবার মস্তক লুণ্ঠিত করেন এবং পরিত্রাণ বিষয়ে হতাশ হইয়া আপন আপন অযোগ্যতাকেই সেই হতাশার একমাত্র কারণ মনে করিয়া তারস্বরে ঘোষণা করেন,—

যদ্যপি আমার গুরু শুঁড়িবাড়ী যায়।
তথাপি আমার গুরু নিত্যানন্দ রায়॥

কিন্তু তাঁহারা বুঝেন না, সকল গুরুই নিত্যানন্দ নহেন; অথবা যিনি নিত্যানন্দের মত নহেন, তিনি গুরু হইবার যোগ্যই নহেন। শুঁড়িবাড়ী যাওয়া যদি সাজে, তবে তাহা একমাত্র নিত্যানন্দেরই সাজে। আপনার গুরুত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিয়া যদি কোনও গুরুর শুঁড়িবাড়ী যাইবার সামর্থ্য থাকে, তবে তাহা একমাত্র নিত্যানন্দেরই আছে। যিনি সর্ব্বভুক্, তিনিই কেবল গোমাংস খাইয়াও আপনার পাবনীশক্তি অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারেন। ফলতঃ, যাঁহার নিত্যানন্দের মত গুরু আছেন, তাঁহারই মুখে ঐ কথা শোভা পায়। নহিলে "হেগো গুরুর পেদো শিষ্যের" মুখে ওরূপ কথা কদাপি শোভা পায় না, এবং এইজন্যই, গুরু করিতে হইলে, নিত্যানন্দের মত যথার্থ শক্তিধরকেই গুরু করিতে হয়। * * * "বিশ্বাসে মিলায় বস্তু," অনেকে আবার একথাও বলিয়া থাকেন। গুরু যেমনই হউক, শিষ্য যদি তাঁহাকে যথাযথ বিশ্বাস করেন, তাহা হইলেই তিনি তরিয়া যাইবেন। গুরু শুধু উপলক্ষ্য মাত্র, সুতরাং গুরু দোষী নহেন। কিন্তু এই কথাই যদি সত্য হয়, তাহা হইলেও, উপলক্ষ্যকে উদ্দেশ্য এবং সাধনকে সাধ্য বলিয়া মনে করিতে নাই। ফলতঃ, ঐ সকল ব্যক্তি বিশ্বাস অর্থে কি বুঝেন, তাহা বলিতে পারি না। তবে, বিশ্বাস শব্দের প্রকৃত অর্থ, প্রকৃত বস্তুতে প্রকৃত জ্ঞান। অগ্নি প্রকৃত বস্তু, অগ্নির দগ্ধ করিবার শক্তি আছে, ইহাও প্রকৃত সত্য। সুতরাং অগ্নিস্পর্শের সম্ভাবনা দেখিলে হস্ত অজ্ঞাতসারেই সরিয়া যায়। এস্থলে ইহাই বিশ্বাস। অন্যথা, অগ্নি জল, অগ্নিতে হস্ত দাও, দগ্ধ হইবে না। ইহা ভোজবাজি হইতে পারে, কিন্তু ইহা বিশ্বাস নহে। * * * এক শ্রেণীর লোক আছেন, তাঁহারা যুক্তিতর্কের কোনও মূল্য আছে বলিয়া স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মতে, যুক্তিতর্কের উপর যাহা নির্ভর করে, তাহা সামান্য লৌকিক সত্য মাত্র; আর বিশ্বাসের উপর যাহার প্রতিষ্ঠা, তাহাই যথার্থ ধর্ম্ম। কি কুক্ষণেই এদেশে "বিশ্বাসে মিলায় বস্তু, তর্কে বহুদূর" ইত্যাদি বাণী প্রচারিত হইয়াছিল। এ সকল উহারই শোচনীয় পরিণাম। যাহা হউক, যুক্তি তর্কের মধ্যেও যে সামান্য লৌকিক সত্য পাওয়া যায়, বিশ্বাসের মধ্যে যদি

তাহাও না মেলে, তাহা হইলে উহার মূল্য যে কি, তাহা আমরা আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে বুঝিতে একান্তই অসমর্থ। বিশেষতঃ, সেই বিশ্বাস যদি দেশের, সমাজের এবং জাতির পক্ষে অনর্থকর হয়, তাহা হইলেও কি উহাকে গ্রাহ্য করিতে হইবে? "পাঠা বলি দেওয়া ধর্ম্ম।"—যদি প্রশ্ন করি,—কেন?—তাহা হইলে উত্তর পাইব,—যেহেতু ইহা ধর্ম্ম, সেই হেতু ইহা যুক্তি তর্কের ধার ধারে না। সুতরাং তোমার এ "কেন"র উত্তর নাই।—"বাল বিধবার বিবাহ দেওয়া অথবা চৈত্রের একাদশীতে তাহাকে একবিন্দু পানীয় জল প্রদান করা অধর্ম্ম।"—যদি প্রশ্ন করি,—কেন?—তবে তৎক্ষণাৎ উত্তর পাইব,—ইহা ধর্ম্মের কথা, ইহাতে কৈফিয়ৎ করিবার কিছুই নাই। ইহা বুঝিবার জন্য চাই শুধু "পাঁচ আনা পাঁচসিকা" বিশ্বাস। যুক্তি তর্ক অবিশ্বাসী নাস্তিকেরই অস্ত্র, সাত্বিকের বুদ্ধি উহাতে কদাপি বিচলিত হয় না। ফলতঃ, এই প্রকার ভিত্তিহীন অন্ধ বিশ্বাস একান্ত অশ্রদ্ধেয়। যাহাতে যুক্তি নাই, সত্য নাই, তাহা কদাপি ধর্ম্ম নহে। সংস্কারকে বিশ্বাসের আসনে প্রতিষ্ঠিত করা মূর্খতা মাত্র। ভিত্তিহীন প্রাসাদ এবং যুক্তিহীন তথাকথিত বিশ্বাস, অর্থাৎ সংস্কার—এতদুভয়ের তুল্য মূল্য। যথার্থ বিশ্বাসের জন্ম সত্য হইতে এবং সত্যেই উহার প্রতিষ্ঠা। সুতরাং উহা বিজ্ঞানবৎ সুপ্রতিষ্ঠিত। যে "বিশ্বাসাৎ অগ্নিস্তপতি...মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ," সেই বিশ্বাসের এই শোচনীয় পরিণাম! ইহা অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়!

সামান্য কাদা, ওস্তাদের হস্তে পড়িয়া বাদ্যযন্ত্রে পরিণত হয়। সেই বাদ্যযন্ত্র আবার যখন সঙ্গীতজ্ঞের হস্তে পতিত হয়, তাহা হইতে তখন কি মধুর শব্দ-তরঙ্গের সৃষ্টি হয়। গুরুর উপযোগিতা এই স্থানেই উপলব্ধ হয়। সুতরাং এমন গুরু যদি গুরু না হন, তবে কেমন করিয়া তাঁহাকে গুরু বলিয়া গ্রহণ করা যায়? একমাত্র বিশ্বাসই যদি সর্ব্বস্ব হয়, তাহা হইলে মনুষ্যকে গুরুরূপে গ্রহণ করিবার সার্থকতা কি? সেরূপ স্থলে, একলব্যের মত খড়ের মূর্ত্তি গড়িয়া লওয়াই সঙ্গত হয়। ফলতঃ, শিষ্যকে যদি শুধু নিজের শক্তিতেই তরিতে হয়, তাহা হইলে গুরুর প্রয়োজনীয়তা কদাপি স্বীকার করা যায় না। সেরূপ স্থলে, তাঁহার খড়ের দ্রোণ হইয়া থাকাই কর্ত্তব্য, মনুষ্য মূর্ত্তিতে চোখ রাঙাইয়া কাছা ঝাড়িয়া দক্ষিণা আদায় করিতে যাওয়া তাঁহার কর্ত্তব্য নহে। পক্ষান্তরে, মহাভারতেও, একলব্য শুধু একজনই আছেন। ভীষ্ম কর্ণ ভীমার্জ্জুন, ইহাঁদের সংখ্যাই সমধিক। আবার, একলব্য যে প্রতীক রচনা করিয়াছিলেন, তাহাও যেমন-তেমন অযোগ্য গুরুর নহে। সুযোগ্য দ্রোণের মত গুরুর মূর্ত্তি বলিয়াই সে মূর্ত্তি তাঁহার সকল উৎসাহের কারণ হইয়াছিল। ফলতঃ, আমরা বর্ত্তমান সময়ে সাধারণতঃ যে সকল গুরু দেখিতে পাই, তাঁহাদের মধ্যে যথার্থ গুরু-পদবাচ্য ব্যক্তি অতি অল্পই আছেন। এরূপ গুরু ভক্তির পাত্র নহেন, তাহা বলাই বাহুল্য।

* * *

যে গুরুর সেবায় ভগবানেরই সেবা করা হয়, সেই গুরুরই যখন এই প্রকার অধঃপতিত অবস্থা, তখন মানবের মনে স্বভাবতঃই এই প্রশ্নের উদয় হইল, গুরুর সেবায় সত্যই কি ভগবানেরই সেবা করা হয়?

মনে করুন, সূর্য্য ঈশ্বর, চন্দ্র অবতার। সূর্য্যের দিকে তাকায়, সাধ্য কাহার? কিন্তু এই সূর্য্যেরই আলো আবার উপভোগ্য হয়, চন্দ্রে প্রতিফলিত হইয়া। এই ধার-করা আলো দেখিয়া মূর্খেরা বলে,—ইহা চন্দ্রের আলো। কিন্তু জ্ঞানীরা জানেন, উহা সূর্য্যেরই আলো। চন্দ্রের নিজের কোন আলোক নাই। অবতারেরও নিজস্ব কিছুই নাই, অবতারও ঈশ্বরেরই। কিন্তু তাই বলিয়া সূর্য্যের আলো কেবল চন্দ্রই পায় না। তবে, চন্দ্র আমাদের অধিক নিকটবর্ত্তী বলিয়া আমরা চন্দ্রেই অধিক আলো প্রতিফলিত দেখিতে পাই। অতএব, উপযোগিতায় চন্দ্রই আমাদের নিকটে বড়, বড়ও জোর এই পর্য্যন্তই বলা যায় (১)। কিন্তু চন্দ্রই সূর্য্য, একথা বলা সঙ্গত হয় না।

* * * সময়ের কোন মাপ জোখ নাই, তবুও কাজ কর্ম্মের সুবিধার জন্য আমরা সময়ের একটা মাপ জোখ করিয়া লই—ঘড়ির সাহায্যে; সকল ঘড়িই যে ঠিক, তাহা

(১) জগতের সর্ব্ব পদার্থেই ঈশ্বর বিদ্যমান। তবে, জীবাদি তাঁহার সামান্য এবং অবতার তাঁহার অসামান্য প্রকাশ, এই মাত্রই সাধারণ মানব এবং মহাপুরুষের মধ্যে যাহা কিছু পার্থক্য।

নহে। পোষ্ট অফিসের ঘড়ি, যেগুলিকে আমরা ঠিক সময় রাখে বলিয়া মনে করি, সেগুলিও বস্তুতঃ যথার্থ ঠিক সময় রাখে না, রাখিতে পারে না। তবে, আমাদের কাজ-কর্ম্ম চালাইবার জন্য ঐগুলিই যথেষ্ট। * * * নীল বর্ণ বলিতে যাহা বুঝায়, তাহাই ঈশ্বর। আর, নীলবর্ণের বস্তু বলিতে, যাহা বুঝা যায়, তাহাই জীবাদি অনন্ত পদার্থ। নীলবর্ণ বলিতে একটি বর্ণ বুঝায়। কিন্তু নীলবর্ণের বস্তু বলিতে অনেক বস্তু বুঝায়। তবে, যত যত অগণিত নীল বস্তু আছে তাহার মধ্যে "নীলমণি" (শ্রীকৃষ্ণ) সর্ব্বোত্তম, "নীলমণি" নীলবর্ণের আদর্শ অর্থাৎ ভগবানের আদর্শ অবতার পুরুষের। ইহাঁদিগকে দেখিলে ভগবানের স্বরূপ অনেকাংশে হৃদ্গত হয়, এইমাত্র। * * * ফ্রেঞ্চ নেশন কি?—ইনি ফ্রেঞ্চ নেশনের একজন, কিন্তু ফ্রেঞ্চ নেশন নহেন, এইরূপ বিচার করিতে করিতে শেষে ফ্রেঞ্চ নেশন বলিয়া কিছুই থাকে না। কম্বলের লোম বাছিতে বাছিতে পরিশেষে কম্বল বলিয়া কোন বস্তই পাওয়া যায় না। ফলতঃ, ফ্রেঞ্চ নেশন আর কিছুই নহে, ফরাসীয় ব্যক্তিগণের সমষ্টি মাত্র। নেপোলিয়ান ফ্রেঞ্চ নেশনের প্রধানতম ব্যক্তি মাত্র, কিন্তু তিনি ফ্রেঞ্চ নেশন নহেন। ফ্রান্সবাসীরা যদি না থাকেন, তবে নেপোলিয়ান একাকী কি করিতে পারেন? বস্তুতঃ, নেপোলিয়ান ফ্রেঞ্চ নেশনের আদর্শ মাত্র। অবতারের সঙ্গে ভগবানের সম্বন্ধও এই প্রকার।

সুতরাং চন্দ্রকে সূর্য্য বলিয়া, পোষ্ট অফিসের ঘড়িকে সময় বলিয়া, নীলমণিকে "নীলবর্ণ" বলিয়া ধারণা করিলে যেমন সত্যেরই অপলাপ করা হয়, শুধু নেপোলিয়ানের সেবা করিলে যেমন সমস্ত ফ্রান্সবাসীরই, অতএব ফ্রেঞ্চ নেশনেরই সেবা করা হয় না, সেইরূপ অবতারও যখন ঈশ্বরেরই অংশ বিশেষ, তখন শুধু এক অবতারের সেবায় সমগ্র ঈশ্বরেরই সেবা করা হয়, এইরূপ মনে করাও সঙ্গত হয় না। * * * অধিক দূর যাইবার প্রয়োজন নাই, এই ভক্তবাদের প্রতিষ্ঠাতা বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রবর্ত্তক স্বয়ং শ্রীচৈতন্যদেবেরই ভাত নির্দ্দেশ—জীবের তিন কর্ত্তব্য, "জীবে দয়া", "নামে রুচি", "বৈষ্ণবসেবন"। জীবে দয়া—লোকসেবা। বৈষ্ণবসেবন—ভক্ত, গুরু, অবতারের সেবা। সুতরাং শুধু গুরুসেবায় মানবের সর্ব্বার্থসিদ্ধি হয় না।

গুরুর ঈশ্বরত্ব সম্বন্ধে মানবের চিত্ত যখন এই প্রকার সন্দিহান; বর্ত্তমান যুগের তথাকথিত সাধু, গুরুরা যখন যথার্থ সাধু গুরুদের বিশ্বহিতার্থে প্রাপ্য সুযোগ অন্যায় ভাবে অপহরণ করত দুঃস্থদের দুর্দ্দশাভার বর্দ্ধিত করিতে প্রবৃত্ত, তখন রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ (২) আসিয়া প্রচার করিলেন "দরিদ্র নারায়ণ"বাদের—সন্ধান দিলেন সেবা-ধর্ম্মের উচ্চতর সোপানের—সুযোগ দিলেন ঈশ্বরকে আরও ভাল করিয়া সেবা করিবার। তাঁহাদের এই "দরিদ্র নারায়ণ"বাদ বস্তুতঃ কোনও নূতন সত্য নহে; উহা চৈতন্যদেবের "জীবে দয়া"ই যুগোপযোগী নব সংস্করণ। ফলতঃ, তাঁহার "জীবে দয়া" সম্যক্ পরিপক্বতা লাভ করত পরিণামে যাহা হইয়া দাঁড়ায়, তাহাই বিবেকানন্দের "দরিদ্র নারায়ণ" সেবা। সুতরাং একজন যাহা জ্ঞানতঃ করিতে বলিয়াছেন, অন্যজন অজ্ঞানেই তাহার সূচনা করিবার উপদেশ দিয়াছিলেন, উদ্দেশ্য,—অজ্ঞ মানব আপাততঃ জীব মাত্র জ্ঞানেই 'জীবে দয়া' করিতে আরম্ভ করুক, শেষে কর্ম্ম করিতে করিতে তাহার জীবে শিবজ্ঞানের উদয় আপনিই হইবে। দয়া তখন সেবা হইয়া যাইবে। বস্তুতঃও, সিদ্ধ সাধকের যখন আমিত্বগন্ধলেশশূন্য সম্পূর্ণ নিষ্কিঞ্চন পরমপ্রেম ঘন অবস্থা লাভ হয়, তখন স্বতঃই—অহেতুক ভাবেই তাঁহার কর্ত্তব্য হইয়া দাঁড়ায়, দরিদ্রের সেবা, কেননা, দরিদ্রকে তখন তিনি নারায়ণেরও অধিক (মূর্ত্তনারায়ণ) বলিয়া (৩) অর্থাৎ নারায়ণকেই দরিদ্র বলিয়া জানিতে সমর্থ হন। বঙ্কিমচন্দ্রের ভিখারিণী কন্যা "রাধারাণী" যাঁহাকে একদিন সামান্য পথিক এবং পথিকমাত্র বলিয়াই মনে করিয়াছিল, পরে সে তাঁহাকেই ভূস্বামী—ঐশ্বর্য্যের স্বামী এবং পরিশেষে তাঁহাকেই আবার হৃদয়ের স্বামী—

(২) রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ বস্তুতঃ পৃথক্ নহেন। একজন আধেয়, অন্যজন আধার। একজন প্রাণ, অন্যজন দেহ। দুয়ে মিলিয়া এক ইঁহারা। ইঁহাদের পৃথক্ অস্তিত্ব নাই।

(৩) কেন না, দরিদ্রের মধ্যে নারায়ণ আছেন, কিন্তু নারায়ণের মধ্যে দরিদ্র নাই। নারায়ণ স্বয়ং পূর্ণ, সুতরাং তাঁহার সেবা করা যায় না। কিন্তু দরিদ্রকে সেবা করিয়া তৃপ্ত হওয়া যায়।

দরিদ্র = নারায়ণ—তাঁহার সেবা লইবার ক্ষমতা।

নারায়ণ – দরিদ্র—তাঁহার সেবা লইবার ক্ষমতা।

পতি রূপে পাইয়া কৃতার্থ হইয়া গিয়াছিল। তাহার প্রকৃত নারীজীবনের আরম্ভ হইয়াছিল সেই দিনই—যেদিন সে সামান্ত ভিখারিণী কন্তামাত্র অথবা ভূস্বামীর পরিচারিকা অথবা অনুগৃহীতা মাত্র না হইয়া স্বামীর ঘরণী হইতে হইয়াছিল। (৪) ফলতঃ, শ্রীচৈতন্যদেবে যে "জীবে দয়া" তরু অঙ্কুরিত হইয়াছিল, বিবেকানন্দে তাহা পল্লবিত ও পুষ্পিত হইয়া মহামহীরুহরূপে পরিণত হইল। বৈষ্ণবধর্ম্মে ভক্তবাদের অধিক বিকাশ হয়, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ধর্ম্মে হইল দরিদ্র নারায়ণবাদের অধিক বিকাশ। সে সময়ে ছিল "বৈষ্ণবসেবন", কিন্তু "জীবে দয়া", এইরূপে কিন্তু জীবসেবা হইয়া দাঁড়াইল "বৈষ্ণব সেবনেরও" অধিক * * মরুপের পান্থপাদপ যেমন ভীষণ মরুভূমির অস্তিত্বেরই সূচনা করিয়া দেয়, সেইরূপ, বিবেকানন্দের এই যে দরিদ্রকে নারায়ণ বলিয়া ঘোষণা করা, ইহাই—চৈতন্যদেবের সময়ের অপেক্ষাও জীবের অবস্থা আজ যে আরও অধিক শোচনীয়, এই কথাই প্রমাণ করিয়া দেয়। সুতরাং দরিদ্রসেবার প্রয়োজন আজ যে কত অধিক, তাহা সহৃদয় ব্যক্তি মাত্রেরই ভাবিয়া দেখিবার বিষয়।

যাহা হউক, এই যে নূতন দরিদ্রনারায়ণবাদ, ইহা ভারতীয় সেবাধর্ম্মেরই অন্যতম বিশিষ্ট রূপ।

(ক্রমশঃ)

(৪) সেবকের তিন অবস্থা—সামান্ত, প্রবর্ত্তক এবং সিদ্ধ অবস্থা। সামান্ত সেবক তমোগুণী সাধক। জীব তাঁহার দয়ার পাত্র মাত্র। প্রবর্ত্তক সাধক রজোগুণী, আত্মমুক্ত্যন্বেষী। তাঁহার সাধ্যতাই শিব সর্ব্বাভীষ্টপ্রদ ষড়ৈশ্বর্য্যশালী স্বয়ং নারায়ণ। তিনি পরিচারক মাত্র। সিদ্ধ সাধক সত্ত্বগুণী, নিষ্কিঞ্চন। জীব তাঁহার নিকটে মূর্ত্ত শিব।—তাঁহার সেবার্থী। তিনি প্রেমিক।

চৈতন্যদেবের "জীবে দয়া" বাণীর সাধনা করত সামান্ত সেবক প্রবর্ত্তকের পদবাতে উন্নীত হন। বিবেকানন্দের দরিদ্র নারায়ণ সেবার সাধনা করিয়া প্রবর্ত্তক সাধক সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকেন। একের সাধ্য শিব, সাধন জীব; অন্যের সাধ্য জীব, সাধন শিব। একটীতে জীব হয় শিব, দরিদ্র হয় নারায়ণ; অন্যটীতে শিব হয় জীব, নারায়ণ হয় দরিদ্র। একের অনুলোম বিচার; অন্যের বিলোম বিচার। একের বিশ্লেষিণী দৃষ্টি; অন্যের সংশ্লেষিণী দৃষ্টি। একের জীবে ও শিবে ভেদ দৃষ্টি, অন্যের অভেদ দৃষ্টি। ইহাই সামান্য ও সিদ্ধ সেবকের মধ্যে যাহা কিছু বিশেষত্ব। প্রবর্ত্তক সাধককে সেবক বলা সঙ্গত হয় না।

ব্যষ্টিতে যাহা সত্য, সমষ্টিতেও তাহাই সত্য। বৌদ্ধ ভারত সামান্যতঃ সেবক ছিলেন,--বৌদ্ধধর্ম্মে জীব ও জগতের স্থান ছিল। শঙ্কর যুগে ভারতে সেবাধর্ম্মের প্রভাব ক্ষুণ্ণ হইয়া গিয়াছিল,—সে সময়ে জীব ও জগৎ মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছিল। চৈতন্যের যুগে আবার সেই সেবাধর্মই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম রূপে পরিগৃহীত আজ। বুদ্ধের ভারতকে সামান্য, শঙ্করের ভারতকে প্রবর্ত্তক এবং চৈতন্যের ভারতকে সিদ্ধ সাধক বলিয়া বর্ণনা করিলে অসঙ্গত হয় না। বুদ্ধ, শঙ্কর ও চৈতন্য—ভারতবর্ষের তিন যুগের তিন জন মহামনিষী—চিন্তারাজ্যের সম্রাট ইঁহারা।

তুমি প্রেমময়।

[শ্রীদেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়]

(১)

মায়ার বন্ধন, মোহের ছলন,
কবে দিবে নাথ ঘুচায়ে;
আর যে পারি না, বাসনা কামনা,
কবে লবে তুমি উঠায়ে?

(২)

আপনা বলিতে, আমারে ছলিতে—
অসার যাহা গো পেয়েছি;
কেড়ে নিবে কবে, জ্ঞানে তৃপ্তি দিবে,
সে আশায় বসে রয়েছি।

(৩)

জানি না সাধনা, ভকতি ভজনা,
বৈরাগী জ্ঞানীর ধারণা;
মন্ত্র, জপ, পূজা, একনিষ্ঠ ভজা,
মোর নাহিক কিছু(ই) জানা।

(৪)

তুমি প্রেমময়, সদানন্দময়,
শুধু প্রেমে তোমায় মেলে;
আঁখিটি মুদিয়া, এ বিশ্বাস নিয়া,
মজেছে অবোধ ছেলে!

বৃষ্টি-জল।

[শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, সাহিত্যবিশারদ]

জলাধিপতি বরুণ দেবতা অনেক কাল নিদ্রাভিভূত থাকিয়া ধরাকে বারিশূন্য করিয়া তুলিয়াছিলেন। সম্প্রতি দেখিতেছি তিনি জাগিয়াছেন; স্থানে স্থানে বারিপাত আরম্ভ হইয়াছে। চতুর্দ্দিকে ভেকের উচ্চ রব শুনিয়া "পেয়ে নব বৃষ্টি-জল, ভেক কুলে কোলাহল"—ইত্যাদি সেই সে কালের কত পুরাতন কবিতা মনে পড়িতেছে। তাই বরষার এই সুদীর্ঘ বেলা কাটাইবার জন্য বৃষ্টি-জল সম্বন্ধে আজ দুই চারি কথা বলিবার ইচ্ছা করিতেছি।

আমরা বৃষ্টির পূর্ব্বে আকাশে যে ঘন কৃষ্ণ মেঘরাশি দেখিতে পাই, তাহা জলীয় বাষ্পের সমষ্টি মাত্র। এই জলীয় বাষ্পের ভাণ্ডার হইতেই বারিপাত হইয়া থাকে।

পৃথিবীর সকল দেশে সমান বারিপাত হয় না। গ্রেট ব্রিটেনে বৎসরে প্রায় ৩০ ইঞ্চি বৃষ্টি হয়। ইংলণ্ডে বাৎসরিক বৃষ্টি পতন গড়ে ৩৩.৭৬ তেত্রিশ দশমিক ছিয়াত্তর, স্কটল্যাণ্ডে ৪৬.৫৬ ছয়চল্লিশ দশমিক ছাপ্পান্ন এবং আয়ার্ল্যাণ্ডে ৩৮.৫৪ আটত্রিশ দশমিক চুয়ান্ন ইঞ্চি মাত্র।

আমাদের দেশের মধ্যে আসাম অঞ্চলেই বেশী বৃষ্টি হয়। ঐ অঞ্চলের কোন কোন স্থানে বৎসরে ৪০০ ইঞ্চিরও অধিক বৃষ্টি পড়ে। খসিয়া পর্ব্বতে সম্বৎসরে ৬০০ ইঞ্চি পর্য্যন্ত বারিপাত হইতে শুনা যায়।

পৃথিবীর কোন কোন অংশে বৃষ্টি কদাচিৎ পতিত হয়। সাহারা মরুভূমিতে ও অষ্ট্রেলিয়ার মধ্যবর্ত্তী কতিপয় স্থানে বৃষ্টি একেবারে হয় না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

গ্রীষ্মপ্রধান দেশে সাধারণতঃ অধিক পরিমাণে বৃষ্টি হয়; কারণ, ঐ সকল স্থানের নদ-নদী হইতে অনেক জল বাষ্পাকারে উড়িয়া মেঘের সৃষ্টি করে। বিষুব রেখা (Eqator) হইতে আরম্ভ করিয়া মেরু প্রদেশের (Poles) দিকে যতই অগ্রসর হওয়া যায়, ততই বৃষ্টির স্বল্পতা দেখিতে পাওয়া যায়।

ঋতু-ভেদেও বৃষ্টি পতনের হ্রাস-বৃদ্ধি লক্ষিত হয়। পারিস সহরে শীতকালে ৪.২ চারি দশমিক দুই ইঞ্চি বৃষ্টি পাত হয়, কিন্তু নিদাঘ কালে ঐ স্থানে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ৬.৩ ছয় দশমিক তিন ইঞ্চি।

বৃষ্টি-জলের এই মাপ নির্ণয় করিবার এক প্রকার যন্ত্র আছে। ঐ যন্ত্রের নাম "রেন্ গেজ্" (Rain-gauge)। ঐ যন্ত্র বিবিধ আকারের হইতে পারে। "রেন্ গেজে" বৃষ্টির মাপ এক ইঞ্চি হইলে প্রতি একার (কিঞ্চিদধিক ৩ বিঘা) জমিতে জলের পরিমাণ একশত এক টন্ (ton) হয়।

বারিপাতের মাপ (measure) এবং জমির ক্ষেত্রফল জানা থাকিলে আমরা নিম্নলিখিত উপায়ে অতি সহজে জলের পরিমাণ (amount) স্থির করিয়া লইতে পারি :—

$$\frac{\text{যত ইঞ্চি বৃষ্টি হইয়াছে} \times ১৪৪ \times \text{জমির বর্গফুট}}{১৭২৮}$$

= কিউবিক্ ফুট জল।

এক কিউবিক্ ফুট জলের ওজন ৬.২৩ গ্যালন।

ভূপৃষ্ঠে যে জল পতিত হয় তাহার কিয়দংশ তথা হইতে বাষ্পাকারে বায়ুতে মিশিয়া যায়; কিছু মাটীর ছিদ্র পথ দিয়া মৃত্তিকা গর্ভে প্রবেশ করে এবং অবশিষ্টাংশ নদী, হ্রদ ও তড়াগাদিতে যাইয়া সঞ্চিত হয়।

বায়ুর গতি, তাপ ও শুষ্কতার তারতম্যানুসারে জল অল্প বা অধিক পরিমাণে বাষ্পাকারে পরিণত হয়। মৃত্তিকা গর্ভে জল শোষণ কার্য্যটীও নিম্নলিখিত কারণগুলির উপর নির্ভর করে :—

(১) বৃষ্টির বেগ।

(২) জমির দৃঢ়তা, ছিদ্রবহুলতা ও সমতলত্ব।

(৩) জমির উপরিস্থ উদ্ভিজ নিচয়ের সংখ্যা ও প্রকৃতি।

(৪) ভূপৃষ্ঠে স্বাভাবিক ও কৃত্রিম পয়ঃপ্রণালীর অবস্থিতি।

বালুকা ও কঙ্করময় ভূমিতে শতকরা ৯০ ভাগ, খড়ি-মাটীতে ৪০ ভাগ এবং লাইম-ষ্টোনে (Lime-stone) ২০ ভাগ জল শোষিত হইতে পারে।

পার্ব্বত্য দেশে (Hilly districts), যে স্থানে জল কিছুমাত্র দাঁড়াইতে পারে না—সহজেই নিকাশ হইয়া যায়—তথায় অতি অল্প পরিমাণে বৃষ্টির জল মৃত্তিকাগর্ভে প্রবেশ করে। কর্দ্দমময় স্থানে এই জল একেবারেই শোষিত হইতে পারে না বলিলেই হয়।

নদ-নদী হইতে কত জল বাষ্পাকারে আকাশে উঠিতেছে তাহার হিসাব রাখা দুঃসাধ্য। তবে এ সম্বন্ধেও Tudsbery এবং আরও কয়েক জন পণ্ডিত ১৪ বৎসরের একটী হিসাব রাখিয়াছিলেন। তাঁহারা দেখিয়াছেন ঐ ১৪ বৎসরের মধ্যে ৩ বৎসর, যতটুকু জল বাষ্পাকারে পরিণত হয়, বৃষ্টিপাত তদপেক্ষা কম হইয়াছিল।

যে কয়েকটী হ্রদ হইতে বোম্বাই নগরীতে জল সরবরাহ করা হয়, সেই সকল জলাশয় হইতে ৮ মাসে (যে সময়ে বৃষ্টি কম হয়) কত জল বাষ্প হইয়া চলিয়া যায়, তাহারও একটী হিসাব দেখান যাইতে পারে :—

বিহার হ্রদ ১৭০০০০০০০০ গ্যালন।
তুলসী ,, ২৫০০০০০০০ ,,
তান্‌সা ,, ৫২০০০০০০০ ,,

মোটামুটি হিসাবে আমরা বৃষ্টি-জলের দশ ভাগের ছয় ভাগ ব্যবহারের জন্য পাইতে পারি। তবে এই জল ব্যবহার সম্বন্ধে কয়েকটী অসুবিধা আছে ; যথা—

(১) ইহা সর্ব্বদা পাওয়া যায় না।

(২) এই জল তত সুস্বাদু নহে।

(৩) এই জল স্বভাবতঃ বিশুদ্ধ হইলেও যে স্থানে পতিত হয় তাহার উপরই ইহার পবিত্রতা নির্ভর করে।

পানের জন্য বৃষ্টির প্রথম অবস্থার জল প্রশস্ত নহে। ঐ জলে বায়ুমণ্ডলস্থ ভাসমান ধূলিকণা ও নানা প্রকার দূষিত পদার্থ মিশ্রিত থাকে।

ছাদের জল ধরিয়া পান করাও অনুচিত। ইহাও অনেক সময় ধূলা, জীর্ণগুল্মাদি ও পাখীর বিষ্ঠা প্রভৃতি দ্বারা দূষিত হয়।

বড় বড় সহরে, যে স্থানে অনেক কল কারখানা আছে এবং যেখানে প্রচুর পরিমাণে কয়লা পোড়ান হয়, সেখানে বৃষ্টির জলে "এমোনিয়াম্ কার্ব্বনেট্" (ammonium carbonate) "নাইট্রাইট্" (nitrite) "নাইট্রেট্" (nitrate) "নাইট্রাস্" (nitrous) "নাইট্রিক এসিড" (nitric acid) "সাল্‌ফিউরাস্" (sulphurous) এবং "সাল্‌ফিউরিক্ এসিড" (sulphuric acid) প্রভৃতির অংশ থাকিতে দেখা যায়।

সমুদ্রের নিকটবর্ত্তী স্থানে বৃষ্টির জলে সচরাচর লবণাংশই (sodium cloride) দেখিতে পাওয়া যায়।

বৃষ্টির জল যতই ভূপৃষ্ঠের নিকটবর্ত্তী হইতে থাকে ততই উহা শূন্যে ভাসমান উদ্ভিজ্জাণু (bacteria), সূক্ষ্ম খড়-কুটা, চুল, জীব জন্তুর মল ও বালুকণা সকলকে টানিয়া লয়।

বৃষ্টির জলে "এমোনিয়া" (amonia) বিদ্যমান থাকায় উদ্ভিজ্জাণুগুলি (bacteria) ঐ জলে শীঘ্র শীঘ্র বংশ বৃদ্ধি করিতে থাকে। এই কারণে ঐ জলও ফিল্টার করিয়া পান করা উচিত।

গ্রেট ব্রিটেনে বৃষ্টির জল সাধারণতঃ তথাকার কূপজল ও ঝরণার জল অপেক্ষা অপবিত্র। কারণ, সহরের ধূম, ধূলা, দুর্গন্ধময় দূষিত বায়ু প্রভৃতি ঐ জলের বিশুদ্ধতা নষ্ট করে।

এইবার বৃষ্টির জল ব্যবহার সম্বন্ধে আমাদের আর একটী কথা স্মরণ রাখিতে হইবে। বড় বড় কারখানাওয়ালা সহরগুলির নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহে বৃষ্টির জল সর্ব্বদাই অম্লগুণবিশিষ্ট ; সুতরাং ঐ জল সীসা, দস্তা ও কলাইকরা লৌহাদির পাত্রে সঞ্চিত রাখা উচিত নহে। প্রস্তর-পাত্রই এই স্থলে ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। যদি সংগৃহীত জলের পরিমাণ অল্প হয় তাহা হইলে মৃৎপাত্রই উত্তম।

বড় "ট্যাঙ্ক" (tank) বৃষ্টির জল ধরিয়া রাখিতে হইলে ট্যাঙ্কটী ইষ্টক দ্বারা নির্ম্মিত করিয়া "হাইড্রলিক সিমেণ্ট" (Hydraulic cement) দ্বারা উত্তম রূপে আচ্ছাদিত (lined) করা আবশ্যক। ঐ বৃহৎ জলাধারে যাহাতে বাহিরের জল অথবা বৃষ্টির প্রথম অবস্থার জল প্রবেশ করিতে না পারে, তদ্বিষয়ে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে। এই জলও ফিল্টার করিয়া পান করা উচিত।

অদৃষ্টের খেলা।

[শ্রীমতী রাধারাণী ঘোষ]

স্বামীকে তার মনে পড়ে না। যার অভাবে তার সমস্ত জীবন শূন্য—সে কে, তা সে জানে না, তবুও স্বামীর স্মৃতিতে, স্বামীর ধ্যানে সে হৃদয় পূর্ণ ক'রে রাখতে চায়। এ যে বঙ্গবালার আজন্ম শিক্ষা, চিরন্তন সংস্কার। তা ভাল কি মন্দ, ন্যায় কি অন্যায়, পাপ কি পুণ্য, সে তর্ক পর্য্যন্ত তার মনে হয় না। অনেক দিনের ভুলে-যাওয়া সুখ স্বপ্নের মত কখনও কখনও বিয়ের কথা মনে পড়ে, সঙ্গে সঙ্গে একটি ছায়াময় সতেরো বছরের তরুণ মূর্ত্তি হৃদয়পটে প্রতিভাত হ'য়ে ওঠে।

* * *

বিয়ের রাতে বরযাত্রদিগের প্রতি কি একটা ত্রুটীর জন্য বরের বাপের মাথা গরম হ'য়ে গেল। কনের বাপকে রীতিমত শিক্ষা দেবার জন্যে তিনি বর উঠিয়ে নেবার হুকুম দিলেন। জাত হারাবার সন্ধিক্ষণে কনের বাপের স্থির মস্তিষ্কে একটা বুদ্ধি জুগিয়ে উঠলো। তিনি সভাপ্রাঙ্গণ হ'তে কোন গতিকে বরকে তুলে নিয়ে এসে একেবারে অন্দরমহলের একটা ঘরে চাবি বন্ধ ক'রে রাখলেন। অনেক গোলযোগের মধ্যে কোনও রকমে নীহারের পাণিগ্রহণ হইল।

বরের বাপ ভোর পরদিন পুত্রটিকে শুধু সঙ্গে নিয়ে বাড়ী ফিরলেন। যাবার সময় নীহারের পিতামাতা আত্মীয়-স্বজনের ভীতচিত্তে আরও ভীতির পাষাণ চাপিয়ে দিয়ে বজ্রাপেক্ষা কঠিন কণ্ঠে বলে দিলেন "তিনি এই অভদ্র নীচলোকের মেয়েকে ঘরে নেবেন না, অন্যত্র ছেলের বিয়ে দেবেন।" সেই অবধি সেই সদ্য-পরিণীতা অবোধ বালিকা অনূঢ়া কন্যার মতই আজন্মকাল বাপের ঘরে র'য়ে গেল।

সে আজ সাত বছরের ঘটনা। বাপের বাড়ীর সাজ-সজ্জা, আদর স্নেহের কিছুরই অভাব ঘটাটন না থাকলেও নীহারের মনে সে বাল্যের আর সকল আনন্দের উচ্ছ্বাসটুকু ছিল না। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে যার অভাব সুস্পষ্টভাবে তার প্রাণের ভেতর ফুটে উঠতে লাগল সেই স্বামী কেমন? সেই নারীর ইষ্টদেবতার শ্রীচরণ কি এ জীবনে সে আর দেখতে পাবে না? কোন্ পাপে তার এ দুর্গতির প্রারম্ভ—নারী জীবনের এ নিদারুণ শাস্তি!

(২)

নীহারের মাসতুতো বোন বিভার বিয়ের সংবাদ নিয়ে সেদিন যখন চিঠিখানা তার বাপের হাতে এসে প'ড়লো, তখন তার মা তাকে ডেকে বল্লেন, "নীহার, জামাইবাবু যখন এত ক'রে লিখেছে, তখন আমাদের যাওয়া উচিত, কিন্তু আমার তো যাবার যো নেই, ভুব অসুখ। নলীনকে নিয়ে তুই নয় ক'লকাতায় যা, কি বলিস?"

বিষণ্ণ-হৃদয়া নীহার বরাবর লোকালয়ে নিজের ম্লান মুখখানা বা'র ক'রতে একান্ত কুণ্ঠিতা। মা তাকে চিনতেন, তাই তিনি কন্যার উত্তরের অপেক্ষায় তার দিকে চেয়ে রইলেন। আজও বুঝি সে সেইরূপ আপত্তি তুলে বসে। এই অনাথা মেয়েটাকে তো কোন দিনই তাঁরা তাঁদের আদেশে চ'লতে বলেন নি। তাঁরা প্রাণপণে তাকে সুখে রাখতেই সচেষ্ট। নীহার অনেকদিন বিভা'কে দেখেনি; সে তাহার বাল্য-সঙ্গিনী; তার সঙ্গে দুটো মনের কথা ব'লে বুকটা অনেকটা হাল্কা হ'তে পারে ভেবে, নীহার সহজেই মার কথায় রাজী হ'ল।

তার ছোট ভাই নলীনকে নিয়ে যথাসময়ে সে মাসিমার বাড়ী এসে উপস্থিত হ'ল। গায়ে হলুদের দিন বিকেল বেলা বিভাকে নিয়ে সঙ্গে ক'রে যখন সে ছাতের ওপর বসে মনের মত ক'রে তার চুল বেঁধে দিচ্ছিল সেই সময় মাসিমা সেখানে এসে বল্লেন, "তোর দাদা এসেছে বিভা—আসছে এখানে!"

নীহার তাড়াতাড়ি সেখান থেকে সরে' পড়বার উপক্রম ক'রতেই বিভা তাকে টেনে বসিয়ে বল্লে, "অত লজ্জা করবার কিছু নেই এতে নীহার দি। লালুদা' ত একটা বাঘ, ভালুক নয়।" সুনীতিও একটু হেসে বল্লেন, "রাখ্ বাপু তোর লজ্জা, লালু আবার একটা মানুষ, তাকে দেখে পালাবি কেন ?"

"কইরে বিভা" বলে লালুও ঠিক সেই সময়ে সামনে এসে দাঁড়াল। "দেখ দেখি বিভা, এগুলো তোর পছন্দ হয় কি না ?" বলতে বলতে সে কয়েকখানি উপহারের বই বার ক'রে বিভার হাতে দিল। "এই নে, এইটে দেখ দিকি।" নীল ভেলভেটের বাক্স করা একটা রিষ্টওয়াচ বইগুলোর ওপর রেখে সে সামনে বসে প'ড়ল।

"এ সব কেন লালু তোর ?"

"এ আর বেশী কি কাকিমা" বলেই লালু বিভাকে একটা ধমক দিয়ে বল্লে, "নে-না রে, হাতে পর্না, লজ্জা কাল বর এলে করিস এখন।"

বিভা সলজ্জভাবে বাক্সটা হাতে তুলে নিয়ে বল্লে, "খুব পছন্দ হ'য়েছে লালুদা,— বেশ জিনিষটা।"

"হাতে পর্না।"

"দাও ত নীহারদি পরিয়ে হাতে—"

লালু নীহারের দিকে চাইতেই তার মুখখানা লজ্জায় লাল হ'য়ে উঠল। সুনীতি নীচে চলে যাচ্ছেন দেখে লালু জুতোটা পায়ে দিতে দিতে বল্লে, "ওঃ বড্ড ভুল হ'য়ে গেছে। দোকানে আর একটা জিনিষ ভুলে এসেছি" বলে সেও নীচে চ'লে গেল।

যথাসময়ে বিবাহের উৎসব মিটিয়া গেল। বিভাও শ্বশুরবাড়ী থেকে ফিরে এলো।

নীহার পান সাজতে সাজতে বল্লে, "মাসিমা, অনেক-দিন বাড়ী ছেড়ে এসেছি, কবে যাব ?"

সুনীতি কুটনো কুটছিলেন। বটিখানা কাত ক'রে রেখে গালে হাত দিয়ে বল্লেন, "সে কিরে নীহার, আমি যে আজ একখানা চিঠি লিখে দিলাম তোকে আরো দু' সপ্তাহ রাখবার জন্যে। আর বিভাও তোকে পেয়ে যেন বেঁচেছে।"

নীহার ঘাড় হেঁট ক'রে বসে রইল। বাড়ীতেও তার কি ভাল লাগে ? জীবনে ভাল লাগবার—সবটাই যে শুকিয়ে মরে গেছে ! সেখানে কেউ নেই, এখানে তবু বিভা আছে।

কলঘর থেকে বিভা চেঁচিয়ে উঠল, "নীহারদি, শীগ্গীর এসো, কেমন মজা শীগ্গীর—"

নীহার তখনকার মত চিন্তার স্রোতটাকে চাপা দিয়ে উঠে পড়ল।

(৩)

মুহূর্ত্তের মত ক্ষণস্থায়ী অতি ক্ষুদ্র এক সপ্তাহ। কিন্তু এই এক সপ্তাহেই লালুর হৃদয় কি এক অভিনব মধুর অভিজ্ঞতায়, কি অসীম সুখ হিল্লোলে চঞ্চল হ'য়ে উঠল। কে জানে কোথা দিয়ে কেমন ক'রে তার দিনগুলো কাটছিল।

নীহার পাড়াগাঁর মেয়ে, কলকাতায় সে খুব কমই এসেছে। এইজন্যে সুনীতি তাকে প্রায়ই মিউজিয়ম, জুগার্ডেন, বায়স্কোপ, থিয়েটার ইত্যাদি সব দেখাতেন। লালুও এদের সঙ্গে থাকত। নীহার কিন্তু কোন দিন তার দিকে পূর্ণ দৃষ্টিতে চাইতে পারে নি। অসাবধানে কখনও যদি লালুর চোকের ওপর চোক পড়'ত, অমনি তার মুখ-খান সঙ্কোচ ও লজ্জায় নত হ'য়ে পড়'ত। এই চকিত দর্শনে তার হৃৎপিণ্ডের শোণিত রাশি এমন বেগে ওঠা নামা ক'রত যে, তার মনে হ'ত সে শব্দ যেন লালুর কাণে গিয়ে পঁহুচাচ্ছে। নীহারের প্রাণ মন শত ধিক্কারে ভ'রে যেত। ছিঃ ছিঃ কি লজ্জা, কি দুর্ব্বলতা!

সে দিন দুপুর বেলা খাওয়ার পর বিভা মাকে বল্লে, "আজ পরেশনাথের বাগান দেখতে গেলে হয় না ?"

সুনীতি বল্লেন, "কে নিয়ে যাবে এখন, লালু ত আজ পাঁচটার গাড়ীতে আসাম চ'লে যাবে।"

"তা আজকের দিনটা লালুদা নয় থাকুন না।"

"তাকে বলে দেখ্ যদি থাকে, আমি ততক্ষণ একটু শুয়ে নিই।"

মা চ'লে যাবার পর বিভা লালুর ঘরে এসে দাঁড়াল। সে তখন তার চামড়ার সুটকেশটার কাছে বসে জিনিষ গুলো গুছিয়ে নিচ্ছিল।

লালু মুখ তুলে বল্‌লে, "কি রে বিভা?"

বিভা একটা ঢোক গিলে বল্লে, "তুমি কি আজই যাচ্ছ?"

"হ্যাঁ"।

বিভা একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে সেইখানেই বসে প'ড়ল।

লালু জিনিষ গুলো গোছাতে গোছাতে বল্লে, "তোর মতলবটা কি বল ত শুনি?"

বিভা একবার ছাদের দিকে চেয়ে বল্লে, "যখন কথা থাকবেই না তখন আর বলে কি হবে?"

লালু একটু গম্ভীর হ'য়ে বল্লে, "বলে দেখলে বিচার করে দেখতে পারি।"

বিভার মুখ প্রফুল্ল হ'য়ে উঠল। সে এইবার খাটের ওপর বসে পা দুলিয়ে দুলিয়ে বল্লে, "নীহারদি কখন পরেশ-নাথ দেখেনি, আজ ইচ্ছে ছিল সকলে দেখতে যাবো তোমায় নিয়ে।"

লালুর মুখখানা আরো গম্ভীর হ'য়ে গেল।

বিভা আর থাকতে না পেরে বল্লে, "বাবা—বাবা, মচ্‌কাবে তবু ভাঙ্গবে না। বেশী বুদ্ধি খাটাতে গেলে কি হবে জান ত?"

"তোকে আর লেক্‌চার দিতে হবে না" বলে লালু নীচে চ'লে গেল। হাতে একখানা টেলিগ্রামের ফর্ম্ম। বিভা হাততালি দিয়া বলে উঠ্‌ল, "বুঝেছি বুঝেছি—"

(৪)

সারাদিন পরেশনাথের বাগানে ঘুরে যখন তারা বাড়ী ফির্‌ল তখন সন্ধ্যে হ'য়ে গেছে। আকাশের গায়ে দু' একটা উজ্জ্বল তারা উঁকি মারছে।

বিভা ব্লাউস খুল্‌তে খুল্‌তে বল্লে, "ধন্যি ভাই নীহারদি। এই যে সারা বেলাটা আমরা ঘুরলাম, তোর মুখে একটিও কথা নেই। খুব সহ্য তোর।"

নীহার জলভরা চোখে বল্লে, "ভগবান যে ছোট্ট বেলা থেকে সহ্য কর্‌বার মতন করেই গ'ড়ে তুলেছেন ভাই।" বিভার চোখ সজল হ'য়ে এলো। কি একটা কথা বল্‌তে গিয়ে হঠাৎ থেমে তাড়াতাড়ি নীচে নেমে গেল।

রাত্রিতে শোবার সময় নীহার দরজায় খিল দিয়ে অতি যত্নে আস্তে আস্তে তার স্বামীর ফটোখানি বার ক'রে ভাল ক'রে দেখলে। যতই সে দেখতে লাগ্‌ল ততই তার প্রাণের ভেতর কতদিনের পুরোনো কান্না যেন গুমরে গুমরে উঠ্‌তে লাগ্‌ল। ফটোখানি বুকের ওপর নিয়ে সে বিছানায় শুয়ে পড়্‌ল। পাশের বাড়ীর ঘড়ীতে টং টং ক'রে দশটা বেজে গেল। জানালার ফাঁক দিয়ে একরাশ জ্যোৎস্না এসে বিছানার ওপর লুটিয়ে পড়েছিল। নীহার শুয়ে শুয়ে জীবনের দুঃখময় অধ্যায়টা উল্টে পাল্টে দেখতে লাগ্‌ল।

দরজায় দুম্ দুম্ ক'রে ঘা দিয়ে বিভা ডাকিল —নীহারদি।

নীহার তাড়াতাড়ি ফটোখানা বালিশের তলায় রেখে দোর খুলে দিয়ে বল্লে, "কি?"

"দোরটা খোলা রাখিস্ ভাই, আমি খানিকক্ষণ বাদে এসে তোর কাছে শোব।"

বিনা বাক্যব্যয়ে নীহার দরজা খোলা রেখে আস্তে আস্তে এসে বিছানায় শুয়ে পড়্‌ল। পাশের বাড়ীর রজনী-গন্ধা ফুলের গন্ধ তার মাথায় গায়ে যেন স্নেহের পরশ বুলিয়ে দিচ্ছিল।

ভোরের বেলা হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে চমকে জেগে উঠে দেখ্‌লে লালু তার শয্যার সঙ্গে মিশিয়ে তার পাশে দাঁড়িয়ে আছে। তার দৃষ্টি মুগ্ধ মধুর, অধরে আনন্দ হাস্য। মানুষ যে এত সুন্দর হ'তে পারে তা এই সব-প্রথম তার চোকে পড়ল।

বিস্ময়ের ঘোরটা কেটে গেলে নীহার লজ্জা সঙ্কোচ কাটিয়ে ধড়মড়িয়ে উঠে পড়ে বল্লে, "আপনি এ সময়ে এখানে?"

লালু বাঁ হাত থেকে একখানা কাগজে ঢাকা ফ'টো খুলে তার সামনে তুলে ধরলে।

নীহারের মুখখানা ফ্যাকাশে হ'য়ে গেল। সে তাড়া-তাড়ি বালিশের নীচে হাত দিয়ে গত রাতের ফটোখানা পেয়ে একেবারে অবাক হ'য়ে গেল। সকালের ফুরফুরে হাওয়াতেও তার কপালের ওপর বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে উঠল।

লালু একটু হেসে কাছে সরে এসে খাটের ওপর বসে তার পকেট থেকে একখানা গোলাপী রংয়ের কাগজ ফেলে দিয়ে বল্লে, "এই প্রীতি-উপহারেই আমার পরিচয় পাবে নীহার। আমিই তোমার হতভাগ্য স্বামী মণিলাল।"

নীহারের চোকের সামনে বায়স্কোপের ছবির মত বিবাহ রাত্রের সেই মধুর করুণ দৃশ্যটা জল জল ক'রে উঠল। মাথার ভেতর কেমন ক'রতে লাগল। বুকের ভেতরকার হৃৎপিণ্ডটা জোরে জোরে লাফিয়ে উঠতে লাগল। মণিলাল আবেগে তাকে বুকের ওপর টেনে নিয়ে বল্লে—"নীহার, আমার প্রাণের নীহার—"

* * *

"কি লজ্জা ভাই!"

"মরণ আর কি, লজ্জা কিসের ?"

"আমি আর সামনে বেরুতে পারব না ভাই। তোমাদের পেটে পেটে এত ছিল!"

"একটু তারিয়ে না খেলে কি কোন জিনিষের স্বাদ পাওয়া যায় ?"

সুনীতি নীচে থেকে চেঁচিয়ে বল্লেন, "ওরে তোরা নীচে আয়। কলের জল যে চ'লে যাবার জোগাড় হ'ল, কখন নাবি বাপু—"

বাইরের দরজায় কড়া নেড়ে পিয়ন বল্লে, "বাবু তার আছে।" মণিলাল তাড়াতাড়ি গিয়ে তার খুলে পড়ে হাসতে হাসতে বল্লে, "কাকিমা, তারের জবাব এসেছে। বাবা আজই আমাদের আসামে যেতে বলেছেন।"

বিভা ছুটে গিয়ে একটা শাঁক নিয়ে জোরে জোরে তিন বার বাজিয়ে দিলে।

সংগ্রহ ও সঙ্কলন।

বাঙ্গলায় কথা।

(২)

সকল দেশের মত বাঙ্গলা দেশেও লোকের আকাঙ্ক্ষা আছে; বাস্তব জীবনের শত অতৃপ্ত ইচ্ছার ব্যথা এখানেও জমাট বাঁধিয়া নানাভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে, গানে, ছন্দে, কথায়। সেই গান, সেই কাব্য ও কথা বাঙ্গালীর বিশিষ্ট সত্তার পরিচয়, তার বিশিষ্ট আশা আকাঙ্ক্ষার উপর প্রতিষ্ঠিত, কিন্তু বাঙ্গালীর সেই হৃদয়ের ভিতর দিয়া প্রকাশিত হইয়া উঠিয়াছে তার মানব হৃদয়, তাই সে গান ও কথা শুধু বাঙ্গালীর নয়, বিশ্বমানবের।

বাঙ্গলার প্রাচীন কথা রূপকথা, কাব্য, পাঁচালী প্রভৃতি। রূপকথার বিশেষত্ব তার অসাধারণত্ব। শিশু হৃদয়ে অশক্তির গুপ্ত অনুভূতির সঙ্গে সঙ্গে একটা আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠে যাহা অসীম শক্তিশালী, সকল বাধাবিঘ্নাতিক্রমী বীরে, সকল রূপের আধার রাজকন্যায়, সমস্ত প্রাকৃতিক নিয়মের বিপরীত ঐন্দ্রজালিক শক্তির কল্পনায় পরিস্ফুট হইয়া উঠে। রূপকথা এই সব অলৌকিক অসাধারণ চরিত্রের অদ্ভুত কার্য্যকলাপে ভরা। ইহা শিশু-হৃদয়ে ও শিশুপ্রতিম বর্ব্বরের অন্তরে বড় আনন্দ দান করে। যখন মানুষ প্রথম কথা রচিতে শেখে তখন সে প্রাকৃত ও অতি-প্রকৃতের ভিতর কোনও সীমা স্বীকার করে নাই। বরং প্রকৃতির সকল বাঁধ ভাঙ্গিয়া চুরিয়া অলৌকিকের রাজ্যে তাণ্ডব নৃত্য করিয়াই তার কল্পনা আনন্দ লাভ করিয়াছে। কিন্তু যতই মানুষের বয়স বাড়িতে লাগিল ততই কল্পনার এই উদ্দাম ভাব কাটিয়া গেল। শিশুর যে উদ্ভট কল্পনায় আনন্দ হয় পরিণত বয়সে লোকের তাহাতে আনন্দ হয় না, তাই সাহিত্য সৃষ্টির প্রারম্ভে কল্পনা যত উদ্দাম হয় পরিণত অবস্থায় ততটা উদ্দাম হয় না। ক্রমে দেখিতে পাই সমাজের শৈশবের সেই স্বপ্ন পরিণতরূপে নানা পৌরাণিক কাহিনীতে গাঁথিয়া গিয়া পরম্পরাগতভাবে চলিয়া আসিতেছে।

এই সব পৌরাণিক কাহিনী এবং কদাচিৎ বা কোনও বিশেষ কীর্ত্তিমান্ মহাপুরুষের অলৌকিক কাহিনীই পরিণত বয়সের সংস্কৃত কথা সাহিত্যের উপজীব্য। উপাখ্যান

রচনা ইঁহারা ছাড়িয়া দিয়াছেন,, মাত্র কয়েকটী সুপরিচিত কাহিনী লইয়া, সকল কাব্য ও নাটক রচিত হইয়াছে। রামসীতার কাহিনী, মহাভারতের নানা কাহিনী লইয়া কত কবি কত ভাবে আলোচনা করিয়াছেন। পশু পক্ষীর কতকগুলি প্রচলিত কাহিনী, ভোজরাজের কথা, বিক্রমাদিত্যের কথা প্রভৃতি কয়েকটী কথা লইয়া কত না গ্রন্থ, কত না কাব্য রচনা হইয়াছে।

বাঙ্গলার কাব্য ও কথাসাহিত্যেও তেমনি কয়েকটী চিরপ্রচলিত কাহিনীকে নানা কবি নানা ভাবে আঁকিয়াছেন। রাধাকৃষ্ণের কাহিনী, কালিকা বা অন্নপূর্ণার কাহিনী, মনসার কথা প্রভৃতি একই কথা লইয়া কত কবি কত কথা লিখিয়া গিয়াছেন। ধনপতি সওদাগরের কাহিনী এবং বিদ্যাসুন্দরের কথা লইয়া অনেক কবি অনেক পালা লিখিয়া গিয়াছেন। ইঁহাদের মূল কাহিনীতে বৈচিত্র্য খুব অল্পই আছে, কিন্তু সেই মূল কাহিনীর সঙ্গে লতা পল্লব যোগ করিয়া, নানামতে বর্ণনা করিয়া নানা কবি নানা রস সৃষ্টি করিয়াছেন। একই কথাকে নানা কবি নানা ভাবে আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহাদের কল্পনার বিচরণের ক্ষেত্র এইরূপে সঙ্কীর্ণ হওয়ায় তাঁহারা তাঁহাদের প্রতিভা গভীরভাবে (intensively) বিশ্লেষণ করিয়া রস-রচনা করিতেই বেশী মনোযোগ করিয়াছেন। তাই কৃষ্ণের কথা, কালীর কথা, মনসার কথা এমন নানা বিচিত্ররসে ভরপুর হইয়া উঠিয়াছে। আর এই সব কথা আশ্রয় করিয়াই বাঙ্গালীর অন্তর, বাঙ্গালীর নানা আকাঙ্ক্ষা বিচিত্রভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। কেবল খুল্লনা, লহনায় বাঙ্গালী কবি আপনার ঘরের কথা বলেন নাই, ভারতচন্দ্রের তুলিকায় মেনকার ভিতর বাঙ্গলার মা ও পার্ব্বতীতে বাঙ্গলার মেয়ে এমন কি শিব, নারদ, নন্দী সকলের ভিতরই বাঙ্গালী ফুটিয়া উঠিয়াছে।

বাঙ্গলায় কথা-সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছিল দেব দেবীর কথা লইয়া। কিন্তু ক্রমশঃ কথার গণ্ডী বিস্তীর্ণ হইয়া দেব দেবীকে অনেক দূর ছাড়াইয়া গিয়াছিল। ভারতচন্দ্র, অন্নদামঙ্গল লিখিতে লিখিতে লিখিয়া বসিলেন মানসিংহ, লিখিলেন বিদ্যাসুন্দর। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের এক বিপুল প্রশস্তি করিতে গিয়া তিনি বাঙ্গলার প্রথম ঐতিহাসিক উপাখ্যান লিখিয়া বসিলেন।

কিন্তু বাঙ্গলার পুরাতন কথার আদ্যোপান্ত অলৌকিক ও অত্যন্ত অসাধারণ ব্যক্তি ও ঘটনা লইয়া লেখা হইয়াছে। দেব দেবী, রাজা রাজড়া এ সব কাহিনীর নায়ক নায়িকা। এসব উপাখ্যানের বিষয় তাহাদের অদ্ভুত কর্ম্ম যাহাতে কল্পনাকে মাতাইয়া তোলে। সাধারণ লোকের দৈনিক জীবনের হাসিকান্না লইয়া এসব উপাখ্যান রচিত হয় নাই। সে চেষ্টা প্রথম হয় আধুনিক উপন্যাসে।

আধুনিক বাঙ্গলা গদ্য সাহিত্যে গল্প লেখার যে প্রথম চেষ্টা হয় তাহার বিষয় ছিল সংস্কৃত ও আরবী ফারসি অদ্ভুত উপাখ্যান। সে সব গল্পের লেখক ছিলেন সাবেকী লোক; তাঁরা ছিলেন সংস্কৃত, আরবী ও ফারসী সাহিত্য রসজ্ঞ। সম্পূর্ণ আধুনিক ভাবে গল্প রচনার প্রথম চেষ্টা বোধ হয় "আলালের ঘরের দুলাল"। "আলাল" ও এই শ্রেণীর উপাখ্যান, কথা-সাহিত্যে ইংরাজী শিক্ষিত বাঙ্গালীর পথ সন্ধানের চেষ্টা মাত্র। পথসন্ধানীর দল আপনার কাজ করিয়া গেলে সেখানে তুরী ভেরী বাজাইয়া চতুরঙ্গ দলে আসিলেন রাজা—বঙ্কিমচন্দ্র।

বঙ্কিমচন্দ্র ও সেকালের কথা-সাহিত্যের মাঝখানে ছিল একটা প্রকাণ্ড ব্যবধান, আর সে ব্যবধান জুড়িয়া ছিল ইংরেজী কথা-সাহিত্য। বঙ্কিমচন্দ্র যখন লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন তখন এদেশে ইংরাজী কোন্ কোন্ উপন্যাস বিশেষভাবে চলিত ছিল তাহা ঠিক বলিতে পারি না। জনসনের রাসেলাস পাঠ্য ছিল এবং তার একখানা অনুবাদও বাহির হইয়াছিল। Fielding ও Smollettএর বই অনেকে পড়িত। Dickens বা Thackeray তখনও বোধ হয় এদেশে পরিচিত হন নাই। Jane Austenএর গ্রন্থ বিলাতে বিশেষ খ্যাতি লাভ করিলেও বাঙ্গলা দেশে সেকালে বেশী চলিত ছিল বলিয়া মনে হয় না। ঠিক সেই সময়ে এবং তার পর অনেক দিন পর্য্যন্ত ইংরাজী শিক্ষিত বাঙ্গালীর মনকে আচ্ছন্ন করিয়াছিলেন নাটকে সেক্সপীয়ার এবং উপন্যাসে স্কট। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভার প্রথম স্ফুরণ হয় স্কটের ছায়ায়।

স্কটের পূর্ব্বেই ইংলণ্ডে Jane Austen, Edgeworth প্রভৃতির রচনায় Comedy of Manners বা শান্ত সামাজিক কথার পত্তন হইয়াছিল। অলৌকিক, অসাধারণ আদর্শ ব্যক্তির চরিত বা লোমহর্ষণ ঘটনার দ্বারা কৌতূহল উদ্দীপিত করিবার চেষ্টা ছাড়িয়া ঔপন্যাসিক বাস্তব জগতের সাধারণ সহজ ঘটনার ভিতর কৌতূহল পরিতৃপ্তির উপাদানের সন্ধান করিতেছিলেন। Jane Austen এদিকে যে পথ প্রদর্শন করিয়াছিলেন তাহা পরবর্ত্তীকালে আরও পরিসর লাভ করিয়া অনেক ভাগ্যবিপর্য্যয়ের ভিতর দিয়া বর্ত্তমানকালের শান্ত সামাজিক কথায় পরিণত হইয়াছে। কিন্তু ঠিক সেই সময়ে স্কট একখানার পর আর একখানা রোমান্স সৃষ্টি করিয়া, ইতিহাসের অতীত যুগ হইতে অদ্ভুত অসাধারণ চরিত্র, আশ্চর্য্য কৌতূহলোদ্দীপক ঘটনাবলীর সমাহার করিয়া ইংলণ্ডের সাহিত্য সমাজকে এমন করিয়া মাতাইয়া তুলিলেন যে, শান্ত উপন্যাস কিছুদিনের মত চাপা পড়িয়া গেল। স্কট নিজে জেন্ অষ্টেনের ভক্ত ছিলেন, কিন্তু ইংলণ্ডে তাঁহার সময়ে Austen তেমন আদর পান নাই। বঙ্কিমচন্দ্রের সময় বাঙ্গলা দেশেও যে পান নাই তার পরিচয় কমলাকান্ত! কমলাকান্ত বলিয়াছে, "Jane Austen বা George Eliot উপন্যাস লিখিয়াছেন—মন্দ হয় নাই, কিন্তু দুই মালার মাপে।" পক্ষান্তরে Bulwer Lyttonএর উপন্যাসের সে সময় অত্যন্ত খ্যাতি ও বিস্তৃতি ছিল। Lytton, Scottএর শিষ্য এবং তাঁরই পন্থার অনুসরণকারী।

সাধারণ ভাবে একথা বলা যাইতে পারে যে, যখন বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর উপন্যাস লিখিতে আরম্ভ করেন তখন এ দেশের শিক্ষিত সমাজে সেই কথারই বিশেষ খ্যাতি ছিল যাহা আমাদের অদ্ভুতত্ব পিপাসা পরিতৃপ্ত করিতে পারে। "চাহার দরবেশ" বা "হাতেম তাই"ও এই শ্রেণীর উপন্যাস, কিন্তু ইহা শিক্ষিত সমাজকে তৃপ্ত করিতে পারিত না, কেন না ইহাদের রস ছিল অত্যদ্ভুত। যে অদ্ভুত রস সেকালের নব্য বাঙ্গালীর প্রীতিপ্রদ ছিল তাহা অদ্ভুত হইলেও স্বাভাবিক হওয়া দরকার। তাই একালে যে Romanceএর বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল তাহা ঐতিহাসিক উপন্যাস—স্কট বা লিটনের ধরণের। তাহার ঘটনা সব রোমাঞ্চকর, বর্ত্তমান সমাজের অবস্থার সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ, অথচ সেগুলি ইতিহাসের ঘটনার এমন একটা আবহাওয়ার ভিতর উপস্থিত করা হইয়াছে যে তাহাতে অপ্রত্যয় হয় না। সেই আবেষ্টনের মধ্যে ঘটনাগুলি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক।

এই সাহিত্যের ছায়ায় বঙ্কিমচন্দ্রের দুর্গেশনন্দিনী লেখা হইয়াছে।

(৩)

"দুর্গেশনন্দিনী" Ivanhoeর অনুকরণ কি না এ সম্বন্ধে অনেক নিরর্থক আলোচনা পড়িয়াছি। বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন, দুর্গেশনন্দিনী লিখিবার সময় তিনি Ivanhoe পড়েন নাই। এ কথা অবিশ্বাস করিবার কোনও হেতু নাই। দুর্গেশনন্দিনীর সঙ্গে Ivanhoeর যে পরিমাণ মিল আছে তেমন মিল অনেক সময় অনেক স্থলে দেখা যায় যেখানে পরস্পরের কাছে ধার করার কোনও সম্ভাবনাই থাকে না। গল্প লেখায় আমার ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতায় আমি এমন দৃষ্টান্ত একাধিক স্থলে দেখিয়াছি। প্রকৃতপক্ষে দুর্গেশনন্দিনীর সঙ্গে Ivanhoeর মিল খুব বেশী নয়। বঙ্কিমচন্দ্র নিজে Miranda ও শকুন্তলায় যে সাদৃশ্য দেখাইয়াছেন, আয়েষা ও রেবেকায় তার চেয়ে সাদৃশ্য কোনও মতে বেশী নয়, আর বঙ্কিমচন্দ্র যেখানে বুলওয়ার লিটন ও উইল্কি কলিন্সের কাছে ঋণ স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হন নাই, সেখানে সত্য হইলে তিনি এ ঋণ স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হওয়ার কোনও হেতু দেখিতে পাই না।

কিন্তু দুর্গেশনন্দিনী যে স্কটের ছায়ায়, তাঁর সাহিত্যের আবহাওয়ায় লেখা, সে বিষয়ে কাহারও সন্দেহ থাকিতে পারে না। দুর্গেশনন্দিনীও Romance. স্কটের উপন্যাসও Romance. আর সেই রোমান্সের অদ্ভুতত্বকে সম্ভাব্য করিবার উপায় উভয় স্থলেই একটা ঐতিহাসিক আবেষ্টন যাহা কতক সত্য কতক মনগড়া। তা ছাড়া আরও অনেক বিষয়েই দুর্গেশনন্দিনীর কলাবিকাশ প্রণালীর ভিতর স্কটের ছায়াপাত লক্ষ্য করা যায়।

বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যে Romanceএর এই আকর্ষণ চিরদিন ছিল। তাঁহার শেষ বয়সের সংস্কৃত রাজসিংহের

ভিতরও এই আকর্ষণ পরিপূর্ণরূপে দেদীপ্যমান, তাঁহার দ্বিতীয় উপন্যাস "কপালকুণ্ডলায়" ইহা পূর্ণ গৌরবে প্রকাশিত। মেদিনীপুরের সাগরতীরে বালিয়াড়ির দিকে চাহিয়া চাহিয়া সেক্সপীয়ারের মিরান্দা ও কালিদাসের শকুন্তলার কথা ভাবিতে ভাবিতে তাঁর চক্ষে কেমন করিয়া কপালকুণ্ডলার ছায়ামূর্ত্তি ভাসিয়া উঠে তাহা আমাদের পক্ষে কল্পনা করা কঠিন নয়। তাঁর পরবর্ত্তীকালে লেখা "মিরান্দা, শকুন্তলা ও দেসদিমোনা" প্রবন্ধ হইতে আমরা পরিচয় পাই যে মিরান্দা ও শকুন্তলাকে কি চক্ষে বঙ্কিমচন্দ্র দেখিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন, "উভয়েই ঋষিকন্যা উভয়েই ঋষিকন্যা বলিয়া অমানুষিক সাদৃশ্য প্রাপ্ত * * * উভয়েই ঋষি পালিতা; দুইটিই বনলতা, দুইটিরই সৌন্দর্য্যে উদ্যানলতা পরাভূতা * * * উভয়েই অরণ্য মধ্যে প্রতিপালিতা। সরলতার যে কিছু মোহমন্ত্র আছে, উভয়েই তাহাতে সিদ্ধ। কিন্তু মনুষ্যালয়ে বাস করিয়া সুন্দর সরল বিশুদ্ধ প্রকৃতি বিকৃতি প্রাপ্ত হয়—কে আমায় ভালবাসিবে, কে আমায় সুন্দর বলিবে, কেমন করিয়া পুরুষকে জয় করিব, এই সকল কামনায়, নানা বিলাস বিভ্রমাদিতে, মেঘবিলুপ্ত চন্দ্রমাবৎ তাহার মাধুর্য্য কালিমা প্রাপ্ত হয়।"

এই স্বভাব-পালিতা নারীর চরিত্র ধ্যান করিতে মনে অনেক প্রশ্ন জাগিয়া ওঠে। মিরান্দা ফার্ডিন্যাণ্ডকে দেখিয়াই ভালবাসিয়াছিল। এমন মেয়ের এমনি ভালবাসা হয় কি? এমন মেয়ে যদি সংসারে গিয়া পড়ে তবে সে কেমন হয়? এসব ভাবনা হইতে কপালকুণ্ডলার উৎপত্তি, কাঁথির বালিয়াড়ি, কাপালিক, কপালকুণ্ডলার মন্দির প্রভৃতি এই সাগর মন্থনে এই কল্পনা লক্ষ্মীর আশে পাশে দাঁড়াইয়া তার জীবনটাকে বাস্তব করিয়া তুলিয়াছে।

কাপালিক ও কপালকুণ্ডলার চরিত্র অদ্ভুত; মতিবিবি Romance এর নায়িকা; কেবল নবকুমার সাধারণ ভদ্র-গৃহস্থ। প্রধানতঃ এই কয়টি চরিত্র লইয়া কপালকুণ্ডলা রচনা হইয়াছে। ইহা খাঁটি রোমান্স। কিন্তু ইহার ভিতর মৃণ্ময়ীর গৃহজীবনের চিত্ররচনায় বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার সামাজিক চিত্র রচনায় ক্ষমতা অনুভব করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। ক্রমে ইহার পর তিনি Comedy of Manners লিখিতে আরম্ভ করেন এবং এই ক্ষেত্রেই তিনি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সফলতা লাভ করেন। "কৃষ্ণকান্তের উইল" নিঃসন্দেহ বঙ্কিমচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ রচনা।

সমাজচিত্র রচনায় বঙ্কিমচন্দ্রের প্রণালী কি ছিল তাহার সম্বন্ধে অনুমান করা কঠিন। কিন্তু আমার মনে হয় যে তাঁহার প্রণালী উপনয় মূলক (Deductive)। তাঁর মনে প্রথম জাগিয়া ওঠে একটা প্রশ্ন,—সমস্ত কাহিনীটি তার সমাধান। কপালকুণ্ডলায় তিনি প্রশ্ন করিলেন, এমনি একটি সংসারানভিজ্ঞ মেয়ে যদি একটি যুবকের সঙ্গে মিলিত হয় এবং সংসারে গিয়া পড়ে, তবে কি হয়? সমস্ত প্লটটা এই প্রশ্নের সমাধান। "রজনীতে" প্রশ্ন এই যে অন্ধ অনাশংসিতসম্পদা সুন্দরী এক নারীর মনে কি ভাব হয়, কেমন করিয়া তার ভালবাসা জন্মে, আর সে সম্পদ পাইলে কি করে? রজনী তাহার উত্তর। "বিষবৃক্ষের" সমস্যা সুস্পষ্ট। পত্নীপরায়ণ সচ্চরিত্র নগেন্দ্রনাথ কুন্দ-নন্দিনীকে ভালবাসিলে কি হইতে পারে? "কৃষ্ণকান্তের উইল" এই সমস্যারই একটা ভিন্ন উত্তর।

আমার মনে হয় কৃষ্ণকান্তের উইলের ভিতর আরও গূঢ় একটি অভিসন্ধি আছে। এই বইখানির লক্ষ্য ও প্রতিপাদ্য ভ্রমর—ভ্রমর চরিত্র বঙ্কিমচন্দ্রের অপূর্ব্ব সৃষ্টি। ইহার ভিতর বঙ্কিমচন্দ্র ভারতের অতীত যুগের একটা অপূর্ব্ব আদর্শ বাঙ্গলার বর্ত্তমান সমাজের আবেষ্টনের ভিতর গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ভ্রমরের আদর্শ দ্রৌপদী।

কথাটা বোধ হয় নূতন; তাই একটু বিশদ করিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিব। প্রথমে দেখা যাক, বঙ্কিমচন্দ্র দ্রৌপদীচরিত্র কি ভাবে বুঝিয়াছিলেন। সে কথার উত্তর বঙ্কিমচন্দ্র নিজেই স্পষ্ট করিয়া দিয়া গিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্র দ্রৌপদীর ভিতর দুইটি লক্ষণ লক্ষ্য করিয়াছেন, দর্প ও ধর্ম্ম। —তাঁহার "প্রবল ধর্ম্মানুরাগই প্রবলতর দর্পের মানদণ্ড স্বরূপ।" "দ্রৌপদী" প্রবন্ধের গোড়ায় বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন, "কি প্রাচীন, কি আধুনিক, হিন্দুকাব্য সকলের নায়িকার চরিত্র এক ছাঁচে ঢালা দেখা যায়। পতিপরায়ণা, কোমলপ্রকৃতিসম্পন্না, লজ্জাশীলা সহিষ্ণুতাগুণের বিশেষ অধিকারিণী—ইনিই আর্য্য সাহিত্যের আদর্শস্থলাভিষিক্তা।

* * * একা দ্রৌপদী সীতার ছায়াও স্পর্শ করেন নাই। এখানে মহাভারতকার অপূর্ব্ব নূতন সৃষ্টি প্রকাশিত করিয়াছেন। সীতার সহস্র অনুকরণ হইয়াছে কিন্তু দ্রৌপদীর অনুকরণ হইল না।"

বঙ্কিমচন্দ্র এই অনুকরণ করিতেই চেষ্টা করিয়াছেন। এবিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা এখানে অসম্ভব। কিন্তু সাধারণ ভাবে আমার এ কথা বুঝাইতে চেষ্টা করিব। ভ্রমর যে বঙ্কিমচন্দ্রের বর্ণিত হিন্দুকাব্যের সাধারণ নায়িকার মত নয় তাহা সুস্পষ্ট। ভ্রমর দর্পিতা, তেজস্বিনী। আর দ্রৌপদীর মত তাহারও দর্পের আশ্রয় ধর্ম্ম। দ্রৌপদীর যে ধর্ম্মানুরাগ বঙ্কিমচন্দ্র দেখাইয়াছেন তাহা aggressive নহে, দ্রৌপদী তাহা বক্তৃতা করিয়া বুঝান না, তাঁহার সমস্ত কার্য্যের ভিতর তাহা অনুস্যূত রহিয়াছে। ভ্রমরের ধর্ম্মানুরাগও তেমনি সুপরিস্ফুট। যাহা অধর্ম্ম তাহার প্রতি তাহার স্বাভাবিক বিরাগ। সব স্থানেই তাহার দর্পের আশ্রয় ধর্ম্ম। প্রেমের প্রতিমা ভ্রমর যখন ভাবিল যে স্বামী পাপ প্রেমে মগ্ন তখন সে সাধারণ সতীসাধ্বীর মত কাঁদিয়া কাটিয়া পায় লুটাইয়া পড়িল না, স্বামীকে লিখিল; "যতদিন তুমি ভক্তি যোগ্য, ততদিন আমারও ভক্তি, যতদিন তুমি বিশ্বাসী, ততদিন আমারও বিশ্বাস। এখন তোমার উপর আমার ভক্তি নাই, বিশ্বাসও নাই।" যখন গোবিন্দলাল তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া গেল তখন "ভ্রমর" জোড়হাত করিয়া অবিকম্পিত কণ্ঠে বলিতে লাগিল, 'তবে যাও— আর আসিও না। বিনাপরাধে আমাকে ত্যাগ করিতে চাও কর কিন্তু মনে রাখিও উপরে দেবতা আছেন। * * * যদি আমি সতী হই। কায়মনোবাক্যে তোমার পায় আমার ভক্তি থাকে, তবে তোমার আমার আবার সাক্ষাৎ হইবে। * * * যদি এ কথা নিষ্ফল হয়, তবে জানিও দেবতা মিথ্যা, ধর্ম্ম মিথ্যা, ভ্রমর অসতী!"—এ কথার ভ্রমরের দর্প আছে, প্রেম আছে, সতীত্ব আছে আর ধর্ম্মের প্রতি প্রগাঢ় নিষ্ঠা ও বিশ্বাস অতি নিপুণ ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। এই সব গুণ তার পরবর্ত্তী ইতিহাসের ছত্রে ছত্রে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা আর বিশ্লেষণ করিব না। শেষে, যখন গোবিন্দলাল নিরুদ্দেশ তখন যামিনী ভ্রমরকে বলিল, "যদি গোবিন্দলাল এখানে আসেন?" তখন ভ্রমর বলিয়াছিল, "যাহাতে তিনি নিরাপদে থাকেন ঈশ্বর তাহাকে সেই মতি দিন।" শেষে বলিল, "আমার বিপদের দিন তোমরা দেখা দিও।"—বিপদ মানে, গোবিন্দলাল যদি ফিরিয়া আসেন। যামিনী বলিল "সে ত আহ্লাদের কথা।" "যামিনী বুঝিল না যে গোবিন্দলাল হত্যাকারী ভ্রমর তাহা ভুলিতে পারিতেছে না।"

এই কথায় বঙ্কিমচন্দ্র ভ্রমর চরিত্রে ধর্ম্মের স্থান লক্ষিত করিয়াছেন। স্ত্রীহত্যাকারী মহাপাতকী স্বামীর সহবাস সে অসম্ভব মনে করিতেছে। এবিষয়ে তাহার এই স্বাভাবিক বিরাগ সম্পূর্ণ ধর্ম্মসম্মত। শাস্ত্রমতে পতিব্রতা নারীর "আশুদ্ধেঃ সম্প্রতীক্ষ্যো হি মহাপাতক দূষিতম্।" অপরিশুদ্ধ মহাপাতকী স্বামীর সঙ্গে সহবাসে বিমুখতা ভ্রমরের চরিত্রের এই ধর্ম্মপ্রবণতা ও তেজস্বিতা সুপরিস্ফুট করিয়াছে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত।

কাঁকড়া বিছা কামড়ানর ঔষধাবলী!

১। কামড়ানর সঙ্গে সঙ্গে কচু গাছের রস লাগাইয়া দিলে তৎক্ষণাৎ জ্বালা নিবৃত্তি হয়।

২। কর্পূরের নস্য লইতে হয়। তাহা হইলেই তৎক্ষণাৎ যন্ত্রণার অবসান হয়।

৩। তেঁতুলের বীজ থুথুর সঙ্গে পাথরে ঘষিয়া ক্ষতস্থানে লাগাইয়া দিলে, ঐ বীজ ক্ষতস্থানে চুম্বকের সঙ্গে লোহার মত লাগিয়া থাকিবে। এবং যতক্ষণ বিষ না নষ্ট হয়, ততক্ষণ উহা পড়িবে না; বিষ টানিয়া লইয়া আপনি পড়িয়া যাইবে। জ্বালারও শীঘ্র উপশম হইবে। নাইট্রিক অ্যাসিড এক ফোঁটা ক্ষতস্থানে লাগাইয়া দিলে জ্বালার উপশম হয়।

৪। ভাতের হাঁড়ির তলার কালি লইয়া একটা পাথরের পাত্রে রাখিতে হইবে। তাহাতে অল্পপরিমাণ জল দিতে হইবে, যাহাতে কালিটা পাতলা না হইয়া যায়। তার পর ২।১টা বকুল বীচি লইয়া উহার সহিত ঘষিতে হইবে।

অবশেষে দুইটার সংমিশ্রণে মলমের মত যে জিনিসটা প্রস্তুত হইবে, উহাকে আঙ্গুল দ্বারা বেশ্ করিয়া ফেটাইয়া যত্নপূর্ব্বক ক্ষতস্থানে ৩।৪ বার লাগাইলে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই যন্ত্রণার উপশম হইয়া যাইবে। আমি অনেক সময় ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি, এবং সন্তোষজনক ফলও পাইয়াছি।

৫। আমের কসির জল একখানি নেকড়া ভিজাইয়া সেই স্থানে লাগাইয়া দিলে তৎক্ষণাৎ যন্ত্রণা আরাম হয়। আমের কসির জল পুরাতন হওয়া আবশ্যক। কিম্বা কামড়ান স্থানে কচুর ডাঁটার রস লাগাইয়া দিলে আরাম হয়।

—ভারতবর্ষ, আষাঢ় ১৩৩০।

কবিতা-কুঞ্জ।

অনুরোধ।

[শ্রীপ্রমথনাথ রায়].

আমারে রাখিবে সখি মনে,
ছিন্ন যবে হবে মুক্ত প্রাণ,
যৌবনের কুঞ্জবনে যবে
বসন্তের হবে অবসান,
কাল যবে দাগ রেখে যাবে
দেহে কেশে ললাটে গোপনে,
তখনো কি—তখনো কি সখি
আমারে রাখিবে তুমি মনে?

মরণের দ্বারে যবে আমি
উপস্থিত হব শান্তি মাগি,
জীবনের এই অতিথির
স্মৃতিখানি রহিবে কি জাগি?
প্রাণ তব নিবে দাবী করি
আরো কত নব নব জনে,
আমি কি করিতে পারি দাবী
আমারে রাখিবে তুমি মনে?

মনে রাখ নাহি রাখ, সখি,
কিছু তব নাহি আসে যায়,
কাল চির,,জন বহুবিধ,
পৃথিবী বিপুল অতি তায়।
স্মৃতি মোর বাধা হয় যদি
তব নব প্রেম পথে, রাণী,
হিয়া হ'তে মুছে ফেলো তবে,
মুছে ফেলো দীন স্মৃতি খানি।

সন্ধ্যাকালে।

[শ্রীলীলা মিত্র]

কমল বনের মুদলো আঁখি,
মলিন হ'ল অরুণ বরণ,
ধূসর আলোয় ধরার পরে
সন্ধ্যা-বধূ রাখ্‌ল চরণ।
সুদূর নভের সুনীল জলে
দীপ্ত তারার দীপ্তি জ্বলে
ছড়িয়ে আঁচল আঁধার আসে
ঘনিয়ে আসে আলোর মরণ।
কুমুদ কলি উঠ্‌লো হেসে
চাঁদের আলোর মধুর ছোঁয়ায়,
শঙ্খ বাজে গৃহে গৃহে
শিউলী শাখা নোয়ায়।
ঐ আঁধারে তুলসী তলে
কার জ্বালানো প্রদীপ জ্বলে
মধুর মুখে ঘরের বধূ
তুলসী তলায় মাথা নোয়ায়।

বিবেক।

[শ্রীদেবপ্রসাদ চক্র]

থামাও শঙ্খ থামাও ঘণ্টা থামাও কলরব,
মুক্তির পথ লক্ষ্য যাহার তাহার কেন ও-সব।
মুক্ত করগো হৃদয়ের দ্বার মুক্তি লভিবে তায়,
যুক্তির দ্বারা তর্কের দ্বারা মুক্তিরে কেবা পায়।
সসীমের মাঝে অসীমতা আছে মোরা যে ভুলিয়া যাই;
মানবের মাঝে দেবের বিকাশ বুঝিয়াও বুঝি নাই।
বৃথা নারায়ণে পূজি কেন মোরা ত্যজি নর-নারায়ণ;
ভুলিয়া যে যাই মন্দির ত্যজি প্রভু কি কোথায় রন্।
ব্যক্ত যাঁহার পূর্ণ স্বরূপ মানব দেহের মাঝে,
সে মানবগণে ঘৃণা করা, মানবের কিগো সাজে?
প্রণমি মানবে ব্যক্ত যাহাতে পূর্ণ সনাতন,
নমো নর-নারায়ণ নমো নর-নারায়ণ।

পুত্র-হারা।

[শ্রীদ্বিজপদ মুখোপাধ্যায় বি, এ]

অরুণ তখন তামার রঙে আমের কানন রঙিয়ে দিয়ে,
অস্তাচলের আড়াল হলেন আস্তে আস্তে আস্তে গিয়ে;
হাস্যময়ী ধরার বুকে,
সাঁঝের আঁধার পড়ল ঝুঁকে,
এম্নি দিনে
মাঝ্ ফাগুনে—
জীবন-হারা পুত্র নিয়ে,
একলা ছিলাম নদীর ঘাটে মনের বাঁধন সব হারিয়ে।

ফাগুনে মোর অশোক কলি ফোটার মতই ফুট্‌লো যদি,
নবীন প্রেমের দিল্ গোলাপে সকল সুবাস উঠ্‌লো যদি,
দোলের রাতের পূর্ণ শশী,
নাশ্‌লো যদি আঁধার রাশি,
কিসের লাগি,
দুখের ভাগী—
করলে তবে আমায় বিধি?
গোপন হ'তে দারুণ ভাবে শোকের নিঠুর শায়ক বিঁধি।

জমাট হয়ে উঠ্‌ল আঁধার সে মুখ যখন পড়্‌ল মনে,
বিবশা তার কোল হ'তে হায় এনেছি তার প্রাণ-রতনে!
হয়ত এখন চেতন পেয়ে,
এই পথে সে আসছে ধেয়ে,
বল্‌ব কি যে,
পাইনে খুঁজে,
কাঁদছে কি সুর অদূর বনে!
মাতৃ-হিয়ার শোকের ব্যথা অথির সমীর বইছে কানে।

কাঁদছে নদী কল্ কলিয়ে 'চোখ গেল'—ওই ডাক্‌ছে পাখী
চতুর্দ্দশীর চাঁদটীরে ওই কৃষ্ণ মেঘে ফেল্‌ল ঢাকি'।
দেখতে আমি পারছি কি তা।
উঠ্‌ছে জ্বলে ওই যে চিতা!!
চাইনে আলো,
আরও ভালো
আঁধার এসে ঢাকুক আঁখি।
বিশ্বেরি আজ বাইরে আমি ভুলেই আছি ভুলেই থাকি।

নদীর ঘাটে বাঁধব বাসা আমরা দুজন আজ্‌কে থেকে,
কান পেতে খুব থাক্‌ব সজাগ সাড়াই যদি না পায় ডেকে,
মাতৃ-হিয়ার সকল বাঁধন,
ছিঁড়ে যাওয়া হয়না কখন,
কিসের মোহে,
রইব গৃহে
ঘরের রতন বাইরে রেখে?
আসার আশা যায় কি ছাড়া নিরাশ ছবি বক্ষে এঁকে?

২০শ ভাগ] আশ্বিন, ১৩৩০। [৮ম সংখ্যা

বাৎস্যায়নে অর্থনীতি।

[শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার]

বাৎস্যায়নের নাম শুনিলেই অনেকে শিহরিয়া উঠেন; রুচিবিকারগ্রস্তগণ তাঁহার ও তৎপ্রণীত কামসূত্রের কথায় আতঙ্কগ্রস্ত হয়েন। তথাপি আমরা কামসূত্রের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম। কামসূত্র পাঠে গ্রন্থকারের ও তাঁহার সমসাময়িক ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক বৃত্তান্ত অবগত হওয়া যায়, এবং প্রাচীন আর্য্য ঋষিগণ যে কেবল দর্শন লইয়া বিব্রত থাকিতেন না, তাহারও প্রমাণ পাওয়া যায়।

বাৎস্যায়ন গ্রন্থারম্ভেই ধর্ম্ম, অর্থ ও কামকে নমস্কার করিয়াছেন। কাম প্রতিপাদ্য বিষয় হইলেও, তিনি ধর্ম্ম ও অর্থকে বিস্মৃত হইতে পারেন নাই। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম—ত্রিবর্গই পূজনীয় এবং তজ্জন্য মনুষ্যজীবন এরূপভাবে বিভক্ত করিতে তিনি আদেশ করিয়াছেন যে, তিনটাই যেন সমন্বয়ে বৃদ্ধি পাইতে পারে—এক হইতে যেন অপরের অনিষ্ট না হয়। আচার্য্য বাৎস্যায়ন কামাপেক্ষা অর্থ এবং অর্থাপেক্ষা ধর্ম্মকে উচ্চ স্থান প্রদান করিলেও, পাঠককে সাবধান করিয়া দিয়াছেন যে, ব্যক্তিবিশেষে যেন ইহার ব্যতিক্রম হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ তিনি বলিয়াছেন যে, নরপতির নিকট অপর দুইটী অপেক্ষা অর্থ অধিকতর প্রয়োজনীয়; কারণ, রাজ্য সমাজ সমস্তই অর্থের উপর নির্ভর করে। তজ্জন্যই তাঁহার মতে শাস্ত্রানুযায়ী অর্থোপার্জ্জনের আবশ্যকতা রহিয়াছে।

বাৎস্যায়ন কামের উপাসক হইলেও, তাঁহার গ্রন্থে অর্থের প্রয়োজনীয়তার কথা কুত্রাপি বিস্মৃত হন নাই। "লোকে মনে করে যে অদৃষ্টে থাকিলে বিনায়াসে অর্থোপার্জ্জন করা যায়"—কিন্তু বাৎস্যায়ন এইরূপ কথায় আস্থা স্থাপন করিতে প্রস্তুত নহেন। উদ্যম ব্যতীত অর্থোপার্জ্জন সম্ভব নহে, তাঁহার এই মত ছিল। অধিকন্তু, কামসূত্র ও শিল্পকলা শিক্ষার জন্য কেহ অত্যন্ত উৎসুক হইলেও, তিনি যেন ধর্ম্ম ও অর্থশাস্ত্র সংক্রান্ত পুস্তক পাঠে অবহেলা না করেন। যথাসঃ পক্ষে ত্রিবর্গ এক সঙ্গে আরাধনা করিলেই লোক ইহলোকে ও পরলোকে উন্নতি লাভ করিতে পারিবে, বাৎস্যায়ন পুনঃ পুনঃ এই উপদেশ প্রদান করিয়াছেন।

বাৎস্যায়ন অর্থশব্দের আলোচনা প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন যে, এই অর্থশব্দে শিক্ষা, ভূমি, সুবর্ণ, গৃহপালিত পশু প্রভৃতি দ্রব্য অন্তর্ভুক্ত হয়। বর্ত্তমানে অর্থশব্দে যেরূপ বিনিময়যোগ্য সকল দ্রব্যই অন্তর্ভুক্ত হয়, অনেকাংশে বাৎস্যায়নের সূত্রেও সেইরূপ অর্থ হয়।

গ্রন্থের অনেক স্থলে অর্থোপার্জ্জন ও অর্থ সংগ্রহ সম্বন্ধে উপদেশ পাওয়া যায়। বিবাহের কন্যা সংগ্রহে পর্য্যন্ত কন্যা যাহাতে ধনীবংশজাত হন, তদ্বিষয়ে বাৎস্যায়ন উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। আদর্শ স্ত্রী, তাঁহার মতে, ব্যয়কুণ্ঠা

হইবেন। সহধর্ম্মিণী বাৎসরিক আয় বুঝিয়া ব্যয় করিবেন। স্বামী অনুপস্থিত থাকিলে, স্ত্রী দৈনিক আয় ব্যয়ের উপর লক্ষ্য রাখিবেন। উপযুক্ত, বিশ্বাসযোগ্য ভৃত্যদ্বারা সময়ানুযায়ী দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া রাখিবেন। ব্যয় সঙ্কোচ বিষয়ে বাৎস্যায়ন পুনঃ পুনঃ গৃহিণীকে উপদেশ দিয়াছেন; এমন কি, মৃৎপাত্র ক্রয়েও উপযুক্তা গৃহিণী যথাসময়ে তৎপরা হইবেন; সময়ানুযায়ী তৈল, লবণ ক্রয় করিবেন; আহার্য্য গ্রহণের পরে যে দধি থাকিবে তাহাও যেন নষ্ট না হয়; উপযুক্ত সময়ে তিল হইতে তৈল, ইক্ষুদণ্ড হইতে গুড়, কার্পাস হইতে সূত্র যাহাতে সংগৃহীত হইতে পারে, তদ্বিষয়ে লক্ষ্য রাখিবেন। অপিচ, ভৃত্যগণের বেতন, তৎকর্ত্তৃক ব্যয়, কৃষির উন্নতি এবং গোমহিষাদির যথোপযুক্ত তত্ত্বাবধানও গৃহিণীর অন্যতম কর্ত্তব্য ছিল। দৈনিক আয় হইতে ব্যয় বাদ দিয়া কিরূপ উদ্বৃত্ত থাকে, সে বিষয়েও দৃষ্টিপাত বাঞ্ছনীয় ছিল। প্রকৃত গৃহিণীর এই সকল বিষয়েই লক্ষ্য রাখা সম্বন্ধে বাৎস্যায়ন উপদেশ দিয়াছেন।

অর্থোপার্জ্জন সম্বন্ধেও বাৎস্যায়ন যথোপযুক্ত উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। "ব্রাহ্মণগণের পক্ষে উপহার গ্রহণ, ক্ষত্রিয়ের রাজ্যজয় দ্বারা অর্থ বৃদ্ধি, এবং ক্রয়বিক্রয়ে বৈশ্যের ধনলাভ এবং বেতন গ্রহণান্তর কর্ম্ম করা শূদ্রের কর্ত্তব্য ছিল।"

তৎকালে কোন্ কোন্ জাতি বা উপজাতি ছিল, বাৎস্যায়নের গ্রন্থ পাঠে তাহাও অবগত হওয়া যায়। রজক, পরামাণিক, পুষ্পবিক্রেতা, গন্ধবিক্রেতা, শৌণ্ডিক, গোপালক, তাম্বুলি, সৌবর্ণিক, গল্পকথক এবং ভাঁড় ইহাদের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। রাজা অজাতশত্রু ও গৌতমবুদ্ধের কথোপকথনে আমরা বৌদ্ধযুগের জাতিসমূহের পরিচয় পাই— বাৎস্যায়ন পাঠেও এ সম্বন্ধে কিছু কিছু বৃত্তান্ত অবগত হওয়া যায়।

আমরা বাৎস্যায়নের কামসূত্র হইতে অর্থনীতি সংক্রান্ত কয়েকটী বিষয় পাঠকগণের সম্মুখে উপস্থিত করিলাম। বারান্তরে এ সম্বন্ধে আমাদের বিস্তৃত আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

বিসর্জ্জন।

(উপন্যাস)

[শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী]

(৮)

তুষারের বিবাহ উপলক্ষে সমস্ত গ্রামখানা আনন্দে ভরিয়া উঠিল। জমীদারের একটী মাত্র ছেলের বিবাহে যে কি জাঁক হইবে, তাহা গ্রামের ছেলে বুড়া সকলেই মনের মধ্যে কল্পনা করিয়া লইল।

পাত্রী কলিকাতার কোনও বড়লোকের একটী মাত্র মেয়ে। সে রীতিমত শিক্ষিতা এবং ধনশালিনী, সুতরাং তুষার এ বিবাহের প্রস্তাবে দ্বিরুক্তি করে নাই।

বিবাহের দিন চার পাঁচ আগে তুষার বাড়ী ফিরিল, কমনীয়ও দাদার বিবাহের আনন্দে যোগ দিবার জন্য কলিকাতা হইতে বাড়ী আসিল।

আজকাল কমনীয় নব্য সভ্য যুবক। তাহার চোখে সোণার চশমা, আঙ্গুলে আংটী, হাতে রিষ্ট ওয়াচ, মুখে সিগারেট। কে দেখিয়া বলিবে এই সেই কমনীয়, যে একদিন লোকের বাগানে বাগানে আম লিচু জাম চুরি করিয়া, মাছ ধরিয়া, সমবয়স্ক ছেলেদের উপর প্রভুত্ব করিয়া দিন কাটাইয়াছে।

বৈশাখের সন্ধ্যার প্রারম্ভ। কলিকাতা হইতে তুষারের ও কমনীয়ের বন্ধু বান্ধব আসিয়া জুটিয়াছিল বড় কমগুলি নয়। কমনীয় সব গুলিকে লইয়া বোটে উঠিয়াছিল। তুষারের হার্ম্মোনিয়ামটা জনৈক বন্ধু দখল করিয়া বসিয়াছিলেন, কোথা হইতে একজোড়া তবলাও যোগাড় হইয়াছিল।

ও-পারের আকাশ তখন ঘোর লাল, কে যেন এক

রাণী সিন্দুর আনিয়া আকাশের গায় মাখাইয়া দিয়াছে। আরক্তিম আলোর রেখা এ-পারটাকে আলোকমণ্ডিত করিয়া রাখিয়াছে। বোট তখনও ছাড়া হয় নাই, সেই সময় জ্যোতিশ নামে কমনীয়ের সমবয়স্ক একটী যুবক ঘাটের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিয়া উঠিল, "দেখ, গোবরে পদ্মফুল ফুটেছে বটে।"

তাহার কথায় সবাই চাহিল, হরেন নামক আর একজন উচ্চ হাসিয়া বলিয়া উঠিল, "বাস্তবিক, যা বলেছিস ভাই, একবারে খাঁটি সত্যি। এ পরী কোথা হ'তে নামল রে? স্বর্গ হ'তে উড়ে এসে পড়ল, না জল হ'তে উঠল?"

তরুণ নামক বি, এ, ক্লাসের একটী ছেলে সুর ভাঁজিল—"তুমি কোন্ কাননের ফুল, তুমি কোন্ গগনের তারা—" কমনীয় তখন অন্যদিকে বসিয়া মহাব্যস্তভাবে গানের খাতার পাতা উল্টাইয়া তাহার মনোমত একটা গান বাহির করিতেছিল, এদিকে গোলমাল শুনিয়া চোখ উঠাইয়া বলিল, "কি হে, বোট এখনও ছাড়া হয় নি যে?"

জ্যোতিশ তাহাকে একটা ধাক্কা দিয়া বলিল, "মাইরি, একবার ঘাটের দিকে তাকিয়ে দেখ ভাই, ফেয়ারী টেল্‌সের একটা ফেয়ারী নেমে এসে দাঁড়িয়েছে।"

সে দিকে চাহিয়া বাস্তবিক কমনীয়ের পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত জ্বলিয়া উঠিল। শুভ্রা নিতান্ত নির্লজ্জভাবে দাঁড়াইয়া বোটের পানে তাকাইয়া আছে, এতগুলি ছেলে যে তাহাকে লক্ষ্য করিয়া কথা বলিতেছে, তাহাতে তাহার শুভ্র মুখখানা একটু আরক্তও হইয়া উঠে নাই। গ্রামের কোনও মেয়ে যে সময় ঘাটে আসে নাই, সে সময় একটা কলসী লইয়া তাহার ঘাটে আসিবার মানে কি? আর যদিই বা আসিল, কেন তাড়াতাড়ি অবগুণ্ঠন টানিয়া চলিয়া গেল না? এরূপ ভাবে অবগুণ্ঠনশূন্য মুখে এতগুলা ছেলের পানে চাহিয়া থাকিতে কোনও ভদ্র রমণী পারে কি?

শুভ্রার উপর তাহার একটা যে অধিকার আছে, তাহা মনে করিয়া কমনীয় এক লম্ফে তীরে নামিয়া পড়িল।

শুভ্রার পিছনে আসিয়া গর্জ্জন করিয়া ডাকিল, "শুভ্রা—"

শুভ্রা ভীষণভাবে চমকাইয়া মুখ ফিরাইল।

আদেশের সুরে কমনীয় বলিল, "জল নিয়ে উপরে চল, তোমার সঙ্গে আমার একটা কথা আছে।"

শুভ্রা নড়িল না।

কমনীয় ব্যগ্র হইয়া বলিল, "তোমায় মিনতি করছি শুভ্রা, এখানে এমন বেহায়ার মত দাঁড়িয়ে থেকে ওই লোকগুলার চোখকে লুব্ধ করো না, তোমার নারী-মাহাত্ম্য খর্ব্ব করো না। ওঠ বলছি। যদি সহজে তুমি না যাও, আমি ছোট বেলার মত তোমার হাত ধরে হিঁচড়ে টেনে নিয়ে যাব, এতে ওরা যদি আমায় নিন্দা করে আমি তা সইতেও রাজি আছি, তবু ওদের চোখের সামনে তোমায় এমন নিচু হ'তে দেখতে পারব না।"

শুভ্রা নীরবে কলসী ভরিয়া জল লইয়া কমনীয়ের পিছনে পিছনে উপরে চলিল। কমনীয় তাহাকে এমন স্থানে লইয়া গেল যেখান হইতে বোটখানা আর নজরে পড়ে না।

শুভ্রার মুখখানার উপর দৃষ্টি রাখিয়া কমনীয় বলিল, "তোমার কি ওখানে এ রকম সময় গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা উচিত হয়েছিল শুভ্রা? তোমার নিজের আত্মজ্ঞান বোধ নেই কি? কেন গেছলে তুমি?"

শুভ্রা ধীরকণ্ঠে বলিল, "জল আনতে।"

কমনীয় বলিল, "জল আনবার অন্য সময়ও ত ছিল, কেন সে সময় যাও নি?"

শুভ্রা নীরব হইয়া রহিল।

কমনীয় তেমনি উত্তেজিত কণ্ঠে বলিল, "বেশ, জল আনতে গেছলে ভালই, জল নিয়েই কেন ফিরে এলে না, কেন সেখানে হাঁ করে ওই সব দুর্দ্দান্ত ছেলেদের সামনে দাঁড়িয়েছিলে?"

শুভ্রা তাহার মুখের উপর কঠোর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া উত্তর দিল, "আমার ইচ্ছে।"

"তোমার ইচ্ছে?" কমনীয় অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া উঠিল। "তোমার ইচ্ছে বলে আলাদা কিছু জিনিস থাকতে পারে না তা জানো শুভ্রা? তুমি কি, তা তুমি ভুলে যেতে পার, আমরা তা ভুলতে পারি নে। তুমি প্রবৃত্তির স্রোতে নিজেকে ভাসাতে ইচ্ছে করতে পার, আমরা তা করতে

দিতে পারি নে। আমরা তোমাকে জোর করে সে দিক হ'তে ফিরাব, যদি দরকার বোধ করি, এর জন্যে তোমায় খুন করতেও পিছাব না।"

শুভ্রা কমনীয়ের মুখের উপর স্থিরদৃষ্টি রাখিয়া তেমনি স্থির কণ্ঠে বলিল, "তোমার তাতে কি আসে যায়? আমি খারাপ হই কিম্বা ভাল হই, তোমার তাতে কি? আর আমায় শাসন করবার তোমার কি অধিকার আছে আমি তাই জিজ্ঞাসা করি তোমায়।"

তাহার কথায় কমনীয় একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেল। শুভ্রা যে অনেক কথা শিখিয়াছে, তাহা সে আগেই জানিয়াছিল, কিন্তু এ রকম কথা যে শিখিয়াছে তাহা সে জানিত না।

খানিকক্ষণ নীরবে শুভ্রার পানে চাহিয়া থাকিয়া কমনীয় কঠোর কণ্ঠে উত্তর করিল, "হাঁ, অধিকার আছে বই কি। ছোট বেলায় আমরা এক সঙ্গে খেলেছি, শুধু সেই অধিকার আছে। সেটা বড় কম অধিকার নয় শুভ্রা। তোমার উপরে আমার যে সম্পূর্ণ অধিকার আছে, তার চিহ্ন দেখ তোমার হাতে এখনও রয়েছে, চিরকাল থাকবেও। আমি তোমায় এখনও আমার ইচ্ছানুসারে চালনা করতে পারি তা মনে রেখো। তুমি ভেব না যে বড় হয়েছ বলে তুমি স্বাধীন হয়েছ, তুমি আমার ছাড়িয়ে উঠবে। যাক, বেশী আর কিছু বলব না তোমায়, সন্ধ্যা হয়ে এল, বাড়ী যাও। আর যেন কখনও তোমায় এ রকম নির্লজ্জ ভাবে না দেখতে পাই। তুমি বিধবা, তুমি পবিত্র দেবতার নির্ম্মাল্য, এই কথাটা অনুক্ষণ বুকে জাগিয়ে রেখো। নারী জাতির উপরে আমার যে বিশ্বাস, যে ভক্তি, যেন তাহা খর্ব্ব না হয়, আমি যেন গর্ব্বিত হ'তে পারি তোমাদেরই পবিত্র কথা বলে।"

সে চলিয়া গেল।

শুভ্রা নিষ্পলকে তাহার পানে চাহিয়া রহিল। যখন তাহাকে আর দেখা গেল না, তখন সে কলসী নামাইয়া সেখানে বসিয়া পড়িয়া দুই হাতের মধ্যে মুখ লুকাইল। চোখের জল তাহার করাঙ্গুলী ভেদ করিয়া ঝর ঝর করিয়া ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

অধিকার? হাঁ, শুভ্রার উপরে তোমার অধিকার আছে সম্পূর্ণ, শুভ্রা যে তাহার সর্ব্বস্ব! তোমারই পদে অর্ঘ্যরূপে দান করিয়াছে। সে বিধবা! হায় ভগবান, কবে তাহার বিবাহ হইল, কবে সে বিধবা হইল, তাহার কিছুই জানে না সে যে, তবু তাহাকে ভাবিতে হইবে সে বিধবা? ওগো, একবার—একবার মাত্র ভাবিয়া দেখ, তাহার পর তাহাকে তিরস্কার কর, তাহাকে প্রহার কর, তাহাকে হত্যা কর। সে এত দীনা, সে এত নিচে? তাহার সাধ নাই, আহ্লাদ নাই, তাহার কিছু নাই? তাহাকে সব বিসর্জ্জন দিয়া শুধু হৃদয়ে জাগাইয়া রাখিতে হইবে, সে দেবতার নির্ম্মাল্য, সে বিধবা?

শুভ্রা চোখ মুছিয়া কলসী লইয়া ধীরে ধীরে বাড়ী চলিল। বাড়ীতে গিয়া যখন পৌঁছাইল তখন বেশ সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে। দূরবর্ত্তী মন্দিরে সন্ধ্যার আরতির বাদ্য বাজিয়া উঠিয়াছে, গৃহস্থের গৃহে শঙ্খ বাজিয়াছে।

তাহাদের বাড়ীতে এখনও সন্ধ্যা পড়ে নাই। সুভা সুষমার সহিত তুমুল ঝগড়া বাধাইয়া দিয়াছেন, স্বল্প ভাষিণী সুষমা দুই একটী মাত্র উত্তর দিতেছেন।

পশ্চাৎ দিকে দণ্ডায়মানা শুভ্রার দিকে সুভার দৃষ্টি পড়ে নাই। তিনি সমান ঝগড়া চালাইতেছিলেন। ঝগড়ার বিষয়টা এই,—তিনি বাড়ী ছিলেন না, বৎসরের মত ধান জমী হইতে আসিয়া গোলাজাত হয়, লোক দিয়া সেই ধান ভানাইয়া লইতে হয়। দুপুরে আহারাদির পর তিনি ধান লইয়া বাহির হইয়াছিলেন, সন্ধ্যার সময় বাড়ী ফিরিয়া শুভ্রাকে না দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারেন, সে জল আনিতে ঘাটে গিয়াছে। শুনিয়া তিনি একেবারে জ্বলিয়া উঠিয়াছেন। এই সন্ধ্যার সময় বিধবা বয়স্থা কন্যাকে একা কেন ঘাটে পাঠানো হইয়াছে, তাহার কৈফিয়ৎ তিনি চাহিতেছেন। সুষমা কেবলমাত্র বলিয়াছেন, ঘরে খাইবার জল ছিল না, শুভ্রা বৈকালে তাহা দেখিতে পাইয়া কলসী লইয়া গিয়াছে।

এক পক্ষে ঝগড়াটা বড় বেশী চলে না। সুষমা একটী মাত্র উত্তর দিয়া বারাণ্ডার এক পাশে চুপ করিয়া বসিয়াছিলেন। সুভা অনেকক্ষণ চীৎকার করিয়া শেষে

এই বলিয়া উপসংহার করিলেন, "দেখতে পাবে ওই মেয়ে দ্বারা যদি কুলে কালি না পড়ে তো আমি বাপের বেটিই নই। এর পর যখন কাঁদতে হবে, তখন বুঝবে আমি সত্যি কথা বলেছি কি না।"

শুভ্রা বাহির হইতে এইমাত্র যে কথার ঠোকর খাইয়া আসিয়াছে, ভিতরে সেই আঘাতটা পূর্ণ মাত্রায় অনুভব করিল, তাহার হৃদয় কিরূপ একটা তিক্তভাবে ভরিয়া উঠিল। নীরবে সে একেবারে গৃহের মধ্যে চলিয়া গেল। কলসীটা এক পাশে রাখিয়া গৃহে আলো জ্বালিয়া সে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

তাহাকে দেখিয়াই পিসিমার কথা বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। তিনি বিড় বিড় করিয়া বকিতে বকিতে রন্ধনগৃহে চলিয়া গেলেন।

সুষমা খানিক গুম হইয়া বাহিরে বসিয়া থাকিলেন, তাহার পর উঠিয়া যেখানে শুভ্রা বসিয়াছিল সেখানে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তীব্রনেত্রে কন্যার পানে চাহিয়া বলিলেন, "তোর ঘাট হ'তে আসতে আজ এত দেরী হ'ল কেন?"

শুভ্রা একবার মুখ তুলিয়া মায়ের দীপ্ত মুখখানার পানে তাকাইয়া চকিতে মাথা নত করিয়া ফেলিল।

সুষমা তেমনি কঠোর সুরে বলিলেন, "ঘাটে আজ বিকেল হ'তে যত রাজ্যের বয়াটে ছোঁড়া জড় হয়েছে, তুই সেখানে কি করছিলি বল। যদি সত্যি কথা না বলিস—"

বাধা দিয়া তীব্রকণ্ঠে চীৎকার করিয়া শুভ্রা বলিল, "খুন করবে? কর না, এই আমি গলা বাড়িয়ে দিচ্ছি। আমায় মেরে ফেল, তোমাদের সকল আপদ চুকে যাক। তোমরাও বাঁচ, আমিও বাঁচি।" সে উচ্ছ্বসিত হইয়া এমন ভাবে কাঁদিতে লাগিল যে, সুষমা আর একটাও কথা বলিতে পারিলেন না।

সুভা বারাণ্ডায় দাঁড়াইয়া উঁকি দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "শুভ্রা এই ভরসন্ধ্যেবেলা অমন করে কাঁদছে কেন বউ?"

সুষমা আর সহিতে পারিলেন না, বলিয়া উঠিলেন, "তোমার মিষ্টি কথায়। এই মেয়ে নিয়ে হয়েছে আমারও এক জ্বালা। হতভাগী সাত তাড়াতাড়ি বিধবা হয়ে বসল। মরেও না তো, যে আমার সকল আপদ ঘুচে যায়! ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, ও এক্ষুনি মরে যাক, এক্ষুনি মরুক, আমি নিশ্বাস ফেলে বাঁচি।"

তিনি আবার বাহিরে আসিয়া বসিলেন।

(৯)

সে দিন বেড়াইতে গিয়াও কমনীয় একটুও আনন্দ লাভ করিতে পারে নাই। বাড়ী ফিরিয়া সকলের চোখ এড়াইয়া সে একেবারে নিজের গৃহে গিয়া শুইয়া পড়িল।

শুভ্রার ভাবটা আজ সে নূতন করিয়া হৃদয়ঙ্গম করিবার চেষ্টা করিতেছিল, কিন্তু কিছুতেই সে ধারণায় তাহা আনিতে পারিল না। শুভ্রা চিরকাল অন্যের নিকট মন্দ হইলেও তাহার নিকট ভাল ছিল। এ কি সেই শুভ্রা—যাহাকে অপমান করিয়া মারিয়া তাড়াইয়া দিলেও আবার না ডাকিলেই কুকুরের মত কাছে আসিয়াছে? এই যে বছর খানেক হইল সে যে তাহাকে মারিয়াছিল সে দাগটাও তাহার দেহে বর্ত্তমান। কই, সেদিনও তো সে এমন রুক্ষভাবে জানিতে চাহে নাই তাহার উপর কমনীয়ের অধিকার কি?

কমনীয় কিছুতেই ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিল না কেন শুভ্রা এরূপ হইয়া গেল।

তবে কি সে তাহাকে ভালবাসে?

কথাটা মনে করিতেই কমনীয়ের হাসি পাইল। দূর, তাও নাকি হ'তে পারে? এ যে বড় আশ্চর্য্য কথা। আর কাহারও সম্বন্ধে হইলে কথাটা খাটিতে পারে বটে, কিন্তু শুভ্রা যে তাহাকে ভালবাসে, এ কথাটা কোনও মতে খাটে না। এ কথা কখনই সত্য নহে।

আজিকার শুভ্রার ব্যবহারটা যতই সে ভাবিতে লাগিল ততই তাহার আপাদ-মস্তক জ্বলিয়া যাইতে লাগিল। সে ভাবিয়া দেখিল, কেবল তাহার মত সহিষ্ণু ছেলেই ইহা সহ্য করিয়া গিয়াছে, অন্য কেহ হইলে শুভ্রার গলাটা ধরিয়া অমনিই যে জলে ফেলিয়া দিত, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। শুভ্রার আজ পুনর্জ্জীবন প্রাপ্তি বলিতে হইবে। আর দুই একটা কথা বলিলে কমনীয়ই যে কি করিত, তাহা সেই জানে না।

পরদিন তাহার ক্লাসফ্রেণ্ড জ্যোতিষ ধরিয়া বসিল, সে মেয়েটী কোথায় থাকে এবং সে তাহাকে চিনে কি না তাহা বলিতেই হইবে।

কমনীয় গম্ভীর ভাবে জানাইল মেয়েটী তাহার আত্মীয়া—সম্পর্কে ভগিনী। সে এই বাড়ীতেই থাকে।

এই যুবক দলের প্রকৃতি তাহার নিকট গোপনীয় ছিল না। সে ইহাদের দৃষ্টি হইতে শুভ্রাকে বাঁচাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল। শুভ্রার শুভ্রতা যেন মলিন হইয়া না যায়, তাহার নারী-মাহাত্ম্য যেন অটুট থাকে, সে দিকে তাহার দৃষ্টি বড় তীব্র ছিল। সে এখন এই যুবক-দলকে বিদায় করিয়া দিতে পারিলে বাঁচে।

গাত্রহরিদ্রার দিন গ্রামের সব বাড়ীই নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল। তুষারের মায়ের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে সুভা নিজে শুভ্রাকে লইয়া জমীদার-বাটী আসিলেন।

যখন তাঁহারা চলিয়া যান, তখন তুষারের জনৈক বন্ধু সত্য শুভ্রাকে দেখিতে পাইয়াছিল। সন্ধ্যার পরে কমনীয়কে ধরিয়া সত্য হাসিয়া বলিল, "সেদিন যে মেয়েটীর কথা তোমায় জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল কমনীয়, তাকে তুমি প্রথমটা চিনতেই পার নি, শেষকালে বললে তোমার সম্পর্কীয়া বোন হয়। আজ তুষার বললে, সে তোমাদের কেউই নয়, প্রতিবেশিনী মাত্র। এত বড় মিথ্যা কথাটা বলবার কি দরকার ছিল কমনীয়? আমরাও মানুষ, আমাদেরও মা বোন আছে, আমরা মনুষ্যত্বহীন চাষা নই, সেটা তো জান?"

সত্য কলিকাতার একটী প্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টারের ছেলে, তাহার পিতা জমিদারও বটেন। সে নিজেও বিশ্ববিদ্যালয়ের এম, এ, ডিগ্রি লাভ করিয়াছে।

কমনীয় কাজের ছুতা করিয়া তাড়াতাড়ি সরিয়া গেল। মনটার মধ্যে সে শান্তি পাইতেছিল। শুভ্রার তথ্য জানিবার জন্য সত্যর এত ঔৎসুক্য কেন, তাহা সে বুঝিতে পারিতেছিল না।

মহা ধুমধামে বিবাহ সম্পন্ন হইয়া গেল, স্ত্রী লইয়া তুষার বাড়ী ফিরিল। কমনীয় নিজের বন্ধু বান্ধবগুলি লইয়া কলিকাতা রওনা হইয়া গেল, বাড়ী রহিয়া গেল সত্য ও আর একটী তুষারের কবিত্বের পরম ভক্ত পরিমল।

সত্য কিছুতেই পা নাড়িতে চাহে নাই। কলিকাতায় তাহার কাজকর্ম্ম কিছুই ছিল না। কলেজের পড়া শেষ করিয়া উপস্থিত সে সঙ্গীতবিদ্যা আয়ত্ত করিবার দিকে মন দিয়াছিল। সে পল্লীগ্রামের সৌন্দর্য্যে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী মুগ্ধ হইয়াছিল, এবং সারাদিন বন্দুক লইয়া সাহেবী সাজে বনে বনে শৃগাল তাড়াইয়া, পাখী শিকার করিয়া ফিরিতে লাগিল।

কমনীয় কলিকাতায় গিয়াও সত্যের জন্য শান্তি পাইতেছিল না। কে জানে কেন, সত্যকে সে সন্দেহের চোখে দেখিয়াছিল।

কোনও মতে সে পড়াটাতে যখন মন দিতে পারিয়াছে, ঠিক সেই সময়ে তুষারের একখানা পত্র পাইয়া সে একেবারে আকাশ হইতে পড়িল। তুষার এখনও বাড়ীতে ছিল, গ্রীষ্মের বন্ধ দু'চার দিন বাদেই, ছুটিও তাহার আর দু'চার দিন ছিল। তুষার লিখিয়াছে—টেংরা মাছের কাঁটা বড় ভয়ানক যন্ত্রণা দেয়—অবশ্য যদি সে কাঁটা ফুটায়। শুভ্রার নাম যে সে টেংরা মাছ রাখিয়াছিল তাহা কিছুমাত্র অযথার্থ নহে, এবার সে যে কাঁটা ফুটাইয়া দিয়াছে, তাহাতে সকল লোকই বিশেষ চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। আজ তিন চার দিন হইল সে গ্রাম ছাড়িয়া কোথা পলায়ন করিয়াছে, চারিদিক অন্বেষণ করিয়াও তাহাকে পাওয়া যাইতেছে না। আরও বিশেষ আশ্চর্য্য যে, তাহার প্রিয়তম বন্ধু সত্যও সেইদিন হইতে অন্তর্দ্ধান হইয়াছে, তাহারও খোঁজ পাওয়া যায় নাই। টেংরার মা পাষাণ স্তূপে পরিণত হইয়াছেন বলিলেও চলে, পিসীমা কাঁদিয়া, গালাগালি দিয়া সারা গ্রামখানি মাথায় করিয়া তুলিয়াছেন। কমনীয় যেন এই পত্র পাঠ মাত্র সত্যদের বাড়ী যায়, এবং সত্য কোথায় আছে সে খবরটা জানিয়া পত্র পাঠ তাহাকে উত্তর দেয়, একটুও যেন দেরী না করে।

চোখের সামনে একটা কালো পর্দ্দা ঝুলিতেছিল, সেটা কোন অদৃশ্য হস্তের আকর্ষণে খসিয়া পড়িয়া গেল। কমনীয়ের সামনে উজ্জ্বল আলোকের অক্ষরে লিখিত—'নারীকে বিশ্বাস করিতে নাই' গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে আলোকরেখার এই উক্তিটী বড় পরিষ্কার, বড় উজ্জ্বল।

ছিঃ, এই রমণীই দেবী নামে বিখ্যাত?

কমনীয় অধর দংশন করিল; এত জোরে যে, অধর কাটিয়া রক্ত বাহির হইয়া পড়িল।

নারী দেবী? যাহার মুখে মধু, অন্তরে গরল, সে দেবী? যে মুখে এক কথা বলিয়া ভুলাইয়া রাখে, হৃদয়ে অন্য কথা পোষণ করে, সে দেবী?

এক নিমিষে জগৎখানা কালো হইয়া গেল, সেই কালোর মধ্যে আকাশ মর্ত্ত্য জুড়িয়া আলোর অক্ষরে একটী মাত্র কথা—নারীকে বিশ্বাস করিতে নাই। কমনীয়ের প্রত্যেক ধমনীর রক্ত উত্তেজিত হইয়া লাফাইতে লাগিল—না না, বিশ্বাস করিতে নাই, বিশ্বাস করিও না।

দুই হাতের মধ্যে মাথাটা রাখিয়া কমনীয় ভাবিতে বসিল—কিসে কি হইল! আজ সে এই প্রথম নিজের জীবনের মধ্যে বিরাট দৈন্যতা, বিরাট শূন্যতা অনুভব করিল। কে তাহার মায়া-হৃদয় জুড়িয়া বসিয়াছিল,—নারী?—ছি ছি ছি!

কমনীয় আগে তো জানে নাই। কিন্তু না, এ মিথ্যার আবরণ দিবার তো কোনই দরকার নাই। শুভ্রাকে সে জীবনাধিক ভালবাসিত, ভালবাসিত বলিয়াই তাহার শুভেচ্ছা তাহার হৃদয়ে জাগিয়াছিল, শুভ্রার মন্দ আশঙ্কায় সে ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল। শুভ্রাকে বাঁচাইবার জন্য, শুভ্রাকে অক্ষয় রাখিবার জন্য, সে অতগুলি ছেলের সামনেও নিজেকে হীন প্রতিপন্ন করিয়াছিল।

শুভ্রা তাহার বিশ্বাস রাখিতে পারিল না, সমগ্র নারী জাতির ললাটের উপর অবিশ্বাসের ছাপ দিয়া সে কলঙ্ক-সাগরে ঝাঁপাইয়া পড়িল। কমনীয়ের মনে ধারণা জন্মিয়া গেল—শুধু একা শুভ্রা নয়, সব মেয়েই এমনি, সবারই মুখে মধু, অন্তরে গরল। এ অধম নারী কখনই উর্দ্ধে উঠিতে পারিবে না, চিরকাল অতি নিম্নে তাহার স্থান।

হঠাৎ সে চমকিয়া উঠিল, তাহার মনে পড়িয়া গেল দাদা লিখিয়াছে তাহাকে সত্যদের বাড়ী যাইতে হইবে, সত্যের খোঁজ লইতে হইবে।

সে ধীরে উঠিয়া পড়িল।

সত্যর বাসা হ্যারিসন রোডে, একেবারে ট্রাম রাস্তার উপরে। সে সেখানে গিয়া খোঁজ লইয়া জানিল, সত্য এখানে নাই। সে কোথায় বেড়াইতে গিয়াছে, আজও ফিরে নাই।

ইহা তো জানিত সত্য কথা। কমনীয় অনেক আগেই ইহা ভাবিয়াছিল, তবু একবার মনকে বুঝাইবার জন্য সে সত্যদের বাড়ী খোঁজ লইতে গিয়াছিল।

সত্যদের বাড়ী হইতে সে আর বাসায় গেল না, বরাবর ষ্টেশনে আসিয়া একেবারে ট্রেণে চাপিয়া বসিল। বাড়ীর অবস্থাটা কি হইয়াছে, এবং শুভ্রার এই অকস্মাৎ অন্তর্দ্ধানে দেশের লোক কি বলিতেছে, তাহা জানিবার জন্য তাহার হৃদয় অত্যন্ত ব্যগ্র হইয়া উঠিল।

হঠাৎ তাহাকে বাড়ী ফিরিতে দেখিয়া বাড়ীর সকলেই আশ্চর্য্য হইয়া গেল। কমনীয় সকলকে বুঝাইয়া দিল আর দু'দিন বাদেই তাহাদের ছুটি হইয়া যাইবে। অনর্থক সেখানে এ দু'দিন বসিয়া থাকার চেয়ে সে দেশে চলিয়া আসিয়াছে।

তুষার জিজ্ঞাসা করিল, "কি রে, সত্যদের বাড়ী গেছলি?"

কমনীয় অবজ্ঞা ভরে উত্তর করিল, "গেছলুম বই কি! তুমি কি মনে কর দাদা, সে এই ভয়ানক কাজটা করে এখনি বাড়ী ফিরে যাবে? সে জানে আমরা সবাই খোঁজ করব, সে সেই জন্যে কলকাতাতেই বোধ হয় যায় নি। খুব সম্ভব, সে অন্য কোন দেশে পালিয়েছে।"

তুষার একটু নীরব থাকিয়া চিন্তিত মুখে বলিল, "সত্য যে এ রকম কাজ করতে পারবে তা আমি কখনো ভাবি নি। আমি তাকে খুব সরল বলেই জানতুম। প্রথম, লেখা পড়ার সে ভারী ভক্ত ছিল, আজকাল গান বাজনাতেই সে দিন কাটিয়ে দেয়। তার বাপ মা বিয়ে দেবার জন্যে এত চেষ্টা করেও কিছুতে তার বিয়ে দিতে পারে নি। তার এ রকম ভাব দেখে আমি তাকে খুব মহৎ বলেই ভাবতুম, সে যে এমন করবে আমি ভাবি নি, ভাবতে পারি নি। ছিঃ, মানুষের নামে একেবারে ধিক্কার দিয়ে গেল সে!"

কমনীয় নীরবে একখানা বইয়ের পাতা উল্টাইতে

লাগিল। তুষার নিজের মনেই বলিল, "আর শুভ্রা, সে যে এমন কাজ করবে তাও আমি ভাবি নি! একবার তাদের বাড়ী যাস কমনীয়, তার পিসিমা আমায় বার বার বলেছে সত্যর খবর নিতে, তাদের খবরটা দিয়ে আসিস।"

কমনীয় খুব মৃদুকণ্ঠে উত্তর দিল, "যাব'খন।"

(ক্রমশঃ)

চাঁদপ্রতাপের ব্রত-কথা।

[শ্রীযোগেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী]

(৮) মাঘ মণ্ডল

পৌষ মাসের সংক্রান্তি দিবস হইতে আরম্ভ করিয়া মাঘ মাসের সংক্রান্তি দিন পর্য্যন্ত প্রত্যহ প্রাতঃকালে বালিকাগণ এই ব্রত করিয়া থাকে। তিনটি দুর্ব্বার 'মোঠা' (গুচ্ছ), পুষ্প-সজ্জিত একটি 'রাইল' (কাঁচা মাটী দ্বারা প্রস্তুত ক্ষুদ্র স্তম্ভ বিশেষ), একটা 'পিঠা' পাতা (গুল্ম-বিশেষের পত্র), একটা 'দধিশ্বর' গাছ, 'খৌরকা মুইঠা' গাছ একটা, দুর্ব্বার 'ঘাই' (গ্রন্থিবিশিষ্ট দুর্ব্বা যাহার গ্রন্থি হইতে অঙ্কুর বাহির হয়) এক গাছি, ও আর একটা লম্বা দুর্ব্বা লইয়া বালিকারা অতি প্রত্যুষে পুকুর ঘাটে যাইয়া 'রাইলটি' ঘাটে স্থাপন করিয়া ও উহার সম্মুখে উপবেশন করিয়া 'মোঠার' অগ্রভাগ দ্বারা জল নাড়িয়া চাড়িয়া ছড়া আবৃত্তি করিয়া থাকে। তৎপর লম্বা দুর্ব্বা গাছটি দ্বারা ব্রতিনীরা জাল (জেলেদের জালের অনুকরণে) বাহিয়া থাকে। তখনও ছড়া বলিতে হয়। শেষে 'রাইল' 'মোঠা' প্রভৃতি সমস্তই জলে বিসর্জ্জন করিয়া তাহারা বাড়ী আসিয়া থাকে। উক্ত উপকরণাদি সকল ব্রতিনীকেই লইতে হয়। বালিকাগণের অভিভাবিকারাই এই সকল উপকরণ পূর্ব্বেই প্রস্তুত করিয়া রাখিয়া দিয়া থাকেন এবং তাঁহারা ব্রতিনীদের ঘাট হইতে বাড়ী ফিরিবার পূর্ব্বেই উঠানে চিত্রাদি অঙ্কিত করিয়া থাকেন। একটি বৃত্ত ও উহার পূর্ব্বে সূর্য্যের মূর্ত্তি, পশ্চিমে চন্দ্রের মূর্ত্তি, উত্তরে মান্দার গাছ ও দক্ষিণে 'গিলা' গাছ ও ত্রিকোণ 'পৃথিবী' (ত্রিকোণ ক্ষেত্র) অঙ্কিত করিতে হয়। এই সকল চিত্রের পার্শ্বে খাট (পালঙ্ক), খড়ম, আয়না, চিরুণী, কৌটা, দোলা অঙ্কিত করা হয়। প্রত্যেক ব্রতিনীর জন্য ঐরূপ চিত্রাদি আঁকিতে হয়। বাড়ী আসিয়া বালিকারা চিত্রিত খাটের উপর দাঁড়াইয়া অঙ্কিত চন্দ্র সূর্য্যাদিকে পুষ্পাঞ্জলি দিতে দিতে ছড়া আবৃত্তি করিয়া থাকে।

ক্রমান্বয়ে পাঁচ বৎসর ব্রত করিয়া ব্রতিনীদিগকে ব্রত প্রতিষ্ঠা (শেষ) করিতে হয়। চন্দ্র সূর্য্যাদি প্রথম বৎসর আঁকিতে হয় ইষ্টকের গুঁড়ি (চূর্ণ) দিয়া। দ্বিতীয় বৎসর চাউলের গুঁড়ি, তৃতীয় বৎসর তুষ (ধানের খোসা) ভস্ম, চতুর্থ বৎসর বেলপাতার চূর্ণ ও শেষ বৎসর আবির দ্বারা চিত্রাঙ্কণ করিতে হয়। অর্থাৎ চিত্রাদির প্রথমতঃ ঈষৎ লাল, পরে শাদা, তাহার পর কাল, তৎপর ধূসর ও সর্ব্ব শেষ বৎসর গাঢ় লাল বর্ণ করা হইয়া থাকে। অন্য কোন দ্রব্য দ্বারা চিত্র আঁকিবার নিয়ম নাই।

এই ব্রত বালিকাদিগকেই করিতে হয়। এ ব্রতে অর্থ ব্যয় করিতে হয় না। শুধু বালিকাগণের ক্ষুদ্র শক্তি দ্বারা যে সকল বস্তু লাভ সম্ভব, অর্থাৎ ফুল দুর্ব্বা ইত্যাদি দ্রব্যই এই ব্রতের উপকরণ। সূর্য্যদেবের উদ্দেশে এই ব্রত করা হইয়া থাকে। ব্রতে পুরোহিতের দরকার হয় না। বালিকারা নিজেরাই যথানিয়মে ব্রত করিয়া থাকে। প্রত্যেক দিন, ব্রত শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত, তাহাদিগকে অভুক্ত থাকিতে হয়।

মাঘ মাসের প্রত্যহ প্রাতঃকালে কোমলমতি বালিকারা সম্মিলিত সুমধুর কণ্ঠে ভক্তিভরে ছড়া আবৃত্তি করিয়া দিঙ্‌মণ্ডল ঝঙ্কারিত করিয়া তোলে। তাহা শুনিতে বড়ই মধুর। ছড়াগুলি বালিকারা যে ভাবে বলিয়া থাকে, তদ্রূপই নিম্নে লিখিত হইল। * এই সকল ছড়া কাহাদের

দ্বারা রচিত, এবং কত কাল যাবৎ প্রচলিত, তাহা জানা যায় না। ছড়াগুলি কবিত্ববিহীন বটে; কিন্তু এগুলি যে বালিকাগণের হিতকামনায় রচিত, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই সকল ব্রতে বালিকাদের স্বধর্ম্মানুরক্তি, গৃহ কর্ম্মাদিতে উৎসাহ ইত্যাদি ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। স্বাস্থ্যের দিক দিয়া দেখিতে গেলেও এই ব্রতে বালিকাদের বিশেষ উপকারই হইয়া থাকে।

বালিকারা পুকুর ঘাটে 'রাইলট' স্থাপন করিয়া সম্মুখে বসিয়া 'মোঠা' দ্বারা ঊর্দ্ধদিকে জল ছিটাইতে ছিটাইতে সমবেত কণ্ঠে সুর করিয়া নিম্নলিখিত ছড়াটি আবৃত্তি করে,—

চক্ষে মুখে পানি (১) দিতে কি কি ফুল ফোটে?
লাল সরষা (২) দুইটী ফুল ফোটে।
কাগে (৩) না ছুইতে রে বগে (৪) নিয়াছিল,
মুই (৫) ছুইলাম দুপলার * আগে।
দুপ্ দুপ্ * সরস্বতী লড়ে না চড়ে,
লড়িয়া চড়িয়া কি বর মাগে?
রাজার দুয়ারে (৬) পাশা করি।
পাশার কড়িটি লয়, লয় বুড়ি, (৭)
তাই দিয়া কিনলাম কবিলেশ্বরা (গাই)।
দে দে কবিলা (গাই) গোবর লাদা, (৮)
তাই দিয়া লেপুম (৯) আমরা সূর্য্যের জাগা (১০)।
জাগা লেইপা (১১) ঘাটে যামু, (১২)
ঘাটে যাইয়া বইঝর খামু (১৩)।
বইঝরের নীচে ঘুঘুরের বাসা,
আমাগ (১৪) সাত বইনের (১৫) একই আশা।

শীতকালে প্রায় প্রত্যহই প্রাতঃকালে দিঙ্মণ্ডল কুয়াসায় আচ্ছন্ন থাকে। কুয়াসা নিবারণার্থ বালিকারা পূর্ব্বোক্ত প্রণালীতে নিম্নলিখিত কবিতা আবৃত্তি করিয়া থাকে;—

খুয়া (১৬) ভাঙ্গুম (১৭) খুয়া ভাঙ্গুম ম্যাচ্লার
(১৮) আগে,
সকল খুয়া ভাইঙ্গা (১৯) গেল বড়ই গাছটির আগে।
দে দে, বড়ই গাছ ঝারা (২০) দে,
ছয় কুড়ি ছয়টা বড়ই লিখিয়া দে।
লিখিতে পড়িতে একটি হইল উনা, (২১)
কাটিয়া ফালামু (২২) শিবের কানের সোনা।
শিবের কানের সোনা না লো, লড়িয়া * পিতল,
এই বর্ত্ত (২৩) করি আমরা মাঘের শীতল।
মাঘের জল ফুটি (২৪) টলমল করে,
উইড়া (২৫) যাইতে পক্ষীটি পইড়া (২৬)
পইড়া মরে।

ইহার পর সূর্য্যদেবকে লক্ষ্য করিয়া ব্রতিনীরা আবৃত্তি করে;—

উঠ উঠ সূর্য্য ঠাকুর ঝিকি মিকি (২৭) দিয়া
না উঠতে পারি আমি নিশির লাইগা (২৮)
নিশিরের পক্কবটী শিয়রে থুইয়া, (২৯)
সূয্য উঠ্বেন কোনখান দিয়া?
বামন (৩০) বাড়ীর ঘাটখান দিয়া।
বামনগ (৩১) মাইয়াগা (৩২) বড় স্যায়ান, (৩৩)
পৈতা যোগায় বিয়ান বিয়ান (৩৪)।

* চিহ্নিত শব্দগুলির কোন অর্থই বুঝিতে পারিলাম না।— লেখক।

(১) জল, (২) সরিষা, (৩) কাকে, এ অঞ্চলে বর্গের প্রথম বর্ণ স্থানে তৃতীয় বর্ণের উচ্চারণ, কোন কোন স্থলে করা হইয়া থাকে। (৪) বকে, (৫) আমরা, মুই শব্দ এ অঞ্চলে ব্যবহৃত নয়। তবে ইহা ছড়ায় ব্যবহৃত কি কারণে হইল, বুঝা যায় না। সম্ভবতঃ যিনি এই ছড়া রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার নিবাস অন্যত্র ছিল। (৬) উঠানে দ্বারে। (৭) পাঁচ গণ্ডা, (৮) কতকটুকু গোময়, (৯) লেপিব, লিপ্ত করিব। (১০) জায়গা, সূর্য্য পূজার স্থান। (১১) লেপিয়া, লিপ্ত করিয়া। (১২) যাইব, (১৩) খাইব।

(১৪) আমাদের; এতদঞ্চলে কথ্য ভাষায় কোন কোন সর্ব্বনাম ও বিশেষ্য একবচনান্ত পদের গ যোগে বহুবচন হয়। (১৫) ভগ্নীর, (১৬) কুয়াসা, (১৭) ভঙ্গ করিব, (১৮) ঘরের চালের নিম্নাংশ, (১৯) ভাঙ্গিয়া, (২০) নাড়া চাড়া, (২১) কম, (২২) ফেলিব, (২৩) ব্রত, (২৪) জলটুকু, (২৫) উড়িয়া, (২৬) পড়িয়া, (২৭) সম্ভবতঃ উজ্জ্বল কিরণ, প্রকৃত অর্থ বোধগম্য হয় নাই। (২৮) লাগিয়া, (২৯) রাখিয়া, (৩০) ব্রাহ্মণ, (৩১) ব্রাহ্মণদের, (৩২) মেয়েটি, (৩৩) সেয়ানা, (৩৪) প্রত্যহ প্রাতঃকালে।

মালিনী লো সই,
মাঘ মণ্ডলের বর্ত্ত করুম, (৩৫) ঘাট পামু (৩৬) কই ?
আছে আছে লো ঘাট, বামন বামন বাড়ীর ঘাট,
রাইত (৩৭) পোয়াইলে (৩৮) বামনরা পৈতা ধোয়
তাত (৩৯)
পৈতার ময়লা খানি পুকইরেতে (৪০) ভাসে,
তাই দেইখা (৪১) মাইলানী (৪২) খলখলিয়া হাসে।
হাসিস না লো মাইলানী, তুই ত আমার সই,
মাঘ মণ্ডলের বর্ত্ত করুম, ঘাট পামু কই ?
আছে আছে লো ঘাট, গোয়াল বাড়ীর ঘাট ইত্যাদি

এইরূপ নাপিত, তাঁতী প্রভৃতি বাড়ীর ঘাটের কথা ছড়ায় আছে। লিপি-বাহুল্যভয়ে সেই সমুদায় লিখিত হইল না। ইহার পর ব্রতিনীরা নিম্নলিখিত ছড়া কহিয়া থাকে,—

উরু * উরু দেখা যায় বড় বড় বাড়ী,
ঐ যে দেখা যায় সূর্য্যের বাড়ী।
কি কর গো সূর্য্যের বউ দুয়ারে বসিয়া ?—
তোমার সূর্য্য আসবেন, বাসবেন খাটে ;
পাও (৪৩) থুইবেন (৪৪) রূপার খাটে ;
স্নান করবেন গঙ্গার ঘাটে ;
কাপড় মেলবেন চাপার ডালে ;
চুল শুকাইবেন বড় ঘরের টুয়েং (৪৫)
তৈল দিবেন সুবর্ণের বাটী (তে) ; (৪৬)
ভাত খাইবেন সুবর্ণের থালে ; (৪৭)
বেঙ্গুন (৪৮) খাইবেন বাটী বাটী ;
আচাইবেন-পিচাইবেন (৪৯) গঙ্গার ঘাটে ;
দাত খোচাইবেন সোনার খোরকায় ; (৫০)
পান খাইবেন বাটায় (৫১) বাটায় ;
সুবারি (৫২) কোটরা (৫৩) ভরা।

(৩৫) করিব, (৩৬) পাইব, (৩৭) রাত্রি, (৩৮) পোহাইলে, (৩৯) তাহাতে, (৪০) পুকুরে, (৪১) দেখিয়া, (৪২) মালিনী, (৪৩) পদ, (৪৪) রাখিবেন, (৪৫) ঘরের চালের উপরের অংশ, (৪৬) পাত্রে, (৪৭) থালায়, (৪৮) বাগুন, (৪৯) আচমন করিবেন, (৫০) শলাকায়, (৫১) ডিবায়, (৫২) সুপারি, (৫৩) কৌটা, এই শব্দটির এ অঞ্চলে ব্যবহার নাই।

তৎপর বালিকারা হুয়ার জাল জলে নাড়িয়া চাঁড়িয়া বলিতে থাকে,—

মামা গ (৫৪) পুকইরে ফালাইলাম (৫৫) জাল,
তা'তে না উঠল কিছু মাছ।
জ্যাঠা গ (৫৬) পুকইরে ফালাইলাম জাল ইত্যাদি।

এইরূপ কাকা, দাদা ইত্যাদিকে লক্ষ্য করিয়া এই ছড়া বলা হইয়া থাকে। ইহার পর,—

সূর্য্যের পুকইরে ফালাইলাম জাল,
তা'তে উঠ্‌ল রাঘব বোয়াল।
উঠল লো নিব (৫৭) আইসা (৫৮) কে ?
ঐ যে আসে লেয়নি (৫৯) খালই (৬০) হাতে
কৈরা। (৬১)
যা যা লেয়নি ধাক্কা-ধুক্কা খাইয়া,
আপনে (৬২) নিমনে যেমন-তেমন কৈরা।
নিলাম লো কুটব (৬৩) আইসা কে ?
ঐ যে আসে কুটনি (৬৪) দাও (৬৫) হাতে কৈরা,
যা যা কটনি ধাক্কা-ধুক্কা খাইয়া,
আপনে কুটুমনে (৬৬) যেমন-তেমন কৈরা।
কুটলাম লো ধুইব (৬৭) আইসা কে ?
ঐ যে আসে ধুয়নি (৬৮) খালই হাতে কৈরা।
যা যা ধুয়নি ধাক্কা-ধুক্কা খাইয়া,
আপনে ধুমনে (৬৯) যেমন-তেমন কৈরা।
ধুইলাম লো বাটনা বাটব (৭০) কে ?
ঐ যে আসে বাট্‌না বাটনি (৭১) বাটা হাতে কৈরা।
যা যা বাট্‌না বাটনি ধাক্কা-ধুক্কা খাইয়া,
আপনে বাটুমনে (৭২) যেমন-তেমন কৈরা।

(৫৪) মামাদের, (৫৫) ফেলিলাম, (৫৬) জ্যাঠাদের, (৫৭) নিবে, লইয়া যাইবে, এ অঞ্চলে এমন কি, ঢাকা জিলার সর্ব্বত্রই ভবিষ্যৎ কালের প্রথম পুরুষের ক্রিয়া বিভক্তি অনেক স্থলেই উত্তম পুরুষের ক্রিয়া বিভক্তির ন্যায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে। (৫৮) আসিয়া, (৫৯) বহনকারিণী, যে লইয়া যাইবে। (৬০) মাছ রাখিবার পাত্র, (৬১) করিয়া, (৬২) স্বয়ং, (৬৩) কুটিবে, কর্ত্তন করিবে। (৬৪) কর্ত্তনকারিণী, (৬৫) দা, মাছ কাটিবার অস্ত্র। (৬৬) কাটিব, (৬৭) ধুইবে, (৬৮) ধৌতকারিণী, (৬৯) পরে ধুইব, (৭০) বাটিবে, পেষণ করিবে। (৭১) পেষণকারিণী, (৭২) পেষণ করিব।

বাটুলাম লো রাঁদব (৭৩) আইসা কে ?
ঐ যে আসে রাঁধুনি কড়াই হাতে কৈরা।
যা যা রাধুনি ধাক্কা-ধুক্কা খাইয়া,
আপ্‌নে রাঁন্ধুমনে (৭৪) যেমন-তেমন কৈরা।
রাঁদলাম লো খাইব (৭৫) আইসা কে ?
ঐ যে আসে খায়নি (৭৬) থাল হাতে কৈরা।
যা যা খায়নি ধাক্কা-ধুক্কা খাইয়া
আপ্‌নে খামুনে (৭৭) যেমন-তেমন কৈরা।
খাইলাম লো আইঠা (৭৮) ধুইব কে ?
ঐ যে আসে আইঠা ধুয়নি গোবর হাতে কৈরা।
যা যা আইঠা ধুয়নি ধাক্কা-ধুক্কা খাইয়া
আপ্‌নে ধুমনে যেমন-তেমন কৈরা ইত্যাদি।
বিছানা করা, শয়ন করা প্রভৃতি এই ছড়ায় আছে।
ইহার শেষে,—
কাইয়া (৭৯) করে কা কা, আথার (৮০) মাটী খা খা,
রাইত পোয়াইয়া যা, কা কা কা।
ইহার পর পিতা ও ভাইদের সৌভাগ্য কামনা।—
থোর্‌কা (৮১) মুঠি (৮২) কাটি-কুটি (৮৩) নখে বান্ধি বোঝা,
বাপ আমার লক্ষেশ্বর, ভাই আমার রাজা।
যদি ভাই রাজা হইতে পার, সুবর্ণের কলসী কাখে লইতে পার।
দধিশ্বর (৮৪) কাটি-কুটি নখে বান্ধি বোঝা,
বাপ আমার লক্ষেশ্বর, ভাই আমার রাজা।
যদি ভাই রাজা হইতে পার, লক্ষের কলসী কাখে লইতে পার।
লক্ষের কলসী লোয়ার (৮৫) কাঠি,
লোয়ার কাঠি লারে বিয়া (৮৬) করে, সকল পারা ভইরা (৮৭) জয় জোকার (৮৮) পড়ে।

(৭৩) রাঁধিবে, (৭৪) রন্ধন করিব, (৭৫) খাইবে, (৭৬) ভোজন-কারিণী, (৭৭) ভোজন করিব, (৭৮) শকড়ী, (৭৯) কাক, (৮০) উনানের, (৮১) ক্ষুদ্র গাছ বিশেষ, (৮২) গুচ্ছ, (৮৩) কর্ত্তন করি, (৮৪) ক্ষুদ্র গাছ বিশেষ, (৮৫) লৌহের, (৮৬) বিবাহ, (৮৭) ভরিয়া, (৮৮) হুলুধ্বনি।

তৎপর,—
দক্ষিণ পারের মালীঝি জাগ নি ?
আমার ফুলের ডালা লইবা নি ?
হাতে কলসী কাখে পোলা, কেমনে লমু আমরা ফুলের ডালা ?
জবার ডালে কে ? ডাইল নামাইয়া দে।
সূর্য্য ঠাকুর চাইচে (৮৯) ফুল, সাজি ভইরা দে।
এইরূপ নানা ফুলের উল্লেখ ছড়ায় আছে। ইহার পর,—
দক্ষিণ পারের মালীঝি ফুলেরে গেলি,
কোন্ কোন্ ফুলে নাইলি-ধুইলি ? (৯০)
কোন্ কোন্ ফুলে শুইয়া ঘুম দিলি ?
কোন্ কোন্ ফুলে রাইত পোয়াইয়া আইলি ?
উত্তর—
জবার ডালে নাইলাম-ধুইলাম ; (৯১)
চাপার ডালে খাইলাম-লইলাম ;
বকুলের ডালে রাইত পোয়াইয়া আইলাম।
এইরূপ পূর্ব্ব, উত্তর ও পশ্চিম পারের মালীঝির উত্তর ছড়ায় আছে। ইহার পর,—
রাইলের কলা বাগে কেরে কাটে পাত ? (৯২)
রাইলের ছোট ভাই সিপাই কাটে পাত।
না কাটিও সিপাইরে না কাটিও পাত,
বাইছা-বাইছা (৯৩) কাট গিয়া বিচাকলার-পাত।
বিচাকলার পাতে রে রাইলে না খায় ভাত,
বাইছা-বাইছা কাট গিয়া কব্‌রি কলার পাত।
কব্‌রি কলার পাতে রে রাইলে না খায় ভাত,
বাইছা-বাইছা কাট গিয়া সব্‌রি কলার পাত।
বিচা, কব্‌রি, শব্‌রি কলার পাত (এ),
ভাত খাইবেন রাইলে তাত।
খাইয়া ওঠ রাইল ঠাকুর খাইয়া ওঠ ভাত,
আমরা সাত বইনে ফালামু পাত।
পাত ফালাইয়া ঘাটে যামু, ঘাটে যাইয়া বইস্থর খামু।

(৮৯) চাহিছে, (৯০) স্নান করিলি, (৯১) স্নান করিলাম, (৯২) পাতা, (৯৩) ভাল দেখিয়া।

বইঅরের তলে তলে ঘুঘুরের বাসা,
আমাগ সাত বইনের একই আশা।
আইস গো সাত বইন ঝাপুরি (৯৪) খেলাই।
ঝাপুরি খেলাইতে পাইলাম টাকা,
তাই দিয়া দিমু (৯৫) আমরা রাইলের বউরে শাখা।
রাইলের বউ লো সাধস্তি (৯৬) কি কি খাইতে সাধ,
আলা-চাইলের (৯৭) খট্‌খটি * পান্তা ভাত।
খাইলাম না লো ছুইলাম না লো, শিয়রে থুইলাম,
রাইত খানি পোয়াইলে আড়া বনে দিলাম।

এইরূপ কুলের টক ইত্যাদির উল্লেখ ছড়ায় আছে। ইহার পর,—

কই যাওরে রাইল গামছা মাথায় দিয়া ?
তোমার ঘরে পোলা (৯৮) হইচে খোপা (কে) জানাও গিয়া।

এইরূপ নাপিত ইত্যাদি। তৎপর,—

রাইলের ঘরে পোলা হইচে নাম থুমু (৯৯) কি ?
বাইছা-বাইছা নাম থুইলাম জগন্নাথ জি।

ইহার পর বিবাহ। নিম্নলিখিত কবিতাটি কহিয়া রাইলটিকে সাতবার ঘুরাইয়া জলে দেওয়া হয়।—

এপারে ওপারে কিসের বাদ্য বাজে ?
রাইলের বেটা গদাধর বিয়া করতে সাজে।
সাজরে সাজস্তি * রাইল মাথায় মটুক (১০০) দিয়া,
আমার রাইলের বিয়া হইব (১০১) দোলায় চড়িয়া।
দোলায় কড়্‌মড়্ (শব্দ) হাতীর আঙ্গাল, (১০২)
ধর্ম্মরাজার বাড়ী নারে একই দুয়ার।
ধর্ম্মরাজ বিয়া করায় গৌরী-পার্ব্বতী,
রাইলগ ফুল ছিটি-ছিটি (১০৩)
আইজ (১০৪) যাওরে রাইল-কাইল (১০৫) আইস,
বচ্ছর বচ্ছর (১০৬) জয় জোকার দিও।
জয় দিম না লো জোকার দিমু,
সোনাধারী ভাইগ (১০৭) আমায় তুইলা (১০৮) কোলে লমু।

ইহার পর বালিকারা বাড়ী আসিয়া চিত্রিত খাটের উপর দাঁড়াইয়া নিম্নলিখিত কবিতাগুলি, ফুল দ্বারা চিত্র স্পর্শ করিয়া, আবৃত্তি করে,—

আমি পূজি গুরার (১০৯) খাট, আমার হইব সোনার খাট।
মাঘ মণ্ডল, সোনার কুণ্ডল ; বাপ রাজা ভাই লক্ষেশ্বর।
মা পাটেশ্বরী, আপনে বিদ্যাধরী।
মাঘ মণ্ডলে ঢাইলা (১১০) ঘি, আমরা বড় মানুসের ঝি।
মাঘ মণ্ডলে ঢাইলা মধু, আমরা বড় মানুসের পুত্রবধূ।
মাঘ মণ্ডলে লইলা লারু, শাখার আগে সোনার খারু। (১১১)।
সূর্য্য পূজুম, (১১২) স্বর্গে উঠুম। (১১৩)
স্বর্গে উইঠা মাগুম (১১৪) বর, ধল ছত্র বড় ঘর।
ছোট বর জামাই আসুক লক্ষেশ্বর।
জটা কাটা বি-জটা (১১৫) তা হইলে কি হয় ?
সা * হয় সু (১১৬) হয়, সাত পুত্রের মা হয়।
চন্দ্র পূজুম চন্দনে, সূর্য্য পূজুম বন্দনে।
চন্দ্র সূর্য্যে দিয়া ফুল, ভাইরা (১১৭) উঠুক তিন (অ)কুল।
উত্তরে মান্দার, সোনা রূপায় আন্ধার।
আমি পূজি গুরার গিলা, আমার হইব সোনার গিলা।
তিন কোণা পৃথিবী পূজুম, নিষ্কলঙ্কে রাজা পূজুম।
আমি পূজি গুরার আয়না, আমার হউক সোনার আয়না।
আমি পূজি গুরার কুটই, আমার হউক সোনার কুটই।
আথা জলন্ত (১১৮) ঢেকি চলন্ত (১১৯) জন্ম জন্ম আয়ন্তি বারন্ত। (১২০)

(৯৪) সন্তরণ. (৯৫) দিব, (৯৬) সাধ ভক্ষণে ইচ্ছা আছে যাহার, (৯৭) আতপ চাউলের, (৯৮) পুত্র, (৯৯) রাখিব, (১০০) মুকুট, (১০১) হইবে, (১০২) শ্রেণী, (১০৩) বর্ষণ, (১০৪) অদ্য, (১০৫) কল্য, (১০৬) প্রতিবৎসর।

(১০৭) ভাইদের, (১০৮) তুলিয়া, (১০৯) চূর্ণের, (১১০) ঢালিয়া, (১১১) বল, এখানে বালা। (১১২) পূজা করিব, (১১৩) উঠিব, (১১৪) মাগিব, (১১৫) জটাহীন, (১১৬) উত্তম, (১১৭) ভ্রাতারা, (১১৮) প্রজ্বলিত, (১১৯) চালিত, (১২০) বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ; জলন্ত, চলন্ত, বারন্ত শব্দ এ অঞ্চলে ব্যবহৃত নহে।

অরে অরে তারা, মাণিকের ঝরা।
নিত্য কাপড় রাত্রবাস, ঝিয়ে ভাতে পঞ্চগ্রাস।
জন্ম ন্যা মাগুম বর, শিশুকালে স্বয়ম্বর।
বড় ঘর ছোট বর, জামাই আসুক লক্ষেশ্বর।
থালে ভাত ঝিঙ্গরে (১২১) পাণি, জন্মে জন্মে আইয় রাণী।
ওঠ খড়মে দিয়া পাও, সূর্য্য ঠাকুর ঘরে যাও।

এইরূপ প্রার্থনার পরই ব্রত শেষ হয়। এই ব্রতের 'কথা' নাই। এই ব্রত নিম্নশ্রেণীর গৃহস্থ বালিকাদিগকে করিতে দেখা যায় না।

বর্জ্জন।

[শ্রীপ্রিয়গোবিন্দ দত্ত এম-এ, বি-এল]

রাত্রি দশটার সময় ক্লাব হইতে আসিয়া রমেশ দেখিল সুশীলা খোকাকে বুকে করিয়া শুইয়া রহিয়াছে, আর টেবিলের উপর ল্যাম্পটা দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছে। "সুশী" ডাকটা তাহার ঠোঁটের ভিতর দিয়া আর একটু হইলেই বাহির হইয়া পড়িত, কিন্তু কি মনে করিয়া রমেশ রসনা সংযত করিয়া ফেলিল। টেবিলের সজ্জিত শৃঙ্খলিত কাগজ-পত্র মিনিট খানেক ধরিয়া রমেশ অন্যমনস্ক ভাবে নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিল পড়িবার মত কিছু আছে কি না। তখনও সুশীলার ঘুম ভাঙ্গিল না দেখিয়া রমেশ পা টিপিয়া টিপিয়া বসিবার ঘরে আসিয়া পড়িল। সেই ঘরের মেঝের উপর পাচক ঠাকুর নাসিকা গর্জ্জন করিয়া নিদ্রাদেবীর আরাধনা করিতেছিল। ভীষণ নাসিকা-গর্জ্জনের শব্দে অতিষ্ঠ হইলেও রমেশ তাহাকে একটি কথাও বলিল না। ধীরে ধীরে চেয়ারে বসিয়া আলোটা উস্কাইয়া দিয়া খবরের কাগজটা খুলিয়া রমেশ বিশেষ মনোযোগ দিয়া পড়িতে লাগিল। লয়েড্ জর্জ্জের পদত্যাগ, বিশ্ববিদ্যালয়ের সমালোচনা, নন্-কো-অপারেশন সংবাদ ইত্যাদি শেষ করিয়া যখন সে পুলিশকোর্টের কলামটা লইয়া বসিল, তখন বড় ঘড়ীটা ঢং ঢং করিয়া বাজিয়া উঠিল। বারটা বাজিতে দেখিয়া রমেশ আর থাকিতে পারিল না। ক্ষুধাও যথেষ্ট বোধ করিতেছিল। খবরের কাগজটা ভাঁজ করিয়া কোন মতে বইএর উপর রাখিয়া রমেশ অস্থির হইয়া উঠিয়া পড়িল। সুশীলার ঘরে আসিয়া দেখিল সে পূর্ব্বের মতই খোকাকে বুকে করিয়া ঘুমাইয়া রহিয়াছে। রমেশ ঝুকিয়া পড়িয়া খোকার গালে ছোট্ট একটি চুম্বন প্রদান করিল। তাহার খেয়ালই ছিল না যে সে ক্লাবে মদ খাইয়া আসিয়াছে এবং সবে মাত্র দুইটি সিগার নিঃশেষ করিয়া ফেলিয়াছে। সুশীলার ঘুম ভাঙ্গিতেই সেই উৎকট গন্ধটা তাহার নাকে গেল। তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিয়াই সুশীলা স্বামীর দিকে মুহূর্ত্তের জন্য তাকাইয়া মাথা নীচু করিয়া একটু ঘুরিয়া বসিল। রমেশ তাহাকে কি যেন বলিতে যাইতেছিল, এমন সময় সুশীলা উঠিয়া খাওয়ার ঘরে তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল।

টেবিলের উপর খাবার সাজাইতে সুশীলার এক মিনিটও লাগিল না। রমেশ খাইতে বসিয়াই কহিল—"আজ বড্ড দেরী হয়ে গেল। তুমি খেয়েছ ত?"

সুশীলা কহিল—"তুমি খাও না।"

রমেশ খাইতে খাইতে অনেক কথাই ভাবিতেছিল—সে যে আজ মদ খাইয়া আসিয়াছে কেবল সেই কথাটাই তাহার মনে আসিতেছিল না। এমন সময় সুশীলা দুধের বাটীটা আনিয়া টেবিলের উপর রাখিল। তাহার দিকে চাহিতেই রমেশ দেখিল সুশীলা কাঁদিতেছে। দমকা হাওয়ার মত সেই মুহূর্ত্তেই রমেশের মনে মদ খাওয়ার কথাটা উদয় হইল। তাড়াতাড়ি দুধ খাইয়া হাত ধুইয়া আসিয়া রমেশ দেখিল সুশীলা কোণের চেয়ারটায় বসিয়া নীরবে কাঁদিতেছে। রমেশ তাহার হাত ধরিতেই সুশীলা হাতটা সরাইয়া লইল। রমেশের চোখও আর্দ্র হইয়া

(১২১) জলপাত্র, এ শব্দেরও এ অঞ্চলে প্রয়োগ দেখা যায় না।—লেখক।

উঠিল। সে কহিল, "সুশী, আজকের দিনটা ক্ষমা কর। আমি আর মদ খাব না। আমি শপথ করছি, আর আমি খাব না বলছি।"

সুশীলা কহিল, "আজই বুঝি তুমি প্রথম এই কথা বলছ, আর শপথ করছ?"

অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া রমেশ কহিল—"সুশী," আর সে বলিতে পারিল না। তাহার চোখ দিয়া টস্ টস্ করিয়া কয়েক ফোঁটা জল গড়াইয়া পড়িল। সুশীলা কহিল, "ছি! তুমি কাঁদছ?"

রমেশ কহিল, "আমায় ক্ষমা কর সুশী। আমি একটা পিশাচ। তোমার কাছে শপথ করেও আমি সে শপথ রাখতে পারি নাই।"

রমেশকে চোখের জল ফেলিতে দেখিয়া সুশীলার মন ভিজিয়া উঠিল। পানের ডিবা হইতে দুইটি পান লইয়া রমেশকে দিয়া কহিল—"না-ও, পান খেয়ে শুয়ে পড়।"

পান দুইটি মুখে দিয়া রমেশ সুশীলার হাতের চুড়িগুলা নাড়িতে নাড়িতে কহিল—"যাও, চারটি খাও গিয়ে।"

সুশীলা কহিল, "তুমি আমার কথা শোন নাই, আমি তোমার কথা শুনব কেন? আমি ঠিক করেছি যেদিন তুমি মদ খাবে সেদিন আমি উপোস করব। যাও, তুমি শোও গিয়ে।"

নিরুপায়ের মত সুশীলার দিকে খানিকক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া রমেশ আপনার ঘরে গিয়া শুইয়া পড়িল। তাহার জন্য সুশীলা অনাহারে থাকিবে, এই কথাটাই তাহার মনের মধ্যে ঘুরপাক খাইতে লাগিল। সুশীলাও খোকার পার্শ্বে শুইয়া পড়িল। মিনিট পাঁচেক বিছানায় অস্থির চিত্তে ভাবিতে ভাবিতে রমেশ পাখাটা হাতে করিয়া উঠিয়া আসিল। ধীরে ধীরে সুশীলার মাথার কাছে মেঝেতে বসিয়া রমেশ সুশীলাকে বাতাস করিতে লাগিল। সুশীলা উঠিয়া বসিয়া কহিল—"আবার এলে যে? যাও না শোও গিয়ে।"

রমেশ—"না, সুশী, আমার ঘুম পাচ্ছে না।"

মিনিট পাঁচেক স্থির হইয়া বসিয়া থাকিয়া সুশীলা কহিল, "আর ত মদ খাবে না?"

রমেশ—"না, খাব না।"

সুশীলা—"যাও, শোও গে, আমি খাব এখন।"

রমেশ—"আমি ততক্ষণ বসে থাকব এখন।"

সুশীলা—"তা' হ'লে আমি কিন্তু খাব না বলছি।"

রমেশ ধীরে ধীরে উঠিয়া বিছানায় গিয়া দেখিতে লাগিল, সুশীলা খায় কি না। একটু পরেই থালার শব্দ, চুড়ীর শব্দ হইতে সে বুঝিল, সুশীলা খাইতে বসিয়াছে।

পরের দিন বৈকালে রমেশ আর বাড়ীর বাহির হইল না। বাড়ীর ছোট লন্‌টায় একটা ইজিচেয়ার টানিয়া আনিয়া পুট হ্যামসুনের "হাঙ্গার" পড়িতে বসিয়া গেল। দিনের আলো নিভিয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাহার পড়াও বন্ধ হইল, আর মনের মধ্যে কেমন একটা অস্থিরতা জাগিয়া উঠিল। সে বুঝিল, ক্লাব আর মদ তাহাকে দৈত্যের মত টানিয়া লইতেছে। ইজি চেয়ারের হাতলটা দুই হাতে শক্ত করিয়া ধরিয়া রমেশ আকাশের দিকে চাহিয়া কহিল—

অসতো মা সদ্গময়,
তমসো মা জ্যোতির্গময়,
মৃত্যোর্মামৃতং গময়।
রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং
তেন মাং পাহি নিত্যং।

মনে একটু শান্তি আসিল। ধীরে ধীরে সিগারেট ধরাইয়া সে ভাবিতে লাগিল, জগতে এমন কি কাজ আছে যাহাতে সে লাগিয়া যাইতে পারে? চরকা হইতে আরম্ভ করিয়া গল্প লেখাতে আসিয়া তাহার মন আটকাইয়া গেল। ছোটবেলায় সে একটু হারমোনিয়ম বাজাইতে শিখিয়াছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের এক পরীক্ষায় সে ড্রইং পাশ করিয়াছিল। এক লাফে চেয়ার হইতে উঠিয়া সে মনে মনে কহিয়া উঠিল—"বেশ, তাই করব। বিকেল বেলা ছবি আঁকব, আর সন্ধ্যা হ'লে বসে বসে হারমোনিয়ম বাজাব।"

ঘরে আসিয়া রমেশ তাহার স্ত্রীকে কহিল—"সুশী, তোমার কাছে টিকিট আছে? ডোয়ার্কিনকে একটা অর্গান পাঠাতে লিখব। তুমিও শিখবে, আমিও শিখব।"

সুশীলা সেলাইএর কলটা বন্ধ করিয়া স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া একটু হাসিল, আর সঙ্গে সঙ্গে কহিল, "তোমার বুঝি ভাল লাগছে না ?"

রমেশ কহিল—"সত্যিই সুশী, ভাল লাগছে না।"

সুশীলা কহিল—"চা খাবে ?"

"মন্দ কি, দাও না" বলিয়া রমেশ সুশীলার পার্শ্বে বসিয়া তাহার উন্মুক্ত কুন্তলের নীচে আঙুল দিয়া এদিক-সেদিক নাড়িয়া দিল। এমন সময় খোকনের বলটা মাটিতে পড়িয়া যাওয়ায় সে কাঁদিয়া উঠিল। সুশীলা কহিল, "খোকাকে একটু রাখ। আমি ঠাকুরকে জল গরম করতে বলে আসি।"

রমেশ খোকাকে কোলে তুলিয়া তাহার দুই গালে আদর বর্ষণ করিয়া কহিল—

খোকা আমার dear
বহুৎ বহুৎ near
সকাল বেলার সিগার
আর সন্ধ্যা বেলার বিয়ার।

এমন সময় সুশীলা আসিয়া কহিল—"ছেলেকে সিগার আর বিয়ার শিখান হচ্ছে দেখছি। দু'দিন বাদে খাওয়াটাও শেখাতে পারবে।"

রমেশ একটু অনুতপ্ত হইয়া কহিল—"সুশী, সত্যি বলছি, আমি ভেবে চিন্তে বলি নাই। কইতে কইতে ওটা মুখ থেকে বেরিয়ে গেল। তুমি খুঁজে দেখ এ ছড়া কোথাও পাবে না।"

সুশীলা একটু হাসিয়া কহিল—"তা, বেশ, তুমি যে একজন দ্বিতীয় বাল্মিকী তা আমি বুঝলুম।"

চা খাওয়া শেষ হইয়া গেলে রমেশ কহিল, "তোমার কাছে তাস আছে ?"

সুশীলা কহিল, "কেন, তাস দিয়ে করবে কি ?"

রমেশ কহিল—"সুশী, সময়টা কাটতেই চাচ্ছে না। এখন মোটে আটটা বেজেছে। ক্লাবে আমাদের দশটা পর্য্যন্ত তাস খেলা হয়। একজোড়া তাস থাকলে তোমাতে আমাতে খেলতুম।"

সুশীলা কোনও উত্তর না দিয়া কলটা ঘট্ ঘট্ করিয়া চালাইতে সুরু করিল। একটা সিগারেট ধরাইয়া কখন যে রমেশ বাহিরের রাস্তায় আসিয়া দাঁড়াইল, তাহা সে বুঝিতেই পারিল না। তখন কেবল তাহার মনে হইতেছিল, তাস—দোকান—আর সুশীলার সঙ্গে বিন্তি খেলা।

কতদূর অগ্রসর হইয়াই রমেশ বুঝিল ক্লাবের পাশ দিয়াই তাহাকে দোকানে যাইতে হইবে। তখনই তাহার জ্ঞান হইল—এ তাস নয়—এ শয়তানের ডাক। তাড়াতাড়ি ঘুরিয়া সে একরকম দৌড়াইতে দৌড়াইতে বাড়ী ফিরিয়া আসিল। সুশীলা বারান্দায় দাঁড়াইয়া ভাবিতেছিল—'বুঝি ক্লাবেই চলে গেল। আজ আবার মদ খেয়ে এসে শপথ করা হবে'। মনে মনে স্বামীর প্রতি রাগও হইল যথেষ্ট। এমন সময় রমেশকে হাঁপাইতে হাঁপাইতে গৃহে প্রবেশ করিতে দেখিয়া তাহার মন আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিল।

রমেশ বিছানায় যাইয়া উপুড় হইয়া পড়িয়া ক্রমাগত ভাবিতে লাগিল, সে শয়তানের দাস হইয়া পড়িয়াছে। তাহার উদ্ধার পাইবার আর উপায় নাই। সে ভগবানকে বারম্বার বলিতে লাগিল—প্রভু, শয়তান কি তোমার কাছে পরাজিত হইবে না ? এই যে লক্ষ লক্ষ লোক 'Thy will be done' বলিয়া কাতরে নিবেদন করিতেছে, তাহাদিগকে কি তুমি অভয় দিবে না ? আমার মত ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র মানবের ক্রন্দন কি তোমার কানে পৌঁছিবে না ?

এমন সময় সুশীলা আসিয়া একটু রুক্ষভাবেই কহিল—"আবার খেয়ে এসেছ বুঝি ?"

রমেশ কহিল—"না সুশী, খাই নাই। তাস আনতে গিয়ে ভয় পেলুম পাছে আবার ক্লাবে গিয়ে বসে পড়ি।"

সুশীলা আশ্বস্ত হইয়া পার্শ্বে বসিয়া পড়িল। তারপর ধীরে ধীরে রমেশের কপালে হাত রাখিয়া কহিল—"তোমার কি খুব কষ্ট হচ্ছে ?"

সুশীলার হাত দুইখানি দুই হস্তে জড়াইয়া নিজের বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া রমেশ কহিল—"কৈ, কষ্ট ত বুঝছি না। কেমন যেন একটা অস্থিরতা বোধ হচ্ছে মাত্র। এতদিনের কু-অভ্যাস একেবারে চেপে বসেছে। কেবল ঘুরে-ফিরে সেই ক্লাবের কথাই মনে পড়ছে।"

সুশীলা তখন ঠোঁট ফুলাইয়া কহিল—" এ পৃথিবীতে

বোধ হয় ঐ ক্লাব আর মদ, এই দুটোকেই তুমি সব চেয়ে বেশী ভালবাস ?"

রমেশ সুশীলাকে আরও কাছে টানিয়া লইয়া কহিল—"এই বুঝি তোমার বুদ্ধি! আমার দ্যুলোক ভূলোকের মাণিক রতন যে কে, তা বুঝি তোমার জানা নাই ?"

সেদিনের মত রমেশ ক্লাব আর মদের নেশা হইতে মুক্তি পাইল।

আরও এক সপ্তাহ রমেশ নানা উপায় ও সতর্কতা অবলম্বন করিয়া আপনাকে ক্লাব ও মদের স্পর্শ হইতে বাঁচাইয়া রাখিল।

শনিবার দিন বৈকালে রমেশকে জলখাবার দিতে দিতে সুশীলা কহিল—"কেন, আমাদের পাড়ায়-ই ত ডাক্তার কবিরাজ আর মাষ্টার রয়েছেন। তুমি তাঁদের নিয়ে নিজের বাড়ীতে বসেই ত তাস খেলতে পার ?"

রমেশ কহিল—"বাস্তবিক! যা বল্লে capital."

সুশীলা কহিল—"আরও capital বলতে হবে। আমি তোমাদের জন্য দুইজোড়া তাস আনিয়ে রেখেছি। তুমি যাও, তাঁ'দিকে নিয়ে আস গিয়ে। আমি কিছু মিষ্টিও করে রেখেছি। পানও সাজিয়ে রাখব এখন।"

রমেশ খাইতে খাইতে কহিল—"বেশ! বেশ! ঠাকুরকে চা'র জলও চড়িয়ে রাখতে বলো।"

সেইদিন হইতেই রমেশের বাড়ী তাসের একটা রীতিমত আড্ডা জমিয়া উঠিল। ক্লাব ও মদের নেশা একেবারে চলিয়া গিয়াছে ভাবিয়া রমেশ হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল।

এদিকে ক্লাব-ঘরে রমেশকে লইয়া নানা কথাই উঠিতে লাগিল। রমেশের মত গণ্যমান্য মেম্বরের অভাব সকলেই অনুভব করিল।

সেদিন 'কাপ' ফাইনাল খেলা হইবে। রমেশের নামেও কার্ড আসিয়াছে। বড় সাহেব preside করিবেন। সুতরাং রমেশের পক্ষে না যাওয়াটা একেবারেই শোভনীয় হইবে না। সর্ব্বোৎকৃষ্ট সিল্কের সুটটা পরিয়া রমেশ সুশীলার কাছে গিয়া দাঁড়াইল।

সুশীলা তখন খোকাকে পোষাক পরাইয়া খেলা দেখাইবার জন্য তৈয়ার করিতেছিল। রমেশ কহিল—আমি একটু আগেই যাই। তুমি ছকুয়ার সঙ্গে খোকাকে পাঠিয়ে দিও।

সুশীলা একটু হাসিয়াই কহিল—"ফিরতে কিন্তু রাত করো না।"

রমেশ খেলার যায়গায় উপস্থিত হওয়ামাত্র তাহার বন্ধুবান্ধব সকলে মিলিয়া তাহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া বসাইল। সুরেশ তাহার পার্শ্বেই বসিয়াছিল। সে কহিল—"আজ আমাদের সৌভাগ্য বলতে হবে। আমরা ত ভেবেছিলুম তুমি ডুব দিয়েই থাকবে।" এমন সময় রেফ্রীর বাঁশী বাজিয়া উঠিল। আর দেখিতে দেখিতে খেলা আরম্ভ হইল।

হাফ্ টাইমের সময় রমেশ যাইয়া সাহেবের সঙ্গে দেখা করিল। সাহেব কহিল—"রমেশবাবু, আপনার সঙ্গে অনেক দিন দেখা হয় নাই। এই নাগরপুর থানাটায় কো-অপারেটিভ সোসাইটি অর্গানাইজ করবার ভার আপনার উপর না দিলে কোন কাজ হবে বলে বোধ হয় না। কাল আটটায় আপনি আমার ওখানে একবার যাবেন। আরও অনেক কথা আছে, তখন হবে। যাবেন ত কাল ?"

'Most gladly" বলিয়া রমেশ আপনার যায়গায় ফিরিয়া আসিল।

খেলা শেষ হওয়ার পর সাহেব একটি ছোট-খাট বক্তৃতা প্রদান করিয়া কাপ ও মেডাল প্রদান করিলেন। আর সঙ্গে সঙ্গে চতুর্দ্দিক হইতে সকলে হুররে, হুররে, রবে গর্জ্জিয়া উঠিল। খেলা উপলক্ষ করিয়া ক্লাবে জলযোগের ব্যবস্থা হইয়াছিল। সাহেব রমেশকে কহিলেন—"আপনি ত ক্লাবে আসছেন ?"

"O! Yes." বলিয়া রমেশ সাহেবের সঙ্গে সঙ্গে চলিল।

ক্লাবে সাহেব বেশীক্ষণ রহিলেন না। এক গ্লাস আমেরিকান সিরাপ খাইয়াই ঘড়ী বাহির করিয়া কহিলেন,—"আমার engagement আছে। দুঃখের বিষয় আর থাকতে পারছি না।"

সাহেব চলিয়া গেলে রমেশও উঠিয়া পড়িল। সুরেশ কহিল—"তোমারও engagement আছে নাকি ?"

যতীন বলিল—"বড্ড hen-pecked হয়ে পড়েছিস্।" কেশব কহিল—"আজ এক বাজী ব্রীজ না খেললে তোমাকে ছাড়ছি না বাবা।" রাজেন কহিল—'ওকে ছেড়ে দাও হে। নইলে গিন্নি ওকে ডাইভোর্স করবে।" নিরাপদ কহিল—"বাবা, মালিনী মাসীকে দু'দিনেই ভুলে গেলে?"

এই রকম নানা প্রকার অভ্যর্থনা ও সমালোচনায় আপ্যায়িত হইয়া রমেশ ব্রীজের টেবিলে বসিয়া পড়িল। প্রথম বারটা জিতিয়াই রমেশ উঠিতে চাহিল। নিরাপদ কহিল—"বেশ ত, চাঁদ, আমাদের টাকাগুলো পকেটস্থ করে' অমনি বেমালুম লম্বা!"

রমেশ কহিল—"বেশ, তোমাকে দিতে হবে না।"

সুরেশ কহিল—"ও কেন তোমার ভিক্ষে নেবে? ও বীরের মত জিতে নেবে।"

সুতরাং রমেশকে আবার বসিতে হইল। এমন সময় পার্শ্বের টেবিলে দুঃখী মা তরলবাহিনীকে তাঁহার সরঞ্জাম সহ লইয়া আসিয়া টেবিলের উপর বসাইল। পাঁচ মিনিটের মধ্যেই সকলে এক পেগ করিয়া প্রসাদ পাইল। রমেশ যে সুরেশ্বরীকে প্রত্যাখ্যান করিল তাহা তাসের ঝোঁকে কেহই লক্ষ্য করিল না। দ্বিতীয় পেগের বেলাতেও রমেশের নিষ্ঠা কাহারও নজরে পড়িল না। তৃতীয় পেগের বেলায় নিরাপদ ধরিয়া ফেলিল, আর অমনি বলিয়া উঠিল—"কি বাবা! অমৃতে অরুচি বাবা! এ ধম্মে সইবে না।" তখন সকলের দৃষ্টি এক সঙ্গে রমেশের উপর পড়িল। সুরেশ কহিল—"এত অরসিক হ'লে ক'দিন থেকে হে?" যতীন কহিল—"এ কিন্তু ভারী অন্যায়।" কেশব কহিল—"এতে কিন্তু আমাদিগকে আর এই ক্লাবকে অপমান করা হচ্ছে।" নিরাপদ বলিয়া উঠিল—"আলবৎ।"

সকলের বাক্যবাণে জর্জ্জরিত হইয়া রমেশ নিরাপদের হাত হইতে মদের গ্লাসটা লইয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়া কহিল—"Your health". আর সকলে এক এক পেগ হাতে লইয়া উচ্চস্বরে কহিল—"Your health, রমেশ।"

আর একটু হইলেই রমেশ সুরেশ্বরীকে উদরস্থ করিয়া ফেলিত। কিন্তু বিদ্যুতের মত তাহার মনে সুশীলার কথা মনে হওয়ায় সে হাতের গ্লাসটা দরজার দিকে ছুড়িয়া ফেলিল। আর সঙ্গে সঙ্গে লাঠি আর টুপি লইয়া তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া পড়িল।

রাস্তায় আসিয়া রমেশ শুনিল সকলে বলিতেছে—মস্ত একটা বুনো uncivilised hen-pecked fool. রমেশ আরও তাড়াতাড়ি বাড়ীর দিকে ছুটিয়া চলিল। সুশীলা রমেশের প্রতীক্ষায় বসিয়াছিল। রমেশ গৃহে প্রবেশ করিতেই সে কহিল—"ক্লাবে গিয়েছিলে বুঝি?"

রমেশ কহিল—হাঁ, গিয়াছিলাম, কিন্তু মদ খাই নাই।

সুশীলা বলিল—কিন্তু মদের গন্ধে যে ঘরটা ভরে গেল।

রমেশ কহিল—তোমাকে ছুঁয়ে বলতে পারি, আজ কিছু খাইনে। মদের গ্লাসটা একদম ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছি। আমার গায় হয় ত পড়ে থাকবে, তাই গন্ধ পাচ্ছ।

কাপড় ছাড়িয়া রমেশ সুশীলাকে কহিল—"দেখ ত আমার পোষাকটা ত নষ্ট হয় নাই?" সুশীলা আলোর কাছে লইয়া দেখিল বাস্তবিকই ট্রাউজারের একটা পা মদে ভিজিয়া গিয়াছে। সুশীলার মনে যা' একটু সন্দেহ ছিল তাহাও চলিয়া গেল।

পরের দিন সাহেবের কাছে দেখা করার ফলে তাহার উপর অনেক কাজের ভার আসিয়া পড়িল। সেই সকল কাজ লইয়া তাহাকে সদর মফস্বলে অনেক ঘুরা-ফেরা করিতে হইল। ক্লাব ও মদের ঝোঁক আরও কমিয়া গেল।

এদিকে রমেশের সমালোচনা বাহির হইতে লাগিল বিস্তর। রমেশ যে স্ত্রীর ভয়ে মদ ছাড়িয়াছে সেই কথাটাই সকলে বেশী করিয়া কহিতে লাগিল। নিরাপদ প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিল—"আমি রমেশকে এক পেগ খাওয়াব তবে ছাড়ব।" রমেশের মত এত বড় একটা পাণ্ডা তাহাদের দল হইতে খসিয়া পড়িলে তাহাদের ক্ষতিও যথেষ্ট—এই ভাবিয়া সকলে একমনে মন্ত্রণা করিতে লাগিল, কি করিলে এই বুনো রমেশটাকে আবার সভ্য করা যায়।

নিরাপদ কহিল—"আমার plan ঠিক হয়ে গেছে। তোরা সব, যা বলব তাই করবি। রমেশ ত রমেশ, স্বয়ং ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির এলে তাঁকেও এক পেগ খাইয়ে দেব।"

সেদিন শনিবার। রমেশ তাহার বৈঠকখানায় কেবল

দুই বাজী তাস খেলিয়াছে মাত্র। এমন সময় সাহেবের চাপরাশী আসিয়া কহিল—"সাহেব সেলাম দিয়া।"

রমেশ পোষাক পরিয়া বাহিরে আসিয়া দেখিল চাপরাশী তখনও বসিয়া আছে। সাহেবের বাড়ীর দিকে অগ্রসর হইতেই চাপরাশী কহিল—"সাব্ ক্লাবমে গিয়া।"

রমেশ তখন ক্লাবের দিকে চলিল। রমেশকে দেখিয়া সাহেব কহিল—"আপনাকে দেখে বড়ই সুখী হলুম।" তারপর রাস্তা, সমবায় সমিতি সংগঠন আর নূতন কূয়োর distribution লইয়া রমেশের সঙ্গে সাহেবের অনেক কথা হইল। এমন সময় সুরেশ আর যতীন কয়েক প্লেট ফল, বিস্কুট, কেক্ আর মিষ্টি আনিয়া টেবিলের উপর রাখিল। অন্যদিক হইতে দুঃখা আসিয়া বোতল গ্লাস ইত্যাদি রাখিয়া গেল। নিরাপদ সিরাপ, সোডা ইত্যাদি আরও অনেক জিনিস আনিয়া রাখিল।

নিরাপদ কহিল—"আপনারা ক্ষমা করবেন। আজ আমাদের ক্লাবের surprise party."

সাহেব কহিলেন—"যথেষ্ট ধন্যবাদ।"

সুরেশ কহিল—"সমস্ত বাংলা দেশে আমাদের ক্লাবের নাম আছে। গবর্ণর পর্য্যন্ত এখানে এসে ভোজ খেয়ে গেছেন। ঐ দেখুন তাঁর ফটো রয়েছে।

সকলের সঙ্গে সঙ্গে রমেশও খানকয়েক বিস্কুট আর কয়েক টুকরা ফল মুখে ফেলিয়া দিল। এমন সময় যতীন এক প্লেট ফুল্কো লুচি লইয়া আসিয়া কহিল—"সার, আমাদের ইণ্ডিয়ান ডিস্, একবার টেষ্ট করুন।"

সাহেব ডইখানি লুচি মুখে পুরিয়া কহিল, "marvellous."

এমন সময় হরি মোক্তার কহিল—"আরও marvellous সার, যদি ঐ রসোগোল্লা with সার।" সাহেব এক গাল হাসিয়া কাঁটায় বিঁধাইয়া একটা রসোগোল্লা মুখের মধ্যে ফেলিয়া দিল।

এদিকে নিরাপদ আসিয়া রমেশের কানে কানে কহিল—"আজ ভাই একটা পেগ খেতে হবে। এক পেগে জাত যাবে না।"

সুরেশ আসিয়া কহিল—"আজ আর ভাই scene দেখাস নে।"

রমেশের মনে ভীষণ এক আন্দোলন উপস্থিত হইল। এমন সময় সাহেব এক পেগ ঢালিলেন। নিরাপদ এক পেগ ঢালিয়া রমেশের সম্মুখে রাখিল। তারপর সবাই এক একটা পেগ হাতে লইয়া সাহেবের সঙ্গে সঙ্গে লাফাইয়া উঠিল। সাহেব কহিলেন—"Health of my young friends here."

যন্ত্রচালিত কলের ন্যায় রমেশও তাহার পেগটাকে খাইয়া ফেলিল। পরের পেগটা হাতে লইয়া সকলে সাহেবের health propose করিল। বাধ্য হইয়া রমেশকে সে পেগও পান করিতে হইল।

তারপর Good night বলিয়া সাহেব চলিয়া গেলেন। আর সঙ্গে সঙ্গে রমেশের মনে একটা তীব্র অনুশোচনা জাগিয়া উঠিল—"কেন আমি সাহেবের খাতিরে মদ খা লাম? মদের বদলে জল খাইলেই ত চলিয়া যাইত। আমি যদি স্পষ্ট বলিতাম, আমি মদ ছাড়িয়া দিয়াছি তা হ'লে কি আমার মাথা কাটা পড়িত? ছিঃ! ভীরুর মত কি কুকার্য্যই না করিলাম!"—এইরূপ রমেশ অনেক ভাবিল।

বাড়ীর দরজার গোড়ায় আসিতেই রমেশের মনে হইল —কেমন করিয়া সে সুশীলার নিকট উপস্থিত হইবে। তাহার নিকট শপথ করিয়াও সে যখন মদ খাইল তখন তাহার কথার মূল্য, ভালবাসার মূল্য যে কত তাহা বুঝিতে সুশীলার কি দেরী হইবে? মদের গন্ধ পাইলে সুশীলার মনে কতই না আঘাত লাগিবে।—এই রকম শত সহস্র কথা রমেশের মনে উদয় হইতে লাগিল। সে আর বাড়ীতে প্রবেশ করিতে পারিল না। ধীরে ধীরে ফিরিয়া সে খেলার মাঠে আসিয়া উপস্থিত হইল; মাঠের চারিদিকে সে ক্রমাগত ঘুরিতেই লাগিল। ট্রেজরীর ঘড়িতে যখন ঢং করিয়া একটা বাজিল তখন তাহার খেয়াল হইল যে সুশীলা তাহার অপেক্ষায় না খাইয়া বসিয়া রহিয়াছে। তাহার জন্য সে অনাহারে থাকিবে এই কথাটা তাহার বুকে তীরের মত বাজিল। আর মুহূর্ত্ত মাত্র অপেক্ষা না করিয়া সে বাড়ীর দিকে ছুটিল।

ঠাকুর বলিয়া বার তিনেক ডাকিতেই পাশের ঘরের

দরজা খুলিয়া গেল। সেই দরজা দিয়া প্রবেশ করিতেই সুশীলা কহিল—"আজ তুমি বড়ই ভাবিয়ে তুলেছিলে। ঠাকুরকে আলো দিয়ে ক্লাবে পাঠালুম। সে ফিরে এসে বল্লো, তুমি সেখান থেকে অনেকক্ষণ চলে এসেছ। এখন ত একটা বেজে গেছে।

রমেশ কহিল—"সুশী, আমি একটা মহা পাষণ্ড। প্রতিজ্ঞা ভেঙ্গে ফেলেছি। আজ আবার মদ খেয়েছি। তুমি আমার মত পাষণ্ডকে ক্ষমা করতে পারবে সুশী?"

সুশীলা কহিল—"মদ খেয়েছ, বেশ করেছ। এখন চারটে ভাত খাবে চল। তুমি ফিরে এসেছ, তাই আমার সৌভাগ্য।"

রমেশকে ভাত দিয়া সুশীলা নিজের ভাতটাও বাড়িয়া খাইতে বসিয়া গেল।

রমেশ কহিল—"এই সাহেব যদি না থাকত তবে আর কিছুতেই আমাকে মদ খাওয়াতে পার তো না সুশী। সাহেব নিজে আমাদের health propose করলে, তাই খেয়ে ফেললুম। তারপর আবার সকলে মিলে তাঁর health propose করলে, তাই আবার খেতে হ'লো।"

সুশীলা একটু হাসিয়াই কহিল—"তা বেশ করেছ। আর খেও না।"

সুশীলার স্নিগ্ধ ভাব দেখিয়া রমেশের অনুতাপের মাত্রা আরও বাড়িয়া উঠিল।

পরের দিন রমেশকে চা দিতে দিতে সুশীলা কহিল— "তোমাদের ক্লাব ত একটা জুয়া আর মদের আড্ডা। ক্লাব থেকে এ দুটো উঠিয়ে দিতে পার না?"

রমেশ ভাবিল—এ ত মন্দ কথা নয়। ক'জন মেম্বরই বা মদ খায়, আর বাজী রেখে ব্রীজ খেলে! সাধারণ সভায় রিজলিউসন করে' এ দুটোকে উঠিয়ে দিতেই হবে। রমেশ আর বিলম্ব না করিয়া রিজলিউসনের একটা খস্‌ড়া করিয়া ফেলিল। বুড়ো বুড়ো মেম্বরদের বাড়ী গিয়া রমেশ তাঁহাদিগকে ঐ রিজলিউসনটা সমর্থ করিতে বলিল। ঘণ্টা দুই ঘুরিয়া রমেশ দেখিল তাহার পক্ষে নেহাৎ কম মেম্বর নয়। তাহার দল যাহাতে আরও পুষ্ট হয়, এই অভিপ্রায়ে সে তাহার বন্ধুবান্ধব মধ্য হইতে আরও নূতন মেম্বর ভর্ত্তি করাইয়া লইল। তার দুই দিন পরে ক্লাবের সেক্রেটারী রমেশের রিজলিউসনটা আঁটিয়া একটা সাধারণ সভার নোটিশ বাহির করিলেন।

নোটিশ পাইয়া নিরাপদর দল ক্ষেপিয়া উঠিল। তাহারাও তাহাদের দল পুষ্ট করিতে লাগিল। তাহারা বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া বলিতে লাগিল—আমরা নিজের পয়সায় একটু আমোদ করি, তাতে আপত্তি হওয়ার মানে কি? রমেশের দলের জন কতক আসিয়া পড়িল।

সাহেবের সভাপতিত্বে সাধারণ সভা বসিলে রমেশ তাহার রিজলিউসনটা প্রস্তাব করিতে উঠিল। এমন সময় স্থানীয় মুসলমান সবরেজেষ্টার প্রায় দশ বারজন অনুচর সহ উপস্থিত হইলেন।

রমেশের বক্তৃতা শেষ হওয়া মাত্র সবরেজেষ্টার সাহেব উঠিয়া কহিলেন—"এই ক্লাব হইল সাধারণের জিনিস। আর এই সাধারণের অর্দ্ধেক হচ্ছে মুসলমান। আপনারা জানেন, মুসলমানদের পক্ষে মদ আর জুয়া খেলা হারাম। এখানে এ দু'টি থাকাতে একজন মুসলমানও এই ক্লাবের মেম্বর স্বেচ্ছায় হ'তে পারে না। এ দুটো না উঠিয়ে দিলে মুসলমানের উপর অত্যন্ত অবিচার করা হবে।"

সবরেজেষ্টারের কথা শুনিয়া নিরাপদের দল আর কোনও কথা বলিতে পারিল না। সাহেবও সকলকে বুঝাইয়া দিলেন—"এই ক্লাবের জন্য মুসলমান টাকা দিয়াছে। এখন মুসলমানদের feelings অমান্য করলে বাস্তবিক অন্যায় করা হবে।"

সুতরাং রমেশের প্রস্তাব গৃহীত হইল। বুড়োরা সকলে রমেশকে ধন্যবাদ দিয়া কহিলেন—"তুমিই বাবা এই বদমায়েসের আড্ডাটা ভাঙ্গতে পারলে।"

বাড়ী আসিয়া রমেশ কহিল—"সুশী, আজ হ'তে ক্লাব থেকে জুয়া আর মদ উঠে গেল।"

সুশীলা বেশ একটু হাসিয়া কহিল—"বেশ, এখন বাড়ীতে বসে মদ খেও আর জুয়া খেল।"

"খুব splendid idea, স্বীকার করতেই হবে।"—বলিয়াই রমেশ সুশীলার দিকে অগ্রসর হইল। সুশীলা হাসিতে হাসিতে তাড়াতাড়ি খোকার নিকট গিয়া আশ্রয় লইল।

গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

[শ্রীপ্রিয়লাল দাস, এম-এ, বি-এল]

উদ্ধৃত শ্লোকে কবি দুর্গাপ্রসাদ বলিতেছেন যে, গঙ্গা "চুনাখালি" ও "সয়দাবাজ" নামে স্থান দুইটীকে পশ্চাতে রাখিয়া দক্ষিণদেশে প্রবাহিতা হইলেন। গঙ্গা যখন ভগীরথ কর্ত্তৃক আনীত হন তখন "চুনাখালি" ও "সয়দাবাজ" বা সয়দাবাদের অস্তিত্ব ছিল না। ইহার কারণ, ভগীরথ রামায়ণের যুগে এই কার্য্য সমাধা করিয়াছিলেন। সেই জন্য কবি জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "কোথা ছিল চুনাখালি, কোথা সয়দাবাজ?" দুর্গাপ্রসাদ বর্ত্তমান মুর্শিদাবাদের উপকণ্ঠে অবস্থিত এই দুইটি স্থানের উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু বঙ্গের রাজধানী মুর্শিদাবাদের উল্লেখ করেন নাই। ইহার কারণ, যে সময়ে 'গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী' রচিত হয় সে সময়ে রাজধানী ঢাকায় ছিল। মুর্শিদকুলী খাঁ ১৭০৪ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৭২৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত মুর্শিদাবাদের মসনদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া রাজত্ব করিয়াছিলেন। তিনি ১৭০৪ খৃষ্টাব্দে ঢাকা হইতে রাজধানী উঠাইয়া দিয়া নিজ নামে গঙ্গার তীরে ইতিহাস-প্রসিদ্ধ উক্ত রাজধানী স্থাপনা করেন। আলোচ্য কাব্যগ্রন্থ যদি মুর্শিদকুলী খাঁর রাজত্বকালে রচিত হইত তাহা হইলে দুর্গাপ্রসাদ নিশ্চয়ই মুর্শিদাবাদের উল্লেখ করিতেন। 'গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী' যে অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল, উদ্ধৃত শ্লোকে কবির নিজের কথা হইতে তাহা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে। "চুনাখালি" ও "সয়দাবাদে"র পর দুর্গাপ্রসাদ "পলাশী"র উল্লেখ করিয়াছেন। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, দুর্গাপ্রসাদের সময়ে 'পলাশী" নামে গ্রামখানি ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দের যুদ্ধে ধ্বংস হইয়া গিয়াছিল। তাহার পর উক্ত গ্রামের অনেকটা অংশ গঙ্গার গর্ভে বিলীন হইয়া যায়। কবির সময়ে আম্রকানন-সুশোভিত "পলাশী" গ্রাম গঙ্গার তীরে জীবন্ত ইতিহাস রচনা করিতেছিল। সে সময়ে ইহার উপর ঢাকার নবাবের বিশেষ আধিপত্য ছিল না। নবদ্বীপাধিপতির অধীনে প্রাচীন "পলাশী" গ্রামখানি নদীয়া-রাজ্যে ভাগীরথীর পূর্ব্বতীরস্থ উল্লেখযোগ্য সর্ব্বপ্রথম গ্রাম বলিয়া কবি গঙ্গার গতিপথে ইহার বিশিষ্ট স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন। নদীয়া-রাজ্যের বাহিরে ভাগীরথীর তীরে "চুনাখালি" ও "সয়দাবাদ" কবির সময়ের উল্লেখযোগ্য স্থান বলিয়া উদ্ধৃত শ্লোকে এই দুইখানি গ্রামের নামও স্থান পাইয়াছে। এতদ্ব্যতীত, "পলাশী"র ন্যায় এই গ্রাম দুইখানিও আম্রকাননের জন্য সুবিখ্যাত ছিল। দুর্গাপ্রসাদ হয়ত সেই কারণেও এই তিনখানি গ্রামের নাম পর পর উল্লেখ করিয়াছেন। "চুনাখালি" ও "সয়দাবাদ" কবির সমকালে প্রসিদ্ধি লাভ করিবার আরও একটি কারণ এই যে, এতদঞ্চলে আর্ম্মানিগণ বসবাস করিতেন এবং তাঁহারা একটি গির্জ্জাও নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। গঙ্গার পূর্ব্বতীরে এই তিনখানি গ্রামের পর পশ্চিম তীরে কবির সময়ের "কাঁটোয়া" গ্রামের উল্লেখ আলোচ্য কাব্যগ্রন্থে দেখা যায়। বৈষ্ণব কাব্য-সাহিত্যে এই গ্রাম বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। শ্রীযুত কুমুদনাথ মল্লিক মহাশয় তাঁহার সুবিখ্যাত গ্রন্থ 'নদীয়া-কাহিনী'তে লিখিয়াছেন,—"১৫১৯ খৃষ্টাব্দে উত্তরায়ণ সংক্রান্তির গভীর নিশায় গোপনে গৃহত্যাগ করতঃ মাঘের দারুণ শীত উপেক্ষা করিয়া সন্তরণে গঙ্গা পার হইয়া শ্রীগৌরাঙ্গ কাঞ্চন নগরে (কাটোয়ায়) উপস্থিত হইয়া শ্রীকেশব ভারতীর সহিত মিলিত হইলেন।" (১০) কুমুদ বাবু ভ্রমবশতঃ এস্থলে "কাটোয়া"কে 'কাঞ্চন নগর' বলিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যদেবের সেবক কর্ম্মকার কবি গোবিন্দদাসের করচায় লিখিত আছে,

"পার হয়ে প্রভু চলে কণ্টক নগরে।
পেছনে পেছনে যাই সেবা করিবারে॥"

(১০) "নদীয়া কাহিনী" দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০৯ পৃষ্ঠা।

গঙ্গার পশ্চিমতীরে অবস্থিত এই কণ্টক নগরই বর্দ্ধমান কাঁটোয়া গ্রাম। কাঞ্চন নগর উক্ত কর্ম্মকার কবি গোবিন্দদাসের জন্মস্থান। গোবিন্দ কবি করচায় আত্মপরিচয় দিয়া লিখিয়াছেন,—

"বর্দ্ধমানে কাঞ্চন নগরে মোর ধাম।
শ্যামদাস পিতৃ নাম গোবিন্দ মোর নাম॥
অস্ত্র হাতা বেড়ি গড়ি জাতিতে কামার।
মাধবী নামেতে হয় জননী আমার॥"

শ্রীচৈতন্যদেবের সমসাময়িক জয়ানন্দ নামে আর একজন বৈষ্ণব কবি তাঁহার রচিত "চৈতন্য মঙ্গল" নামে কাব্য-গ্রন্থে লিখিয়াছেন,—

"মুকুন্দ দত্ত বৈদ্য গোবিন্দ কর্ম্মকার।
মোর সঙ্গে আইল কাটোআ গঙ্গাপার॥"

প্রত্নতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাখালরাজ রায় 'বর্ত্তমান বর্দ্ধমান' শীর্ষক প্রবন্ধে লিখিয়াছিলেন,—"শ্রীগৌরাঙ্গদেব বর্দ্ধমান জেলার কাঁটোয়ায় সন্ন্যাসধর্ম্মে দীক্ষিত হন। বর্দ্ধমান জেলায় শ্রীখণ্ড, কুলীনগ্রাম প্রভৃতি স্থানে বহু বৈষ্ণব জন্মগ্রহণ করিয়া বর্দ্ধমান জেলাকে পবিত্র করিয়া গিয়াছেন। কড়চা-প্রণেতা গোবিন্দদাস বর্দ্ধমানের কাঞ্চন নগর পল্লীতে জন্মগ্রহণ করেন। চৈতন্যচরিতামৃত রচয়িতা শ্রীকৃষ্ণদাস, কবিরাজ ঝামটপুরে, চৈতন্য-মঙ্গল-প্রণেতা জয়ানন্দ আমাইপুরে ও চৈতন্য-মঙ্গল-প্রণেতা লোচনদাস বেনগ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।" ঐতিহাসিক গবেষণার আলোকে কাঁটোয়া সম্বন্ধে কুমুদ বাবুর উক্ত ভ্রম সেইজন্য উজ্জ্বলভাবে ফুটিয়া বাহির হইয়াছে। "কাঁটোয়া"র পর গঙ্গার পশ্চিম তীরে দুর্গাপ্রসাদ "বারহাট ইন্দ্রাণী" নামক স্থানের উল্লেখ করিয়াছেন। গঙ্গার পশ্চিম তীরে এই সুবিখ্যাত তীর্থের নাম কৃত্তিবাস ইন্দ্রেশ্বর ঘাট, বিপ্রদাস ইন্দ্রঘাট, মাধবাচার্য্য ইন্দ্রাণী ও মুকুন্দরাম ইন্দ্রঘাট দিয়াছেন। এই তীর্থের উৎপত্তি সম্বন্ধে কৃত্তিবাস যাহা বলিয়াছেন তাহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। এক্ষণে এই স্থানের উল্লেখ কোনও গ্রন্থে দেখা যায় না। দুর্গাপ্রসাদের সময়ে বর্দ্ধমান জেলায় অবস্থিত গঙ্গার পশ্চিম তীরে এই তীর্থ স্থানটি যে বঙ্গদেশ-প্রবাহিনী গঙ্গার মাহাত্ম্য জাগাইয়া রাখিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্য বিদ্যামহার্ণব "বর্দ্ধমানের ইতিকথা"য় লিখিয়াছেন,—"কাঁটোয়া সহরের ৪।॰ মাইল দক্ষিণ পূর্ব্ব দাইহাট। এক সময়ে এই স্থান ইন্দ্রাণী পরগণার কেন্দ্র ছিল। তিন শত বৎসর পূর্ব্বে কবি কাশীরাম এই ইন্দ্রাণীকে লক্ষ্য করিয়া লিখিয়াছিলেন,—

"ইন্দ্রাণী নামেতে দেশ পূর্ব্বাপর স্থিতি।
দ্বাদশ তীর্থেতে যথা বৈসে ভাগীরথী॥"

এই দ্বাদশ তীর্থের ঘাট বিধ্বস্ত অবস্থায় পড়িয়া আছে, গঙ্গা তাহার এক মাইলেরও দূরে সরিয়া গিয়াছেন।" বারহাট ইন্দ্রাণীর পর কবি গঙ্গার পূর্ব্বতীরে "মাটীয়ারী"র উল্লেখ করিয়াছেন। 'মাটীয়ারী"র কথা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। "ভবানন্দ বাগোয়ান হইতে মাটীয়ারিতে রাজধানী স্থাপনা করেন।" (৬) দুর্গাপ্রসাদের সমসাময়িক নদীয়ার রাজা রাঘব মাটীয়ারি হইতে রেউই নামক স্থানে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। সেই কারণে, কবি "মাটীয়ারী"র উল্লেখ মাত্র করিয়াছেন। দুর্গাপ্রসাদের সমকালে মাটীয়ারির প্রসিদ্ধি লোপ পাইয়া নূতন রাজধানী রেউই যে তৎকালীন নদীয়াবাসিদের সামাজিক ইতিহাসে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছিল তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। রাঘবের পুত্র রুদ্র রায়ের সময়ে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর এজেণ্ট ও ইংরাজদিগের বঙ্গদেশস্থ কারখানা সমূহের শাসনকর্ত্তা মিঃ হেজেস্ (Mr. Hedges) তাঁহার রোজনামচায় (Diary Vol. I) ১৬৮১ খৃষ্টাব্দে রেউই নামক স্থানের উল্লেখ করিয়াছেন। রেউই কবির সময়ে নদীয়া রাজ্যের রাজধানী হইলেও খড়িয়া নদীর তীরে অবস্থিত এই স্থানের নাম যে দুর্গাপ্রসাদ গঙ্গার গতিপথ বর্ণনায় লিপিবদ্ধ করেন নাই, তাহা সমীচীন বলিয়া বোধ হয়। এতদ্ব্যতীত ভবানন্দ মজুমদারের সময় হইতে মাটীয়ারির নাম বাঙ্গালীর নিকট অন্য কারণে সুপরিচিত হইয়াছিল। কুমুদ বাবু "নদীয়া-কাহিনী"তে লিখিয়াছেন,—"প্রতি বৎসর আষাঢ় মাসে অম্বুবাচীর সময় এখানে প্রায় পক্ষকালব্যাপী এক মেলা বসিয়া থাকে। নদীয়া জেলার মুসলমানগণের যতগুলি দরগা বা পীরের আস্তানা আছে

তন্মধ্যে এইটি সবিশেষ প্রসিদ্ধ। এখানকার পীর "মল্লিক গস্" নামে খ্যাত। "মল্লিক গস্" উপাধি বিশেষ, "মলি-অল-গস্" হইতে ইহার উৎপত্তি। গস্ শব্দে ফকির বুঝায়, মলি-অল অর্থে বাদসা অর্থাৎ ফকীরের বাদসা। এই আস্তানাটী কতদিনের প্রাচীন তাহা স্থির নিশ্চয়ে বলা যায় না, তবে কিম্বদন্তী এইরূপ যে, যখন কৃষ্ণনগর রাজবংশের পূর্ব্বপুরুষ ভবানন্দ মজুমদার এই মাটীয়ারিতে তাঁহার রাজধানী স্থাপনা করেন তখন উক্ত পীর ও তদীয় ভ্রাতা করিম দুইটী শিষ্য (একজন রজক অপর নাপিত) সমভিব্যাহারে এখানে আগমন করেন। স্থানীয় মুসলমানগণ করিমের বিবাহ প্রস্তাব করিলে করিম তাহাতে অস্বীকৃত হইয়া এখান হইতে একক্রোশ দূরবর্ত্তী গোবিন্দপুরে গমন করেন ও তথায় তিনি জাহির হয়েন এবং তাঁহার মৃত্যুর পর এইস্থানেই তাঁহার কবর হয়। দুই ভ্রাতাই সিদ্ধ-পুরুষ ছিলেন, যাহাকে যাহা বলিতেন তাহাই সিদ্ধ হইত। মল্লিক গসের পার্শ্বে তাঁহার শিষ্য দুইটীরও কবর হয়। এই পীরের কৃষ্ণনগরের রাজাদের দত্ত অনেক পীরোত্তর ছিল, কিন্তু এখন উহা কতক জমীদারের খাসদখলে কতক সেবাইতগণের নিজস্ব সম্পত্তি হইয়া গিয়াছে। মেলার প্রথম তিন দিন ৮।০ সহস্র লোক সমবেত হয়। এই মেলায় মুসলমানগণের টুপী, হাতা, বেড়ী, কড়া প্রভৃতি লোহার সামগ্রী, কাটকাটরা ও মনোহারী দ্রব্য ইত্যাদি বিক্রীত হয়।" (৬)

"মাটীয়ারি"র পর দুর্গাপ্রসাদ "অগ্রদ্বীপে"র উল্লেখ করিয়াছেন। কবির কথা হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে "অগ্রদ্বীপ" তাঁহার সময়ে গঙ্গার পূর্ব্বতীরে অবস্থিত ছিল। কৃত্তিবাস, বিপ্রদাস, মাধবাচার্য্য ও মুকুন্দরাম "অগ্রদ্বীপে"র উল্লেখ করেন নাই। ভারতচন্দ্র "অন্নদামঙ্গলে" মানসিংহ ও ভবানন্দের ইতিহাস লিখিতে গিয়া কয়েকবার "অগ্রদ্বীপে"র উল্লেখ করিয়াছেন। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ভবানন্দ যখন মানসিংহের সহিত দিল্লীযাত্রা করেন, তখন নিজগ্রাম বাগোয়ান হইতে বহির্গত হইয়া,—

"বাটীর নিকটে খড়ে পার হৈলা নায়ে চড়ে,
অগ্রদ্বীপ গেলা-কুতূহলে।
অঞ্জলি বান্ধিয়া মাথে, প্রণমিয়া গোপীনাথে,
স্নান দান কৈলা গঙ্গাজলে॥
মনে করি অনুভব, গঙ্গারে করিলা স্তব,
কৃতাঞ্জলি হয়ে মজুন্দার।
ব্রহ্ম কমণ্ডলুবাসি, বিষ্ণুপাদ প্রসূতাসি,
শিব জটাজূটে অবতার॥
সগরসিংহ তব তীরে, শরট করট কিরে,
ন হন ভূপতি তব দূরে।
রাজ্য লোভে দূরে যাই, তব তীরে রাজ্য পাই,
এই মনস্কাম যেন পূরে॥
স্তবে হয়ে তুষ্ট মন, গঙ্গা দিলা দরশন,
মজুন্দারে কহেন সরসে।
ধন্য তুমি মজুন্দার, ব্রতদাস অন্নদার,
আমি ধন্যা তোমার পরশে॥
মহাসুখে দিল্লী যাবে, মনোমত রাজ্য পাবে,
মোর তীরে পাবে অধিকার।
সন্তান হইবে যত, সবে হবে অনুগত,
অনেক হইবে রাজা তার॥
দিয়া এই বরদান, গঙ্গা কৈলা অন্তর্দ্ধান,
মজুন্দার হৈলা গঙ্গাপার।" ইত্যাদি।

ভবানন্দ মজুমদার দিল্লী হইতে দেশে ফিরিবার পথে "ত্রিবেণীর স্নান হেতু প্রয়াগে আইল।" ভারতচন্দ্র এই স্থলে ভবানন্দের মুখ দিয়া গঙ্গার মহিমা বর্ণন করিয়াছেন আর সেই সঙ্গে বঙ্গদেশ-প্রবাহিনী গঙ্গার একখানি ক্ষুদ্র মানচিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। এই মানচিত্রে গঙ্গাতীরবর্ত্তী "অগ্রদ্বীপে"র স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

"শিব জটা মুক্ত হয়ে, ভাগীরথী নাম লয়ে,
একা আসি ত্রিবেণী হৈলা।
সরস্বতী যমুনারে, মিলাইয়া দুই ধারে,
মধ্যভাগে আপনি রহিলা॥
ভগীরথে লয়ে সঙ্গে, বারাণসী দেখি রঙ্গে,
আন গঙ্গা দক্ষিণের বাটে।
জহ্নুমুনি গিয়াছিল, পুনঃ উগারিয়া দিল,
জাহ্নবী হইলা জহ্নু ঘাটে।

রাজা ভগীরথ রায়,　　আগে আগে নাচি যায়,
সাধু সাধু কহে দেবগণ।
পূর্ব্বে গেলা পদ্মা হয়ে,　　ভাগীরথী নাম লয়ে,
মোর দেশে দিলা দরশন॥
খিবিয়া মেহানা দিয়া,　　অগ্রদ্বীপ নিরখিয়া,
নবদ্বীপে পশ্চিম বাহিনী।
পুনশ্চ ত্রিবেণী হৈলা,　　দক্ষিণ প্রয়াগ কৈলা,
ত্রিবেণীতে ত্রিলোকতারিণী॥
শতমুখী রূপ ধরি,　　সাগর সঙ্গম করি,
মুক্ত কৈলা সগর সন্তানে।
বেদ যাঁর বিজ্ঞ নহে,　　কে তাঁর মহিমা কহে,
ভারত কি কবে কিবা জানে॥"

ভবানন্দ মজুমদার নানা তীর্থ দর্শন করিয়া স্থলপথে বঙ্গদেশে ফিরিয়া আসিলেন।

"বনভূমি এড়াইয়া রাঢ়ে উপনীত।
দেখিয়া দেশের মুখ মহা হরষিত॥
অজয় হইয়া পার করিলা গমন।
ডানি বামে যত গ্রাম কে করে গণন॥
কাটোয়া রহিল বামে গঙ্গার সমীপ।
গঙ্গা পার হইয়া পাইল অগ্রদ্বীপ॥
গঙ্গা স্নান করিয়া দেখিলা গোপীনাথ।
করিলা বিস্তর স্তব করি যোড়হাত॥
সেইখানে নানা মতে ভোজন করিলা।
বাড়িতে সংবাদ দিতে বাস্থ পাঠাইলা॥"

ভবানন্দের ভৃত্য বাস্থ বাগোয়ানে আসিয়া মজুমদারের গৃহিণীদ্বয়কে সংবাদ দিল এবং 'কতগুলি লোক যোগ্য চাকর রাখিয়া॥ পরদিনে বাস্থ অগ্রদ্বীপে উত্তরিলা।" বাস্থ অগ্রদ্বীপে ফিরিয়া আসিলে ভবানন্দ "ঢাকায় নবাব হৈথা পাঠায়ে উকীল। ডঙ্কা দিয়া বাগোয়ানে হইল দাখিল॥" "অন্নদামঙ্গল" হইতে উদ্ধৃত শ্লোকগুলি পাঠ করিয়া বুঝা যায় যে, ভারতচন্দ্রের মতে ভবানন্দের সময়ে "অগ্রদ্বীপ" গঙ্গার পূর্ব্বতীরে অবস্থিত ছিল। নবদ্বীপ, অগ্রদ্বীপ প্রভৃতি স্থানের উৎপত্তি সম্বন্ধে মতভেদ আছে। ইংরাজ ঐতিহাসিকদিগের মতে অগ্রদ্বীপ প্রাচীন নবদ্বীপেরই উত্তর সীমান্তের প্রথম দ্বীপ। নরহরি চক্রবর্ত্তীর "নবদ্বীপ-পরিক্রমা"য় কিন্তু অগ্রদ্বীপের নামোল্লেখ নাই। এই সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণব গ্রন্থের মতে নবদ্বীপ যদিও নয়টি দ্বীপের সমষ্টি তাহা হইলেও "পৃথক্ পৃথক্ কিন্তু হয় একক গ্রাম।" নরহরি উক্ত নয়টি দ্বীপ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—

"দ্বীপ নাম শ্রবণে সকল দুঃখ ক্ষয়।
গঙ্গা পূর্ব্ব পশ্চিম তীরেতে দ্বীপ নয়॥
পূর্ব্বে অন্তর্দ্বীপ শ্রীমন্ত দ্বীপ হয়।
গোদ্রুমদ্বীপ শ্রীমধ্যদ্বীপ চতুষ্টয়॥
কোলদ্বীপ ঋতু জহ্নু মোদদ্রুম আর।
রুদ্রদ্বীপ এই পঞ্চ পশ্চিমে প্রচার॥"

(১) অন্তর্দ্বীপ, (২) সীমন্তদ্বীপ, (৩) গোদ্রুমদ্বীপ, (৪) মধ্যদ্বীপ, (৫) কোলদ্বীপ, (৬) ঋতুদ্বীপ, (৭) জহ্নুদ্বীপ, (৮) মোদদ্রুমদ্বীপ, (৯) রুদ্রদ্বীপ এই নয়টি নামের উৎপত্তি ও উক্ত নামের স্থানগুলির যে নাম নরহরির সময়ে লোকে জানিত "নবদ্বীপ-পরিক্রমা"য় তৎসম্বন্ধে উপাদেয় তথ্য লিপিবদ্ধ হইয়াছে। আলোপুর, সিমলিয়া, গাদিগাছা, মাজিতাগ্রাম, কুলিয়া-পাহাড়পুর, রাতুপুর, জান্নগর, মাউগাছি ও রাতপুর বা রুদ্রডাঙ্গা, এই নয়টি নরহরির সময়ের প্রাচীন নবদ্বীপের নূতন নামের তালিকাতেও অগ্রদ্বীপের নাম নাই। উক্ত নয়টি দ্বীপের মধ্যে অন্তর্দ্বীপ, সীমন্তদ্বীপ, গোদ্রুমদ্বীপ ও মধ্যদ্বীপ বর্তমান সময়ে গঙ্গার পূর্ব্ব পারে ও কোলদ্বীপ, ঋতুদ্বীপ, মোদদ্রুমদ্বীপ, জহ্নুদ্বীপ ও রুদ্রদ্বীপ গঙ্গার পশ্চিম পারে অবস্থিত আছে। মিঃ গ্যারেট্ (J. H. E. Garrett) নদীয়া জেলার গেজেটিয়ারে লিখিয়াছেন যে, নবদ্বীপ সহর পূর্ব্বে একটি দ্বীপের উপর অবস্থিত ছিল, ইহাকে পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ের অগ্রদ্বীপ হইতে পৃথকভাবে নির্দ্দেশ করিবার জন্য নবদ্বীপ বলা হইত। [the town originally stood on an island which was called Nabadwip (i. e. new island), to distinguish it from Agradwip (former island)] গ্যারেট্ সাহেব কিম্বদন্তী অবলম্বন করিয়া এই কথা বলিয়াছেন। অগ্রদ্বীপ শ্রীচৈতন্যের সময়েও গঙ্গার পূর্ব্ব পারে অবস্থিত ছিল। এক্ষণে নবদ্বীপ

ও অগ্রদ্বীপ গঙ্গার পশ্চিম পারে অবস্থিত। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত কনষ্টেবলের মানচিত্রে অগ্রদ্বীপ গঙ্গার পশ্চিম তীরে অবস্থিত দেখা যায়। (Constable's Hand Atlas of India) নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্য বিদ্যামহার্ণব সম্পাদিত "বর্দ্ধমানের ইতিকথা" নামক বর্দ্ধমানের সংক্ষিপ্ত ইতিহাসে লিখিত হইয়াছে, "অগ্রদ্বীপ এক্ষণে কাঁটোয়া মহকুমার অন্তর্গত। ইহা বর্দ্ধমান জেলার একটি প্রধান তীর্থস্থান। পূর্ব্বতন অগ্রদ্বীপ বর্ত্তমান অগ্রদ্বীপের প্রায় অর্দ্ধক্রোশ উত্তরে ছিল, গঙ্গার গতি পরিবর্ত্তনের সহিত গ্রামও ক্রমে সরিয়া আসিয়াছে। * * আজও বারুণী উপলক্ষে এখানে ১৫ দিনব্যাপী বড় মেলা হয়, তাহাতে প্রায় লক্ষ লোকের সমাগম হয়। "নবদ্বীপ ও অগ্রদ্বীপ কবে যে গঙ্গার পূর্ব্বতীর হইতে গঙ্গার গতি পরিবর্ত্তনের সহিত উক্ত নদীর পশ্চিম তীরে স্থাপিত হইয়াছিল তৎসম্বন্ধে কোনও ঐতিহাসিক স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। কুমুদ বাবু "নদীয়া-কাহিনী"তে লিখিয়াছেন, "কিঞ্চিদধিক শত বর্ষের পূর্ব্বেও নবদ্বীপ গঙ্গার পূর্ব্বকূলে স্থাপিত ছিল এবং উহার পূর্ব্ব দিয়া জালাঙ্গী বা খড়ে প্রবাহিত ছিল। গোয়ালপাড়া গ্রামে তখন নবদ্বীপের পূর্ব্ব সীমা বাহিনী জালাঙ্গী ও পশ্চিম সীমা বাহিনী গঙ্গার সম্মিলন ছিল। কথিত আছে ১২০৬ সনের প্রবল বন্যায় গঙ্গার স্রোত নবদ্বীপের পশ্চিমতলবাহিনী খাত পরিত্যাগ করিয়া পূর্ব্বতলবাহিনী জালাঙ্গী খাতে প্রবাহিত হয় এবং নবদ্বীপ তদবধি গঙ্গার পশ্চিমকূলে গিয়া পড়িয়াছে এবং বর্ত্তমান নবদ্বীপের উত্তর পূর্ব্ব কোণে গঙ্গা জালাঙ্গির সঙ্গম দাঁড়াইয়াছে। এই পরিবর্ত্তন ফলে "শ্রীচৈতন্যদেবের নবদ্বীপের" যে কিছু অবশিষ্ট চিহ্ন বিদ্যমান ছিল তাহা সমস্তই প্রায় ধ্বংস অথবা স্থানভ্রষ্ট হইয়া পড়ে।" (৬) কুমুদ বাবু যে সূত্রে এই কিম্বদন্তী শুনিয়াছিলেন তাহার মূলে যদি সত্য থাকে তাহা হইলে বলিতে হয় যে, ১২০৬ সন অর্থাৎ ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে নবদ্বীপ গঙ্গার পূর্ব্ব তীর হইতে পশ্চিম তীরে স্থাপিত হইয়াছিল, কিন্তু নবদ্বীপের স্থান পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে "অগ্রদ্বীপের"ও যে স্থান পরিবর্ত্তন হইয়াছিল, এ কথা কুমুদ বাবু বলেন না। নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্য বিদ্যার্ণব মহাশয় "বর্দ্ধমানের ইতিকথা"য় লিখিয়াছেন যে, ভূকৈলাসের মহারাজ জয়নারায়ণ ঘোষালের পিতা ১১৭১ সালে অর্থাৎ ১৭৬৪ খৃষ্টাব্দে "অগ্রদ্বীপে" আসিয়াছিলেন। তাঁহার সহযাত্রী কবি বিজয়রাম "তীর্থমঙ্গলে" লিখিয়াছেন,—

> "অগ্রদ্বীপ আসি নৌকা হৈল উপস্থিত॥
> সেইখানে গোপীনাথ ঠাকুরের ঘর।
> অপূর্ব্ব নির্ম্মাণ বাটী দেখিতে সুন্দর॥
> রাজা নবকৃষ্ণের বাড়ী আছেন গোপীনাথ।
> দর্শন না পায়্যা যাত্রী মাথে মারে ঘাত॥"

বিপিনবিহারী মিত্র কর্ত্তৃক ১২৮১ সালে সঙ্কলিত কলিকাতাস্থ শোভাবাজার নিবাসী মহারাজা নবকৃষ্ণ দেব বাহাদুরের জীবন-চরিতে লিখিত আছে,—"নবকৃষ্ণের দ্বিতীয় কার্য্য দেবপ্রতিষ্ঠা—তিনি মহাসমারোহে স্বীয় ভবনে শ্রীশ্রীগোপীনাথজীউ এবং শ্রীশ্রীগোবিন্দজীউ নামে দুইটি দেববিগ্রহ স্থাপনা করেন এবং এই উপলক্ষে বল্লভপুরের রাধাবল্লভজীউ, সাইমানার নন্দদুলাল, খড়দহের শ্যামসুন্দর, অগ্রদ্বীপের গোপীনাথ, বিষ্ণুপুরের মদনমোহন প্রভৃতি নানা স্থান হইতে প্রসিদ্ধ দেববিগ্রহ আনয়ন এবং প্রত্যাবর্ত্তনকালে তাঁহাদের সকলকে বহুমূল্যের অলঙ্কার প্রদান করেন।" নবকৃষ্ণ অপর সকল দেববিগ্রহ প্রত্যাবর্ত্তন করেন কিন্তু কৃষ্ণনগরাধিপতি কৃষ্ণচন্দ্রের নিকট প্রাপ্ত অগ্রদ্বীপের গোপীনাথকে প্রত্যাবর্ত্তন করেন নাই। নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় বলেন যে, "গোপীনাথের অধিকারী রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রাজা নবকৃষ্ণের নিকট তিন লক্ষ টাকা ধারিতেন। সেইজন্য রাজা নবকৃষ্ণ অগ্রদ্বীপের গোপীনাথকে লইয়া যান। অবশেষে কৃষ্ণনগরাধিপতি মোকদ্দমা করিয়া সেই মূর্ত্তি উদ্ধার করেন।" তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, অগ্রদ্বীপের গোপীনাথ মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের জীবদ্দশায় সুদীর্ঘকাল কলিকাতায় মহারাজা নবকৃষ্ণের ভবনে ছিলেন। "গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী" যদি কৃষ্ণচন্দ্রীয় যুগে রচিত হইত, তাহা হইলে দুর্গাপ্রসাদ গঙ্গার গতিপথ বর্ণনায় অগ্রদ্বীপের কথায় লিখিতেন না,—

> "এখনো সেখানে আছে অপূর্ব্ব মন্দির।
> গোপীনাথ বিরাজ করেন সদা-স্থির॥"

"গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী" কাব্য যে অষ্টাদশ শতাব্দীতে মুর্শিদাবাদের নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ ও তাঁহার সমসাময়িক কৃষ্ণনগরের রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সময়ে রচিত হয় নাই এবং সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ ব্যতীত অপর কোনও সময়ে রচিত হইতে পারে না, ইহার আরও একটি উৎকৃষ্ট প্রমাণ অগ্রদ্বীপের ইতিহাসে আছে। গোপীনাথ বিগ্রহের জন্যই অগ্রদ্বীপ সুপ্রসিদ্ধ। শ্রীচৈতন্যদেব এই বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন এবং তাঁহার ভক্ত গোবিন্দ ঘোষকে উক্ত বিগ্রহের পূজক নিযুক্ত করিয়াছিলেন। গোবিন্দ ঘোষ অপুত্রক ছিলেন। তিনি গোপীনাথ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার পর বহুদিন জীবিত ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর গোপীনাথ তাঁহার পুত্ররূপে চৈত্র মাসে কৃষ্ণা একাদশীতে শ্রাদ্ধ করেন। এখনও প্রতি বৎসর গোপীনাথ-কর্তৃক ঐদিনে ঘোষঠাকুরের শ্রাদ্ধক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া থাকে। গোবিন্দ ঘোষের মৃত্যুর পর তাঁহার ভ্রাতৃবংশধরগণ গোপীনাথের পূজকের কার্য্য করিতেন এবং তাঁহাদের শিষ্যসংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। কথিত আছে যে, ঘোষঠাকুরের ভ্রাতৃবংশধরগণের অজ্ঞাতসারে তাঁহাদের কোনও এক ধনী শিষ্য গোপীনাথকে গোপনে লইয়া পূর্ব্ববঙ্গে পলায়ন করিতেছিল, কিন্তু পথে পাটুলির রাজবংশের লোকেরা তাহার নিকট হইতে কাড়িয়া লইয়া আসে এবং তদবধি গোপীনাথ ঘোষবংশের হাত-ছাড়া হইয়া পড়িলেন। পাটুলির রাজাদিগের নিকট হইতে কৃষ্ণনগরের রাজা কৃষ্ণচন্দ্র কিরূপে গোপীনাথকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, কার্ত্তিকেয় চন্দ্র রায়-প্রণীত "ক্ষিতীশবংশাবলীচরিত" নামক গ্রন্থে তাহার বিস্তারিত বিবরণ স্থান পাইয়াছে। কুমুদবাবু "নদীয়া-কাহিনী"তে বোধ হয় উক্ত বিবরণ সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। "নবাব মুরসিদকুলীর সময়ে যখন অগ্রদ্বীপ পাটুলির রাজাগণের এলেকাধীন ছিল এবং যখন এখানকার শ্রীশ্রীগোপীনাথজীউর মেলায় প্রতি বৎসর অন্যূন এক লক্ষ লোকের সমাবেশ হইত, তখন এখানকার এই অসাধারণ জনতায় পিষ্ট হইয়া কতকগুলি লোক প্রাণত্যাগ করে। এই সংবাদ নবাবের কর্ণগোচর হইলে, তিনি এইরূপ অকারণ নরহত্যায় ক্রুদ্ধ হইয়া যখন ঐ স্থানের জমিদারকে শাস্তি দিবার জন্য, অগ্রদ্বীপ কোন্ জমিদারের জমিদারী-ভুক্ত এই বিষয় জমিদারগণের পক্ষের মোক্তারদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তখন, কি জানি প্রভুর কি শাস্তি হইবে মনে করিয়া উক্ত জমিদারের মোক্তার অন্যান্য মোক্তার-গণের সহিত ঐ স্থান তাঁহার মনিবের নহে এই কথা বলায় নবদ্বীপাধিপতির সুচতুর মোক্তার এই অপ্রত্যাশিত সুযোগে কাতরকণ্ঠে উহা তাঁহার মনিবের এলাকাধীন স্বীকার করিয়া, যথাবিহিত উত্তরদানে নবাবের ক্রোধ শান্তি করিয়া চতুরতাফলে অগ্রদ্বীপ প্রাপ্ত হইয়া স্বীয় প্রভুকে জ্ঞাপন করেন। তখন নদীয়ার রাজা, শ্রীশ্রীগোপীনাথজীউকে এইরূপ অপ্রত্যাশিতরূপে স্বীয় তত্ত্বাবধানে প্রাপ্ত হইয়া আপনাকে সৌভাগ্যশালী মনে করেন এবং তাঁহার সেবার নিমিত্ত বর্ত্তমান কুষ্টিয়া ও তন্নিকটবর্ত্তী কতিপয় গ্রাম দেব-সেবায় অর্পণ করেন ও ঐ সকল স্থানের নাম রাখেন গোপীনাথবাদ।" (৬) এই সকল অবিসম্বাদী ঐতিহাসিক ঘটনা যদি দুর্গাপ্রসাদের জীবদ্দশায় ঘটিত, তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই "গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী"তে ইসারায় তাহার আভাস দিতেন। আলোচ্য কাব্যগ্রন্থ যে অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল, তৎসম্বন্ধে প্রমাণ কবির রচিত নিম্নোদ্ধৃত কতকগুলি শ্লোকেও পাওয়া যায়। গঙ্গা অগ্র-দ্বীপ ছাড়িয়া চলিলেন।

"পাটুলি দক্ষিণে করি, প্রেমানন্দে সুরেশ্বরী,
নবদ্বীপ সমীপে আইলা।
গঙ্গাকে সারদা কন, মম ভক্ত বিবরণ,
আছে হেথা বলিয়া চলিলা॥
অম্বিকা পশ্চিম পারে, শান্তিপুর পূর্ব্ব ধারে,
রাখিলা দক্ষিণে গুপ্তিপাড়া।
উল্লাসে উলার গতি, বড় মূলে ভগবতী,
চণ্ডিকা নহেন যথা ছাড়া॥
বৈশাখেতে যাত্রা হয়, লক্ষ লোক কম নয়,
পূর্ণিমা তিথিতে পুণ্যচয়।
নৃত্য গীত নানা নাট, দ্বিজ করে চণ্ডী পাট,
মনে যে মানস সিদ্ধি হয়॥
কুলীন সমাজ নাম, কিবা লোক কিবা গ্রাম,
কাশী তুল্য হেন ব্যবহার।
দয়া ধর্ম্ম বর্ত্তে যথা, কি কব লোকের কথা,
মুনি যেন হেন কুলাচার॥"

(ক্রমশঃ)

ঘুমের দেশের গান।

[শ্রীমতী আলোকলতা গুপ্ত বি-এ]

নিদ্ মহলের অশান্ পরী,
ঘুমটী তোমার ভাঙ্গ্লে কে ?
সুর্ম্মা আঁকা নয়ন-কোণে,
বিজ্‌লী বাতী জ্বাল্‌লে কে ?
নিদ্ মহলের নিদ্ গহ্বরে,
কোন্ সে রাতির কোন্ প্রহরে ?
থম্‌থমে ঐ আঁধার বুকে,
বাজ্‌খাই সুর হান্‌লে কে ?

কোন্ সে রাজার কোন্ সে তনয়,
ঠিকটী তোমায় বল্‌ব কি ?
কোন্ সে চখীর কোন্ সে চখা,
সন্ধানে তার চল্‌ব কি ?
কোন্ সে কাঠির কোন্ সে পরশ ?
মর্ম্ম মাঝে তুললে হরষ ?
কোন্ সে বনের স্বপ্নে পাওয়া,
সবুজ কাঁচা আমলকী ?

জাগ্‌তে হবে, ভাঙ্গতে হবে,
দেখ্‌লে স্বপন্ চল্‌বে না।
স্বপ্ন-পুরীর ঘুমের গানে,
পাষাণ কারা গল্‌বে না॥
জাগ্‌বে বেদন্ কাট্‌তে বাঁধন,
উঠ্‌বে পাছে প্রিয়ার কাঁদন্
উঠুক তাহা শুন্‌বো নাকো
শক্ত হিয়া টল্‌বে না॥

নিদ্ মহলের অশান্ পরী
জাগ্‌বে তবে জাগ্‌বে কি ?
স্বপ্ন রঙ্গীন ঘুমের বাঁধন
কাট্‌বে কি গো কাট্‌বে কি ?
যে যার স্বপন নিজের কাজে
চল্‌বে আপন পথের মাঝে
তখনও কি ঘুমের ঘোরে
থাক্‌বে বসে থাক্‌বে কি ?

ঘুমটী মেরে চুপ্‌টী করে,
থাক্‌ব বসে জাগ্‌ব না।
নিদ্ মহলের থম্‌থমে ঘুম,
ভাঙ্গবো নাকো ভাঙ্গব না॥
স্বপ্ন যখন সত্য বেশে,
ডাক্‌বে আমার সাম্‌নে এসে,
শুনেও তারে শুন্‌বো নাকো,
ডেকেও তারে ডাক্‌বো না॥

ঠিক্ সে কথা, ঠিক সে কথা,
কিন্তু তাহা পার্‌বে কি ?
সত্য সে যে পাষাণ হিয়া,
টান্‌বে তোমায় ছাড়্‌বে কি ?
বাজ্‌বে যখন বাজ্‌বে তুরী,
নিদ্ মহলের পাষাণ পুরী,
পড়্‌বে খসে চূর্ণ হয়ে
সার্‌বে কি তা সার্‌বে কি ?

বল্‌তে আমি পারব নাকো,
স্বপ্ন তাহা শুন্‌বে কে ?
নীল সাগরের অসীম বেলায়,
চুম্ খাওয়া ঢেউ গুণ্‌বে কে ?
ঘুম্‌টি খাওয়া আঁধার মাঝে
বুক্‌চেরা ঐ যে সুর বাজে,
রং বেরংএর সুর লহরীর,
ঢেউ-খেলা জাল বুন্‌বে কে ?

স্বপ্ন কি সে ? মিথ্যা কি সে ?
নয় ত তবে সত্য কি ?
হিম্ সে দেশের আঁধার গুহা,
ঐতিহাসিক তথ্য কি ?
জমাট্ খাওয়া পর্দ্দা তুলে,
রশ্মি রেখা ঢুক্‌লো ভুলে ?
জন্ম ক্ষুধায় আর্ত্ত হঠাৎ
দেখ্‌লে পাকা হরতকী ?

দায়-মুক্ত।

[শ্রীহৃষিকেশ চট্টোপাধ্যায় বি-এ]

১

নিদাঘের দ্বিপ্রহরে ডাক্তার রামরতন বাবুর রোগী দেখিয়া ফিরিবার পথে একটি বালিকা আকুলনেত্রে তাঁহার আগমন প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়াছিল। ডাক্তার বাবুকে দেখিয়া বালিকা কাতরকণ্ঠে বলিল,—"দয়া করে' আমার বাবাকে একবার দেখতে যেতে হবে।"

ডাক্তার বাবু প্রাতে বাড়ী হইতে বাহির হইয়াছেন, এখনও স্নানাহার কিছুই হয় নাই। কিন্তু বালিকার বিষণ্ন বদন ডাক্তার বাবুর ক্ষুধা-তৃষ্ণা উড়াইয়া দিল। তিনি স্থিরভাবে উত্তর দিলেন—"কতদূরে বাড়ী মা?"

অঙ্গুলী সঙ্কেতে বালিকা গ্রাম দেখাইয়া দিয়া সসঙ্কোচে উত্তর দিল,—"ও বেলা, না হয় কাল গেলেও চলবে।"

"ও বেলা আসা যদি না ঘটে মা?"

বালিকা মহা মুস্কিলে পড়িল। ডাক্তার যাইবে অথচ বাড়ীতে এক কপর্দ্দকও নাই। প্রাণের আবেগে, পিতার সঙ্কটাপন্ন অবস্থা দেখিয়া, মাতার ব্যাকুলতায়, দিক্‌বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া সে বড় ডাক্তার লইয়া যাইতে আসিয়াছে। সে মনে করিয়াছিল ডাক্তার বাবুকে তাহাদের বাড়ী যাইবার জন্য বলিয়া গিয়া গ্রামের সকলের নিকট ভিক্ষার আশায় ছুটিবে। যেমন করিয়া হউক, ভিজিটের টাকা ক'টা সংগ্রহ করিয়া তাহার অন্তিম-শয্যাশায়িত পিতাকে একবার বড় ডাক্তার দিয়া চিকিৎসা করাইবে। কিন্তু ডাক্তার বাবু যদি এখনই যান, তবে তাঁহার সম্মানরক্ষা করিবে কি দিয়া? লজ্জায় বালিকার মুখমণ্ডল পাংশুবর্ণ ধারণ করিল। ডাক্তার বাবুকে কি বলিয়া ফিরাইয়া দিবে বালিকা ভাষ খুঁজিয়া পাইতেছিল না। বালিকার নীরবতায়, তাহার মুখভাবে বিচক্ষণ রামরতন বাবু ব্যাপার কতকটা বুঝিতে পারিলেন; প্রকাশ্যে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কিছু কি তোমার বলবার আছে?"

বালিকার নয়নপ্রান্ত দিয়া কয় ফোঁটা অশ্রু শুষ্ক শতধা-দীর্ণ মাটির উপর পতিত হইল। অস্ফুটস্বরে বালিকা উত্তর দিল,—"একটা পয়সাও যে দেবার ক্ষমতা নেই আমাদের!"

ডাক্তার বাবুর আতপ-তপ্ত রক্তিম বদন সহসা প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। অধরপ্রান্তে ক্ষীণ হাসি ফুটিয়া উঠিল। স্নেহ-মাখা মধুর কণ্ঠে বলিলেন,—"তোমায় কিছু দিতে হবে না মা, চল, তোমার বাবাকে আমি রোজ দেখে যাব।"

দরিদ্রের প্রতি এত দয়া? বালিকা ডাক্তার বাবুর প্রশান্ত মুখের দিকে একবার কৃতজ্ঞ-নয়নে চাহিল। এক অনুভূত পুলকে বালিকার অন্তস্তল আন্দোলিত হইয়া উঠিল। এ মহত্ত্বের বিনিময়ে সে কি বলিয়া এই জাগ্রত দেবতার সম্বর্দ্ধনা করিবে, কি দিয়া তাহার কৃতজ্ঞতা জানাইবে তাহা তাহার দারিদ্র্য-ক্লিষ্ট ক্ষুদ্র হৃদয় টুকুর মধ্যে কিছুই খুঁজিয়া পাইল না। বালিকা তাহার কোমল নিকতবে চক্ষু মুছিতে মুছিতে ডাক্তার বাবুকে পথ দেখাইয়া তাহাদের পর্ণকুটীরাভিমুখে অগ্রসর হইল।

২

শয্যাপার্শ্বে বসিয়া ডাক্তার বাবু রোগীকে বিশেষভাবে পরীক্ষা করিয়া সজোরে একটি নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। রোগী তাঁহার কোটরাগত চক্ষু যথাশক্তি বিস্ফারিত করিয়া, আশান্বিত বক্ষে সেই দরিদ্রের বন্ধু সদাশয় ডাক্তারের দিকে অনিমেষনয়নে চাহিয়া রহিলেন। ডাক্তার বাবু তখনও চিন্তা করিতেছিলেন। রোগী অতি ক্ষীণকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কেমন দেখছেন ডাক্তার বাবু?"

রামরতন বাবু বিশেষরূপ আশ্বাস দিয়া বলিলেন, "কেন উতলা হচ্ছেন? আপনি সেরে যাবেন।" একটা বুক-ফাটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া রোগী তাঁহার দরিদ্র-জীবনের আংশিক ইতিহাস ডাক্তার বাবুকে শুনাইতে লাগিলেন। তাঁহার একমাত্র স্নেহের পুত্তলি কন্যাকে পাত্রস্থ করিবার জন্য কত লোকের নিকট গিয়া ব্যর্থ-মনোরথ হইয়া তাঁহাকে ফিরিতে হইয়াছে। দারিদ্র-জীবনের বিরাট

ব্যর্থতায়, মর্ম্মান্তিক বেদনায়, সংসারের ভবিষ্যৎ চিন্তায় তাঁহার সুস্থ সবল দেহ আজ কালের কবলে পতিতপ্রায়।

বলিতে বলিতে রোগীর চোখের কোণগুলি জলে ভরিয়া উঠিল। বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, "বলুন ডাক্তার বাবু! এ দরিদ্র-জীবনের প্রয়োজনীয়তা কি?—শুধু লাঞ্ছনা, গঞ্জনা, বেদনা সহ্য করিয়া মানুষ কতদিন বাঁচিতে পারে?"

প্রকৃত রোগ ধরা পড়িল। রামরতন বাবু স্থিরকণ্ঠে বলিলেন,—"ও সব চিন্তা আপনি ছেড়ে দিন্।"

"কেমন করে' ছাড়ি ডাক্তার বাবু! ঘরে যার বার তের বছরের মেয়ে অবিবাহিতা, অথচ একটা পয়সা সম্বল নেই!"

ডাক্তার বাবু কি ভাবিলেন। তাঁহার প্রশস্ত ললাট কুঞ্চিত হইল, ললাট বহিয়া স্বেদবিন্দু নীচে পড়িল। ডাক্তার বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনার গোত্র?"

কত যুগ যুগান্তরের বাঞ্ছিত জিনিষ পাইবার আশায় কম্পিতকণ্ঠে রোগী জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কোন পাত্র কি সন্ধানে—"

ডাক্তার বাবু—"আছে।"

গরীবের মেয়ের জন্যও পাত্র পাওয়া যায়? আনন্দে হৃদয় নৃত্য করিয়া উঠিল। ব্যর্থ-জীবনের হতাশার গভীর অন্ধকার মাঝে আশার ক্ষীণ আলোক ফুটিয়া উঠিয়া রোগীর শীর্ণ বদনমণ্ডল উজ্জ্বল করিয়া দিল। দরিদ্র ব্রাহ্মণ পাত্রের পরিচয় জানিবার জন্য উৎসুক চিত্তে বলিলেন,—"তিনি কে ডাক্তার বাবু?"

"যদি হয় তবে বলব। এখন আপনার—"

শুষ্ককণ্ঠে রোগী বলিলেন,—"কালাচাঁদ চাটুয্যে আমার নাম। গোত্র—কাশ্যপ—"

"থাক্, আর বলতে হবে না।" ডাক্তার বাবু উঠিয়া পুনরায় বলিলেন,—"চাকর দিয়ে আপনার ওষুধ পাঠিয়ে দোব।"

ঘর হইতে বাহির হইবার সময় ডাক্তার বাবু প্রশান্ত দৃষ্টি রোগীর মুখের উপর ফেলিয়া বলিলেন, "আপনি কিছু ভাববেন না। আপনার মেয়ের বিবাহের ভার আমার।"

বাহিরে গিয়া বালিকাকে ইঙ্গিতে ডাকিয়া চুপি চুপি বলিলেন,—"মা, তোমার বাবার পথ্য, আর তোমাদের খরচের জন্য ঐ ক'টা টাকা নিও।"

বালিকার ঠোঁট দু'খানি কাঁপিয়া উঠিল, চক্ষু জল-ভারাক্রান্ত হইল।

ডাক্তার বাবু চলিয়া গেলে বালিকা টাকা কয়টী তাহার মাতার নিকট দিল। একটা আরামের নিশ্বাস ফেলিয়া ব্রাহ্মণ বলিয়া উঠিলেন,—"মানুষের মাঝেও দেবতা থাকে!"

ডাক্তার বাবুর মহত্ত্ব, তাঁহার করুণা, তাঁহার দান আজ দরিদ্র পরিবারকে নবীন আলোক প্রদান করিয়াছে। তাঁহার গুণকীর্ত্তনে এই ক্ষুদ্র দরিদ্র পরিবারটী মুগ্ধ।

৩

রামরতন বাবুর শ্বশুর বড় জমিদার। জমিদার বাবুর একমাত্র কন্যাকে বিবাহ করিয়া রামরতন বাবু কলিকাতায় ডাক্তারী শিখিতে পারিয়াছিলেন। অতি শৈশবে মাতৃপিতৃহীন হইয়া রামরতন বাবু মাতুলালয়ে প্রতিপালিত হন। জমিদার মহাশয় ঐ অনাথ বালককে নিজ জামাতৃ-পদে বরণ করিয়া তাঁহাকে উচ্চশিক্ষা দান করিয়াছিলেন। সেই অবধি রামরতন বাবু শ্বশুরালয়েই বাস করিয়া আসিতেছেন।

নিজে দরিদ্র সন্তান বলিয়া গরীবের ব্যথা রামরতন বাবু অনুভব করিতে পারিতেন। সেই কারণ তিনি তাঁহার উপার্জ্জিত অর্থের অধিকাংশ দরিদ্র লোকের জন্য ব্যয় করিতেন। ইহাতে জমিদার মহাশয় মুখে কিছু না বলিলেও মনে মনে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইতেন। রামরতন বাবুর একমাত্র পুত্র প্রতুলচন্দ্র এখন কলিকাতায় কলেজে পড়িতেছে। প্রতুল আদর্শ পুত্র। পিতার সমগ্র গুণরাশি সে অর্জ্জন করিয়াছিল। প্রতুলের কলিকাতার খরচ জমিদার মহাশয় নিজেই বহন করিতেন। রামরতন বাবু পুত্রের জন্য কোন ব্যয়ই করিতেন না। সে কারণ তাঁহার স্ত্রী কত কথা বলিতেন, রামরতন বাবু হাসিয়া উড়াইয়া দিতেন।

রামরতন বাবু যে দরিদ্র ব্রাহ্মণকে কন্যাদায় হইতে নিষ্কৃতি দিবেন প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন, লোকপরম্পরায় সেই কথা আজ জমিদার মহাশয় এবং তাঁহার কন্যা শুনিলেন।

উত্তরেই আন্তরিক বিরক্ত হইলেন। রামরতন বাবুর স্ত্রী ইহার জন্য ডাক্তার বাবুকে বেশ 'দু' চার কথা শুনাইয়া দিলেন। জমিদার মহাশয়ও তাঁহাকে ডাকিয়া বলিলেন,—"এ সব কি শুনছি রতন?" তিনি রামরতনের পরিবর্তে "রতন" বলিতেন।

রামরতন বাবু উত্তর দিলেন,—"কোনও খারাপ কায ত নয়!"

"মিছে কতগুলো টাকা খরচ হবে জানো?"

"কিছু টাকা দিয়ে যদি একটা লোকের প্রাণ দিতে পারি—"

জমিদার মহাশয় একটু চড়া সুরে বলিলেন,—"তাতে তোমার কি লাভ?"

রামরতন বাবু চুপ করিয়া রহিলেন।

জমিদার মহাশয় একটু বিদ্রূপের সহিত বলিলেন, "কত টাকা জমিয়েছ বাপু যে একটা কুলীনের মেয়েকে পার করতে চাইছ?"

শ্বশুরের বিদ্রূপে রামরতন বাবু মর্ম্মাহত হইলেন। নিজের উপর বড় ঘৃণা জন্মিল। শ্বশুরান্নে প্রতিপালিত হইতে সাম্রাজ্যের বিনিময়ে যেন কেহ না চায়। সংযত ক্রোধের উত্তাপে ডাক্তার বাবু নিরুত্তর রহিলেন।

জমিদার বাবু বলিলেন,—"ও সব বাজে খরচ করে' নিজের মহত্ত্ব দেখান ছেড়ে দাও। তুমি যা উপায় কর তা সবই ত নষ্ট কর শুনতে পাই।"

রামরতন বাবু আর সহ্য করিতে না পারিয়া বলিলেন,—"যখন কথা দিয়েছি বিবাহ দিতেই হবে।"

"বটে! এত পয়সার গরম! বেশ, তবে তাই হোক বিয়ে দাও দেখি।" এই বলিয়া জমিদার বাবু গর্জ্জন করিতে করিতে চলিয়া গেলেন। অভিমানে উন্মত্ত রামরতন বাবুও বাড়ী হইতে বাহির হইলেন।

রামরতন বাবু একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও স্ত্রীর ডাকে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করিলেন। তাঁহার পত্নী পথরোধ করিয়া বলিলেন,—"রেগে যাচ্ছ কোথা?"

"যেখানেই হোক্ যাব, এখানে আর থাকব না এটা ঠিক।"

"তুমি যে ছেলেমানুষেরও বাড়া হ'লে? বাবা কি বলেছেন তার জন্যে—"

ভারি গলায় রামরতন বাবু বলিলেন,—"হাঁ, তারই জন্যে তোমার বাবার বাড়ী থেকে—"

আর বলা হইল না। জমিদার মহাশয় পশ্চাৎ হইতে আসিয়া বলিলেন,—"আমার কথায় রাগ করো না রতন! বেশ একটু তলিয়ে দেখ। বরং তা'দের কিছু অর্থ-সাহায্য কর।"

স্থিরকণ্ঠে রামরতন বাবু বলিলেন,—"তাতে আমাকে ব্রাহ্মণের নিকট মিথ্যাবাদী হ'তে হয়।"

"বেশ, তোমার যখন একান্ত ইচ্ছে, তখন আর আমি কি বলব। কিন্তু বাবা বুড়োর কথায় রাগ কোরো না।" এই বলিয়া জমিদার বাবু চলিয়া গেলেন।

রামরতন বাবুর স্ত্রী জিজ্ঞাসা করিলেন,—"হাঁগা, কত টাকা খরচ হবে?"

"কি করে' জানব বল।"

"পাত্র ঠিক হয়েছে?"

"না।"

"তুমি বিয়ে দিয়ে দেবে শুনে পাত্রবরা যদি খাঁই বেশী করে?"

বিরক্ত হইয়া রামরতন বাবু বলিলেন,—"তার জন্যে তোমাদের অত মাথা ব্যথা কেন?"

অভিমানে গর্জ্জিয়া তাঁহার স্ত্রী বলিয়া উঠিলেন,—"সে ত ঠিক কথা। আমরা তোমার কে!"

রামরতন বাবু বাহিরে আসিলেন।

৪

ডাক্তার বাবু ব্রাহ্মণকে দেখিতে আসিয়াছেন। এই কয়দিনে ব্রাহ্মণ পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক সুস্থ। তাঁহার ঔষধ পথ্যাদির ব্যবস্থা করিয়া ফিরিবার সময় ডাক্তার বাবু বলিলেন, "এই মাসের পঁচিশে দিনস্থির করেছি, সেইদিন আপনার মেয়ের বিয়ে হবে।"

ডাক্তার বাবুর অভয়বাণী আর একবার ভাল করিয়া শ্রবণ করিবার জন্য শয্যাশায়ী ব্রাহ্মণ একবার উঠিবার বৃথা চেষ্টা করিলেন। উহা যেন বীণা-বিনিন্দিত মধুর সঙ্গীতের মূর্চ্ছনা বহাইয়া দিল।

ফিরিবার পথে ডাক্তার বাবু যে পাত্রের আশায় আজ দিনস্থির পর্য্যন্ত করিতে সাহস করিলেন, সেই পাত্রের পিতার নিকট গমন করিলেন। তিনি রামরতন বাবুকে যথেষ্ট খাতির করিতেন। তাঁহার অনুরোধ পাত্রের পিতা কখনও উপেক্ষা করিতে পারিবেন না বা তাঁহার যা' অবস্থা, দু' টাকা বেশী দর দিলেই তিনি অমত করিবেন না। এই ভরসায় রামরতন বাবু প্রথম দিনেই প্রতিশ্রুতি দিয়া ফেলেন।

কিন্তু আজ তাঁর মুখমণ্ডলে বিমর্ষভাব দর্শনে ডাক্তার বাবু যেন দমিয়া গেলেন। প্রকাশ্যে বলিলেন, "আপনাকে আজ এমন—"

বাধা দিয়া মতিবাবু একটি ক্ষুদ্র শ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "হাঁ, বড় মুস্কিলেই পড়েছি—"

"মুস্কিল!" রামরতন বাবু সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি মুস্কিল মতিবাবু?"

মতিবাবু অপ্রতিভ ভাবে বলিলেন,—"বড় লজ্জার কথা ডাক্তারবাবু যে কথা দিয়ে তা—"

তাঁহার কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই ডাক্তার বাবু গম্ভীর ভাবে প্রশ্ন করিলেন, -' কারণ?"

"কারণ—বাড়ীর অমত।"

ডাক্তার বাবু একটী দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন,—"এ অমত আগে হয় নি কেন?"

মতিবাবু উত্তর দিলেন,—"বাড়ীতে শুনেছে, মেয়েটি কালো।"

রামরতন বাবু স্তম্ভিত হইয়া উদাসভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কেন, সে কথা কি আপনি জানিতেন না?"

"আমি জানতাম। বাড়ীতে শোনাই নি।"

"যথেষ্ট অনুগ্রহ করেছিলেন।" ডাক্তার বাবু আর সহ্য করিতে না পারিয়া বলিলেন,—"খুব ভদ্রতা আপনার! আজ আমি কত আশা নিয়ে এই তিন ক্রোশ পথ আসছি আপনার সঙ্গে একটা রফা করতে। এখন কি হ'লে আপনি মেয়েটী নিতে পারেন?"

কুণ্ঠিতভাবে মতিবাবু উত্তর দিলেন,—"বাড়ীতে বলছিল যে কালো মেয়ে যদি আনতে হয় তবে এই সব চাই।" বলিয়া ডাক্তার বাবুকে এক প্রকাণ্ড ফর্দ্দ শুনাইয়া দিলেন।

রাগে রামরতন বাবু আত্মহারা হইয়া বলিলেন,—"এত টাকা! এযে ওজন কর্‌লে ছেলের চেয়ে ঢের ভারি হবে।"

"কি করব বলুন, আমিও এর জন্য বিশেষ লজ্জিত।"

অধিক বাক্যব্যয় নিষ্প্রয়োজন বোধে ডাক্তার বাবু টুস ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িলেন।

ডাক্তার বাবু চলিয়া যাইতেই ব্রাহ্মণী সোৎসুকে জিজ্ঞাসা করিল, —"কি হ'ল?"

"সব মাটি হ'ল। জমিদার বাড়ীর সেই নগদী ব্যাটার কথা শুনে খাটি করতে গিয়ে সব মাটি—" ব্রাহ্মণ মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন।

৫

বাড়ী গিয়া রামরতন বাবু আকাশ-পাতাল ভাবিতে লাগিলেন। একজন মুমূর্ষুকে আশা দিয়া আজ যদি নিরাশ করেন, তবে সে নৈরাশ্যের তীব্র কশাঘাত সহ্য করিতে না পারিয়া মারা যাইবে। অথচ কোন উপায় নাই। তিন দিন মাত্র সময় আছে। রামরতন বাবু সর্ব্বশেষে নিদানের ব্যবস্থা করিলেন। আর কারও দ্বারস্থ হইবার আবশ্যক নাই। পয়সারও দরকার নাই, তোষামোদেরও প্রয়োজন নাই। এই সিদ্ধান্ত। কিন্তু তখনি পুত্রের মুখ চাহিয়া তিনি শিহরিয়া উঠিলেন। ঐ শিক্ষিত সুন্দর যুবকের জীবন-সঙ্গিনী ঐ মেয়ে! রামরতন বাবু নিজ অপরাধ নিজেই ক্ষমা করিতে পারিতেছিলেন না। পিতা হইয়া পুত্রের জীবন শ্মশান করিয়া দেওয়া কি তাঁহার পিতৃত্বের দাবী? তারপর প্রতুল এখন বয়ঃপ্রাপ্ত। সমস্ত শুনিয়া সে যদি বিবাহে অমত করে? যদিও সে কখনও তাঁহার অবাধ্য নয়, তথাপি শিক্ষাদাতার ত অভাব হইবে না: প্রতুলের জননী, তাহার দাদামহাশয় যথাসাধ্য বাধা দিতে চেষ্টা করিবেন। যাহাই হউক, প্রতুলের সহিতই ঐ দরিদ্র কালো মেয়েটিকে জনমের তরে বাঁধিয়া দিতে রামরতন বাবু কৃতসঙ্কল্প হইলেন, এবং নিজেকে একটা ভারি ঋণ হইতে মুক্ত করিতে পারিবেন ভাবিয়া অন্ততঃ কিছুক্ষণের জন্য প্রত্যূষের স্নিগ্ধ বাতাস স্পর্শে আশ্বস্ত হইয়া চক্ষু মুদিলেন।

প্রাতে শয্যাত্যাগের পর কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া রামরতন বাবু পুত্রকে বাড়ী আসিবার জন্য টেলিগ্রাম

করিলেন। সারাদিন কাটিয়া গেল। উদাসনেত্রে আকাশের দিকে চাহিয়া রামরতন বাবু প্রতুলের আগমন অপেক্ষায় বসিয়া আছেন। আর একখানি মাত্র ট্রেণ আছে, সেখানিতে না আসিলে প্রতুলের আজ আসিবার সম্ভাবনা নাই। রাত্রি এগারটা বাজিল। বেহারা আসিয়া ভোজনের জন্য রামরতন বাবুকে আহ্বান করিল, ধীরপদে রামরতন বাবু ভোজনে গমন করিলেন। বুকের ভিতরটায় তখন অব্যক্ত যাতনা হইতেছিল, প্রতুল আজ আর এল না।

স্ত্রী জিজ্ঞাসা করিলেন,—"হ্যাগা, তোমার হ'ল কি?"

উত্তর না দিয়া রামরতন বাবু চুপ করিয়া রহিলেন। সারারাত্রি জাগ্রতাবস্থায় কাটিয়া গেল।

পরদিন বেলা দশটা পর্য্যন্ত রামরতন বাবু পুত্রের আশাপথ চাহিয়া রহিলেন, কিন্তু প্রতুলের সাক্ষাৎ নাই। প্রথম ট্রেণে আসিলে প্রতুল এতক্ষণ আসিয়া পড়িত।

অনন্যোপায় রামরতন বাবু পুত্রকে আনিবার জন্য স্বয়ং কলিকাতা যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। এমন সময়ে ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল, একজন লোক তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। তাড়াতাড়ি নীচে নামিতেই এক ব্যক্তি প্রণাম করিয়া এক নিশ্বাসে বলিয়া ফেলিল—"বামুন ঠাকুরের অসুখ বড় বেশী, মেয়েরা কান্নাকাটি করছে।"

রামরতন বাবুর মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। চেয়ারে উপবিষ্ট হইয়া তিনি চিন্তাকুল হইয়া পড়িলেন। সেই দরিদ্র ব্রাহ্মণ নিশ্চয়ই কোনরূপে এই বিবাহ-বার্ত্তা-ভঙ্গ শ্রবণ করিয়া মনোভঙ্গে মৃত্যুমুখে যাইতে বসিয়াছে। তাঁহার শরীর কণ্টকিত হইয়া উঠিল। সত্যই ব্রাহ্মণের মৃত্যুর জন্য তিনিই ত দায়ী। রামরতন বাবু কম্পাউণ্ডারকে মুখে মুখে কতকগুলি ঔষধ বলিয়া দিলেন।

আগন্তুকের দিকে চাহিয়া রামরতন বাবু বলিলেন,—"আমি ও বেলা যাব। তুমি এই ঔষধটা এখনই দাওগে।"

আগন্তুক ঔষধের অপেক্ষায় নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। শত চিন্তা বিভীষিকাময়ী মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া রামরতন বাবুকে ঘেরিয়া ধরিল।

ঔষধ প্রস্তুত করিয়া কম্পাউণ্ডার লোকটির হাতে দিতেই, সে ডাক্তার বাবুকে প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল। কম্পিতবক্ষে ডাক্তার বাবু বাটীর ভিতর গমন করিলেন।

অসময়ে স্বামীকে বাহিরে যাইবার সজ্জা করিতে দেখিয়া তাঁহার পত্নী সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন "কোথা যাচ্ছ?"

ব্যস্তভাবে রামরতন বাবু বলিলেন,—"কোলকাতা"। স্ত্রীকে দ্বিতীয় প্রশ্ন করিবার অবসরটুকু পর্য্যন্ত না দিয়া রামরতন বাবু চলিয়া গেলেন। তাঁহার পত্নী ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। হয় ত প্রতুলের কোন অমঙ্গল সংবাদে তিনি কলিকাতায় চলিয়া গেলেন। পুত্রের অমঙ্গল আশঙ্কায় তাঁহার শরীর রোমাঞ্চিত হইল।

আবার মনে হইল হয় ত সেই অনাথার জন্য পাত্র অন্বেষণে তাঁহার স্বামী বাহির হইলেন। পরের জন্য কেন এত মাথা ব্যথা? এই রকম করে' যদি নিজের হঠাৎ অসুখ হয়ে পড়ে? অসুখের কথা স্মরণ মাত্রেই তাঁহার বুকটা কাঁপিয়া উঠিল। না, তাহা হইতে দেওয়া হইবে না। আজ স্বামী বাড়ী ফিরিলে, তাঁহার পায়ে ধরিয়া বলিবেন,—"ও গো আমার যথাসর্ব্বস্ব নিয়ে সে মেয়ের বিয়ে দাও। তুমি অমন করে' নিজের শরীর মাটি ক'র না।"

৬

বেলা তিনটার সময় প্রতুল বাড়ী আসিয়া উপস্থিত। তাহার জননী এই মাত্র তাহার জন্য ভাবিতেছিলেন, হঠাৎ পুত্রকে দেখিয়া ছুটিয়া আসিলেন। রৌদ্রোত্তাপে প্রতুলের মুখখানি সিঁদুরের মত রাঙ্গা হইয়া উঠিয়াছে। পাখা আনিয়া জননী বাতাস করিতে লাগিলেন।

প্রতুলের আগমন-সংবাদে জমিদার মহাশয় কাঁচা ঘুমের ঘোর হইতে উঠিয়া হাই তুলিতে তুলিতে আসিয়া অর্দ্ধস্ফুরিত বচনে বলিলেন,—"হঠাৎ এসে পড়লে যে?"

প্রতুল অবাক্। তাহাকে আসিবার জন্য টেলিগ্রাম করা হইয়াছে, অথচ কেহই অবগত নন!

বিস্মিতভাবে প্রতুল বলিল,—"বাবার টেলিগ্রাম পেয়েই ত চলে এলাম।"

"বাবার টেলিগ্রাম!" জমিদার মহাশয় বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন। তৎপরেই হঠাৎ তাঁহার মুখ আরক্তিম হইয়া উঠিল। আবার ভাবিলেন, এও কি সম্ভব? বরং

প্রতুলের বিয়ের জন্য তিনিই আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন, রামরতন তাহাতে বাধা দিয়াছিল। আবার ভাবিলেন, মতি মুখুয্যের ছেলের সহিত বিবাহ ভাঙ্গিয়া যাওয়াতে যদি অনন্তোপায় হইয়া রামরতন প্রতুলের সহিত বিবাহ দিবার মত করিয়া তাহাকে আনাইয়া থাকে? বৃদ্ধ দন্তে দন্তে ঘর্ষণ করিয়া মনে মনে বলিলেন, সাধ্য কি প্রতুলের যে আমার কথা অমান্য করে? যখন সে আমার এই সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারী। বৃদ্ধের গতিক দেখিয়া প্রতুল আগ্রহসহকারে জিজ্ঞাসা করিল,—"টেলিগ্রাম করার উদ্দেশ্য কি দাদামহাশয়?"

কাষ্ঠ হাসি হাসিয়া বৃদ্ধ বলিলেন,—"তোমার বাবার মস্তিষ্ক-বিকৃতি। একটা কোথাকার গরীবের কালো মেয়ে পার করে দেবার জন্যে তিনি হয় ত ক্ষেপেছেন।"

প্রতুল বলিল,—"সে ত ভাল কথা।"

বিদ্রূপস্বরে জমিদার মহাশয় বলিলেন,—"বেশ ত, বাপের কথায় সেই মেয়েকেই বে' ক'র।"

প্রতুল হাসিল। সেও উপহাসচ্ছলে বলিল—"আমার সঙ্গেই নাকি?"

গম্ভীর বদনে বৃদ্ধ উত্তর দিলেন,—"খুবই সম্ভব।"

"আপনি পাগল হয়েছেন দাদামশাই?"

"পাগল আমি হই নি ভাই, তোমরা বাপ বেটায় পাগল হয়েছ।" বলিয়া তিনি নীরব হইলেন।

তারপর বৃদ্ধ গম্ভীর ভাবে বলিতে লাগিলেন,—"নিশ্চয়ই অন্য পাত্র না পেয়ে তোমার সঙ্গে বে' দেবে বলে' টেলিগ্রাম করেছে। যদি তাই হয়, আমি তোমাদের কিছুতে নেই বলে দিচ্ছি।" জমিদার মহাশয়ের মুখখানি শ্রাবণের ঘন কাল মেঘে ভরা আকাশের মত গম্ভীর হইয়া উঠিল।

প্রতুলও যেন গোলক-ধাঁধায় পড়িয়াছে। এ রহস্যের এক বর্ণও সে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছিল না। প্রতুলের পিতা, যিনি প্রতুলের বিবাহদানে সম্পূর্ণ বিরোধী, তিনি শ্বশুরের মত না লইয়া পুত্রের বিবাহ স্থির করিবেন,—এ কথা কে বিশ্বাস করিবে? অথচ বৃদ্ধের কথায় ত উপহাসের লেশমাত্র নাই। প্রতুলও চিন্তা-সাগরে হাবুডুবু খাইতে লাগিল।

প্রতুলের জননী আসিয়া পুত্রকে জল খাইতে যাইবার জন্য উপরে লইয়া গেলেন। জামাতার উপর ক্রোধবশতঃ আরক্তিম চক্ষু জমিদার মহাশয় বৈঠকখানা ঘরে গিয়া গড়গড়ার নল হাতে লইয়া কি ভাবিতে লাগিলেন। মাঝে মাঝে তাঁহার কোটরাবিষ্ট চক্ষু বিস্ফারিত হইয়া উঠিতে লাগিল।

রাত্রি দশটার সময় মাতা-পুত্রে কথোপকথন হইতেছে এমন সময়ে ডাক্তার বাবু উপস্থিত হইয়া ডাকিলেন,—"প্রতুল—"

পিতার ডাকে সসম্ভ্রমে উঠিয়া গিয়া প্রতুল সম্মুখে দাঁড়াইল। প্রতুলের জননীও স্বামীর নিকট গিয়া বলিলেন,—"কোথায় গিয়েছিলে?" রামরতন বাবু হাঁফাইতেছিলেন। তাঁহার আকৃতির বিশেষ পরিবর্ত্তন হইয়াছে। ঘর্ম্মাক্ত কলেবর!

স্বামীর অবস্থা দেখিয়া পত্নী পাখা আনিয়া ব্যজন করিতে করিতে বলিলেন,—"তুমি পাগল হ'লে নাকি?"

দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া রামরতনবাবু বলিলেন,—"এখনও হই নি। বুঝি এইবার হ'তে হয়।" কণ্ঠস্বর সম্পূর্ণ বিকৃত।

স্বামীর মুখের প্রতি চাহিয়া প্রতুলের জননীর চোক ফাটিয়া জলধারা বহিল। ব্যাকুলকণ্ঠে তিনি বলিলেন,—"তোমার পায়ে পড়ি ওরকম ক'র না। আমার যা' কিছু আছে নাও, নিয়ে সেই মেয়ের বিয়ে দাও।"

পত্নীর কথায় কর্ণপাত করিবার তাঁহার অবকাশ নাই। শুদ্ধ প্রতুলের একটি কথার অপেক্ষা। প্রতুলের উত্তরের উপর রামরতন বাবুর মান-সম্ভ্রম ও অস্তিত্ব নির্ভর করিতেছে। তিনি স্থিরকণ্ঠে বলিলেন,—"সব শুনেছ প্রতুল। তুমি না আসাতে আমি কোল্‌কাতা পর্য্যন্ত ছুটে গিয়েছি, তুমি বাড়ী এসেছ শুনে সাতটার ট্রেণে ফিরলাম। পরশু তোমার বিয়ে।"

রামরতন বাবুর স্ত্রী বলিলেন,—"হ্যাগা, সে কি?"

স্থিরকণ্ঠে রামরতন বাবু বলিলেন,—"তাই"। তারপর প্রতুলকে বলিলেন—"বল, তোমার মত কি?"

লজ্জাজড়িত কণ্ঠে প্রতুল বলিল,—"আমার আবার কি মত বাবা?"

তর্জ্জন করিতে করিতে জমিদার মহাশয় সেস্থানে উপস্থিত হইয়া বলিলেন,—"আমার বাড়ীতে ও বিয়ে হ'তে দেব না। আর যদি এ বিয়ে হয়, জেনো প্রতুল, আমার একটা কাণা কড়ির ভরসা তোমাদের নেই।"

প্রতুল হাসিয়া উত্তর দিল,—"তা জানি দাদামশাই।"

উত্তেজিতস্বরে বৃদ্ধ বলিয়া উঠিলেন,—"নিজের ভাল ভাল করে' বিবেচনা কর আমার কথা রাখ।"

বাধা দিয়া প্রতুল বলিল,—"নইলে কি দাদামশাই আমাদের তাড়িয়ে দেবেন?"

অধিকতর উত্তেজিতকণ্ঠে বৃদ্ধ বলিলেন,—"নিশ্চয়ই।"

প্রতুলের জননী এতক্ষণ নীরব ছিলেন। স্বামীর অপমান তাঁহার বক্ষে শেলের মত বাজিল। তিনিও উন্মত্তার ন্যায় বলিয়া উঠিলেন,—"তাই হবে বাবা! আজই আমরা আপনার বাড়ী থেকে চলে যাচ্ছি।"

কন্যার কথায় বৃদ্ধ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িল। তিনি ভাবিতে পারেন নাই, তাঁহার কন্যাও স্বামীর পক্ষাবলম্বন করিবে। তিনি তখন ক্রোধকে চাপিয়া নীচু স্বরে বলিলেন,—"তোকে ত কিছু বলি নি মা!"

"রাকা কি রাখলেন বাবা! আমার সামনেই ত আমার স্বামী-পুত্রের অপমান করলেন।"

৭

জগতে কোন কথা গোপন থাকে না। বিশেষতঃ দুঃসংবাদ বিদ্যুৎগতিতে প্রবাহিত হয়। বিবাহ-ভঙ্গের সংবাদ রুগ্ন ব্রাহ্মণের কর্ণগোচর হইয়াছিল। তাহার উপর তাঁহার অবলম্বন রামরতন বাবুরও সাক্ষাৎ নাই, সুতরাং দরিদ্র ব্রাহ্মণ ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। ডাক্তারবাবু প্রদত্ত ঔষধ সেবনে কোন ফল হয় নাই। ক্রমশঃ অবস্থা খারাপ হইতেছিল। কন্যা গিয়া আকুলকণ্ঠে ডাকিল,—"বাবা"। চক্ষু মেলিয়া একবার কন্যার প্রতি ক্ষীণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া অতি ধীরে বলিলেন,—"মন্দা, তোর বিয়ে দেখে মরতে—"

কথা কহিতে বড় কষ্ট হইতে লাগিল, তিনি আরও কি বলিতে যাইতেছিলেন, কষ্টবোধ হওয়ায় পারিলেন না। তাঁহার শীর্ণ গণ্ড বহিয়া অবিরাম অশ্রু ঝরিতে লাগিল। মন্দাকিনীও গুমরাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। মন্দার মা উদাসনেত্রে স্বামীর পদতলে বসিয়া আছেন, চক্ষে একফোঁটা জল নাই; বুঝি ভগবানকে ডাকিতেছিলেন, এবং প্রাণভাঙ্গা আকুল স্বরে বলিতেছিলেন,—"যার কেহ নাই, তুমি আছ তার।"

পুনরায় অতি কষ্টে ব্রাহ্মণ বলিলেন,—"দেখলি মা, মানুষের কথার ঠিক?"

সাশ্রুলোচনে, বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে মন্দা বলিল,—"বাবা, আমিই তোমাদের কাল্—"

বাহিরে জুতার শব্দ হইল। মন্দা তাড়াতাড়ি চাহিয়া দেখিল,—ডাক্তারবাবু, পশ্চাতে আর একজন, মন্দা লক্ষ্যও করিল না।

রামরতন বাবুর পায়ের তলায় পড়িয়া কাতরকণ্ঠে মন্দা বলিল,—"কি দেখতে এলেন ডাক্তারবাবু?"

ডাক্তারবাবুর স্বর রোগীর কাণে পৌঁছিবামাত্র রোগী কি একটা দেখিবার জন্য আকুলনেত্রে ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। একহাতে মন্দা ও অপর হাতে প্রতুলের হাত ধরিয়া রামরতন বাবু রোগীর পার্শ্বে গিয়া একটু জোরে বলিলেন,—"এই দেখুন আপনার জামাই। আশীর্বাদ করুন।"

ব্রাহ্মণ একটীবার দম্পতীকে স্মিতমুখে সেই চিরপ্রসন্ন বদনের পানে চাহিলেন।

ডাক্তারবাবু পুনরায় কি বলিতে যাইবেন, অমনি পশ্চাতে পরিচিত কণ্ঠের আওয়াজ আসিল,—"রতন!"

জমিদার মহাশয় তাঁহার পশ্চাতে। বৃদ্ধ মন্দাকিনীর হাত ধরিয়া টানিয়া আনিয়া অশ্রুজড়িত কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন,—"আয় ভাই আমার—আমার আঁধার ঘরের আলো, স্বর্গের মন্দাকিনী দিদি আমার!"

সকলেই অবাক হইয়া গিয়াছিল।

কন্যার দায়ে নিশ্চিন্তচিত্ত ব্রাহ্মণ একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিলেন, যেন হৃদি-তন্ত্রী নিংড়াইয়া উহা ঘোষণা করিল—"আমি দায়-মুক্ত"।

প্রশ্ন ও উত্তর।

[শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য সাহিত্যবিশারদ]

আমাদের দেশে সেকালের ধনী লোকেরা কাব্যামোদ উপভোগ করিতে বড় ভালবাসিতেন। রাজার রাজসভায়, জমিদারের মজলিসে প্রায়ই দুই একজন উপস্থিত কবি থাকিতেন। বড় মানুষেরা আমোদ করিয়া কবিতার পাদ-পূরণ শুনিবার জন্য প্রশ্ন করিতেন। কবিরাও কাল বিলম্ব না করিয়া তাহার উত্তর দিতেন। এখনকার দিনে আর সেরূপ কবি প্রায় দেখা যায় না। রোগে, শোকে ও অন্ন-চিন্তায় সকল লোকই অস্থির। কবির কবিত্ব-শক্তি প্রকাশ হইবে কেমন করিয়া?

প্রায় দেড়শত বৎসর পূর্ব্বে এতদ্দেশে হরুঠাকুর নামে এক উপস্থিত কবি ছিলেন। তাঁহার পূর্ণ নাম হরেকৃষ্ণ দীর্ঘাঙ্গী। বর্দ্ধমান, কৃষ্ণনগর ও কলিকাতা শোভাবাজার রাজবাটীতে তাঁহার খুবই আদর ছিল। প্রথম বয়সে হরুঠাকুর নিজে এক কবির গানের দল করিয়াছিলেন। তাই আজও লোকে বলিয়া থাকে, "কবির গুরু হরুঠাকুর।" কিন্তু শেষ বয়সে তিনি দল ছাড়িয়া দিয়া মহারাজ নবকৃষ্ণের সভাসদ্ হইয়াছিলেন।

একদিন পণ্ডিত মণ্ডলী লইয়া মহারাজ রাজসভায় বসিয়া কবিতার পাদ পূরণ শুনিবার জন্য প্রশ্ন করিলেন—

"বড়শী বিঁধিল যেন চাঁদে।"

পণ্ডিতগণের মধ্যে কেহই সমস্যাটী পূরণ করিতে পারিলেন না। তখন হরুঠাকুর অনুপস্থিত। মহারাজ হরুঠাকুরকে ডাকিতে পাঠাইলেন। হরেকৃষ্ণ গামছা স্কন্ধে লইয়া গঙ্গাস্নানে বাহির হইতেছিলেন। মহারাজের আহ্বানে তৎক্ষণাৎ সেই অবস্থায় রাজসভায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মহারাজ প্রশ্ন করিলেন—

"বড়শী বিঁধিল যেন চাঁদে।"

কবি অল্পক্ষণ চিন্তা করিয়াই এইরূপ পূরণ করিয়া দিলেন—

"একদিন শ্রীহরি, মৃত্তিকা ভোজন করি,
ধূলায় পড়িয়া বড় কাঁদে;
(রাণী) অঙ্গুলি হেলায় ধীরে, মৃত্তিকা বাহির করে,
বড়শী বিঁধিল যেন চাঁদে।"

চারিদিকে ধন্য ধন্য পড়িয়া গেল। উত্তর শুনিয়া মহারাজ অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন এবং কবিকে সহস্র মুদ্রা পারিতোষিক প্রদান করিলেন।

—•—

সেকালে কৃষ্ণকান্ত ভাদুড়ী নামে আর একজন উপস্থিত কবি ছিলেন। ইনি "রসসাগর" নামে বিখ্যাত। পাদ-পূরণে ইঁহার অসাধারণ ক্ষমতা দেখিয়া কৃষ্ণনগরের মহারাজ গিরিশচন্দ্র ইঁহাকে নিজ সভাসদ্ করিয়া রাখিয়াছিলেন। একদিন মহারাজ বলিলেন—

"হাটের নেড়া হুজুক চায়।"

অমনই "রসসাগর" শুনাইলেন—

"উকীল খোঁজে মকর্দ্দামা, কোকিল বসন্ত চায়;
অগ্রদানী নিত্য গণে, কোন্ দিনে কে গঙ্গা পায়।
সাধু খোঁজে পরমার্থ, লম্পট খোঁজে বেশ্যালয়;
গোলমালেতে রেস্ত মেলে, হাটের নেড়া হুজুক চায়।"

আবার একদিন প্রশ্ন হইল—

"বড় দুঃখে সুখ।"

কবি উত্তর দিলেন—

"চক্রবাক চক্রবাকী একই পিঞ্জরে,
নিশিতে নিষাদ আনি রাখিলেক ঘরে।
চকা বলে চকী প্রিয়ে এ বড় কৌতুক,
বিধি হ'তে ব্যাধ ভাল, বড় দুঃখে সুখ।"

পাঠক! "রসসাগরের আরও দুইটী কবিতা শুনুন। মহারাজ গিরিশচন্দ্র প্রশ্ন করিলেন—

"গাভীতে ভক্ষণ করে সিংহের শরীর।"

কবির মুখে তৎক্ষণাৎ কবিতা বাহির হইল—

"মহারাজ রাজধানী নগর বাহির,
বারইয়ারি মা ফেটে হ'লেন চৌচির।

ক্রমে ক্রমে খড় দড়ী হইল বাহির,
গাভীতে ভক্ষণ করে সিংহের শরীর।"

আবার প্রশ্ন হইল--

"রমণীর গর্ভে পতি ভয়ে লুকাইল।"

কবি উত্তর করিলেন—

"লক্ষ্মী নারায়ণ এক চক্রপাত্রে থুয়ে,
তাড়ন করয়ে লোক হুতাশন দিয়ে।
তৃণকাষ্ঠে পেয়ে অগ্নি প্রবল জ্বলিল,
রমণীর গর্ভে পতি ভয়ে লুকাইল।"

—০—

একালের কবিদিগের মধ্যে কবিতার পাদ-পূরণে রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় মহাশয়েরও বিলক্ষণ ক্ষমতা ছিল। বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজাধিরাজ মহাতাপচাঁদ বাহাদুর, ভূকৈলাসের রাজা সত্যশরণ ঘোষাল প্রভৃতি বড় বড় লোকেরা আদর করিয়া ইঁহার কবিতা শুনিতেন।

স্বর্গীয় ভূদেব বাবু রঙ্গলাল বাবুকে বড় ভালবাসিতেন। তিনি মধ্যে মধ্যে কবিতার পাদ-পূরণ শুনিবার জন্য কবিকে প্রশ্ন করিতেন। একদিন ভূদেববাবু বন্ধুবান্ধব লইয়া বসিয়া আছেন। এমন সময়ে রঙ্গলাল বাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ভূদেববাবু তৎক্ষণাৎ প্রশ্ন করিলেন—

"ঠেঁটি পাঁচ হাতি।"

রঙ্গলালবাবু অমনই উত্তর করিলেন—

"বেশ্যার ভাগ্যে ঘটে সাঁচ্চা সাড়ী বারাণসী,
স্ত্রীর ভাগ্যে মুখঝামটা গালি রাশি রাশি।
ঢুলির ভাগ্যে শাল-দো-শালা ছালা ছালা মেলে,
ছেলের ভাগ্যে জুটে না কানি কাঁদিয়া ককালে।
ঠাকুরের ভাগ্যে ঘোড়া মোণ্ডা আর ঠোঁটে কলা,
খাজা গজা পোলাও কোপ্তা ইয়ারদের বেলা।
খেম্‌টার ভাগ্যে মণি-মতি জুটে নানা জাতি,
পুরুতের ভাগ্যে ঘসা পয়সা, ঠেঁটি পাঁচ হাতি।"

ভূদেববাবু আবার প্রশ্ন দিলেন—

"গোদ হয় নি চুলে।"

কবি আবার উত্তর করিলেন—

"সুন্দরে দেখিয়া যত পুর নারী দলে,
নিজ নিজ পতি নিন্দা করিছে সকলে।
এক ধনী কহে সই কি বলিব দুখ,
বিধাতা আমার প্রতি বড়ই বিমুখ।
গোদা পতি, বাম বিধি দিলেন আমার,
তাহারে লইয়া মন সদা প্রাণ যায়।
নাকে ঝোলে লম্বা গোদ যেন পাঁড় শশা,
কাণেতে ঝুলিছে গোদ বাবুয়ের বাসা।
চোখে গোদ, দাঁতে গোদ, গোদ ওষ্ঠমূলে,
সত্যপীরে সিন্নি মেনে গোদ হয়নি চুলে"।

সভামধ্যে হাসির ফোয়ারা উঠিল। সকলেই উপস্থিত-কবির ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

সংগ্রহ ও সঙ্কলন।

বাঙ্গলায় কথা।

৩

অনেক কথাই এ বিষয়ে বলিবার আছে; কিন্তু দুইটি বিশিষ্ট বিষয়ে ভ্রমর ও বঙ্কিমব্যাখ্যাত দ্রৌপদী-চরিত্রে সাদৃশ্য দেখাইয়া এ বিষয়ে আমার বক্তব্য সমাপ্ত করিব। বঙ্কিমচন্দ্র ভ্রমরকে কালো করিয়াছেন। কালো হইয়াও ভ্রমর পতি-সোহাগিনী। এ বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্র সমস্ত কাব্য শাস্ত্রের পন্থা পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণার আদর্শ অনুকরণ করিয়াছেন। কৃষ্ণার কৃষ্ণত্ব তার গুণের গৌরব সূচিত করিতেছে। ভ্রমরেরও তাই। আর একটি ক্ষুদ্র কথা এই যে, ভ্রমরের একটি ছেলে হইয়া আঁতুড়ে মারা গিয়াছিল, এ সংবাদটা লেখক কৌশলে আমাদের দিয়াছেন। এ ছেলের প্লটের পক্ষে কোনও প্রয়োজন নাই, তবু এ আসিল কেন? ইহার উত্তর দ্রৌপদী সম্বন্ধে দ্বিতীয় প্রস্তাবে বঙ্কিমচন্দ্র দিয়াছেন। "এখন বুঝা যায় দ্রৌপদীর পাঁচ স্বামীর ঔরসে কেবল এক একটি পুত্র কেন। হিন্দু-

শাস্ত্রানুসারে পুত্রোৎপাদন ধর্ম্ম। গৃহীর তাহাতে বিরতি অধর্ম্ম। * * কিন্তু ধর্ম্মের যে প্রয়োজন এক পুত্রেই তাহা সিদ্ধ হয়। * * স্বামীর ধর্ম্মার্থ দ্রৌপদী সকল স্বামীর ঔরসে এক এক পুত্র গর্ভে ধারণ করিলেন, তৎপরে নির্লেপবশতঃ আর সন্তান গর্ভে ধারণ করিলেন না। কবির কল্পনার এই তাৎপর্য্য।" ভ্রমরের এক পুত্রের ঠিক এই তাৎপর্য্য কল্পনা কি অসঙ্গত?

পূর্ব্বে বলিয়াছি বঙ্কিমচন্দ্রের ভিতর অদ্ভুতের মোহ শেষ পর্য্যন্ত পরিপূর্ণরূপে দেদীপ্যমান ছিল। তিনি ফলিত জ্যোতিষে বিশ্বাস করিতেন এবং তাহা তাঁহার উপাখ্যানে যথেষ্ট ব্যবহার করিয়াছেন। অভিরাম স্বামী হইতে আরম্ভ করিয়া ভবানী পাঠক, সত্যানন্দ ও আনন্দমঠের চিকিৎসক পর্য্যন্ত আদ্যোপান্ত অল্প বিস্তর ঐশীশক্তিসম্পন্ন পুরুষের পরিকল্পনা তাঁর গ্রন্থে আছে। রজনীর শেষকালে চোখ হইল যোগবলে, শৈবলিনীর মতি ফিরিল স্বামীজির মন্ত্রে, এমন নানারূপে ঐশীক্রিয়া তাঁহার কথার ভিতর কার্য্য করিয়াছে। স্কটের গ্রন্থেও এমনি সব অতিপ্রকৃত বিষয় দ্বারা কাহিনীর কার্য্যপরম্পরার ভিতর যোগ সাধন করা হইয়াছে। তা' ছাড়া যুদ্ধ বিগ্রহ, যবননিগ্রহ, স্বাধীনতার সংগ্রাম প্রভৃতি লইয়া তাঁহার কল্পনাকে খেলাইতে তিনি ভালবাসিতেন। রাজসিংহ যে ঔরঙ্গজেবকে নিগৃহীত করিয়াছেন, সন্তানেরা যে মুসলমান ও ইংরেজদিগকে যুদ্ধে পরাভূত এ কল্পনায় লেখকের একটা তৃপ্তির আনন্দ তাঁর লেখনীমুখে ঝরিয়া পড়িয়াছে। এই সব অলৌকিক বীরকর্ম্ম তিনি আনন্দের সহিত আঁকিয়াছেন, আঁকিয়া তাঁহার আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত করিয়াছেন। কিন্তু যদিও স্থান বিশেষে অতিপ্রকৃতশক্তির আশ্রয় লইতে তিনি কুণ্ঠিত হন নাই, তবু মোটের উপর তাঁর উপাখ্যানগুলি অতিপ্রকৃত ঘটনার উপর নির্ভর করে না। আরব্য উপন্যাসের গল্পের মত তাঁহার গল্প প্রকৃতের সীমা একেবারে অস্বীকার করিয়া অদ্ভুতের আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত করিতে চায় না। বেশীর ভাগ স্থলে তিনি এই অদ্ভুতের তৃষ্ণা পরিতৃপ্ত করিয়াছেন ইতিহাস আশ্রয় করিয়া, এদেশের রোমান্টিক অতীতের কল্পনা অবলম্বন করিয়া। এ বিষয়ে তিনি পরিপূর্ণরূপে স্কট্ ও লিটনের পন্থা অনুসরণ করিয়াছেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের শেষ অবস্থায় তিনি তাঁর উপাখ্যানকে বেশীর ভাগ শিক্ষার বাহন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। ইংরাজী উপন্যাসের স্থষ্টিকর্ত্তা Richardson, তাঁর Pamela, Clarissa Harlowe, Sir Charles Grandison প্রভৃতি উপন্যাসকে উপদেশ দিবার যন্ত্র করিয়া রচিয়াছিলেন, এবং এ পথে তাঁহার যে শিষ্য প্রশিষ্য না আছে তাহা নয়। কিন্তু যখন উপন্যাসের রসবোধ ইংলণ্ডে জাগিয়া উঠিল, তখন এই didactic বা উপদেশমূলক উপন্যাস শ্রদ্ধা হারাইল। জীবনকে যথাযথ ভাবে বর্ণনা করিয়া ঘটনা বিন্যাসদ্বারা কৌতূহলের উদ্রেক করা ও রসবোধ পরিতৃপ্ত করাই উপন্যাসের জীবন বলিয়া পরিগণিত হইল। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম ও মধ্যযুগের উপন্যাসে শিক্ষাদানের কোনও চেষ্টাই নাই। মধ্যযুগে শিক্ষার চেষ্টা কিছু কিছু আসিয়াছে; শেষকালে শিক্ষক উপন্যাস লেখককে প্রায় অভিভূত করিয়াছে। ইউরোপে ইদানীন্তন কালে এমনি একদল ঔপন্যাসিকের সৃষ্টি হইয়াছে, যাঁরা উপন্যাসকে শিক্ষার বাহন করিতেছেন। Tolosty, Ibsen, Strindberg, Bernard Shaw, H. G. Wells প্রভৃতি কথালেখক তাঁহাদের গ্রন্থকে স্ব স্ব মতামতের বাহন করিয়া তুলিয়াছেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের ভিতর বাঙ্গলার কথা-সাহিত্য নূতন জীবন লাভ করিয়াছে। তাঁর ভিতর যে বীজ দেখিতে পাই তাহা পরবর্ত্তী কালে অঙ্কুরিত হইয়া উঠিয়াছে। লোকের গল্প শুনিবার আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত করিবার তিনি যে আয়োজন করিয়াছেন তার ভিতর একদিকে আছে অসম্ভব অস্বাভাবিক কাহিনী বর্জ্জন করিয়া স্বাভাবিক জীবন আশ্রয়, অপর দিকে এই স্বাভাবিক জীবনের মধ্যে যতদূর সম্ভব অদ্ভুত রসের সঞ্চার। এজন্য তিনি ইতিহাসের আশ্রয় লইয়াছেন।

কৃষ্ণকান্তের উইলে তাঁর যে চেষ্টা পরিণতি লাভ করিয়াছিল তার একটা ফল "স্বর্ণলতা"। ইহার ভিতর অদ্ভুতের বংশও নাই। "কৃষ্ণকান্তের" মত dramatic

situationও নাই। ইহা দরিদ্র মধ্যবিত্ত জীবনের অনাড়ম্বর করুণ চিত্র। ইহা বঙ্কিমচন্দ্রের রোমান্সের প্রতিক্রিয়া। ইহার মধ্যে সরল সৌন্দর্য্যের অবধি নাই, কিন্তু ইহা রোমান্স নহে।

তারকনাথের ভিতর এই ধারা পরিপূর্ণ হইয়া আবার আর একটা সম্পূর্ণ নূতন রকম বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে রবীন্দ্রনাথের লেখায়। রবীন্দ্রনাথ প্রথম জীবনে লিখিয়াছিলেন রোমান্স। তাঁর "বউঠাকুরাণীর হাট" রোমান্স, "রাজা ও রাণী" রোমান্স, "রাজর্ষি"ও রোমান্স। কাব্যের ভিতর তাঁর কল্পনা তো চিরদিনই প্রাকৃতের সকল সীমা লঙ্ঘন করিয়া অতি-প্রাকৃতের মধ্যে বিচরণ করিয়াছে, আজও করিতেছে। কিন্তু মধ্যযুগে এবং বর্ত্তমান সময়ে রবীন্দ্রনাথ গদ্যে রোমান্সের পন্থা সম্পূর্ণ বর্জ্জন করিয়া প্রকৃত উপাখ্যান রচনায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথ প্রধানতঃ কবি। কবির চক্ষে তিনি জীবনকে দেখিয়াছেন, কবির তুলিতে লিখিয়াছেন। জীবনের বাহিরটা তিনি যতটা দেখিয়াছেন, ভিতরটা তার চেয়ে বেশী দেখিয়াছেন। তাই তাঁর গল্পগুলি প্রায়ই দীর্ঘ ভাব-বিশ্লেষণে পর্য্যবসিত হইয়া পড়িয়াছে। তাঁর মধ্যবয়সে ছোট গল্পের মধ্যে তার কবির দৃষ্টি এক একটি ছোট ভাবকে কেন্দ্র করিয়া নিপুণ ভাবে তার আশে পাশে নিতান্ত আবশ্যক আবেষ্টন গড়িয়া তুলিয়াছে। প্রত্যেকটি গল্প এক একটি ছবির মত এক একটি ঘটনার ভাবময় প্রতিকৃতি। তাঁর পরিণত বয়সের "পলাতকার" কবিতাগুলিও এই শ্রেণীর। ছোট গল্পের আদর্শ তিনি পাইয়াছিলেন ফরাসী সাহিত্যে। কিন্তু তিনি সে আদর্শ খাঁটি বাঙ্গলার আবহাওয়ার ভিতর বাঙ্গালীর জীবন, বাঙ্গালীর ভাব ও চিন্তা দিয়া ফুটাইয়া অতি সুন্দর এক নূতন আদর্শ সৃষ্টি করিয়াছেন।

বঙ্গদর্শনের নূতন পর্য্যায় বাহির হইলে রবীন্দ্রনাথ আবার উপন্যাস লিখিতে আরম্ভ করেন। "চোখের বালি" ও "নৌকাডুবি" বঙ্গদর্শনে ছাপা হয়। এ দুখানি এক গোত্রের বই। ইহাদের কোনও বিশিষ্ট শ্রেণীর ভিতর ফেলা বড়ই শক্ত, কেন না, এগুলি কিম্বা 'গোরা' বা 'ঘরে বাইরে' কোনওটাকেই সাহিত্যের একটা ধরা-বাঁধা শ্রেণীর মধ্যে ফেলা যায় না। রবীন্দ্রনাথের লেখা আলোচনা করিতে গেলে আমাদের মোপাসাঁর উপদেশ স্মরণ হয়। তিনি বলেন, উপন্যাস লিখিবার কোনও ধরাবাঁধা প্রণালী নাই। শক্তিমান্ লেখক প্রত্যেকেই এক একটা স্বতন্ত্র ধারার সৃষ্টি করেন। সমালোচকের সেগুলি শ্রেণীবিভাগের ব্যর্থ চেষ্টায় সময় অতিপাত না করিয়া ঠিক যেমনটি লেখা হইয়াছে তাই ধরিয়া লইয়া তার রস গ্রহণ করা উচিত। রসগ্রাহীর কেবল দেখিতে হইবে যে লেখার ভিতর কোনটুকু নূতন। রবীন্দ্রনাথ যাহা লিখিয়াছেন তাহা আগাগোড়াই নূতন। তা' ছাড়া এক এক যুগে তিনি এক এক নূতন পন্থা ধরিয়াছেন। তাঁর আদি যুগের রোমান্সের সঙ্গে, পরবর্ত্তী ছোট গল্পের সম্পর্ক অভেদের নয়। ছোট গল্পের পর তাঁর "চোখের বালি" পর্য্যায়ের গল্প একটা নূতন জিনিষ। তারপর 'গোরা', সে একাই এক স্বতন্ত্র বস্তু। তারপর "স্ত্রীর পত্র" হইতে আরম্ভ করিয়া 'ঘরে বাইরে" পর্য্যন্ত এক পর্য্যায়। ইহা ছাড়া তাঁর নাটক আছে, রূপক আছে, কথা কাব্য আছে, কত কিছু আছে।

এ সবের বিশদ আলোচনায় একটা গ্রন্থ লেখা চলে। আমি শুধু রবীন্দ্রনাথের উপাখ্যানের একটা বিশেষত্বের উল্লেখ করিব যে বিষয়ে বাঙ্গালা সাহিত্যে তিনি সম্পূর্ণ নূতন পন্থা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের বেশীর ভাগ কাহিনীই মনের ইতিহাস। 'চোখের বালি'র উপাখ্যান অতি সামান্য, ঘটনা কয়টি এক নিশ্বাসে বলিয়া ফেলা যায়। 'নৌকাডুবি'র যদিও একটা ভয়ানক dramatic situationএ আরম্ভ, তবু তার উপাখ্যান খুব বিস্তৃত নয়। 'গোরার' ভিতর কর্ম্মবহুল dramaর যথেষ্ট অবসর ছিল, তবু গোরার পরিসরের তুলনায় তার ঘটনার সংখ্যার পরিমাণ কিছুই নয়। "ঘরে বাইরে" "চতুরঙ্গ" "স্ত্রীর পত্র" "ভাইফোঁটা" প্রভৃতি সবই এই রকম। এ সকল উপাখ্যানের প্রধান উপাদান মনের সূক্ষ্ম ও বিস্তীর্ণ ইতিহাসে। নাটকের জীবন ঘটনায়। একজন কৃতি নাট্যকার গোরা বা নৌকাডুবির মূলঘটনা

আশ্রয় করিয়া এমন একটা কাহিনী গড়িতে পারিতেন যাহাতে কৌতুকাবহ ঘটনার পর ঘটনা কৌতূহল উদ্দীপ্ত ও পরিতৃপ্ত করিতে পারিত; সেটা হইত বাহ্য ইতিহাস, যাকে চোখে দেখা যায় এমন একটা ইতিহাস। তার ভিতরে নিগূঢ় থাকিত অন্তরের কথা, অল্প স্বল্প কথায় বার্ত্তায় আকারে ইঙ্গিতে সে কথা প্রকাশ হইত, কিন্তু চিত্তের সুদীর্ঘ বিশ্লেষণ থাকিত না। পাত্র পাত্রীদের অন্তরের কথার ইতিহাস গড়িয়া লইবার ভার থাকিত পাঠকের হাতে।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কাছে ঘটনাটার বাহ্যিক প্রকাশের বড় কম মূল্য। প্রত্যেকটি ঘটনায় পাত্র পাত্রীদের মনের ভিতর কি প্রতিক্রিয়া হইল, কেমন করিয়া তাদের চিত্তের ভিতর ভাব ও চিন্তাগুলি ক্রমশঃ পরিণতি লাভ করিল, ইহাই তাঁহার কাছে সব চেয়ে বেশী দরকারী কথা। তাই তিনি চিত্রের পর চিত্র আঁকিয়া এই ইতিহাস সূক্ষ্মভাবে সুনিপুণ ভাবে গাঁথিয়া গিয়াছেন। তাঁর এই যে ভাব-বিশ্লেষণ তাহা Psychologistএর বিশ্লেষণ নহে, কবির বিশ্লেষণ। এ বিদ্যায় তাঁর প্রতিযোগী আছে, বিশেষ করিয়া ফরাসী ঔপন্যাসিকদের মধ্যে, কিন্তু তাঁর চেয়ে শ্রেষ্ঠ কেহই নাই। উপাখ্যান-লেখক সাধারণতঃ মনের কথা বেশী লেখেন না, কেন না এই সব ইতিহাস প্রায়ই নীরস হইয়া পড়ে। মানুষ যে আকাঙ্ক্ষা লইয়া উপাখ্যান পাঠ করিতে বসে তাহা এই সব বিশ্লেষণ প্রায়ই পরিতৃপ্ত করিতে পারে না, তাই উপাখ্যান অনেক সময় ইহাতে অত্যন্ত রসশূন্য ও সাধারণ হইয়া পড়ে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাঁর অতুলনীয় ক্ষমতার বলে ঠিক এই ভাব-বিশ্লেষণে এমন ভাবে কৌতূহলের উদ্রেক করিতে পারেন, চিত্তকে এমন ভাবে বন্দী করিয়া ফেলেন, যে মনোযোগ বিন্দুমাত্র শিথিল হইতে পারে না। ইংরাজীতে যাহাকে বলে gripping interest তাহা রবীন্দ্রনাথের এই চিত্ত-বিশ্লেষণে যেমন দেখা যায়, অনেক বড় বড় ঘটনাবহুল উপন্যাসে বা নাটকে তাহা হয় না। "নষ্টনীড়ে" চারুর মনটা ধীরে ধীরে অমলের দিকে অগ্রসর হইতেছে, 'ঘরে বাইরে'তে বিমলা ও সন্দীপের চিত্ত পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হইতেছে, পায় পায় তাহারা অগ্রসর হইয়া একটা গভীর অন্ধকূপের কিনারা দিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া চলিতেছে, এই ইতিহাস পড়িতে পড়িতে যে একাগ্র কৌতূহল উদ্রিক্ত হয় তাহা অতুলনীয়।

বঙ্কিমচন্দ্র রোমান্সকে অতিপ্রকৃত ক্ষেত্র হইতে অবতীর্ণ করাইয়া স্বাভাবিকের ক্ষেত্রে নামাইয়াছিলেন। "বিষবৃক্ষাদি গল্পে তিনি রোমান্স বর্জ্জন করিয়া শান্ত সামাজিক উপন্যাস লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, অদ্ভুত ছাড়িয়া সাধারণের ভিতর কৌতূহলের উপাদান খুঁজিয়া বাহির করিয়াছিলেন। "স্বর্ণলতায়" এই ইতিহাসের ধারা পরিণতি লাভ করিয়াছিল। রবীন্দ্রনাথের গল্পের বিষয়ও এই সহজ সাধারণ জীবন, ইহার ভিতর রোমান্স নাই। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এই সাধারণের তল খুঁড়িয়া মানুষের ভাবরাজ্যে কৌতূহলের অশেষ উপাদান সঞ্চয় করিয়াছেন। Comedy of Manners যে অন্ধকুঠারীর দ্বারদেশে ঘুরিয়া ফিরিয়া তার ভিতর কদাচিৎ আলোকপাতে তার অংশবিশেষ উদ্ভাসিত করিয়া তুলে, রবীন্দ্রনাথ সেই কুঠারীর ভিতর বিজলী বাতি জ্বালিয়া তার লুক্কায়িত রত্নরাজি আলোকিত করিয়া কৌতূহল পরিতৃপ্তির নূতন পন্থা বাহির করিয়াছেন। এ বিষয়ে তাঁর আর্ট হয় তো বা তাঁর নিজের আবিষ্কার, না হয় তো তিনি এবিষয়ে ফরাসী কথা-লেখকদের বিদ্যার ভিত্তির উপর গড়িয়াছেন। কিন্তু যাহা গড়িয়াছেন তাহাতে বোধ হয় তাঁর চেয়ে আর কেহই অধিক কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন নাই।

(ক্রমশঃ)

শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত।

কবিতা-কুঞ্জ।

দুঃখ বরণ।

[শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল বি-এল্]

(ভৈরবী)

দুঃখকে তুই তুচ্ছ করি' নে
বেদনাকে চিত্তে বরি' নে।
এই আকাশ ভরা সুধার ধারা
গভীর করে' হৃদে ভরি' নে!
এই উদ্ভাসিত আলোর সাথে
মিলে যা' এ মধুর প্রাতে
তারার গানে গভীর রাতে
বেসুর বীণায় সুরটি ধ'র' নে।
দুঃখ ও সুখ এদের চেয়ে
তুই যে বড় জানিস্ মনে,
কোন্ মা তোরে আন্লে হেথায়
ল'বে আবার সে কোন্খানে!
বাখিস্ মনে কোথায় যা'ব
কোন্ সুদূরে কি ধন পাবি,
চির আনন্দের দেশ সে কোথা
তার পানে তুই তরী ভিড়িয়ে নে॥

—•—

স্মৃতি-উদ্বোধন।

[শ্রীভবতারণ সরকার বি-এ]

মনে কি রে পড়ে সেই দিন—
যেই দিন সুপ্রভাতে,
ধরি সবে হাতে হাতে,
এসেছিলে এ ভারতে অতিথি নবীন
মনে কি রে পড়ে সেই দিন?

অরণ্যে বাঁধিয়া ঘর,
সবে মিলে পরস্পর,
ব'য়ে গেল কত কাল মনের হরষে,
স্নিগ্ধ প্রাণ সুধাভরা,
শ্যামল সুন্দর ধরা
ধরা-স্বর্গ-ভারতের সুবাস পরশে।
বন্য তস্করের সহ,
যুঝাযুঝি অহরহ,
যেদিন করিলে তারে পদানত, হীন,
সেই দিন, সেই বেলা,
কত হাসি, কত খেলা,
আজ মনে পড়ে সেই দিন?

সে ভাব কি মনে পড়ে,
সুপ্ত যবে মোহ-ঘোরে,
সমস্ত অবনীতল তামসী নিশায়,
ঐ পঞ্চ সিন্ধু কূলে,
বট অশ্বত্থের মূলে,
উঠিল যে জ্ঞানজ্যোতিঃ নির্ম্মল ধারায়;
জগতে আজিও তার,
পৌছে নাই সমাচার,
কালের কুটিল চক্রে আজি যা মলিন।
তার(ই) ক্ষুদ্র ছিন্ন রেখা,
ধীরে কভু দেয় দেখা,
মনে পড়ে, সেই একদিন।

তথা ছিল কি হেন,
কে বলিবে আজি কেন
জাতি মান কুল ল'য়ে ব্যস্ত নীচতায়?
গুণ বুদ্ধি বল যাহা,
মুখে পর্য্যাসিত তাহা,
বৃথা ভ্রান্ত মত্ত মন স্বার্থ-পরতায়।
জীবিকা সুগম তরে,
কার্য্যভেদে পরস্পরে,
একাকারা আপনারা হ'য়েছিলে ভিন্;

না হয় বা কেউ পাছে,
সঙ্গে আসি মিশিয়াছে,
সেও বাধা, ছিল কি সেদিন ?

খৃষ্টান্ মোস্লেম জাতি,
লয় সবে বক্ষ পাতি,
বয়সে কনিষ্ঠ তারা, জগতে বৃহৎ।
নিজ জনে করি' দূর,
(অভিমানে ভরপুর)
জগতের পদতলে তুমি দণ্ডবৎ।
তোমার অসংখ্য ভাই,
আর তারা তব নাই,
তোমারই অত্যাচারে তুমি আজ ক্ষীণ ;
শাস্ত্রের দোহাই দাও,
স্বার্থের মোহে না পাও,
অজ্ঞতায়, দেখিতে সেদিন !

অথবা শাস্ত্রেই কয়,
তবে কেন এত ভয়,
এক মহাজাতি পুনঃ হউক উত্থান ;
দূর হ'ক মিথ্যা ভান,
হ'ক তথা অধিষ্ঠান,
বিশাল 'হিন্দুর জাতি', নব অভ্যুত্থান।
শিক্ষাগুরু ধরণীর,
আবার তুলিবে শির,
তুমি আমি, উচ্চ নীচ না থাকিবে চিন্
এসেছে আহ্বান তার,
কিংবা সারা আসিবার,
কত দূর, আর কত দিন ?

—•—

নিশীথে।

[শ্রীপ্রমথনাথ রায়]

নিশীথে কাননে ভ্রমিতে ভ্রমিতে
শুনি কুসুমেরা কহে, —
"জান কি লো, বোন, সদা কেন এর
নয়নে সলিল বহে ?
কেন সে এমন বিরস মলিন,
কি ব্যথা তাহারে ঘিরে ?
ঘুমাবার বেলা কেন সে একেলা
এখন কাননে ফিরে ?"
জানে না ফুলেরা তাহাদেরি এক
মানব-ভগিনী, হায়,
তারি তরে মোর ঝরে আঁখি লোর,
নিশি জাগরণে যায়।

—•—

ধর তুমি মোর দুটি হাত !

(William Canton)

[শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায় বি-এ]

ধর তুমি মোর দুটি হাত !
সুখে দুখে ভয়ে অবসাদে
প্রভু ভাবি যেন তুমি আছ সাথে
ধর তুমি মোর দুটি হাত !

যদি কভু সংশয়ের বশ
তব প্রেমে হই সন্দিহান
তোমাতে না পায় শান্তি প্র
ধর তুমি মোর দুটী হাত !

ধর তুমি মোর দুটী হাত !
উগ্র হস্ত—উদ্যত তাড়নে
ব্যগ্র যাহা সুখ-আহরণে—
ধর তুমি মোর দুটি হাত !
যবে অবশেষে একদিন
অন্ধ আঁখি—এ বাহু অবশ
চাবে কোন হারাণ পরশ
তবে তুমি ধর দুটি হাত !

—•—

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

২০শ ভাগ] { কার্ত্তিক, ১৩৩০। { [৯ম সংখ্যা

প্রবাসে জাতীয় সাহিত্য-চর্চ্চার প্রয়োজনীয়তা।*

[শ্রীসুনীলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বি-এ]

জীবন-প্রভাতে মানুষ যখন এই বৈচিত্র্যময় বিশ্বের পানে প্রথম চাহিয়া দেখে, তখন তাহার কিশোর হৃদয়ের অন্তরালে কত মধুর সুর কত যে বিচিত্র রাগিণী ও ছন্দে রণিয়া উঠে, সে নিজেই তাহা বোঝে না। আশায় আনন্দে, পুলকিত উল্লাসে কর্ম্মের পথে সে নামিয়া দাঁড়ায়। একটা বিপুল সৃজন-বাসনা সকল বাধা বিপদের বিরুদ্ধে 'ধূলার উপর স্বর্গ গড়িবার' চেষ্টায় কেবলই তাহাকে প্রেরণা দেয়। কিন্তু, একটা কোন আদর্শকে কল্পনায় মাঝে গড়িয়া তোলা যত সহজ, বাস্তবজীবনে তাহাকে রূপ দেওয়া ত তত সহজ নয়। অনেক সময়ে, জগতের বিপুল বাধা বিপ্লবের ধাক্কা খাইয়া আদর্শের পথ হইতে মানুষকে ফিরিয়া আসিতে হয়, অথবা সারাটা জীবন শুধু সংগ্রামেই কাটিয়া যায়, আদর্শে পৌছান আর হয় না। কিন্তু ফিরিয়া আসিতে হইলেও, তাহার সৃজন-বাসনা এইখানে শেষ হইয়া যায় না। অনেক সময় মানুষের বুভুক্ষিত প্রাণ তাহার আদর্শকে—তাহার আশা, আকাঙ্ক্ষা, কল্পনাকে—শিল্পের ক্ষেত্রে বা সাহিত্যের ক্ষেত্রে অন্য প্রকারে একটু রূপ দিয়া তাহার সৃজন-বাসনাকে কতকটা চরিতার্থ করিতে চায়। জীবনের মাঝে বাধা পাইয়া যত সব রুদ্ধ রাগিণী প্রাণের মাঝে গুমরিয়া গুমরিয়া মরিতে বসে, কাতরতার অবসাদে ও নৈরাশ্যের মলিনতায় জীবনকে নীরস করিয়া তোলে, সাহিত্যের ক্ষেত্রে তাহারা মুক্তির মাঝে কতকটা ছাড়া পায়। মানুষের যত আশা, আকাঙ্ক্ষা, কল্পনা—যত সৌন্দর্য্যানুভূতি, যত বেদনা ও প্রেরণা, সব এইরূপে সাহিত্যের মাঝে অবলম্বন পাইয়া মূর্ত্ত হইয়া উঠে। সুতরাং, একটা জাতির সকল ভাব, সমস্ত সাধনার পরিচয় তাহার সাহিত্যের মাঝে। তাই বলা হয়, "Literature is the true picture of a nation",—'একটা জাতির জীবনের অবিকল প্রতিচ্ছবি হইতেছে তাহার সাহিত্য'।

ফল আগে, কি বীজ আগে, এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যেমন কঠিন, সাহিত্য জাতিকে গড়িয়া তোলে কি জাতি সাহিত্যকে গড়িয়া তোলে, ইহার উত্তরও তেমনই দুরূহ। "Man seems to become keen on moulding and improving the future just as his interest and knowledge of the past increases" (Marvin),—জাতির অতীত ইতিহাসই ভবিষ্যৎকে গঠন করিতে ও উন্নত করিয়া তুলিতে মানুষকে উৎসাহ ও প্রেরণা দেয়; সৃষ্টির সৌন্দর্য্য দেখিয়া মানুষ যতই মুগ্ধ হয়, তাহাকে

* বারাণসী ছাত্র-পরিষদের প্রথম অধিবেশনে পঠিত।

অধিকতর সুন্দর ও পূর্ণ করিয়া তুলিতে সে ততই উৎসাহিত হইয়া উঠে। এইরূপে, এই সৃজন বা প্রকাশের মধ্য দিয়া জাতির সাধনা—জাতির আদর্শ পূর্ণতার দিকে, উন্নতির পথে, অগ্রসর হইতে থাকে। যে জাতির ভাব ও সাধনার কোনও গৌরবময় ইতিহাস বর্ত্তমান নাই, তাহার ভবিষ্যৎও বিশেষ উজ্জ্বল নয়,—জগতে তাহার দাঁড়াইবার স্থান অনেক নীচে।

সাহিত্য মানুষকে তাহার জীবনের উপযোগী আদর্শ স্থির করিতে সাহায্য করে, পথ দেখাইয়াও দেয়। বাস্তব-জীবনের বন্ধন ও তাড়নার মাঝে যে সকল ভাব কোন অর্থ বা সার্থকতা খুঁজিয়া পায় না. সাহিত্য তাহাদিগকে সার্থকতার স্বর্ণপথের ইঙ্গিত জানায়—তাহাদের চরম অর্থটিকে নয়নের কাছে মূর্ত্ত করিয়া তোলে। জগতের বাস্তবতার মাঝে জীবনের যে সকল বস্তু চাপা পড়িয়া থাকে, সাহিত্য তাহাদের বিকাশের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে। বাস্তবের মাঝে যে অজ্ঞাতের সন্ধানে মানবের তৃষিত প্রাণ চঞ্চল হইয়া ওঠে, সাহিত্যের মাঝে সে তাহার আভাস পায়; অজ্ঞাত ঈপ্সিতের যে বেদনায় জীবনের প্রতি-কর্ম্মের মাঝে করুণগুঞ্জন ফুটিয়া উঠে, সাহিত্যে তাহা তৃপ্তির সন্ধান-প্রয়াসে কতকটা স্নিগ্ধ হয়। আবার, সাহিত্য মানবকে জীবন-সংগ্রামে উৎসাহিত করিয়াও তোলে; শত দুঃখ দৈন্যের মাঝেও নৈরাশ্যকে জয় করিতে, বিপদের মাঝে বীরের মত অগ্রসর হইতে শিক্ষা ও প্রেরণা দেয়। শুষ্ক কঠিন পাথরের মাঝে স্নিগ্ধ উৎসের মত, অতি নীরস জীবনেও মাঝে মাঝে সহসা এমন এক একটি সরসতার উৎস উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে, যে কিছুকালের জন্য সকল দুঃখ বেদনা, শুষ্ক কঠোরতা স্নিগ্ধ হইয়া যায়; কঠোরতার চাপে জীবনের মাঝে তাহার স্মৃতিটুকুও হয় ত পরে লোপ পাইতে পারে, কিন্তু সাহিত্য তাহাকে অমর করিয়া রাখে, চিরদিন তাহা মানবের দুঃখ, কঠোরতা, দৈন্যের মাঝে আশার ধ্রুবতারার মত শান্তির কিরণ বিকীর্ণ করে।

প্রত্যেক জাতিরই সাহিত্যের একটা বিশেষ ধারা আছে; প্রত্যেক জাতিরই চিন্তা কোন একটা বিশেষ ধারায় প্রবাহিত হয়। তাহা ছাড়া, প্রত্যেক জাতিরই নিজের একটা বিশেষ সত্তা—entity আছে। মানুষের ভাবের ও শক্তির উচ্চতম বিকাশ শুধু তাহার এই জাতীয় ভাবের মাঝ দিয়া, জাতীয় সাধনার ধারাতেই হইতে পারে। "Not that we can form the future at will, but that it already exists in germ in us, and that we shall put upon it some impress, great or small, which will be traced back to us by the retrospect of the future" (Marvin).—মানুষ যে তাহার ভবিষ্যৎকে যেমন ইচ্ছা তেমনই গড়িয়া তুলিতে পারে, তাহা নয়; অতীতের সাধনার যে বীজ তাহার মাঝে নিহিত আছে, সে শুধু তাহাকেই উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিতে পারে। ইহা সহজেই অনুমেয় যে, বাহির হইতে কোন জিনিষ আনিয়া কাহারও অন্তরকে সজ্জিত না করিয়া, তাহার অন্তরে যাহা একান্ত নিজস্ব এবং স্বাভাবিক, সেই সত্তাকার বস্তুটীকে বিকসিত করাই উন্নতির শ্রেষ্ঠ এবং একমাত্র উপায়। অপর জাতির হৃদয়-যন্ত্রে যে সুর স্বতঃই ধ্বনিয়া উঠে, আমার হৃদয়-যন্ত্র হয় ত তাহার উপযোগী নয়। বাণার সুরটি যেমন বাঁশীতে তেমন মর্ম্মস্পর্শী হয় না, এবং বাঁশীর সুরটি যেমন বাণার তারে তেমন আকুল ব্যথায় ফুকারিয়া উঠে না,—তেমনি এক জাতির আদর্শ অপর জাতির প্রাণকে সাধারণতঃ তেমন নিবিড় আকর্ষণে চঞ্চল করিতে পারে না, এক জাতির ভাব,—আশা, আকাঙ্ক্ষা, কল্পনা—অপর জাতির প্রাণকে তেমন গভীরভাবে অনুপ্রাণিত করে না। যাহার হৃদয় যে ভাবে গঠিত, তাহার জীবনকে সেই অনুসারেই বিকসিত হইতে দেওয়া আবশ্যক। সেক্স্‌পীয়রকে যদি সাহিত্য চর্চ্চা না করিয়া বিজ্ঞান-চর্চ্চা করিতে হইত, এবং নিউটনকে যদি বিজ্ঞানের ক্ষেত্র ছাড়িয়া সাহিত্যের ক্ষেত্রে আবিষ্কারে মনোনিবেশ করিতে হইত, তাহা হইলে জগতের জীবনের ইতিহাস বিশ্ব-মানবের দ্বারে আজ কাল অপূর্ব্ব কাহিনী লইয়া দাঁড়াইত, কে জানে! এই ব্যক্তিগত বৈষম্যের মতই জাতিগত বৈষম্য বা বিশেষত্ব। প্রতি ব্যক্তির যেমন, তেমনি প্রতি জাতির অন্তরের বীজ তাহার নিজের বিশিষ্ট ভূমিতেই অঙ্কুরিত

ও পল্লবিত হইয়া উঠে, অন্যত্র নহে। মাননীয়া শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু-যিনি পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে সেই শিক্ষার কেন্দ্র পশ্চিম দেশেও ইংরাজী কবি ও সাহিত্যিক বলিয়া যথেষ্ট সম্মান ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন, তিনি নিজেই সেদিন বলিয়া গিয়াছেন, বিজাতীয় ধারায় বিজাতীয় ভাবের এই যে শিক্ষা, ইহাতে যথেষ্ট ভুল ও অনিষ্ট আছে,—আমাদের জীবনকে উন্নত করিতে হইলে জাতীয় ভাবে, জাতীয় সাধনার ধারায়, শিক্ষালাভ করিতে হইবে।

সুতরাং, জীবনকে দেখিতে হইলে প্রথমতঃ জাতির যুগ-যুগান্তের অনুভবের বিশিষ্ট ক্ষেত্র ও সাধনাটিকে দেখা প্রয়োজন। এবং এইটুকু দেখার জন্যই জাতীয়-সাহিত্য-চর্চ্চার প্রয়োজন। "জাতীয় সাহিত্য একটা সমগ্র জাতির পিতৃ-পরিচয়।" একটা জাতির সমগ্র জীবনের সমস্ত সাধনা তাহার সাহিত্যেরই মাঝে নিহিত থাকে; সাহিত্য তাহার জীবনের প্রতিচ্ছবি। সুতরাং জাতির সাধনাকে ধরিতে হইলে, তাহার অন্তরের সন্ধান লইতে হইলে, তাহার সাহিত্যই তাহার একমাত্র পথ।

ভাবের আদান-প্রদান সাহিত্যের একটি পরম লক্ষ্য। প্রত্যেক জাতিরই সাহিত্যে যাহা কিছু উপযোগী ও সুন্দর পাওয়া যায়, তাহাকেই গ্রহণ করা দরকার। গ্রহণ করিবার উৎসাহ অনেকেরই থাকে, কিন্তু পরিপাক করিবার শক্তি কোথায়? এই পরিপাক শক্তির জন্যই প্রথমে স্বজাতির সুর ও সাধনার স্বরূপটাকে প্রত্যক্ষ করা প্রয়োজন। গ্রহণের মালিককে জাগাইয়া না তুলিলে লইবে কে? পরের নিকট হইতে কিছু গ্রহণ করিতে হইলে তাহাকে নিজস্ব করিয়া—নিজের ভাবের অঙ্গীভূত করিয়া লইতে হইবে; নহিলে তাহা বদ্-হজম হইয়া মানুষের আত্ম-শক্তি নষ্ট করিতে পারে। আমাদের বাঙ্গলা সাহিত্যের গত অর্দ্ধ শতাব্দীর ইতিহাসে ইহাই দেখিতে পাই। বাঙ্গালী তাহার জাতীয় সাধনার মূল সূত্রটি কি জানি কোন্ দিন হারাইয়া বসিয়াছিল। কিন্তু মানুষের মন ত কখনও নিষ্ক্রিয় থাকে না, তাই গত উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে, কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের স্থাপনের সঙ্গে ইংরাজী সাহিত্যকে সম্মুখে পাইয়া, তাহার চাকৃচিক্য ও উগ্রগন্ধে মুগ্ধ বাঙ্গালী তাহারই দিকে প্রথমে নিজের সত্ত্বা ভুলিয়া ঝুঁকিয়া পড়িল। তাহার ফলে সমাজে একদল লোকের সৃষ্টি হইল, যাঁহাদের প্রকৃতি প্রাচ্য বা পাশ্চাত্য কোন সভ্যতার মাঝেই ঠিক্ খাপ্ খাইত না,—রাজা ত্রিশঙ্কুর মত তাঁহারা অর্দ্ধ শতাব্দী কাল 'বায়ুভূত নিরাশ্রয়' ভাবে মধ্যপথে ঝুলিয়াছিলেন। এ অবস্থায় মনুষ্যত্বের বিকাশ হইতে পারে না,—মানুষের শক্তি-বিকাশের স্বাভাবিক পথ বন্ধ হইয়া যায়। সে সময়ে শিক্ষিত সম্প্রদায় বঙ্গভাষাকে কতকটা ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন, বঙ্গভাষার চর্চ্চা করিতে অনেকে লজ্জা বোধও করিতেন। কিন্তু ধীরে ধীরে বিজাতীয় ভাবের সংঘাতেই বাঙ্গালী হৃদয়ের অন্তরতম প্রদেশে মোহাচ্ছন্ন তন্দ্রার মাঝে চেতনার সাড়া পৌঁছিল। ধীরে ধীরে বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার, ভূদেব, মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, হেমচন্দ্র প্রভৃতি আরও অনেকে বিচিত্র কুসুম-সম্ভারে ও রস-সিঞ্চনে বঙ্গের সারস্বত-কুঞ্জকে সাজাইয়া তুলিলেন। কিন্তু সাজান ফুল দু'দিনে শুকাইয়া আসিলেও, সে সঙ্গে যেটুকু রস-সঞ্চার হইয়াছিল, তাহাতেই বাঙ্গলার প্রাণ সাড়া পাইয়া এক অপূর্ব্ব আনন্দ-বেদনায় যেন তাহার অন্তরের কোন্ হারান মাণিকের সন্ধানে ছুটিয়া চলিল। ইহারই ফলে বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বাঙ্গালীর জাতীয় সাহিত্য—বাঙ্গালার পদাবলী ও গান—বাঙ্গালীর অন্তরের কাছে নূতন রূপে আবিষ্কৃত হইয়াছে। এবং মনে হয় এই আবিষ্কারের ফলের জন্যও বাঙ্গালীকে আরও একটি শতাব্দী অপেক্ষা করিতে হইবে। সে যুগের বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতি এবং এ যুগের রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি সাহিত্যিকদের দান বঙ্গ-সাহিত্যকে উজ্জ্বল করিলেও বাঙ্গালী-জীবনের কোন চিরন্তন আনন্দের বিধান করিতে পারিবে কি না, এই একটি শতাব্দী তাহারই মীমাংসা করিবে। কিন্তু আজ বাঙ্গলার প্রাণ যে শুধু তাহাতেই তৃপ্ত নয়,—কি জানি কোন্ অজ্ঞাত কিম্বা অনাগতের বেদনায় ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে, বাঙ্গলার নব-যুগের রস-সাধনার আলোচনায় এই কথাটা অস্বীকার করা চলে না। রবীন্দ্রনাথের কবিত্বে মুগ্ধ যে বাঙ্গালী একদিন পুলকিত বিস্ময়ে মনে করিয়াছিল, বুঝি তিনি বাঙ্গলায়

মুক্তির বাণী লইয়া আসিয়াছেন—'That he has come with the message of deliverance', আজ তাঁহারই কাব্যে সেই বাঙ্গালী তীব্রতায় আকুল হইয়াও তৃপ্তির সন্ধান পায় না; বাঙ্গালীর নব-জাগ্রত চেতনার তৃষিত মুগ্ধ দৃষ্টির সম্মুখে আজ বাঙ্গলার অন্তরতম স্বরূপ চিত্র—বাঙ্গলার সহজ জীবনের করুণ প্রেম-সাধনা বেদনায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে; বাঙ্গলার পদাবলী, বাঙ্গলার বাউলের করুণ মেঠো গান, শস্য-শ্যামলা বাঙ্গলার পল্লী জীবনের সহজ ক্রন্দন,—সেই আজ লাগে ভাল। নাগরিক সাহিত্যের ঝঙ্কার ও বর্ণ-বৈচিত্র্যে চক্ষু ঝলসিয়া যায় সত্য, কিন্তু প্রাণ ভরিয়া একটু কাঁদিবার অবসরও মেলে কি না, সন্দেহ। তাই, বাঙ্গালী আজ তাহার জাতীয় জীবনের স্বাভাবিক ধারাটিকে পাইবার জন্য, জাতীয় সাধনার সূত্রটিকে ধরিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে। যে দিন বাঙ্গালী তাহার প্রকৃত সন্ধান পাইবে, যে দিন বাঙ্গালার জীবন তাহার অতীতের সাধনার সহিত যোগ রাখিয়া স্বাভাবিক ধারায় বহিয়া চলিবে, সে দিন বৈদেশিক শিক্ষা, বিজাতীয় ভাব বাঙ্গালীকে বিকৃত ও নিস্তেজ না করিয়া তাহার জীবনকে অধিকতর উজ্জ্বল ও শক্তিময় করিয়াই তুলিবে। বঙ্গ-সাহিত্যকে উপেক্ষা করিয়া বাঙ্গালী বিপথে ছুটিয়াছিল, আজ আবার নিজের সাহিত্যের মধ্য দিয়াই সে নিজের পথের সন্ধানে চলিয়াছে; এ পথের সন্ধান পাইতে হইলে, বাঙ্গলার রসে বাঙ্গলার প্রাণকে সঞ্জীবিত রাখিতে হইলে, বঙ্গ-সাহিত্যের সহিত বাঙ্গালীকে যোগ রাখিতেই হইবে।

জাতীয় সাহিত্য-চর্চ্চার এই যে আবশ্যকতা, তাহা স্বদেশ অপেক্ষা বিদেশে অনেক বেশী। মানুষ যখন স্বদেশে স্বজাতির মধ্যে বাস করে, তখন তাহার অজ্ঞাতসারেও সমাজ তাহাকে নিজের ভাবে গড়িয়া তোলে। কিন্তু বিদেশে বিজাতীয় ভাবের মাঝে তাহার অন্তর নিজেকে হারাইয়া ফেলিবার লক্ষ সুযোগ পায়। তাই, এখানে বাঁধিয়া রাখিবার, বাঙ্গালীকে বাঙ্গালী করিয়া রাখিবার, একমাত্র যোগ-সূত্র হইতেছে বাঙ্গালার জাতীয় সাহিত্য। পৃথিবী জুড়িয়া এই যে এত বড় ইংরাজ জাতি, মনে হয় ইঁহারা সেক্স্‌পীয়র, মিল্টন্, শেলী, স্কট্, এডিসনের রচিত ইংরাজের অন্তরের চিরন্তন ভূমিটুকুর মাঝেই বুঝি এমন ভাবে এক হইয়া আছে, বৃহত্তর ব্রিটেনের মূল ভূমিটুকু হইল সেইখানে। সমগ্র ভারতের বিক্ষিপ্ত লক্ষ বাঙ্গালীকে লইয়া আজ এতকাল পরেও যদি কোনও বৃহত্তর বাঙ্গালার সমস্যা বাঙ্গালীর প্রাণে উঠিয়া থাকে, তাহারও সমাধান হইবে সেইখানে—মানুষ ব্যবধান, বিচ্ছেদ ও নির্ম্মম মৃত্যুকে এড়াইয়া জন্ম জন্ম বাঁচিয়া আছে যে ক্ষেত্রে। বাস্তবের মাঝে ইহারই নাম সাহিত্য। তাই আজ মিলনের কথা, শিক্ষার কথা উঠিলে বাঙ্গালীর নব-জাগ্রত প্রাণে সাহিত্যের কথা স্বতঃই আসিয়া পড়ে।

প্রশ্ন উঠিতে পারে,—যে লোক চিরদিন বিদেশে বিভিন্ন অবস্থা ও ভাবের মধ্যে বাস করে, নিজের জাতি বা দেশের সঙ্গে যখন তাহার কোন বিশেষ বাস্তব সম্বন্ধ থাকে না, তখন তাহার পক্ষে স্বজাতির ভাব অর্জ্জনের চেষ্টা না করিয়া, বরং যাহাদের মধ্যে সে বাস করিতেছে, তাহাদেরই ভাব আয়ত্ত করিয়া তাহাদেরই একজন হইয়া উঠিবার চেষ্টা করাই কি সঙ্গত নয়? কথাটী যদি, মানুষের প্রকৃতির মাঝে সম্ভব হইত, তাহা হইলে আপত্তি ছিল না। বিদেশে জন্মলাভ করিয়া বিদেশীর মাঝে থাকিলেই অন্তরে বাহিরে বিদেশী হওয়া যায় না; শৃগাল-শিশু সিংহীর ক্রোড়ে সিংহ-শাবকের সঙ্গে বর্দ্ধিত হইলেও অন্তরে শৃগালই থাকিয়া যায়। সিংহ-শাবকও সিংহই হইয়া উঠে,—শিশুরাও তাহা জানে। হৃদয়ের উপাদান-ভেদে বিভিন্ন জাতির রুচি ও প্রবৃত্তিও বিভিন্ন প্রকারের হয়; এক জাতি যাহাতে আনন্দ পায়, অন্য জাতি তাহাতে আনন্দ পায় না; এক জাতির প্রাণ যাহাতে উৎসাহিত হইয়া উঠে, অন্য জাতি তাহাতে উৎসাহ পায় না। এজন্যই হয় ত দেখিতে পাই, বাঙ্গালী যেখানে যে ভাবের মাঝেই থাকুক, সঙ্কীর্ত্তনে তাহার প্রাণ যেমন মাতিয়া উঠে, অন্য কোনও জাতির প্রাণ তেমন মাতিয়া উঠে না; গানের অর্থের প্রয়োজন হয় না, শুধু সেই খোল ও করতালের মধুর ধ্বনি শুনিবামাত্র তাহার শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে, জীবন তাহার সমগ্র বন্ধনের

মায়াকে ভেদ করিয়া না জানি কোথায় কাহার চরণে লুটাইয়া পড়িতে চায়! আবার, রামচন্দ্রকেও আমরা দেবতা বলিয়াই মানি, কিন্তু রাম-সীতার কাহিনীতে হিন্দুস্থানীর মত অমন গভীর তন্ময়তা বাঙ্গালীর কখনও হয় না। বাঙ্গালী-হৃদয়ের বিশেষত্ব—বসন্তের বাতাসের মত এই যে উচ্ছ্বাসময়ী ব্যাকুল আন্তরিকতা, ইহার অভাব যেখানে, সেখানে বাঙ্গালী-হৃদয় নীরসতার মাঝে অবসন্ন হইয়া পড়ে; সেখানে বাঙ্গালীর আনন্দের মাঝে শুষ্কতা, সম্পদের মাঝে দৈন্য ফুটিয়া উঠে। কিন্তু হিন্দুস্থানীর প্রাণ এই উচ্ছ্বাস চাহে না; গভীর বিশ্বাসে স্থির, প্রশান্ত হিমাচলের মত অচঞ্চল গরীয়ান আন্তরিকতাই যেন তাঁহার হৃদয়ের বিশেষত্ব। এ দেশের বৈরাগ্য কেমন একটা উদাস সুরে ভরা, বাঙ্গালীর বৈরাগ্যের মাঝেও যেন প্রেম কি এক বেদনার তপস্যায় নিবিড়; এখানে জ্ঞানের কথাই বেশী, বাঙ্গলায় চরম মিলনের আকাঙ্ক্ষাই প্রধান। সুতরাং বাঙ্গালীর ভাবের মাঝে হিন্দুস্থানী যেমন তৃপ্ত খুঁজিয়া পাইবে না, হিন্দুস্থানীর ভাবের মাঝেও বাঙ্গালীর জীবন তেমনি নীরস হইয়া উঠিবে। প্রবাসী বাঙ্গালী আপন জাতীয় ভাবের সন্ধান না পাইলে, জাতীয় সাধনার ধারায় অন্তরকে বিকসিত করিতে না পারিলে, জীবনে সার্থকতার সন্ধান পাওয়া দুরূহ হইবে।

তারপর, নেওয়া ছাড়া দেওয়ার দিক দিয়াও প্রবাসী বাঙ্গালীর সাহিত্য-সাধনার একটা বিশিষ্ট স্বার্থকতা আছে। আপন পরিবারের উন্নতি ও মঙ্গল বিধানের জন্য যেমন প্রত্যেকেরই একটা দায়িত্ব আছে, স্বজাতির প্রতিও মানুষের তেমনই একটা মস্ত দায়িত্ব আছে। জাতীয় আদর্শকে, স্বজাতির ভাবকে উন্নত করিতে চেষ্টা করা প্রত্যেকেরই কর্ত্তব্য। মানুষ বিদেশে আসিয়াও এ কর্ত্তব্য উপেক্ষা করিতে পারে না। অধিকন্তু, প্রবাসীর পক্ষে স্বদেশকে দান করিবার অনেক নূতন জিনিষ আছে; বিদেশে ভিন্ন ভাবের সংস্রবে আসিয়া, ভিন্ন সাহিত্যের অনেক শ্রেষ্ঠ জিনিষ সে সহজে নিজের সাহিত্যে দান করিতে পারে; এদেশের প্রবাসী বাঙ্গালী যদি কবীর, তুলসীদাস, সুরদাস প্রভৃতির অতুলনীয় কবিতার কিঞ্চিৎ রসাস্বাদ বাঙ্গলার ঘরে পৌঁছাইয়া দিতে পারে, তাহা আজ সমগ্র বাঙ্গালীর আদরের জিনিষ হইয়া উঠিবে। প্রবাসীর দেওয়া নূতন অভিজ্ঞতায় জাতির দৃষ্টির ও কর্ম্মের প্রসারতাও বাড়িতে পারে।

পৃথিবীর অনেক স্থানেই, বিশেষতঃ ভারতবর্ষের সকল স্থানেই বাঙ্গালীর অল্প-বিস্তর বস-বাস আছে; কিন্তু তাঁহাদের অনেকেই স্বজাতি হইতে প্রায় সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ভাবেই বাস করেন। বিদেশ হইতে পরিজনের সঙ্গে যোগ রাখা হয় যেমন পত্র ব্যবহারে, স্বজাতির সহিত প্রকৃত যোগ রাখিতে হয় তেমনই তাহার সাহিত্যের দান প্রতিদানের মধ্য দিয়া। তাই, প্রবাসী বাঙ্গালীও যদি স্বজাতির সহিত আজ এমনি একটি যোগ-সূত্র গড়িয়া তুলিতে পারে, তবে সমস্ত বিচ্ছিন্ন বাঙ্গালী মিলিয়া একতার বাঁধনে, সহানুভূতির প্রেরণায় কি যে এক মহা বাঙ্গালী জাতি গড়িয়া উঠিতে পারে, ভাবিলেও আনন্দ হয়। তীক্ষ্ণধী, কর্ম্মকুশল এত বড়, এত প্রাচীন এই যে ইহুদি জাতি—পৃথিবীর ধনকুবের এবং দৃঢ়ব্রত হইয়াও এ জাতি একটা জাতিরূপে গড়িয়া উঠিতে পারিতেছে না কেন, এ প্রশ্নের সমাধানে অবস্থার তাড়নাকে যত বড় করিয়াই দেখান হউক না কেন, তাহাদের গৌরবময় অতীতকে পরিপূর্ণ ব্যথায় ও আনন্দে বাঁচাইয়া রাখিবার মত তেমন কোনও সাহিত্য যে নাই, এইটিই হইতেছে অতি বড় কথা। ইতিহাস তাহাদের আছে; কিন্তু ইতিহাস স্মৃতির সহায়তা করে মাত্র,—কাব্য ও সাহিত্যের স্বার্থকতা জীবনটাকে সমগ্র আশা, আকাঙ্ক্ষা, বেদনা ও প্রেরণার মাঝে প্রত্যক্ষ দেখান। এই অমূল্য ধন থাকিয়াও যদি বাঙ্গালীর ভাঙ্গা ঘর জোড়া না লাগে, তাহা হইলে আমাদের দুর্ভাগ্যের লক্ষণ নির্ণয় করিতে ইহার পরও আরও প্রতীক্ষা করিতে হইবে। প্রবাসে বাঙ্গালীর 'থিয়েটার-ক্লাব'ই বাঙ্গালীর মিলন ক্ষেত্র। ইহার মাঝে বাঙ্গালীর বাঙ্গালীত্বের—তাহার artistic sense এর একটু আভাস যেমন প্রচ্ছন্ন আছে, অপর দিকে বাঙ্গলা সাহিত্যের ক্ষীণাঙ্গ—অর্থাৎ উহার নাটকের মাঝেই যে তাহার রস-সাধনা পর্য্যবসিত হইয়াছে, ইহাও

প্রমাণিত হয়; আর তাহাও শুধু ক্রীড়াব অঙ্গ হিসাবে—সাহিত্য-বোধে নয়। কাশীধামে যত বাঙ্গালী আছেন, বঙ্গের বাহিরে এত বাঙ্গালী আর কোথাও নাই; বঙ্গদেশের অনেক সহরের অপেক্ষাও এখানে বাঙ্গালীর সংখ্যা বেশী। কিন্তু এখানে সাধারণ বাঙ্গালীর মাঝে জীবনের স্পন্দন যত ক্ষীণ, এমন বোধ হয় আর খুব কমই আছে। তাহার একটি কারণ বোধ হয় এই, যাঁহারা মুক্তি-কামনায় কাশীবাস করিতে আসেন, তাঁহারা শুধু স্বজাতি হইতেই বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকেন না, পরিজনের সঙ্গে সম্বন্ধ ত্যাগ করিয়া আসেন বলিয়াই মনে করেন। এই বিচ্ছিন্ন নির্লিপ্ত ভাব, এই নিষ্ক্রিয় ঔদাসীন্য অন্ততঃ যুবকদের পক্ষে যে কিরূপ ক্ষতিকর, তাহা সহজেই অনুমেয়। এখানে বাঙ্গালী যুবকদের কোন সম্মিলনী নাই, যুবকদের মাঝে কোন সম্বন্ধ নাই, সহানুভূতি নাই, একতা নাই, ভাবের আদান-প্রদান নাই; বাঙ্গলায় যে সকল ভাব ও কর্ম্মের সাড়া বাঙ্গালীর জাতীয়-জীবনে বিজলীর মত চেতনার স্পন্দন বহিয়া আনে, তাহাও আমাদের বদ্ধ-দুয়ার হৃদয়ের স্তব্ধ অন্তঃপুরে প্রবেশের পথ পায় না, বাহির হইতেই আঘাত করিয়া ফিরিয়া যায়: বঙ্গের কর্ম্মকোলাহলের বাহিরে, বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ধূলা এবং বাঙ্গালীটোলার ধূঁয়া সেবনে আমাদের শান্তিময় জীবনের এই যে নিবিড় স্তব্ধতা, ইহা কি মরণের লক্ষণ নয়? জগতের এই নব-যুগের কর্ম্মকোলাহলময় অরুণ-প্রভাতে আমাদের এই শীতল শান্তির জড়-নেশা ছাড়িয়া দুয়ার খুলিয়া বাহিরের আলোকে আসিয়া দাঁড়াইতে হইবে। কিন্তু কোথায় সে দ্বারি, যে বাঙ্গালীর অন্তরের বদ্ধ দুয়ার খুলিয়া দিয়া তাহাকে তাহার পথের সন্ধান বলিয়া দিবে? কোথায় কাহার মাঝে বাঙ্গালীর মনের কথা গোপন ব্যথার সন্ধান পাইবে? আমাদের আজিকার এই মিলনের ডাক যদি এই সন্ধানের বেদনা বুকে লইয়া আসিয়া থাকে, তবেই ইহা সার্থক; নচেৎ বাহিরের এই উৎসাহ উপহাসেরই নামান্তর। সাহিত্যের মাঝে,—অর্থাৎ সাহিত্যানুশীলন ও সাহিত্য-সৃষ্টি উভয়ের মাঝেই এ বেদনা রূপ পায়, আকার পায়। সাহিত্যই এই সন্ধানের পথ প্রদর্শক, তাই তাহারি দ্বারে আজ আমরা উপস্থিত,—জীবনের জন্য, পথের জন্য, মুক্তির জন্য।

শ্রীহর্ষের কড়াকথা।

[শ্রীগিরীশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ]

কবিপ্রবর শ্রীহর্ষ নৈষধ কাব্যের সপ্তদশ সর্গে নাস্তিক মতের উপর যে তীব্র ভাষা প্রয়োগ করিয়াছেন, অদ্যতন প্রবন্ধে তাহারই সারসঙ্কলন করিয়া পাঠকদিগের সমীপে উপস্থিত করিব।

স্বয়ম্বর সভায় দময়ন্তী-কর্ত্তৃক নলরাজ বৃত হইলে, ইন্দ্র প্রভৃতি প্রার্থী দেবগণ সন্তুষ্টচিত্তে নল-দময়ন্তীকে আশীর্ব্বাদ করিয়া, নিজভবনে গমন করিতেছিলেন, এমন সময় পথিমধ্যে পারিষদ্‌বর্গপরিপূর্ণ কলির সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎকার হইয়াছিল। কলির দল হইতে একজন বেদ-প্রভৃতি শাস্ত্রের অসারতাপ্রদর্শনপূর্ব্বক পাপাচরণের সুখহেতুতা প্রচার করিতেছিল। তাহার যুক্তিগুলি আপাততঃ বড়ই মধুর, এবং ইদানীন্তন পাশ্চাত্য মতাবলম্বী কাপটিকদিগের মতের অনুরূপ। সুধীবৃন্দের অবগতির জন্য আপাততঃ কতিপয় পদ্যের তাৎপর্য্য প্রদর্শিত হইতেছে—

অগ্নিহোত্রং ত্রয়ীতন্ত্রং ত্রিদণ্ডং ভস্মপুণ্ড্রকম্।
প্রজ্ঞা-পৌরুষ-নিঃস্বানাং জীবো জল্পতি জীবিকাম্॥ ৩৯

বেদবিহিত অগ্নিহোত্র, ত্রিদণ্ড এবং ভস্মত্রিপুণ্ড্র ধারণ এই সকল অনুষ্ঠান বুদ্ধিপুরুষকারশূন্যদিগের জীবিকা। অর্থাৎ যাহারা বঞ্চনার দ্বারা অথবা চুরি ডাকাতি করিয়া অর্থসংগ্রহ করিতে অসমর্থ, তাহাদের জীবনোপায়। বৃহস্পতি এই মত প্রকাশ করিয়াছেন। (অসুরদিগের মোহ জন্মাইবার জন্য বৃহস্পতি নাস্তিকমত প্রচার করিয়াছিলেন)।

শুদ্ধি বংশদ্বয়ী-শুদ্ধৌ পিত্রোঃ পিত্রো র্যদেকশঃ।

তদনন্ত-কুলাদোষা দদোষা জাতি রস্তি কা॥ ৪০

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ইত্যাকার জাতি কল্পনা হইতেই পারে না, কারণ প্রত্যেক পিতা মাতার পিতৃকুল ও মাতৃকুল শুদ্ধ হইলে, ব্রাহ্মণাদির বিশুদ্ধি সম্ভব হয়। সুতরাং অনন্ত কুলের নির্দ্দোষতাঘটিত কোনও জাতিরই নির্দ্দোষতা সম্ভব হয় না, অর্থাৎ সৃষ্টিকাল হইতে ব্যভিচার ঘটে নাই, বিজন্মা একটাও হয় নাই এমন বংশ অসম্ভব। ব্যভিচারের দ্বারা উৎপত্তি হইলেই সঙ্কর হইয়া যায়। যদি বিশুদ্ধ জাতিই না থাকে, তবে তাহার কর্ত্তব্যও থাকে না। অতএব জাতিবিচার পরিত্যাগ করিয়া স্বচ্ছন্দাচারে প্রবৃত্ত হওয়াই বুদ্ধিমানের কর্ত্তব্য।

ঈর্ষ্যায়া রক্ষতো নারী র্ধিক্ কুলস্থিতিদাম্ভিকান্।

স্মরান্ধত্বাবিশেষেপি তথা নর মরক্ষত॥ ৪২

স্ত্রী-পুরুষ উভয়ের কামাতুরতার সাম্যেও কুলমর্য্যাদা রক্ষার জন্য ঈর্ষ্যাবশতঃ কেবল স্ত্রীদিগকেই পরপুরুষ সংসর্গ হইতে বঞ্চিত করে, অথচ পুরুষকে পরদার সমাগম হইতে নিবৃত্ত করে না, এমন প্রতারক সামাজিকদিগকে ধিক্।

পাপাত্তাপ মুদঃ পুণ্যাৎ পরাসোঃ স্যারিতি শ্রুতিঃ।

বৈপরীত্যং দ্রুতং সাক্ষা ত্তদাখ্যাত বলাবলে॥ ৭৫

হে বেদবিশ্বাসী পণ্ডিতগণ! শ্রুতি বলে, যে পাপ করিলে মৃত্যুর পর যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়, এবং পুণ্য করিলে সুখ হয়। অথচ প্রত্যক্ষ দেখা যায় যে, প্রয়াগে মাঘ মাসে প্রাতঃস্নানকারীর শীতজন্য খুব কষ্ট হয়, এবং পরদার সমাগমকারীর সুখ হয়। এই উভয় ফলই ক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গে সিদ্ধ হয়। সুতরাং শোনা কথাও প্রত্যক্ষ প্রমাণ, এই উভয়ের মধ্যে কোন্‌টি প্রবল, তাহা বল দেখি?

সুকৃতে বঃ কথং শ্রদ্ধা সুরতে চ কথং ন সা।

তৎকর্ম্ম পুরুষঃ কুর্য্যাদ্ যেনান্তে সুখ মেধতে॥ ৪৮

হে আস্তিকগণ! পুণ্যের জন্য তোমাদের এত শ্রদ্ধা কেন? স্ত্রীসমাগমে তাদৃশ আস্থা নাই কেন? যে কার্য্যের অবসানেই সুখ হয়, তাহাই ত পুরুষের কর্ত্তব্য। ইহজন্মে অনুষ্ঠিত ব্রতাদি জন্য জন্মান্তরের সুখ সন্দিগ্ধ, পক্ষান্তরে সুরতজনিত সুখ, নিজের অনুভবসিদ্ধ। অতএব চান্দ্রায়ণাদি পরিত্যাগ করিয়া সুরতে প্রবর্ত্তনই কর্ত্তব্য।

শ্রুতি-স্মৃত্যর্থ-বোধেষু নৈকমত্যং মহাধিয়াম্।

ব্যাখ্যা বুদ্ধি-বলাপেক্ষা সানোপেক্ষ্যা সুখোন্মুখী॥ ৫১

শ্রুতিস্মৃতির অর্থাবধারণে মহামতিদিগেরও ঐকমত্য কোথাও সম্ভব হয় না। কারণ ব্যাখ্যা পণ্ডিতদিগের বুদ্ধি-বল সাপেক্ষ, অর্থাৎ স্ব স্ব বুদ্ধিনৈপুণ্যানুসারেই পণ্ডিতগণ ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। অতএব যেরূপ ব্যাখ্যা সুখের অনুকূল হয়, সেইরূপ ব্যাখ্যাই আদরণীয়।

মৃতঃ স্মরতি জন্মানি মৃতে কর্ম্ম-ফলোর্ম্ময়ঃ।

অন্যভুক্তৈ র্মৃতে তৃপ্তি রিত্যলং ধূর্ত্তবার্ত্তয়া॥ ৫৩

মৃতব্যক্তি পূর্ব্বজন্মের বৃত্তান্ত স্মরণ করে, প্রেতাত্মাতে পাপপুণ্যরূপ কর্ম্মের ফলস্বরূপ দুঃখসুখের তরঙ্গ উৎপন্ন হয়, অন্যের ভোজনের দ্বারা মৃতব্যক্তির তৃপ্তি হয়, ইত্যাকার ধূর্ত্তবাক্যের কিছুই মূল্য নাই।

জনেন জানতাস্মীতি কায়ং নায়ং ত্বমিত্যসৌ।

ত্যাজ্যতে গ্রাহ্যতে চান্যা দহো ধূর্ত্তশ্রুতির্ধ্বয়া॥ ৫৪

যে দেহকে মানব আমি বলিয়া জানে, শ্রুতিবলে (তত্ত্বমসি) তুমি উহা নও, পক্ষান্তরে যাহা দেখা যায় না, তেমন একটা অদ্ভুত পদার্থকে আত্মা বলিয়া বুঝাইয়া দেয়, ধূর্ত্তশ্রুতির তাৎপর্য্য বড়ই বিস্ময়কর।

বিপ্রলিপ্সুপরিজ্ঞানায় জনা জনিত-মজ্জনাঃ।

বিগ্রহায়াগ্রতঃ পশ্চাদ্গন্তুরোরভ্রবিভ্রমম্॥ ৭৭

গঙ্গা প্রভৃতি তীর্থে স্বর্গ কামনায় যাহারা স্নান করে, তাহারা ভেড়ার যুদ্ধের অভিনয় করে। কারণ ভেড়াগুলি পরস্পর সম্মুখীন হইয়া ঢিশ দিবার পূর্ব্বে, অনেক দূর পিছাইয়া যায়। পৃথিবী হইতে ঊর্দ্ধ স্বর্গস্থানে যাইবার জন্য জলের নীচে ডুবিয়া যাওয়াও তদ্রূপ।

দেবশ্চে দস্তিসর্ব্বজ্ঞঃ করুণা-ভা গবন্ধ্যবাক্।

তৎ কিং বাগ্ব্যয়মাত্রা ন্নঃ কৃতার্থয়তি নার্থিনঃ॥

হে নৈয়ায়িকগণ! তোমরা সর্ব্বজ্ঞ করুণাময় অবন্ধ্য-বাক্য, অর্থাৎ তিনি যাহা বলেন তাহাই হয়, এমন ঈশ্বর আছেন বলিয়া স্বীকার কর। যদি এমন কেহ থাকেন, তবে বাক্যব্যয় করিয়া আমাদিগকে কেন কৃতার্থ করেন না?

কর্ম্মমীমাংসকদিগের মতে জীবের স্ব স্ব কর্ম্মানুসারে ঈশ্বর নানাবিধ ফলের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। ঐ মতের উপর দোষ দিয়া বলা হইতেছে যে –

ভবিনাং ভাবয়ন্ দুঃখং স্বকর্ম্মজ মপীশ্বরঃ।
স্যা দকারণ বৈরীনঃ কারণা দপরে পরে॥ ৭৮

ঈশ্বর স্বকর্ম্মজ দুঃখের বিধান করিয়াও আমাদের অকারণ বৈরী, অন্যান্য শত্রু নিজের স্বার্থ সিদ্ধির জন্যই শত্রুতা করিয়া থাকে। আমি পাপ করিলাম, তাহাতে ঈশ্বরের ক্ষতি কি? নিঃস্বার্থ শত্রুতাচরণকারী ঈশ্বর কিছুতেই স্বীকার্য্য নহে।

ইহা কর উহা করিও না, ইত্যাকার বিধি নিষেধ পরিত্যাগ করাই কর্ত্তব্য—কারণ,—

দৈন্যস্যায়ুষ্য মস্তেন্য মভক্ষ্যং কুক্ষি-বঞ্চনঃ।
স্বাচ্ছন্দ্য মূচ্ছতানন্দ-কন্দলী-কন্দ মেককম্॥ ৮৩

চুরি না করাতে দারিদ্র্যেরই আয়ু বৃদ্ধি হয়, আর অভক্ষ্য পরিহারে নিজের উদরকেই বঞ্চনা করা হয়। অতএব সমস্ত বিধি নিষেধ পরিত্যাগ করিয়া, আনন্দ পাদপের মূল একমাত্র যথেচ্ছাচারকেই অবলম্বন কর।

ইত্যাদি' শাস্ত্রসদাচারনিন্দা কলির চেলার মুখে প্রকাশ করিয়া, কবি, ইন্দ্র প্রভৃতি দিকপালদিগের মুখে ইহার প্রতিবাদ স্বরূপ কড়া কথার অবতারণা করিয়াছেন।

ইন্দ্রের উক্তি—

বর্ণাসঙ্কীর্ণতায়াং বা জাত্যালোপেঽন্যথাপি বা।
ব্রহ্মহাদেঃ পরীক্ষাসু ভঙ্গ মঙ্গ প্রমাণয়॥ ৮৬
ব্রাহ্মণ্যাদি-প্রসিদ্ধায়াং গন্তা যন্নেক্ষতে জয়ম্।
তদ্বিশুদ্ধি মশেষস্য বর্ণবংশস্য শংসতি॥ ৮৭

রে নাস্তিক! তুমি অভিমত প্রকাশ করিয়াছ যে,—ব্যভিচার বশতঃ এবং অন্যান্য কারণে কোন জাতিই বিশুদ্ধ নাই। তোমার মতের অসারতা বুঝিবার জন্য পরীক্ষা কার্য্যে ব্রহ্মহত্যাকারীর পরাজয়কেই প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ কর। (পূর্ব্বে পাপকারীর পরীক্ষা হইত। কোন ব্যক্তি ব্রহ্মহত্যা করিয়া অস্বীকার করিলে, পরীক্ষার দ্বারা তাহার নির্ণয় হইত। প্রকৃত ব্রহ্মহত্যাকারীর পরাজয় হইত, অর্থাৎ তপ্ত কুঠারাদি ধারণে তাহার হাত পোড়া যাইত, পক্ষান্তরে নিষ্পাপের হাত পুড়িত না। ব্রাহ্মণ না থাকিলে এই পার্থক্য সম্ভব হয় না) ব্রাহ্মণী প্রভৃতির অভিগামী পারদারিকের পরীক্ষাতে পরাজয়ও সমস্ত বংশেরই বিশুদ্ধির জ্ঞাপক।

অপিচ—হে নাস্তিক! তুমি মৃতব্যক্তির শ্রাদ্ধ জন্য তৃপ্তি অসম্ভব বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছ; কিন্তু—

যাচতঃ স্বং গয়াশ্রাদ্ধং ভূতমাবিশ্য কঞ্চন।
নানাদেশজনোজ্ঞাঃ প্রত্যেষি ন কথাঃ কথম্॥ ৯০

মানব মৃত্যুর পর কারণবিশেষে ভূত হইয়া কোনও ব্যক্তিতে আবিষ্ট হয়, এবং নিজের গয়াশ্রাদ্ধ প্রার্থনা করে। সর্ব্ব-দেশ-প্রসিদ্ধ এই কথা তুমি কেন বিশ্বাস কর না?

আর নামভ্রমে যমদূত-কর্ত্তৃক নীত মানব যমলোক হইতে ফিরিয়া আসিয়া যে সমস্ত পরলোকের কথা বলে, যাহা ঠিক ঠিক মিলিয়া যায়, তাহাই বা বিশ্বাস কর না কেন?

নীতানাং যমদূতেন নাম ভ্রান্তে রূপাগতৌ।
শ্রদ্ধৎ সে সংবদন্তীং ন পরলোক-কথাং কথম্॥ ৯১

অনন্তর অগ্নিদেব ক্রুদ্ধ হইয়া বলিয়াছেন—

হে ক্ষণাভক্ষণ মূর্চ্ছাল! (ক্ষণকাল খাইতে না পাইলেই মূর্চ্ছাপ্রাপ্ত! উদরসর্ব্বস্ব আধুনিক অনেক বাবুই এই সম্বোধনের যোগ্য) কেবল বেদোক্ত ধর্ম্মেলেই জীবন ধারণ করে, এমন মহাপরাকাদি প্রায়শ্চিত্তকারী মানবদিগের প্রতি লক্ষ্য করিয়া তোমার কি বিস্ময় বোধ হয় না? অর্থাৎ তুমি ক্ষণকাল না খাইলেই মরিয়া যাও, আর পরাককারী বারদিন পর্য্যন্ত অনাহারে থাকে।

মহা পরাকিণঃ শ্রৌত ধর্ম্মৈকবলজীবিনঃ।
ক্ষণাভক্ষণ মূর্চ্ছাল স্মরণ্ বিস্ময়সে ন কিম্॥ ৯৩

হে নাস্তিক! পুত্রেষ্টি কারীরী শ্যেন প্রভৃতি দৃষ্টফল যাগ দেখিয়াও কি তোমার ধর্ম্ম-সন্দেহ দূর করিতে পার না? পুত্রেষ্টি করিলে অচিরে পুত্র হয়, শ্যেনযাগ করিলে শত্রু-বিনাশ হয় এবং কারীরী যাগে সত্তই বৃষ্টি হয়।

পুত্রেষ্টি শ্যেন কারীরী-মুখা দৃষ্ট-ফলামথাঃ।
নবঃ কিং ধর্ম্মসন্দেহমন্দেহজয়ভানবঃ॥ ৯৪

অনন্তর যম বলিয়াছেন—

বেদৈ স্তুহেবিভি স্তুবৎ স্থিরং মতশতৈঃ কৃতম।
পরং কস্তে পরং বাচা লোকং লোকায়ত! ত্যজেৎ॥ ৯৭

' হে ঐহিক-সর্ব্বস্ব নাস্তিক! বেদ এবং তদনুযায়ী স্মৃতি পুরাণ প্রভৃতি শত শত মত যে পরলোক স্থির করিয়াছে; তোমার কথায় কে তাহা পরিত্যাগ করিবে?

আরও দেখ, কোন্ পথে যাইতে হইবে, এমত সন্দেহ উপস্থিত হইলে, বহুলোকে যে পথে যাইতে বলে, তুমি ত সেই পথেই যাইয়া থাক। পরলোক সম্বন্ধে এই লৌকিক দৃষ্টান্ত খাটিবে না কেন?

সমজ্ঞানাল্পভূয়িষ্ঠ-পান্থ-বৈমত্য মেত্য যম্।

লোকে প্রয়াসি পন্থানং পরলোকে'নতঃ কুতঃ॥ ৯৮

নিজের কন্যাকে অন্যের হাতে দান করাবিষয়ে শাস্ত্র এবং লোক সকলেরই একমত দেখা যায়; সুতরাং পরলোক বিষয়েও অনেকের ঐকমত্য দেখিয়া, মন কেন স্থির করা হয় না?

স্বকন্যা মন্যসাৎ কর্ত্তুং বিশ্বানুমতিদৃশ্বনঃ।

লোকে পরত্র লোকস্য কস্য ন স্যাদ্ দৃঢ়ং মনঃ॥ ৯৯

মানবাশক্য-নির্ম্মাণা কূর্ম্মাদ্যঙ্কবিলা শিলা।

ন শ্রদ্ধাপয়তে মুগ্ধা স্তৌথিকাধ্বনি বঃ কথম্॥ ১০৩

হে মূর্খগণ! মানব যাহা নির্ম্মাণ করিতে অসমর্থ, তাদৃশ মৎস্য কূর্ম্ম বরাহ প্রভৃতি চিহ্নযুক্ত শালগ্রামশিলা তোমাদিগকে শাস্ত্রীয় পথে শ্রদ্ধান্বিত করে না কেন? অর্থাৎ শালগ্রামচক্রের ছিদ্রমধ্যে স্বভাবতই মৎস্য কূর্ম্ম প্রভৃতি চিহ্ন হইয়া থাকে। উহা মানবের কৃতিসাধ্য নহে। এই অলৌকিক কার্য্য দেখিয়া শাস্ত্রাভিমত পরলোকে বিশ্বাস করা কর্ত্তব্য।

নাস্তিকবাদের উপর এইরূপ আরও অনেক নিন্দা আছে। সমস্ত লিখিতে গেলে প্রবন্ধ বৃহত্তর হইয়া পড়ে, সুতরাং উহা এখানেই উপসংহৃত হইল।

বৈদিক অশ্বমেধ প্রভৃতি কার্য্যে আপাত-দৃষ্টিতে যাহা নিতান্ত অস্বাভাবিক এবং অশ্লীল, তাহাও যে বেদবিশ্বাসী আস্তিকের পক্ষে সর্ব্বতোভাবে অমীমাংস্য এবং অনুষ্ঠেয়, ইহা বুঝাইবার জন্য কবি কতিপয় বিষয়ের উল্লেখ করিয়া, দোষদর্শী কলিকে অজ্ঞ অপণ্ডিত প্রভৃতি কড়া কথার দ্বারা গালি দিয়াছেন। হিন্দু সাহিত্যের অভিপ্রায় বুঝিতে হইলে, ঐ সমস্ত বিষয়ের আলোচনা আবশ্যক, সুতরাং কয়টি পদ্যের তাৎপর্য্য প্রদর্শিত হইতেছে—

ক্রতৌ মহাব্রতে পশ্যন্ ব্রহ্মচারীত্বরীরতম্।

অজ্ঞে যজ্ঞক্রিয়া মজ্ঞঃ স ভণ্ডাকাণ্ডতাণ্ডবম্॥ ২০২

সেই মূর্খ কলি মহাব্রত নামক বৈদিক যজ্ঞের অঙ্গরূপ ব্রহ্মচারী এবং কামিনী রমণীর সঙ্গম দেখিয়া, যজ্ঞকার্য্যে ভণ্ডের অকাণ্ড তাণ্ডব মনে করিয়াছিল। অর্থাৎ ভণ্ড মানবগণ যেমন সর্ব্বজন-সমক্ষে গুহ্যাঙ্গপ্রদর্শন প্রভৃতি অশ্লীল ব্যবহার করে, যাজ্ঞিকেরাও তেমনই অকার্য্যের অনুষ্ঠানও অনুমোদন করে। এখানে বলিয়া রাখিতেছি যে, আধুনিক পাশ্চাত্য রুচির অনুসারে "সং প্রবাদ" শব্দের 'Conversation' অর্থ গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু ভারতীয় প্রাচীন মনীষিবৃন্দ উহার মৈথুন অর্থই বুঝিয়াছিলেন; কবি শ্রীহর্ষও সেই মতেরই প্রতিধ্বনি করিয়াছেন। অধিকন্তু যাহারা বেদের আদেশের উপর দোষারোপ করে, তাহাদিগকে অজ্ঞ মূর্খ বলিয়াই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। "মহাব্রতে ব্রহ্মচারী পুংশ্চখোঃ সংপ্রবাদঃ" এই শ্রুতির অর্থানুসারে শ্লোক রচিত হইয়াছে।

অশ্বমেধযজ্ঞে যজমান ভার্য্যার সহিত যজ্ঞাশ্বের অস্বাভাবিক অশ্লীল ব্যাপার দর্শন করিয়া, অপণ্ডিত কলি শ্রুতির কর্ত্তাকে ভণ্ড মনে করিয়াছিল।

যজ্ঞ ভার্য্যাশ্বমেধাশ্ব-লিঙ্গালিঙ্গি বরাঙ্গতাম্।

দৃষ্টাষ্ট স কর্ত্তারং শ্রুতে র্ভণ্ড মপণ্ডিতঃ॥ ২০৪

অশ্বমেধকাণ্ডে আছে—"অশ্বস্য শিশ্ন মহিষ্যা উপস্থে নিধত্তে" যে অশ্বমেধের ফলে ইন্দ্রত্বলাভ হয়, ব্রহ্মহত্যার পাপ প্রক্ষালিত হয়, এ হেন ব্যাপারে রাজমহিষীর লাঞ্ছনা কেন? শাস্ত্রবিশ্বাসী মানবের ঈদৃশ প্রশ্নের অবকাশ নাই। কারণ ভারতীয় প্রাচীন সুধীসমাজের নির্ব্বিবাদ সিদ্ধান্ত যে—

পুরাণং মানবো ধর্ম্মঃ সাঙ্গো বেদ শ্চিকিৎসিতম্।

আজ্ঞা-সিদ্ধানি চত্বারি নহন্তব্যানি হেতুভিঃ॥

পৌরাণিক বিবরণ মনুক্ত ধর্ম্ম ষড়ঙ্গ-সমন্বিত বেদ এবং চিকিৎসাশাস্ত্র এই চারিটি আজ্ঞাসিদ্ধ, এই গুলিকে হেতুর দ্বারা খণ্ডন করিবে না। ঈশ্বরের আদেশ মনে করিয়াই অবনত মস্তকে স্বীকার করিতে হইবে। এই কর্ম্মে এইরূপ

ফল হয় কেন? এইরূপ কুতর্ক করা চলে না। কারণ ধর্ম্ম অধর্ম্ম উভয়ই প্রত্যক্ষের বিষয় নহে। সুতরাং কেবল লৌকিক দৃষ্টান্তের সাহায্যে উহার তথ্যনির্ণয়ের চেষ্টা বাতুলতারই পরিচায়ক।

প্রদর্শিত তীব্রোক্তির মত ১৭শ সর্গে আরও অনেক শাস্ত্রীয় বিষয়, নাস্তিকের প্রতি গালিবর্ষণের দ্বারা কবি কর্ত্তৃক মীমাংসিত হইয়াছে। বাহুল্য ভয়ে তাহা এই প্রবন্ধে আর প্রদর্শিত হইল না।

নৈষধ কাব্য ২২ সর্গে নিবদ্ধ। উহার এক একটি সর্গের স্বতন্ত্রভাবে সমালোচনা না হইলে তাৎপর্য্য প্রদর্শন করা অসম্ভব। অতঃপর আমরা বিভিন্ন সর্গের যথাশক্তি সমালোচনা করিতে চেষ্টা করিব। কবি শ্রীহর্ষ অসাধারণ দার্শনিক হইয়াও, শাস্ত্রের প্রতি কিরূপ আস্থাবান ছিলেন, তাহা দেখাইবার অভিপ্রায়েই অন্যান্য সর্গ উল্লঙ্ঘন করিয়া সপ্তদশ সর্গের বিষয় অগ্র বিবৃত হইল।

বঙ্কিমের অপত্যস্নেহ।

[শ্রীনীরদকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ]

শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক বিদ্যারত্ন মহাশয়ের পর বঙ্কিমচন্দ্রের পুস্তকাবলীর চরিত্র-বিশ্লেষণে লেখনী ধরিতে যাওয়াই মূর্খের কাজ সন্দেহ নাই, কিন্তু তথাপি—

"মন্দঃ কবিযশঃপ্রার্থী গমিষ্যাম্যুপহাস্যতাম্।
প্রাংশুলভ্যে ফলে লোভাদুদ্বাহুরিববামনঃ॥"

মহাকবির এই বাক্য স্মরণ করিয়া লেখনী ধারণ করিলাম। আশা করি, বিদ্বন্মণ্ডলী বঙ্কিমের এই নূতন রাঁধুনীর নূতনত্ব দোষ ক্ষমা করিবেন। এবার আর পাঠকগণ "বঙ্কিম চর্চ্চড়ী"র আস্বাদ পাইবেন না; এবার কাঁচা হাতের প্রস্তুত "বঙ্কিমের অপত্যস্নেহের" আস্বাদ করিয়া দেখুন।

প্রথমেই "দেবীচৌধুরাণী"তে আমরা দেখিতে পাই যে, হরবল্লভ স্বার্থপর, নীচ, পিশাচান্তঃকরণ, অর্থগৃধ্নু,—ঘোর বিপদে পড়িয়াও স্বার্থপরতার চরম দৃষ্টান্ত দেখাইতেছে। কারণ ইহা নিশি ঠাকুরাণীর উক্তি হইতেই প্রমাণ পাইতেছি "………তুমি জুয়াচোর, কৃতঘ্ন, পামর, গোয়েন্দাগিরি কর, তোমার কথায় বিশ্বাস কি?"

(দেবীচৌধুরাণী, তৃতীয় খণ্ড, অষ্টম পরিচ্ছেদ)

দেখা যাইতেছে যে, এই হরবল্লভ জীবন-সঙ্কট বিপদে পড়িয়া যে কোনও সর্ত্তে জীবনরক্ষার জন্য ব্যাকুল, তখন তাহার নিকট স্বীয় প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তর আর কিছুই নাই, সেই হরবল্লভকে যেমনই নিশি বলিলেন "ব্রজেশ্বরের মাথায় হাত দিয়া দিব্য করিতে পার?" অমনই হরবল্লভ গর্জ্জিয়া উঠিল। বলিল, "তোমাদের যাহা ইচ্ছা তাহা কর। আমি তা পারিব না" (তৃতীয় খণ্ড, অষ্টম পরিচ্ছেদ)

স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, এই জীবন সঙ্কট মুহূর্ত্তেও এমন স্বার্থপর ব্যক্তির অন্তঃকরণে অপত্যস্নেহের ফল্গুধারা অন্তঃসলিলা বহিতেছে। যেমনই সেই স্নেহাস্পদের অকল্যাণজনিত কার্য্য (অবশ্য বাঙ্গালীর অন্ধ বিশ্বাসানুযায়ী) করিতে আদিষ্ট হইয়াছেন, অমনই সেই ফল্গু ভৈরব গর্জ্জনে বান ডাকিয়াছে, সে স্রোতের তাড়নে নীচতা, স্বার্থপরতা —এমন যে প্রিয় জীবন, তাহার রক্ষার জন্য আকুলতা— সমস্তই ভাসিয়া গিয়াছে, তখন হরবল্লভ মরিয়া—"ডাকিনী বেটাদের" হাতে প্রাণ দিবেন সেও স্বীকার, তথাপি পুত্রের অমঙ্গলজনিত কার্য্য কোন মতেই করিবেন না। অপত্যস্নেহের এরূপ নিখুঁত চিত্র আমরা আর কোথায় পাইব?

আবার "দুর্গেশনন্দিনী"তে আমরা প্রায় এই রকমই চিত্র দেখিতে পাই। বীরেন্দ্রসিংহ রাজপুত, বীরাগ্রগণ্য— দিল্লীশ্বরের আনুগত্য স্বীকার করিতে কোনও মতে প্রস্তুত নহেন, বাহুবলে শত্রু পরাঙ্মুখ করিবেন—"আকবরশাহের পক্ষ হইলে কোন্ সেনাপতির অধীন হইয়া যুদ্ধ করিতে হইবে? কাহার আনুগত্য স্বীকার করিতে হইবে? মানসিংহের? গুরুদেব, এ দেহ বর্ত্তমানে এ কার্য্য বীরেন্দ্রসিংহ হইতে হইবে না।"

কিন্তু যেমনই অভিরামস্বামী গণনায় তিলোত্তমার অমঙ্গল সংবাদ বলিলেন, অমনই বীরেন্দ্রের বীরহৃদয় অপত্যস্নেহের করুণ কোমল রসে ভরিয়া গেল। সকল তেজ, সকল বীর্য্য অপত্যস্নেহের নিকট নিমেষে পরাভূত হইল। সে বীররস কোথায় অন্তর্হিত হইল, সে রাজপুতের দৃঢ়প্রতিজ্ঞা সে বীরত্বব্যঞ্জক ভাব, সকলই ভাসিয়া গেল, মোগলের আনুগত্য স্বীকার প্রিয়তমা কন্যার অমঙ্গল অপেক্ষা শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ জ্ঞান হইল। কহিলেন, "...এক্ষণে তিলোত্তমা ব্যতীত আর আমার সংসারে কেহই নাই;... মানসিংহের অনুগামী হইব।"

(দুর্গেশনন্দিনী, প্রথম খণ্ড, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ)

অপত্যস্নেহের এই অসীম শক্তি দেখিয়া সত্যই আমরা বিস্মিত ও মুগ্ধ হই; এই শক্তি কঠিন পাষাণকেও দ্রবীভূত করিয়া ফেলিল। এ শক্তির বিকাশ একমাত্র কেবল সেই সাহিত্য-সম্রাটের লেখনী হইতেই সম্ভবে।

অন্যস্থানে আমরা দেখিতে পাই যে, কতলুখাঁর দরবারে বীরেন্দ্রসিংহের বিচারকালে বীরেন্দ্র মরিতে ভীত নহেন, শত্রুর কৃপাপ্রার্থী নহেন; "...তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া মরিতে পারিতাম .....তুমি আমার প্রাণের অধিক ধনকে .." (দুর্গেশনন্দিনী, ২য় খণ্ড, চতুর্থ পরিচ্ছেদ) এই একটীমাত্র কথা "প্রাণের অধিক ধন" ইহা হইতেই বুঝা যায়, কতখানি গভীর স্নেহ এই বীর হৃদয়ে সঞ্চিত আছে। কারণ বীরেন্দ্রসিংহ আর কথা কহিতে পারিলেন না, স্নেহের আতিশয্যে স্বর রুদ্ধ হইয়া গেল। আবার যখন কতলুখাঁ জিজ্ঞাসা করিলেন, "মৃত্যুকালে তোমার কন্যার সহিত সাক্ষাৎ করিবে না?" বীরেন্দ্র বলিলেন, "যদি আমার কন্যা তোমার গৃহে জীবিত থাকে তবে সাক্ষাৎ করিব না। যদি মরিয়া থাকে, লইয়া আইস, কোলে করিয়া মরিব।" কি সুন্দর ভাব! প্রাণ চাহিতেছে সেই বুকের ধনকে বুকে করিতে, কিন্তু সেই সঙ্গে রাজপুতের আভিজাত্যধর্ম্ম বাধা দিতেছে পাছে কন্যা কলঙ্কিতা হইয়া থাকে, এই ভয়ে জীবিতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবেন না; কিন্তু স্বধর্ম্মরক্ষণার্থে মৃতা কন্যাকে কোলে করিবার ইচ্ছা বলবতী, "এত ভালবাসি তারে যে মৃতদেহটাকেও বুকে করিয়া মরিব।" নবাবের নিকট কোনও ভিক্ষাই চাহিবেন না বলিয়াও শেষে কন্যার কথায় সে প্রতিজ্ঞা ভাসিয়া গেল। এমনই শক্তি এই অপত্যস্নেহের!

(দুর্গেশনন্দিনী, ২য় খণ্ড, চতুর্থ পরিচ্ছেদ)

তাহার পর 'রজনী'তে আমরা দেখি যে, রজনী জন্মান্ধ,—হউক না কেন সে যতই সুন্দরী,—জানি তাহার অন্যান্য সর্ব্বাঙ্গের সৌন্দর্য্যের তুলনা নাই, কিন্তু বিংশ শতাব্দীর পাঠক! এরূপ সুন্দরী যদি সৌন্দর্য্যের সাররত্ন চক্ষু হইতে বঞ্চিতা হয়, তাহা হইলে তাহাকে কি সুন্দরী আখ্যায় অভিহিত করিবেন? বোধ হয়, না। বোধ হয় কেন, নিশ্চয় না। কিন্তু সেই রজনীর পিতাই বলিতেছেন "...আমার মেয়ের দোষের মধ্যে অন্ধ, নহিলে অমন মেয়ে লোকে তপস্যা করিয়া পায় না।" কি সুন্দর এই অপত্যস্নেহের শক্তি প্রস্ফুটিত করিবার ভঙ্গী! একি আর কোথাও দেখিতে পাওয়ার আশা করা যায়? দোষের মধ্যে কি না অন্ধ! যেন অতি সামান্যই খুঁত—ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নহে—দোষের সেরা দোষ "চক্ষুহীনা"—সেটী যেন অতি সামান্যই খুঁতে দাঁড়াইল! কোন্ শক্তি মানবের চক্ষে এই উদারতা দিতে পারে? সে যে অপত্যস্নেহেরই সেই উদ্দাম অন্ধশক্তি, যাহা সেই কাণা ফুলওয়ালীকে সুন্দরী শ্রেষ্ঠায় পরিণত করিয়াছে—কারণ "অমন মেয়ে লোকে তপস্যা করিয়া পায় না।" এ যে কেবল সেই লেখনীই প্রসব করিতে পারে।

(রজনী, ১ম খণ্ড, চতুর্থ পরিচ্ছেদ)

আবার পাঠক 'যুগলাঙ্গুরীয়ে'র ব্যাপার স্মরণ করিয়া দেখুন, কি সুন্দরভাবে এই অপত্যস্নেহ সেখানে চিত্রিত হইয়াছে। হিরণ্ময়ীর বিবাহ-ব্যাপারে তাহার পিতা কত কৌশলই উদ্ভাবিত করিয়াছিলেন। প্রাণসমা নয়নপুত্তলী তনয়ার বৈধব্যযন্ত্রণার কল্পনাক্লিষ্ট হৃদয় সেই আদরের তনয়ার ভাবী মঙ্গলের জন্যই বর্ত্তমান সুখ হইতে তাহাকে বিচ্ছিন্ন করিয়াছিল। প্রণয়াস্পদকে চক্ষুর অন্তরাল করিয়া কত কষ্টই তাঁহাকে দিয়াছিলেন,—কিন্তু সকলই ত সেই তনয়ারই ভবিষ্যৎ সুখের জন্য! কত দৃঢ় এই ধনদাস যে পুত্রীর কষ্ট চক্ষুর সম্মুখে দেখিয়াও তাহারই কল্যাণ

কামনার্থে সে কষ্ট সহিয়াছিলেন ; এ যে সেই লেখকেরই দার্শনিক হৃদয়-দর্পণের প্রতিবিম্ব মাত্র !—এমন Refined Egoismএর চূড়ান্ত ও জীবন্ত দৃষ্টান্ত আর কে দেখাইবে ? —তুচ্ছ সে John Stuart Millএর theory ইহার কাছে !

বিষবৃক্ষে আমরা দেখিতে পাই যে, কুন্দনন্দিনীর বৃদ্ধ পিতা, তনয়ার বিবাহের বয়স অতিক্রান্ত হইলেও তাহাকে অসীম স্নেহবশতঃই সঙ্গ-ছাড়া করিতে পারিতেছেন না— সে যে তাঁহার সংসার-বন্ধনের একমাত্র গ্রন্থি, প্রাণ ধরিয়া তাহাকে পরহস্তে সমর্পণ করিতে পারিলেন না। "আর কিছুদিন যাক্—কুন্দকে বিলাইয়া দিয়া কোথায় থাকিব ? কি লইয়া থাকিব ?" (বিষবৃক্ষ ১ম খণ্ড, ২য় পরিচ্ছেদ) এই "কি লইয়া থাকিব"—ইহাই বৃদ্ধের অন্তরের কথা—এইটাই তাঁহার অপত্যস্নেহের touch-stone। এই বাক্য হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, অন্তিম সময়েও যখন শমন আসিয়া ধরিয়াছে—তখনও অপত্যস্নেহের অমিয় উৎস সমভাবে প্রবাহিত, তখনও মায়া, তখনও তনয়ার অদর্শনা কাঙ্ক্ষায় ব্যাকুলতা। সামান্য লোকের ভিতর দিয়া গ্রন্থকার যে অপত্যস্নেহের অপূর্ব্ব পরিচয় দিয়াছেন, তাহা বাস্তবিকই অতুলনীয়।

'আনন্দমঠে' ব্রহ্মচারী সত্যানন্দ ও মহেন্দ্র যখন ভক্তি-রসে আপ্লুত, মহেন্দ্র ভাবে গদ্‌গদ, সন্তানধর্ম্ম গ্রহণে বদ্ধ-পরিকর, তখনও কন্যার নিমিত্ত ব্যাকুলতা ও দর্শনে আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিতেছেন—"আমার স্ত্রী কন্যা কোথায় ?...একবার দেখিয়া তাহাদের বিদায় দিব।" বৈরাগ্য উপস্থিত, সন্ন্যাস গ্রহণ স্থির—তথাপি "একবার দেখিয়া বিদায় দিব।" (আনন্দমঠ, ১ম খণ্ড,দ্বাদশ পরিচ্ছেদ)

অনেকে হয়ত বলিবেন, "এতদিনকার মায়া কি বাপু অমনই হঠাৎ ছাড়া যায় ?" কিন্তু সেই এতদিনকার মায়া ছাড়িয়াই ত কঠোর ধর্ম্ম গ্রহণে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, তবে কেন কেবল আর একবার দেখিবার ইচ্ছা বলবতী ?—সে যে দুর্নিবার অপত্যস্নেহ—সকল বৈরাগ্যই ভাসাইয়া দেয় !

যদিও আমরা স্থানে স্থানে এই অপত্যস্নেহের অভাব দেখিতে পাই—যদিও রূপনগরাধিপতির পত্রে রাণার প্রতি কটূক্তি—রাণাকে কন্যাদানে অসম্মতি—কন্যার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কার্য্য—ইত্যাদি দেখিতে পাই, কিন্তু তথাপি তাহার মূলে কন্যার মঙ্গলেচ্ছাই বর্ত্তমান—যদিও ভ্রান্ত কিন্তু সেই ভ্রান্ত মঙ্গলেচ্ছাই অপত্যস্নেহের চরম দৃষ্টান্ত। যদিও কৃষ্ণকান্ত উইল দ্বারা হরলালকে সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন, কিন্তু ইহাও সেই পুত্রেরই মঙ্গলাশায়—ভরসা—সম্পত্তি বঞ্চিত হইলে পুত্র ভয়ে সংশোধিত হইবে। কিন্তু যখন আশানুরূপ ফল হইল না, তখন সেই স্নেহ নিদারুণ বিরাগে পরিণত হইয়া তাহাকে ত্যজ্যপুত্র করি-লেন। ইহাতে অপত্যস্নেহের অপকর্ষ ত প্রমাণ হইতেছেই না, বরং তাহার শক্তি আরও জ্বলন্তভাবে পরিস্ফুট হইতেছে, কারণ, যে যাহাকে যত অধিক ভালবাসে বা স্নেহ করে, সে তাহার নিকট হইতে বিপরীত ব্যবহার পাইলে সেই স্নেহ নিদারুণ বিরাগে পরিণত হয়,—ইহাই Psychology of human mind। এমন Negative শক্তি দিয়া গ্রন্থকার অপত্যস্নেহ এত সুন্দরভাবে প্রস্ফুটিত করিয়া তুলিয়াছেন যে, সত্যই সেই লেখনীর উদ্দেশে শ্রদ্ধাভরে মস্তক আপনিই নত হইয়া যায়।

বিসর্জ্জন।

[শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী]

(১০)

সুষমার কোন কাজে আর হাত পা উঠিতেছিল না, একমাত্র প্রিয়তমা কন্যার এই অবস্থায় তিনি একেবারে দমিয়া পড়িয়াছিলেন। জগতের যত লজ্জা, সব আসিয়া যেন তাঁহাকেই ঘিরিয়া ফেলিয়াছিল; তিনি গৃহমধ্যে আশ্রয় করিয়াছিলেন।

শুভ্রা যে বাস্তবিকই এমন কাজ করিবে, এমন ক'রয়া বংশে দুরপনেয় কলঙ্করাশি অর্পণ করিয়া যাইবে তাহা কে জানিত? যে জননীর কন্যা সে, যিনি সর্ব্বতোভাবে তাহাকে শিক্ষা দিয়া গড়িয়া তুলিয়াছেন, তিনিই যে জানেন না, তিনিই যে তাহাকে চিনিতে পারেন নাই।

যখন শুভ্রার পলায়নবার্ত্তা সুভা দ্বারা চারিদিকে রাষ্ট্র হইয়া গেল, যখন পল্লীবাসিনীরা দলে দলে আসিতে লাগিলেন, গ্রামের উৎসাহী যুবকগণ পলাতকাকে খুঁজিবার জন্য বাহির হইয়া পড়িল, তখন দুর্ভাগিনী মাতা দরজা বন্ধ করিয়া গৃহমধ্যে পড়িয়া রহিলেন। তাঁহার চোখে এক ফোঁটা জল ছিল না, তিনি মাথা খুঁড়িয়া বলিতেছিলেন, হে ঠাকুর, তার মরণ দাও। মায়ের যদি সন্তানের উপর যথার্থ কোন স্নেহ থাকে, সেই স্নেহকে মৃত্যুরূপে পরিবর্ত্তিত কর, যেন এই মুহূর্ত্তে শুনতে পাই সে মরেছে।

সেই রজনী প্রভাতের কথা বর্ণনা করা যায় না। সেই নীরব গভীর মেঘে-ঢাকা অন্ধকারময় যামিনীতে সে যখন নীরবে মা ও পিতার মাঝখান হইতে উঠিয়া যায়, ভগবান তখন তোমার ঘন মেঘের আড়ালে বজ্রও কি ঘুমাইয়াছিল? পথে কি বিষধর সর্পও ছিল না, তাহার পায়ে দংশন করিতে পারে নাই? হায়, জগতে সকলেই যদি ঘুমাইয়া থাকে, পাপী অবাধে পাপ কাজ চালাইবে না কেন? ওগো, সে যে বিধবা, সে যে যুবতী, তার যে মা আছে!

কিন্তু বৃথা হাহাকার, বৃথা প্রার্থনা। দিন তো কাটিয়া চলিল, তাহার মৃত্যু সংবাদ তো পাওয়া গেল না। ভবিষ্যৎ চিন্তাবিহীনা, কোন্ সাগরে লীন হইতে গেল সে?

গ্রামে শুভ্রার কথা ছাড়া আর কথা নাই। তুষারের প্রাণের বন্ধু সেই শিকারী যুবকই শুভ্রাকে লইয়া পলাইয়াছে, ইহা গ্রামে প্রকাশ হইয়া গিয়াছিল। সত্যর জন্য তুষারও অত্যন্ত অপমান বোধ করিতেছিল। এখন তাহার সত্যর উপরে এত রাগ হইতেছিল যে সাম্‌নে যদি তাহাকে পায় তো ছিঁড়িয়া ফেলে।

রাগ হইবারই কথা, কারণ পিতা পর্য্যন্ত তাহাকে তিরস্কার করিয়াছেন। সত্যর জন্য সে বেচারার বাহিরে মুখ দেখানো প্রায় বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। বড় জ্বালাতন হইয়াই সে কমনীয়কে পত্র দিয়াছিল।

সেদিনকার আকাশ মেঘে ছাওয়া। পাতলা মেঘের ফাঁকে সূর্য্যের সামান্য আলো এক এক জায়গায় আসিয়া পড়িয়াছে। গাছের পাতা একটিও নড়িতেছিল না। সুপক্ক আমগুলি গাছে ঝুলিয়া আছে, দুর্দ্দান্ত বালকদল গাছতলায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। সামান্য একটু বাতাস আসিবার অপেক্ষা; বাতাস যে নিশ্চয়ই আসিবে তাহাতে তাহাদের সন্দেহ নাই। অসহ্য গুমট গরম পড়িয়া গিয়াছে।

তখন বৈকাল হইয়া আসিয়াছে। কমনীয় অনাবৃত গাত্রে, খালি পায়ে শুভ্রাদের বাড়ীর দরজায় গিয়া দাঁড়াইল। সুভা তখন বারাণ্ডায় বসিয়া চরকায় সুতা কাটিতেছিলেন, সুষমা গৃহমধ্যে বাতায়ন পার্শ্বে দাঁড়াইয়া মেঘে-ছাওয়া আকাশ পানে চাহিয়াছিলেন। তাঁহার হৃদয় আজ সম্পূর্ণ অন্ধকার, অমনি নিবিড় মেঘে ছাইয়া গিয়াছে, তাই আজ বাহিরের এই বিরাট মেঘের পানে চাহিয়া তিনি নিজেকে বিস্মৃত হইয়া গিয়াছিলেন। আকাশের এ মেঘ আবার উড়িয়া যাইবে, আবার তরুণ তপনের বিমল কিরণে ধরাবক্ষ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে, কিন্তু তাঁহার হৃদয়ের অন্ধকার কাটিবে না, তাঁহার হৃদয়াকাশ ইহজীবনে আর পরিষ্কার হইবে না!

কমনীয় সুভাকে দেখিয়া একটুখানি দাঁড়াইল। সুভার চোখ তাহার উপর পড়িতেই তিনি ব্যস্তভাবে বলিলেন, "এই যে, কমনীয় এসেছে। এস বাবা, এস। বউ, একখানা আসন দিয়ে যাও তো।"

বউ বাহির হইল না। অগত্যা তাড়াতাড়ি চরকা ছাড়িয়া দিয়া তিনিই একখানা আসন খুঁজিয়া আনিয়া পাতিয়া দিলেন। কমনীয় আসনখানা টানিয়া লইয়া বারাণ্ডার ধারের দিকে বসিল। সুভা বলিলেন, "ওখানে কেন বাবা, এদিকে সরে বস।"

কমনীয় একটু হাসিয়া বলিল, "এই বেশ বসেছি মাসীমা, তোমায় অত ব্যস্ত হ'তে হবে না, তুমি বস।"

সুভা চরকা, তূলা একপাশে সরাইয়া রাখিয়া কমনীয়ের নিকটে আসিয়া বসিলেন; সস্নেহে তাহার পানে চাহিয়া বলিলেন, "এই তো সেদিন বাড়ী হ'তে গেছ বাবা, এই ক'দিনেই রোগা হয়ে গেছ। কলকাতার খাওয়া-দাওয়া

কি তোমাদের সহ্যি হয় বাবা! যারা কল্‌কাতায় থাকে, তারা যে কি খেয়ে ওই কল্‌কাতার মাটী কামড়ে পড়ে' থাক্‌তে চায় জানিনে। তোমরা বাবা পল্লীগ্রামের ছেলে, কল্‌কাতায় থাকা তোমাদের পোষাবে না। তোমাদের কলেজের ছুটি হয়েছে?"

কমনীয় উত্তর করিল, "হ্যাঁ, আজ আমাদের কলেজ বন্ধ হয়ে গেল।"

সুভা একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "আমাদের কি সর্ব্বনাশ হয়ে গেছে তা' তো শুনেছ বাবা!"

কমনীয় অন্যদিকে চাহিয়া বলিল, "হ্যাঁ, শুন্‌লুম সব।"

সুভা করুণ সুরে বলিলেন, "কে জানত যে সেই মেয়ের মধ্যে এমন বিষ লুকান ছিল, যা' উগরে দিয়ে আমাদের একেবারে মেরে গেল। হতভাগী এমন সর্ব্বনাশও করে গেল—"

তাঁহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল, তিনি অঞ্চলে চোখ মুছিয়া বলিলেন, "যাই হোক্ বাবা, তোমার কাছে আমার একটা ভিক্ষা আছে। শুভ্রাকে তুমি যত ভালবাস্‌তে, তত আর কেউ ভালবাসে না। আমি জানি তুমি তার জন্যে খুব চেষ্টা করবে। তুমি তার খোঁজ যদি করে দাও—"

বিস্মিত কণ্ঠে কমনীয় বলিল, "আমি?"

সুভা বলিলেন, "হ্যাঁ তুমি। শুনেছি, যে তাকে নিয়ে পালিয়েছে তার কল্‌কাতায় বাড়ী, সেখানে একটু যদি খোঁজ কর—"

সে যে সত্যর বাড়ী তুষারের পত্র পাইয়া খোঁজ লইতে গিয়াছিল তাহা কমনীয় প্রকাশ করিয়া বলিতে পারিল না। সে বলিল, "আমি একখানা বইয়ের দরকারে কাল সকালে সত্যর বাসায় গেছলুম, শুনলুম সে ওখানে মোটেই আসে নি।"

উদ্বিগ্ন কণ্ঠে সুভা বলিলেন, "তবে সে সেই মেয়েটাকে নিয়ে গেল কোথায়?"

কমনীয় একটু হাসিয়া বলিল, "যাবার জায়গার ভাবনা কি মাসীমা? কত দেশ আছে, তারা সেখানে যাবে।"

সুভার চোখ ছলছল করিয়া উঠিল। "'মেয়েটার কপালে যে কি হবে কে জানে। শেষে হয় তো—' না বাবা কম, একটু তোমায় খোঁজ করতেই হবে। তাকে তোমায় এনে দিতে হবে। মনে কর সে তোমার সহোদরা বোন, তাকে ফিরিয়ে না আনলে সে কোথায় কি করবে তার ঠিক নেই। সে তোমার বড় বাধ্য ছিল, সে জগতে কারও কথা শুনত না তোমার কথা ছাড়া। এখনও সে তোমার কথা শুন্‌বে, তোমার কথা রাখবে। তাকে ফিরিয়ে আন্‌তে পারবে তুমিই, আর কেউ পারবে না। কমনীয়, তোমার হাতে ধরে' বলছি, তুমি একটু চেষ্টা কর, আমাদের বাঁচাও।"

তিনি যথার্থই কমনীয়ের হাত ধরিলেন, তাঁহার চোখ দিয়া ঝর ঝর করিয়া জল ঝরিয়া কমনীয়ের হাতের উপর পড়িতে লাগিল।

কমনীয় বড় বিব্রত হইয়া পড়িল, সে এখন কি করিবে, কি বলিবে, তাহা ভাবিয়া পাইতেছিল না। একটু ভাবিয়া বলিল, "এখানকার সবাই তো খুঁজছে তাকে মাসীমা।"

সুভা বলিলেন, "সে কি প্রাণের সঙ্গে খোঁজ করা বাবা? এরা খুঁজছে মজার জন্যে, আর কিছু উদ্দেশ্য এতে নেই। তাকে ফিরাতে পারলে এখনও তাকে রক্ষা করতে পারা যায়, এখনও সে বেশী পাপ করতে পারে নি।"

কমনীয় বলিল, "কিন্তু যে কুলত্যাগ করে গেছে, তাকে গ্রহণ করলে সমাজ তো আপনাদের নেবে না।"

সুভা বলিলেন, "সমাজে আমাদের দরকার কি বাবা? আমাদের ছেলে মেয়ে নেই যে বিয়ে দিতে হবে। আমাদের কেউ নেই, আছি আমরা কয়টা বিধবা মেয়ে মানুষ। সমাজ আমাদের কিছু করতে পারবে না, আমরা সমাজ নিয়ে বাস করব না। বল কমনীয়, তুমি তার খোঁজ করবে? আজ যদি না পাও, কালও আশা ছাড়বে না তার? প্রতিজ্ঞা কর—তাকে খুঁজে বার করবার চেষ্টা তুমি করবে?"

কমনীয় প্রতিজ্ঞা করিল। সুভা তাহার হাত ছাড়িয়া দিলেন, চোখের জল মুছিতে মুছিতে বলিলেন, "সর্ব্বনাশী সে, অনায়াসে আমাদের মায়া কাটিয়ে চলে যেতে পারলে, কিন্তু আমরা যে পারিনে। প্রাণ যে নিয়ত সেই রাক্ষসীর জন্যেই হাহাকার করছে। ঘরদোরগুলোর পানে তাকাতে গিয়ে তার চিহ্নগুলো যত স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠছে, তত

চোখের জল রাখতে পারছি নে। তাকে সাবধানে রাখতে গেছলুম কি না, তাই সে আমাদের এমন করে' সর্ব্বনাশ করে গেল!"

কমনীয় চুপ করিয়া রহিল। টুপ টাপ করিয়া বৃষ্টি আসিয়া পড়িল। উঠানে কতকগুলা ঘুঁটে পড়িয়াছিল, হঠাৎ সেইগুলার পানে দৃষ্টি পড়িতেই সুভা ব্যস্তভাবে তাহা উঠাইতে ছুটিলেন।

ঝুপ ঝুপ, অবিশ্রান্ত বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। সুভা ঘুঁটেগুলি রন্ধনগৃহের বারান্দায় উঠাইয়া রাখিতে গিয়া নিজে আটকাইয়া পড়িলেন, আর এ ঘরে আসিতে পারিলেন না।

কমনীয় অন্যমনস্কভাবে বৃষ্টিধারার পানে চাহিয়া রহিল, সহসা পশ্চাতে আহ্বান শুনিয়া সে মুখ ফিরাইয়া দেখিল বিষণ্ণ মূর্ত্তি সুষমা।

সুষমা শান্তকণ্ঠে বলিলেন, "ঘরে এস কমনীয়, তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে আমার।"

তিনি যে তাঁহার কথা সুভার সামনে বলিতে চান না তাহা কমনীয় বুঝিল। সে উঠিয়া গৃহে প্রবেশ করিল। তখন অবিশ্রান্ত ধারায় বৃষ্টি পড়িতেছে, কড় কড় করিয়া মেঘ ডাকিয়া উঠিতেছে।

সুষমা বলিলেন, "তোমার মাসীমা তোমায় কি বলছিলেন?"

কমনীয় বলিল, "তিনি বলছিলেন, শুভ্রাকে খুঁজে আনতে।"

সুষমা রুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন, "আর দরকার কি বাবা? যে গেছে সে চিরকালের জন্যেই যাক, আমি আর তাকে ফিরিয়ে পেতে চাই নে। আগুনটাকে বুকের আড়ালে চাপা দিয়ে রাখবারই চেষ্টা করেছিলুম, সে আগুন যখন আড়াল ভেঙ্গে প্রকাশ হয়ে গেল, হোক, আর তাকে ঢাকবার দরকার নেই। বাবা, বিপদ হবে এই কথা ভাবতেই ভয় হয়, কিন্তু বিপদ যখন এসে পড়ে, তখন আর ভয় হয় না। তাকে লুকিয়ে রেখেছিলুম—সে বেরিয়ে পড়ল, সে চলে গেল। যাক, জন্মের মতনই চলে যাক সে, আমি আর তাকে কাছে পেতে চাই নে। সে সুখী হ'তে গেছে, সুখী হোক সে, আর তাকে এ দুঃখের মধ্যে এনে লাভটা কি? কমনীয়, তুমি তার খোঁজ কোর না, আমি বলছি আমার কথা শোন। যদি তার কোনো খবর পাও, তখন এসে আমায় জানিয়ো, নইলে নয়, বুঝছ?"

কত দুঃখে যে মায়ের মুখে এ কথা উচ্চারিত হইল তাহা কমনীয় বুঝিল। শুভ্রার উপর তাহার এত ক্রোধ হইতেছিল যে, যদি এ সময় সে সামনে থাকিত, খুন করিয়া ফেলিত। মা সন্তানের মৃত্যু আকাঙ্ক্ষা করেন—সে কখন? যখন বুক সেই সন্তানের দত্ত এইরূপ ভীষণ আঘাতে ভাঙ্গিয়া যায়।

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কমনীয় বলিল, "মাসীমা যে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নেছেন, তাকে পেলে নিয়ে আসবার জন্যে।"

ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া সুষমা বলিলেন, "নিয়ে আসবে কোথায়, আমারই এই বাড়ীতে তো? না কমনীয়, তোমার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হবে না; আমি সে দুশ্চারিণী মেয়েকে আমার স্বামীর পবিত্র ভিটায় আসতে দেব না; এ পবিত্র তীর্থ তার পদক্ষেপে কলঙ্কিত করতে দেব না। জানো তো, আমার সমাজ আছে, ধর্ম্ম আছে?"

কমনীয় ধীরকণ্ঠে বলিল, "কিন্তু মাসীমা বললেন, তিনি সমাজ চান না।"

সুষমা দীপ্তকণ্ঠে বলিলেন, "তিনি চান না, আমি চাই। সমাজ—বলতে আমি এই জনসংঘের শৃঙ্খলতাকে মাত্র বুঝছি নে, সমাজ আমার ধর্ম্ম কর্ম্ম—সব। আমার ধর্ম্ম বড় না মেয়ে বড়? কমনীয়, আমার কথা শোন, যদিই তাকে কোথাও দেখতে পাও, তাকে বোলো আমি তার মৃত্যুকামনা করেছি, আমি তাকে এই অভিশাপ দিচ্ছি, যেন সে অনুতাপে আজীবন দগ্ধ হয়।"

সজল চক্ষু তিনি অন্যদিকে ফিরাইলেন। রুদ্ধকণ্ঠে কমনীয় বলিল, "আর যদি তাকে বুঝিয়ে সৎপথে আনতে পারি মাসীমা?"

সুষমার মুখে মলিন হাসির রেখা ভাসিয়া গেল, 'পাগল ছেলে! যে একবার খারাপ হয়েছে, তাকে সৎপথে আবার ফিরানো যায় না। সে যদি কি না জানত,

কোনও জ্ঞান যদি তার না থেকে সে খারাপ হ'ত, তাকে সৎ উপদেশ দিলে সে নিজের ভুল বুঝতে পেরে একদিন না একদিন ফিরতে পারত; কিন্তু সে যে সব জেনেও খারাপ হয়েছে, সে কি সৎ উপদেশ কানে নেবে আর? তোমায় সে চেষ্টা করতে হবে না কমনীয়, সে মিথ্যা চেষ্টা হবে তোমার।"

উভয়েই অনেকক্ষণ নীরব। সুষমা সে নীরবতা ভঙ্গ করিয়া পুনরায় কথা কহিলেন; বলিলেন, "আর তুমি তার খোঁজ করতে যেয়ো না। বুঝে দেখো, এতে তোমায় অনেক লোকে অনেক নিন্দা করবে। সে তো মরেছেই, তার সঙ্গে ইচ্ছা করে' তোমার নাম তুমি জড়াতে যেয়ো না। একদিন তুমি যে তাকে নিজের বোনের মতই ভালবেসেছ, তা লোকে বুঝবে না, তারা মন্দটাই ধরবে, কারণ সে যথার্থই মন্দ হয়ে গেছে। আমার কথা বুঝে দেখ কমনীয়, আমি মন্দ কথা বলছি নে।"

কথাটা যে বাস্তবিকই ঠিক তাহাতে কমনীয়ের প্রথম হইতেই সন্দেহ ছিল না। সে মাথা নাড়িয়া বলিল, "না মাসীমা, তুমি ঠিক কথাই বলেছ।"

বৃষ্টি ধরিয়া গিয়াছিল। কমনীয় একবার বাহিরের পানে চাহিয়া বলিল, "এখন তবে যাচ্ছি মাসীমা, কাল আবার আসব।"

সুষমার চোখে জল আসিয়া পড়িল, পরের ছেলের যে মমতাটুকু আছে, রাক্ষসী মেয়ের—দূর ছাই, মরুক সে।

কণ্ঠ পরিষ্কার করিয়া তিনি বলিলেন, "যতদিন এখানে থাক বাবা, মাঝে মাঝে এসে এক-আধবার দেখে যেয়ো। আমার প্রাণ একা ঘরে থাকতে বড্ড অস্থির হয়ে ওঠে। বাড়ী হ'তে বেরুলেই লোকে সেই পোড়ামুখীর কথা ছাড়া আর কিছু বলে না। তার নাম আমি আর মোটে যে শুনতে পারি নে, তা তারা বোঝে না। তারা চায় মজা, তারা মায়ের বেদনা বোঝে না তাই আরও নানা কথা বলে' আমার জ্বালাময় প্রাণটাকে আরও জ্বালায়।"

আসিতে স্বীকার করিয়া কমনীয় বাহির হইল।

(১১)

সামনে বহিয়া যাইতেছে শান্ত সলিলা ভাগীরথী। মাথার উপর মেঘ-ভাঙ্গা সূর্য্য পূর্ণভাবে জাগিয়াছে, তাহার উজ্জ্বল কিরণ তরঙ্গের উপর পড়িয়া সমস্ত জলখানি শুভ্র করিয়া তুলিয়াছিল। দুপুরের দারুণ রৌদ্রতাপে উত্তপ্তকায় পাখীগুলি এখন ঝোপে ঝোপে গাছের পাতার আড়ালে বসিয়া গান গাহিতেছিল। গাভীগুলি মুক্ত প্রান্তর ছাড়িয়া গাছের স্নিগ্ধতল আশ্রয় করিয়াছিল।

কমনীয় ও তুষার হুইল লইয়া গাছের ছায়ায় বসিয়া মাছ ধরিতেছিল, অনেকক্ষণ বসিয়া বসিয়া যখন একটা মাছও পড়িল না, তখন তুষার ভারি বিরক্ত হইয়া উঠিল, বলিল, "আজ মাছ খাবে না, চল বাড়ী যাই।"

কমনীয়ের উৎসাহের কিছুমাত্র অভাব ছিল না, সে সুতার পানে স্থির দৃষ্টি রাখিয়া বলিল, "এখন বাড়ীতে গিয়েই বা কি করব দাদা, তার চেয়ে মাছ ধরা ভাল। বোস না, মাছ নিশ্চয়ই খাবে'খন। এই তো মাত্র ঘণ্টা দুই হবে এসেছি আমরা, এখনই মাছ যে খাবে এমন কোনও কথা নেই।"

তুষার বলিল, "মাত্র ঘণ্টা দুই, তুই বলছিস কিরে? দু' ঘণ্টা বড় কম সময় কি না? বলতে যতটা সহজ, কাজে ততটা নয় তা জানিস?"

কমনীয় বলিল, "ঘুমিয়ে এ সময়টা মিথ্যেই নষ্ট হ'ত তো, দাদা ঘুমিয়ে যে কিছু কাজ হয় না, এটা ঠিক কথা। আর এই অসহ্য গরমে ঘরের মধ্যে পচে মরার চেয়ে ঠাণ্ডা গাছ-তলায় বসে থাকা হাজার গুণে ভাল। দেখ তো, এ কেমন ঠাণ্ডা, কেমন ঝির ঝির করে' বাতাস বইছে।"

তুষার তাহার কথা স্বীকার করিয়া লইল, বলিল, "ভাল যে তা' আমি স্বীকার করছি, কিন্তু এ রকম করে' ছিপ ফেলে জলের পানে তাকিয়ে থাকা সাত জন্মের অধর্ম্ম। যাঃ, তুই বস কমনীয়, আমি আধঘণ্টার জন্য একটু ঘুমিয়ে আসি।"

কমনীয় তাহার চোখের দিকে চাহিয়া দেখিল তাহার চোখ ঘুমের ভারে মুদিয়া আসিতেছে, বাস্তবিকই সে আর বসিয়া থাকিতে পারিতেছে না। পূর্ব্বে মাছ ধরাতে তাহার যতটা উৎসাহ ছিল, ঘুম আসার জন্য ততটা নিরুৎসাহ আসিয়া তাহাকে ছাইয়া ফেলিয়াছে।

কমনীয় বলিল, "তা তুমি যাও, শোও গে, আমি মাছ না পেলে আজ আর উঠছি নে।"

তুষার হুইলটা গুটাইয়া রাখিয়া উঠিয়া পড়িল, বলিল, "আমি এই গাছতলাটায় ঘুমুই গে যাই, খানিক বাদেই আমায় জাগিয়ে দিস, ভুলিস নে যেন। বেশীক্ষণ ঘুমুলে আবার আমার মাথা ধরে, শরীর বড্ড খারাপ করে তা তো জানিস? ডাকতে ভুলে যাস নে।"

সে চলিয়া গেল। কমনীয় পিছন ফিরিয়া দেখিল সে বাঁধানো জায়গাটার উপর আড় হইয়া পড়িল, ও খানিক বাদেই ঘুমাইয়া পড়িল।

পার্শ্বে একটা পাত্রে কতকটা চার ছিল, সেগুলা জলে ছড়াইয়া দিয়া, পার্শ্বস্থিত পানের ডিবে খুলিয়া একটা পান ও খানিকটা দোক্তা মুখে ফেলিয়া দিয়া কমনীয় একবার শ্রান্তভাবে আকাশ পানে চাহিল।

সূর্য্যকিরণে উদ্দীপ্ত কি সুন্দর নীল আকাশ! দিকে দিকে কিরণ ছুটিয়া সে আকাশকে জ্যোতির্ম্ময় করিয়া তুলিয়াছে। আমগাছের ঘন পাতা ভেদ করিয়া বাগানের মাঝে মাঝে সূর্য্যকিরণ টুকরা টুকরা হইয়া ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। মাথার উপর নীল আকাশের কোল দিয়া, নদীর সূর্য্যকিরণোদ্দীপ্ত সুনীল জলে কালো ছায়া ফেলিয়া পাপিয়া ডাকিয়া গেল—চোখ গেল, চোখ গেল।

কি শান্ত সময়টা, আর কি শান্ত স্থানটা! শান্তভাবে কমনীয়ের হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠিল।

মনে পড়িল গত দিনগুলার কথা। এমনি শান্ত সুনীল আকাশের তলে এইখানে বসিয়া সে এমনি ভাবে জলে ছিপ ফেলিয়া ব্যগ্র চোখে চাহিয়া থাকিত। সেই সময় এই গভীর নীরবতা ভেদ করিয়া একটী সরল সুমিষ্ট হাসি ও কাহার দ্রুতধাবনজনিত শব্দ তাহার কানে ভাসিয়া আসিত। সে মুখ ফিরাইয়া দেখিত, সেই ছায়ার মধ্য দিয়া একটী ক্ষুদ্র বালিকা ছুটিয়া আসিতেছে, তাহার কুঞ্চিত এলোচুল উড়িতেছে, চোখে মুখে আসিয়া পড়িতেছে; তাহার মুখে প্রফুল্ল হাসি, তাহার বড় বড় চোখ দুটিও সঙ্গে সঙ্গে হাসিতেছে।

কেবলমাত্র এই হাসির জন্য সে কমনীয়ের কাছে প্রহার ও তাড়না সহ্য করিত বড় কম নয়। কমনীয় একটা তাড়নায় তাহার মুখের হাসি বন্ধ করিয়া দিত, কারণ একটু মাত্র শব্দ হইলে মাছ পলাইয়া যাইবে। পাছে মাছ পলাইয়া যায় এই ভয়ে সে চুপ করিয়া কমনীয়ের পাশে বসিয়া থাকিত। কমনীয়ের পানের ডিবা খুলিয়া তাহার হাতে পান দিত, দোক্তার কৌটা খুলিয়া দিত আবার বন্ধ করিত। কমনীয় মাছ ধরিতে বিশেষ মনোযোগ দেওয়ায় জলে চার ছড়াইতে পারিত না, শুভ্রা চার ছড়াইত, তাহার সিগারেট ধরাইয়া দিত, এমনি কত কাজ ছিল তাহার।

আজও সে নীরব নিঃশব্দ মধ্যাহ্ন, আজও কমনীয় মাছ ধরিতে বসিয়াছে, কিন্তু কোথা সে? কই, পিছনে তো তাহার পদশব্দ, তাহার হাসির শব্দ ভাসিয়া উঠে না। সে বালিকা খুব ভাল গান গাহিত, কমনীয়ও গানের বড় ভক্ত ছিল, সময় সময় সে কমনীয়ের আদেশানুসারে গুণ গুণ করিয়া নীল আকাশের গান, পাখীর গান, ফুল ফুটার গান গাহিয়া কমনীয়কে শুনাইত। আজ সেই কচিমুখের গানখানি শুনিবার জন্য কমনীয়ের প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠে, কিন্তু হায়, কোথা সে? সে এখন জীবিতা হইয়াও মৃতা, সে আজীবন দূরেই থাকিবে, নিকটে আসিবার অধিকার সে আর কোন কালেই পাইবে না।

তাহার মা বলিয়াছেন, সে রাক্ষসী। প্রকৃতই সে রাক্ষসী। অথবা রাক্ষসীরও অধম সে। রাক্ষসীরও মায়া আছে, কিন্তু তাহার মায়া নাই। পরের প্রেমে মুগ্ধ হইয়া সে এক মুহূর্ত্তে মা, পিসী, আবাল্য-পরিচিত গ্রাম, খেলার সাথী সব ত্যাগ করিয়া অজানা জায়গায় চলিয়া গেল। হায় অধম নারী, তোমার অসাধ্য এ জগতে কিছু নাই, তুমি সবই করিতে পার!

একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া কমনীয় আবার মাছ ধরায় মন দিবার চেষ্টা করিল।

এখনও সে সেই দুশ্চারিণী বাল্যসঙ্গিনীর চিন্তা মনে আনে? ছিঃ! সে না প্রতিজ্ঞা করিয়াছে তাহার নাম কখনও মুখে আনিবে না। মুখ যাহা প্রকাশ করে না, মন কেন তাহা চিন্তা করে? ভগবান মনটাকে সবল কর, সবল কর।

মনে পড়িল, একদিন ওই বেদীর উপরে সে এমনি দুপুর বেলায় শুইয়াছিল, অষ্টম বর্ষীয়া বালিকা শুভ্রা তাহার পিঠের ঘামাচি মারিয়া দিতে দিতে বলিতেছিল. "জানো কমদা, আমার যখন বিয়ে হবে, তখন আমি বিয়ে করব কাকে ?"

কমনীয় তাহার কথায় যেন অবহেলা দেখাইয়া উদাস-ভাবে বলিয়াছিল, "কাকে বিয়ে করবি ?"

শুভ্রা অসঙ্কোচে উত্তর দিয়াছিল, "তোমাকে।"

কথাটা শুনিবামাত্র কমনীয় তাহাকে খুব মারিয়া দূর করিয়া তাড়াইয়া দিয়াছিল। ভয়ে সে আর কোনও দিনই সে কথা মুখে আনে নাই।

আজ কমনীয়ের প্রথম মনে হইল, শুভ্রা বাস্তবিকই তাহাকে ভালবাসিত। ছোট বেলায় একদিন যে-কথা প্রকাশ করিয়া ফেলিয়া সে প্রহার সহ্য করিয়াছিল, সে কথাটা সে মনের মধ্যে বরাবরই পোষণ করিয়া রাখিয়া-ছিল। সে বিধবা তাহা জানিয়া সে মনের গতি ফিরাইল, কিন্তু ভালবাসার গতি ফিরাইতে পারে নাই।

তাহার দৃষ্টি কমনীয়ের মনে উজ্জ্বল হইয়া জাগিয়াছিল। সে দৃষ্টিকে আগে সে একদিনও চিনিতে পারে নাই, আজ সেই দৃষ্টি আলোচনা করিয়া তাহাতে আগুনের শিখা দেখিয়া কমনীয় চমকাইয়া উঠিল। একদিন বড় হইয়াও সে শুভ্রাকে মারিয়াছিল, ফেলিয়া দিয়াছিল, সে একটুও কাঁদে নাই, একটুও তিরস্কার করে নাই, একটু আদরের প্রত্যাশায় দীনা ভিখারিণীর মতই করুণনেত্রে তবু তাহার পানে চাহিয়াছিল।

আর সেইদিন ? সেদিন সে যে ঘাটে অমন নির্লজ্জের ন্যায় দাঁড়াইয়া চাহিয়াছিল, সে কি শুধু তাহাকে দেখিবার জন্য ? কমনীয়ের তিরস্কারে সে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল। যাহার নিকট সে একটু স্নেহ, একটু আদর পাইবার প্রত্যাশা করিয়াছিল, তাহার নিকট কেবল তিরস্কার ও কর্ত্তব্য সম্বন্ধে জাগ্রত থাকিবার উপদেশ শুনিয়া সে রাগিয়া গিয়াছিল। বোধ হয় সেই জন্যই শুধু কমনীয়ের উপর রাগ করিয়াই সে এই হারিধিতে ঝাঁপ দিয়া পড়িয়াছে।

কমনীয় একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিল। শেষ কথাটা ভাবিতে করুণায় তাহার সরল প্রাণখানা বড় কোমল সুরে বাজিয়া উঠিল। হায় অভাগিনি ! তুমি নিজেই মরিলে যে ! কমনীয় দিব্য অক্ষত রহিল, তাহাকে ক্ষত বিক্ষত করিতে গিয়া তুমি নিজেই ক্ষত বিক্ষত হইলে যে ! নিজের চারিদিকে নিজের হাতেই প্রাচীর গঠিয়া তুলিলে তুমি, চির অন্ধকারেই তোমার বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া লইলে তুমি, সে প্রাচীর ধরাশায়ী করিয়া তোমায় আলোকে আনিতে কাহারও সাধ্য নাই।

কত মাছ আসিয়া টোপ খাইয়া পলাইয়া গেল, কতবার সে আবার টোপ গাঁথিয়া ফেলিল, কিন্তু মাছ ধরিতে পারিল না।

সূর্য্য মাথা ছাড়াইয়া পশ্চিমে গিয়া জ্বলিতে লাগিল, রৌদ্র আসিয়া চোখের উপর পড়িল। বিরক্ত কমনীয় হুইল গুটাইয়া উঠিল, আজ আর মাছ পড়িল না।

হুইল দুইটা লইয়া যখন সে বেদীর কাছে আসিল তখনও তুষার ঘুমাইতেছে। বিরক্ত কমনীয় তাহাকে একটা ধাক্কা দিয়া চীৎকার করিয়া বলিল, "নাও, আর ঘুমুতে হবে না, ওঠো এখন।"

ধড়ফড় করিয়া তুষার উঠিয়া পড়িল, দুই হাতে চোখ ডলিতে ডলিতে বলিল, "ইস্, বেলা যে একেবারে চলে গেছে। তোকে কখন বলেছিলুম উঠিয়ে দিতে, বল দেখি ? এতক্ষণ ঘুমিয়েছি, মাথা ধরল বলে'।"

কমনীয় বলিল, "মাত্র একঘণ্টা তো ঘুমিয়েছ, এতেই যদি মাথা ধরে তবে একদম না ঘুমোনই তোমার উচিত।

তুষার মাথায় হাত বুলাইয়া বলিল, "উঃ, এই দেখ, মাথাটা ধরে উঠল চট্ করে। আমার কি ঘুমোনোর অভ্যাস আছে এখন ? বরং যখন কলেজে পড়তুম তখন লাষ্ট বেঞ্চে গিয়ে বইখানা মুখের উপর চাপা দিয়ে খানিকটে ঘুমিয়ে নিতুম। এখন মিনিট পাঁচেক বড় জোর চোখ বুজুতে পারি লাইব্রেরী-রুমের মধ্যে। সত্যি, বড্ড মাথা কামড়াচ্ছে।"

কমনীয় হাসিয়া উঠিল, বলিল, "চল্, এক কাপ গরম চা খেয়ে ফেলবে। চা খেলেই তোমার মাথা ধরা ছেড়ে যাবে'খন।"

তুষার উঠিয়া বলিল, "মাছ ধরতে পারলি ?"

কমনীয় মাথা নাড়িয়া বলিল, "আজ মাছ মোটেই টোপ খায়নি, আজ সব গভীর জলে লুকিয়েছে।"

তুষার হাসিয়া বলিল, "কোন্ দিনই বা পড়ে ? রোজ ছিপ ফেলে জলের পানে তাকিয়ে বসে থাকাই আমাদের সার। নিষ্কর্ম্মা লোকের আর কি-ই বা কাজ আছে মাছ ধরা ছাড়া। আমাদের কপালে যদি মাছ পড়তো, তাও একরকম হ'তো।"

কমনীয় বলিল, "বাঃ, সেদিন কত বড় মাছটা ধরে ছিলুম বল।"

তুষার বলিল, "সেই মাসের মধ্যে একদিন একটা তুই বলে' আবার রোজ অমনি করে শকুনের মত বসে থাকিস কমনীয়, আমি কক্ষনো ও রকম পারি নে। ও চেয়ে ঘুমিয়ে শান্তি আছে।"

কমনীয় বলিল, "আর বোল না; তবু যদি মাথা না ধরত।"

তুষার আবার হাসিল।

ক্রমশঃ।

চাঁদপ্রতাপের ব্রত-কথা।

[শ্রীযোগেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী]

(৯) সুমতি ঠাকুরাণী।

আত্মীয় স্বজনগণের বিপদ-আপদ হইতে রক্ষা পাইবার মানসে এবং তাঁহাদের সুখ, ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি ও সুবুদ্ধি অটুট থাকিবার কামনা করিয়া মহিলাবৃন্দ সুমতি ঠাকুরাণীর ব্রত করিয়া থাকেন। বিবাহাদি ক্রিয়া-কর্ম্ম নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইবার পর কোন কোন ললনা এই ব্রত করিয়া থাকেন। বলা বাহুল্য যে, কর্ম্মারম্ভের পূর্ব্বেই ব্রত মানস করা হইয়া থাকে।

যে কোন মাসের শনি কিম্বা মঙ্গলবার এই ব্রত করিতে হয়। ব্রতিনী সকালবেলা স্নান করিয়া কয়েকটা পান ও সুপারি, কিছু খয়ের ও চূণ; কতকটুকু তৈল ও সিঁদুর, কয়েকটা ধান, কয়েকগাছি দুর্ব্বা, একটা তামাকপাতা, কিয়ৎ পরিমাণ বাতাসা কিংবা অন্য কোন প্রকার মিষ্ট সামগ্রী এবং একখানি কলার 'মাইজ' পাতা একখানা পাত্রে সাজাইয়া ও উহা লইয়া বাড়ীর নিকটবর্ত্তী কোনও তে-রাস্তার (তিনদিকে তিন রাস্তার) মোড়ে (মিলন স্থানে) উপস্থিত হইয়া উহার মধ্যস্থলে এবং উক্ত কলার 'মাইজ' পাতায় তৈলাক্ত সিঁদুর দ্বারা একটি করিয়া 'পুত্তলি' (পুতুলের মত চিত্র) অঙ্কিত করেন। তৎপর তিনি কলার 'মাইজে' উক্ত পাত্র হইতে একটি নিখুঁত পান ও অন্যান্য সকল দ্রব্যেরই কিছু কিছু সাজাইয়া পথের পুত্তলির উপর স্থাপন করিয়া যথাজ্ঞানে সুমতি (ভগবতী) দেবীকে উপকরণাদি নিবেদন করতঃ উদ্দেশে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া দ্রব্যাদিপূর্ণ পাত্রটি সহ বাড়ী ফিরিয়া আইসেন ও পান বাতাসা ইত্যাদি দেবী-প্রসাদ সকলকে ডাকিয়া দেন। তৎপর তিনি নিজে প্রসাদ গ্রহণ করিয়া কৃতার্থম্মন্য হয়েন। কেহ কেহ শুধু একটি পান ও একটি সুপারি উপকরণ দ্বারাই ব্রত করিয়া থাকেন।

এই ব্রতে পুরোহিতের দরকার হয় না এবং পুষ্পাদিও লাগে না। এ অঞ্চলে এই ব্রতের 'কথা' অনেকেই বলে না। যাহারা কথা কহেন, তাঁহারা ব্রত শেষে 'পুত্তলির' সম্মুখেই কহিয়া থাকেন। কোন কোন ব্রতিনী প্রতিবেশিনী মহিলাদিগকে ব্রত-স্থানে আহ্বান করিয়া লইয়া গিয়া থাকেন। কেহ কেহ একাকিনী গিয়াই ব্রত করিয়া থাকেন। হিন্দু পথিক মাত্রেই উক্ত পুত্তলি দৃষ্টিগোচর হইলে উহার এক পার্শ্ব দিয়া চলিয়া গিয়া থাকে। উহা দেখিয়াও মাড়াইয়া গেলে কিংবা পদদলিত করিলে পাপ হয় বলিয়া সকলেরই দৃঢ় বিশ্বাস।

'কথা' সংক্ষেপতঃ এইরূপ:—এক গোয়ালিনী

তাহার পুত্রবধূকে দুই চক্ষে দেখিতে পারিত না। সামান্য ত্রুটিতেই বধূ শাশুড়ীর বাক্যবাণে জর্জ্জরিত হইত। গোয়ালিনী প্রায়শঃই গ্রাম-গ্রামান্তরে ঘোল বেচিতে যাইত। যাইবার পূর্ব্বে বধূকে শ্বশ্রূ যে সকল কাজের ফরমাইস দিত, সেই সমুদয় কর্ম্ম তাহার একার পক্ষে সম্পন্ন করা কঠিন হইত। গোয়ালিনী বাড়ী ফিরিয়াই, 'একাজ করা হয় নাই, ওকাজ ভাল হয় নাই' ইত্যাদি বলিয়া তর্জ্জন-গর্জ্জন করিয়া পাড়াশুদ্ধ কাঁপাইয়া তুলিত। বধূ শাশুড়ীর কথার প্রতিবাদ করিত না; নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়া মনের দুঃখ লাঘব করিত।

একদিন শ্বশ্রূ বধূকে এত অধিক কাজের ভার দিয়া গেল যে, উহার অর্দ্ধেকও তাহার দ্বারা সম্পন্ন হওয়া অসম্ভব। বধূ কাজের চাপে ও শাশুড়ীর ভয়ে দিশাহারা হইয়া পড়িল। সে যথাশক্তি কাজ করিতে লাগিল। মনের দুঃখ সে কিছুতেই দমন করিতে পারিতেছিল না; নয়ন-জলে তাহার বক্ষ ভাসিয়া যাইতে লাগিল। সে যখন ধান ভানিতে ব্যাপৃত, তখন বেলা তৃতীয় প্রহর। কাজের ঝঞ্ঝাটে তখনও সে অনাহারে ছিল। ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে, বিষাদিত মনে সে কর্ম্মই করিতেছিল; এক মুহূর্ত্ত অবসরও তাহার ছিল না। এমন সময় রক্তবসনা, নানালঙ্কার বিভূষিতা এক অতি রূপবতী রমণী তাম্বুল চর্ব্বণ করিতে করিতে তাহার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি বিষাদিনী বধূর প্রতি করুণাপূর্ণ নয়নে চাহিয়া সুকোমল স্বরে বলিলেন,—"তোমার কোন ভয় নাই। সুমতি দেবীকে স্মরণ করিয়া তুমি কাজ করিতে থাক। অতি অল্প সময়ে তোমার গৃহস্থলীর সমস্ত কর্ম্ম সুচারুরূপে সম্পন্ন হইবে।" ইহা বলিয়াই সেই পরমাসুন্দরী নারী তথা হইতে অন্তর্হিত হইলেন।

যথাসময়ে গোয়ালিনী গৃহ-প্রত্যাগত হইয়া বধূর কার্য্যের কোন ত্রুটী ধরিতে পারিল না। তৎপর দিবস আরও অধিক কাজের চাপ পড়িল বধূর উপর। সেদিনও সেই রমণী আসিয়া সেইরূপ আদেশ দিয়া গেলেন। বধূটি তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিয়া গেলেন, "আমি সুমতি দেবী। আমাকে আরাধনা করিলে তোমার শাশুড়ীর কুবুদ্ধি লোপ পাইবে, সে তোমাকে কখনও তিরস্কার করিবে না। তোমাদের সংসারে দুঃখের লেশও থাকিবে না।" বধূ দেবীকে জিজ্ঞাসা করিয়া ব্রতের নিয়ম-প্রণালী জানিয়া লইল। দেবী অন্তর্হিতা হইলেন।

সেদিনও গোয়ালিনী গৃহে ফিরিয়া দেখিতে পাইল যে, বধূ সকল কর্ম্মই উত্তমরূপে সম্পন্ন করিয়াছে। তাহার পরও ক্রমান্বয়ে তিন দিন কাজের ভার অতিমাত্রায় বাড়াইয়া বধূর কর্ম্ম সম্পাদনে অতিশয় বিস্মিত হইয়া গোয়ালিনী তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল যে, কিরূপে সে এত অধিক কাজ একা সম্পন্ন করিতে পারিয়াছে। বধূ উত্তর করিল যে, সুমতি দেবীর কৃপায় সে সমস্ত কাজ অত্যল্পকাল মধ্যে সমাধা করিয়াছে। তখন হইতে গোয়ালিনীর বধূর প্রতি বিদ্বেষ ভাব দূর হইল। যথাসময়ে তাহারা উভয়ে সুমতি দেবীর ব্রত করিল। গোয়ালিনী পুত্র, পুত্রবধূসহ পরম সুখে কালযাপন করিতে লাগিল।

গোয়ালিনীর প্রমুখাৎ দেবীর মাহাত্ম্য অবগত হইয়া প্রতিবেশীনিরা এই ব্রত করিতে লাগিল। এইরূপে ক্রমে সুমতি ঠাকুরাণীর ব্রত নানাস্থানে প্রচারিত হইল।

শিখণ্ডী।

[নিমচাঁদ]

আমি যদি বলি, ব্যাসদেব মহাভারতে শিখণ্ডীর যে চিত্র এঁকেছেন তার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে এমন একটিও মানব-চরিত্রের চিত্র সেক্সপীয়রের তুলি দিয়ে বেরয় নি, তাহ'লে সৌখিন সমালোচকেরা বলবে, নিমচাঁদের বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পেয়েছে। যাদের মস্তিষ্কের চাকে বিলাতী মধু ভ'রে রয়েছে, তারা সেক্সপীয়রের ফর্দ্দের বাইরে নূতন কিছু একটা ভেবে নিতেও পারে না। ব্যাসদেব কি চরিত্র-চিত্রণ-শিল্পে এতই অকেযো ছিলেন যে, তিনি

যা' তা' একটা ছবি এঁকে তার নাম দিয়েছিলেন "শিখণ্ডী"? স্বভাবের নিয়মে আমরা সদাসর্ব্বদা যা' ঘটতে দেখি তাই সহজে বুঝতে পারি। শিখণ্ডী-চরিত্র সেইজন্যে আমরা খপ্ করে' বুঝে নিতে পারি না। সেক্ষপীয়রের পাগল অভিনেতৃদেরকেও বুঝতে দেরী হয়। পাগল তবু জগতে অনেক মেলে। সেক্ষপীয়র হয় ত নিজের দেশে শিখণ্ডী নামে জীবটিকে দেখেন নাই। যদি তিনি দেখতেন তাহ'লে তার চরিত্রের একটা নমুনা গড়তেন। এদেশে পৌরাণিক যুগে একটি মাত্র শিখণ্ডী জন্মেছিল। আধুনিক যুগে ভারতবর্ষ, বিশেষতঃ বাঙ্গালাদেশ শিখণ্ডীতে ভ'রে গেছে। বাঙ্গালীর দেশে শিখণ্ডীর যতটা প্রভাব, ততটা বোধ হয় অপর কোনও দেশে নাই। এখানে শিখণ্ডীর উপর আমাদের হার জিত সৌভাগ্য ষোল আনা নির্ভর করেন তুমি আমি কাঠের টুকরা, লোহার পাত মাত্র। শিখণ্ডীরূপ স্ক্রুট খুলে নাও, আমরা ঝরে পড়ব। কুরুক্ষেত্রের ঘটনা-চক্রে বেদব্যাস শিখণ্ডী মাকা স্ক্রুটা যতক্ষণ না এঁটে দিয়েছিলেন ততক্ষণ চাকাখানা পাণ্ডব সৈন্যকে পিষে ফেলছিল। বেদব্যাস জানতেন ভীষ্মের মত বীরকে কাৎ করবার জন্যে শিখণ্ডীর দরকার। আর শক্তিকে কায়দার মধ্যে আনতে গেলে খুব একটি নগণ্য তুচ্ছ জিনিষের খোঁজ নিতে হয়। রাজার খাসবাগে যে সব বাঘ ভাল্লুক সিংহ থাকে, সেগুলা যে মেথর তাদেরকে গোস খাওয়ায় তাকেই চেনে। বুল হাউণ্ড ডুরিয়ানকে মানে, মনিবকে দেখলে অনেক সময় দাঁত বার করে। বেদব্যাস মানব-সংসারে হরেক রকম জানোয়ার দেখেছিলেন। উপেক্ষিত কোনও শ্রেণীর মানুষ তাঁর চোখের বাইরে পড়ে' থাকত না। যে উঞ্ছবৃত্তি অবলম্বন করে, যে পঙ্গু, কুষ্ঠরোগী তারও ছবি বেদব্যাসের চিত্রশালায় আছে।

বেদব্যাস শিখণ্ডীকে ভাল করে' চিনিয়ে দেবার জন্যে তাকে ভীষ্মের ঠিক সামনে খাড়া করে দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, শিখণ্ডীর পূর্ব্বজন্মের ইতিহাসটিও তিনি লিখে গেছেন। সেক্ষপীয়র কোনও নায়ক-নায়িকা, পাত্র-পাত্রীর পূর্ব্বজন্মের ইতিহাস লেখেন নি। প্রাচীন গ্রীক ঋষিরা পূর্ব্বজন্ম মানতেন। পূর্ব্বজন্মের পুরুষ পরজন্মে নারীদেহ ধারণ করিয়াছে এবং নারী পুরুষরূপে জন্মিয়াছে এই প্রকার দৃষ্টান্ত গ্রীক পুরাবৃত্তে বিরল নহে। আধুনিক সময়ে পাশ্চাত্যের স্পিরিটবাদীরা আত্মার ভবিষ্যৎ ইতিহাস সম্বন্ধে আলোচনা করছেন, কিন্তু পূর্ব্বেকার ইতিহাস তাঁদের কাছে অন্ধকারময়। হিন্দুদের মধ্যে জাতিস্মর কল্পনার সৃষ্টি নয়। বৌদ্ধ সাহিত্যের সবটাই পূর্ব্বজন্মের কথায় ভরা। মহাভারত পাঠক মাত্রেই শিখণ্ডীর পূর্ব্বজন্মের ইতিহাস সম্বন্ধে অবগত আছেন। সাধারণ লোকে প্রত্যক্ষ দেবতা বাপ-মাকে দেখিয়ে দিয়ে ছেলের চরিত্র সমালোচনা করে। কি ভ্রম! কে কার বাপ! কে কার মা! মানব-জগতে স্তূপাকার জ্ঞানরাশির উপর দার্শনিক ঊর্দ্ধমুখে দাঁড়িয়ে জ্যোতিষ্কমণ্ডলের সামান্তে অজ্ঞেয় বস্তুটিকে কত শত যুগ পূর্ব্বে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পরমাণুতে পরিণত হ'তে দেখেছেন, আর তার পর ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বত্র সেই অতি সূক্ষ্মকণা কিরূপ ছড়িয়ে পড়ে' শত সহস্র জীবদেহের ভিতর দিয়ে বার বার প্রকাশিত ও রূপান্তরিত হয়েছে তাও দেখেছেন, কিন্তু এখনও মানুষ মায়ার মায়ায় আচ্ছন্ন হয়ে রক্ত মাংসের সম্বন্ধ নিয়ে, বিবাদ বিসম্বাদ লড়াই করছে। বেদব্যাস মানুষের কুলচি লিখতে ব'সে অনেক সময়ে তার পিতা পিতামহ প্রপিতামহের খবর না দিয়ে আত্মার পূর্ব্বাবস্থার সংবাদ দিয়েছেন। শিখণ্ডীর চরিত্র বুঝতে গেলে সেইজন্যে তার পূর্ব্বজন্মের ইতিহাস জানা দরকার। বেদব্যাস যে সন্ধান দিয়েছেন তা থেকে বেশ বুঝা যায় যে পুরুষ ও নারীর মাঝামাঝি একটা কিছু অস্বাভাবিক সৃষ্টির নামই শিখণ্ডী। স্ত্রীত্বের দোষগুলির সঙ্গে পুরুষত্বের দোষগুলি মিশে গিয়ে এই অদ্ভুত জীবের সৃষ্টি হয়েছে। সাহস নাই—ক্রোধ আছে। প্রতিহিংসা লইবার ইচ্ছা বলবতী, কিন্তু পুরুষোচিত কার্য্য করিতে সামর্থ্য নাই। তবে যদি অর্জ্জুনের মত একজন বীর ধনুর্ব্বাণ হাতে করে পিছনে দাঁড়িয়ে থাকে তাহ'লে শিখণ্ডীর প্রতাপ দেখে কে? ভয়ানক জবরদস্ত জমিদার যার সামনে কেহ মাথা তুলে কথা কহিতে সাহস করে না, তিনি হয় ত একজন সামান্য খানসামা আর না হয় পুরাতন পেয়াদার আবদার

অগ্রাহ্য করতে পারেন না। তোমাকে কেবল দরজার আড়াল থেকে ইসারায় জবাবগুলি গুছিয়ে পেয়াদার মুখে তুলে দিতে হবে। যদি শিখণ্ডীর সন্ধান পাও আর যদি তাকে ভালরকম অভিনয়ের মহলা দিতে পার, তা'হলে তোমার সুদ বাত্নবরদারি, এমন কি তিন সনের বাকী খাজনা রেহাই হয়ে যাবে। দুঁদে হাকিম, যার এজলাসে মুখ খুলতে বড় বড় গুঁপো উকিল ভয় পায়, পাছে হুজুর কি হুকুম দিতে কি হুকুম দিয়ে বসেন, তাঁকে দিয়ে তোমার কায হাসিল করতে হ'লে শিখণ্ডীর সাহায্য চাই। বড় বড় মহারথীকে দেখেছি শিখণ্ডীর পাশে ব'সে তার জুনিয়ারি করছেন। মক্কেলকে বাঁচাতে হ'লে ইহা ছাড়া আর দ্বিতীয় উপায় কেহ কল্পনা করতে পারে না। বেদব্যাস শিখণ্ডীর চরিত্রের যে আদর্শ সৃজন করে' গেছেন তাতে তাঁর সূক্ষ্ম দৃষ্টিরই ভাল রকম পরিচয় পাওয়া যায়।

জয়ের রাস্তায় যত কিছু আপদ বিপদ, জঞ্জাল আবর্জ্জনা আছে, শিখণ্ডী না হ'লে সে সব দূর হবে না। যার শিখণ্ডীরূপী বন্ধু নাই তার জগতে আপনার বলতে কেহ নাই। শিখণ্ডীকে তুষ্ট না করলে রায় বাহাদুরী, বড় চাকুরী, মান ইজ্জত, টাকা লাভ হয় না। যদি মিউনিসিপাল কমিশনার হ'তে চাও, লাট-সভায় বসতে ইচ্ছা কর, তা হ'লে শিখণ্ডীর আশ্রয় নাও। বঙ্গদেশে শিখণ্ডীর অভাব নাই। দলে দলে শিখণ্ডীকুল সর্ব্বত্র ঘুরে বেড়াচ্ছেন। ভোট যোগাড়-করবার মরসুমে শিখণ্ডীকুল যেখম ছড়িয়ে যখন পাড়ায় পাড়ায় নৃত্য আরম্ভ করে তখন বাঙ্গালী-জগত আনন্দে অধীর হয়ে পড়ে। যারা কৌরবগণের পক্ষ অবলম্বন করে' অর্জ্জুনের দোষ দিয়ে থাকে, আর শিখণ্ডী দেখলেই ঝাঁটা নিয়ে তাড়া করে, তারা বোকা। পৌরাণিক সাহিত্যের অন্তর্নিহিত গূঢ় রহস্য তারা বুঝে না, বুঝিবার চেষ্টাও করে না। এই শ্রেণীর লোক রণস্থলে দাঁড়িয়ে মরবে তবু শিখণ্ডীকে সামনে রেখে ভীষ্মকে মেরে ফেলবার চেষ্টা করবে না। ইহারা পৃথিবীতে যশ অর্জ্জন করতে পারে না। যদি পারে, তাহ'লে বুঝবে যে, সে যশের সৌরভ একটুখানি জায়গা যুড়ে জনকতক বন্ধু বান্ধব ও চেনা শুনা লোককেই মাতিয়ে রেখেছে। তাদের পসার প্রতিপত্তি জগৎ-জোড়া হয়ে কোনও কালে সমগ্র মানব-সমাজকে পাগল করে' রাখতে পারবে না। আমাদের এই মাটির গোলক ত একটুখানি জিনিষ, যদি স্বর্গে যেতে চাও, তাহ'লেও শিখণ্ডীর মারফৎ টিকিট কিনে তোমাকে স্বর্গের দরজায় গিয়ে দাঁড়াতে হবে। বেদব্যাস জানতেন, মানুষ যত বড় বীর, যেমন কেন বিদ্বান বুদ্ধিমান ধার্ম্মিক হউক না, তার ভেতরকার কোনও স্থানে এমন একটি ছিদ্র আছে যেখানে আঘাত করতে পারলে বীরত্ব ধীরত্ব বিদ্যা বুদ্ধি ধর্ম্ম কর্ম্ম সব গুঁড়িয়ে ধূলিবৎ হয়ে পড়বে।

আমি আশা করি, "অর্চনা"র পাঠকগণকে ঠাবে-ঠোরে শিখণ্ডী-চরিত্র সম্বন্ধে যাহা বলিলাম, তা থেকে তাঁরা এই অপরূপ জীবটিকে চিনিয়া লইতে পারিবেন।

বুড়ো।

[শ্রীমতী মুরলাবালা বিশ্বাস]

"জগৎভরা আছে বুড়ো
আমার মত কই"
ব'ললে হেসে সাগর বুড়ো,
"আমি যেমন হই!"
রাম রাবণের যুদ্ধ বিষম
দেখছ কি কেউ,
সে সব খবর জানে কেবল,
আমার খ্যাপা ঢেউ।

আমি কালের ইতিহাস,
কতই খবর রাখি,
রাজ্যের নব উত্থান পতন,
যাহা কিছু দেখি।
বুঝতে যদি পারতে তোমরা
আমার ভাষার কথা,
জানতে কত ইতি-কথা,
(আমার ঢেউয়ের) স্তরে স্তরে গাঁথা।

আমার সফার।

[শ্রীরাসবিহারী মণ্ডল বি-এল]

আমি মোটরকার, মা-লক্ষ্মী যার ঘরে, আমিও তার ঘরে। তার ঘরেই আমার আদর, অনাদর কেবল লক্ষ্মী-ছাড়াদের কাছে, যারা আমার কাছ ঘেঁস্‌তে পারে না। সদাই তারা আমার ভয়ে ত্রস্ত, কখন্ আমি তর্জ্জন কর্‌তে কর্‌তে তাদের ঘাড়ে গিয়ে চাপি। তারা আমায় দেখে মোটেই সন্তুষ্ট নয়; আমি আসা অবধি তাদের নাকি পথে চলে' সুখ নেই—শান্তি নেই! আমি যখন বুক ফুলিয়ে আনন্দ-নর্ত্তনে পথের মাঝ দিয়ে চীৎকার কর্‌তে কর্‌তে ছুটে যাই, তারা আমার পানে ঈর্ষ্যান্বিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখে আর মনে-মনে আমায় গালি দিতে দিতে সরে' যায়। আমি সেটা বুঝ্‌তে পারি।

কলির ষষ্ঠ 'ম'কার আমি। আমি না হ'লে আনন্দ-উৎসব জমে না, নিমন্ত্রণ-বাড়ী, সভা-সমিতির ফটক মানায় না। আমি সর্ব্বত্র! থিয়েটার-বায়স্কোপে আমি, ঘোড়-দৌড়ে আমি, রাত-বিরিতে স্থানবিশেষে আমি। দিনে আমি, রেতে আমি। অর্থোপার্জ্জনে আমি, অর্থ নষ্টে আমি। আমি সর্ব্ব ঘটে। তাই আমার আদর ঘরে ঘরে, আমার পূজো সবাই করে। যার আছে, সে আমার কদর বোঝে, যার নেই সে আমায় পাবার জন্যে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে, হা-হুতাশ করে!

মা-লক্ষ্মীদের রাঙ্গা পায়ের ধূলোও আমার বুকে পড়ে, বাবু সহরের রঙ্গিনীদের জুতোর ধূলোরও অভাব নেই। আমি না হ'লে ত তাদের হাওয়া খেয়ে তৃপ্তিই হয় না। যুগলে আমার বুকে বসে' যারা সন্ধ্যার বাতাসে গা ঢেলে না দিয়েছে, সন্ধ্যার আকাশখানির নীচে আমার সুখ-কোমল ক্রোড়ে বসে' যারা পরস্পরের কানে প্রেমের গোপন কথাটি না ব'লেছে তারা অপ্রেণয়ী! আমার বুকে বসে' যাদের বুকে তরঙ্গ না উঠেছে,—আমার বুকের তরঙ্গের মত—তাদের প্রাণ বজ্র দিয়ে গড়া, তাদের প্রেমের সার্থকতা কোথায়? প্রণয়ীর ফুলবাসর আমি। আমার স্নেহ-উষ্ণ ক্রোড়ে বসে' প্রাণে বাসনার ফুল আপনি ফুটে উঠে, আকাঙ্ক্ষার সাগর আপনি উথ্‌লে উঠে!

আর একটা কথা বল্‌ব? কিন্তু ভয় করে। কেউ শুনবে না ত। ভয় করে, পুলিশের কাণ যে বাতাসে ভাসে! তস্করের পরম বন্ধু আমি। ডাকাতি ত' হয়ে' আসছে সৃষ্টির প্রারম্ভ থেকে, কিন্তু এমন ডাকাতির কথা কেউ কখন অনুমান করেছিল, আমার সৃষ্টির পূর্ব্বে? উঃ, সে কি মুস্কিলেই পড়েছিলুম একবার! আমরা কি ছাই বুঝ্‌তে পেরেছিলুম তারা ডাকাত? আদর করে' এসে গাড়ীতে চাপ্‌ল দুপুর রাত্রে; আমার ড্রাইভার বেচারী, তাদের হুকুম মত আমায় যেমন ছুট্‌তে বল্‌লে আমিও তেমনি ছুট্‌লুম—উন্মত্ত গর্জ্জনে, রাত্রির শুব্ধতার বুকে কশাঘাত করে'। শেষে কোথা থেকে কি যে হ'য়ে গেল, আমার বুকের উপর গুলি চল্‌ল, বেচারী ড্রাইভারের প্রাণ গেল—আমি ভয়ে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লুম। যখন জ্ঞান হ'ল, তখন আমি পুলিশের হাজতে। উঃ, সে কি যন্ত্রণা! মাথার উপর দিয়ে কত রোদ বৃষ্টি বয়ে' গেল, হুডটা গলে' গেল, প্রাণ যায় যায়! কোথায় সেই গ্যারেজের সুখশয্যা, আর কোথায় সেই থানার গাছতলা! সে কথা মনে হ'লেও বুক কেঁপে ওঠে! তবে এখন আর আমি ট্যাক্সি নই,—এইটুকু ভরসা!

যাক্, এতক্ষণ নিজের ঢাকই পিটুলুম। কিন্তু তা'তো বল্‌তে আসিনি। আমার এখনকার যে সফার, তারই একটা কথা বল্‌ব। আমি এবার হাঁসপাতাল থেকে overhaul হয়ে' বেরিয়েই শুনলুম, আমার নূতন সারথি এসেছে। তাকে প্রথম দেখেই আমার প্রাণটা যেন তার জন্য মমতায় ভরে' উঠেছিল। কেন তা জানি না, তবে এর পূর্ব্বে এমন সুদর্শন অমায়িক ড্রাইভার আমি দেখিনি। একে ত' বাঙ্গালী আমাদের অদৃষ্টে খুব কমই জোটে; যত হাতে-বালা, লম্বা-দাড়ী-চুল শিখই আমাদের সারথি হ'য়ে বসে। তাদের না আছে প্রাণে একটু সখ, না আছে

রস-কস্। তাই এমন একজন ভদ্র বাঙ্গালী যুবকের হাতে প্রাণটা সঁপে দিয়ে একটা অভিনব তৃপ্তি অনুভব করলুম।

আমার মনিব বাঙ্গালী হ'লেও পুরোদস্তুর সাহেব। আদব-কায়দা সব সাহেবী ধরণের। কল্‌কাতার পুরোনো বাড়ী ভাড়া দিয়ে ভবানীপুরে এই সাহেবী ধরণের বাড়ীখানি করেছেন। দিব্যি ঝরঝরে তকতকে বাড়ীখানি!

মনিবের বড় মেয়েটী শুনতে পাই বিধবা। নাম লাবণ্য। দিব্যি ফুটফুটে চেহারা, তার উপর বিবিটির মত দিনরাত বেশ ফিটফাট্ হ'য়ে থাকে, যেন ছবিখানি! তার উপর আবার ভর্ত্তি যৌবন!

মনিবের বাবা ছিলেন নাকি গোঁড়া হিন্দু। তিনি বেঁচে থাকতেই খুব ছেলেবেলায় দিদিমণির বিয়ে দিয়েছিলেন—মনিবের এবং গৃহিণীর অমতে। বিয়ের পর কর্ত্তাবাবুর মৃত্যু হয়, দিদিমণিকেও আর শ্বশুর-ঘর করতে হয় না। তারপর বিধবা হন।

আমার গ্যারেজের সাম্‌নেই মনিবের বাড়ী। গ্যারেজের ওপরে দোতালায় সফারের কোয়ার্টার। নতুন সফার সেইখানেই থাকত—তার সংসারে আর কেউ ছিল না। তার নাম ছিল—প্রকাশ।

প্রকাশ কাজকর্ম্মের পর আমায় গ্যারেজে তুলে আপনার ঘরটীতেই বসে থাকত। মাঝে মাঝে একটী ছোট হারমোনিয়মে সুর তুলে আপন মনে গাইত। তার স্বরটী বড় মিঠে—গাইতেও বেশ ভালই পারত।

কিন্তু, একটা জিনিষ আমি বেশ লক্ষ্য ক'রে দেখেছি—আমাদের দিদিমণিকে দেখ্‌লেই যেন তার মুখখানা সাদা হ'য়ে যেত—যদিও তাকে দেখবার জন্যে বেচারীর চোখ দু'টী ব্যগ্র হ'য়ে থাকত। সে যেন উন্মুখ হ'য়ে সামনের গাড়ীবারান্দাটার পানে চেয়ে বসে' থাকত কখন দিদিমণি একবার বেরুবে, কিংবা কখন সাম্‌নের খোলা জায়গাটায় পায়চারি করবে। আমার যেন কেমন-কেমন ঠেকত, যতই হোক্ মনিব ত'! আবার ভাবতুম, চোখ যখন রয়েছে, আর সাম্‌নে অমন রূপের পশরা, তখন না দেখে কে থাকতে পারে? তার ওপর বয়স-দোষ। হ'লই বা সফার!

যাক্, দোষ গুণ বিচার করবার আমি কে? বুঝিই বা কি? আমার ছুটতেই জন্ম, আমি কেবল আস্ফালন করে' ছুটতেই জানি। তাতেই আমার আনন্দ।

মুখুজ্যে সাহেব আমার মনিব-বাড়ী প্রায় রোজই আসেন। তিনি একজন নবীন বিলেত-ফেরত, ডাক্তারী পাশ করে' এসেছেন। সন্ধ্যার পর রোজই দিদিমণির সঙ্গে একসঙ্গে চা খান, হাত ধরাধরি করে' বেড়ান, আমার ওপর চেপেও একসঙ্গে বেড়াতে বের হন। গুজব নাকি, মুখুজ্যে সাহেবের সঙ্গে দিদিমণির আবার বিয়ে হবে, এখন তারই মহলা চল্‌ছে। লোহার কল-কব্জা আমি, সত্যি-মিথ্যে কেমন করে জানব?

(২)

সেদিন সন্ধ্যার পূর্ব্বে আমার ডাক পড়্‌ল—বেড়াতে' যেতে হবে। সফার আমায় গ্যারেজের বাইরে এনে বাড়ীর সাম্‌নে ফটকের কাছে দাঁড় করালে। প্রকাশ গায়ে লম্বা কোট আর মাথায় টুপি এঁটে আমার পাশে পায়চারী করতে লাগ্‌ল।

প্রকাশের হাতখানা ঠক্‌ঠক্ করে' কাঁপছিল যখন সে মুখুজ্যে সাহেব আর দিদিমণিকে আমার দোরটী খুলে দিয়ে একপাশে চুপটী করে' দাঁড়িয়েছিল। আমার মনে হ'ল যেন তার বুকের মাঝে একটা তুমুল ঝড় বয়ে যাচ্ছে।

উন্মুক্ত সান্ধ্য-আকাশের নীচে আমি ছুটছিলুম—বিরাট স্বেচ্ছাচারের মত! মুখুজ্যে সাহেব ও দিদিমণির অস্ফুট কলহাস্য ও প্রণয়-গুঞ্জন আমার বুকের মাঝে যেমন একটা মত্ততা এনে ফেলেছিল—তেমনি একটা কিসের আচ্ছন্নতায় সফার বেচারীকে মগ্ন করে' ফেলেছিল। যেন তাকে মাঝে-মাঝে পাথর করে' দিয়ে যাচ্ছিল; তার হাত দু'খানা অসাড় হয়ে আস্‌ছিল; আমি বুঝতে পারছিলুম।

কি এক অপূর্ব্ব রঙ্গীন নেশার ঘোরে তারা দু'জনে বসেছিল যেন স্বপ্নদেশের যুগলপ্রণয়ী! প্রেমের স্বপ্নে চোখের পাতা ভিজিয়ে—প্রেমের হাসিতে ঠোঁট রাঙ্গিয়ে—বাসনার ঝড়ে প্রেম-সাগরে তুফান তুলে তারা দু'জনে পাশাপাশি বসেছিল, পরস্পরের মুখের পানে স্থিরদৃষ্টি রেখে। জগতের সমস্ত ঐশ্বর্য্য—সমস্ত সৌন্দর্য্য, যেন সেই মুখে!

সফার বেচারী কিন্তু দেখতে পাচ্ছিল না এই প্রেমের ছবি, যদিও তার চোখ দুটো পিছু পানেই ছুটে আসতে চাচ্ছিল, কাণদুটো তীরের মত সোজা হয়েছিল, তাদের কথাটি শোন্‌বার জন্তে!

মুখুজ্যে সাহেব কথায়-কথায় জিজ্ঞাসা করলে—লাবণ্য! তোমার সে বিয়েব কথা মনে পড়ে?

পড়ে—খুব সামান্য, একটা স্বপ্নের মত।

মুখুজ্যে সাহেব হেসে বলে' উঠ্‌ল—শুধু স্বপ্ন বলা চলে না; একটা দুঃস্বপ্ন। যার স্মৃতিটুকু পর্য্যন্ত তোমাব কাছে বিষময়; যদিও সেটাকে ছেলেখেলা ভিন্ন আর কিছুই বলা চলে না।

দিদিমণির মুখখানা সহসা গম্ভীর হয়ে উঠ্‌ল, মুখ মুছ্‌তে মুছ্‌তে বল্লে—ছেলেখেলাই হোক্ আর দুঃস্বপ্নই হোক্, কিন্তু জীবনের উপর এমনি একটা কালো দাগ কেটে দিয়ে গেছে, যা' আমি সহস্র চেষ্টা সত্ত্বেও মুছতে পারি না, যা' আমার জীবনের সমস্ত উৎসবকে ম্লান করে' দিয়ে যায়, মেঘাচ্ছন্ন আকাশের মত আমার জীবনটাকে রৌদ্রহীন করে' দিয়ে যায়—

দিদিমণির ইতিহাস শুনতে শুনতে আমরা এমনি তন্ময় হ'য়ে পড়েছিলুম যে, আমাদের সকলের জ্ঞান ফিরে এল, যখন আমি আব একখানা মোটরেব গায়ে এসে ধাক্কা দিলুম। সে এক বিরাট গর্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত স্তব্ধ হ'য়ে এল।

একটা মোড়ের কাছে আস্‌তেই এই ঘটনা! সে গাড়ীখানা সেই গলিটা হ'তে বেরুচ্ছিল, আর আমি ছুটছিলুম সিদে বড় রাস্তা ধরে। একটা হৈ হৈ কাণ্ড বেধে গেল। সে গাড়ীতে সওয়ারী ছিল দু'জন মোটা-সোটা ভুঁড়িওয়ালা মাড়োয়ারী; আর এক পাঞ্জাবী সফার। মাড়োয়ারী প্রভুরা একেবারে অগ্নিশর্ম্মা হ'য়ে নেমে এসে ভুঁড়ি দুলিয়ে খপ করে' প্রকাশের হাত ধরলে। মারে আর কি! বেচারী ত ভয়ে জড়সড়! মুখুজ্যে সাহেব নেমে একটা মীমাংসা করে' দেবার চেষ্টা করলে। একজন মাড়োয়ারী ইতর ভাষায় তাঁকে গালি দিয়ে বলে উঠল—চল, সব শালাকো থানামে লে যাগা—শালা সাব বন্ গিয়া; মাতোয়ালা হোকে ··· লেকে হাওয়া খানে নিক্‌লা—বাস, একদম লাট বন্ গিয়া—

মুহূর্ত্তে এক কাণ্ড হ'য়ে গেল। প্রকাশ হঠাৎ উত্তেজিত হ'য়ে বক্তা মাড়োয়ারীর মুখে ঘুসি বসিয়ে দিলে। তার সেই বলিষ্ঠ হাতের দুই ঘুসির চোটেই নাকের রক্তে তার জামা কাপড় লাল হ'য়ে উঠ্‌ল।

অপর মাড়োয়ারীর সঙ্গে প্রকাশের হাতাহাতি আরম্ভ হোল। পাঞ্জাবী সফারটাও তার মনিবের সঙ্গে যোগ দিলে। তারা দু'জনে মিলে প্রকাশকে এম্‌নি নির্দ্দয়ভাবে প্রহার করলে যে, সে রাস্তায় পড়ে গেল। তার পকেট থেকে কতকগুলো টাকা আরও কি কি জিনিষ মাটিতে ছড়িয়ে পড়ল। মুখুজ্যে সাহেব মাঝে পড়ে তাদের থামিয়ে দিলে। রাস্তায় লোকে লোকারণ্য হয়ে গেল। অপমানে, ভয়ে দিদিমণির মুখখানা ছায়ের মত শাদা হয়ে গেল।

সেই সময় একজন সার্জ্জেণ্ট এসে পড়ল। মুখুজ্যে সাহেব তাকে ঘটনাটা বুঝিয়ে দিলে। সার্জ্জেণ্ট সকলকে থানায় যেতে বল্লে। আবার মুখুজ্যেসাহেব প্রকাশের জন্তে জামিন হ'ল। আমরা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাড়ী ফিরলুম। তখন রাত হ'য়ে গেছে।

(৩)

রাত্রি তখন প্রায় ১০টা। প্রকাশ সবে স্নান করে' ভিজে গামছাখানা কাঁধে ফেলে নীচে গ্যারেজে আমার কাছে দাঁড়িয়ে আমার শরীরে কোথায় কি জখম হ'য়েছে পরীক্ষা করছিল, এমন সময় ধীরে ধীরে দিদিমণি সেইখানে এসে দাঁড়াল। প্রকাশ বেশ একটু আশ্চর্য্য হ'য়েই সসম্ভ্রমে মাথাটী নুইয়ে তার সাম্‌নে দাঁড়িয়ে রইল। আমিও একেবারে অবাক্ হ'য়ে গেলুম দিদিমণির এই আকস্মিক আগমনে, এই গ্যারেজে দিদিমণির মুখখানি যেন বড় মলিন। কম্পিত ভগ্নস্বরে দিদিমণি বল্লে—সফার! তোমার এই জিনিষগুলো গোলমালে রাস্তায় ছড়িয়ে পড়েছিল—এই নাও! প্রকাশ তার একখানি হাত বাড়িয়ে দিয়ে মুখখানি নীচু করে' দাঁড়িয়ে রইল। দিদিমণি ক'টা টাকা, একটা ঘড়ি আর একখানা রুমাল তার হাতে

দিলে। প্রকাশ বিনীতভাবে বল্লে,—এর জন্যে রাত্রে তো আপনার কষ্ট করে' এখানে আসবার দরকার ছিল না!

দিদিমণি পূর্ণদৃষ্টিতে প্রকাশের মুখের পানে চেয়ে বল্লে,—না, শুধু তার জন্যে নয়, আর একটা কথা আছে তোমার সঙ্গে।

বলুন। প্রকাশের মুখখানা সহসা মরার মত পাংশু হ'য়ে গেল।

দিদিমণি একখানা ছোট ফটো হাতে নিয়ে প্রকাশের সামনে ধ'রে জিজ্ঞাসা করলে,—এ ছবি, তুমি কোথায় পেলে?

প্রকাশের মুখ চোখ লাল হ'য়ে উঠলো; সে অত্যন্ত চঞ্চল হ'য়ে বলে' উঠল—এ আমার ছবি, আমার পকেটে ছিল।

কিন্তু এ ছবি তুমি পেলে কোথা থেকে?

প্রকাশ বড়ই কাতরভাবে বল্লে,—আমায় মাপ করুন—

মাপ করব? কেন? কার চুরি করেছ?

চুরি? জীবনে আমি কখনো কারুর জিনিস চুরি করিনি আজও পর্য্যন্ত, বরং আমার অনেক জিনিষই অনেকে চুরি করেছে। প্রকাশ বেশ একটু উত্তেজিত হ'য়ে উঠেছিল। ঘন ঘন নিশ্বাসে তার মুখখানা পর্য্যন্ত কেঁপে উঠ্ছিল।

তবে! কোথায় পেলে এ ছবি?

প্রকাশ দৃঢ়স্বরে উত্তর দিলে—এ আমারই ছবি—আমার বিয়ের ফটো।

তোমার?—দিদিমণি বজ্রাহতার মতই প্রকাশের মুখের পানে চেয়ে রইল।

প্রকাশ বজ্রগম্ভীরস্বরে বলে' উঠল—হ্যাঁ, আমার। আর,—আর আমার পাশে ঐ ছোট নোলকপরা মেয়েটাকে চিন্তে পার কি? ওর নাম লাবণ্যপ্রভা। দশ বৎসর পূর্ব্বের মন্মথ চাটুজ্যের মেয়ে লাবণ্য, এখনকার 'মিস্' লাবণ্য নয়।

দিদিমণি দাঁড়িয়ে থর্ থর্ করে' কাঁপ্‌ছিল। তার পা দুটো যেন তার দেহখানির ভার সইতে পারছিল না।

প্রকাশ বল্‌ছিল—এখানকার এ নাম আমার ছদ্মনাম। যুদ্ধ থেকে ফিরে যখন শুনলুম—আমি মরে' গেছি, তখন সে নামটাকে আমার ইচ্ছে করেই বদ্‌লে দিলুম। কথাটা যে কেমন করে' কোথা থেকে রটলো বল্‌তে পারিনে—কিন্তু এখন আমার মনে হয়, আর আমার না ফিরলেই ছিল ভাল।

দিদিমণি ভগ্নস্বরে জিজ্ঞাসা করলে,—কেন? কেন ও কথা বল্‌ছ? দোষ কি আমার? কেন তুমি এমন করে' লুকিয়েছিলে? কেন তুমি এসে আমায় চাওনি? তুমি যাই হও—তোমার দাবী এমনি কাপুরুষের মত ছেড়ে দিয়ে তুমি লুকিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছিলে কেন? আমার দোষ কি?

দিদিমণির গালদুটী বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়্‌ছিল; হঠাৎ প্রকাশের পায়ের কাছে বসে' দু'হাতে তার পা দুখানা চেপে ধরে' বড়ই ব্যাকুলভাবে বল্লে—আমায় মাপ কর, অজ্ঞাতে পাপ করেছি—আমায় মাপ কর।

প্রকাশ ত্রস্তে সরে' গিয়ে বলে' উঠলো—ছি ছি—তুমি কি করছ? কেউ দেখ্‌লে বল্‌বে কি? মনে রেখো, এখানে আমি তোমাদের চাকর, তুমি আমার প্রভুকন্যা।

দিদিমণি দুটী চোখ সোজা প্রকাশের মুখের উপর তুলে ধরে' কি যেন বল্‌তে গেল,—কিন্তু কণ্ঠ তার রুদ্ধ হ'য়ে এল। তার কম্পমান দেহখানা সহসা সংজ্ঞাশূন্য হ'য়ে কঠিন ভূমিতলে লুটিয়ে পড়লো।

প্রকাশ মাটির উপর বসে' নিজের কোলে তার মাথাটি তুলে নিলে।

দেব-দর্শন।

[শ্রীমতী বীণাপাণি দেবী]

বিশ্বনাথের দর্শন আশে, সারা বিশ্ব ঘুরিয়া মরি,
কোথায় জীবের প্রাণের বন্ধু, জগত-তারণ হরি !
তীর্থে তীর্থে ঘুরিলাম কত, মিলিল না দরশন,
পাথরে বক্ষে জড়ায়ে দেবতা, না পেলাম পরশন।
কোথায় তুমি প্রাণময় ওগো ! সর্ব্ব জীবের গতি,
কোথায় তুমি প্রাণের বন্ধু, অখিলের প্রাণপতি !
বিশ্বেশ্বরে বিশ্বনাথের কোথা নাহিক চিহ্ন লেশ,
পাপীর সেথা কোথায় মোক্ষ, বুক-ভাঙ্গা শুধু ক্লেশ।
পতিতের সেথায় নাহিক শান্তি, অন্নপূর্ণা দ্বারে,
মিটিল না ক্ষুধা অমৃত ধারায়, মুক্তি না দিতে পারে।
বৃন্দাবনে সে ব্রজবিহারীর নাহি কোন সন্ধান,
ব্রজ-গোপালের পদরেণু বিনা কে করিবে পরিত্রাণ ?
যশোদা মায়ের দুলাল কোথা, কোথা সে রাখাল-সখা ?
অনাথের নাথ কোথা সে বন্ধু, না দেখি চরণ রেখা !
পুরুষোত্তমে সেই জগৎ-বন্ধু, হস্ত চরণ হীন !
কেমনে বিলাবে অভয় করুণা, মুক্তি পাইবে দীন ?
বদ্রি কেদারে না দেখি তোমায়, হিমানী তুঙ্গ শিরে,
গঙ্গাদ্বারে না পেলাম দেখা, হরির চরণ নীরে !
দ্বারকানাথের রথের চক্র না দেয় অভয় বাণী,
মুক্তি না দেয় কামিক্ষা মায়ের মোক্ষের পীঠখানি।
একাম্র তীর্থে নাহি দরশন, পাণ্ডার লীলা খেলা,
শূন্য আসনে পাষাণ স্থাপিয়ে কৃত্রিমতার মেলা !
দরিদ্রের কোথা নাহি সমাদর, বিশ্বনাথের দ্বারে,
তাম্রচক্রে রজতখণ্ডে দেবতায় মিলিতে পারে।
ভগবান পায়ে বিলাতে ভক্তি, মুক্তি পথের লাগি,
প্রয়োজন যদি স্বর্ণ রজত, কেমনে তোমায় ডাকি ?
সন্ন্যাসে নয়, সাধনা সফল ভক্তির অশ্রুলোরে,
বাঁধা যদি নহ দয়াময় ! পূজি গো কেমন করে ?
কোথায় দেবতা, কোথায় দেবতা, খুঁজে ফিরি সারা ঠাঁই,
বৃক্ষ পাথরে না দেখি তোমায়, কোথায় খুঁজিয়া পাই ?
ফিরিলাম গৃহে, অন্ধ নয়নে পেল না তোমার দেখা,
দগ্ধ হৃদয় পেল না শান্তি, তোমার চরণ রেখা !
তীর্থে তীর্থে, পাষাণে পাষাণে, লুটায়ে দিলাম শির,
বুকের রুধিরে পূজিলাম কত, ঢালিয়া নয়ন-নীর ;
কণিকা মাত্র করুণা তোমার, শান্তির কণাটুক্,
দিল না বক্ষে, আনন্দ ধারায় ভরিল না পোড়া বুক্ !
বৃক্ষ ছায়ায় দেখিবে তোমায়, শান্ত তটিনীর তীরে,
আকাশে বাতাসে তোমার স্পর্শ, তোমার করুণা ফিরে !
জীবের হৃদয়ে তোমার বিকাশ, হৃদি-সিংহাসনে তুমি,
প্রাণময় তুমি আছ প্রতি প্রাণে, তোমায় খুঁজিয়া ভ্রমি !
একি ভ্রম, প্রভু ! জলে স্থলে তুমি সারা চরাচর ময়,
ফুলের সুবাস, স্নিগ্ধ মলয়, তোমারি করুণা বয় ;
উদয় অস্ত, ওগো বিশ্বরূপ ! তোমারি রূপের খেলা,
পূর্ণ শশধর, তারকাপুঞ্জ, তোমারি রূপের মেলা !
স্নিগ্ধ আঁধারে বিলায় শান্তি, নিখিলে ঢাকিয়া রাখি,
স্নেহ ভালবাসা, প্রণয়ের মাঝে, তোমার করুণা দেখি !
[illegible] বুকে তব দরশন, সন্তানের প্রিয় হাসি,
সেথায় তোমার নির্ম্মল করুণা, অতুলন রূপ-রাশি।
দয়াময় তুমি, তব দয়া মাগি, তোমার করুণা যাচি,
ভ্রান্ত পথিক ফিরে সারা ঠাঁই, সদা আছ কাছাকাছি !
মুদিয়া নয়ন ধেয়ানে তোমার, চরণ পূজিতে চাই,
অখিলের পতি, তোমার মূরতি, আঁখি মুদে কোথা পাই
বিশ্ব ভুবন উছলিয়া তব, বিকাশে মধুর হাসি,
তোমারি চরণে চলে যায় যে গো সব ভালবাসা-বাসি !
মন্ত্র সাধনে, ক্রিয়া অনুষ্ঠানে, তব উপাসনা করি,
জপতপ কত, বিবিধ বিধানে, মিলে কি প্রাণের হরি ?
সংসারের কাযে, দয়া স্নেহ মাঝে, প্রীতির বাঁধনে বাঁধা,
আছয়ে বন্ধু, তোমায় খুঁজিয়া সারা দশদিশি সাধা !
তব প্রেমরাশি, চরাচরবাসী, বিতর সকল জনে,
অন্ধ নয়ন, না পায় দরশন, শান্তি না পায় মনে।
আঘাতের মাঝে আশিষ তোমার, বরিষণ কর দীনে,
অসীম দুঃখ বেদনার মাঝে, যেন লইতে পারি চিনে।

সফল চিকিৎসা।

[ভিষগ্‌রত্ন কবিরাজ শ্রীইন্দুভূষণ সেনগুপ্ত আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রী এইচ্-এম্-বি, এল্-এ-এম্-এস্]

আজকাল দেশের যেরূপ অবস্থা, তাহাতে লোকের দু'বেলা দু'মুঠা ভাতের জন্য প্রাণান্ত পরিশ্রম করিতে হয়। দেশের তো এই 'অন্নচিন্তা চমৎকারা' অবস্থা,—তাহার উপর নিত্য নূতন রোগ আসিয়া বাঙ্গালীকে ধ্বংস করিতে বসিয়াছে। যদি সত্য কথা বলিতে হয় তাহা হইলে স্বীকার করিতেই হইবে যে, বাঙ্গালী আমরা আমাদের ধ্বংসের পথ নিজেরাই গড়িয়া তুলিয়াছি। আমাদের এখন এই অবস্থা দাঁড়াইয়াছে যে, আমরা আর নিজেকে বিশ্বাস করিতে পারি না। কিন্তু বাঙ্গালীর এ অবস্থা তো চিরকাল ছিল না। বাঙ্গালীর বুদ্ধি ছিল, বল ছিল, সাহস ছিল। এক কথায় বাঙ্গালীর ছিল না কি?

আগেকার বাঙ্গালী আর এখনকার বাঙ্গালী, এ যেন দুই বিভিন্ন জাতি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পাশ্চাত্য ঔষধ ব্যবহার তো দূরের কথা, আগে বাঙ্গালী পাশ্চাত্য চিকিৎসকদের ছায়া মাড়ানকেও পাপকার্য্য বলিয়া মনে করিত। আগে বাঙ্গালীর ঘরের ছেলে মেয়েদের অসুখ হইলে বাড়ীর প্রাচীনা স্ত্রীলোকেরাই বাড়ীর আশে-পাশের গাছপালা হইতে দু'চারটা পাতাটা-ডাঁটাটা ছিঁড়িয়া আনিয়া তাহাই ছেঁচ করিয়া তাহারই রস বা সিদ্ধ করিয়া তাহারই কাথ খাওয়াইয়া রোগ আরাম করিতেন। খুব শক্ত অসুখ না হইলে তখন বড় একটা কেহ কবিরাজ ডাকিতেন না। আমি শুনিয়াছি, আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার যুগপ্রবর্ত্তক স্বনামধন্য মহাপুরুষ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যাসাগর স্বর্গীয় গঙ্গাধর কবিরাজ মহাশয় পাচন মুষ্টিযোগাদির দ্বারাই চিকিৎসা করিতেন।

এখন বাঙ্গালী আর নিজেদের ঘরের ঔষধকে বিশ্বাস করে না, বাঙ্গালী এখন তাহার ছেলে মেয়েদের সামান্য একটু মাথা ধরিলেই বা সর্দ্দি কাশি হইলেই পেটে না খাইয়াও স্ত্রীর গয়না বাঁধা দিয়া ডাক্তারের বাড়ীতে ছুটিবে তবু তাহার বাড়ীর পার্শ্বের কবিরাজের কাছে গিয়া তাহার নিকট হইতে একটা উপদেশও লইবে না। ডাক্তার আসিয়া রোগীর বুকে পিঠে নলের চোঁয়া বসাইয়া একটা প্রেস্‌ক্রিপসন লিখিয়া দিয়া যাইলেন, গৃহস্থও সর্ব্বস্বান্ত হইয়া ডাক্তারী চিকিৎসা করাইয়া যখন রোগ আরাম হইল না দেখিলেন তখন কবিরাজের শরণাপন্ন হইলেন। কবিরাজ তাঁহার দু'চারটা বড়ি ঔষধ দিলেন বা বলিয়া দিলেন অমুক গাছের পাতার রস করিয়া খাওয়াইয়া দাও, রোগ আরাম হইবে। যাহা বহু ব্যয় করিয়াও ডাক্তার রোগীর অসুখ আরাম করিতে পারিল না তাহা যদি কবিরাজের সামান্য একটা গাছের পাতার রসে বা পাতা সিদ্ধ কাথে আরাম হইল, তখনও কি গৃহস্থের তাহাতে আক্কেল হয়? তারই বাড়ীর অন্য একজনের আবার অসুখ করিল, গৃহস্থ অমনি সব ভুলিয়া গিয়া সেই ডাক্তারের শরণাপন্ন হইলেন, তবু কবিরাজ ডাকিলেন না। সেদিন দেখিলাম, মহামান্য স্যার জন্ উডরফ্ তাঁহার প্রসিদ্ধ "ভারতশক্তি" নামক পুস্তকের একস্থলে বড় দুঃখ করিয়াই লিখিয়াছেন,— "আমার একটী বাঙ্গালী চাকরের একবার অসুখ করে, আমি তাহাকে চিকিৎসা করাইতে যাইলে সে বলে, আমাকে ডাক্তারী ঔষধ খাইতে দিন। আমি তো অবাক যে, দেশের লোক তাহার দেশীয় চিকিৎসাকে বিশ্বাস করিতে চাহে না।" তিনি আরও লিখিয়াছেন যে,—"বাঙ্গালা দেশের হাঁসপাতালের কোন আবশ্যকতাই নাই। আর বাড়ীর পার্শ্বে এত গাছপালা রহিয়াছে যাহা সেবনে অতি সত্বর লোক রোগের হস্ত হইতে রক্ষা পাইতে পারে, তাহার আবার হাঁসপাতালের কি প্রয়োজন?" এটা খুবই সত্য কথা যে বাঙ্গালী যদি তাহাদের বাড়ীর আশেপাশের গাছপালার বিষয় কিছু জানিয়া রাখে তাহা হইলে সামান্য একটু আধটু অসুখ করিলেই তাহাকে ডাক্তার কবিরাজের শরণাপন্ন হইতে হয় না। তাহার ঘরের অনেক পয়সা তো বাঁচিয়া যায়ই, তদ্ভিন্ন রোগীও শীঘ্র শীঘ্র আরাম হইতে পারে। আমি এখানে আর একটী কথা বলিয়া রাখি, কেহ যেন মনে

না করেন যদি কাশি হইয়াছে আমি "বেঙ্গল কেমিকেলের বাসক সিরাপ" খাওয়াইবার জন্য আপনাদিগকে বলিতেছি। আমার কথা হইতেছে, তুমি তোমার দেশের গাছ-পালার গুণ পরিচয় জানিয়া তাহার ব্যবহার শেখ। তোমার ছেলে মেয়েদের রোগ হইলেই তোমার দেশের গাছপালার দ্বারা তুমি নিজেই চিকিৎসা করিতে আরম্ভ কর। আর একটা কথা এখানে জানিয়া রাখ, বেঙ্গল কেমিকেল, ইণ্ডিয়ান কেমিকেল প্রভৃতির আবিষ্কৃত সিরাপ অমুক বা এক্‌ট্রাক্ট অমুক কিনিয়া ব্যবহার করিয়া তুমি যাহা ফল পাইবে, যদি তুমি কাঁচা গাছ গাছড়ার রস বা সিদ্ধ ক্কাথ করিয়া ব্যবহার কর, তাহা হইলে তাহাপেক্ষা শতগুণ কেন, সহস্রগুণ উপকার পাইবে।

যাক্, যাহার জন্য আজ এত কথার অবতারণা করিলাম, এখন সেই বিষয়েরই একটু আলোচনা করিব। আমাদের দেশের গাছপালার গুণ পরিচয় ধারাবাহিক ভাবে আজ দুই বৎসর হইতে "অর্চ্চনার" পাঠক পাঠিকাদের শুনাইয়া আসিতেছি। আজ তাঁহাদিগকে আমাদের পরীক্ষিত কয়েকটী রোগের ঔষধ জানাইব। আমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে যদি আমাদের দেশের স্ত্রী-পুরুষেরা আমার প্রদত্ত এই ঔষধগুলি জানিয়া রাখিয়া ব্যবহার করেন তাহা হইলে আমাদের বালক-বালিকাদিগকে অকালমৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা করিতে পারিবেন। ইহা যে শুধু আমার কথা তাহা নহে,—শাস্ত্রকারও বলিয়া গিয়াছেন,—

"সর্ব্বৌষধেষু পাচন মৃষিভিঃ শ্রেষ্ঠ মুচ্যতে।
যতো ব্যাধি প্রপীড়িতং স্বস্থং করোতি সত্বরম্‌॥"

অর্থাৎ রোগীগণ পাচন সেবন করিলে যেমন সত্বর স্বাস্থ্যলাভ করিয়া থাকে, অন্যান্য ঔষধে তত শীঘ্র ফলপ্রাপ্ত হয় না।

জ্বর চিকিৎসা।

নবজ্বরে—

(১) আদা ও বেলপাতার রস সম পরিমাণে /০ ছটাক লইয়া অর্দ্ধ আনা সৈন্ধব লবণ মিশ্রিত করিয়া প্রাতে ও বৈকালে পান করিলে বেদনাযুক্ত নবজ্বর ভাল হয়।

(২) আদা, বেলপাতা ও নিসিন্দাপাতার রস সম পরিমাণে /০ এক ছটাক পরিমাণ লইয়া ঈষদ উষ্ণ করিয়া প্রাতে ও সন্ধ্যায় সেবন করিলে বেদনাযুক্ত নবজ্বর ২।৩ দিনের মধ্যে আরোগ্য হয়।

(৩) সিউলীপাতার রস এক ছটাক, আদার রস দুই তোলা একত্র গরম করিয়া কিঞ্চিৎ মধু প্রক্ষেপ দিয়া প্রাতে ও বৈকালে পান করিলে নবজ্বর ভাল হয়।

(৪) চিরতা, মুথা, গুলঞ্চ, বালা, বৃহতী, কণ্টকারী, গোক্ষুর, শালপাণি, চাকুলে ও শুঁঠ ইহাদের মিলিত দুই তোলা লইয়া অর্দ্ধসের জলে সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোয়া থাকিতে নামাইয়া ছেঁকিয়া পান করিলে বাতজ্বর ভাল হয়।

(৫) কিস্‌মিস্‌, গুলঞ্চ, গাম্ভারীছাল, বালা ও অনন্ত-মূল ইহাদের কাথে অর্দ্ধতোলা ইক্ষুগুড় মিশ্রিত করিয়া পান করিলে বাতজ্বর ভাল হয়।

(৬) বেলছাল, সোনাছাল, গাম্ভারীছাল, পারুল-ছাল, গনিয়ারীছাল, বেড়েলামূল, রাস্না, কুলঞ্চ, কলাই ও কুড় ইহাদের ক্কাথ সেবনে গাঁটে গাঁটে বেদনাযুক্ত বাতজ্বর ভাল হয়।

(৭) শালপাণি, বেড়েলা, রাস্না, গুলঞ্চ ও অনন্ত-মূল ইহাদের ক্কাথ অল্প উষ্ণ থাকিতে থাকিতে পান করিলে প্রবল বাতজ্বর ভাল হয়।

(৮) শুণ্ঠী, গুলঞ্চ ও পিপুলমূল ইহাদের ক্কাথ বাত-জ্বর নাশক।

(৯) ধনে, দেবদারু ও কণ্টকারী ইহাদের ক্কাথ পান করিলে অতি সত্বর বাতজ্বর ভাল হয়।

(১০) ধনে ও পলতা ইহাদের ক্কাথ প্রাতে ও সন্ধ্যায় সেবন করিলে পৈত্তিকজ্বর ভাল হয়।

(১১) ক্ষেৎপাপড়ার ক্কাথ এক ছটাক পান করিলে পৈত্তিকজ্বর ভাল হয়।

(১২) ক্ষেৎপাপড়া, রক্তচন্দন, বালা ও শুণ্ঠী ইহাদের ক্কাথ সেবনে পিত্তজ্বর ভাল হয়।

(১৩) ক্ষেৎপাপড়া, গুলঞ্চ ও আমলকী ইহাদের ক্কাথে চারি আনা চিনি মিশ্রিত করিয়া পান করিলে পিত্তজ্বর ভাল হয়।

(১৪) দু' তোলা ধনে পূর্ব্বদিন প্রস্তুত করিয়া রাখিয়া

সেই বাসী ধনিয়ার কাথ পরদিন প্রাতঃকালে ইক্ষুগুড়সহ সেবনে পিত্তজ্বর ভাল হয়।

(১৫) শুঁঠ, বালা, ক্ষেৎপাপড়া, বেনার মূল, মুথা ও রক্তচন্দন ইহাদের কাথ পান করিলে পিপাসা, বমি, দাহ প্রভৃতি নানাবিধ উপদ্রবযুক্ত পিত্তজ্বর ভাল হয়।

(১৬) নিমছাল, শুঁঠ, গুলঞ্চ, দেবদারু, শঠী, চিরতা, কুড়, পিপুল, গজপিপুল ও কণ্টকারী ইহাদের কাথ সেবনে কফজ্বর ভাল হয়।

(১৭) আমলকী, হরীতকী, পিপুল ও রক্তচিতার মূল ইহাদের কাথ পান করিলে কফজ্বর ভাল হয়।

(১৮) হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, পলতা, বাসক, গুলঞ্চ, কটুকী, বচ ইহাদের কাথ সেবনে কফজ্বর ভাল হয়।

(১৯) কটুকী, চিতা, নিমছাল, কাঁচা হরিদ্রা, আতইচ, বচ ইহাদের কাথে মধু ও মরিচ চূর্ণ সহ সেবনে কফজ্বর ভাল হয়।

(২০) শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, নাগকেশর, হরিদ্রা, কটুকী ও ইন্দ্রযব ইহাদের কাথ কফজ্বরনাশক।

(২১) চিরাতা, নিমছাল, পিপুল, শঠী, শুঁঠ, শতমূলী, গুলঞ্চ ও বৃহতী ইহাদের কাথ কফজ্বর নষ্ট করে।

(২২) পিপুল, শুঁঠ, বচ ও ইন্দ্রযব ইহাদের কাথ কিঞ্চিৎ মধুর সহিত সেবনে কফজ্বর ভাল হয়।

(২) কটুফল, কুড, কাকড়াশৃঙ্গী, পিপুল ইহাদের চূর্ণ সমভাগে লইয়া ।০ আনা মাত্রায় কিঞ্চিৎ মধুর সহিত সেবনে কফজ্বর নষ্ট হয়।

নবজ্বরে কোষ্ঠবদ্ধ দূরীকরণের জন্য—

(২৪) সোন্দালের আঠা, পিপুলমূল, মুথা, কটুকী ও হরীতকী ইহাদের কাথ সেবনে কোষ্ঠ পরিষ্কার হয়। ইহা সেবনে আমরসের পরিপাক হইয়া শরীরের বেদনা নিবারণ করে।

(২৫) হরীতকী ।• চারি আনা ও সৈন্ধব লবণ ৵• দুই আনা একত্র বাটিয়া গরম জলসহ সেবনে নবজ্বরে উত্তম কোষ্ঠ পরিষ্কার হয়।

নবজ্বরের সংক্ষিপ্ত পরিচয়—

নবজ্বর অর্থাৎ তরুণজ্বর; ৭ দিন পর্য্যন্ত অবস্থাকে জ্বরের তরুণস্বর বলে। ইহাতে মুখ হইতে লালাস্রাব, বিবমিষা, হৃদয়ের অশুচি, অরুচি, তন্দ্রা, আলস্য, অপরিপাক, মুখের বিরস, দেহের গুরুতা ও স্তব্ধতা, ক্ষুধানাশ, অধিক প্রস্রাব ও জ্বরের প্রাবল্য প্রভৃতি লক্ষণ লক্ষিত হয়।

বাতিক জ্বরের লক্ষণ—ইহাতে কম্প, বিষমবেগ অর্থাৎ জ্বরাগমনের বা জ্বর বৃদ্ধির কালের বিষমতা ও উষ্ণ্যাদির বিষমতা এবং কণ্ঠ ও ওষ্ঠের শোষ, অনিদ্রা, হাঁচি না হওয়া, দেহের রুক্ষতা, সমস্ত গাত্রে বিশেষতঃ মস্তকে ও হৃদয়ে অধিক বেদনা, মুখের বিরসতা, মনের কঠিনতা, উদরে শূলবৎ বেদনা, আধ্মান ও হাই ওঠা এই সমস্ত লক্ষণ দৃষ্ট হয়।

পিত্তজ্বরে—তীক্ষ্ণবেগ, অতিসারবৎ তরল মল ভেদ, অল্পনিদ্রা, বমি ও কণ্ঠ, ওষ্ঠ, মুখ ও নাসিকার পাক অর্থাৎ এই সকল স্থানে ক্ষত হওয়া আর ঘর্ম্ম নির্গম, প্রলাপ বাক্য কথন, মুখ তিক্ততা, মূর্চ্ছা, দাহ, মত্ততা, পিপাসা এবং মল, মূত্র ও নেত্রের পীতবর্ণতা ও গাত্রঘূর্ণন এই সকল লক্ষণ দৃষ্ট হয়।

কফজ্বরে—স্তৈমিত্য অর্থাৎ শরীর আর্দ্রবস্ত্রাবৎ প্রতীত; জ্বরের মন্দ বেগ, আলস্য, মুখমাধুর্য্য, মলমূত্র ও নেত্রের শুক্লবর্ণতা, শরীরের স্তব্ধতা ভুক্তবান ব্যক্তির ন্যায় অন্নে অরুচি, গাত্রের নাত্যুষ্ণতা, বমন, অঙ্গাবসাদ, অপরিপাক, শরীরে ভারবোধ, শীতানুভব, বমনভাব, রোমাঞ্চ, অতি-নিদ্রা, প্রতিশ্যায় অর্থাৎ মুখ নাসিকা হইতে জলস্রাব, অরুচি ও কাস এই সকল লক্ষণ প্রকাশিত হয়।

প্রস্তুত-প্রণালী—যে সকল ঔষধের প্রস্তুত-প্রণালী প্রদত্ত হয় নাই, তাহাদের প্রত্যেকটী ঔষধে যতগুলি দ্রব্যের উল্লেখ থাকিবে তাহারা সর্ব্বশুদ্ধ মোট দুই তোলা হইবে। অর্দ্ধসের জলে সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোয়া থাকিতে নামাইয়া ছেঁকিয়া সেব্য।

(ক্রমশঃ)

গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

[শ্রীপ্রিয়লাল দাস, এম-এ, বি-এল]

দুর্গাপ্রসাদ অগ্রদ্বীপের পর পাটুলীর উল্লেখ করিয়াছেন। "নদীয়া-কাহিনী"র মতে পাটুলী অগ্রদ্বীপের সন্নিহিত একখানি গ্রাম। বংশবাটীর রাজারা পাটুলীর রাজা বলিয়া খ্যাত ছিলেন। অগ্রদ্বীপ হইতে গোপীনাথ বিগ্রহ যখন অপহৃত হইয়াছিলেন তখন পাটুলীর রাজাদের সৈন্যগণ তাঁহাকে উদ্ধার করেন। পাটুলী যে সে সময়ে গঙ্গার পূর্ব্বতীরে অবস্থিত ছিল তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই। কুমুদনাথ মল্লিক মহাশয় বলেন, "নদীয়ার বহু গ্রামই তখন পাটুলীর রাজ্যান্তর্গত ছিল। পরে পাটুলী হইতে রাজধানী স্থানান্তরিত করায় নদীয়াবাসীর স্মৃতি হইতে তাঁহারা ক্রমে ক্রমে দূরে পড়িয়াছেন।" (৬) ইহা হইতে মনে হয় যে পাটুলী হইতে রাজধানী স্থানান্তরিত হইবার বহু বর্ষ পরে মুর্শিদকুলী খাঁর সময়ে পাটুলীর জমিদারগণ অগ্রদ্বীপে যে মেলা হইত তাহাতে সুবন্দোবস্ত করিতে পারিতেন না এবং এই সুবন্দোবস্তের অভাবে উক্ত মেলায় দুর্ঘটনা হওয়াতে নবাব ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন এবং পাটুলীর জমিদারের মোক্তার অগ্রদ্বীপ নিজ প্রভুর জমিদারীভুক্ত নয় এইরূপ প্রকাশ করাতে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের মোক্তার চতুরতা করিয়া অগ্রদ্বীপ কৃষ্ণচন্দ্রের জমিদারীভুক্ত করিয়া লইবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। উদ্ধৃত শ্লোকে দুর্গাপ্রসাদ বলিতেছেন,—"পাটুলী দক্ষিণে করি" গঙ্গা নবদ্বীপ সমীপে আসিলেন। তাহা হইলে "গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী" কাব্য রচিত হইবার সময়ে পাটুলী গঙ্গার পশ্চিম তীরে অবস্থিত ছিল অর্থাৎ এই সময়ের পূর্ব্বেই পাটুলী হইতে বংশবাটীর রাজারা রাজধানী স্থানান্তরিত করিয়াছিলেন। কবির কথা যে সত্য তাহা আমাদিগকে মানিয়া লইতে হইবে। কিন্তু তাহা হইলে জিজ্ঞাস্য যে, গোপীনাথ অগ্রদ্বীপ হইতে অপহৃত হইবার পরে কি নূতন পাটুলীতে রাজধানী স্থানান্তরিত হইয়াছিল? ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, রাজধানী স্থানান্তরিত হইলেও গঙ্গার পূর্ব্বপারে অবস্থিত বংশবাটীর রাজাদের জমিদারীর কাছারী ও সৈন্যগণ উপযুক্ত কর্ম্মচারীর অধীনে গঙ্গার পূর্ব্বতীরেই প্রাচীন পাটুলী গ্রামে ছিল। পাটুলী নামে স্থানটির উল্লেখ এক্ষণে নদীয়ার বর্ত্তমান ইতিহাসে বা আধুনিক কোনও মানচিত্রে দেখা যায় না। বর্দ্ধমানের ইতিহাসে ও গেজেটিয়ারে পাটুলী নামে গ্রামের কথা লিখিত হইয়াছে। এই পাটুলী গ্রাম বংশবাটীর জমিদারের নূতন রাজধানী পাটুলী কি না তদ্বিষয়ে কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না। গঙ্গার গতিপথ বর্ণনা করিয়া দুর্গাপ্রসাদ "গঙ্গাভক্তি-তরঙ্গিণী"তে যে সকল স্থানের উল্লেখ করিয়াছেন কবির সমকালে গঙ্গার পূর্ব্ব বা পশ্চিম তীরে তাহাদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে যাহা কিছু জানা যায় তাহা হইতে ইহাই অনুমান করা যায় যে, দুর্গাপ্রসাদের সময়ে গঙ্গা প্রাচীন স্রোতোপথে প্রবাহিতা হইতেছিলেন এবং পাটুলী হইতে বংশবাটীর জমিদারদের রাজধানী স্থানান্তরিত হইয়া গঙ্গার পশ্চিমতীরে বর্দ্ধমান জেলায় প্রতিষ্ঠিত হইলেও গঙ্গার পূর্ব্বতীরে প্রাচীন পাটুলী গ্রামখানির অস্তিত্ব সম্পূর্ণ লোপ পায় নাই। সুপ্রসিদ্ধ পরিব্রাজক টাভার্নিয়ার ১৬৬৬ খৃষ্টাব্দে দুর্গাপ্রসাদের জীবনকালে জলপথে নদীয়ায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। তিনি স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন গঙ্গার জোয়ার তখন নদীয়া পর্য্যন্ত আসিত। (১১) কুমুদবাবু বলেন যে, গঙ্গার জোয়ার এখন কালনা পর্য্যন্ত আসিয়া থাকে। "নবদ্বীপের তলবাহিনী ভাগীরথী ও জালাঙ্গী বহু প্রাচীন কাল হইতে এত অধিকবার স্থান পরিবর্ত্তন করিয়াছে যে নবদ্বীপ মণ্ডলের চতুঃসীমাবর্ত্তী ৮।১০ মাইলের মধ্যে কোথায় গঙ্গা বা জালাঙ্গী বা তাহাদের শাখা ছিল এবং কোথায় না ছিল তাহা বলা সুকঠিন। এই ৮।১০ মাইলের

(১১) Tavernier's Travels in India Vol. I.

মধ্যে অসংখ্য স্রোত ও জলহীন খাদ তাহার সাক্ষ্য দিতেছে।" (৬) সেই কারণে হয়ত পাটুলী ও অগ্রদ্বীপ কোনও সময়ে গঙ্গার পশ্চিম পারে ও পুনরায় পূর্ব্বতীরে কয়েক বৎসরের মধ্যে অবস্থিত হইয়া থাকিবে। গঙ্গার উভয় তীরবর্ত্তী স্থান সমূহের যে পাঁচটি তালিকা এই প্রবন্ধে প্রদত্ত হইয়াছে তাহাতে নবদ্বীপমণ্ডলের অন্তর্গত গ্রামগুলির ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থিতি স্থলের কথা ভাবিয়া দেখিলে ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, উক্ত গ্রামগুলির মধ্যে কোনও একখানি গ্রাম যাহা কবিবিশেষের সমকালে গঙ্গার পূর্ব্বতীরে অবস্থিত ছিল তাঁহার পরবর্ত্তী সময়ে গঙ্গার গতি পরিবর্ত্তনে তাহা পশ্চিমতীরে স্থানান্তরিত হইয়াছিল। বিপ্রদাসের সময়ে (ক) নবদ্বীপ ও অম্বিকা কালনা গঙ্গার পূর্ব্বতীরে, মুকুন্দরামের সময়ে (ঘ) পূর্ব্বস্থলী, নবদ্বীপ, পাড়-পুর, সমুদ্রগড়ি গঙ্গার পূর্ব্বতীরে কিন্তু অম্বুয়া বা অম্বিকা কালনা গঙ্গার পশ্চিমতীরে ও দুর্গাপ্রসাদের সময়ে (ঙ) অগ্রদ্বীপ ও নবদ্বীপ গঙ্গার পূর্ব্বতীরে কিন্তু পাটুলী ও অম্বিকা বা অম্বিকা-কালনা গঙ্গার পশ্চিমতীরে অবস্থিত ছিল দেখা যায়। বর্ত্তমান সময়ে উক্ত নবদ্বীপ, অম্বিকা বা অম্বিকা কালনা, পূর্ব্বস্থলী, পাড়পুর, সমুদ্রগড়ি, অগ্রদ্বীপ ও পাটুলী নামে স্থানগুলির মধ্যে নবদ্বীপ, অম্বিকা-কালনা, পূর্ব্বস্থলী, অগ্রদ্বীপ ও পাটুলী গঙ্গার পূর্ব্বতীরে অবস্থিত নহে ও অবশিষ্ট দুইখানি গ্রাম—পাড়পুর ও সমুদ্রগড়ি—যদিও গঙ্গার পূর্ব্বপারে অবস্থিত, কিন্তু গঙ্গার তীরদেশ হইতে বহুদূরে সরিয়া গিয়াছে। যাহা হউক, নবদ্বীপ-মণ্ডলের অন্তর্গত এই সকল স্থানের মধ্যে দুর্গাপ্রসাদের সময়ে অগ্র-দ্বীপ ও নবদ্বীপ গঙ্গার পূর্ব্বতীরে ও পাটুলী গঙ্গার পশ্চিম-তীরে অবস্থিত ছিল ইহাই কবির বর্ণনা হইতে বুঝা যায়। গঙ্গার জোয়ার যে কবির সময়ে নবদ্বীপ মণ্ডলের অন্তর্গত স্থানসমূহে আসিত, সে কথা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। গঙ্গা বা অন্য কোনও নদীর জোয়ার ভাটা নদীবিশেষের প্রাকৃতিক অবস্থা ব্যতীত আর কিছুই নহে। বৈষ্ণব কবিরা গঙ্গার জোয়ার ঘটিত প্রাকৃতিক দৈনন্দিন ঘটনাকে কত মতে যে নবদ্বীপের ইতিহাসের সহিত জড়াইয়া দিয়াছেন তাহা বলা যায় না। নরহরি চক্রবর্ত্তী "নবদ্বীপ-পরিক্রমা"য় নবদ্বীপ মণ্ডলের অন্তর্গত উপরোক্ত সমুদ্রগড়ি সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহা পাঠ করিয়া জানা যায় যে, শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের সময় হইতে আরম্ভ করিয়া তাঁহার পরবর্ত্তী যুগে কবি নরহরির সময় পর্য্যন্ত গঙ্গার জোয়ার নবদ্বীপে আসিত। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভকালে মুকুন্দরাম উক্ত পাড়পুর ও সমুদ্রগড়ি নামে গ্রাম দুইখানিকে গঙ্গার পূর্ব্বতীরে অবস্থিত দেখিয়াছিলেন। নরহরি চক্রবর্ত্তী কিন্তু বলেন যে, কোলদ্বীপ যাহার অন্তর্গত উক্ত সমুদ্রগড়ি ও কুলিয়া বা কুলিয়া পাড়পুর, উহা গঙ্গার পশ্চিমপারে অবস্থিত। সপ্তদশ শতাব্দীতে নবদ্বীপ ও নবদ্বীপ মণ্ডলের অন্তর্গত স্থানসমূহ সম্বন্ধে কবিগণের নানা প্রকার বিরুদ্ধ মতকে কেবল একটি উপায়ে সামঞ্জস্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ করা যাইতে পারে। গঙ্গা ও জালাঙ্গী পরিবেষ্টিত স্থানসমূহ এই দুইটি নদীর মধ্যবর্ত্তী চরভূমি হইতে সমুৎপন্ন এই অভিমত যদি সঙ্গত হয়, তাহা হইলে উক্ত নদী দুইটি হইতে প্রবাহিত একাধিক জলস্রোতের তীরবর্ত্তী স্থানসমূহের মধ্যে কোনও একটি স্থান বা গ্রাম কাহারও চক্ষে গঙ্গার পূর্ব্বতীরে আবার কাহারও চক্ষে গঙ্গার পশ্চিমতীরে অবস্থিত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে। সেই কারণে, মুকুন্দরামের সদাগরেরা যখন অজয় নদী হইতে গঙ্গায় আসিয়াছিলেন তখন তাঁহারা গঙ্গার পশ্চিমতীর দিয়া নৌকা বাহিয়া যাওয়াতে গঙ্গার মধ্যবর্ত্তী চরোৎপন্ন গ্রামবিশেষকে উক্ত নদীর পূর্ব্বতীরে অবস্থিত মনে করিয়াছিলেন, কিন্তু ঠিক সেই সময়ে নবদ্বীপের অধিবাসীরা সেই গ্রামকে গঙ্গা-শাখার পশ্চিমতীরে অবস্থিত মনে করিতেন। আমরা নরহরির "নবদ্বীপ-পরিক্রমা"য় যে অগ্রদ্বীপের উল্লেখ দেখিতে পাই না, তাহার কারণ এই, কবি হয়ত তাঁহার সমকালে অগ্র-দ্বীপকে গঙ্গা হইতে বিচ্ছিন্ন ও জালাঙ্গীর তীরবর্ত্তী মনে করিতেন। রেনলের (Renall) প্রাচীন মানচিত্রে দেখা যায় যে, অগ্রদ্বীপ গঙ্গার মধ্যে অবস্থিত ও ইহাকে ঘিরিয়া গঙ্গা প্রবাহিত হইতেছে। নরহরি চক্রবর্ত্তী বলেন,—

"নবদ্বীপ ধাম পদ্মপুষ্প প্রায় রীত।
ক্ষণেকে সঙ্কোচ ক্ষণে হয় বিস্তারিত॥"

গঙ্গা ও জালাঙ্গীর সঙ্গমস্থলের অনতিদূর পর্য্যন্ত প্রতিদিন জোয়ার ভাটার উৎপাতে মূল নদী দুইটীর জল নদীগর্ভস্থ তলানী মাটি ও বালুকারাশিকে সমুদ্রে লইয়া যাইতে পারিত না, আর সেই কারণে নবদ্বীপ মণ্ডলের অন্তর্গত স্থান সমূহের পার্শ্ব দিয়া প্রবাহিত গঙ্গা ও গঙ্গাশাখার তলদেশে উহা জমিয়া গিয়া সময়ে সময়ে একাধিক চরের সৃষ্টি করিত। কালসহকারে গঙ্গার স্রোত ক্রমশঃ ইহার ফলে মন্দীভূত হইয়া আসে এবং জালাঙ্গীর স্রোতোপথেই বঙ্গের উত্তর সীমাবাহিনী গঙ্গার জল প্রবলভাবে বহিতে থাকে। নরহরি চক্রবর্ত্তী সমুদ্র হইতে জোয়ারের জল নবদ্বীপ পর্য্যন্ত যে কেন আসিত, তাহার কবিত্বময় কারণ দর্শাইয়াছেন। 'সমুদ্রগড়ি বর্ণন'' শীর্ষক পদ্যময় রচনায় তিনি বলিয়াছেন,—

* * * * *

"সমুদ্রগড়ি গ্রামের নিকটে গিয়া কয়।
দেখ শ্রীনিবাস এ সমুদ্রগড়ি হয়॥
নিজগণে শ্রীসমুদ্রগতি নাম কয়।
এথা গঙ্গা-সমুদ্র প্রসঙ্গ সুখময়॥
গঙ্গাশ্রয় করিয়া সমুদ্রগতি এথা।
লোকে যে প্রসিদ্ধ শুন কহি সে কথা॥
একদিন সমুদ্র কহেন গঙ্গা প্রতি।
জগতে তোমার সম নাই ভাগ্যবতী॥
পূর্ণব্রহ্ম শ্রীগৌরসুন্দর নদীয়ায়।
করিবেন প্রকট বিহার সভে গায়॥
তোমার তীরেতে হব অশেষ আনন্দ।
গণ সহ সদা বিলসিব গৌরচন্দ্র॥
ব্রজে জলক্রীড়া হৈছে করে যমুনায়।
তৈছে ক্রীড়া করিবেন প্রভু গৌররায়॥
শুনিয়া জাহ্নবী নিজ অন্তর প্রকাশে।
সমুদ্রের প্রতি কহে সুমধুর ভাষে॥
মোর যে দুর্ভাগ্য তা কহিব কার কাছে।
সুখ দিয়া প্রভু মহাদুঃখ দিব পাছে॥
করিব সন্ন্যাস প্রভু ছাড়িব নদীয়া।
তোমার তীরেতে বাস করিবেন গিয়া॥
পরম অদ্ভুত লীলা তথা প্রকাশিব।
নিরন্তর তোমার আনন্দ বাড়াইব॥
তোমার সৌভাগ্য গাইবেক সর্ব্বজন।
তাহা না কহিয়া কর মোরে বিড়ম্বন॥
সমুদ্র কহেন তথা যে কহিলা বটে।
দেখিব সন্ন্যাসি-বেশ যাতে প্রাণ ফাটে॥
সোঙরিতে সে বেশ কি করে জানি হিয়া।
তোমার আশ্রয় তেঞি লইলুঁ আসিয়া॥
তুমি দেখাইব এই নদীয়া নগরে।
ভুবনমোহন গৌরচন্দ্র নটবরে॥
তিলে তিলে প্রিয়গণে রচিব সুবেশ।
কেবা না ভুলিব দেখি সে চাঁচর কেশ॥
জৈছে প্রভু তৈছে তাঁর প্রিয় সঙ্গিগণ।
তোমা হৈতে হব তাঁ সভার সন্দর্শন॥
ঐছে দোঁহে কহি কত চিন্তে মনে মনে।
প্রভু অবতীর্ণ বা হইব কতদিনে॥
ওহে শ্রীনিবাস গঙ্গাসিন্ধু এইখানে।
সদাই অধৈর্য্য গৌরচন্দ্রের ধিয়ানে॥
সুরধুনী সমুদ্রের উৎকণ্ঠাতিশয়।
জানিল প্রভুর হৈল প্রকট সময়॥
প্রকট সময় সর্ব্বমতে সুলক্ষণ।
চন্দ্রগ্রহণের ছলে শ্রীনাম কীর্ত্তন॥
নবদ্বীপভূমি হৈল মহাতেজোময়।
শোভাবধি জগন্নাথ মিশ্রের আলয়।
অতিশয় মঙ্গলামঙ্গল গেল দূরে।
ভাসএ সকল লোক আনন্দ সায়রে॥
বিবিধ প্রকারে স্তুতি করে ঋষিগণ।
ব্রহ্মাদি দেবেও করে পুষ্প বরিষণ॥
হইতে প্রকট প্রভু শচীর তনয়।
প্রভুর প্রকট ধ্বনি ভুবনে ব্যাপয়॥
প্রভু প্রকটাদি লীলা দেখিবার তরে।
চিত্তোদ্বেগে সিন্ধু কত কহিল গঙ্গারে॥
গঙ্গাশ্রয় করিয়া আইসে নিতি নিতি।
দেখে গৌরচন্দ্রের বিহার রঙ্গে মাতি॥
একদিন সমুদ্র নির্ম্মল গঙ্গাকূলে।
গণসহ গৌরচন্দ্রে দেখি বৃক্ষমূলে॥

দিব্য সিংহাসনে বিলসএ গৌরহরি।
রূপে কোটি কন্দর্পের দর্প চূর্ণ করি ॥
কুঙ্কুম কনক নহে রূপের উপমা।
ভুবন ভুলয়ে দেখি কেশের সুষমা ॥
বদন চন্দ্রমা কোটি চন্দ্রমদ নাশে।
ঝরয়ে অমিয়া সদা মন্দ মন্দ হাসে ॥

* * *

নানা সেবা করে প্রভু ভৃত্য চারি পাশে।
দেখিয়া সমুদ্র হৈলা অধৈর্য্য উল্লাসে ॥
সমুদ্রের মনে বহু অভিলাষ হৈল।
অন্তর্যামী প্রভু অভিলাষ পূর্ণ কৈল ॥
হইয়া সমুদ্র মহাবিহ্বল আনন্দে।
গণসহ প্রভুলীলা দেখ এ স্বচ্ছন্দে ॥
গঙ্গার সৌভাগ্য প্রশংসয়ে বার বার।
নিতি গতাগতি মাত্র আশ্রয় গঙ্গার ॥
গঙ্গাসহ গতিতে সমুদ্র গতি নাম।
এবে লোকে কহয়ে সমুদ্রগড়ি গ্রাম ॥" (১২)

নবদ্বীপের পরে গঙ্গা পশ্চিমতীরে অবস্থিত অম্বিকা হইয়া পূর্ব্বতীরে শান্তিপুরে আসিলেন। এই অম্বিকা বা অম্বিকা-কালনা দুর্গাপ্রসাদের সময়ে গঙ্গার তীরদেশে অবস্থিত ছিল, কিন্তু কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ইহা সেখান হইতে অনেকটা দূরে সরিয়া গিয়াছিল। কিছুদিন হইতে আবার এই স্থানে গঙ্গার তীরে ভাঙ্গন আরম্ভ হইয়া অম্বিকা-কালনাকে গঙ্গার তীরে আনিয়া ফেলিয়াছে। দুর্গাপ্রসাদের সময়কার শান্তিপুরও এক্ষণে গঙ্গার তীরদেশ হইতে বহু দূরে সরিয়া গিয়াছে। শান্তিপুর বঙ্গদেশের একখানি অতি প্রাচীন গ্রাম। দ্বাদশ খৃষ্টাব্দে রাজা গণেশের রাজত্ব-কালে ইহা বর্ত্তমান ছিল। শ্রীচৈতন্যদেবের সমকালে ভক্তশিরোমণি যবন হরিদাস এখানে কিছুদিন বাস করিয়া-ছিলেন। অদ্বৈতাচার্য্যের বাসস্থান বলিয়া শান্তিপুর বৈষ্ণব-জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। ইহা নবদ্বীপ মণ্ড-লের অন্তর্গত একখানি গ্রাম। "শুনা যায় বহুপূর্ব্বে এই সকল স্থান গঙ্গার গর্ভবর্ত্তী ছিল; এখনও উহাদের অবস্থান পর্য্যবেক্ষণ করিলে স্পষ্টই প্রতীতি হইবে যে, গঙ্গাগর্ভ মৃত্তিকাপূর্ণ হইয়া শান্তিপুর, ফুলিয়া, বেলগড়ে প্রভৃতি স্থান, অর্থাৎ উলা ও অম্বিকা-কালনার মধ্যবর্ত্তী স্থান সমুদয় উদ্ভূত হইয়াছে; এখনও বন্যা বা বর্ষাদি কারণে গঙ্গার জল বৃদ্ধি হইলেই এই সকল স্থানের অধিকাংশই জলমগ্ন হয়। * * * শান্তিপুর গ্রাম যে বহুকাল পূর্ব্বে জলমগ্ন ভূখণ্ড ছিল তাহার বহু চিহ্ন ও নিদর্শন সময় সময় পাওয়া যায়। কূপাদি খননকালে এখানে একবিংশতি হস্ত পরিমিত মৃত্তিকার নিম্নদেশ হইতে নৌকাদির ভগ্না-বশেষ বা হাইল এবং শালকাষ্ঠ ইত্যাদি নদীবক্ষের চিহ্ন পাওয়া গিয়াছে। রামনগর পাড়ার একটি কূপের তলদেশের একপার্শ্বে একখানি চৌকর কাষ্ঠ অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে। বহুপূর্ব্বে শান্তিপুরের উত্তর, পূর্ব্ব, দক্ষিণ এই তিন দিকে গঙ্গা প্রবাহিত ছিল। ("শান্তিপুরে দ্রবময়ী বহে তিন দিকে।" অদ্বৈতঃ মঙ্গল) উত্তরে বাবলা গ্রামের প্রান্তে ও পূর্ব্বে ঘোড়লিয়া হইতে বাবলা পর্য্যন্ত গঙ্গার খাত এখনও বর্ত্তমান। বর্ষাকালে এই খাত গঙ্গার জলে পূর্ণ হয়। দক্ষিণে গঙ্গা এখনও বহতা, তবে ইহার গতি ও অবস্থান পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। জেমস্ রেনেল কর্ত্তৃক শতাধিক বর্ষ পূর্ব্বে অঙ্কিত নদীয়ার মানচিত্রে গঙ্গা হইতে শান্তিপুর বহুদূরে দেখান হইয়াছে; মধ্যে কিছুকাল গঙ্গা গ্রামের অব্যবহিত দক্ষিণ প্রান্ত দিয়া বহতা ছিল, এক্ষণে পুনরায় দূরে সরিয়া যাইতেছে।" (৬) এস্থলে বলা আবশ্যক যে, এই প্রবন্ধে যে পাঁচটি তালিকা প্রদত্ত হইয়াছে তাহাতে কবিবিশেষের সময়ে গঙ্গার পূর্ব্ব ও পশ্চিম তীর-বর্ত্তী স্থানসমূহের অবস্থিতি-স্থল দেখান হইয়াছে। যদি মানচিত্র অঙ্কিত করিয়া উক্ত স্থানগুলির অবস্থিতি-স্থল নির্দ্দিষ্ট করা হইত তাহা হইলে কোনও কোনও গ্রাম গঙ্গার উত্তরতীরে অবস্থিত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইত, কারণ মুকুন্দরাম ও দুর্গাপ্রসাদ বর্ণনাদ্বারা গ্রামবিশেষের যে অবস্থিতি-স্থল নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন, তাহাতে গঙ্গার যেখানে বক্রগতি আছে সে স্থানে নদীর পূর্ব্বাভিমুখে গতি হওয়াতে তাহার তীরবর্ত্তী স্থলসকল দক্ষিণ, না হয় উত্তর তীরে অবস্থিত

(১২) নবদ্বীপ পরিক্রমা (প্রথমাংশ), শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত, বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

হওয়ারই কথা। বাস্তবিক, মুকুন্দরাম সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভকালে ও দুর্গাপ্রসাদ উক্ত শতাব্দীর মধ্যভাগে নবদ্বীপ মণ্ডলের অন্তর্গত যে সকল গ্রামের উল্লেখ করিয়াছেন, গঙ্গার সমসাময়িক মানচিত্রে তাহাদের যথার্থ স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। এই দুই জন বাঙ্গালী কবি কেবল বর্ণনা দ্বারা গঙ্গার যে সুসম্পূর্ণ মানচিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন তাহার ভৌগোলিক মূল্য নেহাত কম নহে। অনুসন্ধিৎসু পাঠকের আলোচনার সুবিধার জন্য আমরা এস্থলে উক্ত কবিদ্বয়ের মানচিত্রের সার সংগ্রহ করিয়া দিলাম। ইহা হইতে নবদ্বীপ মণ্ডলের অন্তর্গত গ্রামসমূহের অবস্থিতি-স্থল বুঝিতে পারা যাইবে এবং মুকুন্দরামের সময় হইতে দুর্গাপ্রসাদের সময় পর্য্যন্ত কিঞ্চিদূর্দ্ধ অর্দ্ধ শতাব্দীর মধ্যে উক্ত গ্রামগুলি যে কোথায় ছিল ও গঙ্গার ও গঙ্গা-শাখার স্রোতোপথ এই সময়ের মধ্যে যে পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল তাহাও স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে।

(চ) মুকুন্দরাম—ধনপতির "ডাহিনে" ভাগুসিংহের ঘাট, "বামে" মেট্যারি, চণ্ডীগাছা, মলেনপুরের ঘাট, পূর্ব্বস্থলী, নবদ্বীপ, পাড়পুর, সমুদ্রগড়ি, "মীরজাপুরে করিল চাপান," "ডাহিনে আম্বুয়া", "শান্তিপুর বামেতে, দক্ষিণে গুপ্তপাড়া", "উলা ছাড়ি চলে ডিঙ্গা খিসমার পাশ", "কুলিয়ার ঘাটেতে সাধুর ডিঙ্গা ভাসে", "যশিপুর সদাগর করি তেয়াগন। কোদালের ঘাটে ডিঙ্গা দিল দরশন॥" "বামভাগে হালিসহর দক্ষিণে ত্রিবেণী।" (১৬০৬ খৃষ্টাব্দ)

(ছ) দুর্গাপ্রসাদ—"পূর্ব্বধারে" মাটীয়ারী, অগ্রদ্বীপ, "দক্ষিণে পাটুলি", "নবদ্বীপ সমীপে আইলা", "অম্বিকা পশ্চিম পারে, শান্তিপুর পূর্ব্ব ধারে", "রাখিলা দক্ষিণে গুপ্তিপাড়া", "উল্লাসে উলার গতি", "উপনীত চাকদহ পরে।" (১৬৭০ খৃষ্টাব্দ)

ষ্টাভোরাইনসের (Stavorinus) মানচিত্রে (১৭৭০ খৃষ্টাব্দ) গুপ্তিপাড়া গঙ্গার পূর্ব্বতীরে দেখান হইয়াছে। এক্ষণে ইহা গঙ্গার পশ্চিমতীর হইতে দেড় মাইল দূরে অবস্থিত। মুকুন্দরাম (চ) ও দুর্গাপ্রসাদ (ছ) গুপ্তিপাড়া গঙ্গার দক্ষিণতীরে অবস্থিত বলিয়াছেন। দুর্গাপ্রসাদ (ছ) পাটুলীও গঙ্গার দক্ষিণতীরে অবস্থিত বলিয়াছেন। ইহা হইতে অনুমান করা যায় যে, সপ্তদশ শতাব্দীতে গঙ্গা গুপ্তিপাড়ার নিকটে একটি শাখা বিস্তার করিয়া এই গ্রামকে ঘিরিয়া প্রবাহিতা হইয়াছিলেন। পাটুলী সম্বন্ধেও এই যুক্তি প্রয়োগ করা যাইতে পারে। শুনা যায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ অধ্যাপক মুকুন্দরামের চণ্ডীকাব্যের বিশদ ব্যাখ্যাযুক্ত একটি সংস্করণ প্রকাশিত করিবার জন্য এক্ষণে যত্নবান হইয়াছেন। উক্ত সংস্করণে মুকুন্দ কবির সমকালে গঙ্গার গতিপথ অঙ্কিত করিয়া যদি তাঁহারা একখানি মানচিত্র সন্নিবিষ্ট করেন তাহা হইলে সপ্তদশ শতাব্দীতে নবদ্বীপ মণ্ডলের অন্তর্গত গ্রামসমূহের অবস্থিতি-স্থল সম্বন্ধে পাঠকের কৌতূহল নিবৃত্তি হইতে পারে। মুকুন্দরামের ন্যায় দুর্গাপ্রসাদও বাঙ্গালার সপ্তদশ শতাব্দীর প্রাকৃতিক ও সামাজিক ইতিহাসের যে উপকরণ তাঁহার কাব্যে সংগৃহীত করিয়া রাখিয়াছেন তাহা যে কবে বাঙ্গালার সুসম্পূর্ণ ইতিহাসের জন্য ব্যবহৃত হইবে তাহা কে বলিতে পারে? গঙ্গা গুপ্তিপাড়ার পরে কবির বাসস্থান উলায় যখন আসিলেন তখন তাঁহার উল্লাস দেখিয়া দুর্গাপ্রসাদের জন্মভূমির প্রতি হৃদয়ের যে কতটা টান ছিল তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। উলা দুর্গাপ্রসাদের সময়ে গঙ্গার পূর্ব্বতীরে অবস্থিত ছিল। এক্ষণে ইহা নূতন নামে বীরনগর বলিয়া পরিচিত। প্রাচীন উলা গঙ্গার পূর্ব্বতীর হইতে চার পাঁচ মাইল দূরে সরিয়া গিয়াছে। উলা সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে প্রসঙ্গক্রমে অনেক কথা বলা হইয়াছে। মুকুন্দরামের ধনপতি সদাগর সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভকালে উলায় চণ্ডীদেবীর পূজা করিয়াছিলেন। নদীয়ার গেজেটিয়ারে এই ঘটনা সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে—"One of the earliest traditions connected with this town is that it was once visited by Srimanta Saudagor the mythical Hindu merchant-prince. At that time the Ganges flowed past the place and that as Srimanta was sailing up to it a terrible storm came on. In response to divine inspiration he called upon Ulai Chandi, one of the wives of Shiva, the destroyer to

help him. She answered his prayer and protected his fleet whereupon he instituted a special worship of her in this place which has been carried on to the present day." উক্ত গেজেটিয়ারে লিখিত এই কিম্বদন্তীর মূলে যে কতটা সত্য আছে তাহা আমরা জানি না। মুকুন্দরামের ধনপতি সদাগর ১৬০৬ খৃষ্টাব্দে যদি গঙ্গার পূর্ব্বতীরে উলা দেখিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার পুত্র শ্রীমন্ত আন্দাজ ১৬২০ খৃষ্টাব্দেও যে এই গ্রামকে উক্ত স্থানে দেখিয়াছিলেন ও তৎপরে পিতা-পুত্রে দেশে কয়েক বৎসর পরে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার সময়েও যে গঙ্গার পূর্ব্বতীরে উলা দর্শন করিয়াছিলেন, তাহা মুকুন্দ কবি স্পষ্ট করিয়া অভয়ামঙ্গল কাব্যে লিখিয়াছেন। ইহার আনুমানিক অৰ্দ্ধ শতাব্দী পরে দুর্গাপ্রসাদ "গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী" রচনা করেন। উলার পর গঙ্গার গতি বর্ণনা করিয়া কবি লিখিয়াছেন,—

"এড়াইলা ঐ স্থান, শুন গঙ্গা কোথা যান,
উপনীত চাকদহ পরে।
প্রসিদ্ধ পরম স্থান, আসে লোক স্নান দান,
মহা মহা বারুণীতে করে॥
কহিব কৌতুক কিছু, বঙ্গদেশী লোক নিছু,
দেশ ভাষা কন কতগুলি।
যখন বলেন শুন, শুনিতে শুনায় পুন,
বালকের নাম পোলা পুলি॥
তুম্বা আঁচলা ঝোলা ঝুলি, পোলা পুলি কতোগুলি
লইয়া আইসেন সেইখানে।
গুড়াক তমাক কোটা, কার সঙ্গে ডাবা হুটা,
গল্প কত হয় টানে টানে॥
কার আছে এই ভার, তের বুড়ির তালুকদার
ইহাতে কে টেকে তার ধুমে।
মাদুলিতে ভরা হাত, নাম রাম জগন্নাথ,
বাদসার নানা যেন জুমে॥
দেখেন সুধারা যার, কাঁধেতে উঠেন তার,
তার আর নাহিক নিস্তার।
পড়িলে শক্তের ঠাঁই, আজ্ঞাকারী তাঁর ভাই
কত কব আর অনাচার॥
সঙ্গে কুলবধূ যত, কত রূপ কব কত,
পোষাক দেখিলে হরে বুদ্ধি।
দুবেড়া কাপড় পরা, কনুই তক শঙ্খ ভরা,
কথা শুনে উড়ে ভুতশুদ্ধি॥
উর্ব্বশী সমান যারা, পরিচ্ছদ বিনা তারা,
স্নান হয় সর্ব্বদা অশুচি।
যা মুখা মুড়াক দিল, কোবায়কে নিল নিল,
কথা যেন কপির কিচমিচি॥"

ক্রমশঃ।

[আশ্বিনের "অর্চ্চনা"র ৩০০ পৃষ্ঠায় ২৩ ছত্রে "দুর্গাপ্রসাদের সময়ে" এই দুইটী শব্দ থাকিবে না।]

সংগ্রহ ও সঙ্কলন।

বাঙ্গলায় কথা।

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য বর্ত্তমানের সাহিত্য। কিন্তু তাঁর চেয়ে অল্প বয়সের অনেক লেখক ও লেখিকা এখন কথা-সাহিত্যে নূতন নূতন সৃষ্টি করিয়া বঙ্গভারতীর অঙ্গশোভা বর্দ্ধন করিতেছেন। এক হিসাবে তাঁহারা তাঁহার পরবর্ত্তী যুগের। তাঁহাদের সকলের মধ্যেই কিছু না কিছু বিচিত্রতা আছে, কার কতটা আছে, কার কি দোষগু তাহা হয়তো নিরপেক্ষ ভাবে বিচার করিবার ক্ষমত আমাদের নাই, লক্ষ্যও বোধ হয় আমরা ঠিক করিতে পারি না। কিন্তু এই সকল কৃতী সাহিত্যিকের মধ্যে এক জন এমন বিশিষ্ট ভাবে মাথা উঁচু করিয়া আছেন, এব এমন স্পষ্টভাবে তিনি কথা-সাহিত্যে বিশিষ্ট নূতন সম্প

দান করিয়াছেন যে, তাঁহার কথা উল্লেখ না করিলে এ প্রবন্ধ গুরুতর অপূর্ণতাদোষে দোষী হইবে। তিনি শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

শরৎ বাবু অনেক উপন্যাস লিখিয়াছেন, আরও অনেক লিখিতেছেন। তাঁহার হাতে যাহা বাহির হইয়াছে তার ভিতর বৈচিত্র্য আছে। নানাদিক দিয়া তাঁর উপন্যাসের আলোচনা হইয়াছে ও হইতেছে। আমি তাঁহার উপন্যাসগুলির একটি দিক মাত্র দেখাইবার চেষ্টা করিব।

ইউরোপে কথা-সাহিত্যে স্কট্, ডিকেন্স, থ্যাকারেকে ছাড়িয়া অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে। জর্জ মেরেডিথ, হেনরী জেমস, টমাস হার্ডি, রবার্ট লুই ষ্টিভেনসন, H. G. Wells প্রভৃতি কৃতী লেখক কথাসাহিত্যে নূতন নূতন পন্থার সৃষ্টি করিয়াছেন। বিদেশীর মধ্যে Zola, Guy de Maupassant, Anatole France, Gautier, Tolstoy, Turginev, Dostoevsksy, Maeterlinck, Ibsen, Bjornsen, Strindberg, Bernard Shaw প্রভৃতি বহু বহু কৃতী লেখক নানা দিক দিয়া কথা ও নাট্য সাহিত্যের বৃদ্ধি ও পরিণতি সম্পাদন করিতেছেন। বর্ত্তমান যুগের বাঙ্গালী কথা-সাহিত্যিক পাশ্চাত্য সাহিত্যের এই সব নূতন ধারার সঙ্গে সুপরিচিত। তাহাদের কলাবিকাশ, তাহাদের আদর্শ, তাহাদের ভাব প্রেরণা ইঁহাদের ভিতর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কার্য্য করিতেছে। কাজেই আজকার উপন্যাস যে গতযুগের বাঙ্গলার উপন্যাস হইতে ভিন্ন হইবে সে আর বিচিত্র কি? কিন্তু বর্ত্তমান যুগের পাশ্চাত্য সাহিত্য বাঙ্গলার সাহিত্যিকদের উপর ঠিক প্রত্যক্ষভাবে কোনও বিশিষ্ট প্রভাবের চেয়ে পরোক্ষভাবে সমষ্টিভাবেই বেশী প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। ইহার ফলে বর্ত্তমান যুগের বাঙ্গলা কথা-সাহিত্য জীবনের সঙ্গে খুব নিবিড়ভাবে পরিচয় করিয়া সাহসের সহিত তাহা প্রকাশ করিতেছে। দেশের ও সমাজের ভিতর যে সকল শক্তি অন্তর্নিহিত থাকিয়া ক্রিয়া করিতেছে সেগুলি বিশিষ্ট অবস্থা ও চরিত্রের ভিতর দিয়া ফুটাইয়া তুলিয়া একদিকে দেশকে ও মানবকে ভাল করিয়া জানাইবার চেষ্টা করিতেছে এবং অন্যদিকে একটা উন্নত আদর্শের দিকে ইঙ্গিত করিতেছে। ইহা কেবল বাঙ্গলা সাহিত্যের নয়, আজকার বিশ্বসাহিত্যের একটা বিশেষত্ব। বাঙ্গলা কথা-সাহিত্যের সঙ্গে এই বিশ্বসাহিত্যের একটা অঙ্গাঙ্গীযোগ সাধিত হইয়াছে।

শরৎচন্দ্রের কথার ভিতর পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রভাব কেহই দেখাইতে পারিবে না। তাঁর প্রাণটা বাঙ্গালীর প্রাণ, আর তিনি আঁকিয়াছেন খাঁটি বাঙ্গালী জীবন। বাঙ্গালী গৃহস্থ পরিবারের জীবন তাঁর মত অন্য কেহ আঁকিয়াছে বলিয়া আমি জানি না। কিন্তু তিনি শুধু আলো আঁকেন নাই, ছায়াও আঁকিয়াছেন, আর ছায়ার ভিতর আলোর সন্ধান দিয়াছেন। এই হিসাবে তিনি পাশ্চাত্য সাহিত্যের শিষ্য যে তিনি তাহাদের নিকট পাইয়াছেন চিত্রাঙ্কনে এই কঠোর সত্যনিষ্ঠা। তিনি আদর্শবাদী নহেন। সমাজকে কোন বিশিষ্ট আদর্শের দিকে পরিচালিত করিবার উদ্দেশ্য লইয়া তিনি কোন গল্প লেখেন নাই। তাঁর লেখার ভিতর সমাজের আলোচনা আছে, মাঝে মাঝে তীব্র ঝাঁঝাল সমালোচনা আছে। তাঁর কল্পিত মানব চরিত্রের ভিতর হইতে আমরা হয়ত অনেক উপদেশ লাভ করিতে পারি, কিন্তু সে কেবল তাঁর চরিত্রচিত্রগুলি সত্য বলিয়া। সত্য মানুষের জীবন হইতে আমরা যেমন উপদেশ লাভ করিতে পারি, শরৎচন্দ্রের বই হইতে তার চেয়ে বেশী উপদেশ পাই না। বাঙ্গালী জীবনের এই অনাড়ম্বর চিত্র শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের প্রাণ।

এ বিষয়ে তারকনাথের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের সাদৃশ্য আছে। শরৎচন্দ্রের ক্ষেত্র তারকনাথের চেয়ে বিস্তৃত, কেন না তিনি দেখিয়াছেন বেশী, লিখিয়াছেন বেশী; কিন্তু ক্ষেত্রের মাটি তাঁদের এক—বাঙ্গালীর সমাজ, বাঙ্গালীর জীবন। কিন্তু তারকনাথ যেখানে সেই ক্ষেত চষিয়া, নিপুণ পাচকের হাতে সুমিষ্ট ডাল ভাত তরকারী বঙ্গবাণীর পাতে পরিবেশন করিয়াছেন, শরৎচন্দ্র সেখানে মাটি খুঁড়িয়া বঙ্গভারতীর গলায় রত্নের মালা পরাইয়াছেন। সাধারণ জীবনের ভিতর, আমাদের চারিদিকে সাধারণ লোকের ভিতর যে রূপকথারই মত অসাধারণ, অদ্ভুতের উপাদান আছে তাহা তাঁহার মত দিব্যদৃষ্টিতে আর কোনও বাঙ্গালী লেখকই দেখিতে পান নাই। তাঁর ভিতর এই দিব্য

আছে বলিয়াই তিনি এই সমুদয় অসাধারণ বিষয়ের তল-দেশ পর্য্যন্ত সন্ধান করিয়া তার অন্তরের কথা এমন সহজ সরল অনাড়ম্বর ভাবে বলিয়া গিয়াছেন যে, তাহার ভিতর "স্বর্ণলতার" সরলতার সঙ্গে রূপকথার অলৌকিকত্বের অপূর্ব্ব সমন্বয় হইয়াছে।

শরৎচন্দ্রের ভিতর রবীন্দ্রনাথের প্রভাব সুস্পষ্ট। তাঁর ভাষা তাঁর নিজস্ব, কিন্তু তিনি ইহা আহরণ করিয়াছেন রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যের আবহাওয়ার ভিতর। তাঁর উপাখ্যান রচনা ও বর্ণনার প্রণালীও তাঁর নিজস্ব; তবু তিনি খুব বিশেষ ভাবে রবীন্দ্রনাথের নিকট ভাবের ইতিহাস গাঁথিবার সঙ্কেতটা শিখিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের মত তিনিও তাঁর পাত্র পাত্রীদের মনোভাবকে বিশদ ভাবে বিশ্লেষণ করিয়াছেন। তাঁর শ্রীকান্তের অনেকটা 'নৌকা-ডুবি' বা 'গোরার' মত ভাব বিশ্লেষণ পূর্ণ। কিন্তু তিনি এই বিশ্লেষণ এমন ভাবে করিয়াছেন যে, তাহাতে তাঁহার বিশেষত্ব প্রতি অক্ষরে সুপরিস্ফুট।

কিন্তু যে প্রকারে তিনি সাধারণ জীবনের ভিতর অসাধারণত্বের উপাদান সন্ধান করিয়া মানুষের স্বাভাবিক অদ্ভুতত্বের পিপাসার সঙ্গে সঙ্গে অলৌকিকের প্রতি অপ্রত্যয়ের যুগপৎ পরিতৃপ্তি সম্পাদন করিয়াছেন সেইটাই শরৎচন্দ্রের সাহিত্যচেষ্টার সবচেয়ে বড় ফল। তাঁহার এই কৃতিত্বের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পরিচয় তাঁর শ্রীকান্ত। ইহার ভাষাও যেমন আড়ম্বরশূন্য হইয়াও শোভা-সম্পদে মণ্ডিত, কাহিনীটিও তেমনি সহজ আবেষ্টনে বেষ্টিত হইয়াও অপূর্ব্ব কৌতূহলো-দ্দীপক। "শ্রীকান্তের" ভিতর যে সকল পাত্রপাত্রী আছে তাহারা কেহই আমাদের অপরিচিত নয়, আর যে সব ঘটনা ইহাতে আছে তেমন ঘটনা হয়তো হামেশাই আমাদের চারিদিকে ঘটিতেছে, কিন্তু এই অনাড়ম্বর চেষ্টাবিহীন সরল উপাখ্যানের ভিতর সহজভাবে শরৎবাবু ফুটাইয়া তুলিয়া-ছেন—ইন্দ্রনাথ, শ্রীকান্ত, রাজলক্ষ্মী, অভয়া—ইহাদের প্রত্যেকটির চরিত্রের ভিতর এমন একটা অসাধারণত্ব আছে যাহাতে তাহাদের কাহিনী রূপকথার রাজপুত্রের কথার মতই চমৎকপ্রদ। ইহার কেহই সাধারণ নয়, প্রত্যেকটিই সাহিত্যের অপূর্ব্ব সৃষ্টি।

সাধারণের ভিতর অসাধারণ ফুটাইয়া তোলা কেবল শরৎচন্দ্রের নিজস্ব নহে, বর্ত্তমান যুগসাহিত্যের এটা একটা সুপরিচিত উপায়। বাঙ্গালা সাহিত্যেও, শরৎবাবু বিশেষ খ্যাতি লাভ করিবার পূর্ব্ব হইতেই এমন চেষ্টা দুই চারিটা হইয়াছে। সে সব চেষ্টার মধ্যে বিশেষ ভাবে উল্লেখ করিতে হয় শ্রীমতী নিরুপমা দেবীর "দিদি" ও "শ্যামলী"। কিন্তু শরৎচন্দ্রের ভিতর এই ক্ষমতা এতই প্রখর ও অসাধারণ যে ইহার সুন্দর পরিচয় তাঁর প্রথম লেখা "বড় দিদি" হইতে আজকার লেখা "দেনা-পাওনা" পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র সমান ফুটিয়া রহিয়াছে। সহজ ও সাধারণ আবেষ্টনের ভিতর এতগুলি বিশেষ ভাবে দেদীপ্যমান অসাধারণ চরিত্র কেহ আঁকিয়াছেন বলিয়া আমি জানি না। "বিরাজ বৌ" শরৎবাবুর একখানা অনাড়ম্বর সংসার চিত্র। সাধারণ গৃহস্থ পরিবারের দৈনিক জীবনের অতি সাধারণ তুচ্ছ ব্যাপার লইয়া এ গল্প। কিন্তু ইহার ভিতর বিরাজের যে চরিত্র তিনি আঁকিয়াছেন তাহা আগাগোড়া অসাধারণ। অসাধারণ বলিয়া যে আমাদের অপরিচিত নয়—আমাদের ঘরের কোণেই "বিরাজ বৌ"এর বাস, কিন্তু সেই চির পরিচিতের ভিতর "বিরাজ বৌ" সম্পূর্ণ নূতন—সম্পূর্ণ অসাধারণ। সে হিন্দুর ঘরের মেয়ে, কায়-মনোবাক্যে সতী। তবু সে স্বামীর গৃহ হইতে বাহির হইয়া বিলাসী জমিদারের সঙ্গে গৃহত্যাগী হইল। এমন একটা অসম্ভব ব্যাপার যাহার দ্বারা সম্পূর্ণ সম্ভব হইতে পারে তেমনি করিয়াই বিরাজ বৌকে তিনি আঁকিয়াছেন।

কিরণময়ী ও সাবিত্রী যে অসাধারণ সে কথা আর বলিয়া দিতে হইবে না। তারা দুজনেই ভালবাসে, কিন্তু কি আশ্চর্য্য ভালবাসা। সাবিত্রীর ভালবাসা কেবল তাহার বাঞ্ছিতকে আপনা হইতে দূরে সরাইতে ব্যস্ত, আপনাকে পরিপূর্ণ রূপে বিলুপ্ত করিয়া তার প্রেমাস্পদের মঙ্গল চেষ্টায় সে ব্যস্ত। অথচ সে সাধারণ পতিপরায়ণা বাঙ্গালীর মেয়ের আদর্শের মত মেরুমজ্জাশূন্য প্রাণী নয়, তার প্রত্যেকটি কথা ও কাজের ভিতর চরিত্রের বল যেন ছুটিয়া ফুটিয়া বাহির হইতেছে। ঠিক তেমনি জোর আছে কিরণময়ীর চরিত্রে। প্রথম হইতেই সে তেজস্বিনী।

উপেন্দ্রকে ভালবাসিয়া সে তেজে মন্দা পড়িল, উদ্দাম অশ্ব লাগাম পুরিয়া সংসার করিতে লাগিয়া গেল, কিন্তু তার ভিতর জ্বলিতে লাগিল একটা তীব্র প্রেম যার আকাঙ্ক্ষিত একেবারেই অলভ্য বলিয়া সে আগাগোড়াই জানে। তাকে লাভ করিবার চেষ্টাও সে কখনও করে নাই। ইহা হইতে সাধারণ পরিণতি যাহা কিছু হইতে পারে সে সবের ধার দিয়াও এ গল্প যায় নাই। কিরণময়ী উপেন্দ্রকে এত বেশী ভালবাসিত বলিয়াই দিবাকরের সঙ্গে বাহির হইয়া গেল। কতকটা এমনি বিনোদিনী গৃহত্যাগ করিয়াছিল মহেন্দ্রের সঙ্গে। কিন্তু বিনোদিনীর লক্ষ্য ছিল বেহারী; মহেন্দ্রকে সে বেহারীকে লাভ করিবার উপায় স্বরূপ গ্রহণ করিয়াছিল। আর কিরণময়ী তেমন কোনও আশা না করিয়া, নিরাশায় না ডুবিয়া, কেবল একটা উদ্দাম উন্মত্ততায় দিবাকরকে লইয়া চলিয়া গেল আর ভীরু অনিচ্ছুক দিবাকরকে পাপের কালিমায় লেপিয়া দিতে বিধিমতে চেষ্টা করিল—কিরণময়ী উপেন্দ্রকে ভালবাসে বলিয়া। এই অদ্ভুত ব্যাপার সম্ভব হইয়াছে কেবল কিরণময়ীর অপরূপ চরিত্রের কল্পনায়।

'বিন্দুর ছেলের' বিন্দুটি অসাধারণ, 'রামের সুমতির' রাম অসাধারণ, 'একাদশী বৈরাগী' অসাধারণ, শরৎ বাবুর প্রায় সমস্ত গ্রন্থই অসাধারণত্বে বোঝাই। এমন কি বারোয়ারী উপন্যাসের যে কয় পরিচ্ছেদ তিনি লিখিয়াছেন সেই স্থানেই গল্পটা একটা স্বতন্ত্র বিশিষ্টরূপ ধারণ করিয়াছে ও নায়িকার হঠাৎ মেরুমজ্জা গজাইয়া সে অসাধারণ হইয়া উঠিয়াছে।

অদ্ভুত ও সৃষ্টিছাড়ার যে আকাঙ্ক্ষায় কথা-সাহিত্যের উৎপত্তি তাহা পরিণতি লাভ করিয়াছে এইরূপ সাহিত্যে যাহার ভিতর অস্বাভাবিক কিছুই নাই, deus ex machina পর্য্যন্ত নাই, নিতান্ত সহজ সাধারণ স্বাভাবিক ঘটনা পরম্পরায় এ কাহিনী গড়িয়া উঠিবে, কিন্তু সেই ঘটনা পরম্পরার ফল অনাড়ম্বর সমাজচিত্র হইলে চলিবে না। বর্ত্তমান যুগের কথা-সাহিত্যিক সম্ভব জগতের ভিতর অসাধারণ ও আলোকিককে যথাসম্ভব ফুটাইয়া তুলিতে চান; সহজ জীবনের ভিতর রোমান্সের রোমাঞ্চ ঘটাইতে চান, সাধারণ জীবনে অসাধারণের উপাদান আহরণ করিয়া। তার জন্য তাঁরা নিত্য নৈমিত্তিক জীবনকে গভীর ও নিবিড়ভাবে আলোচনা করিয়াছেন। জীবনের ক্ষেত্র তাঁরা অণুবীক্ষণের দ্বারা পরীক্ষা করিয়াছেন, অন্তরের গভীরতম তলদেশে তাঁহারা ডুবুরী নামাইয়া দিয়াছেন, অন্ধকার মণিকোঠায় আলো জ্বালিয়া দিয়াছেন।

আলোকে যারা অনভ্যস্ত, তন্দ্রার ঘোরে যারা মশগুল হইয়া আছে, অন্ধকারে যাহারা বাণিজ্য করে, সবার মধ্যে চেঁচামেচীর সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। কমলমণির আবির্ভাবে নগেন্দ্রের অট্টালিকায় যেমন অস্থায়ী বাসিন্দাদের সোরগোল পড়িয়া গিয়াছিল, তেমনি সোরগোল অনেক দিন পড়িয়া গিয়াছে। কিন্তু এমন তো চিরদিনই হইয়াছে। সত্য যখন আসে সে কোনও দিনই নিঃশব্দ পদসঞ্চারে আসিতে পায় না। অন্ধকারের রাজ্যে আলোর রেখা যখন দেখা দেয় তখন যে চারিদিকে চেঁচামেচী লাগিয়া যায় সে যে কেবল আনন্দেরই কলরব এমন নয়, তার ভিতরও বেদনারও আর্ত্তনাদ আছে।

আজ যে বাঙ্গালা সাহিত্যের চারিধারে কতক সম্মতির কতক প্রতিবাদের কলরব শোনা যাইতেছে, ইহাতেই প্রমাণ করে যে সত্য আসিতেছে, যে আলোতে অনেকের চোখ ধাঁধিয়া উঠিয়াছে, যে আলো সত্য শিব সুন্দরেরই অপূর্ব্ব দ্যুতি—আর্টের আত্ম প্রকাশ, জীবনের নববিকাশ।

সম্পূর্ণ

শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত।

গ্রন্থ-সমালোচনা।

প্রব্রজ্যার গান—শ্রীজ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ বিরচিত। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানার্থক সদস্য, বাঙ্গালা সাহিত্যক্ষেত্রে সুপরিচিত লেখক ঘোষ মহাশয়ের এখানি নূতন পুস্তক। "তৃণপুঞ্জ" "বীণা ও বাঁশরী" প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করিয়া শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রবাবু যে বিমল যশ অর্জ্জন করিয়াছেন, প্রব্রজ্যার গান সে যশকে বৃদ্ধি করিবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। এ গ্রন্থে আধ্যাত্মিকতা ও আন্তরিকতা আরও গভীর।

"রাখ এক কোণে, নিবিড় নিভৃত স্থানে,
সকলের অলক্ষিত করিয়া দাসেরে"

এই মহিমময় দীনতার গান আরম্ভ হইয়াছে। আপনাকে অকিঞ্চন ভাবিয়া গাঢ় ভক্তিতে গায়ক বলিয়াছেন—

"মাগে না, দিও না দিব্য জ্ঞান ;—নাহি পাত্র
ধরিয়া রাখিতে।"

এই ভক্তি-নম্র দীনতাই এই পুস্তকের প্রাণ।

"কেমনে গা'হব আমি মোর প্রেমময় ?"

কারণ সারা বিশ্ব নিরবধি তাঁহার গুণ গানে নিয়োজিত। কিন্তু ভক্তি-নম্র দীনতা কবির হৃদয়কে আশাহত করিয়া দীন করে নাই।

"উঠ, এস যাই পিতার সমীপে
অতীতে পাশরি সন্তাপময়।"

জ্ঞান-বৃদ্ধ রায়বাহাদুর জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্রের "খৃষ্টের আক্ষেপ" নিজেরই আক্ষেপ। মুখে "বিশ্বাস করেছি প্রভু!" বলিয়া কার্য্যে শয়তান-সহচর হইলে মুক্তি দিবার প্রতিশ্রুতি খৃষ্টাবতার করেন নাই। পরদুঃখে মন না কাঁদিলে, শোক-তাপগ্রস্ত বা সঙ্গতি-বিহীনের কষ্ট লাঘব না করিলে শুধু মৌখিক বিশ্বাসে স্বর্গলাভ হয় না। প্রতীচ্য ইসাহী খৃষ্টধর্ম্মের এ ব্যাখ্যা করিবেন কি না জানি না। কিন্তু কর্ম্মযোগের জ্ঞান যাঁহার পৈত্রিক সম্পত্তি সেরূপ খৃষ্টানের মুখে একথা শুনিলে আনন্দ হয়। কেবল মৌখিক বিশ্বাস ব্যতীত মোক্ষমার্গের আরও পাথেয় চাই। তাহা—

"প্রতি রিপু অবরোধে—দুষ্কৃত দমনে
প্রতি স্বার্থ বলিদানে—স্বত্ব বিস্মরণে
প্রতি পর-সেবা দানে—পরের চিন্তনে,
প্রতি প্রেম-কার্য্যে প্রাণে—হিংসার নিরোধে,
প্রতি সত্য অনুরাগে—মিথ্যা পরিহারে
প্রতি ন্যায্য আচরণে—উচ্চ ভাবনাতে ;
জন্ম-হতে মৃত্যু হ'লে প্রদীপ্ত আলোকে।"

বৌদ্ধনীতি-সুধা মন্থন করিলেও এই অমৃত উদ্ভূত হয়। মানবের মোক্ষের জন্য যে সে স্বয়ং দায়ী সে কথা এ গ্রন্থে পুনঃ পুনঃ ধ্বনিত হইয়াছে। "যদি মনে পড়ে" কবিতায় কবি বলিতেছেন যে, পিতার নিকটে ক্ষমা চাহিলে তিনি ক্ষমা করিবেন। কিন্তু কেবল ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া আবার পুরাতন বাসনা ও স্মৃতিরাশিতে হৃদয় কলুষিত করিয়া রাখিলে পূর্ব্বমত "তোমার হৃদয় রহিবে। তাঁর ক্ষমা তাঁর দয়া হবে ব্যর্থ তবোপরে।" ইহা কর্ম্মফলবাদের নীতি। মহাত্মা খৃষ্টাবতার প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মেও ইহার কার্য্যকরী শক্তি উল্লিখিত, বিলাতী মিশনারীরা যাহাই বলুন। "যোগ্যতা" কবিতাতেও এই নীতি গীত হইয়াছে।

পুনরাবর্ত্তন নীতিও এগ্রন্থে উচ্চস্থান প্রাপ্ত হইয়াছে। এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধে আমরা আর অধিক শ্লোক উদ্ধৃত করিতে চাহি না। আজিকালিকার ছন্দ-বিন্যাস—যাহার অর্থ, নিরর্থক শব্দ-ব্যঞ্জনা ও দুর্ব্বোধ কবিতা—এগ্রন্থে নাই। কিন্তু যাঁহারা কাব্যে রস চান, জ্ঞান চান, কবির প্রাণের সঙ্গীত শুনিতে চান, তাঁহারা "প্রব্রজ্যার গান" শুনিয়া তৃপ্ত হইবেন।

২০শ ভাগ । অগ্রহায়ণ, ১৩৩০ । ১০ম সংখ্যা

গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী ।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

[শ্রীপ্রিয়লাল দাস এম-এ, বি-এল]

উদ্ধৃত শ্লোকে দুর্গাপ্রসাদ বলিতেছেন যে গঙ্গা উলার পর চাকদহে উপস্থিত হইলেন। কবির সময়ে চাকদহ গঙ্গার পূর্ব্বতীরে অবস্থিত ছিল। এক্ষণে গঙ্গা চাকদহ হইতে বহুদূরে সরিয়া গিয়াছে। গঙ্গাতীরস্থ প্রাচীন চাকদহের অস্তিত্ব সম্পূর্ণ লোপ পাইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে রেলওয়ের পার্শ্বে উক্ত নামের যে গ্রাম দেখা যায় উহা নূতন গঠিত চাকদহ। প্রাচীন চাকদহ সম্বন্ধে "নদীয়া কাহিনী"তে লিখিত হইয়াছে—"প্রবাদ ভগীরথ যখন স্বর্গ হইতে গঙ্গাদেবীকে আনয়ন করেন তখন এখানে তাঁহার রথের চক্র প্রোথিত হইয়া যায়, তাই এখানকার নাম হয় চক্রদহ, অপভ্রংশে এক্ষণে চাকদহ হইয়াছে। কেহ কেহ ইহার নিকটবর্ত্তী গ্রাম মনসাপোতাকেও পৌরাণিক যুগের সময় উৎপন্ন বলিয়া থাকেন। তাঁহাদের মতে চাকদহ, মনসাপোতা, জশোড়া প্রভৃতি স্থানগুলির সম্মিলিত নাম প্রদ্যুম্ন নগর। দ্বারকাধিপতি শ্রীকৃষ্ণের পুত্র প্রদ্যুম্ন, নিম্নবঙ্গের তদানীন্তন অধিপতি সম্বরাসুরকে বধপূর্ব্বক এখানে পতিত করেন এবং নিজ নামে এই স্থানের নাম রক্ষা করেন। তৎপূর্ব্বে ইহার নাম ছিল ঋক্ষবস্ত নগর। এই প্রবাদের কোনও ঐতিহাসিক মূল্য থাকুক আর নাই থাকুক, এখনও এখানে একটি দীর্ঘিকা প্রদ্যুম্ন হ্রদ নামে খ্যাত এবং জমিদারগণের প্রাচীন কাগজাদিতেও উহার প্রদ্যুম্ন নগর নামে পরিচয় পাওয়া যায়। চারিশত বৎসর পূর্ব্বেও স্মার্ত্ত প্রধান রঘুনন্দন তাঁহার প্রায়শ্চিত্ত তত্ত্বে "মুক্ত বেণী" প্রয়াগের স্থান নির্দ্দেশ কালেও ইহাকে প্রদ্যুম্ন নগর বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, যথা—

> "প্রদ্যুম্ন নগরাদ্ যাম্যে সরস্বত্যা স্তথোত্তরে ।
> তদ্দক্ষিণ প্রয়াগস্তু গঙ্গাতো যমুনা গতা ॥"

এই বচন অনুসারে সরস্বতী নদীর উত্তরে দক্ষিণ প্রয়াগ এবং তাহারও উত্তরে প্রদ্যুম্ন নগরের স্থান নির্দ্দিষ্ট হয়, তাহা হইলে "চাকদহ মণ্ডল"ই প্রদ্যুম্ন নগর বলিয়া খ্যাত ছিল অনুমিত হয়। রঘুনন্দন যখন ইহাকে প্রদ্যুম্ন নগর আখ্যা প্রদান করিয়াছেন সেই সময়ে বিভিন্ন ঘটকগণের কারিকায় এই স্থানের "আচম্বিতা" নামও দেখা যায়। "আচম্বিতা" দেবীবর ঘটকের ৩৬ মেলের এক মেল। জমিদারী কাগজাদিতেও ইহার আচম্বিতা নাম পাওয়া যায়। এই প্রদ্যুম্ন নগর পূর্ব্বে বহু দেবমন্দির ও মঠাদি দ্বারা সুশোভিত

ছিল জানা যায়। এখনও দুই একটি প্রাচীন দেবতাহীন মন্দির এখানে বিদ্যমান আছে।" (There is an old temple at Chagdaha which at present lies in a delapidated state. * * * The temple is of ordinary size and has ornamental cut brick-work. Its age may, as it appears and as has been reported by persons who had the inscription read, be 500 years. There is no idol there now. People say there was a lingam in it."—List of Ancient monuments published by the Government). কোন সময়ে যে প্রাচীন চাকদহ ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছিল তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন কিন্তু অসম্ভব নহে। দুর্গাপ্রসাদের সময়ে যে ইহা বঙ্গদেশ-প্রবাহিনী গঙ্গার পূর্ব্বতীরে একটি প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান ছিল, তাহা কবির বর্ণনা হইতে স্পষ্ট বুঝা যায়। "প্রসিদ্ধ পরম স্থান, আসে লোক স্নান দান, মহা মহা বারুণীতে করে।" ইহার পরের শ্লোকগুলিতে দুর্গাপ্রসাদ পূর্ব্ববঙ্গের যাত্রীদের বাগ্‌ভঙ্গীর উল্লেখ করিয়াছেন আর সেই সঙ্গে সমসাময়িক বাঙ্গালার ইতিহাসের ঘটনা-বিশেষের ঈষৎ আভাস দিয়াছেন।

"কার আছে এই ভার, দেড় বুড়ির তালুকদার,
ইহাতে কে টেঁকে তার ধুমে।
মাদুলিতে ভরা হাত, নাম রাম জগন্নাথ,
বাদসার নানা যেন জুমে॥" (১৩)

"দেড় বুড়ির তালুকদারের" স্পর্দ্ধা দেখিয়া কবি তাহাকে "বাদসার নানা" অর্থাৎ আত্মীয় বিশেষের সহিত তুলনা করিয়াছেন। বঙ্গদেশের মুসলমান শাসনকর্ত্তারা নবাব খেতাবে অভিহিত হইতেন। দুর্গাপ্রসাদ এস্থলে "বাদসা" শব্দ ব্যবহার করাতে বুঝা যাইতেছে যে, তিনি দিল্লীশ্বরের কোনও আত্মীয়ের কথা পাঠককে স্মরণ করাইয়া দিতেছেন। এইচ্‌ ব্লকম্যান্‌ "বাঙ্গালার ভূগোল ও ইতিহাস" নামক ইংরাজি গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, ১৮২ খৃষ্টাব্দে টোডরমল্ল আকবরের সময়ে "তুমার জমা" নামক বাঙ্গালার রাজস্বের যে হিসাব প্রস্তুত করেন, ১৬৫৮ খৃষ্টাব্দের কিছু পূর্ব্বে সাজেহানের পুত্র বঙ্গের শাসনকর্ত্তা সাহ সুজা তাহাকে সংশোধন করিয়া বাঙ্গালার রাজস্বের একটি নূতন হিসাব প্রস্তুত করেন। টোডরমল্ল বাঙ্গালাকে উনিশটি সরকারে বিভক্ত করিয়াছিলেন। সাহ সুজা বাঙ্গালাকে চৌত্রিশটি সরকারে বিভক্ত করেন। "When Prince Suja was made Governor he made shortly before 1658 a new rent-roll which showed 34 Sarkars"—(Geography and History of Bengal by—H. Blochmann, 1873) মুর্শিদকুলী খাঁ ১৭২২ খৃষ্টাব্দে "কামিল জমা তুমারি" নামে যে রাজস্বের হিসাব প্রস্তুত করেন তাহাতেও বাঙ্গালাকে চৌত্রিশটি সরকারে বিভক্ত করা হইয়াছিল। মুর্শিদকুলী খাঁর সময়ে যে "গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী" রচিত হয় নাই তৎসম্বন্ধে যুক্তি ও প্রমাণ ইতিপূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। মুর্শিদকুলী খাঁ বাদসা ছিলেন না। সুতরাং আলোচ্য শ্লোকে দুর্গাপ্রসাদ "বাদসা" শব্দ প্রয়োগ করিয়া মুর্শিদকুলী খাঁর কথা পাঠককে স্মরণ করাইয়া দিতেছেন না। ইতিহাস পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন যে, সাজেহানের জীবদ্দশায় তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র সাহ সুজা দুইবার বঙ্গের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হয়েন এবং সাজেহানের মৃত্যুর সময় তিনি বঙ্গদেশে অবস্থান করিতেছিলেন। সাহ সুজা এই সময়ে সাজেহানের মৃত্যু সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া নিজেকে বাদসা বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন। রিয়াজু উস্‌ সালাতিন্‌ (Riyazu-S-Salatin) নামক বাঙ্গালার ইতিহাসে লিখিত আছে যে, সাহ সুজা যখন বাদসার প্রতিনিধি ও বঙ্গের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হয়েন সে সময়ে তিনি কাবুলে অবস্থান করিতেছিলেন। সইফ্‌ খাঁ তাহার পক্ষে বাঙ্গালা শাসন করিবার জন্য আদেশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সইফ্‌ খাঁ সম্রাজ্ঞী মমতাজ মহালের ভগ্নী মালিকান্‌ বানুকে বিবাহ করিয়াছিলেন। 'On the twelfth year of the rule of Shah Jehan, Shah Suja was appointed Viceroy of Bengal. He was then at Kabul and Saif Khan received

(১৩) "জুম (যাবনিক), স্পর্দ্ধ, যথা,—"এত জুম আজ্ঞা বিনা বুকে হাত দিলা।"—(প্রকৃতিবাদ অভিধান)

orders to administer Bengal on his behalf. * * * Saif Khan married Malikan Banu, sister of Empress Mumtaz Mahal"—Vide Maasir-Ul-Umara Vol I P. 102—Riyazu-S-Salatin. A History of Bengal, translated from original Persian by Abdus Salam, M. A.). স্বয়ং সাহ সুজার দ্বিতীয় পত্নী বঙ্গের পূর্ব্বতন শাসনকর্ত্তা নবাব আজম খাঁর কন্যা ছিলেন। এই সকল অবিসম্বাদী ঐতিহাসিক ঘটনার কথা আলোচনা করিলে স্পষ্ট বুঝা যায় যে আলোচ্য শ্লোকে কবি তাঁহার সমসাময়িক পাঠক ও শ্রোতাকে বঙ্গদেশে সাহ সুজার আত্মীয়গণের স্পর্দ্ধার কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া পূর্ব্ববঙ্গবাসী দেড় বুড়ির তালুকদারকে চিনিয়া লইতে অনুরোধ করিতেছেন। সাহ সুজার সময়ে বঙ্গদেশ চৌত্রিশটি সরকারে বিভক্ত হওয়াতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তালুকদারগণের নাম যে রাজস্বের হিসাবের কাগজে স্থান পাইয়াছিল তাহা সংজেই অনুমান করা যায়। আলোচ্য শ্লোকে দুর্গাপ্রসাদ যে তাঁহার সমসাময়িক বাদসা পুত্র ও বঙ্গের শাসনকর্ত্তা সাহ সুজা যিনি পরে নিজেকে বাদসা বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন তাঁহাকে ও তাঁহার আত্মীয়গণকে লক্ষ্য করিয়াছেন তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। সাহ সুজার সহিত তাঁহার বহু আত্মীয় যে বঙ্গদেশে আসিয়াছিলেন তাহা কবি-কল্পিত নহে। দেড় বুড়ির তালুকদারের জীবন্ত চিত্রখানিও কল্পনার সৃষ্টি নহে। সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে যে "গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী" রচিত হইয়াছিল তাহা আলোচ্য শ্লোকে ঐতিহাসিক সত্যের রশ্মিরেখা হইতে বেশ বুঝা যাইতেছে। এতদ্ব্যতীত, কবির সমকালে যে চাকদহ "প্রসিদ্ধ পরম স্থান ছিল" তাহা কবির পরবর্ত্তী যুগে অষ্টাদশ শতাব্দীতে ব্যাঘ্রসঙ্কুল জঙ্গলাকীর্ণ স্থানে পরিণত হইয়াছিল। 'নদীয়া কাহিনী"তে লিখিত হইয়াছে,—"একজন সাহেব ১৭৮৬ খৃষ্টাব্দেও এখানে ব্যাঘ্রের উপদ্রবের বর্ণনা করিয়াছেন।" (৬) দুর্গাপ্রসাদের সময়ে চাকদহে যদি ব্যাঘ্রভীতি থাকিত তাহা হইলে পূর্ব্ববঙ্গ হইতে যাত্রীরা "পোলা পুলি কতগুলি" লইয়া বারুণীতে স্নানদান করিবার জন্য এখানে আসিত না। দুর্গাপ্রসাদের পরবর্ত্তী সময়ে অষ্টাদশ শতাব্দীতে চাকদহ জনশূন্য হইয়া গেলে "গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী"তে উল্লিখিত বারুণীর যোগে স্নানার্থ যাত্রী সমাগমের ব্যাপারটিও এখান হইতে লোপ পায়।

"চাকদহ হইতে গঙ্গা গমন করিলা।
তিনজন মন্দ মন্দ গতিতে চলিলা॥
সরস্বতী যমুনার মনে করেন খেদ।
হইবে গঙ্গার সঙ্গে গমন বিচ্ছেদ॥
ঈশ্বরীকে নিবেদন করেন দুজনে।
কাতর হইয়া কন ধরিয়া চরণে॥
অধমতারিণী গঙ্গা অপার মহিমা।
শম্ভু না জানেন গুণ কি পর্য্যন্ত সীমা॥
এতকাল হইয়াছে নাম বটে জল।
তোমার পরশ হইলে জনম সফল॥
লোকেতে মানিবে তীর্থ বলিবে এখন।
বিদায় হইব বল্যা করেন রোদন॥
ভগীরথ বলে হায় কেমন কপাল।
দুঃখের উপরে দুঃখ ঘটিল জঞ্জাল॥
কাঁদিয়া অস্থির রাজা গড়াগড়ি যায়।
সরস্বতী যমুনায় শান্ত করেন তায়॥
কেন খেদ কর বাছা শুনহ কারণ।
হবে যে বিচ্ছেদ আছে মুনির বচন॥
ভরদ্বাজ মুনি যাবে একাত্র কানন।
এখানে করিয়া স্নান করিবে গমন॥
এই হেতু বিচ্ছেদ হইবে তিন ধারা।
কি করিব এই জন্যে যাইব আমরা॥
এ কথা কহিয়া যমুনা পূর্ব্ব দিগে যান।
সরস্বতী পশ্চিমেতে করিলা পয়ান॥
দক্ষিণে চলিলা গঙ্গা কিছু নিরানন্দ।
বিচ্ছেদ বেদনা জন্যে কিছু গতি মন্দ॥
গঙ্গা কন মুক্তবেনি হৈলা এইস্থান।
স্নান দানে হবে মুক্ত বেনির সমান॥
গঙ্গা আজ্ঞা কার সাধ্য কে করে লঙ্ঘন।
মুক্ত হয় জীব কেশ করিলে মুণ্ডন॥
উড়িষ্যার লোক জানে করে শাস্ত্র মত।
জানিয়া না জানে অন্য দেশি লোক যত॥

যুক্তবেণী মুক্তবেণী উভয় সমান।
তুল্য ফল করিলে সুওম স্নান দান॥"

স্মার্ত্ত রঘুনন্দনের অভিমত উদ্ধৃত করিয়া কুমুদবাবু "নদীয়া কাহিনী"তে "চাকদহ মণ্ডল" নাম দিয়া যে স্থানে "মুক্তবেণী"র অবস্থিতি স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া তাহাকে প্রদ্যুম্ন নগর বলিয়াছেন, অম্বিকাচরণ গুপ্ত প্রণীত "হুগলী বা দক্ষিণ রাঢ়" নামক গ্রন্থে তৎসম্বন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছে তাহা পাঠ করিলে বুঝা যায় যে "ত্রিবেণী" ও উক্ত প্রদ্যুম্ন নগর সম্বন্ধে শেষ কথা অম্বিকা বাবুর গ্রন্থেই পাওয়া যায়। অম্বিকাচরণ গুপ্ত মহাশয় বলেন,—"ত্রিবেণীর পরিচয় সূত্রে লিখিত আছে—

প্রদ্যুম্নস্ত হ্রদাৎ যাম্যে সরস্বত্যাপ্তদোত্তরে।
তদ্দক্ষিণ প্রয়াগস্ত গঙ্গাতো যমুনাগতা॥

শব্দ কল্পদ্রুম।

প্রায়শ্চিত্ততত্ত্বে স্মার্ত্ত রঘুনন্দন "প্রদ্যুম্ন নগরাৎ যাম্যে" এই পাঠ পরিবর্ত্তন করিয়া শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র প্রদ্যুম্ন গঙ্গাতীরে আসিয়া যে নগর সংস্থাপিত করিয়াছিলেন তাহারই প্রমাণ চেষ্টা করিয়াছেন। পাণ্ডুয়ার অন্তর্গত মোড়পুরকে তিনি "মারপুর" বলিয়া তাহার পোষকতা করিয়াছেন। অধিকন্তু তিনি ঐ শ্লোকটী মহাভারত হইতে উদ্ধৃত বলিয়া কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসকেও জড়িত করিয়াছেন। কিন্তু মহাভারতে ঐ শ্লোক খুঁজিয়া মিলে না। যাহাই হউক, কন্দর্পপুত্র যে আপন রাজধানীর নিকটবর্ত্তী গঙ্গা যমুনাদি পূতসলিলা নদী ছাড়িয়া এতাধিক দূরে নগর সংস্থাপিত করিবার প্রয়োজনানুভব করিয়াছিলেন এরূপ মনে হয় না। আর পাণ্ডু অপেক্ষা প্রদ্যুম্ন নামের অপভ্রংশেই যে পাণ্ডুয়া নাম হইয়া থাকিবে এরূপ অনুমানও অসঙ্গত। ত্রিবেণীর উত্তরবর্ত্তী যে কোন স্থানেরই নাম প্রদ্যুম্নপুর থাকুক তাহা শ্রীধল্ল সেনের বংশধর প্রদ্যুম্ন বই আর কোন প্রদ্যুম্নের প্রতিষ্ঠিত নহে।" অম্বিকা বাবু সেন বংশীয় বঙ্গাধিপতি প্রদ্যুম্নের রাজত্ব দশম শতাব্দীতে ছিল ইহাই স্থির করিয়াছেন। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, প্রদ্যুম্ন নগরের সহিত চাকদহের কোনও সম্বন্ধ নাই। বাস্তবিক, চাকদহের পর "মুক্তবেণী"র বিষয় চিন্তা করিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে, গঙ্গার পশ্চিম তীরবর্ত্তী দেশ অর্থাৎ বর্ত্তমান হুগলী জেলার অন্তর্গত ত্রিবেণী তীর্থেরই উল্লেখ দুর্গাপ্রসাদ "গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী"তে স্পষ্টভাবে করিয়াছেন। দুর্গাপ্রসাদের পূর্ব্ববর্ত্তী যুগে গঙ্গা যমুনা ও সরস্বতীর স্রোত যে এই তিনটী নদীর বিভিন্ন স্রোতোপথে বা খাতে প্রবলভাবে বহিত তাহা ঐতিহাসিকগণ স্বীকার করিয়া থাকেন। ব্লকম্যান্ সাহেব ষোড়শ শতাব্দীর য়ুরোপীয় পরিব্রাজক ডি, বারসের (D' Barros) উক্তির উপর নির্ভর করিয়া বলিয়াছেন,—"The island opposite Tribeni has a conspicuous place on D' Barros' map of Bengal and on that by Blaev. The map also agrees with Abul Fazl's statement in the Ain, that at Tribeni there are three branches, one the Saraswati on which Satgaon lies; the other the Ganga now called Hugli, and the third the Jabuna. De Barros' and Blaev's map show the three branches of almost equal thickness." (৯) তাহা হইলে আমরা দেখিতেছি যে, ষোড়শ শতাব্দীতে অঙ্কিত মানচিত্রে ও "আইন ই-আকবরী"তে উক্ত তিনটী নদী বিশেষভাবে উল্লিখিত হইয়াছে। ডি, বারস্ ও ব্লেভের মানচিত্রে ব্লকম্যান সাহেবের মতে নদী তিনটীর কলেবর তিনটী সমস্থূল রেখা দ্বারা চিহ্নিত হইয়াছে। ষোড়শ শতাব্দীর বহু পূর্ব্বে ইতালীর রাজধানী রোম হইতে বাণিজ্য পোত সকল ত্রিবেণী দিয়া প্রাচীন পাটলিপুত্র পর্য্যন্ত গমন করিত। আলোচ্য উদ্ধৃত শ্লোকে দুর্গাপ্রসাদ "মুক্তবেণী"র কথা বলিয়াছেন, কিন্তু "ত্রিবেণী" শব্দটি ব্যবহার করেন নাই। শুধু তাহাই নহে, দুর্গাপ্রসাদের সময়ে উক্ত নদী তিনটীর স্রোতোবেগ মন্দীভূত হওয়াতে কবি বলিতেছেন,—"চাকদহ হইতে গঙ্গা গমন করিলা। তিনজন মন্দ মন্দ গতিতে চলিলা॥ * * * একথা কহিয়া যমুনা পূর্ব্ব দিগে যান। সরস্বতী পশ্চিমেতে করিলা পয়ান॥ দক্ষিণে চলিলা গঙ্গা কিছু নিরানন্দ। বিচ্ছেদ বেদনা জন্ত কিছু গতি মন্দ॥" সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে দুর্গাপ্রসাদের সমকালে সরস্বতী ও যমুনা মজিয়া গিয়াছিল, তবে বোধ

হয় সম্পূর্ণ লোপ পায় নাই। গঙ্গার সহিত গঙ্গার এই দুইটি শাখার বিচ্ছেদ যে ঘটিয়াছিল, তাহা কবির কথা হইতে বেশ বুঝিতে পারা যায়। দুর্গাপ্রসাদ সেইজন্য কেবল যে 'ত্রিবেণী' শব্দটি ব্যবহার করেন নাই তাহা নহে, তিনি সরস্বতীর তীরে অবস্থিত সপ্তগ্রামের নাম পর্য্যন্ত উল্লেখ করেন নাই। কৃত্তিবাস, বিপ্রদাস, মাধবাচার্য্য ও মুকুন্দরাম ত্রিবেণী ও তাহার নিকটবর্ত্তী সপ্তগ্রামের উল্লেখ করিয়াছেন। (ক, খ, গ, ঘ-চিহ্নিত তালিকা দ্রষ্টব্য) অম্বিকাচরণ গুপ্ত মহাশয় "হুগলী বা দক্ষিণ রাঢ়" নামক বিবিধ মূল্যবান তথ্যপূর্ণ গ্রন্থে সপ্তগ্রাম সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল।

"শাস্ত্রে আছে—প্রিয়ব্রত রাজার সাত পুত্র—অগ্নিদ্র, মেধাতিথি, বপুষ্মান, জ্যোতিষ্মান, দ্যুতিমান, সবন ও ভব্য। পুরাণবিশেষে এই সাতটীর কোন কোন নামের প্রকারান্তর আছে। তাঁহারা গৃহাশ্রমী না হইয়া নিভৃত নির্জ্জন গঙ্গাযমুনার সঙ্গমস্থলে তপঃসাধনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ঋষি তপস্বীরা রাজ্যাধিকারের কি ধার ধারেন, তপশ্চর্য্যাই তাঁহাদের লক্ষ্য। অনুমান হয় যখন বলিরাজ পুত্র সুহ্ম অসভ্য রাঢ় জাতীয়ের দেশে সুহ্ম নামে রাজ্য সংস্থাপন করেন, সেই সময়ে তিনি এই সপ্তর্ষিসন্নিবিষ্ট পুণ্যভূমিকে আপনার রাজধানীর উপযুক্ত বোধে ইহাতেই আপনি অবস্থিতি করেন এবং সপ্তর্ষির সম্মানার্থে ইহার সপ্তগ্রাম নাম রক্ষা করিয়াছিলেন। প্রবোধচন্দ্রোদয়ের দত্তবাক্যে রাঢ়পুরীকে অত্যাশ্চর্য্যশালিনী বলা হইয়াছে, তাহা সপ্তগ্রাম বই অন্য কোন নগরকে বুঝায় না। * * * সপ্তগ্রাম এখন বন জঙ্গলে পরিপূর্ণ শ্বাপদ সমাকুল। কিছু দিন পূর্ব্বে সপ্তগ্রামের পথে চলিতে ভয় হইত, শার্দ্দূল ভল্লুকাদি শ্বাপদ জন্তু দিবাভাগে রাজপথে নির্ভয়ে ভ্রমণ করিত। খৃষ্টীয় শকের প্রথম শতাব্দীতে প্লীনি লিখিয়া গিয়াছেন—That the ships near the Godevari sailed from thence to Cape Palimerus, thence to Tentigale opposite Fulta, thence to Tribeni—Dr. Crafford's Hugli.

"এখন কলতায় পরপারে ধনজা। ত্রিধারায় প্রবাহিতা গঙ্গার শাখা সরস্বতীর উত্তরে ত্রিবেণী এবং দক্ষিণে সপ্তগ্রাম। সপ্তগ্রামের পূর্ব্বদিক দিয়া ভাগীরথী দক্ষিণগামিনী। সেকালে যেখানে সপ্তর্ষি তপস্যা করিতেন, সেখানে এখন বাসুদেবপুর, বাঁশবেড়িয়া, পামারপাড়া, কৃষ্ণপুর, শিবপুর, দেবানন্দপুর, ত্রিশবিঘা প্রভৃতি গ্রাম দেখিতে পাওয়া যায়। রেভঃ লং সাহেব লিখিয়া গিয়াছেন —Many years ago Satgao the Royal Emporium of Bengal from the time of Pliny down to the arrival of the Portuguese in this country, has now scarcely a memorial of its greatness left.

"অন্যতম পাশ্চাত্য প্রত্নতাত্ত্বিক উইলফোর্ড লিখিয়াছেন —It is a famous place of worship and was formerly the residence of the kings of the country and said to have been a city of immense size so as to have swallowed one hundred villages. প্লীনী যাহা লিখিয়াছেন, তাহা অপ্রকৃত বা আমাদের শাস্ত্রবিরুদ্ধ নহে।

"এখন আমরা সপ্তগ্রামে কি দেখিতে পাই—গঙ্গাতীরে এক প্রাচীন দুর্গের ধ্বংসাবশেষ—তাহার পশ্চিমে সরস্বতী ও অন্য তিনদিকে দুর্গপরিখা ও প্রাকারচিহ্ন, একটি অতি পুরাতন ভগ্ন সেতু, জাফর খাঁর সমাধি মসজিদ, (যাহা সপ্তর্ষির সাধন গৃহ বা দেবালয় বই আর কিছু বলিয়া মনে করা যায় না) কিন্তু এখন জাফর খাঁর সমাধি বলিয়াই প্রসিদ্ধ এবং কতকগুলি মসজিদের ভগ্নাবশেষ এবং কতকগুলি অতি প্রাচীন জলাশয় বই আর কিছু নেত্রগোচর হয় না।

"মুসলমান রাজত্বেও সপ্তগ্রামের সুখ সমৃদ্ধি ছিল। কবিকঙ্কণ লিখিয়াছেন,—

> আর যত সহর তা বলিবারে নারি।
> এ সব সহরে যত সদাগর বৈসে।
> কত ডিঙ্গা লয়্যা তারা বাণিজ্যায় আইসে॥
> সপ্তগ্রামের বণিক কোথায় না যায়।
> ঘরে বসে সুখ মোক্ষ নানাধন পায়॥

তীর্থমধ্যে পুণ্যতীর্থ ক্ষিতি অনুপম।
সপ্তর্ষির শাসনে বলায় সপ্তগ্রাম ॥

কবিকঙ্কণ চণ্ডী।

"কবি বিপ্রদাস পিপলাই ১৪১৭ সালে বা ১৪৯৬ খৃষ্টাব্দে রচিত মনসামঙ্গলে সপ্তগ্রামের পরিচয় দিয়াছেন—

ছত্তিশ আশ্রমে লোক, নাহি কোন দুঃখ শোক,
আনন্দে বঞ্চয়ে নিরন্তর।
বৈসে যত দ্বিজগণ, সর্ব্বশাস্ত্রে বিচক্ষণ,
তেজোময় যেন দিবাকর ॥
সর্ব্বতত্ত্ব জানে মর্ম্মে, বিশারদ গুরু ধর্ম্মে,
জ্ঞানে গুরু দেবের শেখর।
পুরুষ মদন যেন, রমণী সাবিত্রী হেন,
আভরণ সব স্বর্ণময়।
তার রূপ গুণ যত, তাহা বা বর্ণিব কত,
হেরিতে নিমিষ বিলয় ॥
অভিনব সুরপুরী, দেখি ঘর সারি সারি,
প্রতিঘরে কনকের ঝারা।
নানা রত্ন অবিশাল, জ্যোতির্ম্ময় কাচ চাল,
রঙ্গে মুক্তা প্রলম্বিত ঝারা ॥
মসিদ মোকাম ঘরে, সেলাম রাজায় করে,
ফয়তা করয়ে নিত্য লোকে।
বন্দিয়া মনসা দেবী, দ্বিজ বিপ্রদাস কবি,
উদ্ধারিয়া ভকত সেবকে ॥"

"কবি কৃষ্ণরামের ষষ্ঠীমঙ্গলে সপ্তগ্রামের পরিচয়—

"সপ্তগ্রামে যে ধরণী তার নাহি তুল।
চালে চালে বৈসে লোক ভাগীরথী কূল ॥
নিরবধি যজ্ঞ দান পুণ্যবান লোক।
অকাল মরণ নাহি, নাহি দুঃখ শোক ॥
শক্রজিৎ রাজার নাম, তথির অধিকারী।
বিচারিয়ে যত গুণ বলিবারে নারি ॥
বিমল বংশের শশী প্রতাপে তপন।
জিনিয়া অমরাপুরী তাহার ভবন ॥"

"শক্রজিৎ নামে হিন্দু রাজা সপ্তগ্রামে রাজত্ব করিতেন, ইহা উপরি উক্ত কবিতায় স্পষ্ট প্রতিপন্ন করিতেছে। ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভে শ্রীচৈতন্য পার্ষদ নিত্যানন্দ মহাপ্রভু কিছুদিন ত্রিবেণীর নিকট সপ্তগ্রামে উদ্ধারণ দত্ত মহাশয়ের বাটীতে অবস্থিতি করিয়াছিলেন।

"উদ্ধারণ দত্ত ভাগ্যবন্তের মন্দিরে।
রহিলেন মহাপ্রভু ত্রিবেণীর তীরে ॥
কায় মন বাক্যে নিত্যানন্দের চরণ।
ভজিলেন অকৈতবে দত্ত উদ্ধারণ ॥"

চৈতন্য ভাগবৎ।

"হিরণ্য ও গোবর্দ্ধন মজুমদার নামে দুই ভাই এই সময়ে সপ্তগ্রামের ইজারদার ছিলেন। তাঁহারা বার লক্ষ টাকা বার্ষিক রাজস্ব দিয়া বিশ লক্ষ টাকা আদায় পাইতেন। তৎকালে ইজারদারী প্রথা প্রচলিত ছিল। নিয়মিত সময়ের জন্য মহল মফকুর এবং পরগণাদি নিরিখ মত বিলি বন্দোবস্ত হইত।

"হেনকালে মুলুকের ম্লেচ্ছ অধিকারী।
সপ্তগ্রাম মুলুকের সে হয় চৌধুরী ॥
হিরণ্য দাস মুলুক নিল মোক্তা করিয়া।
তাঁর অধিকার গেল মরে সে দেখিয়া ॥
বার লক্ষ দেন রাজায় সাধেন বিশ লক্ষ।
সেহ তুড়ুক কিছু না পাঞা হৈল প্রতিপক্ষ ॥
রাজঘরে কৈফিতি দিয়া উজির আনিল।
হিরণ্য মজুমদার পলাইল রঘুনাথেরে বান্ধিল ॥"

চৈতন্য চরিতামৃত, অন্ত্যলীলা।

* * *

"প্রাচীন রোমকেরা সপ্তগ্রামকে গাঙ্গেস রেজিয়া বলিতেন। তাঁহারা এখান হইতে কার্পাস সূত্র নির্ম্মিত সূক্ষ্ম বস্ত্র এবং নানা প্রকার ছিট ও কৌষেয় বাস ইউরোপের বাজারে লইয়া গিয়া বহুমূল্যে বিক্রয় করিতেন। তদতিরিক্ত সোরা, নীল, লাক্ষা প্রভৃতি এদেশের বহু পণ্যই পৃথিবীর নানাস্থানে নীত হইত, তজ্জন্য নানাদেশের লোক সদাসর্ব্বদা সপ্তগ্রামে আসা যাওয়া করিত এবং পুণ্যভূমি বলিয়া অনেক যতি, ব্রহ্মচারী, সন্ন্যাসীর এখানে সমাগম হইত। এই সময়ে সপ্তগ্রাম খুব গুলজার ছিল।"

এই সকল উদ্ধৃত শ্লোক হইতে বুঝা যাইতেছে যে,

মুকুন্দরামের সময়ে অর্থাৎ সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভ কালেও সপ্তগ্রাম সমৃদ্ধ স্থান ছিল। ইহার পর কিঞ্চিদূর্দ্ধ পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে সরস্বতীর স্রোত মন্দীভূত হওয়াতে বঙ্গদেশের প্রধান বন্দর সপ্তগ্রাম হইতে পর্ত্তুগীজগণ কর্ত্তৃক হুগলীতে স্থানান্তরিত হয়। হুগলী জেলার গেজেটিয়ারে লিখিত আছে যে ১৬৫০ খৃষ্টাব্দের পর কোনও মানচিত্রে সপ্তগ্রামকে প্রদর্শিত হয় নাই। "Satgaon is not shown in any maps subsequent to 1650 A. D." ইহার পূর্ব্বে ১৫৬৯ খৃষ্টাব্দে গাষ্টাল্ডির মানচিত্রে, ১৫৭০ খৃষ্টাব্দে ডি, বারসের মানচিত্রে এবং ১৬৪০ খৃষ্টাব্দে ব্লেভের মানচিত্রে সপ্তগ্রাম চিহ্নিত হইয়াছিল দেখিতে পাওয়া যায়। "It appears in all the old maps, such as those of Gastaldi (1561), De Barros (circa 1570), and Blaev (1640)." সপ্তগ্রামের পতনের উল্লেখ করিয়া উক্ত গেজেটিয়ারে লিখিত হইয়াছে যে, নদীর গতি পরিবর্ত্তনই ইহার পতনের হেতু। দামোদর পশ্চিমদিকে সরিয়া যাইতে আরম্ভ করে এবং সরস্বতীর খাত মাটিতে পূর্ণ হইয়া উঠে। "The decline of the city began with changes in the river courses. The Damodar began to shift westwards, the river Saraswati also began to silt up and the upper reaches of the Bhagirathi became difficult of navigation by the larger ships that began to visit Bengal." অম্বিকা বাবু "হুগলী"র ইতিহাসে লিখিয়াছেন,—"হুগলী" নাম বড় বেশী দিনের নহে। * * * ন্যূনাধিক চারিশত বৎসর পূর্ব্বে রচিত কবিকঙ্কণের চণ্ডীকাব্যে হুগলীর পরপারবর্ত্তী গোরিয়া, কাঁকিসহর, এপারে ত্রিবেণীর উল্লেখ আছে, কিন্তু হুগলী, চন্দননগর, গোন্দলপাড়া, ভদ্রেশ্বর, গোরুটীর কথা নাই * * * ইহাতেই বুঝা যাইতেছে যে, চারিশত বৎসর পূর্ব্বে হুগলী, চন্দননগর, চুঁচুড়া প্রভৃতির অস্তিত্ব ছিল না। হুগলীর অভাব সপ্তগ্রাম মিটাইত।" ঘ-চিহ্নিত তালিকার সহিত ঙ-চিহ্নিত তালিকা মিলাইয়া দেখিলে বুঝা যায় যে, দুর্গাপ্রসাদের সময়েও হুগলীর অস্তিত্ব ছিল না কিম্বা হুগলী-কবির সমকালে গঙ্গার পশ্চিম তীরবর্ত্তী বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য নগর বলিয়া প্রতিষ্ঠালাভ করে নাই। খ-চিহ্নিত বিপ্রদাসের তালিকায় কিন্তু হুগলীর নাম দেখা যায়। তাহা হইলে কি বিপ্রদাস মুকুন্দরাম ও দুর্গাপ্রসাদের পরবর্ত্তী যুগের কবি? গ-চিহ্নিত মাধবাচার্য্যের তালিকাতেও হুগলীর নাম নাই। পর্ত্তুগীজগণ যে "হুগলী" নগর সর্ব্বপ্রথম স্থাপনা করিয়াছিলেন, তাহা অবিসম্বাদী ঐতিহাসিক সত্য। অম্বিকাবাবুর মতে "খৃঃ ১৫১৭ অব্দে পর্ত্তুগীজ পোত গঙ্গা নদীতে প্রথম প্রবেশ করিয়াছিল।" তাহা হইলে কবি বিপ্রদাস পঞ্চদশ শতাব্দীতে হুগলী নগরের কথা বলিলেন কিরূপে? আমাদের মনে হয় যে, মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বিপ্রদাসের লিখিত "মনসার ভাসানের" যে পুঁথি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহার প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে তিনি বিশেষভাবে পরীক্ষা করিবার অবসর পান নাই। দুর্গাপ্রসাদের তালিকায় (ঙ) যদিও হুগলীর উল্লেখ নাই কিন্তু হুগলীর পারে গোন্দলপাড়া ও ভদ্রেশ্বরের উল্লেখ আছে। গোন্দলপাড়া সম্বন্ধে অম্বিকাবাবুর যে মত উদ্ধৃত করা হইয়াছে, তাহাও নির্ভুল বলিয়া মনে হয় না। কারণ, মুকুন্দরামের চণ্ডীকাব্যে ইহার কথা স্পষ্ট করিয়া লিখিত হইয়াছে।

"গরিয়া ছাড়িয়া ডিঙ্গা চলে গোন্দলপাড়া।
জগদ্দল এড়াইয়া গেলেন নপাড়া॥"

ধনপতি ও তাঁহার পুত্র শ্রীপতি উভয়েই গোন্দলপাড়া দেখিয়াছিলেন। সে যাহা হউক, দুর্গাপ্রসাদ যখন সপ্তগ্রামের কথা বলেন নাই তখন এই সুবিখ্যাত স্থানটি তাঁহার সময়ে যে সরস্বতীর স্রোত মন্দীভূত হইয়া যাওয়াতে ধ্বংসমুখী হইয়াছিল তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। সে সময়ে হয়ত হুগলীনগর গঙ্গার বন্দর বলিয়া খ্যাতি লাভ করে নাই। কবি ত্রিবেণীর নাম না লইয়া 'মুক্তবেণী'র কথা বিশেষ ভাবে বলিয়াছেন। ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে, ত্রিবেণী তীর্থ সে সময়ে প্রসিদ্ধ তীর্থ বলিয়া খ্যাত ছিল, কিন্তু গঙ্গা যমুনা ও সরস্বতীর স্রোত মন্দীভূত হওয়াতে ভারতবর্ষের বা বঙ্গদেশের সকল স্থানের লোক এখানে স্নানদান ও কেশ মুণ্ডনের জন্য আসিত না। কবি দুঃখ প্রকাশ করিয়া

বলিতেছেন,—"উড়িস্যার লোক জানে কয়ে শাস্ত্র মত। জানিয়া না জানে অন্য দেশি লোক যত॥" অম্বিকাবাবু বলেন, "প্রয়াগ যুক্ত বেণীর ন্যায় এখানেও বেণীমাধব নামে শিব আছেন, তাঁহার বর্ত্তমান মন্দির ও ঘাট, উড়িষ্যার রাজা মুকুন্দদেবের নির্ম্মিত॥" কোন্ সময়ে যে এই মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল অম্বিকাবাবু তাহা বলেন নাই। হুগলীর গেজেটিয়ার পাঠে জানা যায় যে, ষোড়শ শতাব্দীতে ত্রিবেণী উড়িষ্যার রাজা মুকুন্দ হরিচন্দনের অধিকারভুক্ত হইয়াছিল। "In the middle of the sixteenth century it appears to have passed into the hands of the Oriya king Mukunda Harichandan. The broad flight of steps on the river and the *jamai jangal* * * * are attributed to the Oriyas." ত্রিবেণীতে মুকুন্দদেবের রাজত্ব অল্পকাল স্থায়ী ছিল। মুকুন্দদেব মুসলমান কর্ত্তৃক পরাজিত হইবার পর যদিও উড়িয়া রাজার অধিকার হইতে ত্রিবেণী চলিয়া যায় কিন্তু উক্ত রাজা কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত দেবমন্দির দর্শনার্থ ওড্রদেশবাসিগণ যে ত্রিবেণীতে আসিত তদ্বিষয়ে সন্দেহমাত্র নাই। দুর্গাপ্রসাদ সেইজন্য লিখিয়াছেন,—"উড়িষ্যার লোক জানে করে শাস্ত্র মত।" সপ্তদশ শতাব্দীতে সপ্তগ্রামের সৌভাগ্য যেমন কমিয়া আসিতে আরম্ভ হয় ও ত্রিবেণী হিন্দু রাজার সহিত মুসলমানের বিরোধ হেতু যাত্রীদের পক্ষে নিরাপদ তীর্থ বলিয়া বিবেচিত না হওয়াতে গঙ্গার পূর্ব্বপারে অবস্থিত চাকদহ সমগ্র পূর্ব্ববঙ্গবাসী বাঙ্গালীর নিকট "প্রসিদ্ধ পরম স্থান" বলিয়া খ্যাতি লাভ করিতে থাকে। তীর্থ হিসাবে ত্রিবেণীর পতন ও চাকদহের অভ্যুদয়ের বিষয় চিন্তা করিয়া দুর্গাপ্রসাদ চাকদহ ও "মুক্তবেণী"র যে সমসাময়িক পদ্যময় ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহা উদ্ধৃত ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক তথ্যের আলোকে পাঠ করিলে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, দুর্গাপ্রসাদের বর্ণিত চাকদহ ও "মুক্তবেণী"র সামাজিক ইতিহাস সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগের ঘটনাকেই আশ্রয় করিয়া লিখিত হইয়াছে। "গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী", যে সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে রচিত হইয়াছিল, তৎসম্বন্ধে ইহা হইতে প্রকৃষ্টতর প্রমাণ করিব রচিত পরবর্ত্তী শ্লোকে পাওয়া যায় না। চাকদহ ও "মুক্তবেণী"র পর কয়েকটি নূতন স্থানের নাম কিন্তু গঙ্গার উত্তর তীরে পাওয়া যায়।

"দ্বিজ বলে অতঃপর শুন সর্ব্বজন।
সুরধুনী আর যথা করিলা গমন॥
কুমারহট্ট বামে করি, দক্ষিণে রাণী নগরী,
ভাটপাড়ায় গঙ্গা উপনীত।
পশ্চিমে গোঁদলপাড়া, পূর্ব্বদিগে মুলাজোড়া,
ভদ্রেশ্বরে আইলা ত্বরিত॥
দীর্ঘাঙ্গ দক্ষিণে রহে, উপনীত খড়দহে,
পুণ্যভূমি বৈকুণ্ঠ সমান।
সেইখানে দ্বিজবর, জন্মেছিলা যোগেশ্বর,
ভরদ্বাজ মুনির সন্তান॥
চলিলা দক্ষিণদেশ, বালী ছাড়া অবশেষ,
উপনীত যথা কালীঘাট।
দেখেন অপূর্ব্ব স্থান, পূজা হোম বলিদান,
দ্বিজগণ করে চণ্ডীপাঠ॥
* * *
নানা দেশ ছাড়াইয়া, পশ্চিম বাহিনী হৈয়া,
দক্ষিণে বামেতে দুর্গা দেখি।
গঙ্গাতে মনোযোগ, অম্বুলিঙ্গ ক্ষেত্রভোগ,
এড়াইলা মনে অতি সুখী॥
* * *
শতমুখী হইয়া চলিলা ভগবতী।
ভগীরথে কৃপা করি হৈলা বেগবতী॥
সগর সন্তান যত ভস্ম হৈয়াছিল।
সেইখানে বেগে জল আসিয়া পড়িল॥
* * *
* * *
গঙ্গা কন শুন বাছা আমার বচন॥
তুমিতো জীবন মুক্ত ভাবনা কি আর।
তোমা হৈতে হইবেক পাপির নিস্তার॥
সাগর সঙ্গম এই তব কীর্ত্তি অতি।
রহিল তোমার নামে নাম ভাগীরথী॥

ভাগীরথী বলে যেবা ডাকিবে আমারে।
চতুর্ব্বর্গ ফল আমি দিব হে তাহারে ॥

* * *

জলনিধি জানিয়া গঙ্গার আগমন।
সত্বরে আসিয়া করে দেবী সম্ভাষণ ॥
অনেক সঞ্চিত পুণ্য ছিল যে আমার।
সেই ফলে দর্শন হইল তোমার ॥
দয়াময়ী দয়া করি আইস মম বাস।
পবিত্র করহ দাসে এই অভিলাষ ॥
সাগরের অনুরাগ দেখিয়া তখন।
সিন্ধুরে বাড়াইতে দেবীর হইল মিলন ॥
কাম্য তীর্থ সাগর সঙ্গম সেই স্থান।
স্নান দান মরণেতে বিষ্ণুপদ দেন ॥
জলে স্থলে অন্তরীক্ষে হয় মৃত্যু যাঁর।
চতুর্ভুজ হয় সেই জন্ম নাহি আর ॥
গঙ্গা কন ভগীরথ আর কিবা চাও।
পিতৃলোক উদ্ধার হইল ঘরে যাও ॥"

(ক্রমশঃ)

বিসর্জ্জন।

[শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী]

(১২)

বাস্তবিক ইতির বিবাহের জন্য শ্রীনাথ বাবু বড় ভাবিত হইয়া পড়িলেন। ইতি সপ্তদশ বর্ষীয়া, কিন্তু আজও তাহার বিবাহের পাত্র যোগাড় হইল না।

লোকের কথার ভয়ে ইতি পথে ঘাটে যাওয়া একরকম প্রায় বন্ধ করিয়াছে। যে সময়ে পথে ঘাটে লোক থাকে না, সেই সময়ে সে বাহিরের কাজ সারিয়া লয়। তাহার এই লোককে এড়াইয়া চলিবার চেষ্টা পিতারও চোখে পড়িয়াছে, তিনিও বড় ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছেন। এখন কোনও রকমে কন্যাকে পাত্রস্থ করিতে পারিলেই তিনি বাঁচিয়া যান, ইতিও বাঁচিয়া যায়।

শ্রীনাথ বাবু নিজে অথর্ব্ব হইয়া পড়িয়াছিলেন। বাত ও জ্বরে তিনি উত্থানশক্তি রহিত হইয়া গিয়াছিলেন। নিজে যে কোনরূপ চেষ্টা করিবেন সে ক্ষমতা নাই, পরের দয়ার উপরেই তাঁহাকে সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে হইত।

সেদিন পাড়ার মস্তক সদৃশ আবুর মাতা যখন এই দুর্ব্বল পর-অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষী বৃদ্ধকে অত্যন্ত রূঢ়ভাবে যা-না-তাই শুনাইয়া দিয়া গেলেন, তখন শ্রীনাথ বাবু শুধু আকাশ পানে চাহিয়া একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিলেন, রন্ধনগৃহে থাকিয়া ইতি চোখের জল ফেলিল।

নির্জ্জন দুপুর বেলায় ঘাটে জল আনিতে গিয়া তাহার সমবয়স্কা মিহিরার সহিত দেখা হইয়া গেল। বিবাহের পরই সে শ্বশুরালয়ে চলিয়া গিয়াছিল, দীর্ঘ পাঁচ বৎসর পরে এই সবে ফিরিয়াছে। আজ সে যে এই দুপুরেই ঘাটে আসিবে তাহা ইতি জানিত না। সে তাহাকে দেখিয়াই পাশ কাটাইবার উদ্যোগে ছিল, কিন্তু মিহিরা তাহাকে ধরিয়া ফেলিল—"কে রে, ইতি না? তুই এখানে আছিস্, শ্বশুর বাড়ী যাস নি?"

ইতি ভারি সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল। মাথায় অত্যন্ত বাড়িয়া পড়ায় সে মেয়ের মত মাথায় কাপড় ফেলিয়া বেড়াইতে পারিত না। মাথায় কাপড় থাকায় মিহিরা তাহার সিঁথির পানে লক্ষ্য করিতে পারে নাই। সে দীর্ঘাকৃতি ছিল, কাজেই আপনাকে লুকাইয়া রাখিতে পারে নাই।

মুখখানা অন্যদিকে ফিরাইয়া সে বলিল, "শ্বশুরবাড়ী যাব কি, আমার শ্বশুরবাড়ীই নেই।"

"শ্বশুরবাড়ী নেই?" বিস্ময়ে মিহিরা ভাল করিয়া ইতির পানে চাহিল। মাথায় সিঁদুর নাই, হাতে লোহা নাই, পরণে অথচ শাড়ী। সে খানিক সংশয়ের মধ্যে সাঁতার দিয়া মুখ ফুটিয়া বলিয়া ফেলিল, "তুই বিধবা হয়েছিস?"

ইতি এবার হাসিয়া ফেলিল—"দূর, বিয়েই হয়নি, তার আবার বিধবা।"

বিয়ে হয় নি? মিহিয়ার দুই চোখ বিস্ফারিত হইয়া উঠিল, "সে আবার কি কথা? বুড়ো মাগী হ'লি এখনও বিয়ে হয়নি তোর? ও মা মা, কি লজ্জার কথা, কি ঘেন্নার কথা! তোর বয়সী আমরা, ক—বে আমাদের বিয়ে হয়ে গ্যাছে। আচ্ছা ইতি, তুই লোকের কাছে মুখ দেখাচ্ছিস্ কি করে বল তো? আমরা হ'লে ভাই, গলায় দড়ি দিয়ে এই নদীর জলে ডুবে মরতুম। আর বাবা-ই বা কি বল দেখি? সামনে এত বড় মেয়ে রেখে কোন্ মুখে ভাত গিল্‌ছে? না, বিয়ে দিলে শ্বশুরবাড়ী পাঠাতে হবে বলে বিয়ে দিচ্ছে না? যাই হোক্, ঘেন্না ধরালি ভাই, বাঙ্গালীর ঘরে এত বড় মেয়ে কক্ষনো দেখি নি তোকে ছাড়া। আমার শ্বশুরবাড়ীতে একজনদের একটা মেয়ের বিয়ে আর কিছুতে হয় না। মেয়েটা লজ্জায় মুখ দেখাতে না পেরে এই গঙ্গাতেই ডুবে মরে। কোথায় গেল ঠিক নেই, পত্রখানা মাত্র পড়েছিল। তা এই ভাল কিন্তু। যে মেয়েদের বিয়ে হয় না, তাদের চুপে চুপে গঙ্গার কোলে সরে যাওয়াই ভাল।"

গর্ব্বিত ভাবে সিক্ত বস্ত্রের ছপ ছপ শব্দ করিতে করিতে সে চলিয়া গেল। সে চলিয়া গেল বটে, কিন্তু যে কথাটা রাখিয়া গেল তাহা রহিয়াই গেল, এবং ঘুরিয়া ফিরিয়া ইতির বুকের মধ্যে বাজিয়া উঠিতেছিল।

কলসীটা পার্শ্বে রাখিয়া সে বসিয়া পড়িয়া দুই জানুর মধ্যে মুখ লুকাইয়া সেই কথাগুলিই ভাবিতে লাগিল।

বড় সত্য কথাই বলিয়া গিয়াছে সে, যথার্থ পথ দেখাইয়া দিয়াছে। বাস্তবিকই যে মেয়ের বিবাহ দিতে পারা যায় না, যাহার জন্য বৃদ্ধ পিতাকে লোকের বাক্যবাণে অবিরত বিদ্ধ হইয়া নির্নিমেষে শুধু আকাশ পানে চাহিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিতে হয়, সে মেয়ের মরণই ভাল। সে নিজেও তো বড় কম যন্ত্রণা সহ্য করে না, তাহার চোখের অশ্রুধারাও তো শুকায় না। সে অশ্রুধারা মুছিয়া দিতে পারে একমাত্র মৃত্যু, আর কেহ নয়।

কি শান্ত মরণই সে দেখাইয়া দিয়া গেল! হৃদয় যাহার জ্বলিয়া যাইতেছে, জলে সে ডুবিয়া যাক্। শীতল বারি তাহার সকল জ্বালা, সকল দুঃখ অবসান করিয়া দিবে, সে চিরতরে জলের তলে বিশ্রাম করিতে যাইবে।

শান্ত গোপনীয় বন্ধু, অতি নীরবে, অতি ধীরে তাহার প্রাণটা সে হরণ করিবে, মাটীতে দেহ থাকিবে না, থাকিবে জলে। কেহ দেখিবে না, কেহ শুনিবে না, নিঃশব্দে সেই চলিয়া যাইবে।

হাঁ, এই শান্তকেই ইতি আলিঙ্গন করিবে, পিতাকে সে রক্ষা করিবে, নিজেকে সহস্র চোখের দৃষ্টির সম্মুখ হইতে গোপন করিবে। সে এতদিন তবু কিসের আশায় বাঁচিয়াছিল, এ সহজ কথাটা কি একবারও তাহার মনে পড়ে নাই?

নিষ্ঠুর, এ জগৎটাই নিষ্ঠুর, এর অধিবাসীরা বড় নিষ্ঠুর! ইহারা বৃদ্ধ শয্যাশায়ী পিতৃ-হৃদয়ের বেদনা অনুভব করিতে পারে না, ইহারা দেশের মেয়ের লজ্জা অপমান বুঝিতে পারে না। ইহারা হৃদয় ভাঙ্গিয়া দিতে পারে, সান্ত্বনা দিতে পারে না।

নিঃশব্দে ইতির চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িল। তাহার খোঁজ না পাইয়া রোগশয্যাশায়ী পিতার অবস্থা কি হইবে তাহা সে একবার ভাবিয়া দেখিল। হায়, তাঁহাকে দেখিতে যে কেহ নাই, তাঁহার সেবা করিবার কেহ নাই। ইতি জলের গ্লাস হাতে না দিলে তিনি জল পানও করিতে পান না। আর সেই স্নেহের পুতুল ছোট ভাই মণি। সে যে দিদিকে না দেখিলে কাঁদে। দিদির কোলের মধ্যে পরম নিশ্চিন্তে সে ঘুমায়, দিদির হাতে না হইলে সে খায় না। হায়, যখন ইতি চলিয়া যাইবে, এই বালককে ও বৃদ্ধকে দেখিবে কে?

ইতি জল আনিতে আসিয়াছে, তাহারা জানিবে না সে জুড়াইবার জন্য জাহ্নবীর শীতলগর্ভে গিয়াছে। দিন চলিয়া যাইবে, সন্ধ্যার সময়ে খেলা শেষে মণি বাড়ী ফিরিয়া দিদিকে ডাকিবে, পিতা গীতা পড়িয়া শুনাইবার জন্য তাহাকে ডাকিবেন, কিন্তু কোথায় রহিবে সে তখন? সে ডাক তো তাহার কানে আর পশিবে না, সে তো আর আসিতে পাইবে না!

স্বরায় গ্রামে রাষ্ট্র হইয়া পড়িবে শুভ্রা যেমন গৃহত্যাগ করিয়া গিয়াছে, ইতিও তেমনি চলিয়া গিয়াছে। সে যে নিজের বেদনা ও পিতার বেদনা দূর করিবার জন্য চলিয়া গেছে, তাহা কেহ বুঝিবে না, তাহা কেহ জানিবে না।

সে কথা ভাসিয়া যাইবে সেই বৃহৎ ত্রিতল অট্টালিকার একটী গৃহের অধিস্বামীর কানে। কি মনে করিবে সে, কতখানি ধিক্কার দিবে তাহাকে!

ইতির চোখ দিয়া ঝর ঝর করিয়া জল ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। কিন্তু না, তাহাকে মরিতেই হইবে। জীবিত থাকিয়া কোনও প্রতিকার সে করিতে পারিবে না, পিতাকে সে রক্ষা করিতে পারিবে না।

ইতি চোখ মুছিয়া মুখ তুলিল। কি শান্ত সুনীল আকাশ, তাহার নিচে কি শান্তশীতল ভাগীরথী। গাছের ছায়া জলে পড়িয়া মৃদু হিল্লোলে কাঁপিতেছে। সূর্য্যের প্রতিবিম্ব সহস্র খণ্ডে বিভক্ত হইয়া জলে ভাসিতেছে।

ইতি একবার সামনে, পিছনে চাহিয়া দেখিল কেহ নাই। ধীরে ধীরে সে চোখ মুছিতে মুছিতে জলে নামিতে লাগিল।

একটু দূরেই একটা গাছের আড়ালে বসিয়া কমনীয় মাছ ধরিতেছিল। আজ তুষার আসে নাই, সে একা। ইতির পানে মাঝে মাঝে সে চাহিয়া দেখিতেছিল। সে যে খানিক কাঁদিল, তাহার পর জলে নামিতে লাগিল তাহাও সে দেখিতেছিল।

একবার এই সময়ে টোপ গাঁথিয়া ফেলিতে গিয়া সে চোখ দুইটা ফিরাইয়াছিল, জলে সূতা ফেলিয়া সে চাহিয়া দেখিল ইতি নাই, সে জলের মধ্যে কোথায় বিলীন হইয়া গিয়াছে, শূন্যগর্ভ কলসাটা ভাসিয়া ভাসিয়া দূরে সরিয়া যাইতেছে।

এ কি? সে কি ইচ্ছা করিয়া জলে ডুবিল?

কমনীয়ের পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত বিদ্যুৎ ছুটিয়া গেল। ছিপ ফেলিয়া সে লাফাইয়া উঠিল।

কিন্তু কই, কোথা সে? ওই না দূরে তাহার মাথাটা একবার ভাসিয়া উঠিতে দেখা গেল?

মুহূর্ত্তমধ্যে কমনীয় জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িল। অনেকটা সাঁতার দিল, মাথা তুলিয়া আবার দেখিতে লাগিল, কিন্তু না, জলের পর কেবল জলরাশি, ঢেউয়ের পর ঢেউ, কই, ইতিকে দেখা গেল না।

নিকটেই, তাহার দক্ষিণ পার্শ্বে ইতির মুখখানা ভাসিয়া উঠিতেই সে তাহাকে ধরিয়া ফেলিল, টানিতে টানিতে ঘাটের দিকে লইয়া চলিল। একটু পরেই সে ইতিকে টানিয়া ঘাটে তুলিল। তখন সে অত্যন্ত শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে ও হাঁফাইতেছে। নিজের কষ্ট তাহার লক্ষ্য করিবার সময় তখন ছিল না, সে ইতিকে দেখিতে মন দিল।

প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা পরে ইতি ধীরে ধীরে যখন চোখ মেলিল তখন তাহার চোখের সামনে কমনীয়কে দেখিয়াই সে চমকিয়া উঠিল। আনন্দে উৎফুল্ল কমনীয় জিজ্ঞাসা করিল, "এখন কেমন আছ ইতি?"

ইতি প্রথমটা উত্তর করিল না, তাহার পর ক্ষীণকণ্ঠে উত্তর দিল, "ভাল আছি।"

ধীরে ধীরে সে উঠিয়া বসিল।

কমনীয় বলিল, "একটু বাদে বাড়ী যেয়ো, এখন হাঁটতে পারবে না।"

ইতি শান্তভাবে উত্তর করিল, "বেশ যেতে পারব, আমার কিছু কষ্ট হয় নি।"

কমনীয় বলিল, "তবে চল, তোমার কলসাটা আমি পৌঁছে দিয়ে আসি। কলসী নিয়ে হাঁটা তোমার বড় কষ্ট হবে এখন।"

ইতি মলিন হাসিল, "আমি বলছি আমার কষ্ট হবে না, তবু তুমি বলতে চাও আমার কষ্ট হবে। আমি এখন ও রকম দুটো কলসী নিয়ে যেতে পারি।"

কমনীয় একটু থামিয়া বলিল, "যদি তোমার কষ্ট না হয় তুমি যেতে পার। তুমি জলে ডুবেছিলে কেন ইতি? আমি বেশ দেখেছি তুমি হঠাৎ পড়ে যাও নি, ইচ্ছে করে জলে নেমে ডুব দিলে। এর কারণ কি আমি তা' শুনতে চাই।"

ইতি উত্তর দিল না, উঠিয়া দাঁড়াইল।

কমনীয় বুঝিল সে উত্তর দিতে চায় না, তথাপি সে বলিল, "তোমার বাবা কি তোমায় কিছু বলেছেন?"

ইতি মাথা নাড়িল।

কমনীয় বলিল, "তবে গ্রামের লোকে যা বলে তাই বলেছে। তোমার বিয়ে হয়নি এই অপরাধে তারা যে তোমাদের যা-ন্যা-তাই বলে যাচ্ছে তা আমি শুনেচি। আমার বিশ্বাস, সেই সব কথা হ'তে পরিত্রাণ পেতে জলে ডুবে মরতে এসেছিলে তুমি, কেমন?"

ইতির চোখের জলই তাহার বিশ্বাসের সত্যতা প্রতিপন্ন করিল।

কমনীয় সান্ত্বনার সুরে বলিল, "তুমি পাগল হয়েছ, তাই পরের কথা শুনে মরতে এসেছ। যদি যথার্থ মানুষ হ'তে পারতে, ও সব কথা হেসে উড়িয়ে দিতে পারতে। নিন্দের ভয়ে লুকিয়ে বেড়াও জানি, কিন্তু কেন সে গোপনতা? তুমি যত গোপন হতে যাবে ওরা ততই তোমার নিন্দে করবার অবকাশ পাবে। আমার মতে একেবারে প্রকাশ হয়ে যাও, দীনভাব যেন তোমার মধ্যে না থাকে। কি হাস্যকর কথা এটা ভেবে দেখ দেখি। তারা তোমায় নিন্দে করেছে, তাই তুমি আত্মহত্যা করতে এসেছ? মানুষ তুমি, তাই প্রতিপন্ন কর। ভগবান তোমায় কিছু দিতে কার্পণ্য করেন নি, কিন্তু তুমি তা ঠিক মত ব্যবহার করতে পারছ না। মরে গেলেই জগতে তোমার মস্ত হার হয়ে গেল। বেঁচে থেকে যুদ্ধ কর, শত্রুকে জয় কর, ভগবান তোমায় যা' দেছেন তার সদ্ব্যবহার কর। ছি ছি, অমন কল্পনা মনেও এনো না। কখনও কারও কাছে প্রকাশ কর না তুমি মরতে এসেছিলে, আমিও জীবনে কারও কাছে একথা প্রকাশ করব না প্রতিজ্ঞা করছি। একথা লোকে শুনলে আরও হাসবে যে। ছেলেমানুষী কোর না, বুঝে চলতে শেখো। যারা তোমায় নিন্দা করে, করুক নিন্দা, তুমি মনে স্ফূর্ত্তি রাখো, মনকে সবল রাখো। যাও, এখন বাড়ী যাও, আর এখানে থেক না; কেউ এসে পড়বে।"

কলসীটা জলে ভরিয়া সে উপর পর্য্যন্ত উঠাইয়া দিল। ইতির হৃদয় কৃতজ্ঞতায় আর্দ্র হইয়া উঠিয়াছিল, সে আর একটা কথাও বলিতে পারিল না।

কমনীয় যে এমন জ্ঞানপূর্ণ উপদেশ দিতে জানে তাহা সে জানিত না। নাস্তিক কমনীয়ের মুখে ঈশ্বরের নাম ও তাহার ঈশ্বরে বিশ্বাস যথার্থই বড় বিস্ময়ের কথা।

সে একবার ফিরিয়া দেখিল কমনীয় তখনও দাঁড়াইয়া আছে, তাহাকে ফিরিতে দেখিয়া তবে সে বাড়ী যাইবে। ইতি মুখ ফিরাইয়া লইয়া ধীরে ধীরে বাড়ী চলিল। আর একবার মুখ ফিরাইয়া দেখিল কমনীয় চলিয়া গিয়াছে।

(১৩)

ইতি যে জলে ডুবিয়া মরিতে গিয়াছিল তাহা কমনীয় কাহারও কাছে প্রকাশ করে নাই, ইতিও প্রকাশ করে নাই।

ধীরে ধীরে জ্যৈষ্ঠ মাস গত হইল, আষাঢ় মাস আসিয়া পড়িল, ইতি অষ্টাদশ বৎসরে পড়িল। সমাজ তাহার পানে চাহিয়া ঘৃণায় শিহরিয়া উঠিল।

আকাশে সেদিন বর্ষার মেঘ স্তরে স্তরে সাজিয়া আসিয়াছে। চারিদিকেই কেবল মেঘের নিবিড়তা। ধরার বুকে সন্ধ্যার আগেই সন্ধ্যার কালো ছায়া নামিয়া আসিল। বৈকালে খুব খানিকটা বৃষ্টি হইয়া গিয়া খানা ডোবায় খানিকটা করিয়া জল বাড়িয়াছিল। ভেককুল মহা আনন্দে ঘ্যাঁ ঘোঁ শব্দে গান ধরিয়াছিল।

ইতি রন্ধনগৃহে ভাত চাপাইয়া দিয়া সিক্ত বারাণ্ডায় আসিয়া একখানা পিঁড়ি টানিয়া লইয়া বসিয়া মেঘের ও চপলার খেলা দেখিতে লাগিল। ঘন কালো মেঘের কোলে স্বর্ণাপেক্ষা উজ্জ্বল সৌদামিনীর খেলা দেখিতে সে বড় ভালবাসিত।

ও ঘরে মণি উচ্চকণ্ঠে নিজের পড়া তৈয়ার করিতেছিল, পিতা আপন মনে গুণ গুণ করিয়া সুর ভাঁজিতেছিলেন।

দ্বারের নিকট হইতে একটা কণ্ঠস্বর শুনা গেল, "শ্রীপতি—ওহে শ্রীপতি, বলি বাড়ী আছ কি?"

ইতি শয়নকক্ষে গিয়া বলিল, "বাবা, মুখুয্যে মশাই তোমায় ডাকছেন।"

শ্রীপতি বাবু বলিলেন, "আলোটা ধরে নিয়ে আয় আমার কাছে।"

ইতি রন্ধনগৃহের ল্যাম্প আনিতেছিল, সেই সময় শ্যামাপদ মুখো আবার হাঁক দিলেন, "ওহে শ্রীপতি—"

অগ্রসর হইয়া ইতি শান্তকণ্ঠে বলিল, "আসুন, বাবা আপনার ডাক শুন্‌তে পেয়ে আমায় আপনাকে নিয়ে যাবার জন্যে পাঠিয়ে দিলেন। তিনি ঘরে আছেন।"

শ্যামাপদ বাবুর সহিত আর একটি অপরিচিত যুবক ছিল। শ্যামাপদ বাবু তাহাকে ডাকিয়া অগ্রসর হইতে হইতে বলিলেন, "কি কর্‌ছেন তিনি ?"

ইতি নত মুখে উত্তর করিল, "শুয়ে আছেন। বাতের জন্যে তিনি খুব কম সময়ই উঠতে পারেন, আর রোজই একটু করে জ্বর হচ্ছেই।"

সে একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিল।

শ্যামাপদ বাবুকে ও সেই অপরিচিত ভদ্রলোককে বারাণ্ডায় উঠাইয়া দিয়া সে রন্ধনগৃহে চলিয়া গেল।

কাদামাখা জুতা জোড়া পা হইতে খুলিতে খুলিতে শ্যামাপদ বাবু গৃহমধ্যে উঁকি দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন আছ হে শ্রীপতি ?"

শ্রীপতি বাবু যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া উঠিয়া বসিলেন, দুই হাত কপালে ছোঁয়াইয়া বলিলেন, "কি সৌভাগ্য আমার, আসুন আসুন, বস্‌তে আজ্ঞা হোক্। মণি, পড়া এখন রাখ বাবা, দু'খানা আসন চট্ করে পেতে দে আগে।"

মণি আসন দু'খানা আনিয়া পাতিয়া দিল।

গম্ভীর মুখ আগন্তুক যুবক একখানা আসন অধিকার করিলেন, শ্যামাপদ বাবু আর একখানা আসনে বসিয়া বলিলেন, "আসবার কি আর যো আছে ? বিকেলেই আসতুম, তা সে যে জল, তা তো জানোই ? এ বছরটায় এমন তোড়ে জল কোনও দিনই হয় নি। ভাল ঘরের ছাদ দিয়ে পর্য্যন্ত আজ জল পড়েছে, ভাঙ্গা চুরো ঘর তো দূরের কথা। বৃষ্টিটা ঘণ্টা খানেক বাদে ধরলেও পথে এক হাঁটু জল। সে জলগুলো সরলো তো কাদা। পাশ দিয়ে দিয়ে যদিও এসেছি, তবু জুতো জোড়াটা একেবারে গ্যাছে। যাক্, তোমার শরীর কেমন ?"

বিষণ্ন সুরে শ্রীপতি বাবু বলিলেন, "আর শরীর ! এ ক্ষণভঙ্গুর দেহটা এখন গেলেই আমি বাঁচি। যত দিন যাচ্ছে তত কেবল খারাপই হচ্ছে, ভাল একদিনও যায় না। সমস্ত দেহে বাত,হাত পা নাড়তে গেলে ঝিন্ ঝিন্ করে ওঠে, রোজ জ্বর হচ্ছে। আর সহ্য করাও যায় না, মরণও আমার হয় না !"

বিজ্ঞ চিকিৎসকের ন্যায় মাথা নাড়িয়া শ্যামাপদ বাবু বলিলেন, "বটে ? যাক্, খাচ্ছ কি ? ওষুধ পত্র—"

শ্রীপতি বাবু বলিলেন, "ঢের খেয়েছি, এখন আর খেতে পারি নে।"

শ্যামাপদ বাবু বলিলেন, "খেতে পার না বলে অমনি ছেড়ে দিলে ? কথাতেই আছে যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ আশ। তুমি একেবারে আশা ছেড়ে দিয়ে বস্‌লে চল্‌বে কেন ? এই অপোগণ্ড ছেলেটা আছে, ওই কুমারী মেয়েটা আছে, তুমি চলে গেলে এদের সব দেখবে কে ? শোন হে, মরণকে ইচ্ছে করে ডেক না, ও সব ছেলেমানুষী ছেড়ে দাও, যাতে ভাল হয়ে উঠতে পার, মেয়েটার বিয়ে দিয়ে, ছেলেটাকে একটা মানুষ করে যেতে পার তারই চেষ্টা কর।"

আরও চেষ্টা ? মৃত্যু আসিয়া ক্রমে ক্রমে কাছে পৌঁছিয়াছে, তাহার শীতল জড়কারী নিশ্বাস শ্রীনাথের দেহে লাগিয়াছে, এখনও আশা করিতে হইবে, এখনও বাঁচিতে প্রাণপণ চেষ্টা করিতে হইবে ? শ্রীনাথের মুখে একটু হাসি খেলিয়া গেল। তিনি বলিলেন, "যার উপায় সেই করে, আপনি আমি কি কর্‌তে পারি মুখুয্যে মশাই ? জীব দেছেন যিনি, আহারও দেবেন তিনি, তরিয়েও নিয়ে যাবেন তিনি। আমি মরে গেলে তিনিই দেখবেন যিনি এখনও দেখছেন। এই যে উত্থানশক্তি রহিত হয়ে পড়ে আছি, ওদের দেখতেও পারছিনে, কিছু করতেও পারছিনে, তিনিই তো সব দেখছেন।"

একান্ত ভক্তের মতই কথা বটে। শ্রীনাথ বাবু চোখ মুদিয়া একবার হৃদয়ের মধ্যস্থিত সেই জ্যোতির্ম্ময় আলো-রেখাটী অনুভব করিয়া রহিলেন।

একটুখানি নীরব থাকিয়া শ্যামাপদ বলিলেন, "তা বটে, কিন্তু সেই নির্ভর করে থাকাটাই ভারি শক্ত কাজ। যাক, খাওয়া-দাওয়া চলছে কেমন ?"

শ্রীনাথবাবু একটু হাসিয়া বলিলেন, "তেমনিই।"

শ্যামাপদবাবু বলিলেন, "সংসার ?"

শ্রীনাথবাবু বলিলেন, "কলকাতার কয়েকটী বন্ধু মিলে মাসে কুড়ি টাকা করে পাঠিয়ে দেন, তাঁদের দয়ায় সংসারের ভাবনা এখনো ভাবতে হয় নি।"

খানিকক্ষণ গৃহখানি নিস্তব্ধ রহিল। সেই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া শ্রীনাথবাবু বলিলেন, "যাক, আমার নিজের কথা নিয়েই এতক্ষণ কেটে গেল, আপনার কথা কিছুই শুনতে পেলুম না। এই বৃষ্টি বাদলার দিনে সন্ধ্যেবেলায় আমার কাছে কি দরকার আপনার, কাল দিনের বেলা আসলেও তো হতো? এ ভদ্রলোকটী কে?"

আগন্তুক ভদ্রলোক বিরাট গুম্ফে একবার হাত বুলাইয়া গৃহের অন্তদিকে চাহিলেন। অকস্মাৎ যেন চেতনা পাইয়া শ্যামাপদবাবু বলিলেন, "হাঁা, হাঁা; সেকথা বলতে ভুলে গেছি, নানা কথায় থাকলে মনটা এমনিই হয় বটে। বিশেষ —মানুষের দুঃখ কষ্টের কথা শুনলে আমার মোটে জ্ঞানই থাকে না। নিজের সংসারটাই আমার এমনি করে' বয়ে গেল।"

খানিকক্ষণ মাথায় হাত বুলাইয়া তিনি বলিলেন, "একটা কাজের জন্যেই আমি এসেছি। লোকের যাতে উপকার হয় তার জন্যে আমি আমার প্রাণ দিতে পর্য্যন্ত প্রস্তুত। তোমার এই দুঃখ কষ্ট, মনে কর না যে অন্য লোকের মত আমিও নাকে তেল দিয়ে ঘুমুই। যাতে তোমার মেয়েটীকে এখন পার করতে পার, তার চেষ্টা আগে, তারপর আর সব। মণি পুরুষ ছেলে, যেমন তেমন করে' মানুষ হয়ে যাবেই, ওর জন্যে ভাবনা করবার কিছু দরকার দেখছি নে। তোমার মেয়েটী এই সতের আঠারো বছরের হ'ল, না?"

শ্রীনাথবাবু হিসাব করিয়া বলিলেন, "এই আঠার বছরে পড়ল।"

শিহরিয়া শ্যামাপদবাবু বলিলেন, "সর্ব্বনাশ! যে বয়সে আমাদের দেশের মেয়েরা দু' ছেলের মা হয়, সেই বয়সে তোমার মেয়ে কুমারী। তা, এতে তোমার দোষ নেই, পাত্র জুটাতে না পারলে তুমি আর কি করবে বল। আর আজকাল ছেলের বাপ মায়ের যে খাঁই, ছেলেরও যে উঁচু নজর, তোমার মেয়ের বিয়ে হওয়াই মুস্কিল।"

শ্রীনাথবাবু একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "আমি নিজে শয্যাশায়ী, নচেৎ চেষ্টা করলে এতদিন যেমন করেই হোক বিয়ে দিতে পারতুম। আমি বড়লোক কুটুম্ব চাই নে, বড় চাকরে, কিম্বা বি, এ, এম, এ ছেলে চাই নে। নিজের স্ত্রীর ভরণপোষণ করতে পারে এমনি সাধারণ একটী ছেলে চাই। কি করব, যদি নাই পাওয়া যায়, মেয়ে আমার না হয় আজীবন কুমারী হয়ে থাকবে।"

মুখের কথা লুফিয়া লইয়া শ্যামাপদবাবু বলিয়া উঠিলেন, "কুমারী হয়ে থাকবে? তাই বা থাকবে কেন, আমরা থাকতে দেব কেন? যতক্ষণ আমরা আছি, কিছু ভাবনা নেই তোমার। আমি পাত্র ঠিক করেছি, তোমার মত পেলে এই মাসেই বিয়ে দিয়ে ফেলি। বিয়ের জন্যে আবার ভাবনা?"

শ্রীনাথবাবু যেন অকূল সাগরে কূল পাইয়া গেলেন, গদগদকণ্ঠে বলিলেন, "যদি তা করেন, তা'হলে যথার্থ আমি বেঁচে যাই। আমার এমন অবস্থা হয়েছে যে, লোকের কাছে আর মুখ দেখাতে পারছি নে, মেয়েটা পথে ঘাটে যাওয়া একেবারে ছেড়ে দেছে। যদি আপনার দয়ায়—"।

মুরুব্বিয়ানা চালে হাসিয়া শ্যামাপদবাবু বলিলেন, "আমার দয়া বল না। এই ভদ্রলোক—সুরেনবাবু, এঁকেই আমি বলছি ইতিকে বিয়ে করবার জন্যে। তোমার যা' কিছু কথাবার্ত্তা তুমি এঁর সঙ্গে বলতে পার। এমন পাত্র তুমি আর পাবে না তা আমি বলে দিচ্ছি।"

মণি এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া এই ভদ্রলোকের বিশাল বিরাট চেহারাখানির পানে চাহিয়াছিল। এমন নিকষ কালো রঙ যে মানুষের থাকিতে পারে তাহা তাহার ধারণারও অতীত। গুম্ফটীও বিশাল, তাহা আবার দুই দিকে উঁচু হইয়া উঠিয়াছে। সামনের দুগ্ধশ্বেত দুটি বড় বড় দাঁত সর্ব্বদাই বাহির হইয়া রহিয়াছে। অত্যন্ত স্থূলকায় ভদ্রলোক, মণি ঠিক জানিল এত মোটা ভদ্রলোক য'দ তাহাদের মাষ্টার হইত, চেয়ারে বসিতে পাইত না। এই লোকের সঙ্গে তাহার দিদির বিবাহ হইবে শুনিয়াই তাহার সমস্ত মনটা বিরক্তিতে ভরিয়া উঠিল।

পাত্রের পানে চাহিয়া শ্রীনাথবাবু খানিক নীরব হইয়া

রহিলেন, তাহার পর জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইনি কি কাজ করেন্?"

শ্যামাপদবাবু সদর্পে উত্তর করিলেন, "ইনি সিঙ্গাপুরের এক কোম্পানীর ম্যানেজার, মাইনে মাসে পাঁচশো।"

শ্রীনাথবাবু বলিলেন, "সংসারে আর কেউ আছেন কি?"

শ্যাম্যপদবাবু বলিলেন, "কেউ নেই, সেইজন্যেই ইনি বয়স্থা মেয়ে বিয়ে করতে চান। মাথার উপর কেউ ছিল না যে বিয়ে দেয়। আমারই এক বন্ধুর ছেলে হে, ওদের আমি বিশেষ করে চিনি। কলকাতায় সেদিন গিয়ে হঠাৎ দেখা হয়ে গেল। বাবাজি তো দেশে থাকেন না, চিরটা-কাল বিদেশেই কেটে গেল। জিজ্ঞাসাবাদ করে' জানতে পারলুম বাবাজি আজও কুমার। আমার মনে তোমার মেয়ের কথাটা জেগে উঠল, ভাবলুম, তোমরাও কায়স্থ, বাবাজিও কায়স্থ। বিয়েটা হ'লে তুমিও বাঁচ, বাবাজিও ঘরের মেয়ের হাতের রান্না ভাতটা খেয়ে, একটা সেবা পেয়ে বাঁচেন। এই সব নানারকম ভেবে বাবাজিকে বলায়, বাবাজি তো কিছুতেই রাজি হন না। অনেক করে' বুঝিয়ে সুঝিয়ে তবে কতক রাজি করেছি। যাই হোক, বিয়েটা যদি দাও, মেয়েটা চিরকাল রাণীর মত সুখে থাকবে, তোমার মণি পর্য্যন্ত সেখানে থেকে একটা মানুষ হয়ে যাবে। আর বিয়ে দিতে তোমার একটা পয়সা খরচ নেই। এ বিয়েতে আমিই পুরুত হব, বাবাজি যা' খুসি হয়ে দেন, তাই; তোমার কাছ হ'তে এক পয়সাও আমি নেব না। ভেবে দেখ, তোমার যা' মত হয় তা খুলে বল। আমার মতে এমন পাত্র আর তুমি খুঁজে পাবে না।"

শ্রীনাথবাবু অনেকক্ষণ নীরব রহিলেন, তাহার পর বলিলেন, "আজ হঠাৎ আমি কিছু বলতে পারছি নে, কাল সকালে এর উত্তর দিলে হবে না কি?"

শ্যামাপদ বাবু বলিলেন, "হবে না কেন, খুব হবে। যদিও বাবাজি বলছিলেন কাল সকালেই রওনা হবেন, তা না হয় বিকেলেই যাবেন। মেয়েটীকে কাল দিনের বেলা একবার ভাল করে দেখে শুনে যদি বিয়ের ঠিকই হয়ে যায়, বিয়ে করে নিয়ে যাবেন। কি বল বাবাজি, এইটেই কি ভাল হবে না?"

বাবজি মাথা কাত করিলেন, কথা কহিবেন না, কারণ তিনি বিবাহের মূল, তিনি বর।

শ্যামাপদ বাবু একটা আড়ামোড়া দিয়া, হাই তুলিয়া, গোটাকত তুড়ি ঠুকিয়া বলিলেন, "তাহ'লে আজ আসি শ্রীনাথ, রাত অনেক হয়ে এল। আকাশে মেঘও করেছে বেজায় রকম, বৃষ্টি এসে পড়লে যাওয়া এরপর দুষ্কর হবে। কাল সকালে বাবাজিকে নিয়ে তা হ'লে আসব, তোমার যা' মত হয়, সেই সময় বাবাজির সামনেই বোলো। কন্যাকর্ত্তা বরকর্ত্তা তোমরাই, আমি পুরুত মাত্র, মন্ত্র পড়ে দুটো হাত শুধু এক করে দিয়ে যাব।"

নিজের রসিকতায় নিজেই অত্যন্ত প্রীত হইয়া তিনি অস্বাভাবিকরূপে হাসিয়া উঠিলেন। বাবাজির দাঁত সব-গুলিই একবার মেঘের কোলে চপলার হাসির মত বাহির হইয়া তখনই দুইটি বাদে সব ঢাকিয়া গেল। শ্রীনাথ বাবুর মুখ তখন বড় গম্ভীর ছিল, তাঁহার মুখে হাসি দেখা গেল না।

ভদ্রলোক দুজন গাত্রোত্থান করিলেন। শ্রীনাথ বাবু মণিকে বলিলেন, "আলোটা ধরে বাইরের দরজাটা এঁদের পার করে দিয়ে আয় মণি।"

আলো ও ভদ্রলোক দুটিকে লইয়া মণি চলিয়া গেল। শ্রীনাথ বাবু শুইয়া পড়িয়া ভাবিতে লাগিলেন।

এ পাত্র তাঁহার কোনও মতে পছন্দ হইতেছিল না। একে বিভীষণ চেহারা, তাহার উপর পাত্র একেবারে সুদূর সিঙ্গাপুরে কাজ করে শুনিয়া তাঁহার মন দমিয়া গিয়াছিল। সেখানে সে কি কাজ করে কে জানে। পাঁচশত টাকা মাহিনা, কিন্তু কুড়ি টাকাও পায় যদি তাহাও ভাল। আরও তিনি বিশেষ লক্ষ্য করিয়া তাহার মুখে ছলনা ও কুটিলতার রেখা দেখিতে পাইয়াছিলেন। সে যেন দুখ আবরণের আড়ালে নিজেকে লুকাইয়া আছে, সেখান হইতে তাহাকে বাহির করা অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার।

গরম দুধের বাটি ও একগ্লাস জল লইয়া দেবকন্যার ন্যায় অপরূপ সুন্দরী ইতি আসিয়া তেমনি কোমল স্নিগ্ধ সুরে ডাকিল "বাবা।"

পিতা চোখ মেলিলেন। এই নিসর্গ সুন্দরীর পার্শ্বে

সেই ভীষণাকার জামাতা, সে কি মানায়? এ যে স্বর্গের পারিজাত, ছলনা জানে না, কপটতা জানে না, এ যে দেবতারই পূজার যোগ্য, অসুরের তো নয়।

ইতি ভাবিল পিতা ঘুমাইতেছেন। দুধের বাটি ও জলের গ্লাস নামাইয়া সে পিতার গায়ে হাত দিয়া ডাকিল "বাবা, ওঠ, দুধ জুড়িয়ে যাচ্ছে যে।"

"দুধ এনেছিস্ মা?" শ্রীনাথ বাবু উঠিবার চেষ্টা করিলেন, ইতি তাঁহাকে সন্তর্পণে বসাইয়া দুধের বাটি মুখে ধরিল।

দুধ ও জল খাইয়া শ্রীনাথ বাবু বলিলেন, "আজ শ্যামা-পদ বাবু কেন এসেছিলেন শুনেছিস্ কি মা?"

ইতি অঞ্চলে পিতার মুখ মুছাইয়া দিয়া বলিল, "শুনেছি বাবা।"

শ্রীনাথ বাবু চিন্তাকুল ভাবে বলিলেন, "তারা আবার কাল সকালে আমার মত জান্‌তে আস্‌বে। কি যে করি ভেবে পাচ্ছিনে। যদি না রাজি হই, শ্যামাপদ বাবু রটিয়ে দেবে আমি পাত্র পাওয়া সত্ত্বেও মেয়ের বিয়ে দিলুম না, এতে সমাজ নিশ্চয়ই আমায় একঘরে কর্‌বে। এতদিন যে করেনি সে কেবল আমার শয্যাশায়ী থাকার জন্যে পাত্র খুঁজতে পারিনি, তাই। এবার সে আমার কোনও মতে ক্ষমা করবে না। অথচ সেই পাত্রের হাতে—বাপ হয়ে কি করে যে তোকে সমর্পণ করব, তা আমি ভেবে পাচ্ছিনে। সে যে একটা পিশাচ রাক্ষস—। না ইতি, সমাজচ্যুত হই সেও ভাল, তবু নিজের চোখে দেখে তার হাতে আমি তোকে সঁপতে পারব না, তুই চিরকুমারী হয়ে থাক্। যখন তোর এই বুড়ো বাপটা মরে যাবে, তখন কেউ ফেল্‌তে না আসে, তোরা দুই ভাই বোনে আমায় টেনে নিয়ে গিয়ে গঙ্গার জলে ফেলে দিয়ে আসিস্।"

ইতি শান্ত চোখের দৃষ্টি পিতার মুখের উপর স্থাপন করিয়া বলিল, "না বাবা, তা হবে না। ওই লোকটার সঙ্গেই আমার বিয়ে দিন, আমি কুমারী হয়ে থাকব না।"

সে যে কেন বলিতেছে বিবাহ করিব তাহা বুঝিয়া পিতৃহৃদয় ব্যাকুল হইয়া উঠিল, বলিলেন, "ওই ভয়ানক জানোয়ারটাকে বিয়ে করবি মা?"

ইতি তেমনি শান্তকণ্ঠে বলিল, "বাবা, মানুষ উপরে দেখতে ভয়ানক হ'লেও তার মধ্যে স্নেহশীল সরল হৃদয় তো থাকতে পারে।"

পিতা একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "তা থাকতে পারে। আমি আমার চোখ দিয়ে তার মুখে যে ছায়া দেখেছি, সেটা হয় তো আমারই মনের ভুল। তুই যদি নিজে ইচ্ছে করে বিয়ে করিস্ ইতি—"

ইতি দৃঢ় কণ্ঠে বলিল, "হ্যাঁ বাবা, আমি নিজে ইচ্ছে করেই বিয়ে করব। যদি এতে ভাল ফল হয়, সে আমারই ভাল; যদি মন্দ হয়, তাতেও তোমায় দোষ দেব না বাবা।"

পিতার চোখে জল আসিয়া পড়িল, তিনি কন্যার মাথায় স্নেহপূর্ণ হাতখানা বুলাইয়া দিতে দিতে বলিলেন, 'তবে তাই হবে মা, কাল আমি স্পষ্ট মত দেব। তুই যখন জেদ করে বিয়ে করতে চাচ্ছিস্, তোর বুড়ো জীর্ণ বাপটাকে সমাজের কঠোর দৃষ্টি হ'তে রক্ষা করবার জন্যে যখন তোর এতটা আগ্রহ, তখন কেন আমি বাধা ডেকে আনব? মাতৃহীনা কন্যা আমার, তুই যাতে সুখী হবি, তোর বাপের তাতে সুখ হবে বই দুঃখ হবে না।"

ইতির চোখ ছল ছল করিতে লাগিল। অতিকষ্টে সে অশ্রু সামলাইয়া মণিকে ডাকিয়া ভাত খাইতে গেল।

ক্রমশঃ।

টুর্গেনিফ্।

[শ্রীমতী নীহারবালা নাগ চৌধুরী]

কাউণ্ট লিও টলষ্টয় সম্বন্ধে আলোচনা কালে প্রথিত-নামা কবি ও সমালোচক ম্যাথু আর্ণল্ড বলিয়াছেন যে ঐরূপ শক্তিশালী আর একজন রুশিয় লেখকের আবির্ভাব হইলে সমস্ত সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তিকে রুশিয় ভাষা শিক্ষা করিতে হইবে। আর্ণল্ডের অনুমান সত্যে পরিণত হইয়াছে, রুশিয় সাহিত্য-জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে, কিন্তু যে প্রতিভাশালী সাহিত্যিকের বিষয় এখানে লেখা হইতেছে, রুশিয়ায় জন্মগ্রহণ করিলেও তিনি ফরাসী ভাষায় তাঁহার রচনাগুলি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ভাষা বিভিন্ন হইলেও তাঁহার বিষয়গুলি সমস্তই রুশিয় এবং দেশীয় ভাবের প্রেরণায় লিখিত। টুর্গেনিফ্ অভিজাত হইলেও তাঁহার বাল্যকাল শ্রান্ত কৃষকের দারিদ্র্যময় জীবনের লীলাভূমি রুশিয় পল্লীতে অতিবাহিত হয় এবং তাঁহার লেখায় রুশিয় জন-মজুরের যে চিত্র দেখিতে পাওয়া যায় তাহা তাঁহার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা-প্রসূত বলিয়াই এত নিখুঁত। টুর্গেনিফ্ ব্যাল্জ্যাকের * জন্মের ঊনবিংশ বর্ষ পরে ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে রুশিয়া দেশে জন্মগ্রহণ করেন। তখন কেহ স্বপ্নেও ভাবে নাই যে ইহাঁরই রচনা নিদ্রামগ্ন রুশ সমাজে কি বিপুল চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিয়া যুগান্তর আনয়ন করিবে। টুর্গেনিফ্ ঠিক বিপ্লববাদী ছিলেন না, কিন্তু যে অসন্তোষ হইতে রুশিয়ায় ধ্বংসবাদী, বিপ্লববাদী, সমাজপন্থী, সাম্যবাদী প্রভৃতি রাজনৈতিক সম্প্রদায়ের উদ্ভব, সেই অসন্তোষের বীজ যে সমস্ত লেখক অত্যাচার-জর্জ্জরিত মোহ নিদ্রামগ্ন শ্রান্ত হৃদয়ে বপন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে টুর্গেনিফ্ প্রধান। সাম্যবাদী বল্‌শেভিক্ শাসিত রুশিয়ার সম্বন্ধে যে অল্পবিস্তর অতিরঞ্জিত চমকপ্রদ সংবাদ আজ সভ্যদেশের মানবের মনে ভয় ও ঘৃণার উদ্রেক করিতেছে, দূর ভবিষ্যতে নিরপেক্ষ ঐতিহাসিক হয়ত তাহার সারতত্ত্ব নিরূপণ করিতে পারিবেন, কিন্তু ফরাসী রাষ্ট্রবিদ্রোহের ইতিহাসে যে ভীষণ অশান্তি ও রক্তস্রোতের মধ্য দিয়া অত্যাচার-জর্জ্জরিত ফরাসী জাতিকে বিষময় যথেচ্ছাচার শাসনপ্রণালী হইতে মুক্তিলাভ করিতে হইয়াছিল, রুশিয়ায় বর্ত্তমানকালে বোধ হয় তদ্রূপ উৎকট বিষময় প্রতিষেধকের আবশ্যক হয় নাই।

টুর্গেনিফ্‌কে ষোড়শ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে, বিদ্যাশিক্ষার জন্য প্রথমে মস্কো পরে সেণ্টপিটারস্‌বর্গে পাঠান হয়। তৎপরে বার্লিনে দর্শনশাস্ত্র পাঠ কালে তাঁহাকে কিছুকাল বিখ্যাত ধ্বংসবাদী বাকুনিনের সঙ্গে একসঙ্গে কাটাইতে হইয়াছিল। রুশিয়ায় ফিরিয়া তিনি কিছুকাল আপন জমিদারীতে শিকার করিয়া বেড়ান, এবং তাহার পরই বিদেশ পর্য্যটন কালে তাঁহার "শিকার কাহিনী"তে উরাল-বাসী কৃষকের অজ্ঞান তমসাচ্ছন্ন, দারিদ্র্যপূর্ণ ও অশান্তিময় জীবনের প্রকৃত চিত্র প্রকাশিত হয়। তিনি ইহাতে রুশিয় দাস-প্রথার কুফল নির্ভয়ে সর্ব্বজন সমক্ষে প্রকাশ করেন এবং অলস, সুরুচিবর্জ্জিত, বিলাসপরায়ণ রুশিয়ার অভিজাতশ্রেণীর বৈচিত্র্যহীন জীবন যাপন প্রণালীর আলোচনা করেন। এই পুস্তক প্রকাশের ফলে রুশিয়ার চিন্তাশীল ব্যক্তিদের মধ্যে প্রবল আন্দোলনের সূত্রপাত হয় এবং বহুকাল হইতে বদ্ধমূল এই জঘন্য দাস-প্রথার বিরুদ্ধে শিক্ষিত জনমণ্ডলী উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠেন। শিক্ষিত সমাজে এই পুস্তকের অত্যধিক আদর দেখিয়া রাজশক্তির শ্যেনদৃষ্টি তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং তাঁহার দ্বিতীয় পুস্তক প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বেই রাজকর্ম্মচারীরা তাহাতে রাজ-বিদ্রোহের গন্ধ পাইয়া তাঁহাকে তাঁহার জমিদারীতে নির্ব্বাসিত করেন। নজরবন্দী অবস্থায় মৃগয়া ও পুস্তক রচনা এই দুইটিমাত্র তাঁহার চিত্তবিনোদনের উপায় ছিল এবং "মুমু," "রাজপথের পান্থশালা" প্রভৃতি দাসজীবনের সকরুণ চিত্রগুলি এই সময়েই লিখিত হয়। ইতিমধ্যে

---

* এই বর্ষের ৭০ পৃষ্ঠায় ব্যালজ্যাকের গ্রন্থ-তালিকায় ভ্রমক্রমে "লা ডিবেকল" সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, কিন্তু উহা জোলার লিখিত, ব্যালজ্যাকের নহে।

সম্রাটপুত্র তাঁহার মৌলিকত্বপূর্ণ নির্ভীক রচনায় তাঁহার প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার মুক্তির জন্য যত্নশীল হয়েন এবং তাঁহারই আগ্রহ ও চেষ্টায় টুর্গেনিফ্ মুক্তিলাভ করেন। ইহার অব্যবহিত পরেই সম্রাট নিকোলাস ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হন, কিন্তু টুর্গেনিফের নিকট রাজধানীর রাজনৈতিক আবহাওয়া অত্যন্ত দূষিত বলিয়া বোধ হওয়ায় তিনি রুশিয়া পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। ইহার পর তিনি ইটালী, ফরাসীদেশ, জার্ম্মানী প্রভৃতি সকল দেশেই কিছুকাল বাস করিয়াছিলেন, কিন্তু কার্য্যব্যপদেশে মধ্যে মধ্যে রুশিয়ায় ফিরিলেও তথায় স্থায়ীভাবে আর বাস করেন নাই। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে তিনি বেডেনে বাস করিতে থাকেন এবং তথায় অবিবাহিত অবস্থায় প্রিয়বন্ধু গার্সিয়াসের সাহচর্য্যে সাহিত্যচর্চ্চাতেই তাঁহার জীবন অতিবাহিত হয়।

রাজশক্তির ভ্রুকুটিতে তিলমাত্র সঙ্কুচিত না হইয়া টুর্গেনিফ্ স্বাধীনভাবে আমতোৎসাহে আপনার মত প্রচার করিতে থাকেন। তাঁহার সুলিখিত গল্পগুলিতে তিনি দেখাইয়াছেন যে রুশিয় কৃষকের হৃদয়ে, দয়া ধর্ম্ম প্রভৃতি মৌলিক সৎপ্রবৃত্তিগুলি এখনও বিশেষরূপে জাগ্রত। অত্যাচার-পীড়িত, হীন আবেষ্টনের মধ্যে তাহাদের নৈতিক জীবনের বিশেষ মার্জ্জিত বা উন্নত অবস্থার আশা করা বাতুলতা। অতি দীন কৃষকও স্বদেশ, সম্রাট ও ধর্ম্মের জন্য আত্মবলি দিতে সর্ব্বদা প্রস্তুত, কুসংস্কারাচ্ছন্ন ধর্ম্ম-জীবনের মধ্যেও তাহাদের মন মুক্তিপ্রয়াসী জ্ঞানীর ন্যায় মোক্ষলাভের সমস্যার সমাধানে তৎপর, তাহাদের কৌতুক-প্রিয়তা, আতিথেয়তা এবং প্রাচ্যজাতির বিশেষত্ব, তাহাদের অদৃষ্টবাদিতা সমস্তই টুর্গেনিফ্ বিশেষভাবে দেখাইয়া গিয়াছেন। তাঁহার লেখা পড়িলে মনে হয় তিনি আগাগোড়াই রুশ কৃষকদের প্রতি বিশেষ সহানুভূতিশীল। তিনি এত অত্যাচারের পরও তাহাদের মধ্যে এত সদ্গুণের অস্তিত্ব দেখিয়া বিস্ময়ান্বিত হইয়াছেন এবং তাহাদেরই রুশসাম্রাজ্যের প্রধান ভিত্তি ও অবলম্বন বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন। রুশিয়ার ভূস্বামীবর্গের সম্বন্ধে তাঁহার মত সম্পূর্ণ বিপরীত, তিনি দেখাইয়াছেন যে মার্জ্জিত রুচি ও সভ্যতার দাবী সত্বেও তাঁহাদের প্রকৃত বর্ব্বরোচিত। তাঁহারা যেমন অশিক্ষিত ও আলস্যপরায়ণ তেমনই ব্যসনাসক্ত। যাঁহারা আবার দেশ ছাড়িয়া বিদেশী শিক্ষার সংস্পর্শে আসিয়াছেন তাঁহারা শিক্ষাভিমানী এবং আত্মম্ভরিতায় পূর্ণ। দুই চারিজন ভূস্বামী এখনও প্রাচীন, সরল, অনাড়ম্বর গ্রাম্য জীবনযাত্রা প্রণালীর পক্ষপাতী হইলেও তাঁহাদের রীতি নীতি সর্ব্ববিধ উন্নতি ও সংস্কারের পরিপন্থী।

টুর্গেনিফের চিত্র সর্ব্বথাই নৈরাশ্যব্যঞ্জক ও বিফলতার অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন। এইজন্যই তাঁহার পুস্তকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর আদর্শ চরিত্রের এত অভাব। অস্বাভাবিক ও রোগদুষ্ট রুশ সমাজে এইরূপ চরিত্রের অবস্থিতি সম্পূর্ণ অসম্ভব ইহাই যেন তাঁহার প্রধান প্রতিপাদ্য। এইজন্যই রুশিয়ায় মৌলিক চরিত্রের এত প্রাচুর্য্যাব এবং টুর্গেনিফও তাঁহার নিপুণ তুলিকাপাতে তাহাদের রঙীন চিত্রাবলী এত উজ্জ্বলভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। তাঁহার এই চরিত্রগুলির মধ্যে অনেকগুলিতেই কর্ম্মপ্রবণতা ও অলসতার দ্বন্দ্ব দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথমটি মানসিক অবস্থায় মাত্র পরিস্ফুট এবং বাস্তব জীবনে কর্ম্মক্ষেত্রে তাহার সম্পূর্ণ অভাব। মানব হৃদয় কার্য্যক্ষেত্রে কিরূপ পরিবর্ত্তিত হয় তৎসম্বন্ধে তাঁহার অভিজ্ঞতা তাঁহার "মিত্রি রুদিন" এবং "বসন্ত নির্ঝরে" বিশেষরূপে দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি বস্তুতান্ত্রিক হইলেও বীভৎস বা বিকৃত চিত্র অঙ্কন কালে কখনও সুরুচি বা শীলতার মাত্রা অতিক্রম করেন নাই। তাঁহার হৃদয় কবির ন্যায় কোমল ও সঙ্কোচপূর্ণ। সাধারণ গ্রাম্যজীবনের আড়ম্বরহীন ঘটনাগুলিও তিনি সহানুভূতির সহিত বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। তিনি সাধারণ দর্শকের চক্ষে না দেখিয়া সমস্ত ঘটনা সমালোচকের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন এবং এই সর্ব্বব্যাপী হীনতা ও দারিদ্র্যের কারণ উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার বর্ণনা যেরূপ সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর ও সঠিক সেইরূপ তাঁহার পর্য্যবেক্ষণশক্তির পরিচায়ক। তিনি মনুষ্য জীবনের জটিল সমস্যাগুলির সম্বন্ধে নিরপেক্ষ দর্শকের পদ গ্রহণ করিয়াছেন—কোনওরূপ মতবাদ প্রচার করেন নাই। কিন্তু তাঁহার ভাষা একটু করুণ এবং সময়ে সময়ে বেদনার চিহ্ন তাহাতে বিশেষ পরিস্ফুট।

মনুষ্য জীবন তাঁহার কাছে একটি বিরাট সমস্যা, কিন্তু

তিনি ইহার উন্নতিকল্পে ন্যায়মার্গে নিয়ন্ত্রিত করিবার কোনও পন্থা আবিষ্কার করেন নাই। তিনি কেবল মনুষ্য সমাজের দোষ, ব্যভিচার, অত্যাচারগুলি অসন্তুষ্ট বিদ্রোহীর ন্যায় সমালোচনা করিয়া গিয়াছেন, অনেকস্থলে কারণও দেখাইয়াছেন, কিন্তু প্রতীকারের কোনও উপায় আলোচনা করেন নাই। এই নিমিত্তই তাঁহার পাঠকের মনে স্বতঃই উদয় হয় যে, তাৎকালিক রুশিয়ার অভিজাত শ্রেণীর যে জাড্য ও অবসাদের তিনি এত নিন্দা করিয়া গিয়াছেন, তাহার প্রভাব হইতে তিনি আপনাকেও সম্পূর্ণরূপে মুক্ত করিতে পারেন নাই।

উল্লিখিত দোষ ত্রুটী সত্ত্বেও টুর্গেনিফ্ একজন প্রকৃষ্ট শক্তিশালী লেখক ছিলেন। তাঁহার রচনা-কৌশলের উৎকর্ষে তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লেখকদের মধ্যে স্থান পাইবার উপযোগী। তাঁহার গল্পগুলির অধিকাংশই আকারে বিশেষ স্বল্পায়তন, কিন্তু বাহুল্যবর্জ্জিত বর্ণনামাধুর্য্য, রচনা-কৌশল ও শব্দনির্ব্বাচনে তাঁহার ন্যায় শিল্পী অতি বিরল। তিনি জীবন্ত ও মুর্ত্তিমান চরিত্রের সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন কিন্তু তিনি যে কেবল মনুষ্য চরিত্র অঙ্কনেই বিশেষ পারদর্শী ছিলেন তাহা নহে। চেতন এবং জড়জগতের সমস্ত বিভাগই তাঁহার কল্পনা অতি দক্ষতার সহিত চিত্রিত করিয়া গিয়াছেন। অশ্ব, সারমেয়, পক্ষী সকলেই তাঁহার রচনায় পূর্ণমূর্ত্তিতে বিরাজমান। তাহাদের চরিত্র বিশ্লেষণে, তাহাদের স্বভাব বর্ণনায় টুর্গেনিফের অদ্ভুত জীবচরিত্র-জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। নৈসর্গিক সৌন্দর্য্য সৃষ্টিতেও তাঁহার কল্পনা সমান যত্নশীল, মনুষ্য ও জীবচরিত্রের ন্যায় প্রাকৃতিক বর্ণনাতেও তাঁহার নৈপুণ্য অসাধারণ।

টুর্গেনিফের প্রথম রচনাগুলির ফলে দাস-প্রথার উচ্ছেদ হইলে তিনি অন্যান্য বিষয় লিখিতে আরম্ভ করেন। অর্দ্ধ শিক্ষিত রুশসমাজে, বিদেশী শিক্ষার প্রভাবে যে বিশ্বসভ্যতা-বাদী, কিন্তু বিশিষ্টতাহীন ও মিত্রভাবাপন্ন মতবাদের প্রচার হইয়াছিল তাহার অযৌক্তিকতা প্রচার করাই টুর্গেনিফের দ্বিতীয় উদ্দেশ্য। টুর্গেনিফ্ সংস্কার বিরোধী ছিলেন না বরং তিনি উন্নতিশীল ও উদারপন্থী ছিলেন, কিন্তু তিনি ব্যক্তি বিশেষের বা দলবিশেষের মতবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত [illegible] নীতির ভক্ত ছিলেন না। "ওমরাহদের বাসা", "ধূম্র", "পিতা এবং পুত্র" "নবীন ক্ষেত্র" এই চারিখানিই তাঁহার অপেক্ষাকৃত বৃহদাকারের পুস্তক এবং ইহাদের মধ্যে শেষের দুইখানিই তাঁহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট রচনা। টুর্গেনিফের "পিতা ও পুত্র" ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। তিনি ইহাতে নব্য রুশযুবকদের মধ্যে বিশেষরূপে প্রচারিত জড়বাদ ও ধ্বংসবাদের কতকগুলি দোষ প্রদর্শন করেন। "পিতা ও পুত্রে"র নবীন ধ্বংসবাদিগণের মত মধ্যপন্থীগণের ন্যায় আন্দোলনেই সীমাবদ্ধ, কার্য্যে পরিণত করিবার একাগ্রতা তাঁহাদের নাই। উদারপন্থী রাজকর্ম্মচারী, প্রাচীন মতাবলম্বী ওমরাহ, স্বাধীনতাকাঙ্ক্ষী রমণী এবং রুশিয় সমাজের অন্যান্য বহুবিধ চরিত্রই ইহাতে চিত্রিত হইয়াছে, কিন্তু ইহা প্রাচীন এবং নবীন কোন দলকেই সন্তুষ্ট করিতে সক্ষম হয় নাই। প্রাচীন ও নবীন মতাবলম্বীদের যে তুলনা ইহাতে করা হইয়াছে তাহা এত স্বাভাবিক ও সুন্দর যে ইহার সত্য বর্ণনা সকলেরই অতি অপ্রিয় হয়। ইহাতে টুর্গেনিফের চিন্তাশক্তির ব্যাপকতা ও আলোচনার প্রগাঢ়তার পরিচয় পাওয়া যায়। "ধূম্র"তে প্রবাসী স্লাভ স্বদেশপ্রেমিকের জাতীয় উন্নতি বিধানের সুখস্বপ্নে নিমগ্ন থাকিয়া তদ্বিষয়ে নিশ্চেষ্টতাকে ব্যঙ্গ করা হইয়াছে। "নবীন ক্ষেত্র" ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। ইহাতে শাসন সংস্কারের ফলে জনসাধারণের অবস্থার উন্নতিকল্পে যে বিপুল সামাজিক আন্দোলনের সূত্রপাত হয় তাহার আলোচনা করা হইয়াছে। তরুণ বিপ্লববাদী ও তাহাদের গুপ্ত সমিতির কার্য্যাবলী, তাহাদের আশা, উৎসাহ এবং উদ্দেশ্য সংসাধনে ব্যর্থ প্রয়াস সমস্তই ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে। টুর্গেনিফ্ লঘুপ্রকৃতির যশাকাঙ্ক্ষী নেতা ছিলেন না। তিনি নিরুপদ্রব অহিংস আন্দোলনের পক্ষপাতী ছিলেন। প্রাচীন মুমূর্ষু রুশকেই আমরা স্বাভাবিক অবস্থায় টুর্গেনিফের লেখায় দেখিতে পাই। ভবিষ্যতে নবীন শক্তিমান পুরুষের আবির্ভাবের কোনও চিহ্নই আমরা টুর্গেনিফের লেখায় দেখিতে পাই না। এই কারণেই সমালোচকগণ বলেন, সামাজিক ঔপন্যাসিক হিসাবে টুর্গেনিফ্ ধ্বংস কার্য্যই সংসাধন করিয়া গিয়াছেন, গঠন কার্য্যে তাঁহার কোন কৃতিত্ব নাই। কিন্তু

তাঁহারা ভুলিয়া যান যে, অত্যাচার-জর্জ্জরিত,কুসংস্কারাচ্ছন্ন, ভগ্নপ্রবণ প্রাচীন রুশ সমাজের যে অবস্থায় টুর্গেনিফের আবির্ভাব হয় তখন একজন নির্ভীক, স্পষ্টবাদী, তীক্ষ্ণ সমালোচকেরই বিশেষ আবশ্যক হইয়াছিল রাজনৈতিক ও সমাজ-বিজ্ঞানবিদের নিকট টুর্গেনিফের লেখার মূল্য যাহাই হউক না, ললিতকলাবিদ্ সাহিত্যরসিকের নিকট টুর্গেনিফ্ চিরকাল উপভোগ্য থাকিবেন। তাঁহার প্রতিভা তাঁহাকে দেশকালের আবেষ্টনের বাহিরে আনিয়া চির অমরত্ব প্রদান করিয়াছে ইহা তাঁহার বিরুদ্ধ মতাবলম্বীকেও স্বীকার করিতে হইবে।

অন্তরিতা।

[শ্রীঅরীন্দ্রজিৎ মুখোপাধ্যায় এম-এ]

সেদিন যখন দিনের শেষে আমায় নাহি দেখ্‌তে পাবে,
ভাগুনধরা নদীর কূলে উদাস বায়ু লুটিয়ে যাবে,
আমি তখন অলখ্ চোখে থাকব চেয়ে তোমার মুখে,
শুনব তোমার প্রাণের বীণায় কি গান বাজে গভীর দুঃখে।

আকাশ যখন হুতাশভরা কুহেলিকায় ছয় সাঁজে,
রিক্ত হৃদয় সঙ্গী খোঁজে প্রদীপজ্বালা গৃহের মাঝে,
আমি তখন থাকব কাছে যদিই না'ক দেখ্‌তে পাবে,
সেদিন তোমার ব্যথার গানে আমার পরাণ সুর মিশাবে।

বিজন রাতে একলা ঘরে ঘুমিয়ে যখন থাক্‌বে শুয়ে,
আস্‌ব আমি জ্যোৎস্না বেয়ে, বক্ষে তোমার পড়্‌ব নুয়ে,
অশ্রুজলের শুকন রেখা মুছিয়ে দেব স্পর্শে আমার,
সুপ্ত মুখে স্বপন হাসি লুকিয়ে থেকে দেখ্‌ব আবার।

যখন বনে ফুটবে মুকুল আমায় পাবে দেখ্‌তে পাবে,
ফাগুন দিনের আগুন শেষে নতুন পাতা যে গান গাবে,
সাদা মেঘের নৌকাগুলি চল্‌বে যেথা আকাশ চেয়ে,
থাক্‌ব আমি থাক্‌ব সেথা সঙ্গীহারা তোমায় চেয়ে।

অশোক যেথা উঠ্‌ছে ফুটি কাননে সেথা রইচি আমি,
পথহারা ওই নদীর বাঁকে বেড়াই ছুটে দিবস যামী,
দখিন বাতাস আমার নিশ্বাস অঙ্গে তোমার লাগবে এসে,
শিশির-ভেজা শেফালিকায় করুণা মোর উঠ্‌বে ভেসে।

তোমার দুঃখে দুঃখ আমার, তোমার সুখে সকল সুখ,
আজকে যেমন তখন তেমন তোমার কথায় ভর্‌বে বুক,
আমি সদাই থাক্‌ব কাছে যদিই না'ক দেখতে পাবে,
তোমার ব্যথার সকল গানে আমার পরাণ সুর মিশাবে।

এমা হ্যামিল্‌টন্।

[শ্রীঅবনীকুমার দে]

কিছুকাল পূর্ব্বে শ্রদ্ধেয় "অর্চ্চনা"-সম্পাদক শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় "মন্মথ মন্দিরে ইংরেজ মনীষা" শীর্ষক এক বহু জ্ঞাতব্য এবং মনোজ্ঞ প্রবন্ধে ইংলণ্ডের প্রায় প্রত্যেক প্রথিতযশা সাহিত্যিক এবং কবিবৃন্দের চরিত্র সম্বন্ধে অল্প-বিস্তর আলোচনা করিয়াছেন। সেই সময় আমারও ইচ্ছা হইয়াছিল, তাঁহারই প্রদর্শিত পথ অবলম্বন করিয়া দুই একটি বিদেশী চরিত্র 'অর্চ্চনা'র পাঠকবর্গের মনোরঞ্জনার্থ প্রকাশিত করি, কিন্তু তখন উহাকে নিতান্ত বিকৃত রুচির পরিচায়ক বলিয়া অনেকটা সঙ্কুচিত হইয়াছিলাম। কিন্তু আজ কলিকাতার এক শ্বেতাঙ্গ সমাজ আমাদের নারীজাতির উপর তীব্র কটাক্ষ করিয়া এমন এক অশ্লীল ভাষা প্রয়োগ করিয়াছে যে, তাহাতে ধৈর্য্য সংবরণ করা অসম্ভব হইয়াই দাঁড়াইয়াছে। নারীর প্রতি এমন ইতর এবং অসভ্য ভাষা কেবল তাহারাই প্রয়োগ

করিতে পারে যাহারা নারীর মর্য্যাদা, নারীর নারীত্ব এবং মাতৃত্ব উপলব্ধি করিতে পারে না। আজ এই শ্বেতাঙ্গ সমাজের চরম নৈতিক অবনতি দেখিয়া আমাদের অন্তরে ঘৃণার পরিবর্ত্তে উহাদের জন্য দয়ারই উদ্রেক হয়। তবে ইউরোপের সমগ্র শ্বেতাঙ্গ সমাজই যে এইরূপ জঘন্য ভাব পোষণ করেন, এমন নহে। তাই এত ঘোর suffragist আন্দোলনের মধ্যে থাকিয়াও তাহাদেরই মুখ হইতে আমরা শুনিতে পাই :—"The First woman who, of her free-will, gave her breast to her babe was the mother of all the Humanities. She it was who prepared the way for the coming of Christ. By her, love entered first into Human consciousness." (Feminism and sex extinction by Arabella Kenealy). কিন্তু এই মুষ্টিমেয় দুর্নীতিপরায়ণ শ্বেতাঙ্গ সম্প্রদায় তাহা বুঝিতেছে কই ? যাহা হোক, আজ আর প্রবন্ধের কলেবর অধিকতর বর্দ্ধিত না করিয়া একটি শ্বেতদ্বীপের নারী-চরিত্র 'অর্চ্চনা'র পাঠকবর্গের সম্মুখে অতি সংক্ষেপে উপস্থিত করিলাম।

* * *

এমা ইংরেজী ১৭৬১ খৃষ্টাব্দে হার্ট নাম্নী এক দাসীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করে। ১৩ বৎসর বয়ঃক্রম কালে এমা Flintshire (ফ্লিন্টসায়ারের) অন্তর্বর্ত্তী হাউয়ার্ডেন্ পল্লীর থমাস্ সাহেবের গৃহে তাঁহার পুত্রকন্যার রক্ষণাবেক্ষণের ভার প্রাপ্ত হয়। কিন্তু বেশী দিন তাহার ঐ কাজ ভাল না লাগায় উহা পরিত্যাগ করে, এবং ষোল বৎসর বয়সে লণ্ডনের সেণ্ট্ জেমস বাজারের একটি দোকানের কার্য্যে নিযুক্ত হয়। ইহার অল্পকাল পরে এক সম্ভ্রান্ত মহিলার গৃহে সে পরিচারিকার কার্য্যে বৃতা হয়, এবং সেখানে সে অবসর সময়ে নাটক এবং উপন্যাস পাঠে মনোনিবেশ করে। নাটক পড়িতে পড়িতে তাহার মনে অভিনেত্রী হইবার প্রেরণা জাগিয়া উঠে এবং নৃত্যগীতকলা সম্বন্ধীয় অঙ্গভঙ্গির অনুশীলন করিতে ব্যাপৃতা হয়। অল্পকালের মধ্যেই সে রঙ্গালয়ে যোগদান করতঃ ছোট ছোট ভূমিকায় অশেষ কৃতীত্ব প্রদর্শন করে এবং শীঘ্রই তাহার খ্যাতি সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িতে দেখা যায়। কিন্তু এ অবস্থারও তাহার মন বশ মানিল না—কর্ত্তব্যকার্য্যে অবহেলা প্রযুক্ত কর্ত্তৃপক্ষ তাহাকে জবাব দিলেন। এমা এবার একটি ট্যাভারেণে (এক প্রকার সরাইখানা) কার্য্য লইল। ঐ ট্যাভারেণে অনেক চিত্রকর, সঙ্গীতজ্ঞ এবং অভিনেতার গতায়াত ছিল। এমাকে এখানে এক ওয়েল্‌স্‌দেশীয় নাবিক যুবকের সহিত ঘনিষ্টতাসূত্রে প্রথম আবদ্ধ হইতে দেখা যায়। নৌবিভাগে ঐ যুবকের চাকরী চুক্তিবদ্ধ থাকায় এমা যাইয়া কাপ্তেনকে বহু অনুনয়ে তুষ্ট করিয়া বালকের চুক্তি-বন্ধন উচ্ছেদ করিয়া লয়। এই ভদ্র যুবকের সহিত কিছুকাল বিলাস-লালসা সম্ভোগ এবং বিবিধ উপহার সম্ভার প্রাপ্ত হইয়া এমা তাহাকে সম্পূর্ণ নিঃস্ব অবস্থায় পরিত্যাগ করে। অবশ্য, এই বর্জ্জনের মূলে এক বৃহত্তর উদ্দেশ্য এবং স্বার্থ নিহিত ছিল। এমা ঐ যুবককে পরিত্যাগ করিয়া এক বহুমানাস্পদ ধনবান ব্যক্তির আশ্রয় লাভ করে। এই ভদ্রলোক এমাকে বিলাসিতার চরম সোপানে আরোহণ করান, কিন্তু বেশী দিন এভাবে চলিতে পারে না—তাঁহারও পুঁজি ফুরাইয়া আসিতে লাগিল —অথচ এমার খরচ ক্রমশঃই বাড়িয়া যাইতে লাগিল— অতএব আত্মীয়বর্গের প্ররোচনায় এবং সামাজিক অবস্থা পর্য্যাবলোকন করিয়া তিনিই স্বেচ্ছায় এমাকে পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন।

এবার এমার দুর্দ্দশা উপস্থিত হইল। এমা দারিদ্র্যের তীব্র কশাঘাতে জর্জ্জরিত হইয়া পাপের নিম্নতম সোপানে পতিত হইল। ক্রমে সামান্য অন্নবস্ত্রের অভাবে এমা দেহ বিক্রীর অতি জঘন্য স্তরে যখন নিতান্ত অসহায় অবস্থায় পথের উপর নামিয়া পড়িল, তখন ডাক্তার গ্র্যাহাম নামক এক ধুরন্ধর কলাবিদ্ তাহাকে উদ্ধার করেন। ডাক্তার এমাকে স্বগৃহে আনয়ন করিয়া খুব মূল্যবান এবং অতি স্বচ্ছ একখণ্ড বস্ত্র দ্বারা তাহার সুকুমার দেহলতিকাকে নামমাত্র আবৃত করিয়া নারী-সৌন্দর্য্যের চরম আদর্শ ও অভিব্যক্তিরূপে মঞ্চোপরি দাঁড় করাইলেন। ডাক্তার তাহার নাম দিলেন Goddess Hygeia ("the goddess of health, said to be the daughter of Æsculapious and held in great veneration among

the ancients. Some authors confound her with Minerva. She is usually depicted holding a serpent in one hand and a cup in the other"—Classical Dictionary). ডাক্তারের নিমন্ত্রণে চারিদিক হইতে প্রথিতযশা সাহিত্যিক, কবি, কলাবিদ্, শিল্পী এবং মনিষীবৃন্দ সমাগত হইতে লাগিলেন। ডাক্তারের গৃহ এক পুণ্যতীর্থরূপে পরিগণিত হইল। বড় বড় সমজদারেরা অনিন্দ্যকান্তি নগ্নসৌন্দর্য্য বিগ্রহ প্রতিমার পাদপীঠে মস্তক নত করিলেন—এমা নিস্পলকনেত্রে দর্শকবৃন্দের ক্ষুধাতুর চক্ষের সম্মুখে স্থির হইয়া রহিল। চতুর ডাক্তার সময় বুঝিয়া এবার অনেক মডেল্ প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ সব মডেল বহুমূল্যে বিক্রয় হইতে লাগিল। অনেকে নকলে পরিতৃপ্ত না হইয়া আসল দেখিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া ছুটিয়া আসিল। ডাক্তার প্রকাণ্ড প্রদর্শনী খুলিয়া বসিলেন। বিখ্যাত ওয়ারউইক্ পরিবারের চার্লস গ্রেভিল্ এমাকে দেখিয়াই ভালবাসিয়া একেবারে বিবাহ করিতে কৃতসঙ্কল্প হন, কিন্তু খুল্লতাত স্যর ডব্লিউ হ্যামিল্টন্ তাহার আশার পথে অন্তরায় হইয়া দাঁড়ান। গ্রেভিলের অনেক দেনা ছিল। এমার পরিবর্ত্তে স্যর হ্যামিল্টন্ গ্রেভিলের সমস্ত দেনা চুকাইয়া দিতে স্বীকৃত হওয়ায়, গ্রেভিল এমার আশা পরিত্যাগ করেন। কেহ কেহ অনুমান করেন হ্যামিল্টন্ যুবক গ্রেভিলকে এই ছলনাময়ী যাদুকরীর প্রভাব হইতে মুক্ত করিবার জন্য এই পন্থা অবলম্বন করেন, যেহেতু তিনি না কি নিজে উহার প্রকোপ কিছুটা অনুভব করিয়া আসিতেছিলেন। ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই, কারণ এই পাপীয়সী বালিকা প্রতারণার মুখস পরিয়া অনেক অসম্ভবকে সম্ভব করিতে সুদক্ষ ছিল। ব্যভিচারের এত ক্লেদ-কর্দ্দমে নিমজ্জিত থাকিলেও সে যখন-তখন ইচ্ছানুযায়ী নম্র ও সরলতার—সতীত্বের ও বীরত্বের মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিতে পারিত। প্রেমিকার অভিনয়ে তাহার তুল্য জগতে খুব বিরলই দেখা যায়।

১৭৯১ খৃষ্টাব্দে Sir William এমাকে পত্নীত্বে বরণ করিয়া নেপল্‌সের কোর্টে রাণীর সহিত তাহার পরিচয় করাইয়া দেন। রাণী ইংরেজভক্তপত্নী এমার রূপচর্য্যে এতই প্রীতা এবং আকর্ষিতা হন যে, তিনি এমাকে পলকের অন্তরাল করিতে পারিতেন না। রাজপ্রাসাদই এমার একপ্রকার বাসস্থান হইয়া দাঁড়াইল। এখানেই বিখ্যাত ব্রিটীশবীর Nelson (নেলসনের) সহিত এমার প্রথম পরিচয় জন্মে। এখানেই এমা নেলসনের সহচরী হইয়া দাঁড়ায় এবং বহু রাজনৈতিক কার্য্যে ভূমিকা করিয়া এমা নেলসনের বহু সহায়তা করিয়াছে দেখা যায়। বিখ্যাত আবুকীর (Aboukir) বিজয়ের পর নেপল্‌সে যখন নেলসনকে সম্রাটোচিত সম্মানে অভ্যর্থনা করা হয়, তখন লেডী এমা হ্যামিল্টন্ তাঁহারই পার্শ্বে গৌরবের আসন অলঙ্কৃত করে। সেই অবধি এমাকে নেলসনের সহিত নিরবচ্ছিন্ন ভাবেই একত্র থাকিতে দেখা যায়। প্রিন্স Caraceiolor হত্যাকলঙ্কের মূলেও চিরযৌবনা এমা রহস্যতিমিরাবৃত যবনিকার অন্তরালে বিদ্যমানা। অবশেষে এমা নেলসনের সহিত জার্ম্মেণীতে গমন করে এবং তথায় বহু সম্মানের সহিত বিবিধ সভায় খ্যাতি এবং প্রতিপত্তি অর্জ্জন করে। এক সময় এমন কথাও শুনা গিয়াছিল যে, এমার গর্ভে নেলসনের এক কন্যা জন্মিয়াছিল, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত কেহ বিশেষ করিয়া তাহার সত্য নির্ণয় করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। বিখ্যাত চিত্রকর রম্নি (Romney) এমার এক চিত্র অঙ্কিত করিয়া যশস্বী হইয়াছেন। ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে নেল্‌সনের মৃত্যু হয়। এমা অতিরিক্ত পরিমাণে মদ্যাসক্ত ছিল। নেল্‌সন যদিও মৃত্যুকালে এমার সবিশেষ যত্ন লইবার কথা উল্লেখ করিয়া যান, তবুও হতভাগিনী এমাকে দারিদ্র্যের কঠোর নিষ্পেষণে নিতান্ত নিঃসঙ্গ অবস্থায় কেলে নগরে ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে ইহলীলা সম্বরণ করিতে দেখা যায়।

সার্থকতা।

[শ্রীমতী গিরিজা চৌধুরী]

আড়ের কোলে ভোরের বেলায়
লুটিয়ে আছে শিউলি তলায়,
কতই ফুলের রাশি
ক্ষীণ পরাণের হাসি
চায় না কেহ তাদের পানে,
মরম ব্যথা নাশি।

ও-পাড়ার ঐ শৈলবালা—
সাধ হ'য়েছে গাঁথ্‌তে মালা,
(তাই) হাতে নিয়ে সাজি
শিউলি তলায় আজি,
কোমল হাতে কুড়িয়ে নিলে,
কোমল কুসুম রাজি।

ছু'টে গিয়ে গৃহে আপন
গাঁথ্‌ল মালা মনের মতন,
প'রে আপন গলে
সোহাগ ভরে চলে,
দেখা'তে সই চারুলতায়,
ছু'টল কুতূহলে।

ক্ষণেক পরে অরুণ করে
ফুলের শোভা যখন ঝরে
কাঁদে শৈলবালা
ভাসিয়ে দিয়ে খেলা,
আমার তরে ম'রল এরা
এতই সকালবেলা?

চারু তখন তুলে আঁচল
বলে মুছে আঁখি সজল,
"দুঃখ কিসের তরে,
উঠে দেবের বরে
ধন্য হ'লো শেফালিকা
তোমার বুকের 'পরে।"

আর্ট ও সাহিত্য।

(সমালোচনা)

[শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভুঞরা বি-এ]

শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর তত্ত্বনিধি বি-এ বিরচিত 'আর্ট ও সাহিত্য' গ্রন্থ পাঠ করিয়া পরম প্রীত হইলাম। স্বীকার করিতে লজ্জা নাই, এই গ্রন্থ পাঠ করিবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত 'আর্ট' কথাটী এতদিন আমার নিকট এক দুর্ব্বোধ্য দুজ্ঞের ও বিভিন্নার্থবোধক বস্তু ছিল। কিন্তু তত্ত্বনিধি মহাশয়ের গ্রন্থ পাঠ করিয়া 'আর্ট' শব্দের যথার্থ স্বরূপ এই প্রথম উপলব্ধি করিলাম।

প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের পণ্ডিতমণ্ডলী সমালোচকগণের অভিমত উদ্ধৃত করিয়া ঠাকুরমহাশয় তাঁহার সহজসাধ্য প্রাঞ্জল ভাষায় আর্টের স্বরূপ ও সার্থকতা বুঝাইয়াছেন। অমর শিল্পীর সুনিপুণ তুলিকাপাতে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর আলেখ্য যেমন নয়নের অন্তরাল হইলেও আমাদের মানসচক্ষে সতত বিরাজ করে, এই 'আর্ট ও সাহিত্য' গ্রন্থও তেমনি যেন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া আমাদের চক্ষের সম্মুখে দণ্ডায়মান—তাহার প্রতি পত্র, প্রতি ছত্র, এমন কি প্রতি বর্ণ পর্য্যন্ত গ্রন্থকারের ভাব-গাম্ভীর্য্য, পদলালিত্য এবং লিপিচাতুর্য্যের সাক্ষ্য দিতেছে। নব্যবঙ্গের ভাষার আধুনিকতা ও 'মার প্যাঁচ' এবং অর্থহীন শব্দবিন্যাসের বাহ্যাড়ম্বর ইহাতে নাই, ফলতঃ তাঁহার বক্তব্য অস্পষ্ট ও হেঁয়ালিভরা হয় নাই, সেইজন্য তিনি বিশেষভাবে পাঠকগণের ধন্যবাদার্হ। যে সমুদয় বিদেশী শব্দ ব্যবহার করা আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে,

তিনি তাহার প্রত্যেকটার এক একটা করিয়া বাঙ্গালা প্রতিশব্দ প্রয়োগ না করিয়া ক্ষান্ত হন নাই। ইহা এ যুগে অল্প পাণ্ডিত্য ও সংযমের পরিচায়ক নহে। বোধ করি ইহা ঠাকুরবাড়ীর সম্পূর্ণ নিজস্ব।

'আর্ট ও সাহিত্য' গ্রন্থ পাঠ করিলেই পাঠক দেখিতে পাইবেন ইহা সাধারণতঃ দুইটী প্রধান ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে (১কথা—৯ কথা) আর্ট ও তাহার সংজ্ঞা, এবং দ্বিতীয় ভাগে (১০ কথা—২০ কথা) সেকালের ও একালের উপন্যাসে আর্টের স্বরূপ বিশ্লেষণের বিশদ আলোচনা হইয়াছে।

প্রথম ভাগেই গ্রন্থকর্ত্তার কৃতিত্ব ও নৈপুণ্য প্রকাশ পাইয়াছে। আধুনিক উপন্যাসপ্রিয় তরলমতি পাঠক সম্প্রদায়ের নিকট ইহার প্রথমাংশ কিঞ্চিৎ নীরস ও কঠোর বোধ হইলেও ধৈর্য্যধারণপূর্ব্বক কোনক্রমে ১ম অধ্যায়টী মাত্র একটু অবহিত চিত্তে পাঠ করিলেই দেখা যায়, পুস্তকের আখ্যানভাগ ক্রমশঃ সমধিক সরস ও চিত্তাকর্ষক হইয়া উঠিতেছে। তখন আর পুস্তকখানি শেষ না করিয়া উঠা সম্ভব হইবে না। এরূপ জটিল বিষয় এমন সরস ও স্বচ্ছ করিয়া দেখান অল্প কৃতিত্বের কথা নয়।

প্রথম ৩টী অধ্যায়ে আর্ট কি, তাহার উদ্দেশ্য, তাহার লক্ষণ বিশদভাবে বুঝানো হইয়াছে। রসগন্ধানভিজ্ঞ ব্যক্তিকে যেমন মিষ্টতা ও সুগন্ধ বুঝান অসম্ভব, আর্টকেও তদ্রূপ সংজ্ঞা বা পরিভাষার দ্বারা সীমাবদ্ধ করা যায় না—ইহা অনুভূতি মাত্র, পরিপার্শ্ব বা আনুষঙ্গিক লক্ষণ দ্বারাই ইঁহার স্বরূপ নির্দ্ধারণ করা হইয়া থাকে। 'আর্ট' অর্থে সাধারণতঃ 'কলাকৌশল' শব্দটী ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কিন্তু সকল কলাকৌশলই কি আর্ট-পদবাচ্য? তাহা হইলে বিগত মহাসমরে—জর্ম্মাণ-প্রবর্ত্তিত হত্যার অভিনব কৌশলাবলীও আর্টের অন্তর্ভুক্ত। তাহার উত্তরে কেহ কেহ বলেন—আর্ট বিশ্ব মানবের মঙ্গলসোপান। কিন্তু শুদ্ধ মঙ্গল ভাবই আর্টের একমাত্র পরিচায়ক নহে। কারণ সে ক্ষেত্রে আচার্য্য ও পুরোহিতের ধর্ম্মোপদেশ এবং মাতাপিতার অনুশাসনাবলীতেই আর্টের যথার্থ বিকাশ বুঝিতে হইবে। দর্শন, বিজ্ঞান এবং কতিপয় didactic বা ধর্ম্মমূলক কাব্যোপন্যাসাদি ভিন্ন অন্য কোন কাব্য, উপন্যাস, চিত্র বা সঙ্গীতে আর্টের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ জন্মিতে পারে। এজন্য অন্য এক সম্প্রদায় বলেন—সৌন্দর্য্য-সৃষ্টিই আর্টের যথার্থ পরিমাপ। আর্টের এই তথাকথিত ব্যাপক সংজ্ঞাও অত্যন্ত অস্পষ্ট ও ভিত্তিহীন। সৌন্দর্য্যের ধারণা সকলের সমান নয়। কেহ কেবলমাত্র বাহ্য সৌন্দর্য্যের উপাসক, আবার কেহ বা অন্তঃ-সৌন্দর্য্যের পক্ষপাতী। কেহ শকুন্তলাতেই সৌন্দর্য্যের আদর্শ দেখিতে পান, কেহ বা ক্লিয়োপেট্রার রূপমুগ্ধ। আবার এই বিচিত্র সংসারে বীভৎস নগ্ন সৌন্দর্য্যের উপাসকও অল্প নয়।

সুতরাং কেবল মঙ্গলভাব বা কেবল সৌন্দর্য্যসৃষ্টি পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া আর্ট উৎপাদন করিতে পারে না। আর্টের প্রধান লক্ষ্য হইবে উন্নতিসাধন এবং সেই সাধনার প্রশস্ত পথ ইহার সৌন্দর্য্যদান, অর্থাৎ আর্ট আমাদিগকে আমাদের জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে রস ও সৌন্দর্য্যের মধ্য দিয়া সসীম হইতে অসীমে আনয়ন করিবে। বৈশিষ্ট্য বা বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়া সত্য যাহা, সনাতন যাহা তাহাই প্রকাশ করিবে। প্রবীণ গ্রন্থকারের মতে "আর্ট তাহাই যাহার চরম লক্ষ্য উন্নতিসাধন, যাহার পদভূমি প্রকৃতির সত্যভূমিতে, যাহার কেন্দ্র প্রকৃতির সকল বৈচিত্র্যের মধ্যে, একত্বের উৎস ভগবানে। অর্থাৎ সত্য, শিব ও সুন্দর এই তিনের সংমিশ্রণেই যথার্থ আর্টের উৎপত্তি" তাই কবি গাহিয়াছেন—Beauty is utility, utility is beauty. স্বীয় মতের পোষকতা করিবার জন্য গ্রন্থকর্ত্তা প্লেটো, সুলজার, হেগেল, মেণ্ডেলসহ, মারজ, কুজাঁর, কস্‌টার, রস্কিন, টলষ্টয়, এমার্সন প্রভৃতি প্রতিভাশালী মনীষিগণের অভিমত উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন ইঁহাদের কেহই Artএর utilitarian side বা মঙ্গল ভাবকে অস্বীকার করিতে সাহস করেন নাই।

৫ম ও ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে বর্ত্তমান যুগের তথাকথিত 'Art for art's sake' বা 'আর্টের খাতিরে আর্ট' এবং 'Realistic art' বা 'প্রত্যক্ষ-দ্যোতক আর্টে'র উৎপত্তি ও ভিত্তিহীনতা সপ্রমাণ হইয়াছে। এই উভয় তত্ত্বেরই জন্ম য়ুরোপখণ্ডে। প্রথমটী জার্ম্মাণীর এক বৈজ্ঞানিক সমালোচক বিশ্লেষণ উদ্দেশ্যে আর্টের গুণসমষ্টি 'সত্য, শিব, সুন্দর' হইতে একটী অপ্রধান গুণ 'সুন্দর'কে পৃথকভাবে বিশ্লেষণ করিয়া স্বকীয় অন্তঃকরণের কোন এক বিশিষ্ট ভাব ব্যক্ত করেন। কিন্তু তাঁহার অন্ধ স্তাবকেরা তাঁহার উদ্দেশ্য বিস্মৃত হইয়া 'সৌন্দর্য্য'কে 'সত্য ও শিব' হইতে সম্পূর্ণ পৃথক করিয়া তাহারই প্রচারে আর্টের সার্থকতা, এই মিথ্যাবাণী সমাজে প্রচার করিতে লাগিল। 'প্রত্যক্ষ-দ্যোতক আর্ট' কথাটীও সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। স্বাভাবিকতাই যখন আর্টের প্রাণ—তখন প্রকৃতির মধ্যে যাহা প্রত্যক্ষ তাহাই আর্ট, যাহা অপ্রত্যক্ষ তাহা কখনও আর্ট হইতে পারে না। সুতরাং 'প্রত্যক্ষ-দ্যোতক' কথাটী আর্টের একটী অনাবশ্যক বিশেষণ।

গ্রন্থকর্ত্তার ভাষাতেই বলি—এদেশের কতিপয় শিক্ষিত লোক তাহাদের বিলাতী অনুকরণ প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া এই সর্ব্বনাশক তত্ত্বদ্বয় প্রচার আরম্ভ করিয়াছেন। ফলে বঙ্গসাহিত্যের চতুর্দ্দিকে 'রাশি রাশি পূতিগন্ধময় গলিত দুর্নীতি ও অশ্লীলতা দেখিতে পাই, এবং দেশের তরলমতি বালক, বালিকা, যুবক, যুবতী সেই হলাহল আকণ্ঠ পান করিয়া নিজেদের সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছে। এই বীভৎস কুৎসিত নগ্ন কাম ভাবকে রস ও সৌন্দর্য্যের প্রলেপ দিয়া অপরিণতবয়স্ক যুবক যুবতীদের নয়নাভিরাম করিয়া তুলিয়া অর্ব্বাচীন লেখকগণ যে দেশের কি সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছেন গ্রন্থকার নির্ভয়ে

ওজস্বিনী ভাষায় তাহা লোকচক্ষুর সম্মুখে ধরিয়া সাহিত্যের তথা সমাজের প্রভূত মঙ্গলসাধন করিয়াছেন। তজ্জন্য তিনি দেশপ্রাণ ব্যক্তিমাত্রেরই বরেণ্য হইয়া রহিবেন।

গ্রন্থের ২য় ভাগের (১০ক-২১ক) প্রারম্ভেই সেকাল ও একালের উপন্যাসের সীমারেখা নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। সেকালের উপন্যাসের জন্ম অমর কবি বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম রচনায়। একালের উপন্যাসের উৎপত্তি রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি'ও 'নষ্ট নীড়' প্রভৃতিতে। সেকালের উপন্যাসের কেন্দ্র ভগবান এবং লক্ষ্য সমাজের মঙ্গল, আর একালের অধিকাংশ উপন্যাসে এতদুভয়ের প্রত্যেকটীর অভাব অনুভূত হইয়া থাকে। গ্রন্থকার একালের উপন্যাসের বিস্তৃত সমালোচনা করেন নাই—তাঁহার কৈফিয়তও 'নিবেদনে' দিয়াছেন। এখানে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। সেকালের উপন্যাস শ্রেণীর মধ্যে সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র ও জগৎবরেণ্য রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থের সবিশেষ আলোচনা করা হইয়াছে। তাঁহার সিদ্ধান্তের সহিত আমাদের মোটের উপর ঐক্য থাকিলেও স্থানে স্থানে তাঁহার মত সমর্থন করা যায় না। গ্রন্থকার বলিয়াছেন "আমরা slave mentalityকে অন্ধভাবে আলিঙ্গন করিয়া রমণীর মাতৃত্ব উপলব্ধি না করিয়া 'প্রিয়াসাধনে' অগ্রসর হই।" এখানে রমণীর 'মাতৃত্ব ও প্রিয়াসাধনে'র দ্বারা গ্রন্থকার কি ভাব ব্যক্ত করিতেছেন ঠিক বোধগম্য হইল না। তিনি কি বলিতে চাহেন রমণীকে মাতৃরূপে অঙ্কিত করাই সৎসাহিত্যের চরম লক্ষ্য এবং রমণীকে প্রিয়া-রূপে সখীরূপে দেখান কুরুচি ও অশ্লীলতার প্রশ্রয় দেওয়া? তাহা হইলে তো দেখা যায়, পৃথিবীতে কবি বলিয়া যাঁহারা খ্যাতি লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের অধিকাংশ গ্রন্থই আমাদের পরিত্যাজ্য। কালিদাসের শকুন্তলাকে রাজা দুষ্মন্ত সখী ও প্রিয়াভাবেই দর্শন করিয়াছেন। সেক্সপীয়র Othello Desdemonaকে, Ferdinand Mirandaকে, Hamlet Opheliaকে মাতা-পুত্র রূপে না দেখাইয়া নায়ক নায়িকা রূপেই অঙ্কিত করিয়াছেন। হয় তো গ্রন্থকার বলিবেন, পাঠক তাহাদের মাতৃত্ব অনুভব করিবেন। কিন্তু তাহা হইলে কবির Art কোথায়? কবি যাহা বলিবেন নিজে তাহা অনুভব করিবেন এবং সঙ্গে সঙ্গে পাঠককেও তাহাই অনুভব করিতে হইবে। তা' ছাড়া সত্যভূমিতে দাঁড়ানই যদি Artএর সার্থকতা, তাহা হইলে শিশু ও বৃদ্ধ ভিন্ন যাবতীয় মানবের পক্ষেই ত বয়োধর্ম্মে প্রিয়ামিলনেচ্ছা ও সৃষ্টি করিবার তীব্র আকাঙ্ক্ষা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। তবে পরকীয়া রমণীর প্রতি আসক্তি বা কামভাব পরিপোষণ সম্পূর্ণ দূষণীয় ও সমাজের অকল্যাণকর, সুতরাং আর্টের পরিপন্থী।

গ্রন্থকার আর এক স্থলে বলিতেছেন, কুন্দের বিষভক্ষণ আপত্তি-জনক ও সমাজ-শরীরে নানা অমঙ্গলের উৎপাদক। ইহারই ফলে না কি অনেক গৃহে হৃদরোগে, উদ্বন্ধনে, বিষপানে অকালে জীবন বিসর্জ্জন করিবার কথা শোনা যায়। কিন্তু আমাদের জিজ্ঞাসা—ইহার পূর্ব্বে কি বঙ্গসমাজে আত্মহত্যা বলিয়া কোন জিনিষ ছিল না? স্বাভাবিকতাই আর্টের প্রাণ—স্বামী-পরিত্যক্তা, লোকলাঞ্ছিতা স্বজনবান্ধবহীনা কুন্দ যে বিষপানে অন্তরের জ্বালা জুড়াইবার জন্য ব্যগ্র হইবে ইহা ত স্বাভাবিকই। আর এই দৃশ্যের মধ্য দিয়া বঙ্কিমচন্দ্রের মঙ্গলেচ্ছাও স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। দীনা, হীনা, পবিত্রা বিধবাদিগকে প্রলোভনে ভুলাইয়া, তারপর তাহাদের যথাসর্ব্বস্ব নষ্ট করিয়া, তাহাদিগকে সমাজে হেয় ঘৃণিত ও লাঞ্ছিত করিয়া জগতের মাঝে হস্তে কুকুর করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া যে কতদূর হৃদয়হীনতা ও পশু প্রকৃতির পরিচায়ক তাহা তিনি জ্বালাময়ী ভাষায় কামোন্মত্ত নরপিশাচদিগকে বুঝাইয়া দিয়াছেন। বস্তুতঃ, বঙ্কিমবাবুর গ্রন্থের প্রতি পত্রে, প্রতি ছত্রে, প্রতি বর্ণে যে সমাজহিতৈষণার পরিচয় পাওয়া যায়, মাদৃশ ব্যক্তির তাহা দেখাইবার মত সময় ও সামর্থ্য উভয়েরই অভাব। অধ্যাপক ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও বটুকনাথ ভট্টাচার্য্য দেখাইয়াছেন বঙ্কিমচন্দ্রের প্রত্যেকটী কথার মধ্যে আমরা ভগবানের অস্তিত্ব ও সমাজহিতৈষণা দেখিতে পাই। Herbert Spencerএর অভিব্যক্তিবাদ, Goetheএর culture মন্ত্র এবং Comteএর বিশ্বমানবপূজা, বিশ্বমানব সংযোগ ও সেবার ভাব বঙ্কিম-চিত্তের উপর যে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল তাহা কি বিফল হইতে পারে?

তারপর দেবেন্দ্রের তথাকথিত অশ্লীল ও জঘন্য চরিত্রাঙ্কনেরও যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। কুন্দনন্দিনীর প্রতি প্রণয় বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তাহার মত ব্যক্তির চরিত্রও কেমন ধাপে ধাপে উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতে পারে—প্রণয়ের এই যে মঙ্গলসাধন বৃত্তি তাহাই দেবেন্দ্র-চরিত্রাঙ্কনের Back-ground বা পৃষ্ঠভূমি। মানব জীবনের অতি হীন কদর্য্য অনন্ত অংশ হইতেও সৌন্দর্য্য চয়ন করা যায়। তাঁহার উপন্যাসের এই যে Philosophy তাহার বিশিষ্টতাই এইখানে অত্যাচার, অন্যায়, অবিচার এ জাতিকে কত শতাব্দী ধরিয়া জর্জ্জরিত করিয়াছে—সামাজিক কু-প্রথা জাতির মেরুদণ্ড দুর্ব্বল করিয়াছে—এ সকলের মধ্য হইতেও বঙ্কিমচন্দ্র সৌন্দর্য্য খনি ঘাঁটিয়া বাহির করিয়াছেন। এরূপ সরসতা ও প্রীতির মূলে তাঁহার স্বদেশানুরাগই কারণ রূপে বর্ত্তমান। তিনি কি কখনও সমাজ-শরীরে মঙ্গল ব্যতীত অমঙ্গল আনয়ন করিতে পারেন?

আমরা অত্যন্ত দুঃখের সহিত বলিতে বাধ্য যে গ্রন্থখানিতে এত গুণ সমাবেশ সত্ত্বেও স্থানে স্থানে কিছু কিছু ত্রুটি বিচ্যুতি রহিয়া গিয়াছে। গ্রন্থের মধ্যে পুনরুক্তি দোষ অত্যন্ত রূঢ় ভাবে পাঠকের চক্ষে ধরা পড়ে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাইতে পারে ৭ম ও ৯ম অধ্যায়ের প্রায় সমগ্রাংশই প্রথম চারি অধ্যায়ের পুনরুক্তি মাত্র। এই পুনরুক্ত দোষের জন্যই বোধ হয় গ্রন্থখানি অধ্যায়ে অধ্যায়ে অনেক সময় সমসূত্রে গ্রথিত হয় নাই।

যাহা হউক, পরিশেষে আমাদের বক্তব্য—যে সদুদ্দেশ্য প্রণোদিত হইয়া গ্রন্থকার এরূপ জটিল বিষয়ের অবতারণা করিয়াছেন তাঁহার সেই মঙ্গল উদ্দেশ্য সফল হউক। তাঁহার নিজস্ব ভাষাতেই বলি—"আবার শক্তিমান লেখনী পবিত্র ও কল্যাণকর ভাবসমূহের চিত্র আঁকিয়া ছেলে মেয়েদের অন্তরে পবিত্র ভাব জাগাইয়া তুলুক, ব্রহ্মচর্য্য বলে বলী করিয়া তাহাদিগকে বিপদে আপদে, দুঃখে শোকে, হিমাচলের ন্যায় অচল অটল করিয়া তুলুক। দেশের মুখশ্রী ফিরিয়া যাউক।

ভুল।

[শ্রীপ্রফুল্লকুমার মণ্ডল বি-এ]

তখন সবে সন্ধ্যা হইয়াছে। প্রদীপ হাতে স্ত্রীকে ঘরে ঢুকিতে দেখিয়া সুধাংশু চুপি-চুপি চোরের মত তাহার পিছনে আসিয়া দাঁড়াইল। মৃণাল ঘরের কোণে প্রদীপ রাখিয়া চলিয়া যাইতেছিল, সুধাংশু খপ্ করিয়া তাহার একখানা হাত চাপিয়া ধরিয়া কহিল,—জলজ্যান্ত মানুষ একট্যা পড়ে' রয়েছে এখানে, তা' বুঝি একবার নজরেই আসে না গা? দু'দিন বাদে যাবেই না-হয় ছেড়ে, তাই বলে'—

কথাটা শেষ করিবার পূর্ব্বেই সে মৃণালকে একটু দেয়ালের আড়ালে টানিয়া আনিয়া তাহার মুখের আধ-ঘোমটাটুকু খুলিয়া দিল। প্রদীপের আলো পূর্ণভাবে সেই সুন্দর মুখখানি উদ্ভাসিত করিয়া তুলিল। কিন্তু একটা ফুটন্ত গোলাপের ভিতর সহসা একটা কীট দেখিলে মানুষ যেমন করিয়া থমকিয়া যায়, সুধাংশুও তেমনি থমকিয়া গেল। তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল,—কি হ'য়েছে, অমন করে' রয়েছ যে?

আমার যাওয়া হবে না—বলিতে বলিতেই মৃণালের দুটী চোখ ছাপাইয়া অশ্রু নামিয়া আসিল। মুহূর্ত্তমধ্যে সুধাংশুর সোহাগের সাধ নিঃশেষে উবিয়া গিয়া সমস্ত অন্তর কি-যেন একটা বিষে ভরিয়া উঠিল। সে মৃণালকে ছাড়িয়া দিয়া স্তব্ধভাবে একখানা চেয়ারে বসিয়া পড়িল। মৃণাল চোখের জল মুছিতে মুছিতে স্বামীর কাছে সরিয়া দাঁড়াইল। একটু নীরব থাকিয়া কহিল,—বাবা এসেছিলেন নেবার কথা বল্‌তে, তা' মা বল্‌লেন—এখন গেলে সংসার চলা ভার হবে।

বলিতে বলিতে মৃণালের কণ্ঠ আবার রুদ্ধ হইয়া আসিল। পুনরায় চোখ মুছিয়া সুধাংশুর পা দুখানা দুই হাতে জড়াইয়া ধরিয়া কহিল,—তোমার পায়ে পড়ি, তুমি একবার বল এঁদের! মায়ের এই অসুখের সময় আমি তাঁকে দেখ্‌তে পাবো না?

সুধাংশুর সারা দেহ-মন তিক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। অত্যন্ত রুক্ষস্বরেই বলিয়া ফেলিল,—তা' আমার কাছে প্যান্ প্যান্ কর্‌লে আর কি হবে? আমি কিছু পার্‌বো না।

স্বামীর কাছে এই অপ্রত্যাশিত ধাক্কা খাইয়া মৃণাল পাংশু হইয়া গেল। মুহূর্ত্তমাত্র সে তাহার মুখের পানে চাহিয়া থাকিয়া মাথার কাপড় টানিয়া দিয়া একান্ত নীরবে ঘরের বাহির হইয়া গেল। সুধাংশুও কাঁধের উপর কামিজটা ফেলিয়া চটি পায়ে দিয়া একেবারে বাড়ী হইতে রাস্তায় আসিয়া দাঁড়াইল।

* * *

এলোমেলো নানান্ কথা ভাবিতে ভাবিতে সুধাংশু বেশ একটু উত্তেজিত ভাবেই ট্রামের রাস্তা ধরিয়া হেদুয়ার বাগানের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। ফটকের কাছে আসিতে হঠাৎ কে একজন তাহার হাত ধরিয়া ফেলিতেই সুধাংশু তাহার মুখের পানে চাহিয়া যেন একটু অপ্রতিভ হইয়া গেল।

বিভূতি সুধাংশুর বন্ধু। এই বন্ধুটীকে সুধাংশু যেন একটু বিশেষ করিয়া ভালবাসিত এবং পছন্দ করিত। সম্প্রতি বিভূতির স্ত্রী মারা গিয়াছিল। এই অল্পবয়সে

জীবনের এত বড় একটা প্রিয় সামগ্রীকে হারাইয়া মানুষ কি করিয়া বাঁচিয়া থাকে, তাহাই যেন সুধাংশুর পক্ষে একটা বিরাট সমস্যার বিষয় ছিল। কেন না, মৃণালকে সে বুঝি সত্য সত্যই প্রাণের চেয়ে ভালবাসিত। তাই, বিভূতির স্ত্রী মারা যাইবার পর হইতে যখনই তাহার সহিত দেখা হইত, তখনই যেন একটা বিপুল সমবেদনায় সুধাংশুর বুকখানা আষাঢ়ের মেঘের মত সজল হইয়া আসিত।

বিভূতি তাহার স্বভাবসুলভ হাসিটুকু হাসিয়া কহিল,—কিহে, এমন হন্ত দন্ত হ'য়ে চলেছ কোথায়?

সুধাংশু বলিল,—না, এমন বিশেষ কোথাও নয়। একটু বেড়াতেই চলেছি। তুমিও আসবে? না, কাজ আছে বাড়ীতে?

না:—কাজ আর কি! আর, থাকলেও আজ তো আর তাদের সে জোর নেই যে, টেনে বসে' রাখবে?—বলিয়া বিভূতি হাসিল।

দুই বন্ধুতে ফটকের ভিতর ঢুকিয়া পুষ্করিণীর এক পাশে বেশ একটু নির্জ্জন স্থান দেখিয়া বসিল। আশপাশের বাদাম ও দেবদারু প্রভৃতি গাছগুলাতে তখনো চড়াই পাখীর দল তাহাদের সন্ধ্যারাগিণীর রেশটুকু বজায় রাখিয়াছিল। পুকুরের কালো জলের উপর গ্যাসের আলোর সুদীর্ঘ ছায়াগুলা যেন আপনার সৌন্দর্য্যে আপনি স্পন্দিত হইতেছিল। ঝিরঝিরে দক্ষিণা বাতাসটুকু হিসাবী গৃহস্থের দানের মত চুপি চুপি সাড়া দিয়া যাইতেছিল।

দুইজনে কিছুক্ষণ সেই শ্যামল ঘাসের উপর নীরবে পড়িয়া থাকার পর বিভূতি কহিল,—তারপর, হঠাৎ আজ সন্ধ্যের সময় হেদোর দিকে ছুটলে কেন বল ত?

উদাস ভাবে সুধাংশু জবাব দিল,—এলুম একবার! ভালো লাগলো না বাড়ীতে।

কেন বল দিকি?

সুধাংশু এবার বিভূতির পানে চাহিয়া যেন একটু উৎসাহের সহিতই বলিয়া উঠিল,—কি জানি ভাই! কিছুই যেন আর ভাল লাগে না। সত্যি বিভূতি, কোনোদিন আমি মানতে চাইনি, আজ মানচি,—এই বিয়ে করাটা জীবনের একটা মস্ত ভুল!

বিভূতি ম্লান হাসি হাসিল। কহিল,—কারণ?

নয় তো কি? একদিকে হয় এই তোমার মত দুর্গতি, নইলে, অপরদিকে তুষের আগুনের মত জ্বালার আর কামাই নেই! তার চেয়ে বরং ও সব আপদ গেলেই বাঁচা যায়।

বিভূতি ঈষৎ বিরক্ত হইয়া কহিল,—বাজে ব'কো না। যদি কারণ কিছু বলবার থাকে বল, নইলে চুপ কর।

সুধাংশু কহিল,—না, সত্যি ভাই, আমার এ অসহ্য হ'য়ে উঠেছে। শোন, বলি। আমার শাশুড়ি বড় অসুখে ভুগছেন,—শুনে অবধি বউ তো যাবার জন্যে কান্নাকাটি করছে। শ্বশুরমশায়ও লিখেছিলেন, আমি গিয়ে তোমায় নিয়ে আসবো—তিনি এসেছিলেন, কিন্তু মা পাঠাতে অমত করেছেন। এখন তো ও আর কাউকে কিছু বলতে পারবে না; কেবল আমার কাছেই দিনরাত এই কান্নাকাটির জের চলবে। কিন্তু আমি কি করতে পারি বল তো?

বিভূতি গম্ভীর হইয়া কহিল,—তা, পাঠিয়েই দাও না একবার।

কি বিপদ! এই পাঠানোটা কি এতই সোজা বিভূতি! মা যখন একবার না বলেছেন, আমি তার ওপর কি করে' আবার সে কথা বলব?

বিভূতি খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। পরে মুখ তুলিয়া বলিল,—দেখ সুধাংশু! এ জীবনে একরোখা হ'য়ে কর্ত্তব্য করে' যাওয়াটাই একমাত্র সার্থকতা নয়। একটু-আধটু কর্ত্তব্যের হানির জন্যে যদি শাস্তির ব্যবস্থা হয়, তাহ'লে সে শাস্তি মাথায় পেতে নেওয়া ভাল, তবু চোক-কাণ বুজে এই কর্ত্তব্যের মধ্যে ডুবে থাকা ভাল নয়। শোন, একটা কথা বলি।—বলিয়া বিভূতি হাতের পোড়া সিগারেটটুকু ফেলিয়া দিয়া বলিতে আরম্ভ করিল;—

সে আজ প্রায় বছর-তিনের কথা। বউ তখন বাপের বাড়ীতে। তোমায় তো আগেই বলেছি, বাপের বাড়ীতে গিয়ে সে কোনও বেশীদিন থাকতে পারতো না। দু'পাঁচ দিন থেকেই সে নিজে আমায় চিঠি লিখে এখানে নিয়ে আসবার জন্যে তাগাদা দিত। কিন্তু, সেবার বাধ্য হ'য়ে তাকে থাকতে হয়েছিল। তখন সে প্রথম গর্ভবতী।

আমার সম্বন্ধী অতুলবাবুকে তুমি দেখেছ বোধ হয়? একদিন আমাদের বাড়ীতে কি একটা সামান্য কথা নিয়ে তাঁর সঙ্গে আমার দাদার এক তুমুল ঝগড়া হ'য়ে গেল। ঝগড়ার মুখে কেউ কাউকে আঘাত ও অপমান করতে কসুর কর্‌লেন না। অথচ, এই ঝগড়া-ঝাটির ব্যাপারটা তাঁদের কারুর কাছে বোধ করি তত বিশ্রী ঠেক্‌ল না, যত ঠেক্‌ল আমার কাছে! বাড়ীতে এই নিয়ে আলোচনা বড় কম হোল না। তবে আমি লক্ষ্য করতুম, সে আলোচনা যেন আমার উপস্থিতিতেই হঠাৎ বন্ধ হ'য়ে যেত। তার ভেতরই যা' একটু-আধটু আমি শুনতে পেতুম, তা থেকে যেন পাকে-প্রকারে এইটুকুই প্রকাশ পেত' যে, এই এত বড় একটা কাণ্ড ঘটে' যাবার পর আমার নিজের কথনই এমনি-ধারা চুপ করে' থাকা কর্ত্তব্য নয়। একটু কিছু করা যেন আমার পক্ষে নিতান্তই প্রয়োজন হ'য়ে পড়েছে। এই কর্ত্তব্যটা যে কি তাই আমি ক'দিন ধরে' ভাবছিলুম। শেষে সিদ্ধান্ত স্থির করে' ফেলে প্রভাকে আমি একখানা চিঠি লিখ্‌লুম। তাতে যা' লিখেছিলুম, তার ভাবার্থ এই:—ব্যাপার যা' হয়েছে সবই বোধ হয় তুমি শুনেছ? এ ক্ষেত্রে দোষ কোন্ পক্ষের কতটা বেশী; তা' নিয়ে মাথা ঘামাতে যাওয়া বৃথা। কিন্তু আমি ভেবে দেখ্‌লুম, এ অবস্থায় তোমার আর এখন ও বাড়ীতে থাকা উচিত নয়। আর, বোধ হয় এতে তোমার কষ্টও হবে না! সুতরাং আমার মতে তুমি ভাল করে' ভেবে দেখে যাতে এখানে চলে' আস্‌তে পারো, তাই ক'রো কিম্বা আমায় লিখো, আমি নিয়ে আস্‌বো। ইত্যাদি।

একদিন পরেই এ চিঠির উত্তর এল। সে লিখেছিল—তুমি আমায় যেতে লিখেছ; আর, এও লিখেছ, বোধ হয় এতে আমার কষ্ট হবে না। ঐ কথাটাতেই আমার মনে ভারী লাগ্‌ল। আমাদের কষ্ট কিসে হয়-না-হয় সে কথা তোমরা কি করে' বুঝ্‌বে? কিন্তু আমার তো এখন যাওয়া হবে না! এ সব কাণ্ড ঘটবার আগে হ'লে এতে আমি আপত্তি করতুম না, বরং তুমি তো জানো, তাতে আমার সুখ বই দুঃখ ছিল না। কিন্তু আজ আর তা' হয় না। তুমি আমায় ক্ষমা ক'রো। কি করব বল, বাপ-মাকে এত সহজে আমি ছাড়্‌তে পার্‌লুম না।

প্রভার তরফ থেকে এরকম চিঠি যে কোনোদিন আমার কাছে আস্‌তে পারে, তা' আমি স্বপ্নেও ভাবিনি, কেন না, আমার কথা সে বরাবর দেবতার কথা বলে' মেনে এসেছে। এই প্রথম আমি তার কাছে ধাক্কা খেলুম। সে ধাক্কার জোর এত বেশী যে, মনে হলো, এক পাষাণস্তুপের সংঘাতে আমার বুকের পাঁজরগুলো বুঝি ভেঙ্গে চুরমার হ'য়ে যাবার যোগাড় হ'ল।

সেদিন রাত্রে ঘরের মধ্যে একা বসে' বসে' চিঠিখানা যে কতবার উল্টে-পাল্টে পড়ে' দেখ্‌লুম, তার ইয়ত্তা নেই। নিষ্ফল ক্রোধে আমার বুকের নীচে কালবৈশাখীর প্রবল ঝড় উঠ্‌ল। অনেকক্ষণ স্তব্ধ হ'য়ে বসে' থেকে শেষে একখানা কাগজ বার করে' তাকে লিখ্‌লুম,—তোমার চিঠি পেয়েছি। তা বেশ, ক্ষমাই করলুম। বোধ হয় এ জীবনে এই পর্য্যন্ত!...

হা রে মানুষ! এইখানেই তার মূর্খতার চরম পরিচয়! নিজের অবাধ অধিকারের সামান্য একটু ব্যাঘাত দেখ্‌লে কি হিংস্রতা নিয়েই সে শাস্তি দেবার জন্যে তেড়ে ওঠে! সেদিন ভেবেছিলুম,—জীবনে আমার শুধু নেবারই পালা, দেবার কথা এতে আস্‌তেই পারে না!

এই শেষ চিঠির আর কোনো উত্তরই এল না। নিজেকে আমি পাষাণ দিয়ে বাঁধ্‌লুম। মনে মনে ভাব্‌লুম,—বাপ-মাকে ত্যাগ করা তার পক্ষে তত সহজ নয়, যত সহজ এই স্বামীকে ত্যাগ করা! চিঠিতে এই কথাটাই না সে ইঙ্গিতে প্রকাশ করেছে? হয়ত এত বড় একটা কথা প্রভা তার মনের কোণে মুহূর্ত্তের তরেও জায়গা দেয়নি, কিন্তু, আমার তখনকার মনের অবস্থায় তার ঐ কথার ঐ অর্থ করাটা নিতান্ত অসম্ভব নয়। দিনের পর দিন ঐ কথাটাকেই আমি আমার হৃদয়ের ফলকে বড় বড় কালো অক্ষরে গেঁথে রাখ্‌লুম। মনে যখনই সামান্য একটু দুর্ব্বলতার কাঁদুনি ওঠ্‌বার যোগাড় হোত, তখনই মূলমন্ত্রের মত ঐ কথাটা বারম্বার আউড়ে নিতুম। এমনি করে' দিন কাট্‌তে লাগ্‌ল।

চিঠিপত্র বন্ধ হ'য়ে গিয়েছিল। লোক পাঠিয়ে তারা মাঝে মাঝে আমার খবর নিত, আমি তাদের সঙ্গে

কথাটি পর্য্যন্ত কইতুম না। প্রভা কেমন আছে, এই সামান্য কথাটাও জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজন বোধ করতুম না। বাড়ীর সকলে আমার এই ভাব লক্ষ্য করে' বেশ খুসীই হয়েছিলেন। এই নিয়ে যে-সব আলোচনা চলত, তাতে সকলেই আমায় রীতিমত বাহবা দিচ্ছেন শুনতে পেতুম।

এমনি ভাবে মাসখানেক কাটল। হঠাৎ একদিন শ্বশুর-মশায় নিজে আমার বাড়ীতে এসে হাজির। আমি তখন একা নীচে বৈঠকখানায় বসে। সুতরাং পালাবার সুযোগ আমি পেলুম না। তিনি একেবারে আমার সামনে দাঁড়িয়ে আমার কুশল জিজ্ঞাসা করতে আমি কোনোরকমে নমস্কারের পালা শেষ করলুম। তিনি বললেন, দিনচারেক হ'ল প্রভার জ্বর হয়েছে, আজ একবার তুমি যেয়ো ওখানে।

মনের ভেতর ঘুমন্ত বিদ্রোহের আগুন হঠাৎ দপ করে' জ্বলে উঠল। আমাকে তার কিসের প্রয়োজন? কখখনো যাবো না। জবাব দিলুম,—আজ আমার সময় হবে না—বলেই চটি পায়ে দিয়ে বরাবর রাস্তায় বেরিয়ে পড়লুম। ঘণ্টাখানেক এদিক-ওদিক ঘুরে যখন বাড়ী ফিরলুম,—আর তাঁকে দেখতে পেলুম না। বাড়ীর ভেতর ঢুকতেই বড় বৌ মুচকি হেসে বললেন,—ছোট বৌয়ের বাবা যে তোমার নেমন্তন্ন করতে এসেছিলেন!

দেখা হয়েছে—ব'লে আমি তাড়াতাড়ি আমার ঘরে উঠে গেলুম। বড় বৌ হাসতে লাগলেন।

ঠিক তারই দিন-তিনেক বাদে হঠাৎ একদিন সকালে বাবা আমায় ডেকে বললেন,—কাল রাত্রে বৌমার একটি ছেলে হ'য়ে নষ্ট হয়েছে!

চমকে উঠলুম। তারপর বিনা বাক্যব্যয়ে আস্তে আস্তে সেখান থেকে সরে' গেলুম। মনের ভিতর প্রলয়ের একখানা কালো ছবি যেন বারম্বার ঠেলে উঠতে চাইল; কিন্তু প্রাণপণে তাকে আমি আড়াল করবার চেষ্টা করলুম।

মোটে আট মাস! এই অসময়ে এ দুর্ঘটনা কেন হয়ে গেল? বুকের ভেতর থেকে একবার যেন কে কশাঘাতে ক'রে জবাব দিতে চাইল,—তার জন্যে দায়ী আমি নিজে! কিন্তু, যুক্তি দিয়ে, নিয়তির দোহাই পেড়ে চোখ রাঙিয়ে তাকে শাসিয়ে রাখলুম।

তারপর আরও মাস-দেড়েক কাটল। সুধাংশু! সে দুর্দ্দিনেও আমি একবার প্রভাকে চোখের দেখা দেখতে যাই নি, পাছে কর্ত্তব্যের হানি হয়, পাছে স্ত্রীর প্রতি পক্ষপাতিত্ব করা হয়!

এত বড় একটা অন্যায়ের পরিসমাপ্তি অবশ্য খুব সহজেই হ'য়ে গেল। মাস-দেড়েক পরে হঠাৎ একদিন প্রভা আমাদের বাড়ীতে এসে হাজির। আমার পা দুটো জড়িয়ে কেঁদে পড়ে সে আমার ক্ষমা চাইলে; আমি তাকে বুকে টেনে নিলুম। কেন না, শেষ পর্য্যন্ত আমার স্বামীর গৌরবই অক্ষুন্ন রইল।

কিন্তু আজ? আজ আমার কি মনে হয় জানো? আজ আমার মনে হয়, যে ক্ষমা চাইলে সেই মহৎ! ক্ষমা চেয়ে সে তো আমার গৌরব বাড়ায় নি সুধাংশু! আমার চোখে ধুলো দিয়ে সে শুধু তার ক্ষমাটুকু হ'তে আমায় বঞ্চিত করে রেখেছিল! আমি অন্ধ, তাই তার সে জীবনব্যাপী অভিমানটুকু ধরতে পারিনি!

সে আজ কতদিন হয়ে গেল! আজ প্রভা আমায় ফেলে রেখে হাসতে হাসতে তার নিজের যায়গাটীতে চলে গিয়েছে!

যখনই নির্জ্জনে বসে তার কথা স্মরণ করি, তখনই সর্ব্বপ্রথম জীবনের ঐ ঘটনাটা আমার মনে আগুনের মত জ্বলে ওঠে! মনে হয়, জীবনে তাকে এত কষ্ট দিয়েছিলুম বলেই হয় ত সে এমনি বিজয়গর্ব্বে আমায় ফাঁকি দিয়ে চলে গেল।

বুকের নীচের ঐ ঘাটুকু যেন আমার কিছুতেই শুকোল না, বোধ হয় শুকোবেও না কোনোদিন!

এখন কেবল প্রতীক্ষা আর প্রতীক্ষা! কবে আবার তার সঙ্গে দেখা হবে, কবে আবার মনের এই দারুণ জ্বালা তার মার্জ্জনার হাসিতে জুড়িয়ে যাবে!

বিভূতি চুপ করিল। তাহার চোখের দৃষ্টি সামনের একটা বড় নক্ষত্রের উপর স্থির নিবদ্ধ। অদূরস্থ গ্যাসের ঝাপসা আলোয় সুধাংশু দেখিল, একটা শান্ত শীর্ণ জলরেখা তাহার গালের উপর দিয়া গড়াইয়া আসিতেছে।

বাংলা ভূমি।

[শ্রীভক্তিসুধা হার]

মোর বঞ্চিত হৃদি তালে কি পুলক নাচে রে
বাঞ্ছিত বাঁশী কার হিয়া মাঝে বাজে রে !
ভুলাল রে সব কাজ কি বিপুল হর্ষে
প্রাণে প্রাণে মধুতানে প্রীতি গান বর্ষে,
এ যে উতরোল করে মন টানে হিয়া মাঝে রে।

ওগো এই ফুলরেণুটুক্ মেখে নিতে বুকে গো
নিঝুমের নিবিড়তা মনে ধরে' সুখে গো,
নীরবতা ফুটে উঠে নীলিমার বর্ণে
তটিনীতে ঢেউ খেলে অরুণের স্বর্ণে,
আমি আপনারে মিলাবারে চাই সুখে দুখে গো।

তোর দীনতার আড়ালেও হাসি ফোটে অধরে
দীনতরে বুক ছাপি' ঝরে প্রীতি অঝোরে —
ঝক্‌মক্ আভরণে নাহি সাজ সজ্জা
ঝলমল ফুলদলে ঢেকে দিল লজ্জা
নিতি নব নব ঋতু আনি শোভা রাশি বিতরে।

চির মঙ্গলময়ী তব নির্ম্মল মরমে
অধমের মলিনতা আবরিলে সরমে
দুঃখের ব্যথাটুকু অঞ্চলে অর্পি'
লাঞ্ছিত করি স্নেহে চলে গেল দর্পি'
তুমি নীরবেই সয়েছিলে কি স্নেহের ধরমে।

ওই সন্ধ্যার ম্লান ছায়া কুন্তল জালে গো
তারকার টিপ্ জ্বলে উজ্জ্বল ভালে গো
সঙ্গীতে কেঁপে উঠে তটিনী কি ছন্দে
অন্তর হারাল রে রূপে রসে গন্ধে
মরি শ্যাম মেখলাতে শোভা পুষ্পের মালে গো।

কত যুগে যুগে কালে কালে করেছি যে সাধনা
প্রাণ দিয়ে প্রেম দিয়ে করি বেশ-রচনা
ঘিরিয়াছে হিয়াখানি যদি কভু ভ্রান্তি
দুঃখের দিনে তবু ওই বুকে শান্তি
ওগো গর্ব্ব যে সেই তোর সার্থক বাসনা।

বসন্ত রোগের দেশীয় চিকিৎসা।

[কবিরাজ শ্রীইন্দুভূষণ সেনগুপ্ত, আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রী]

গত চৈত্র মাসের 'স্বাস্থ্য' পত্রিকায় মাননীয় কবিরাজ শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ রায় মহাশয় 'বসন্ত রোগের সহজ প্রতিকার' শীর্ষক একটী প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। বৈশাখের 'অর্চ্চনা'য় উহা উদ্ধৃত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রবাবু বসন্ত রোগের সহজ প্রতিকারের বিষয় যাহা বলিয়াছেন, তদ্ভিন্ন আমি নিম্নে বসন্ত রোগের সহজসাধ্য আরও কয়েকটী দেশীয় ঔষধ প্রদান করিলাম।

আমরা বসন্ত রোগে যাহা প্রয়োগ করিয়া বিশেষ ফল পাইয়াছি, তাহাই নিম্নে প্রদত্ত হইল।

বসন্ত রোগের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার উপায়—

(১) মোচার রস দ্বারা শ্বেতচন্দন পেষণ করিয়া, কিম্বা বাসকের রস মধু দ্বারা পেষণ করিয়া পান করিলে বসন্ত রোগ হয় না।

(২) টাটকা কণ্টকারীর মূল সম পরিমাণে গোলমরিচ চূর্ণ সহ বাটিয়া সেবন করিলে এক বৎসরের মধ্যে বসন্ত রোগ হয় না।

(৩) পুনর্ণবার মূল চূর্ণ ও গোলমরিচ সম পরিমাণে জল সহ সেবন করিলে কোন কালে বসন্ত রোগ হয় না।

(৪) তেলাকুচা, মাধবীলতা, অশোক, পাকুড় ও বেতস ইহাদের কাথ চৈত্র মাসে পান করিলে বসন্ত রোগ হওয়ার আশঙ্কা থাকে না।

(৫) চৈত্র মাসের কৃষ্ণপক্ষীয় চতুর্দ্দশী তিথিতে শুভ্র-বর্ণ কলসে লোহিতবর্ণ পতাকাযুক্ত নিমের শাখা স্থাপন করিয়া বাড়ীতে রাখিলে সেই বাড়ীতে বসন্ত রোগ হইতে পারে না।

নিম্নলিখিত ঔষধগুলি বসন্ত রোগের বিশেষ ফলপ্রদ।

(১) বসন্তের পিড়কা সকল সম্পূর্ণরূপে উদ্গত না হইলে কাঁচা হরিদ্রার রস, তেলাকুচার পাতার রস অথবা শতমূলীর রস মাখনের সহিত মিশ্রিত করিয়া গাত্রে মর্দ্দন করিবে।

পিড়কার প্রথম অবস্থায়—

(২) মেথীভিজা জল, কুড় ও বাবুই তুলসীর কাথ, অথবা কুড়, বাবুই তুলসীর শিকড় ও মানকচুর শিকড়ের কাথ সেবন করিলে উপকার হয়।

(৩) কুমুরিয়া লতার কাথে ৵৹ আনা পরিমিত হিং প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করিতে দিবে।

(৪) জয়ন্তী অথবা শিকটী মূল, ঘৃত ও পর্য্যুষিত জলের সহিত পান করিতে দিলে উপকার হয়।

(৫) সুপারীর মূল কিম্বা মরিচ ও ময়না মূল, অথবা মরিচ ও নাটাকরঞ্জার মূল বাসি জলের সহিত প্রয়োগ করিবে।

(৬) শ্বেতচন্দন ঘষা ৵৹ আনা ও অর্দ্ধ ছটাক হিঞ্চে শাকের রসের সহিত পান করিলে বসন্তের স্ফোটকগুলি ভাসিয়া উঠে।

বসন্ত পাকিতে আরম্ভ করিলে—

(৭) গুলঞ্চ, যষ্টিমধু, দ্রাক্ষা, ইক্ষু মূল, ও দাড়িমের খোসা, ইহাদের কাথে কিঞ্চিৎ গুড় প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করিতে দিবে।

(৮) রক্তচন্দন, শ্বেতচন্দন, নিমছাল, ক্ষেৎপাপড়া, আকনাদি, পলতা, বেনামূল, কটকী, আমলকী, বাসকছাল ও দুরালভা ইহাদের কাথ শীতল করিয়া কিঞ্চিৎ চিনি প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে পিত্তজ বসন্ত ভাল হয়।

(৯) পলতা, গুলঞ্চ, মুথা, বাসক, দুরালভা, চিরতা, নিমছাল, কটকী ও ক্ষেৎপাপড়া ইহাদের কাথ পান করিলে অপক্ক প্রশমিত ও পক্ক বসন্ত বিশুষ্ক হয়।

(১০) গুলঞ্চ, যষ্টিমধু, রাস্না, শালপাণি, চাকুলে, বৃহতী ও কণ্টকারী গোক্ষুর, রক্তচন্দন, গাম্ভারী ফল, বেড়েলা মূল ও বৈচি মূল, ইহাদের কাথ বাতপ্রধান বসন্ত রোগের পকাবস্থায় পান করিলে বিশেষ উপকার হয়।

(১১) কিস্‌মিস, গাম্ভারী ফল, খর্জ্জুর, পলতা, নিম-ছাল, বাসক, লাজ (খৈ), আমলকী ও দুরালভা, ইহাদের কাথ চিনি সহ পান করিলে পিত্তজ বসন্ত ভাল হয়।

(১২) দুরালভা, ক্ষেৎপাপড়া, চিরতা ও কটকী, ইহাদের কাথ পিত্তপ্রধান ও শ্লেষ্মপ্রধান বসন্ত রোগে প্রয়োগ করিলে বিশেষ ফল হয়।

বসন্ত রোগে মুখে ও কণ্ঠে ব্রণ উৎপন্ন হইলে—

(১৩) আমলকী ও যষ্টিমধুর কাথে কিঞ্চিৎ মধু প্রক্ষেপ দিয়া তদ্দ্বারা গণ্ডুষ করিতে দিবে।

(১৪) জাতীফল, মঞ্জিষ্ঠা, দারু হরিদ্রা, সুপারি, শমীকাষ্ঠ, আমলকী ও যষ্টিমধু ইহাদের কাথে মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিতে দিবে।*

বসন্ত রোগে অবশ্য পালনীয়—

(১) বসন্ত উপস্থিত হইলে রোগীর ও গৃহস্থ সকলেরই অতি পবিত্র থাকা, জপ, হোম, পূজা ও শীতলাস্তোত্রাদি পাঠ করা কর্ত্তব্য।

(২) বসন্তরোগজনিত জ্বর হইলে জল স্পর্শ করিবে না, সর্ব্বাঙ্গে ভাঙ্গ (সিদ্ধি) চূর্ণ মালিস করিবে ও নির্ব্বাত স্থানে থাকিবে।

(৩) রুদ্রাক্ষ অল্প ঘষিয়া ৩টী গোলমরিচ চূর্ণ ও পর্য্যুষিত জল সহ তিন দিন সেবন করিবে। ইহা দ্বারা বসন্ত রোগে বিশেষ উপকার হয়।

(৪) কুমারিয়া লতার মূল ২ তোলা ৷৹ সের জল সহ সিদ্ধ করিয়া ⁄৵৹ অর্দ্ধ পোয়া থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া খাইবে।

* প্রস্তুত প্রণালী—উপরোক্ত ঔষধগুলির যেগুলির পরিমাণ দেওয়া হয় নাই তাহারা সর্ব্বশুদ্ধ মোট ২ তোলা হইবে,—অর্দ্ধসের জলে সিদ্ধ করতঃ অর্দ্ধ পোয়া থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সেবন করিতে দিবে।

(৫) অনন্ত মূল ॥০ অর্দ্ধ তোলা, আতপ চাউলের সহিত জল সহ বাটিয়া খাইলে বসন্ত রোগ ভাল হয়।

(৬) এই রোগে অত্যন্ত দাহ হইলে পর্য্যুষিত জল মধ্যে অল্প মধু মিশ্রিত করিয়া খাইতে দিবে।

(৭) পায়ে বসন্ত হইয়া অবিরত জ্বালা হইলে আতপ চাউলের জল দ্বারা উক্ত স্থান ভিজাইয়া রাখিবে।

(৮) শুষ্ক কুলচূর্ণ ৶০ আনা, অর্দ্ধ তোলা ইক্ষুগুড় সহ প্রাতঃকালে পান করিলে অতি শীঘ্র সকল প্রকার বসন্ত পাকিয়া উঠে।

(৯) টাবালেবুর রস কাঁজি সহ বাটিয়া প্রলেপ দিলে বসন্ত ও দাহ নিবারিত হয়।

(১০) কণ্ঠ পরিষ্কারের জন্য পিঁপুল চূর্ণ মধুর সহিত অবলেহন করিতে দিবে।

পথ্যাপথ্য—

রোগের প্রথমাবস্থায় ক্ষুধানুসারে দুগ্ধ সাগু বা দুগ্ধ বার্লি প্রভৃতি লঘু পথ্য আহার করিতে দিবে। পরে ক্ষুধাবৃদ্ধি অনুসারে এবং জ্বরাদির অবস্থা বিবেচনা পূর্ব্বক অন্ন প্রভৃতি আহার করিতে দিবে। বেগুন, পটল, কাঁচাকলা, ডুমুর প্রভৃতির তরকারী ও বেদানা, কিস্‌মিস্, কমলালেবু ও আনারস প্রভৃতি ফল খাইতে দিবে। গাত্রে সর্ব্বদা মোটা কাপড় রাখা কর্ত্তব্য।

মৎস্য, মাংস, উষ্ণবীর্য্য দ্রব্য ও গুরুপাক দ্রব্য এই সকল পদার্থ ভোজন, তৈল মর্দ্দন ও বায়ু সেবন এই পীড়ায় বিশেষ ভাবে বর্জ্জন করিতে হইবে। বসন্ত অতিশয় সংক্রামক ব্যাধি, সুতরাং বসন্ত রোগীর নিকট হইতে যতটা সম্ভব দূরে থাকিতে চেষ্টা করিবে।

তুমি।

[শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায় বি-এ]

তুমি আমার শিষ্যা সখি
তুমি আমার প্রেয়সী,
দুখের মাঝে শান্তি তুমি,
তুমি আমার শ্রেয়সী।

আমার হৃদয় মরুভূমে
ফুটাও কুসুম তোমার চুমে—
তাহার মাঝে বহাও আনি'
শান্ত শীতল সরসী।

তোমার কোলে মাথা রেখে
কল্প লোকের স্বপ্ন দেখে
চাই ঘুমুতে শ্রান্ত আমি
ওগো আমার মানসী।

আমার শুষ্ক ওষ্ঠপুটের
তুমি তৃষার পানীয়—
তোমার সভায় যাব যখন
তৃষ্ণা আমার হানিও।

আমায় পরম তৃপ্তি দানে
ভুলিয়ে রেখ' হাসি গানে—
কাব্য-কথার আলাপনে
তোমার পানে টানিও।

প্রেমে নাইক জাতি বিচার
প্রেম যে করে সব একাকার—
মগের সনে মেশে মোগল
এইটী শুধু জানিও।

চাঁদপ্রতাপের ব্রত-কথা।

[শ্রীযোগেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী]

(১০) তারাব্রত।

মাঘ মাসের প্রথম দিবসে আরম্ভ করিয়া সংক্রান্তি দিন পর্য্যন্ত প্রত্যহ এই ব্রত করা হইয়া থাকে। অবিবাহিতা বালিকারাই এই ব্রত করিয়া থাকে। সন্ধ্যার পর আকাশে অন্ততঃ ষোলটি তারা উদিত হইলে পর ব্রত করিতে হয়। ব্রতের প্রথম ও শেষ দিবসে ব্রতিনীকে উপবাস করিতে হয়। ব্রতিনী নিতান্ত শিশু হইলে অথবা শারীরিক দুর্ব্বলতাদি হেতু উপবাস করিতে না পারিলে, উহার জননী কিংবা অন্য কোন অভিভাবিকা তাহার পরিবর্ত্তে উপবাস করিয়া থাকেন। প্রতিদিনই সন্ধ্যার পূর্ব্বেই উঠানে চাউলের গুঁড়ি (চূর্ণ) দিয়া একটি বৃত্ত, উহার মধ্যে ষোলটি তারা, উহার পূর্ব্বে সূর্য্য ও পশ্চিমে চন্দ্রের মূর্ত্তি অঙ্কিত করা হয়। এই সকল চিত্রের পার্শ্বে আয়না, চিরুণী, খড়ম, ও আসনের চিত্র আঁকিতে হয়। ক্রমান্বয়ে চারি বৎসর ব্রত করিয়া ব্রতিনীকে ব্রত শেষ (প্রতিষ্ঠা) করিতে হয়। প্রথম বৎসর প্রথম দিন (মাঘের ১লা তারিখ) খৈ, মোয়া (মোদক), বাতাসা ইত্যাদি পূর্ণ চারিটি সরা (মৃৎপাত্র) ও দধিপূর্ণ চারিটি খোরা (ক্ষুদ্র মৃৎপাত্র) ব্রত স্থানে রাখিতে হয়। পর বৎসর সমূহে সংক্রান্তি দিন উক্ত উপকরণাদি দেওয়া হইয়া থাকে। সরা ও খোরা দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ বৎসরে যথাক্রমে আটটি, বারটি ও ষোলটি করিয়া দেওয়া হইয়া থাকে।

যথাসময়ে ব্রতিনী মৃত্তিকার উপর অঙ্কিত আসনের উপর উপবেশন করিয়া, হাতে পুষ্প লইয়া ভক্তিভরে নিম্নলিখিত কবিতা আবৃত্তি করিয়া থাকে,—

এক তারা পূজি, দুই তারা পূজি,
ষোল ষোল তারা পূজি।
ষোল ষোল তারা।
তোমরা হইও সাক্ষী।
ঘৃত দিয়া করি আমি পঞ্চগ্রাসী।
শিব জিজ্ঞাসা করেন,—"গৌরি।
মর্ত্ত্যে কিসের জোকার (হুলুধ্বনি) পরে ?"
"তারাব্রত করে।"
"তারাব্রত করলে কি ফল হয় ?"
"শিব হেন সোয়ামী (স্বামী) পায়;
কার্ত্তিক, গণেশ পুত্র পায়,
লক্ষ্মী সরস্বতী কন্যা পায়—
জয়া বিজয়া দাসী পায়,
অর্জ্জুন হেন ভাই পায়—
লক্ষ্মণ হেন দেবর পায়।"
ষোল বর্ত্তীর (ব্রতিনীর) হাতে ষোল সরা দিয়া,
আমি গেলাম ইন্দ্রপুরে নৌটা * হইয়া।
চন্দ্র সূর্য্যে দিয়া ফুল
ভইরা (ভরিয়া) উঠুক তিন কুল।

তৎপর ব্রতিনী নিম্নলিখিত ছড়া বলিয়া থাকে,—

উত্তরে মান্দার, সোণা রূপায় আন্ধারি।
আমি পূজি পিঠালিব (তণ্ডুল চূর্ণের) কাকই (চিরুণী),
আমার হয় যেন সোণার কাকই।

এইরূপ আয়না প্রভৃতির উল্লেখ ছড়ায় আছে। লিপি-বাহুল্যভয়ে তৎসমুদয় লিখিত হইল না।

সর্ব্বশেষে মৃত্তিকার উপর অঙ্কিত খড়মের চিত্রের দিকে লক্ষ্য করিয়া ব্রতিনীকে নিম্নলিখিত কবিতাটী আবৃত্তি করিতে হয়,—

উচ * খড়মে দিয়া পাও (পা),
সু-সোয়ামীর ঘরে যাও।

প্রতি বৎসরই ব্রতের প্রথম ও শেষ দিন প্রথমেই পুরোহিত চন্দ্র ও নক্ষত্রাদির পূজা করিয়া থাকেন। তৎপর ব্রতিনী উপরোক্ত ছড়াগুলি আবৃত্তি করিয়া থাকে। মাঘমণ্ডলের ব্রতের ন্যায় এ ব্রতেও যে বালিকারা সুশিক্ষা লাভ করিয়া থাকে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

এই ব্রতের 'কথা' নাই। ছড়া আবৃত্তির পরই ব্রত শেষ হইয়া থাকে। একই উঠানে এক কিংবা একাধিক বালিকা ব্রত করিতে পারে। খাদ্যোপকরণাদি সধবা মহিলা ও বালক বালিকাগণকে দেওয়া হইয়া থাকে।

---

* চিহ্নিত শব্দদ্বয়ের অর্থ বুঝিতে পারিলাম না।—লেখক।

মায়ের পূজা।

[শ্রীকৃষ্ণপদ দাস]

সহসা মহাসমুদ্রের প্রশান্ত ভাব দেখিয়া নাবিক যেমন ভাবে, এ ঝড়ের পূর্ব্ব লক্ষণ, আমাদের ভবেশের হঠাৎ গাম্ভীর্য্য দেখেও মেসের সকলে স্থির করিল এও বড় রকমের একটা কিছুর পূর্ব্ব সূচনা।

মেসের নিরানন্দ বাড়ীখানাকে একা ভবেশই মাতিয়ে রাখে। তার প্রাণখোলা হাসিতে, শাদা প্রাণের শাদা গানে, কথায়, তর্কে, ব্যবহারে সকলেই আনন্দ অনুভব করিত। তাস পাশা দাবা খেলাতে সে অদ্বিতীয়—শেলীর কবিতা ভাল কি টেনিসনের ভাল, রবিঠাকুরকে কোন্ শ্রেণীভুক্ত করা যায়, এসব আলোচনার মীমাংসা একা ভবেশ ছাড়া আর কেউ কর্‌তে পার্‌ত না।

যাক্, ভবেশের ভাবান্তর লক্ষ্য করে সকলে বেশ একটু চিন্তিত হলো। কারও সাহসে কুলাল না যে তাকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করে। সুকুমার ছিল তার অন্তরঙ্গ। কোন কঠিন সমস্যার মীমাংসা না হ'লে, সেই আলোচনায় যখন তার চিত্ত ভারাক্রান্ত হ'ত, তখন সে সুকুমারকে ডাকত। দুজনে মিলে একটা পথে এসে নিশ্চিন্ত হ'ত।

আজ কাল ভবেশ নীরব, সুতরাং মেসটাও নীরব।

রাতের খাওয়া শেষ হ'য়ে গেছে। ভবেশ তার ঘরে বসে খোলা জানালার ভেতর দিয়ে জ্যোৎস্নাভরা বাইরের দিকে চেয়ে আছে। অনাবিল চাঁদের আলো খানিকটা তার মুখের উপর এসে পড়ে চিন্তাক্লিষ্ট ললাটের কুঞ্চিত রেখাগুলো স্পষ্ট করে দেখিয়ে দিচ্ছে। এমন সময় সুকুমার পা টিপে তার কাছে এসে ডাকলে—"ভবেশ।"

ভবেশ যেন স্বপ্নজগত হ'তে এইমাত্র মাটীর জগতে নেমে এল। সবিস্ময়ে বললে—"কে?—ওঃ! কতক্ষণ এয়েছিস্?"

"বেশীক্ষণ নয়, এইমাত্র।"

"তার পর কি মনে করে চোরের মত এলি?"

"একটা কথা জিজ্ঞাসা করব, ঠিক উত্তর দিবি?"

"গৌরচন্দ্রিকা ছাড় না ভাই, সোজা ভাষায় স্পষ্ট করে বলিস তো শুনতে রাজি আছি—আর সাধ্যমত গোপন না করে উত্তর দেবো।"

"আচ্ছা, তোর এ মৌনব্রতের কারণ কি? হঠাৎ একেবারে চুপ।"

"কেন, ভয় পেয়েছিস না কি?"

"নাঃ—"

"তবে?"

"এমনই জানতে ইচ্ছা হ'ল।"

"আচ্ছা শোন তবে—দেখ সুকুমার, আজ ক'দিন হ'তে ভাবছি—এত বড় যে একটা আন্দোলন সমস্ত ভারত (পৃথিবী বল্লেও অত্যুক্তি হয় না) জুড়ে যার বিস্তৃতি, আশ্চর্য্য যে তার স্পর্শ আমাদের কারো প্রাণে লাগেনি। আমরা তেমনই জড়ের মত বসে আছি।"

"কি করতে চাস তুই?"

"করবার কি কিছুই নেই সুকুমার! সমস্ত জীবনটাই তো এখনও বাকী। কলেজ যাওয়া, বাপমায়ের কষ্টার্জ্জিত অর্থের সদ্ব্যবহার করা ছাড়া কি আর কোন কাজ নেই?"

"কাজ নেই, একথা কে বলছে? আমরাই কোন্ নিষ্কর্ম্মা আছি।"

"সুকুমার! কাজ একে বলে না। দেশের কাজ—মায়ের সেবা করা চাই।

"তোর মাথা খারাপ হয়ে গেছে ভবেশ। আজ বাদে কাল এগ্‌জামিন; আর তোর মাথায় এই কুবুদ্ধি গজাল। মতলব কি বল দেখি, কলেজ ছাড়বি না কি?"

"যে শিক্ষা আপনার ভাইকে অবিশ্বাস করতে শেখায়—যে শিক্ষায় মাকে চিনতে দেয় না—যে শিক্ষা নিজেদের অবস্থার কথা ভাবতে শেখায় না—যে শিক্ষায় উদরান্নের জন্য পরের দোরে ভিক্ষা করতে শেখায়—সে শিক্ষায় দরকার কি সুকুমার?"

(২)

ভবেশ ধনীর সন্তান। তাহার পিতা এক বিস্তৃত জমিদারী রেখে পরলোক গমন করেন। এই জমিদারীর আয় ছিল বার্ষিক পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা। যখন পিতৃবিয়োগ হয়, তখন ভবেশের বয়স ছিল ১০ বৎসর। সাংসারিক বা বৈষয়িক কোন বিষয়েই তাহার অভিজ্ঞতার লেশ মাত্র ছিল না। বৃদ্ধ নায়েব তারিণী মুখুজ্যে তার পিতামহের আমল হ'তে আজও কাজ করছেন। ভবেশকে তিনিই কোলে পিঠে করে' মানুষ করেছেন।

ভবেশ বিবাহিত। যে বৎসর তার বিয়ে হয়, সেই বৎসরেই পিতৃবিয়োগ হয়। পত্নী সারদা তার আদর্শ সহধর্ম্মিণী। মনোমত সঙ্গিনী পেয়ে ভবেশের বিবাহিত-জীবন বেশ সুখেই কাটছিল। সে প্রতি শনিবারেই বাড়ী আসত। পাল পার্ব্বণের কোনও ছুটীতে সে কলিকাতায় কাটাত না।

বৃদ্ধ নায়েব মশাই অবসর নিলেন। সঙ্গে সঙ্গে দুষ্ট রাহুগ্রহের মত কোথা হ'তে তার মামা হরিহরবাবু এসে তার মায়ের হৃদয় আচ্ছন্ন করে' বসল। ভবেশ কোন কালেই কিছু দেখত না। আর দেখবার বোঝবার ক্ষমতা তার ছিল না। মামাই এখন সর্ব্বেসর্ব্বা। মা ভবানী দেবী এখন তাঁর আদেশেই পরিচালিত হন।

* * *

গুডফ্রাইডের ছুটীতে বাড়ী আসতেই দীনু মোড়ল, ভোলা মুচী, করিম শেখ তার কাছে কেঁদে পড়ল, "বাবা ক্ষেতের ফসল ঘরে না তুলে পৌষ কিস্তির টাকা দিতে পারব না। আমাদের আর্জ্জিটুকু তোমাকে মঞ্জুর করতেই হ'বে।"

ভবেশ মামাকে বল্লে—"প্রজারা বলে, ফসল না তুলে পৌষ কিস্তির খাজনা দিতে পারবে না—একেবারে চোত-কিস্তিতে দেবে; তাই করে' নিও মামা—তাদের এখন আর তাগাদা করবার দরকার নেই।"

'সে ভাবনা তোমার ভাবতে হ'বে না বাবাজী—তুমি তোমার পড়াশুনো দেখ—ওসব দেখতে শুনতে গেলে পড়ার ক্ষতি হবে।" ভবানী দেবীর দিকে তাকিয়ে বল্লেন—"দেখ দেখি দিদি, প্রজারা কি বলে না বলে সেকথা শোনবার জন্যে তো আমি রয়েছি।"

ভবানী দেবী বললেন—"হরি যা' বলে তাই কর বাবা।"

তিনি ইদানীং হরিহরবাবুর উপর একান্ত নির্ভরা হইয়াছেন। সমস্ত দিনই পূজা অর্চ্চনা নিয়ে থাকেন। ভাল মন্দ কোন কাজই দেখেন না। হরিহরবাবু এই সুযোগে বুদ্ধিমানের যা' করা উচিত, তাই করতে লাগলেন।

(৩)

গ্রীষ্মের ছুটীতে বাড়ী এসে ভবেশ শুনলে প্রজারা অনেকেই গাঁ ছেড়ে অন্যত্র চলে গেছে। ভবেশ মামাকে বললে—"মামা, এ কি শুনছি, অনেক প্রজাই না কি গাঁ ছেড়ে গেছে?"

মামা বললেন—"শা—রা ভারী পাজী বাবাজী; যাক্ না, দু'দিন পরে ফিরে আসতেই হবে। না হয়, নতুন প্রজা বসাব। ভাত ছড়ালে কাকের অভাব হয় না বাবাজী।"

ভবেশ মাকে বললে, "এ ভাল বুঝচি না মা—প্রজারা সব মামার অত্যাচারে ভিটে-মাটী ছেড়ে পালাচ্ছে।"

মা বললেন, "হয় ত তোকে কেউ মিথ্যে খবর দিয়েছে বাবা। হরি আমাদের মন্দ করে না।"

* * *

অনেক দিনের বিরহের পর আজ মিলনের রাত্রি। রাত্রে খাওয়া দাওয়া শেষ ক'রে ভবেশ শোবার ঘরে অর্দ্ধশায়িত থেকে অনেক কথাই ভাবতে লাগল। সারদা ধীর সঙ্কোচে ঘরে ঢুকে পাশে বসল। ভবেশের একটু তন্দ্রা এসেছিল, সারদার আগমন জানতে পারে নি। নির্ব্বাক হ'য়ে বসে থাকা সারদার স্বভাব নয়। সে বললে, "কি গো মহাপুরুষ! কিসের ধ্যান হচ্ছে?"

"ধ্যান, না হ্যাঁ—একটা কথা ভাবছি।"

"ভাবছ তা ত বেশই বুঝতে পারছি, জানতে চাই; ভাবনার অংশ কি একটু পেতে পারি না?"

"পেতে কেন পারবে না, একটু নয় সবটাই পাবে।"

"না গো দয়াময়, সবটা নিলে সইতে পারিব না—আমি যে অর্দ্ধাঙ্গিনী।"

"অর্দ্ধেকই নাও, শোন —"

"দাঁড়াও, আগে ঠিক হ'য়ে বসি" ব'লেই মাথার কাপড়টা একটু টেনে দিলে। হাওয়ায় উড়ে পড়া, ঘামে ভেজা দু' এক গাছা চুল সরিয়ে দিতেই মুখখানা মেঘ-জালমুক্ত শরতের শশধরের মত হ'লো। একটু সোজা হয়ে বসে সারদা ব'ল্লে—"হাঁ, বল, তারপর?"

"সারদা! তুমি হাসি দিয়ে আমার মস্ত বড় ব্যথাকে ঢেকে রাখছ।"

"এই নাও, আবার বন্দনা সুরু হ'ল। ওগো স্তব স্তুতির মধ্যে আমায় বাঁধতে যেও না। আমি আপনা হ'তেই বাঁধা পড়ে আছি। নাও—বল—"

"আচ্ছা সারদা, মিছে জমিদার সেজে কি লাভ? মিথ্যার খোলসটা ছিঁড়ে ফেলে স্ব-রূপ দেখান উচিত নয় কি?"

"পায়ে পড়ি তোমার হেঁয়ালি ছাড়—"

"জান তুমি, মা কিছু দেখেন না—জপ তপ নিয়েই আছেন। জমিদার আমি—অন্ততঃ লোকে তাই জানে। কিন্তু আমি কে? মামাই সব। আমাকে কেবল সং সাজিয়ে লোকের সামনে দাঁড় করিয়েছে, মামার অত্যাচারে প্রজারা আজ ত্রস্ত। তারা জানে আমি তাদের জমিদার, অত্যাচারী নির্দ্দয় প্রাণহীন পশু। তাদের দেখাতে চাই আমি পশু নই, মানুষ—তাদের মত আমারও প্রাণ আছে, অনুভব করবার শক্তি আছে।"

"কিন্তু উপায় কি?"

"উপায় আমি ভেবেছি সারদা, এ মিথ্যার আবরণ আমি ভাঙ্গব—আমার স্ব-রূপ তাদের দেখাব।"

মামা কি সহজে ছাড়বে, বাধা দেবে না?"

"সে কথাও ভেবেছি,তুমি আমার সহায় থেকো সারদা, বিপদের ভারে নুয়ে পড়লে—নিরাশায় ক্লান্ত হ'য়ে তোমার কাছে ছুটে এলে তুমি শান্তির কোলে আমার ব্যথিত মাথাটি তুলে নিও!"

(৪)

মা বললেন, "হ্যাঁ ভবেশ, তুই না কি প্রজাদের সব ক্ষেপিয়েছিস?"

ভবেশ তখন তার গৃহচিকিৎসার বাক্সটী নিয়ে বাইরে যাচ্ছিল, তার চোখে মুখে ব্যস্ততা ফুটে উঠেছিল—কথাটা তার কানে গেল না, ভাল করে না শুনেই জবাব দিলে "হ্যাঁ।"

আজ ক'দিন হ'ল হরিহরবাবু ভবেশের মাকে ক্রমাগত লাগাচ্ছিলেন—ভবেশ নাস্তিক হ'য়েছে,দেব দ্বিজ মানে না—প্রজাদের খাজনা মাপ করেছে। আবার তাদের স্বদেশীতে মাতিয়েছে। কোন্ দিন হয় ত পুলিসের হাঙ্গামে পড়বে।

জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে মৃতের সৎকার, রোগীর শুশ্রূষা, ঔষধ পথ্য দেওয়া, এগুলো ভবেশের নিত্যকর্ম্ম হয়েছে। তার চেষ্টায় গাঁয়ে একটা দল হয়েছে। বেকার যুবারা সকলেই তার সঙ্গে যোগ দিয়ে এই কাজে যথেষ্ট সাহায্য করছে। ইতর ভদ্র সকলেরই মুখে ভবেশের সুখ্যাতি।

মা একদিন বললেন, "কলেজ ছেড়ে দিলি ভবেশ?" সেদিনও ভবেশ বড় ব্যস্ত ছিল, সংক্ষেপে উত্তর দিল "হ্যাঁ।"

হরিহর বাবু ভবেশকে ভয় করতেন। সুমুখে কোন কথা বলবার সাহস তাঁর ছিল না।

ছুটি প্রায় শেষ হ'য়ে এল। ভবেশ তার দলকে ধীর ও শান্তভাবে থেকে কাজ করতে উপদেশ দিয়ে কলিকাতায় গেল। ব'লে গেল শীঘ্রই ফিরে আসবে।

* * *

হঠাৎ একদিন সংবাদ গেল জমিদারী নিলামে উঠেছে। নিলামের কারণ বুঝতে ভবেশের বিলম্ব হ'ল না। ভবেশ বাড়ী গেল, কিন্তু নিলাম রদ করতে পারল না।

সারদা বললে, "একবার দেখলে না কেন?"

ভবেশ উদাস ভাবে বললে, "দরকার নেই—মামা নিচ্ছে নিক্। মার যখন এত বিশ্বাস তাঁর উপর।"

"মার উপর রাগ করে' এ যে নিজেরই অনিষ্ট করছ।"

"যার অর্দ্ধেকেরও বেশী ভাই সব অনাহারে অর্দ্ধাহারে মরে, জমিদার হ'য়ে ভোগে থাকা তার শোভা পায় না সারদা। যাক্ দিন কতক "ফকিরী" নেওয়া যাক্।"

কিছুদিন পরে মা একদিন ডাকলেন, "ভবেশ"।

তাঁর পাশে বসে ভবেশ বল্লে, "কেন মা?"

"জমিদারী গেল?"

"গেল বই কি মা।"

"ডাকতে পারলি না?"

"টাকা কোথায় পাব মা?"

"কত টাকা অপব্যয় করেছিস্ বল দেখি, তোর বেহিসেবী খরচের জন্তই তো—"

বাধা দিয়ে ভবেশ বললে, "থাম মা, বাজে খরচ আমি কিছু করিনি। আর তোমার জমিদারীর তবিল থেকে এক পয়সাও আমার কাজে নিই নি। সারদার টাকায়—"

"থাক্, আর বল্‌তে হবে না। পরে, ধরা গলায় বল্‌লেন "এবার পূজো হবে না বাবা?"

"কেন হবে না মা?"

"টাকা কোথায় পাবি বাবা?"

ঠিক কথা, কিন্তু মা, আমার মনে হয় এবার সত্যিকারের পূজো হবে।"

*　*　*　*

সব শুনে সারদা গায়ের গহনা খুলে ভবেশের কাছে রেখে বল্‌লে, "মা—যখন মাকে আনতেই হবে—কত দিনের পূজো।—আমাদের হ'তে কিছুতেই বন্ধ হবে না।"

ভবেশ বল্‌লে, "স্বামী হ'য়ে তোমার গায়ের গহনা নিয়ে মার সাধ পূর্ণ করব? না, থাক্ সারদা।"

ভবেশের হাত দুখানি ধরে সজল চোখে সারদা বল্‌লে "ওগো পায়ে পড়ি তোমার, এতো তুমি নিজের কাযে খরচ করছ না—মায়ের পূজার অধিকার কি আমার নেই।"

বৃদ্ধ উকিল তারিণী মুখুজ্যের কাছে গহনাগুলো রেখে টাকা নিয়ে ভবেশ সুকুমারকে সঙ্গে নিয়ে পূজার বাজার করতে লাগ্‌ল।

তারিণী মুখুজ্যে একদিন ভবেশের বাড়ীর সামনে দাঁড়িয়ে ডাকলেন, "ভবেশ"।

ভবেশের মা বাইরে এসে মুখুজ্যে মশাইকে দেখ্‌তে পেয়ে বল্‌লেন, "ভেতরে আসুন না।"

"আর যাব না, একটা খবর ছিল, ভবেশকে পেলে ভাল হ'ত।"

"সে তো এখানে নেই—কল্‌কাতা গেছে।"

"ওঃ, আমারই ভুল হয়েছে, আসি মা, ভবেশ এলে একদিন দেখা করতে বল্‌বেন।" বলে তিনি চলে গেলেন। সুকুমারের সঙ্গে ভবেশ বাড়ী ফির্‌ল।

ষষ্ঠীর দিন বোধন হবে। মা বল্‌লেন, "প্রতিমা কই?"

ভবেশ বল্‌লে—"প্রতিমা! বলে দিয়েছি কাল আস্‌বে।"

সকালে পুরোহিত ঢোলের বাজনা আর সানাইয়ের সুরের সঙ্গে নদীতীর হ'তে নবপত্রিকা স্নান করিয়ে নবীন জমিদার হরিহর বাবুর বাড়ীতে প্রবেশ করলেন। দলে দলে পাড়ার ছেলেরা বুড়োরা নতুন জমিদারের পূজাবাড়ীতে ঢুকতে লাগ্‌ল।

ভবেশ সকালেই বাড়ী হ'তে বেরিয়েছিল। গাঁয়ের ছোটলোকদের নিমন্ত্রণ করে অনেক বেলায় বাড়ী ফির্‌ল।

সুকুমার উঠানের মাঝে চুলো কেটে রান্না চড়িয়েছে, সারদাও তার সঙ্গে যোগ দিয়েছে।

কাতারে কাতারে কাঙ্গালীর দল আস্‌তে লাগ্‌ল। ভবেশ তাদের সার বেঁধে বসিয়ে দিচ্ছে—সারদা অন্নপূর্ণার মত তাদের সকলকে পরিবেশন কর্‌তে লাগ্‌ল। ভবেশ ও সুকুমার তাকে সাহায্য কর্‌তে লাগ্‌ল।

দীনু মোড়ল, করীম সেথ ও ভোলা মুচী ইত্যাদি যারা গাঁ ছেড়ে গিয়েছিল তারা সকলেই এসেছে। তাদের মধ্য হ'তে কে একজন ব'লে উঠ্‌ল, "মা কৈ?"

"শালা মুখ্যু মাকে দেখতে পাচ্ছিস্ না, ঐ যে মা।"

"কই?"

"ওই যে থালা হাতে পাটের শাড়ী প'রে।"

আহারের পর ভবেশের মা সকলকে এক একখানি খদ্দরের কাপড় দিলেন। খদ্দর পরিহিত হাস্যমুখ কাঙ্গালীদের এক নবীন শ্রী ফুটে উঠ্‌ল। তাদের জয়ধ্বনিতে—কলহাস্যে বাড়ীখানি মুখরিত হয়ে উঠ্‌ল। ভবানীদেবীকে প্রণাম করে তারা সকলে দাঁড়াল।

এই সময় নবীন জমিদার বাড়ী হ'তে ব্রাহ্মণেরা ভোজনের পর পুটুলি বেঁধে ঘরে ফির্‌ছিলেন। দলের প্রাচীন শিরোমণি ঠাকুর বল্‌লেন—"কই হে ভবেশ, প্রতিমে কই?"

বিনীত ভাবে ভবেশ বল্‌লে—"এই যে শিরোমণি মশায়, দেখতে পাচ্ছেন না?"

শ্রেণীবদ্ধ গরীবদের দিকে আঙুল দেখিয়ে ভবেশ বল্লে—"এই যে সব মায়ের সজীব প্রতিমূর্ত্তি। মা তো আমার খড় মাটীর পুতুল নয় শিরোমণি মশাই!—মা যে সাকারা। আমাদের মা রাংতার সাজ পরেন না, তিনি পরেন আমার দেশের আমার ভাইয়ের হাতের তৈয়ারী ঐ পবিত্র কাপড়। মা আমার পরমেশ্বরী—কখন পুরুষ কখন নারী। এরাই তো সব মা। সজীব—নির্জ্জীব নয়। এদের পূজাই তো মায়ের পূজা।

"ওঃ, এই তোর মায়ের পূজা" ব'লে তিনি যাবার উপক্রম কর্‌তেই তারিণী মুখুজ্যে এসে সারদার গহনাগুলো ভবেশের হাতে দিয়ে বল্‌লেন—"হাঁ, এই মায়ের পূজা। ভবেশ, দীর্ঘজীবি হও বাবা, আর বছর বছর এমনি করে মায়ের পূজা কর।"

সংগ্রহ ও সঙ্কলন।

শিশুর খাদ্য।

স্তন্য দুগ্ধই শিশুর প্রধান খাদ্য। মানব শিশু ভূমিষ্ঠ হইবার পর দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত অতি অসহায় অবস্থায় কাল যাপন করিয়া থাকে। এই সময় তাহার জীবন যাত্রার সম্পূর্ণ ভার তাহার জননীর উপর নির্ভর করিয়া থাকে। তিনি কৃপা পরবশ হইয়া স্তন্যপান করাইলে তাহার ক্ষুৎ-পিপাসার নিবৃত্তি হয়। তাহার একস্থান হইতে অন্যস্থানে যাইবার ক্ষমতা থাকে না। তাহার মাতা তাহার শয্যা পরিবর্ত্তন না করিয়া দিলে, তাহাকে মূত্রসিক্ত বিছানায় শুইয়া থাকিতে হয়। মাতা যদি সন্তানের প্রতি অবহেলা করেন, তাহা হইলে তাহার প্রাণ রক্ষা হয় কি করিয়া! বুঝি এই জন্যই পরম কারুণিক সৃষ্টিকর্ত্তা মাতৃ-হৃদয়ের এক নিভৃত স্থানে স্নেহের অফুরন্ত ভাণ্ডার গচ্ছিত রাখিয়াছেন—সন্তান যন্ত্রণায় অভিভূত হইয়া ক্রন্দন করিলে শত আবেগ আসিয়া মাতৃ-হৃদয়ের সেই স্নেহের রুদ্ধ কপাট খুলিয়া দেয়! মা আর থাকিতে পারেন না। শত কার্য্য থাকিলেও তাহা ফেলিয়া রাখিয়া ছুটিয়া আসিয়া তাহাকে বুকে তুলিয়া লন—তাহার চন্দ্রবদনে চুম্বন করেন। অপত্য স্নেহের এমনি মহিমা!

শিশু ভূমিষ্ঠ হইবার পর কিছু কাল মাতৃ স্তন্য পান করিয়া জীবন ধারণ করিয়া থাকে। স্তন্য দুগ্ধই তাহার জীবন রক্ষার প্রধান অবলম্বন। ইহা ব্যতীত আর কিছু খাইবার ক্ষমতা তাহার থাকে না।

সুপ্রসিদ্ধ ইংরাজ ডাক্তার থরণবুল্ বলেন, স্বাস্থ্য ভাল থাকিলে সকল মাতার সন্তানকে নিজে স্তন্য পান করান উচিত। যদ্যপি তিনি রোগান্বিতা হ'ন এবং চিকিৎসক যদি পরামর্শ দেয় যে স্তন্যপান করাইলে তাঁহার স্বাস্থ্য হানি ঘটিবে এমত অবস্থায় স্তন্য দান হইতে বিরত থাকাই উচিত। অনেক সময় দেখা যায় যে স্নেহের বশে গর্ভধারিণী চিকিৎসকের শত নিষেধ সত্ত্বেও সন্তানকে স্তন্য পান করাইয়া থাকেন; ইহা কোন ক্রমে যুক্তিসঙ্গত নহে। সর্ব্বাগ্রে নিজ স্বাস্থ্যের উপর যত্ন লওয়া উচিত। এরূপ করিলে কঠোর দুরারোগ্য ব্যাধি আক্রমণ করিতে পারে, এমন কি জীবন সংশয় ঘটিতে পারে তাহা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। মায়ের মন এ সকল বুঝে না সত্য; কিন্তু স্বাস্থ্যের প্রতি অবহেলার মত পাপ আর নাই।

অনেক সময় দেখা যায় মাতার স্তন্য দুগ্ধের অভাব নাই অথবা শিশু কিছুতেই খাইতে চাহে না, অথবা তাহা পান করিলে তাহার শরীর অসুস্থ হয় ইহার কারণ কি?

শিশু কি কারণে দুগ্ধ পান করে না? পান করিলে কেন তাহার অসুখ করে? তাহার কারণ প্রত্যেক জননীর অবগত হওয়া উচিত, তিনি কি ভাবে সমস্ত দিন অতিবাহিত করেন। তিনি কি অতিরিক্ত মানসিক চিন্তা অথবা ক্ষমতার অতিরিক্ত কায়িক পরিশ্রম করিয়া থাকেন? তিনি কি অতিরিক্ত বিলাস বাসনার বশবর্ত্তিনী অথবা অঙ্গ বিন্যাসের পক্ষপাতিনী? তিনি কি রাত্রি জাগরণ এবং

উত্তেজক খাদ্যদ্রব্য ভক্ষণ করিয়া থাকেন? তিনি যদি প্রকৃতই এই সকল বদ অভ্যাসে অভ্যস্থা হ'ন, তাহা হইলে শিশু কি কারণে স্তন্য পান করে না এবং করিলে তাহার শরীর কেন অসুস্থ হয় তাহার কারণ তিনি স্বয়ং উপলব্ধি করিতে পারেন। এদেশের ললনাগণ জরদা, দোক্তা, প্রভৃতি তামাক জাতীয় দ্রব্য এবং অতিশয় পানের মশলা খাইয়া থাকেন; শিশুর স্বাস্থ্য অটুট রাখিতে হইলে এই সকল অভ্যাসগুলি সর্ব্বাগ্রে বর্জ্জন করা চাই।

কখনও কখনও দেখা যায় শিশু কিয়ৎক্ষণ বেশ তৃপ্তি ও আগ্রহের সহিত স্তন্য পান করিয়া আর খাইতে চাহে না। খাওয়াইতে গেলে সে চীৎকার করিয়া কাঁদিতে থাকে। ক্ষুধা প্রশমিত না হওয়াই শিশুর ক্রন্দনের কারণ। তাহাকে অকৃত্রিম উপায়ে খাওয়াইবার ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। গো-দুগ্ধের সহিত সামান্য পরিমাণে জল মিশাইয়া, অথবা শটীর পালো, বার্লি বা সাগু প্রভৃতি হাল্কা খাদ্য তাহাকে দেওয়া যাইতে পারে। ঝিনুকে খাওয়াইতে কষ্ট বোধ হইলে ফিডিং কাপ বা 'মাইপোষ' ব্যবহার করিলে সুবিধা হয়।

শিশুর খাদ্য শরীরপোষণের উপযোগী যাবতীয় আবশ্য-কীয় দ্রব্যই যে তাহার মাতার দুগ্ধে বর্ত্তমান আছে তাহা সকলেই জানেন। স্তন্য দুগ্ধের প্রধান উপকরণ জল। গবাদির দুগ্ধেও জলীয় উপাদান বর্ত্তমান আছে। গবাদির দুগ্ধে যেমন সর আছে, নারীর দুগ্ধেও তদ্রূপ সর আছে। সর দেহকে পুষ্ট অর্থাৎ মোটা করে।

দুগ্ধ পানের পর নানা কারণে শিশুর শরীর অসুস্থ হইতে পারে। প্রথমতঃ তাহার অধিক ক্ষুধার উদ্রেক হওয়াতে সে এত অধিক দুগ্ধ পান করে যে তাহার ক্ষুদ্র পাকস্থলীতে দুগ্ধ থাকিবার স্থান পায় না। তখন সে অসুস্থ বোধ করে এবং, কিয়ৎক্ষণের মধ্যে বমন করিয়া ফেলে। এরূপ স্থানে বমন হওয়াই ভাল।

২য় কারণ। প্রসূতির শরীর অসুস্থ থাকিলে বিশেষতঃ জ্বর হইলে, শিশুর পক্ষে তখন তাহার মাতার স্তন্য দুগ্ধ গরলের কার্য্য করিয়া থাকে এবং সে তাহা পান করিবার অল্পক্ষণ পরে সেই দুগ্ধ উদগার করিয়া ফেলে। যদি দুগ্ধ পান করিবার পরই শিশু বমন করিয়া ফেলে, তাহা হইলে যতটা দুগ্ধ সে অধিক গ্রহণ করিয়াছিল প্রায় 'ততটাই' তুলিয়া ফেলে, কিন্তু তাহার বমনের চেষ্টা প্রথমবারে ব্যর্থ হইলে তাহার পাকস্থলীর অন্তরস্থ সমুদয় দুগ্ধ বমন করিয়া ফেলে এবং সেই উদ্গীরিত দুগ্ধ ছানার ন্যায় কাটিয়া যায় ও তাহাতে টক্ টক্ গন্ধ পাওয়া যায়। এই নির্গত দুগ্ধ দেখিয়া অনেক জননী মনে ভাবেন যে গোয়ালা তাঁহাকে ঠকাইয়া খারাপ দুগ্ধ দিয়াছে এবং এইরূপ ভাবিয়া তিনি গোয়ালার বাপান্ত, চৌদ্দ পুরুষান্ত করিয়া তবে ক্ষান্ত হন। ইহা তাঁহার ভুল ধারণা। শিশুকে অত্যধিক খাওয়ান হেতু সে যে বমন করিয়াছে তাহা তিনি বুঝিতে পারেন না। বস্তুতঃ শিশুকে যদ্যপি নিয়মিত সময়ে এবং অল্পে অল্পে খাওয়ান যায় তাহা হইলে সে হজম করিতে পারে এবং তাহার দেহ পুষ্ট হয়।

উদরাময় শিশুদিগের একটি উৎকট রোগ। অনেক সময় আমরা ইহা উপেক্ষা করি। আমাদের এ বিষয়ে যে নিতান্ত দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য তাহা আমরা একবারও ভাবি না। শিশুর উদরাময়ের প্রধান কারণ ভুক্তদ্রব্য তাহার সহ্য না হওয়া। সুতরাং ঔষধের ব্যবস্থা করিবার পূর্ব্বে তাহার আহার্য্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে। প্রথম হইতে প্রতিকার না করিলে পরে শিশুর পক্ষে কিরূপ অশুভকর হইবে তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই সহজেই অনুমান করিতে পারেন, আমাদের অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন। উপরন্তু রোগের তরুণাবস্থায় যন্ত্রণায় শিশু অত্যধিক ক্রন্দন করিতে থাকে। জননী তনয়ের ক্রন্দনের প্রকৃত কারণ অবগত না হইয়া ভাবেন, যে শিশুর ক্ষুধার উদ্রেক হেতু এবম্প্রকার চীৎকার করিতেছে। তিনি এইরূপ ভ্রান্ত ধারণার বশ-বর্ত্তিনী হইয়া শিশুকে অধিক পরিমাণে দুগ্ধ পান করিতে দেন। ইহাতে অতি বিষময় ফল প্রসব করিয়া থাকে।

নিদান বলেন:—

'গুরুভির্ব্বিবিধৈরন্নৈর্দুষ্টৈর্দোষৈঃ প্রদূষিতম্।
ক্ষীরং মাতুঃকুমারস্য নানা রোগায় কল্পতে॥"

অর্থাৎ—নানা প্রকার গুরুপাক্ ভক্ষণ জনিত প্রকুপিত দোষ দ্বারা স্তন্যদুগ্ধ দূষিত হইলে সন্তানের নানা প্রকার রোগ

জন্মিয়া থাকে। বায়ুদূষিত দুগ্ধ পান করিলে শিশুর মল, মূত্র রোধ, কৃশতা, কামজ্বর এবং নানা প্রকার বায়ুজনিত রোগ উৎপন্ন হয়। পিত্তদুষ্ট দুগ্ধ পান করিলে মল রেচন, কামলা, অধিকতর তৃষ্ণা, গাত্রদাহ প্রভৃতি রোগ সমূহের উৎপত্তি হয় এবং কফদুষ্ট স্তন্য দুগ্ধ পানে অতি নিদ্রা, জড়তা, শ্লেষ্মাঘটিত রোগ জন্মিয়া থাকে। গর্ভবতী স্ত্রীলোকের স্তন্য দুগ্ধ পানে বমন, অগ্নিমান্দ্য, কৃশতা উদরবৃদ্ধি, ক্ষীণতা প্রভৃতি ঘটিয়া থাকে।

জনৈক স্বাস্থ্য-বিশারদ পণ্ডিত বলেন, শিশুদিগকে যা-তা খাইতে দিতে নাই। তাহাদের পাকস্থলী নিতান্ত ক্ষুদ্র—পরিপাকশক্তি অল্প; সুতরাং গুরুপাক খাদ্য খাওয়াইলে অসুখ করে। সুপক্ক ও সহজপথ্য ফল শিশুদিগের পক্ষে উপাদেয়। খেজুর, কমলা লেবুর রস, আপেল, আঙ্গুরের শাঁস প্রভৃতি সমধিক উপকারী। আখরোট, চা, কফি, মাংস প্রভৃতি খাওয়ান অন্যায়।

মাতার পথ্যাপথ্য বিচার:—প্রসূতির আহার্য্য সহজে পরিপাক যোগ্য এবং পুষ্টিকর হওয়া চাই। সময়ের ফল মূল, ডাল ভাত, মাছ তরকারী এবং প্রচুর পরিমাণে দুগ্ধ জননীর প্রধান খাদ্য। মাংস, চা, কফি, পোর্ট ওয়াইন বা অন্য কোন প্রকার মাদক দ্রব্য, ঘৃত মশলাদি সংযুক্ত আহার্য্য একেবারে পরিত্যাজ্য।

শ্রীমতী সরোজরাণী রায়
মাতৃমন্দির, কার্ত্তিক, ১৩৩০।

বিয়ের উদ্যোগ।

(অঙ্কের পাটে শব্দ পড়ার শিক্ষা।)

পাত্র না হয় হলই না-১, গুণ নাই কি কনের-ও ?
এত টাকা ৫০ ? সীমা নাই কি ১৫ ?
২-এ নেবে আমার সিন্দুক ? দেবে নাক রেহাই সে ?
আমার কিনা ৮-কে কাঁদে হবে আমার বেয়াই সে ?
আস্-৩ গুটিয়ে কথা কইলে এমনি জোরে সে,
মনে মনে কল্লাম বি-৪ মারবে আমায় ধরে সে।
৮০ বলে পালিয়ে এলাম, মনে হল ভয় গো ;
কি জানি কি করবে ১০-আ, এ সম্বন্ধ ৯-গো।
৫১-বর্ত্তী মোর ভাই কাকা যাঁহারা—
অঙ্গের ৭-এ বন্দোবস্ত কত্তে বর্লেনি তাঁহারা।
গায়ের ৫-ড়া সেরে গেলে লাগ্‌ব আবার চেষ্টাতে ;
এ-১২ কি ঘটক বেটা গোল বাধাবে শেষটাতে ?

বঙ্গবাণী, কার্ত্তিক, ১৩৩০।

স্মৃতির আলো।

[শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত]

হে দেবী, ধ্যানের রাণী, আজিকে উষায়
প্রথম নয়ন মেলি' তোমারি কথায়।
ভরে গেল প্রাণ মোর—সকল হৃদয়
উঠিল ব্যাকুল হয়ে! এমনি সময়।
তোমার আমার নিত্য ঘটিত মিলন
উদার অম্বরতলে, বিহঙ্গ-কূজন।
বাজাত মঙ্গল শঙ্খ, লইত বরিয়া
হাসিমুখে ফুলবালা, সোহাগে চুমিয়া।
বহিত মৃদুল বায়ু! আজ তুমি নাই—
শূন্য এ মধুর উষা! তবু চারি ঠাঁই।
তোমারি স্মৃতির আলো ধ্রুবতারা প্রায়
জাগিতেছে অনুক্ষণ জীবন-অমায়।
উদ্ভাসিয়ে লক্ষ্য-পথ! সেই আলোরাশি
দীনের সম্বল শেষ—উৎসবের বাঁশী।

২০শ ভাগ] { পৌষ, ১৩৩০ । } [১২শ সংখ্যা

সংস্কৃত সাহিত্যে দুটি চিত্র।

[শ্রীরামসহায় বেদান্তশাস্ত্রী]

মহাশ্বেতা সত্ত্বগুণের শুভ্র মূর্ত্তি, কাদম্বরী রজোগুণের গৌর আকৃতি। একটি তপোবনের অধিদেবতা, অপরটী সাম্রাজ্যের রাজলক্ষ্মী। প্রথমটি, স্বর্গগঙ্গা মন্দাকিনী, যেন আকাশ-পথ বাহিয়া মর্ত্ত্যে অবতীর্ণা। অন্যটি, গিরিতটিনী যেন পর্ব্বত-গাত্র ভেদ করিয়া সমতল ভূমিতে বহমানা। মহাশ্বেতা ঋষিকুমার পুণ্ডরীকের অনুরাগিণী, ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণী। কাদম্বরী রাজপুত্র চন্দ্রাপীড়ে দত্তহৃদয়া, রাজার রাজরাণী। এটী শান্তির বিমল শ্বেতিমা। ওটী ভোগের উজ্জ্বল রক্তিমা। একজন আদর্শ দেবী-প্রতিমা; অন্যজন গরীয়সী মানবী ছবি।

মহাশ্বেতা।

মহাশ্বেতা একাধারে ভালবাসার, সংযমের ও ত্যাগের সজীব চিত্র। দর্শন মাত্রই যে, সে আপনার প্রাণ, মন ঋষিকুমার পুণ্ডরীকের পদে পুষ্পাঞ্জলিরূপে দান করিল— এ ভালবাসার ছবি। মধুকরীর মত আকৃষ্টা হইয়াও যে, সে কষ্টে কষ্টে আপনার দুর্দ্দমনীয় চিত্তটিকে আয়ত্ত করিয়া রাখিয়াছিল—এ সংযমের মূর্ত্তি। সমস্তসুখে জলাঞ্জলি দিয়া একাকিনী নির্জ্জনারণ্যে সে যে পতিদেবতার জন্য কঠোর তপস্যায় আত্মনিয়োগ করিল—এ ত্যাগের চিত্র। রাজকন্যা হইয়া সে যে ভাবে পিতা মাতা, আত্মীয় স্বজন ছাড়িয়া ব্রহ্মচারিণী সন্ন্যাসিনীর মত সতী-ব্রত পালন করিতেছিল; প্রাতঃস্নান, সন্ধ্যাবন্দনা, শিবারাধনা করতঃ সে যে প্রকারে বনজাত ফলমূলে কোনমতে ক্ষুন্নিবৃত্তি করিয়া প্রতি দীর্ঘ দিনগুলি কাটাইয়া দিতেছিল—তাহা সাধারণ মানবীতে দুর্লভ; একমাত্র মহাশ্বেতাতেই সুলভ।

চন্দ্রাপীড়ের নিকট জীবন ইতিহাস বিবৃত করায় এবং রাজপুত্রের যথাযোগ্য আতিথ্য-সৎকার করায় মহাশ্বেতার সংযম, আতিথেয়তা ও মহানুভবতার ভাবই পরিস্ফুট। বিবাহের অনুরোধ করিয়া মদলেখাকে কাদম্বরীর নিকট পাঠাইয়া দেওয়ায়, দেবারাধনা ত্যাগ করতঃ চন্দ্রাপীড়কে লইয়া কাদম্বরী ভবনে যাত্রা করায়—স্বার্থত্যাগ, সখিপ্রেম এবং সাংসারিক সূক্ষ্ম জ্ঞানই সুপরিব্যক্ত।

কি প্রেমে, কি বিবাহে, ত্যাগের ভাব যাহার ফুটে, তাহারই প্রেম আদর্শ, সে মর্ত্ত্যের দেবতা, যাহার না ফুটে তাহার প্রেম স্বার্থপরতাপূর্ণ, সকাম; সে "রক্তমাংসময় হৃদয় সমন্বিত" মর্ত্ত্যের মানব মাত্র। মহাশ্বেতা কপিঞ্জলের অনুরোধে ঋষিকুমারের জীবন রক্ষার জন্যই তাহাকে দেখিতে যায়; আত্মতৃপ্তি সুখের জন্য, ভালবাসার খেলা খেলিবার জন্য বা প্রাণের ক্ষুধা মিটাইবার জন্য মহাশ্বেতা যায় নাই। নিজের [illegible] ছিঁড়িয়া ফেলিবে, সর্ব্বসুখে

জলাঞ্জলি দিয়া ব্রহ্মচারিণী সাজিবে—তথাপি সে কুলকন্যার অনুচিত অভিসারিকার বেশে পুণ্ডরীককে দেখিতে যাইবে না। তুচ্ছ নিন্দার ভয়ে, সেই মহাপ্রাণের, জীবন রক্ষায় উদাসীনা থাকা উচিত নহে—এইরূপ ভাবিয়াই মহাশ্বেতা মৃতপ্রায়, পুণ্ডরীক দর্শনে যাত্রা করে। আত্মোৎসর্গমূলক প্রেমই আদর্শ প্রেম। এই নিঃস্বার্থ ভালবাসাই মর্ত্ত্যের অমৃত। মরিলে সকলই ফুরায়; মহাশ্বেতার মরণে ভয় নাই। তথাপি ধৈর্য্যশালিনী নারী দৈববাণীর উপর নির্ভর করিয়া পুণ্ডরীকের জীবন প্রত্যাশায় 'হৃদয়কুসুম-শোষী' দীর্ঘ শোকের মধ্যে কোনমতে জীবনটা ধরিয়া রাখিল; এ এক প্রকার আত্মবলি। এ বিরহও সংসারের শান্তি। মহাশ্বেতা সরস্বতী দেবীরই যেন প্রতিচ্ছবি। বীণাবাদিনী, রাজকন্যা হইয়াও বিরহানুরাগিণী। সংস্কৃত সাহিত্যে ইহার তুলনা নাই। কবি বাণভট্টের ইহা এক অপূর্ব্ব সৃষ্টি। প্রেম-বিহ্বলতার সঙ্গে বিচারশক্তির এমন বিচিত্র সন্নিবেশ মুগ্ধা নায়িকায় কদাচিৎ দৃষ্ট হয়। এ চরিত্র যেমন শিরীষ-কুসুমবৎ সুকুমার তদ্রূপ প্রস্তরবৎ কঠিন। এ যেন ভোগের মধ্যে ত্যাগ,—কামনার মধ্যে নিবৃত্তি,—সংসারের মধ্যে গোলোক। সত্ত্বময়ী, শ্বেতবর্ণা মহাশ্বেতাকে ব্রাহ্মণকুমার পুণ্ডরীকের অনুরাগিণী করায় কবির সূক্ষ্ম কলাকৌশলই প্রকাশিত হইয়াছে। কাদম্বরী-কাব্যে মহাশ্বেতা উপনায়িকা হইলেও তাহার স্থান কাদম্বরী অপেক্ষা উচ্চে।

কাদম্বরী।

কাদম্বরী প্রেমের ও ভোগের জীবন্ত ছবি। যুবতীর রূপোন্মাদ, গুণানুরাগিতা ও বীরপ্রিয়তার সঙ্গে প্রেম-বিহ্বলতা ষোল আনাই তাহাতে বিদ্যমান। মহাশ্বেতার বৈধব্যপ্রায় অবস্থা দেখিয়া সখিপ্রেম বশতঃই সে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল 'বিবাহ করিবে না'। কিন্তু সে প্রতিজ্ঞা সে রাখিতে পারিল না। চন্দ্রাপীড়ের দর্শনমাত্র তাহার চিত্তে পূর্ব্বরাগের সূচনা হইল। চন্দ্রাপীড়ের রমণী মনোমোহন রূপ, অলোকসামান্য গুণ, অদৃষ্টপূর্ব্ব মহানুভবতা, শিক্ষা-মার্জ্জিত বাক্‌কৌশল সেই পূর্ব্ব রাগটীকে গাঢ় অনুরাগে পরিণত করিল। ইহা নায়ক চন্দ্রাপীড়েরই চরিত্রোৎকর্ষ-তার নিদর্শন।

কাদম্বরী রজোগুণের মূর্ত্তি। তাই সে রোহিতবর্ণা। নবোদিত বালসূর্য্যের মত তাহার বর্ণ। এ সৌন্দর্য্য "দীপ-মালায় সমুজ্জ্বল নাট্যশালার মত" যুবজনপ্রিয়। কাদম্বরী সুরার নাম। সুরার মতই ইহার ঢল ঢল লাবণ্য; সুরার মতই ইহার তীব্র মাদকতা। ইহার বাক্যে, ইহার অঙ্গ-ভঙ্গীতে, ইহার পদক্ষেপে যেন সুরার স্রোতই বহিতে থাকে। রজোগুণের অধিদেবতা বলিয়াই কাদম্বরী রাজ-পুত্রের অনুরাগিণী। চতুরা রাজলক্ষ্মী রাজারই ভোগ্যা হইয়া থাকে। মানুষীতে "প্রভাতরল জ্যোতি"র সম্ভাবনা নাই বলিয়াই কাদম্বরী গন্ধর্ব্বাপ্সরা সহযোগে উদ্ভূতা। পিতা "চিত্ররথ" গন্ধর্ব্ব, মাতা "মদিরা" অপ্সরা। ইহার বাগ্‌ভঙ্গী, কলাকৌশল, প্রণয়চাতুর্য্য ও যৌবন লীলা প্রভৃতি ভারত ললনার উপযোগী হইবে না—তাই কি সূক্ষ্মদর্শী কবি ইহার দেহে গন্ধর্ব্বাপ্সরা রক্ত বহাইয়াছেন? এ যেন স্বাধীনতাপ্রাপ্তা যৌবনবিলাসিনী পাশ্চাত্য দেশের নায়িকা।

প্রবৃত্তির সেবা করিয়া, ভোগের মধ্যে ডুবিয়া থাকিয়া নিবৃত্তিমার্গের পথিক হওয়া যায় না। হাব-ভাব-বিলাস-বিভ্রমে, অঙ্গ ঢালিয়া দিয়া, সুচতুরা সখীদের সঙ্গে আবির-কুঙ্কুমের প্রেমলীলা করিয়া ত্যাগব্রত গ্রহণ করা চলে না। কাদম্বরীর হইল তাই। সেই সৌন্দর্য্যময় পুষ্পশরময় অন্তঃপুরে যে বাস করে, "মৃণালিকে," 'কুমুদিকে," "কদলিকে," "চূতকলিকে" দিনরাত এই রহস্যালাপে যে ডুবিয়া থাকে—অলক্তরস ও চরণের ভার, বিনা হস্তাবলম্বনে উত্থান ও অতি সাহসের কাজ, এমন বিলাসের ভাবে যে অনুপ্রাণিত রহে; তাহার আবার প্রতিজ্ঞা, তাহার আবার ত্যাগ! এই প্রকার লালসারাগে আপাদমস্তক অনুরঞ্জিতা বলিয়াই কাদম্বরী চন্দ্রাপীড়কে দর্শনমাত্র ভালবাসায় মুগ্ধা হয়। নহিলে কি তাহার চক্ষু চন্দ্রাপীড়ের প্রতি একেবারেই নিশ্চল নিবদ্ধ লক্ষ্য হইয়া পড়ে? সঙ্গে সঙ্গে রোমাঞ্চ, কম্পন, স্বেদধারা ও নিশ্বাসবৃদ্ধি কখন কি দেখা যায়? আশ্চর্য্য, কাদম্বরীর সহসা এই ভাবানুভব! চন্দ্রাপীড়কে দর্শনমাত্র মুখের সেই স্মিত হাস্য, নয়নের সেই মুগ্ধ কটাক্ষ, সারা অঙ্গের সেই লজ্জার লীলা, একটু ভ্রূর সেই উন্নমিত মৃদু-ভঙ্গিমা—এ সকল যেন কেবল কাদম্বরীরই বিশেষত্ব।

এ যেন উদ্দাম প্রণয়ের গৈরিক নিস্রাব ; উন্মাদক যৌবনের বিপুল উচ্ছ্বাস ; সম্ভোগাত্মক আদিরসের চরম বিকাশ !

দুষ্মন্তের প্রথম দর্শনে শকুন্তলার মনে হয়—"ইহাকে দেখিয়া আমার মনে তপোবন বিরোধী ভাবের উদয় হইতেছে কেন ?" আর চন্দ্রাপীড়ের প্রথম দর্শনেই কাদম্বরীর রোমোদ্গম, উরুকম্প, স্বেদনির্গম ও উষ্ণায়ত নিশ্বাস দেখা গেল। শকুন্তলার হৃদয়ে অনুরাগের বীজটি প্রথমে ফুটিয়া উঠিয়া ক্রমে অঙ্কুরিত, পরিশেষে ফুল ফলে শোভা পায় ; আর কাদম্বরীর চিত্তে প্রণয়-কুসুম একেবারেই বিকশিত হইয়াই যেন ফুটিয়া উঠিয়াছে। শকুন্তলার প্রণয়-নদী পর্ব্বতবক্ষে জন্ম লইয়া ক্রমে বিপুলকায়া প্রখর-স্রোতা হইয়া দেখা দেয় ; আর কাদম্বরীর প্রেমনদী একেবারেই বিশালোরস্কা খরতরঙ্গা হইয়া পর্ব্বত গাত্র ভেদ করিয়া ছুটিতেছে। নির্ব্বিলাস তপোবনের মধ্যে শমান্বিত ঋষিগণের মধ্যে বাস করিয়া শকুন্তলার পূর্ব্বরাগ যেমন ভাবে ফুটিয়া উঠে, বিলাসময় কুমারীপুরের ভিতরে হাব ভাবময়ী সখীদের সংসর্গে থাকিয়া কাদম্বরীর পূর্ব্বরাগও যে সেই ভাবে ফুটিবে, এমত কথা নাই। তুলনায় বলা যায়, মহাশ্বেতার পূর্ব্বরাগ শান্ত ঊর্ম্মির নর্ত্তন ; শকুন্তলার পূর্ব্বরাগ খর-তরঙ্গের উচ্ছ্বাস ; আর কাদম্বরীর পূর্ব্বরাগ উদ্দাম কল্লোলের গর্জ্জন।

মহাশ্বেতা।

মহাশ্বেতার শৈশব-জীবনের চিত্রটি বড় মধুর। গন্ধর্ব্বগণের অঙ্কে স্কন্ধে বীণার মত আরূঢ়া থাকিয়া, পিতামাতার আদরে স্নেহে তাহার বাল্যকাল বড়ই সুখে কাটিয়াছিল। তারপর নবযৌবনের আবির্ভাব, সেও বড় মধুর। চরণের লীলাঙ্কিত গতি, চক্ষুর শান্ত কটাক্ষ কপোলের আরক্ত আভা তাহাকে বড়ই প্রিয়দর্শনা করিয়াছিল। নবযৌবনের সমাগমে নব পল্লব বেষ্টিত কুসুমটির মত তাহার একটি নূতন শ্রী ফুটিয়া উঠিয়াছিল।

এমনই এক বসন্তকালের মধুমাসে মধুসখা কামদেবের মতই মধুর দর্শন পুণ্ডরীক কপিঞ্জল সহ তাহার সম্মুখে আসিল। স্বর্গের পারিজাত মঞ্জরীর গন্ধ, ঋষিকুমারের পবিত্র সুন্দর শ্রী, অনির্ব্বচনীয় তপোজ্যোতি তাহার উপর একটি প্রভাবের বিস্তার করিল। সেই ঋষিকুমার মহাশ্বেতাকে দেখিবামাত্র মোহিত হইয়া তৎপ্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল। ভালবাসার নিদর্শনরূপে সেই ঋষিকুমার মহাশ্বেতার কর্ণে স্বর্গের পারিজাত মঞ্জরী বাঁধিয়া দিল। উভয়েই উভয়ের দর্শনে মোহিত ও অনুরক্ত হইয়া পড়িল।

মহাশ্বেতা আপনার প্রাণ মন ঋষিকুমারের পদে পুষ্পাঞ্জলিরূপে দান করিয়া মাতার সঙ্গে কোনমতে গৃহে ফিরিল। চরণ আর চলে না ; দেহভার আর বহে না। পায়ের নূপুরগুলি পর্য্যন্ত মঞ্জীর শব্দে মহাশ্বেতার প্রত্যাগমনে বারণ করিতেছিল। ভালবাসা রাগে আপাদমস্তক অনুরঞ্জিতা কুমারী তখন অলস দেহ-যষ্টি শয্যার উৎসঙ্গে ঢালিয়া দিল।

মহাশ্বেতা তরলিকার মুখে ব্রাহ্মণকুমারের আকুলতার নিবেদনটি আদর করিয়াই শুনিল। তারপর পুণ্ডরীকের সখা কপিঞ্জল আসিয়া প্রিয়তমের ছবিটি মহাশ্বেতার চক্ষুর উপর ধরিল। তাহারই জন্য ঋষিকুমার মৃত্যু-শয্যায় শয়ান, জীবনরক্ষার মৃত সঞ্জীবনী মন্ত্র তাহারই আয়ত্তে। মহাশ্বেতার উভয় সঙ্কট, তরলিকাকে তখন সে কহিল, "সখি, কি করিব ? পিতা মাতা আত্মীয় বন্ধুদের না জানাইয়া, ইতর রমণীর মত প্রণয়ীর নিকট ছুটিয়া যাইব ? কুল মর্য্যাদা সদাচারের মস্তকে পদাঘাত করিয়া, নির্লজ্জার মত অভিসার করিব ? আবার এদিকে ব্রহ্মহত্যা ঋষিহত্যার পাতকিনীই বা কিরূপে হইব ?"

তরলিকার অনুরোধ "যাওয়াই উচিত।" তখন সেই কুলকুমারী তরলিকাকে সঙ্গে লইয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানে পৌঁছিল। দেখিল—পুণ্ডরীকের "নিশ্চল তারক" চক্ষু দুটি চন্দ্রলক্ষ্যে স্থির। বাহু দুটি নিস্পন্দ হৃদয়ের উপর অসাড় ভাবে নিপতিত। অভাগী বুঝিল—তাহার বড় আশার ইন্দ্রধনু কালমেঘে ঢাকিয়া ফেলিয়াছে। বসন্তের বাতাসে জীবকুসুমটি ফুটিতে না ফুটিতে গ্রীষ্মের খরতাপে ঝলসিয়া গিয়াছে।

দৈববাণী হইল—'পুণ্ডরীক আবার বাঁচিবে।" যে মহাপ্রাণ অভাগীর জন্য অতৃপ্ত মন-প্রাণ লইয়া মহাযাত্রা করিয়াছে—তাহারই জন্য মহাশ্বেতার বাঁচিয়া থাকিতে হইবে। দেব-নিবেদিত সে অণুটিকে যে রকম করিয়াই

হউক, তাহাকে ধরিয়া রাখিতেই হইবে। নিজের সুখের অপেক্ষা প্রেমাস্পদের সুখই যেখানে অধিকতর কাঙ্ক্ষিত, প্রকৃত প্রেম সেইখানেই।

তারপর মহাশ্বেতার যোগিনী বেশ। আর্দ্র বল্কলে যৌবনের মাধুরী ঢাকিয়া, সোণার অঙ্গে বিভূতি মাখিয়া, রাজকুমারী একাকিনী অরণ্যে শিবারাধনায় নিযুক্তা। মহাশ্বেতা যখন গভীর রজনীতে বীণা বাজাইয়া করুণ সঙ্গীত গাহিত; বনদেবীরা পর্য্যন্ত পাণ্ডুপত্র মোচন করিয়া অশ্রু-বর্ষণ করিত। লোকে ভাবিত—ভগবতী উমা পতির প্রসন্নতা লাভের আশায় তপস্যার্থ আবির্ভূতা।

হৃদয়-বলে মহাশ্বেতা অদ্বিতীয়া। কতদিন কত বৎসর একই ভাবে কাটিয়া গেল। পুণ্ডরীক পরজন্মে বৈশম্পায়ন হইয়া মহাশ্বেতাকে দেখিয়া উন্মত্তের মত একদিন আশ্রমে উপস্থিত। আমাদের দর্শনশাস্ত্রে বলে—"জন্মান্তর স্মৃতি উদ্বোধের কারণ উপস্থিত হইলেই ফুটিয়া থাকে।" সেই জন্মান্তরের অতৃপ্ত ভোগলালসা আজ শত বাহু হইয়া তাহাকে বেষ্টন করিল। উপেক্ষা ও ঔদাসীন্য পাইয়াও সে লালসার অগ্নি নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইল না। সেই উন্মত্ত কামুক একদিন গভীর রজনীতে সুপ্তা মহাশ্বেতার অঙ্গস্পর্শ করিবার জন্য অগ্রসর হইল। তপঃকৃশা নিরাবেশী সাধ্বীর সতীত্বের তেজে সে পাপ-দেহ ভস্মীভূত হইয়া গেল।

পুণ্ডরীক শাপে চন্দ্রদেব চন্দ্রাপীড়, প্রতিশাপের ফলে পুণ্ডরীক বৈশম্পায়ন জন্ম লাভ করিল।

সতীর শাপে বৈশম্পায়ন ভস্মীভূত হইয়া পক্ষিযোনি প্রাপ্ত হইল। সেই দুর্গতিও কিছুদিন যন্ত্রণা ভোগের পর শেষ হইয়া আসিল। "ভোগেই কর্ম্মের ক্ষয়।" পুণ্ডরীকও সশরীরে মহাশ্বেতার নিকট উপস্থিত। এমত কঠোর সাধনা কখন বৈফল্যবরণ করে না। যে কপিঞ্জল পুণ্ডরীকের আসক্তিকে পাপ মনে করিয়া মহাশ্বেতাকে পাপিষ্ঠা মায়াবিনী বলিয়া গালি দিতে কুণ্ঠিত হয় নাই—সেই কপিঞ্জলই আজ মহাশ্বেতার পাতিব্রত্যগুণে মুগ্ধ হইয়া সেই আসক্তিকে পুণ্যরূপে অভিনন্দিত করিল—সেই মহাশ্বেতাকে আদর্শ সাধ্বীদেবী বলিয়া পূজা করিল। যে প্রেম লৌহ শৃঙ্খলের মত কষ্টকর বন্ধন মনে হইয়াছিল—তাহাই আবার জীবনের বন্ধনী হইয়া উঠিল।

কাদম্বরী।

কাদম্বরী ভোগময়ী প্রকৃতির মূর্ত্তি। সংসারের নানা বর্ণময়ী চিত্রশালা। কাদম্বরী যেন শৈশবের কলিকারূপে না ফুটিয়া একেবারেই প্রস্ফুটিত হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। জীবনাকাশে যৌবনের পূর্ণচন্দ্র যেন মধ্যস্থলে একেবারে উদিত হইয়াছে। কাদম্বরীকে যখন আমরা প্রথম দেখিতে পাই—তখন সে গন্ধর্ব্ব নগরীর কুমারীপুরে বিলাসিনী সখীদের মাঝখানে বিলাস-শয্যায় শয়ানা। তাহার বাস-বাটিকা যেন স্বর্গের অমরাবতী। সেখানে বিদ্যুতের স্থির প্রভা দিবারাত্রই জ্বলে; ফুটন্ত জ্যোৎস্নার রশ্মি নিরন্তরই ফুটে, মলয়ের মৃদু মন্দ বাতাস সর্ব্বক্ষণই বহে। সেখানে রূপসীরা রূপের ডালি লইয়া সজীব বিদ্যুল্লতার মত বেড়াইয়া বেড়ায়; গন্ধর্ব্বকামিনী অপ্সরা ভামিনীরা বীণা বাজাইয়া সঙ্গীত গাহিয়া ভোগ-স্বর্গ সূচিত করে। অন্তঃপুরে কোথাও আবীর কুঙ্কুমের বৃষ্টি, কোথাও সরসী-জলে জলক্রীড়া, কোথাও সস্মিত পল্লব নিক্ষেপ, কোথাও যৌবন সম্বন্ধীয় বিশ্রব্ধ রসালাপ। একদিকে শুকসারিকার প্রণয় কলহ—অপর দিকে মদলেখা তমালিকার চাটূক্তি। এইরূপে কাদম্বরী সংসার-নদীতে গা ভাসাইয়া বহিয়া চলিয়াছে। কাদম্বরী যুবক রাজকুমারগণের আরাধ্যা সামগ্রী। এমন বিলাসময়ীকে বিলাসসঙ্গিনী করিতে কোন্ বিলাসী না ইচ্ছুক হয়? কাদম্বরী যখন হাসে, তখন মুক্তা ঝরে; আলাপ করে বীণা বাজে; চলিয়া যায় মৃত্তিকা শিহরে। তার প্রতি অঙ্গ-ভঙ্গীতে আদিরস উছলিয়া পড়ে, প্রতি কটাক্ষ বিক্ষেপে বিদ্যুতের তরঙ্গ বহে; প্রতি রোম-কূপে আকাঙ্ক্ষার খরজ্যোতি নিয়তই প্রজ্বলিত হয়।

চন্দ্রাপীড়ের সম্মুখেই প্রথম কাদম্বরীর আবির্ভাব। চন্দ্রাপীড়ের অভ্যর্থনা নিমিত্ত তাহার সেই সভঙ্গিক উত্থান, তাম্বুল প্রদানার্থ সেই সস্বেদ দুরু দুরু কম্প, রূপাতিশয় দর্শন জন্য সেই উদ্ভিন্ন রোমাঞ্চ আর প্রথম প্রণয়াবেশ হেতু সেই সচকিত কটাক্ষ কাদম্বরীকে বড়ই নয়নাকর্ষক ও উন্মাদক করিয়া তুলিয়াছে। কাদম্বরীর একটি ইঙ্গিতে, একটি কটাক্ষে, একটি অঙ্গ-ভঙ্গীতে যে ভাব প্রকাশ পায়, সহস্র নারীর প্রেমগর্ভ বাণীতে তাহা নাই। অন্তঃপুরিকাগণের

হাবভাব, বিলাসবিভ্রম, ভ্রূভঙ্গী কটাক্ষ, ইসারা ইঙ্গিত, রসালাপ চাটূক্তির মধ্য দিয়া না গেলে কাদম্বরীকে বোঝা যাইবে না।

কাদম্বরী চরিত্রটির আগাগোড়াই হৃদয়তত্ত্ব বিশ্লেষণে ভরা। তাহার প্রণয়রাগের চিত্রটিতে কি সুন্দর রঙই ফুটান হইয়াছে! কাদম্বরীর শয়ন, উত্থান, রোমাঞ্চ, স্বেদ, কম্পন, স্তম্ভ কি মনোরম ভাবেই ফেনাইয়া ফেনাইয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। কুমারীপুর ক্রীড়াপার্ব্বত্য কুঞ্জবন, ময়ূরবেদী, চন্দ্রোদয় ও প্রাতঃকালের ছবি কি মনোহর রূপেই অঙ্কিত হইয়াছে। কাদম্বরীর সকলই সুন্দর, সকলই উন্মাদক, সকলই অপূর্ব্ব। ছলাকলা, চাতুরী, আচার, ব্যবহার, শিষ্টাচার, সভ্যতা সকলই অদ্ভুত হৃদয়োত্তেজনক। প্রগল্‌ভা রসিকা সখীদের সঙ্গে যার নিয়ত সহবাস, প্রেমগীতির লীলায়িত মূর্চ্ছনায় সর্ব্বদা যে বিভোরা, সেই কাদম্বরী চতুরা বিলাসিনী, অথবা বুদ্ধিমতী না হবে কেন? কবি বলিয়াছেন "বালা হইয়াও সে মন্মথজননী।"

কাদম্বরী ও চন্দ্রাপীড়ের গোপন প্রণয়লীলা ফল্গুর মত হৃদয় বালুকার মধ্য দিয়া বহিয়া চলিল। মধ্যে মধ্যে এক একটা তরঙ্গের উচ্ছ্বাস সেই বালুকাভেদ ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। এ প্রণয়-লীলার বিশেষত্বই, কাদম্বরী নিজে বড় কোন কথা কহিত না। মনোভাব বুঝিয়া ভ্রূর মৃদু চলনেঙ্গিত পাইয়া মদলেখাই যাহা বলিবার বলিত। তাহার বিলাসেঙ্গিতে, ভাবভঙ্গীতে অবশ্য কিছু কিছু প্রকাশ পাইত মাত্র। প্রণয়ের এই লুকোচুরি খেলা বড়ই উপভোগ্য। এই লুকোচুরি গোপনেই রহিল। কেহ কাহারও নিকট মুখ খুলিল না। এইরূপে আশা নিরাশা, নিশ্চয় সন্দেহ, প্রণয় বিরহ, হর্ষ বিষাদের মধ্য দিয়াই কাদম্বরীর প্রণয় ফুটিয়া উঠিয়াছে।

পিতার পত্র পাইয়া চন্দ্রাপীড়কে অকস্মাৎ রাজধানীতে ফিরিয়া যাইতে হইল। কাদম্বরীর সহিত সাক্ষাতের আর সময় নাই। পত্র পাঠাইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া চন্দ্রাপীড় বিদায় শেষ করিয়া লইল। বিদায় দৃশ্য আর আমাদের দেখা হইল না। দুইজনের মধ্যে আর কাহাকেও মুখ খুলিতে হইল না। নির্ব্বিলাস তপোবনের মধ্যে থাকিয়া পিতৃপরবশা হইয়াও শকুন্তলা দুষ্মন্তের জন্যই আত্মদান, দেহদান করিতে বাধ্য হয়; আর বিলাস পূর্ণ কুমারীপুরে বাস করিয়া একপ্রকার স্বাধীনতা প্রাপ্তা হইয়াও গন্ধর্ব্বাপ্সর নন্দিনীকে আত্মদান দূরে থাক—মৌখিক প্রণয় প্রকাশ পর্য্যন্ত করিতে হইল না। চন্দ্রাপীড় যদি পিতার পত্র পাইয়াও কোন ছলে গন্ধর্ব্ব পুরীতে থাকিয়া যাইত, তাহা হইলে কাদম্বরী কি করিত—সে বিচারে এখন আবশ্যক নাই।

চন্দ্রাপীড় চলিয়া যাওয়ার পরে পত্রলেখা কিছুদিন কাদম্বরীর অনুরোধে তাহার নিকট থাকিয়া গেল। কাদম্বরী পত্রলেখার নিকট আপনার অন্তরের রুদ্ধ দ্বার খুলিয়া দিল। মহাশ্বেতা জ্যেষ্ঠা ভগ্নীর মত শ্রদ্ধার পাত্রী, আর সে এখন যোগিনী সন্ন্যাসিনী; মদলেখা পরিজনের মধ্যে সখী হইলেও দাসী। কাদম্বরী হৃদয়ের গোপন ব্যথা কাহাকে আর জানাইবে? পত্রলেখা চন্দ্রাপীড়ের সঙ্গিনী, সখী, তাই সে বড় প্রিয়া। আর কাদম্বরীর প্রণয় কাহিনী চন্দ্রাপীড়ের নিকট গিয়া প্রকাশ করিবে—ইহাই তাহার আকাঙ্ক্ষা। প্রিয়তমের নিকট এই প্রেম নিবেদন করিয়া কাদম্বরীর মনের ভার লাঘব হইল। ইহাতেই প্রণয়িনীর তৃপ্ত সুখ। পত্রলেখা ভরসা দিল "আমি পাদপঙ্কজ স্পর্শ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিতেছি, তোমার হৃদয়-দয়িতকে আমি সত্বরই আনিয়া দিব।" মিলনে যে প্রেম গুপ্ত থাকে, বিরহে তাহাই শত মুখে প্রবাহিত হয়—ইহাই প্রেমের ধর্ম্ম।

পত্রলেখা ফিরিয়া গিয়া কাদম্বরীর অবস্থা চন্দ্রাপীড়ের নিকট বিবৃত করিল। কি উন্মাদক সে ভালবাসা, কি হৃদয়-বিদারক মনোবেদনা, কিবা কাতর আকুল আহ্বান! সকলেই ফিরিয়াছে কিন্তু বৈশম্পায়ন কোথায়? সে ত ফিরে নাই! পিতৃ আদেশে চন্দ্রাপীড়কে অচ্ছোদ সরসী তীরে আবার যাত্রা করিতে হইবে। কি সুখময় যাত্রা সে! কাদম্বরীর প্রণয়লাভ আজ সার্থক হইবে, অবশ্য "প্রভাতরল" জ্যোতিঃ আজ হৃদয়ের উপর স্থিরভাবে বিরাজ করিবে—কি সুখ সে! বড় সাধে—বড় আশায় চন্দ্রাপীড় সেই পূর্ব্ব পরিচিত অচ্ছোদ সরসী তীরে মহাশ্বেতা আশ্রমে উপস্থিত। এ কি! বৈশম্পায়ন আর নাই! প্রিয় সখার সেই কমনীয়

তহ আজ মহাশ্বেতার অভিশাপে ভস্মীভূত। অকার্য্যকারী প্রাণপ্রিয় বন্ধুর মৃত্যুর জন্য চন্দ্রাপীড় মহাশ্বেতাকে কিছু বলিল না। কোনও অনুযোগ করিল না—কি মহানুভবতা! কি সুবিচার! কি আত্মোৎসর্গ!

"দেবি, কাদম্বরীর সেবাসুখ লাভ করা এ জন্মে আর হইবে না। জন্মান্তরে যেন লাভ করি" বলিতে বলিতে চন্দ্রাপীড়ের স্বভাব সরস হৃদয় স্ফুটিত হইয়া গেল।

কবি বলিলেন, "কাদম্বরীসমাগমাপ্রাপ্তি দুঃখেনৈব চন্দোন্মুখং শিলী মুখানাথাঃ (ভ্রমর) স্বভাব সরসং হৃদয়-মস্ফুটৎ।"

এদিকে কাদম্বরী প্রিয়তমের আগমন সংবাদ পাইয়া মহাশ্বেতা আশ্রমে উপস্থিতা। হর্ষ, সুখ, মান, অভিমান, উৎকণ্ঠা, ব্যাকুলতা লইয়া রাজকুমারী হৃদয়-বল্লভ দর্শনাশায় প্রধাবিতা—গিয়া দেখে, তাহার প্রাণপ্রিয় চন্দ্রাপীড় "উৎখাত বীজকোষ" পদ্মের মত, ফল কুসুম শূন্য উপবনের মত, চন্দ্রবিবর্জিত নিশামুখের মত প্রাণশূন্য নিপতিত।

সেই বিলাসিনী যৌবনমদমত্ত কাদম্বরীর নিমেষের মধ্যেই এক মহাপরিবর্ত্তন সংঘটিত হইল। নয়নে অশ্রুধারা নাই, বরং সহমরণের সুদৃঢ় সঙ্কল্পে মুখখানি নির্ব্বিকার ও প্রশান্ত। চন্দ্রাপীড়ের মৃত্যুর জন্য সখী মহাশ্বেতাকে কারণ ভাবিয়া তাহার উপর কিছুমাত্র ক্ষুব্ধ হইল না। মহানুভবতার প্রকৃতিই কি এই? সখীপ্রেমের জ্বলন্ত নিদর্শন কি এই? কাদম্বরী চরিত্রের এইখানেই সর্ব্বাপেক্ষা বিশেষত্ব। পুণ্ডরীককে মৃত দেখিয়া সংযমশালিনী মহাশ্বেতার প্রাণভেদী ক্রন্দনে সমস্ত বনভূমি প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠে, আর এই যৌবন বিলাসিনী কাদম্বরী প্রিয়তমের মরণে ক্রন্দন দূরে থাক, বরং সে (সহমরণে) দৃঢ়চিত্তা, নির্ব্বিকার বদনা।

রঘুবংশে অজ রাজার, কুমারসম্ভবে রতিদেবীর, উত্তর চরিতে রামচন্দ্রের, নৈষধ চরিত্রে সুবর্ণ হংসের বিলাপ অনেকেই শুনিয়াছেন। আর আজি কাদম্বরীর বিলাপ শুনুন। সহমরণে দৃঢ় সংকল্প করিয়া কাদম্বরী সখী মদলেখাকে বলিয়া গেল—যেমন স্বাভাবিক তেমনই কবিত্বময়, তেমনই মর্ম্মবিদারক!

"সখি, বাবা মা রহিলেন দেখিও। আমি যাহাকে যে চক্ষুতে দেখিতাম, তুমি তাহাকে সেই মতই দেখিও। * * * আমার চরণতল-লালিত অশোক তরুটীর পত্রপল্লব, দেখিও যেন কেহ কর্ণপূর করিবার জন্য না ছেঁড়ে। সহকার তরুটির সাথে আমার সেই বড় সাধে রোপিতা মাধবী লতাটির বিবাহ দিও। আমার স্বহস্ত বর্দ্ধিতা মালতীলতা কুসুমিতা হইলে তাহার ফুল দিয়া যেন কেবল দেব পূজাই করা হয়। "কালিন্দী," "সারিকা," "পরিহাস," শুকটিকে পিঞ্জর-বন্ধন হইতে মুক্ত করিও। তাহারা যেখানে ইচ্ছা উড়িয়া যাক্। সেই নকুলিকাকে (বেজিকে) ক্রোড়ের উপর করিয়া নিদ্রা যাইও। সেই জীবঞ্জীব মিথুন, সেই হংসদম্পতীর যেন কোন বিপদ না ঘটে। সেই ক্রীড়াপর্ব্বত যাহাকে ইচ্ছা দান করিও। আর সেই বীণাটি তুমি নিজে বাজাইও।"

মহাশ্বেতার নিকট গিয়া তাহার কণ্ঠ ধরিয়া বলিতে লাগিল—"প্রিয় সখি, তোমার প্রত্যাশা আছে, তাই তুমি মরণের অধিক যন্ত্রণা সহ্য করিয়া সমাগমের আশায় বাঁচিয়া আছ! আমি কি লইয়া বাঁচিয়া থাকিব! জন্মান্তরে যেন তোমাকে আবার প্রিয় সখিরূপে পাই।"

তারপর কাদম্বরী প্রিয়তম চন্দ্রাপীড়ের দেহের প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল। সেই নিস্পন্দ দেহের শীতলস্পর্শে সেই সাংঘাতিক মুহূর্ত্তেও তাহার দেহে পুলক ফুটিয়া উঠিল। তখন সেই উন্মাদিনী বালা আপনার শিথিল কবরীচ্যুত পুষ্পরাশি দ্বারা পতিপদ পূজা করিল। ধীরে ধীরে সে চরণ ক্রোড়ের উপর তুলিয়া লইয়া স্তম্ভিতাবৎ বসিয়া রহিল। বড় আনন্দময়ী, বড় চতুরা, বড় বুদ্ধিমতী যে, আবাল্য দুঃখ সহনে অনভ্যস্তা যে, সেই নারীর কি এই শোকমূর্ত্তি? শোকে এমন স্থিরা দৃঢ়া, মরণে এমত কৃতসঙ্কল্পা সতী নারীর দৃশ্য সংস্কৃত সাহিত্যে দুর্লভ নহে। বাঙ্গালার কবি কি এই দৃশ্যটিই মৃণালিনী উপন্যাসে মনোরমার সহমরণ কালে ফুটাইয়াছেন?

কাদম্বরীর স্পর্শে "সমুচ্ছসিতাদিকদেহাৎ" প্রিয় দেহ হইতে এক "চন্দ্র ধবল" জ্যোতিঃ ঊর্দ্ধে উত্থিত হইল। দৈববাণী শোনা গেল—"চন্দ্রাপীড়ের পুনর্জ্জীবন হইবে।"

নির্ব্বাণোন্মুখ দীপশিখাটি তৈলবিন্দু পাইয়া জ্বলিয়া

উঠিল। শুষ্কপ্রায় মাধবীলতাটি বর্ষার বারিসেকে পুনর্জ্জীবিতা হইল। কাদম্বরী স্পর্শে সে দেহ অবিকৃত থাকিবে, একদিন চন্দ্রাপীড়ের দেহে জীবন ফিরিয়া আসিবে, এই বিশ্বাসে এই আশ্বাসে সে শিথিলবৃন্ত কুসুমবৎ আপনার জীবনটুকে কোনমতে ধরিয়া রাখিল। সেই ভোগময়ী প্রবৃত্তি আজ নিবৃত্তিরূপা হইয়া মহাশ্বেতার মতই হইয়া রহিল।

মহাশ্বেতা প্রিয় দেহ পায় নাই। কাদম্বরী প্রিয় দেহ পাইয়াছে। কাজেই সে মহাশ্বেতার মত বীণা বাজাইয়া, শিবারাধনা করিয়া, প্রিয় স্মৃতিচিহ্ন লইয়া জীবন কাটাইবে কেন? সে যে প্রিয়তমের স্পৃহনীয় দেহটি তাহারই সৌভাগ্য-দেবতার বরে লাভ করিয়াছে। তাই সে বড় যত্নে সেই প্রিয়তম দেহ চন্দন চর্চ্চিত করে, বিঘ্ন বিপদ হইতে রক্ষা করে। সে জীবন্মৃতা হইয়া অবলম্বনটী লইয়া বাঁচিয়া রহিল। মহাশ্বেতার মত বীণা বাজাইয়া প্রাতঃস্নান ও সন্ধ্যাবন্দনাদি করিয়া, বনজাত ফুল দ্বারা মহাদেবের পূজা অর্চ্চনা লইয়া সে থাকিতে পারে না। ঐ জাতীয় সংযম শক্তি তাহার নাই। গাঢ়তাপে আতপ্তাঞ্জল নলিনীর মত সে মুখখানি লুকাইয়া থাকিতেই ভালবাসে—যা যার প্রকৃতি।

অভিশাপের আজ শেষ দিন। বসন্তকালে পূর্ণিমা রজনীতে মলয় পবনের শিহরণে শিহরিয়া উঠিয়া কাদম্বরী উন্মত্তার মত চন্দ্রাপীড়কে অকস্মাৎ আলিঙ্গন করিল। সেই মৃত সঞ্জীবন স্পর্শেই যেন সেই মৃতদেহ সমুচ্ছ্বাসিত হইয়া উঠিল। চন্দ্রাপীড় চাহিয়া দেখিল, কাদম্বরী উন্মাদক আলিঙ্গনে তাহাকে বাঁধিয়া রাখিয়াছে।

চারিটি অতৃপ্ত প্রাণীর মুখে তখন মিলনের স্বচ্ছ হাসি—কি সুন্দর দৃশ্য! বিষাদের করুণ সঙ্গীতের পর মিলনের এ সুখ-রাগিণী বড় শ্রুতি সুভগ, ইহা প্রাণ-ঢালা ভালবাসার পুরস্কার—প্রাণপাত সাধনার ফল, ইহা মনুষ্যত্বেরই জয়—ধর্ম্মেরই মাহাত্ম্য।

বিসর্জ্জন।

[শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী].

(১৪)

"হ্যাঁ ঠাকুরপো, ইতির বিয়ের নাকি সম্বন্ধ এসেছে?" বলিতে বলিতে বিমলা আসিয়া বারাণ্ডার ধারে বসিলেন।

তখন সকাল বেলা। রাত্রের সে মেঘ এখন আকাশে ছিল না। তরুণ সূর্য্যের আলো সারা গ্রামখানির বুকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। জলসিক্ত দূর্ব্বাদলের উপর, গাছের পাতায় সোণালা বরণ সূর্য্যের আলো ঝকমক করিয়া দুলিতেছে। আকাশখানি পরিষ্কার নীল। মাঝে মাঝে সাদা মেঘের টুকরা ভাসিয়া আসিয়া আবার দূরে চলিয়া যাইতেছে।

শ্রীনাথ বাবুকে ধরিয়া আনিয়া ইতি বারাণ্ডায় বসাইয়া মুখ ধুইবার উপকরণ নিকটে দিয়া কাপড় কাচিবার জন্য ঘাটে গিয়াছিল।

বিমলার কথা শুনিয়া শ্রীনাথ বাবু বলিলেন, "হাঁ, কাল মুখুজ্যে মশাই কোথা হ'তে এক সম্বন্ধ এনেছেন। পাত্রও এসেছে।"

বিমলা মুখ কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, "রামোঃ, সেই নাকি তোমার পাত্র? তাকে আমি যে কাল দেখেছি গো! কালো হাঁদা ভূত, তারি সঙ্গে ইতির বিয়ে! শুনলে হাসিও পায়, দুঃখও হয়। তোমারও ত চোখ আছে ঠাকুরপো, দেখো একবার কেমন পাত্র সে, তারপর—"

শ্রীনাথ বাবু বলিলেন, "আমি পাত্র কাল দেখেছি।"

বিস্ময়ে দুই চোখ কপালে তুলিয়া বিমলা বলিলেন, "দেখেছ, তোমার মত হয়েছে?"

শ্রীনাথ বাবু মলিন হাসিয়া বলিলেন, "অগত্যা।"

বিমলা স্তম্ভিত ভাবে বলিলেন, "সে কি কথা গো? সেই পাত্র দেখে তোমার পছন্দ হ'ল?"

শ্রীনাথ বাবু বলিলেন, "পছন্দ না হলেই বা করব কি?

আমার কি এমন ক্ষমতা আছে যাতে ভাল ছেলের হাতে তাকে দিতে পারি? আমার অর্থ নেই, আমি নিজে শয্যা-গত। মেয়েকে কুমারী রাখবারও যো নেই, তোমরাই দশজনে নানা কথা বলবে তাতে। এমন অবস্থায় যেমন পাত্র পাই তারই হাতে মেয়ে দেওয়া ভাল।"

তোমরা দশজনে—এই কথাটা বিমলার গায়ে বাজিল; মুখখানা বেজায় রকম অন্ধকার করিয়া তিনি বলিলেন, "আমি কি তোমার মেয়ের বিয়ের চেষ্টা করি নি ঠাকুর-পো? অমন ধম্ম-খেকো কথা তুমি আর মুখে এনো না। আমি তোমাদের জন্যে যতটা খেটেছি, এমন আর কেউ খেটেছে বলতে পার? তোমায় ঠাকুরপো ভাল কথায় বুঝাতে আসলুম, তুমি উল্টো বুঝলে। যা' তোমার খুসি তুমি তাই কর গে। তোমার মেয়ে তুমি বিলাও, কাট, মার, লোকের কি তাতে?"

কালো মুখেই তিনি উঠিয়া গেলেন।

ভাল কথা বলিতে গিয়া মন্দের উদ্ভব দেখিয়া শ্রীনাথ বাবু নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন।

ইতি কাপড় কাচিয়া আসিয়া দেখিল তিনি চুপ করিয়া বসিয়া আছেন। সে কলসী নামাইয়া নিকটে আসিয়া বলিল, "এখনও মুখ ধোও নি বাবা?"

"হ্যাঁ, এই ধুই—"

তাড়াতাড়ি তিনি মুখ ধুইতে লাগিলেন।

একটু বাদেই শ্যামাপদ বাবু নির্ব্বাচিত পাত্র সুরেন্দ্র-নাথকে লইয়া উপস্থিত হইলেন। মণি অবজ্ঞাভরে আসিয়া বারাণ্ডায় দুখানা আসন পাতিয়া দিয়া গেল। সাক্ষাৎ যমদূতাকৃতি ভাবী ভগ্নীপতিকে দেখিয়া তাহার মোটেই পছন্দ হয় নাই, এবং সে মনে মনে লক্ষবার ভগবানের নিকটে ইহার মরণ প্রার্থনা করিতেছিল।

শ্যামাপদ বাবু বসিয়াই বলিলেন, "তারপর তোমার মতটা কি হ'ল শ্রীনাথ? ভেবে চিন্তে দেখেছ বোধ হয় সব?"

ভাবী জামাতার মুখ পানে চাহিয়া শ্রীনাথ বাবুর মন বিদ্রোহী হইতে চাহিতেছিল। সেই অসংযত মনটাকে ফিরাইয়া তিনি দৃঢ় কণ্ঠেই উত্তর করিলেন, "হাঁ, আমি রাজি আছি।"

অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া শ্যামাপদ বাবু বলিলেন, "নিশ্চয়ই রাজি হতেই হবে যে। হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলে যে—সে মহামূর্খ নামেই খ্যাত হয়। তোমার যথার্থ যে বুদ্ধি আছে তা বেশ জানলুম। তা' হলে দিন স্থির হয়ে যাক, কি বল?"

শুষ্ক কণ্ঠে শ্রীনাথ বাবু বলিলেন, "তা করুন।"

শ্যামাপদ বাবু মণির পানে চাহিয়া বলিলেন, "ওরে ওই ছোঁড়াটা, তোদের পঞ্জিকা থাকে যদি, নিয়ে আয় তো।"

যে মিষ্টস্বরে সম্বোধন, তাহাতে মণির মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত ঠাণ্ডা হইয়া গেল। তাহার বিকৃত মুখের পানে তাকাইয়া পিতা সান্ত্বনা পূর্ণ কণ্ঠে বলিলেন, "যাও ত বাবা পঞ্জিকাখানা নিয়ে এসো।"

মণি আস্তে আস্তে গৃহে চলিয়া গেল ও একখানি পঞ্জিকা আনিয়া শ্যামাপদ বাবুর সামনে ফেলিয়া দিয়া বাহিরে চলিয়া গেল।

শ্যামাপদ বাবু ত্রস্তে পঞ্জিকাখানা কুড়াইয়া লইয়া সুরেন্দ্রনাথের পানে চাহিয়া একটু হাসিমুখে বলিলেন, "আজ কালকার ছেলেগুলোই হয়েছে এমনি। এরা কাউকে মানতে চায় না, কাউকে গণতে চায় না, নিজের মতেই চলবে গোঁ ধরে। ছোট হ'তে বড় পর্য্যন্ত, সবই এমনি একরোখা। এই যে পঞ্জিকাখানা ফেলে দিয়ে গেল, এখানা হাতে তুলে দিলেই না ভাল হোত। যাক্, ছেলেমানুষ রোখের বশে একটা কাজ করে ফেলেছে তাতে ধরিনে; তবে কথা হচ্ছে কি, এ ছেলেটাও সাধারণ ছেলের দলে মিশে পড়ল।"

পঞ্জিকার পাতা উল্টাইয়া নির্দ্দিষ্ট স্থান বাহির করিয়া তিনি বলিলেন, "এ মাসের আর তিনটে বিয়ের দিন বাকি আছে। দুটো একেবারে শেষ দুই তারিখে, আর একটা এই আসছে সতেরই। কোন্ দিনে বিয়ে দেওয়া ইচ্ছে?"

শ্রীনাথ বাবু বলিলেন, "উনত্রিশে দিনটা করলেই ভাল হয় না কি? বাবাজির মত কি?"

সুরেন্দ্রনাথ গম্ভীর কণ্ঠে বলিলেন, "ও দিকে বিয়ের দিন করলে আমার বেজায় অসুবিধা হবে। ২৫শে তারিখে যে জাহাজ ছাড়বে বন্দর হতে সেই জাহাজে আমায় যেতেই হবে, নইলে চাকরী যাবে।"

শ্যামাপদ বাবু শিহরিয়া বলিলেন, "না বাপু, তাতে দরকার নেই, এই তারিখেই তোমার বিয়ে হয়ে যাক, ২৫শে' তুমি সস্ত্রীক চলে যাও সিঙ্গাপুরে, বস্ ফুরিয়ে গেল, কি বল শ্রীপতি ?"

একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া শ্রীপতি বাবু বলিলেন, "তাই হোক।"

শ্যামাপদ বাবু বলিলেন, "নমো নমো করে শুধু নারায়ণ সাক্ষী রেখে বিয়েটা দিলেই হবে; লোক জনকে বলারও দরকার দেখছি নে। যেমন তেমন করে তোমার দায়টা পার হওয়া বৈ তো নয়। যত সহজে সরল ভাবে বিয়েটা হয়ে যায় ততই তোমার ভাল। যাক, সে সব বন্দোবস্ত তো ঠিক হল, এখন মেয়েটিকে আহ্বন, বাবাজি একবার ভাল করে দেখে নিন।"

শ্রীনাথ বাবু ডাকিলেন, "ইতি, একবার এদিকে এস তো মা।"

ধীর পদে নতমুখে ইতি পিতার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার সিক্ত কেশদাম পৃষ্ঠে, মাথায় কাপড় দেওয়া। স্কন্ধের উপর দিয়া এক গোছা চুল আসিয়া বুকের উপর লুটাইতেছে।

শ্যামাপদ বাবু সুরেন্দ্রনাথকে বলিলেন, "দেখ বাবা, তোমার অপছন্দ কখনই হবে না।"

মুগ্ধের ন্যায় সুরেন্দ্রনাথ চাহিয়া রহিলেন, খানিক পরে চোখ নামাইয়া মাথা কাত করিয়া জানাইলেন, পছন্দ হইয়াছে।

শ্যামাপদ বাবু বলিলেন, "তবে এখন আমরা উঠি, আপনি তা' হলে ওই দিনই বিয়ে দিয়ে ফেলুন। মেয়ে যত শীগগির পার করা যায় ততই ভাল। ওঠ বাবাজি—"

শশব্যস্তে শ্রীনাথ বাবু বলিলেন, "একটু জলযোগ করবার—"

বাধা দিয়া একটু হাসিয়া শ্যামাপদ বাবু বলিলেন, "এমন সকাল বেলায় কি জল খাওয়া যায়? সে আবার হবে একদিন, আজ যাওয়া যাক।"

সুরেন্দ্রনাথকে লইয়া তিনি চলিয়া গেলেন।

মণি সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল, "ওই লোকটার সঙ্গে বিয়ে দেবে দিদির—বাবা?"

শ্রীনাথ বাবু একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "তা বই আর উপায় কি বাবা?"

মণি মাথা নাড়িয়া সবেগে বলিল, "না, তা হবে না বাবা, তা কক্ষনো হবে না।"

শ্রীনাথ বাবু নীরবে অন্য দিকে চাহিয়া রহিলেন।

মণির চোখ জলে ভরিয়া আসিল, ইতি তাহা লক্ষ্য করিয়া হাসিমুখে বলিল, "তাতে দুঃখ কিরে বোকা ছেলে? দেখছিস নে বিয়ে না দিলে বাবাকে একঘরে হতে হবে, কেউ আমাদের দেখবে না। বাবাকে অনর্থক ভাবিয়ে তুলিস নে মণি, বড় হচ্ছিস, একটু বুদ্ধি বিবেচনা করে কাজ করিস।"

মণি আর কথা না কহিয়া বাহিরে চলিয়া গেল।

(১৫)

সেদিন ইতির বিবাহ। সত্যই ইতি অসঙ্কুচিত চিত্তে সেই কদাকার স্বামীর হাতে নিজেকে সমর্পণ করিতে অগ্রসর হইয়া পড়িল। কেবলমাত্র শ্যামাপদ বাবুই তাহার যে পরিচয় দিলেন তাহা সে জোর করিয়া বিশ্বাস করিয়া লইল, অবিশ্বাসকে একটু অগ্রসর হইতে দিল না।

পিতাকে রক্ষা করিবার জন্য কন্যা নিজের প্রাণ পর্য্যন্ত বলি দিতে প্রস্তুত। এই পিতামাতাকে রক্ষা করিবার জন্য আমাদের দেশে কত মেয়ে আত্মহত্যা করিয়া জ্বালা জুড়াইয়াছে। ইতিও সেই পিতাকে রক্ষা করিবার জন্য উৎসাহিত ভাবে বিবাহে অগ্রসর হইল। পরে যে কি হইবে তাহা সে ইচ্ছা করিয়াই ভাবিতে ভুলিয়া গেল। উপস্থিত যে রক্ষা পাওয়া তাহার বিশেষ দরকার তাহাই সে জানিয়াছিল।

কমনীয় সন্ধ্যাবেলা ছাদে বেড়াইতেছিল, তুষার নিজের গৃহে হার্ম্মোনিয়াম বাজাইয়া গান গাহিতেছিল—

মাস মাস, বরষ গেল—
বরষের শেষে সখা আসিলে না!

গানের সুরটী ঢেউ খেলাইয়া উঠিতেছিল পড়িতেছিল, কমনীয় নিবিষ্টচিত্তে গানটা শুনিতেছিল। এই গানটী তুষারের বড় প্রিয় হইয়াছিল, কারণ সম্প্রতি সে ইহা শিখিয়া আসিয়াছে।

কমনীয়ের মা নিকটে আসিয়া দাঁড়াইয়া অর্দ্ধোক্তিতে বলিলেন, "ও আবার কি গান শিখে এসেছে? ঠাকুর দেবতার গান গায় সে ভাল, যত সব বদ গান গাইবে।"

কমনীয় মুখ ফিরাইয়া একটু হাসিয়া বলিল, "গানটা ভাল না হোক, সুরটা চমৎকার।"

লীলা মুখ বক্র করিয়া বলিলেন, "চমৎকার লাগে তোদেরই কাছে বাপু, আমাদের কাছে লাগে না। যাক, সে সব কথা। তোর কাছে একটা দরকার আছে আমার।"

কমনীয় বলিল, "কি বল।"

লীলা বলিলেন, "বস, বলছি।"

কথার ভাবেই কমনীয় বুঝিল, বাস্তবিক বিশেষ আবশ্যকীয় কথা, এবং সে কথাটা যে কি তাহা বুঝিতেও তাহার বিলম্ব হইল না। সে মুখখানা অত্যন্ত গম্ভীর করিয়া আকাশের যে কোণটা রাঙা করিয়া চন্দ্র উঠিবার উদ্যোগ করিতেছিল সেই দিকে চাহিল।

মাতা বলিলেন, "বলছিলুম তোর বিয়ের কথা। এত দিন বিয়ের কথা বলি নি, একটা বেশ পাত্রী হাতে এসেছে। দেখতে ভারি সুন্দর মেয়ে, আর তার বাপ টাকাও দেবে বিস্তর। মেয়েটাকে বোধ হয় দেখেছিস, তুষারের শালা, আমাদের বউমার খুড়তুতো বোন। তারা এখুনি দিতে চায়, আজ দাদাকে পত্র দেছে। তাদের ইচ্ছে দুটি মেয়ে বেশ একঘরে থাকে, ভাব থাকে।"

কমনীয়ের মনে সেই প্রগলভা মেয়েটার কথা জাগিয়া উঠিল। মাস খানেক আগে তুষারের বিবাহে বরযাত্রী গিয়া সে সেই মেয়েটার কাছে লাঞ্ছিত হইয়াছিল বড় কম নয়। পানের মধ্যে সরিষা পুরিয়া, ভাতের মধ্যে বাটী সাজাইয়া, ঘুমাইলে নাকে নস্য দিয়া, হাঁচাইয়া কাশাইয়া একেবারে অস্থির করিয়া তুলিয়াছিল।

তাহার দুর্দ্দান্ততার জন্য তাহাকে ভাল লাগিলেও তাহাকে বিবাহ করিতে হইবে এমন কল্পনা কমনীয় কখনও করে নাই। সে তুষারকে জানাইয়াছিল যে, মেয়েটা বেশ ভাল, তাহাতে বিশ্বাসঘাতক তুষারই যে বাড়ীর সকলকে জানাইয়াছে সে সেই মেয়েটাকে ভালবাসে তাহাতে তিল মাত্র সন্দেহ নাই। মামা মামী মা এবং দাদা এই চারিজনে মিলিয়া এই চক্রান্তটা করিয়া তুলিতেছে।

কমনীয় বিরক্ত ভাবে বলিল, "তোমাদের কেবল বিয়ে বিয়ে ঝোঁক। আর তো কিছু খুঁজে পাও না তাই কেবল বিয়েরই স্বপ্ন দেখ। আমি বিয়ে করব না তা বলে দিচ্ছি। অনর্থক আমায় ত্যক্ত করতে এস না।"

দুই চোখ কপালে তুলিয়া লীলা বলিলেন, "তুই বলছিস কি রে, বিয়ে করবি নে, সে কি আবার একটা কথা হতে পারে? না হয় এ মেয়েকে বিয়ে করবি নে যদি পছন্দ না হয়ে থাকে। অমন তো হাজার হাজার মেয়ে আছে, বিয়ে তাদেরই কাউকে করবি। একেবারে বিয়ে করব না—সে আবার কি কথা?"

তাঁহাকে বেশী নাড়াচাড়া করিতে গেলে যে অনেক কথা শুনিতে হইবে, তাহা কমনীয় জানিত, সে তাই সে কথাটা চাপা দিবার জন্য বলিল, "আচ্ছা সে হবে, যখনকার কথা তখন দেখা যাবে, এখনি তার কি? আগে ডাক্তারী পাশ হই, তখন বিয়ে করব। আর দুটো বছর সবুর কর, তারপরে বিয়ে করে তোমায় চতুর্ব্বর্গ ফলদান করব।"

মা বলিলেন, "আরও দু' বছর? সে কি বড় কম দিন মনে করিস নাকি? তার আগেই আমি যদি মরে যাই?"

কমনীয় গম্ভীর মুখে বলিল, "তা হলে আর বিয়ে হবে না।"

লীলা তাহার কঠোর পণ জানিতেন, সে যাহা বলে তাহাই ঠিক পালন করিয়া যায়। ছোটবেলা হইতে তাহার কৃত সকল কার্য্যে এই দৃঢ় পণ দেখা যাইত, ইহার জন্যই সে একগুঁয়ে নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিল।

অগত্যা দুই বৎসর পরেই রাজি হইয়া তিনি বলিলেন, "তাই না হয় হবে। আজ গাঁয়ে একটা বিয়ে হচ্ছে, কিন্তু একটা সাড়া শব্দ নেই। আজ যে ইতির বিয়ে হচ্ছে রে, জানিস কিছু?"

বিস্মিত হইয়া কমনীয় বলিল, "ইতির বিয়ে হচ্ছে? কোথায়, কার সঙ্গে?"

লীলা বলিলেন, "তা শুনিস নি? একটা পাত্র জুটেছে যে, সিঙ্গাপুর না কোথায় পাঁচশো টাকা করে মাইনে পায়।"

কমনীয় বলিল, "বিয়েটা দেখতে হবে, আমি যাচ্ছি।"

লীলা গালে হাত দিয়া বলিলেন, "যাবি কি রে? তারা নমো নমো করে বিয়ে সারছে, কাউকে বলে নি। যদি দেখতেও বলত, তাও না হয় যেতিস, শুধু শুধু যাবি—তাতে—"

"তা হোক গিয়ে—"

কমনীয় একেবারে তুষারের কক্ষে ঢুকিয়া পড়িল, তুষার তখন গান ধরিয়াছিল—"নিশীথ রাতে বাদল ধারা—"

কমনীয় হার্মোনিয়াম চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "রাখো এখন তোমার 'নিশীথ রাতে বাদল ধারা'; আমার সঙ্গে যাবে?"

তুষার বলিল, "কোথা? এই অন্ধকার রাত, রাতটা বাদে কালই বাড়ী ছাড়তে হবে, এখন যাব কোথা বল তো? সারাদিন বাড়ী হতে নড়তে চাইবি নে, রাত্রেই বেড়ানোর ঝোঁক যত।"

কমনীয় ক্ষিপ্রহস্তে হার্মোনিয়ামের চাবিগুলা বন্ধ করিয়া দিতে দিতে বলিল, "রাত্রে একটু বেরুলে তোমায় বাঘ ভালুকে খেয়ে ফেলবে না, ভয় নেই। একটা বিয়ে দেখতে যাচ্ছি, যাবে?"

বিস্মিত হইয়া তুষার বলিল, "বিয়ে? কার বিয়ে?"

কমনীয় বলিল, "ইতির বিয়ে। বেচারা ভদ্রলোক গরীব বলে কাউকে বিয়ে দেখতে ডাকতে পারে নি; কিন্তু তা না হলেও আমাদের উচিত বিয়েটাতে সাক্ষী থাকা। ছোটবেলায় যার সঙ্গে খেলেছি, তার বিয়েটায় থাকা উচিত কি না তুমিই বল।"

তুষার আর কথা না কহিয়া জুতা পায়ে দিয়া দাঁড়াইল।

উঠানে না আছে আলিপনা না আছে কিছু। পুরোহিত শ্যামাপদ বাবু একখানি কুশাসনে বসিয়া বিবাহের মন্ত্র উচ্চারণ করিতেছিলেন, কৃষ্ণকায় স্থূলাকৃতি বরের পার্শ্বে নত বদনে বসিয়া ইতি। সামনে পিতা কম্পিত হস্তে কন্যার কম্পিত শীতল হাতখানা ধরিয়া বরের হস্তে সমর্পণ করিতেছেন, ভগিনীর পার্শ্বে দাঁড়াইয়া মণি ক্রুদ্ধ বিস্ফারিত নেত্রে সুরেন্দ্রনাথের পানে চাহিয়া আছে।

তুষার ও কমনীয় সেখানে পৌঁছাইতেই সকলেই সচকিত হইয়া উঠিল। ইতির নত মুখ আরও নত হইয়া গেল, শ্যামাপদ বাবুর মুখখানা ফেঁকাশে হইয়া গেল, তিনি তাড়াতাড়ি সম্প্রদানের শেষ মন্ত্রটা উচ্চারণ করিয়া ফেলিলেন।

তুষার বরাবরই শান্তপ্রকৃতি হইলেও সে শ্যামাপদ বাবুকে দেখিতে পারিত না, আর কমনীয়ের তো কথাই নাই। ছোটবেলা হইতে আজ পর্য্যন্ত সে শ্যামাপদ বাবুকে বিশেষরূপে উৎপীড়িত করিয়া বিশেষ আনন্দ লাভ করে। পথে ঘাটে টিকটিকি, বড় মাকড়সা লইয়া চলে, শ্যামাপদ বাবুর কাছাকাছি হইয়া চট করিয়া সেটা তাঁহার গায়ে ফেলিয়া দেয়। ভদ্রলোক প্রবল ভয়ে কম্পমান হইয়া পড়িয়া গেলে সে সহচরগণ সহ হো হো শব্দে হাসিয়া গগন ফাটাইয়া তোলে।

কমনীয় একটু হাসিয়া বলিল, "যাক—পুরোহিত জুটেছে ভাল, আজ শ্যামাপদ বাবুর পৈতে দেখছি ভারি সাদা।"

তুষার একটু হাসিল, পরক্ষণেই গম্ভীর মুখে বলিল, "ভয় নেই, আমরা কিছু বলতে আসি নি। শ্রীনাথ বাবু কিছু না বললেও আমরা সেধে বিয়ে দেখতে এসেছি।"

দারুণ বিপদ হইতে পরিত্রাণ পাইয়া শ্যামাপদ বাবু মুখে একটু হাসি খেলাইয়া বলিলেন, "তা তো বটেই বাবা, তা তো বটেই। হাজার হোক জমীদারের ছেলে ভাগনে তোমরা, বুদ্ধি আছে বই কি। তা বেশ করেছ বাবা, বেশ করেছ বিয়ে দেখতে এসে। ওহে শ্রীনাথ এদের বসতে আসন দিতে বল মণিকে।"

লজ্জায় শ্রীনাথ বাবু মাথা তুলিতে পারিতেছিলেন না। তাঁহার অবস্থা দেখিয়া দয়ার্দ্র হইয়া তুষার বলিল, "না না, আসন দিতে হবে না। আমরা বেড়াতে এসেছি, এখনি চলে যাব। থাক রে মণি, তোর আর দৌড়াতে হবে না।"

কমনীয় তখন তদ্গতচিত্তে বরের রূপসুধা পান করিতেছিল, বলিল "পাত্র জুটালেন বুঝি আপনিই?"

লজ্জিত ভাবের হাসি হাসিয়া শ্যামাপদ বাবু বলিলেন, "তা আর কি করি বাবা! বেচারা ভদ্রলোক নিজে উত্থানশক্তি রহিত, এ দিকে মেয়ের বিয়ে না দিতে পারলে জাত যায়। কি করি, পাত্রটিকে জুটিয়ে আনলুম।"

তুষার বলিল, "এই তো মানুষের কাজ। যেদিন দেশে দেশে আপনার মত পরার্থপর লোক জন্মাবে, যথার্থ সেই দিনই দেশ উন্নত হবে। যাক্, ছেলে কি কাজ করেন?"

শ্যামাপদ বাবু গর্ব্বিত মুখে বলিলেন, "তা আছে। সে খুব মোটা মাইনের কাজ, কোন কোম্পানীর ম্যানেজার, পাঁচশো টাকা মাসিক মাইনে।"

কমনীয় মাথা দুলাইয়া বলিল, "তাতো ঠিকই।"

সাম্‌নে একটা প্রদীপ জ্বলিতেছিল, তাহার মলিন আলোকে ইতির মুখ মোটেই দেখা গেল না।

আর একটু দাঁড়াইয়া কমনীয় ও তুষার বিদায় লইল।

পথে আসিয়া কমনীয় হঠাৎ উচ্ছ্বসিত হইয়া হো হো শব্দে হাসিয়া উঠিল।

তুষার কি ভাবিতে ভাবিতে চলিতেছিল, তাহার হাসির শব্দে চম্‌কিয়া বলিল, "হাসছিস্ যে বড়?"

কমনীয় বলিল, "হাস্‌ছি শ্যামাপদর ভাব আর কথা দেখে। 'দুর্জ্জনকে দূরে পরিহার' এই নীতিটা সে চমৎকার পালন কর্‌তে শিখেছে কিন্তু।"

তুষার গম্ভীর মুখে বলিল, "তুই তাই ভাবছিস্, আমি ভাবছি বরের কথা। লোকটাকে আমি বোধ হয় বছর চার পাঁচ আগে যখন আমি আই-এ ক্লাসে পড়তুম্ তখন দেখেছি। আমাদের মেসের পাশের বাসায় একে আমি দেখেছিলুম।"

কমনীয় বলিল, "ঠিক এই-ই তাহ'লে।"

তুষার সন্দেহের ভাবে মাথা দুলাইয়া বলিল, "ঠিক বল্‌তে পার্‌ছিনে। সে লোকটা কিন্তু চুরি করে বছর খানেকের জন্যে জেলে গেছল। যদি এই সেই লোক হয় তবে মেয়েটার কপালে বিস্তর দুঃখ আছে।"

কমনীয় উত্তেজিত হইয়া বলিল, "ওখানেই এ কথা বল্‌লে না কেন?"

তুষার শান্তভাবে বলিল, "সে লোক যদি না হয় তখন অপ্রস্তুত হয়ে মরি আর কি। তোর মত গোঁয়ার তো আমি নই, যে লাফিয়ে পড়ে যাকে তাকে যা' না তাই বলব। যে কাজই কর না কেন, ধীরে ধীরে ভেবে চিন্তে কর্‌তে হয়, এটা একটা মস্ত নীতি, তা জানিস্?"

কমনীয় বলিল, "তুমি প্রফেসর মানুষ, নীতি চালাতে পার, আমার দ্বারা তা' হয় না। যেটা করব, ভাববও না, দেখবও না, একদম করে ফেলব, বস্ ফুরিয়ে গেল। সব কাজ ধীরে সুস্থে, ভেবে চিন্তে কর্‌তে গেলে চলে না।"

তুষার শুধু হাসিল।

বাড়ী ফিরিতেই তুষারের পিতা হাঁক্ দিলেন, "এত রাত্রে তোরা দুজন কোথা গেছলি রে?"

কমনীয় আর কাহাকেও ভয় না করিলেও মামাকে ভয় করিত। সে তুষারের গা টিপিল।

তুষার তিলমাত্র বিলম্ব না করিয়া উত্তর করিল, "সুধীর কাকার বাড়ী আজ কথা হচ্ছে তাই শুন্‌তে গেছলুম।"

অবিশ্বাসী বিদেশী ভাবাপন্ন পুত্র ও ভাগিনেয়ের হিন্দু-ধর্ম্মে আস্থা দেখিয়া তিনি ভারি খুসি হইয়া বলিলেন, "আচ্ছা—আচ্ছা যা।"

দুই ভাইয়ে মিথ্যার আবরণের আড়াল দিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। ক্রমশঃ।

গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

[শ্রীপ্রিয়লাল দাস, এম-এ, বি-এল]

আলোচ্য কাব্যের রচনাকাল নির্ণয় করিবার জন্য শেষোদ্ধৃত শ্লোকগুলি হইতে বিশেষ কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না। নিখিলনাথ রায় মহাশয় "মুর্শিদাবাদের ইতিহাসে" ভাগীরথীর গতিপথ সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহার সহিত দুর্গাপ্রসাদের বর্ণনার কতটা ঐক্য আছে তৎসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা আবশ্যক। "রামায়ণে লিখিত

আছে যে ভগবান শঙ্কর ভগীরথের তপস্যায় প্রসন্ন হইয়া গঙ্গাকে স্বীয় জটাটবী হইতে বিন্দু সরোবরের অভিমুখে পরিত্যাগ করেন, তথা হইতে গঙ্গা সপ্তধারে প্রবাহিত হন। তাঁহার হ্লাদিনী, পাবনী ও নলিনী নামে তিন স্রোত পূর্ব্বদিকে, সুচক্ষু, সীতা ও সিন্ধু নামে তিন স্রোত পশ্চিম দিকে এবং অবশিষ্ট আর একটি স্রোত মহারাজ ভগীরথের পশ্চাত পশ্চাত চলিয়া সমুদ্রে পতিত হয়। এই স্রোতই গঙ্গা বা ভাগীরথী, সুতরাং ভাগীরথী ও নলিনী যে দুইটী বিভিন্ন নদী, তাহা রামায়ণ হইতে প্রতিপন্ন হইতেছে। উক্ত নলিনী যে পদ্মার নামান্তর মাত্র, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।" নিখিল বাবু আরও বলেন—"কৃত্তিবাসী রামায়ণে ও গঙ্গাভক্তি তরঙ্গিণীতে লিখিত আছে যে,গঙ্গা ভগীরথের পশ্চাত ধাবিত হইয়া ভাগীরথীর মোহানার নিকট প্রতারিত হওয়ায় পূর্ব্বমুখে গমন করিয়াছিলেন, পরে পুনর্ব্বার উজানে প্রবাহিত হইয়া ভাগীরথীরূপে সমুদ্রে পতিত হন।" গঙ্গার প্রতারিত হওয়া সম্বন্ধে কৃত্তিবাস ভাষা রামায়ণের আদিকাণ্ডে লিখিয়াছেন,—

"গৌড়ের নিকটে গঙ্গা মিলিল আসিয়া॥
পদ্ম নামে এক মুনি পূর্ব্ব মুখে যায়।
ভগীরথ বলি গঙ্গা পশ্চাত গোড়ায়॥
যোড় হাত করিয়া বলেন ভগীরথ।
পূর্ব্বদিকে যাইতে আমার নহে পথ॥
পদ্মমুনি লয়ে গেল নাম পদ্মাবতী।
ভগীরথ সঙ্গেতে চলিল ভাগীরথী॥
শাপবাণী সুরধুনী দিলেন পদ্মারে।
মুক্তিপদ যেন নাহি হয় তব নীরে॥
একবার গেল গঙ্গা ভৈরব বাহিনী।
আর বার ফিরিলেন সাগর গামিনী॥
অজয় গঙ্গার জল হইল দর্শন।
শঙ্খধ্বনি করেন যতেক দেবগণ॥"

বাঙ্গালী কবি কৃত্তিবাস বাল্মীকির উপর কলম ধরিয়া গঙ্গার ভৌগোলিক অবস্থার কেমন সুন্দর কবিত্বময় ব্যাখ্যা করিয়াছেন! দুর্গাপ্রসাদ "গঙ্গাভক্তি তরঙ্গিণী"তে এই প্রাকৃতিক ব্যাপারের সুন্দরতর ব্যাখ্যা লিখিয়াছেন।

"উধুয়া দক্ষিণে করি, চলিলা পরমেশ্বরী,
গউড় দেশেতে উপনীত।
আসিতে সুতির কাছে, ভগীরথ পড়ে পাছে,
শঙ্খাসুর করিল মোহিত॥
আগে শঙ্খ বাজাইয়া, চলিল গঙ্গারে নিয়া,
মায়া করি যায় শঙ্খাসুর।
যাইতে কথেক পথ, গঙ্গা কন ভগীরথ,
বাছা আর আছে কত দূর॥
অসুরের মায়া যত, কথায় কহিব কত,
ভগীরথ মত কথা কয়।
বলে শুন সুরেশ্বরী, আইস আমার পুরী
যাবে দুঃখ বড় দূর নয়॥
গঙ্গার হইল ভয়, ভাবেন কি কথা কয়,
ব্যঙ্গ শুনে হইল সংকিত।
ভগীরথ কেন্দে বলে, কোন পথে মা চলিলে,
মায়ের নিকটে উপনীত॥
দেখে ভগীরথ মুখ, গঙ্গার হইল দুঃখ,
বলেন যেমন সন্তানেরে।
কান্দনা কান্দনা আর, বল বাছা সমাচার,
ফেলাইল কেবা এত ফেরে॥
রাজা বলে নিবেদন, আছে দিক নিরূপণ,
যাইতে যে হবে মা দক্ষিণে।
এ যে পূর্ব্ব বহুদূর, ভুলাইল শঙ্খাসুর
ফিরে চল দয়া করি দীনে॥
হাসিয়া বলেন সতী, শুন তবে পদ্মাবতী,
তুমি কর এ পথে গমন।
চল দেখাইয়া পথ, আগে বাছা ভগীরথ,
বিলম্বে নাহিক প্রয়োজন॥

সুতীর নিকটে গঙ্গা আইলা ফিরিয়া।
চলিলা কিরীটকোনা দক্ষিণে রাখিয়া॥
মহাপীঠ সতীর কিরীট সেই স্থানে।
ভগীরথে দেখাইলা ভৈরব যেখানে।"

ইহার পর গঙ্গা "দক্ষিণ সমাজ" আসিলেন। শেষোদ্ধৃত

শ্লোকগুলি যে কৃত্তিবাসের অনুকরণে রচিত তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। মুকুন্দরামের প্রভাবও "গঙ্গাভক্তি তরঙ্গিণী"র স্থানে স্থানে অনুভব করা যায়। দুর্গাপ্রসাদের সময়ে মুকুন্দরামের চণ্ডীকাব্য যে গীত হইত তাহা শুধু অনুমান-সাপেক্ষ নহে। দুর্গাপ্রসাদ পূর্ব্ব বঙ্গের লোকদিগের বাগ্‌-ভঙ্গী লইয়া যে কৌতুক করিয়াছেন, তাহার কারণ তিনি বাল্যকাল হইতে মুকুন্দরামের চণ্ডীকাব্যের গানে উক্ত প্রকার বাগ্‌ভঙ্গী শুনিয়া আসোরে সমবেত শ্রোতাদিগের কৌতুকপ্রিয়তার পরিচয় পাইয়াছিলেন।

"বাঙ্গাল কান্দেরে হুড়র বাপই বাপই।
কুক্ষণে আসিয়া প্রাণ বিদেশে হারাই॥
পলায় বাঙ্গাল সব পেলাইয়া সোলা।
হেট মাথা করি রয় কাঁকতলি মলা॥
আর বাঙ্গাল বলে বাই গায় নাই বল।
আমার জীবন ধন এভরে হিন্দল॥
আর বাঙ্গাল বলে বাই বৃথা কৈল দ্বন্দ্ব।
পুরুষ সাতের মোর হারাইল কাসন্দ॥
আর বাঙ্গাল বলে বাই হইল অনাথ।
হর্ব্বধন গেল মোর হুকুতার পাত॥
আর বাঙ্গাল বলে বাই হুতাষ।
জীবনে কাতর বড় আরায়ে বাতাস॥
আর বাঙ্গাল বলে বাই কইতে বড় লাজ।
অলিগুভি-বাস্যা গেলো জীবনে কি কাজ॥
অলদি গুভা হুক্কাপাতা হিদল হিকই।
মজাইল হর্ব্বধন কেমনে কুলাই॥
আর বাঙ্গাল বলে বাই এই ঐন গতি।
দক্ষিণ পাটনে মৃত্যু বিধাতার লিখিতি॥
যুবতী যৌবনবতী তেজিলাম রোষে।
আর বাঙ্গাল বলে দুঃখ পাই গ্রহ দোষে॥
ইষ্টমিত্র কুটম্বেরে লাগে মায়া মো।
আর বাঙ্গাল বলে না দেখিনু মাগু পো॥
কবন্দক হেতু পরাধীন যেই জন।
আর বাঙ্গাল বলে তার বিফল জনম॥
কেন আজি রহিলাম থাইয়া আপনা।
বিপাকে মজিল মোর হর্ব্ব হবাপনা॥
শিশুমতি সাধু নাহি বুঝে হিতাহিত।
রাজার সভায় কেন কয় বিপরীত॥
আর বাঙ্গাল বলে যাই যেই নাই বুঝে।
ক্ষিতিতলে মরণে প্রকৃতি নাই গুচে॥
বাঙ্গালের বচনে সাধুর ম্লান মন।
সজল নয়নে বলে বিনয় বচন॥"

(মুকুন্দরাম)

দুর্গাপ্রসাদ যে প্রণালীতে "গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী" রচনা করিয়াছেন তদ্বিষয় চিন্তা করিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে তিনি মুকুন্দরামের রচনা-প্রণালী আলোচ্য কাব্যে অনুসরণ করিয়াছেন। দুর্গাপ্রসাদ যে সপ্তদশ শতাব্দীর কবি তাহার ইহাও একটি প্রমাণ। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে ভারতচন্দ্র প্রমুখ কবিরা সপ্তদশ শতাব্দীর বঙ্গভাষার সুদীর্ঘ বৃহদায়তন গীতি-কাব্যকে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাব্য-শিল্পের ইতিহাসে নূতন যুগের অবতারণা করিয়াছিলেন। মুকুন্দরামের চণ্ডীকাব্যে কালকেতু ও সদাগরের দুইটি স্বতন্ত্র দীর্ঘ উপাখ্যান একটিমাত্র সূত্রে গ্রথিত। শুধু তাহাই নহে, উক্ত প্রত্যেক উপাখ্যানের ভিতর অনেকগুলি নাতি-ক্ষুদ্র কথার সমাবেশ দেখা যায়, কিন্তু কাব্যের বর্ণনীয় সকল বিষয়-গুলিই একটি অবিচ্ছিন্ন গানের অঙ্গীভূত। দুর্গাপ্রসাদের "গঙ্গাভক্তি তরঙ্গিণী"তেও আমরা দেখিতে পাই যে, গঙ্গার ইতিহাসের শেষে বামন-ভিক্ষার উপাখ্যান জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে আর উক্ত দুইটি বিষয়েরই বর্ণনাতে ছোট-খাট অনেক ব্যাপার কবি বুনিয়া দিয়াছেন। মুকুন্দরামও দুর্গা-প্রসাদের গানের ধুয়া আরম্ভ ও শেষ, এমন কি ভণিতাতেও একই প্রকার শিল্প-নৈপুণ্য লক্ষিত হয়। ভারতচন্দ্রের "অন্নদামঙ্গল" ও "বিদ্যাসুন্দরে" বর্ণিত প্রত্যেক ক্ষুদ্র বা বৃহৎ বিষয় এক একটি স্বতন্ত্র ক্ষুদ্র বা বৃহৎ কবিতার আকারে রচিত। ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, অষ্টাদশ শতাব্দীর বাঙ্গালী কবিরা কাব্য রচনা করিতে বসিয়া কাব্যের বর্ণনীয় বিষয়গুলিকে ভাগ করিয়া লইয়া খণ্ড কবিতার আকারে সেগুলিকে রচনা করিবার পক্ষপাতী হইয়া পড়িতেছিলেন। দুর্গাপ্রসাদ যদি অষ্টাদশ শতাব্দীর কবি হইতেন তাহা হইলে তিনিও তাঁহার "গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী"

কাব্যকে খণ্ড কবিতার ছাঁচে ঢালিয়া উক্ত প্রকার নূতন ধরণের গীতি-কবিতা রচনা করিতেন। এতদ্ব্যতীত, ভারতচন্দ্রের যুগে বাঙ্গালা কাব্য-সাহিত্যে আদিরসের যে তরঙ্গ বহিয়া যাইতে আরম্ভ হইয়াছিল দুর্গাপ্রসাদের কাব্যে তাহার অনুরূপ কিছু দেখা যায় না। দুর্গাপ্রসাদের রচিত "গঙ্গা-ভক্তি তরঙ্গিণী" কাব্যে অশ্লীলতার সম্পূর্ণ অভাব লক্ষিত হয়। আলোচ্য কাব্যে দুই এক স্থান ব্যতীত ঘটনা-বৈচিত্র্যেরও অভাব দেখা যায়। দুর্গাপ্রসাদের যুগে বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনে একটানা স্রোত বহিতেছিল। মানসিংহ কর্ত্তৃক সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভকালে প্রতাপাদিত্যের বাঙ্গালী বাহিনী ধ্বংস হইবার পর কচুরায় ও ভবানন্দ মজুমদারের বংশধরগণ মোগল শাসিত বাঙ্গালায় বিশ্বাসঘাতকতার পারিতোষিক স্বরূপ তাঁহাদের পূর্ব্ব পুরুষগণের প্রাপ্ত জমিদারী রক্ষা করিয়া বৎসর বৎসর খাজনা আদায়ে মোগল সম্রাটের তুষ্টিসাধন পূর্ব্বক বেশ সুখে ও স্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করিতেছিলেন। বাঙ্গালার যে চিত্র দুর্গাপ্রসাদ অঙ্কিত করিয়াছেন, তাঁহাতে শান্তিপ্রিয় বাঙ্গালীর জাতীয় চরিত্রের কোমল ভাবগুলি ফুটিয়া উঠিয়াছে। অগ্রদ্বীপের চিত্রে বাঙ্গালীর বৈষ্ণবতা, উলার চিত্রে তাহার নৃত্যগীত-প্রিয়তা, চাবদহের চিত্রে বাঙ্গালী তীর্থযাত্রীর উৎসাহ দেখিয়া বুঝিতে পারা যায় যে, আমরা বঙ্গদেশে যুদ্ধ বিগ্রহ ও ষড়যন্ত্রের যুগ হইতে বহুদূরে আসিয়া পড়িয়াছি। ইহার পর কিঞ্চিদধিক পঞ্চাশ বৎসর পরে কৃষ্ণচন্দ্রীয় যুগে আবার আমরা বাঙ্গালার ইতিহাসে ষড়যন্ত্রকারী বিশ্বাসঘাতক বাঙ্গালীর পরিচয় পাইব; আবার আমরা বাঙ্গালীকে মুসলমান রাজা সিরাজুদ্দৌলার অত্যাচার হইতে স্বদেশকে রক্ষা করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইতে দেখিতে পাইব। সে সময়ে কিন্তু বাঙ্গালী বিলাসিতার স্রোতে নিমজ্জিত হইয়া কৌলিন্যের ছায়াবাজী রচনা করিতেছিল, আর মাঝে মাঝে গোপাল ভাঁড়ের রসিকতায় উচ্চ হাস্য করিয়া জাতীয় হৃদয়ে উচ্চাভিলাষের নূতন দেবতার আরতি করিতেছিল। সেই কারণে তাহার উন্মত্ত বঙ্গদেশে স্বরাজ্য প্রতিষ্ঠার পক্ষপাতী না হইয়া বিদেশী নূতন প্রভুর সাহায্যে অত্যাচারের প্রতিকার করিয়া পৈত্রিক সম্পত্তি নূতন বন্দোবস্তে ভোগ দখল করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িল। কৃষ্ণচন্দ্রীয় যুগের বাঙ্গালা কাব্য সাহিত্যে সেইজন্য আমরা যে ঘটনা-বৈচিত্র্যের পরিচয় পাই তাহাতে আবিলতার গন্ধ ও স্বার্থের অভিনয় ছাড়া আর বড় বেশী কিছু নাই। বাঙ্গালা দেশ ও বাঙ্গালীর ইতিহাসে সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দী যে দুইটি অধ্যায় রচনা করিয়াছে, সেই দুইটী অধ্যায় মনোযোগের সহিত পাঠ করিলে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে মুকুন্দরাম ও ভারতচন্দ্রের যুগের ঠিক মধ্যবর্ত্তী সময়ে দুর্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় "গঙ্গা-ভক্তি তরঙ্গিণী" কাব্য রচনা করিয়াছিলেন।

(সমাপ্ত)

মরণ গীতিকা।

[শ্রীপ্রিয়গোবিন্দ দত্ত, এম্-এ, বি-এল]

হোটেলের ঘড়ীর মৃদু কম্পিত আওয়াজ শুনিয়া মেরী তাহার স্বামীকে কহিল, "চল এখন ফেরা যাক। খাওয়ার সময় হয়েছে।"

তাহারা দুইজনে সমুদ্রের ধারে বসিয়া হাওয়া খাইতেছিল। হোটেলের আর আর সকলেও তখন সেইখানে এধার-ওধার চলা ফেরা করিতেছিল। ঘড়ীর আওয়াজ শুনিয়া সকলেই হোটেলের দিকে চলিতে সুরু করিল। মেরীও তাহার রুগ্ন স্বামীকে লইয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইল। কিন্তু তাড়াতাড়ি যাইতে চাহিলেই কি আর অমন সঙ্গিটীকে লইয়া যাওয়া যায়! তাই একে একে দলের পর দল তাহাদিগকে অতিক্রম করিয়া চলিয়া গেল। তাহাদের কলহাস্যে, সুদৃশ্য পরিচ্ছদে ও সুমিষ্ট এসেন্স সুবাসে চতুর্দ্দিক ভরিয়া উঠিল।

এই সকল লোকের দিকে মেরী দুই একবার খুব

ব্যগ্রতার সহিত তাকাইয়া দেখিল, এবং স্বামীকে লইয়া তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে চলিতেও সে একটু চেষ্টা করিল। এমন সময় পেছন হইতে আর একটি দল আসিয়া তাহাদিগকে ধরিয়া ফেলিল।

মেরী একটু বিরক্ত হইয়া উঠিতেছিল, এমন সময় ন্যাথানিয়েল কহিল, "মেরী, আমরা নয় সকলের শেষেই যাব।"

স্বামীর যে তাড়াতাড়ি চলিতে কষ্ট হইতেছিল সেজন্ত মেরী একটু অনুতপ্ত হইল।

কে কে যেন পশ্চাতে কোমল সুরে আলাপ করিয়া আসিতেছিল। মেরীর কানে তাহার সুর পৌঁছিতেই সে স্বামীর তিরস্কার ভুলিয়া গিয়া তাহার অধিকৃত সমস্ত ফরাসী বিদ্যাটুকু দিয়া বিশেষ মনোযোগ দিয়া সেই গুঞ্জন শুনিতে লাগিল।

মেরী শুনিল পুরুষটি কহিতেছে, "আপনার খুড়ার বুঝি খুব শক্ত ব্যারাম?" মেয়েটি বলিল, "না, কোন ব্যারাম নাই। তবে তিনি আরামটাকে খুব পছন্দ করেন, আর চলা ফেরা তাঁর মোটেই ভাল লাগে না। তাই সারাদিন কেবল ইজি চেয়ারে বসে বসে কাটান। আর আমাকে বাধ্য হয়ে তাঁর কাছে বসে বসে কেবল একটানা গল্প করতে হয়।"

তারপর দুইজনেই কিছুক্ষণ নীরবে রহিল। পরে পুরুষটি কহিল, "আপনার কি একেবারেই ছুটি নাই?"

"একেবারে নাই বললেই হয়।"

"তা হলে দেখছি আপনার সঙ্গে এই সমুদ্রের ধারে দেখা করার সৌভাগ্য আর আমার হবে না।"

"না, তা নয়, এখানে আমি এসে থাকি। এখানে দেখা হতে পারবে।"

"অজস্র ধন্যবাদ।"

মেরী বুঝিল এই কথাবার্ত্তার মধ্যে একটা কোমল ব্যাকুলতা ও অস্পষ্ট আকাঙ্খা লুক্কায়িত রহিয়াছে। পশ্চাৎ ফিরিয়া সে দেখিল একজোড়া নর নারী চলিয়া আসিতেছে। মেরী বুঝিল—এরাই দুটি। আর অমনই লজ্জিত হইয়া মস্তক আনত করিল। মেয়েটির জন্য তার মনে একটু বেদনা জাগিয়া উঠিয়াছিল। মেরীর মনে হইল—আজই বোধ হয় ওদের মধ্যে প্রথম পরিচয়।

একটু পরেই মানুষ দুইটি মেরীদের পাশ কাটাইয়া চলিয়া গেল। রমণীটির গড়ন ও চলন দেখিয়া মেরী বিমোহিত হইল। অমন সুন্দর চলন-ভঙ্গী, অমন মানানসই পোষাক পরিচ্ছদ, অমন স্কন্ধদেশ সে যেন আর জীবনে দেখে নাই।

মেরী হোটেলে ফিরিয়াই স্বামীকে লইয়া খাইবার টেবিলে বসিয়া পড়িল। স্থির হইতেই দেখিল সেই পুরুষটা তাহার ঠিক সম্মুখেই বসিয়া রহিয়াছে। মেরী যেন একটু বিব্রত হইয়া উঠিল। অন্যদিকে চোখ ফিরাইতেই দেখিল সেই মেয়েটি একটি বৃদ্ধ বাতগ্রস্ত পুরুষের সঙ্গে বসিয়া খাইতেছে। তবে সে খাওয়া একেবারে নাম মাত্র। ডিসের পর ডিস সে স্পর্শ করিয়াই ফেরত দিল। শুধু দুই একটা খেজুর চিবাইতে চিবাইতে হাতের চুড়ি কয়গাছি দ্বারা অলক্ষিতে মৃদু, সুমিষ্ট সঙ্গীত-স্রোত বহাইয়া দিল। মেরী অবাক হইয়া দেখিল, মেয়েটির হাতে বিয়ের আংটী রহিয়াছে। মেরীর মনে হইল—তবে কি ঐ বুড়োই ঐ মেয়েটির স্বামী! না, না; খুড়োই হবে, স্বামী হতে যাবে কেন! ঐ বুড়োর কাছে মেয়েটি যে একেবারে শিশু!

সেই পুরুষটি যখন মেয়েটির দিকে চাহিয়া একটু প্রসন্নতা দেখাইল মেয়েটি তখন একটু ফিক্ করিয়া হাসিয়া উঠিল। এ দৃশ্যটি মেরীর চোখে পড়ায় সে মেয়েটিকে মনে মনে দোষীই সাব্যস্ত করিল।

এমন সময় স্বামীর গায়ের শালখানি পড়িয়া যাওয়ায় মেরী উঠিয়া শালটা আবার ঠিক ঠাক করিয়া দিল। তাহাতে সন্তুষ্ট হইয়া ন্যাথানিয়েল ধন্যবাদ জানাইয়া প্রসন্নতাপূর্ণ মৃদু হাস্য করিল। মেরীর মনও আনন্দে নাচিয়া উঠিল। সে স্বামীর স্কন্ধে হাতখানি রাখিয়া তাহার মুখের উপর কোমল কটাক্ষ পাত করিল।

আর একদিন ভোজন শেষ হইলে সেই পুরুষটি উঠিয়া মেরীকে নমস্কার করিল। মেরী চুপ করিয়াই রহিল, প্রতি নমস্কার আর করিল না। ভদ্রলোকটি কোনদিকে দৃকপাত না করিয়া চলিয়া গেল। সেই মেয়েটি যে কোণটিতে আহার করিতেছিল সে দিকেও চাহিয়া দেখিল না। মেরী ভাবিল দুটীতে বোধ হয় ঝগড়া করেছে।

মেয়েটির দিকে মেরী চাহিয়া দেখিল সে দিব্যি পুরুষটির দিকে চাহিয়া আছে, আর তাহার ঠোঁটের কোণে হাসি লাগিয়া রহিয়াছে। তবে সে হাসি যেন বিদ্রূপ মাখান। তাই মেরী ঠিক করিল, মেয়েটি ও লোকটাকে একেবারেই গ্রাহ্য করে না। সেজন্য মেরী মেয়েটির উপর খুসীই হইল।

স্বামীর জন্য মেরী যখন নূতন একটা গরম শাল আনিতে উঠিল তখনও সেই পুরুষটির এসেন্স ও ফুলের গন্ধ বাতাসে লাগিয়াছিল। নিজের ঘরখানির নিকটে আসিয়া দেখিল সেই মেয়েটি পাশের ঘরটিতে প্রবেশ করিতেছে। "ও, তবে ত আমরা প্রতিবেশী!"—এই ভাবিয়া মেরী মনে মনে খুসীই হইল। আর একটু হইলেই সে তাহাকে নমস্কার করিয়া কথা বলিয়া ফেলিত।

ফিরিয়া আসিয়া স্বামীর গায় শালটা ভাল করিয়া জড়াইয়া দিয়া তাহারা দুইজনে আবার সমুদ্রের ধারে চলিয়া গেল।

সমুদ্রের স্বচ্ছ জলে পাহাড়ের প্রতিবিম্ব পড়িয়াছিল। সেদিকে চাহিতেই মেরীর মনে যেন কেমন একটা সুর বাজিয়া উঠিল। আর তাহার মন-পাখী অদূরবর্ত্তী আল্লস্ পর্ব্বত পার হইয়া তাহার বিধবা মাতার গৃহে গিয়া উপস্থিত হইল। আর মনে হইল সেই দিনের কথা যখন তাহারা তিন ভগ্নীতে মাতার স্বল্প আয়ের উপর নির্ভর করিয়া দিন কাটাইতেছিল। ন্যাথানিয়েল যে দিন তাহাদের গ্রামের ধর্ম্মযাজক হইয়া আসিল তাহার বক্তৃতার প্রশংসা সেই দিনই একে একে গ্রামময় ছড়াইয়া পড়িল। তারপর সে আসিয়া যেদিন তাহাদের বাড়ীর সকলের সহিত বন্ধুতা স্থাপন করিল সে দিনের কথাও মেরীর মনে একে একে মনে পড়িয়া গেল। বড়দিদি ও মেজদিদিকে ছাড়িয়া ন্যাথানিয়েল যে তাহাকেই ভালবাসিবে একথা সে মুহূর্ত্তের জন্যও ভাবে নাই। মা বোনের কথার উপর নির্ভর করিয়া সে যখন তাহার পত্নীত্ব স্বীকার করিল তখন তাহার মনে হইয়াছিল —"কেন ভালবাসতে পারব না? ভালবাসা কি তেমন একটা আয়াসের জিনিস?"

মেরী মনে করিল—"নিশ্চয়ই তার বিয়ে সফল হয়েছে। নিশ্চয়ই সে স্বামীকে ভালবেসেছে। আর ভালবাসবেই বা না কেন? ধর্ম্মের নামে পবিত্র বেদীর উপর সে প্রতিজ্ঞা করেছে ভালবাসবে। তার কি অন্যথা হ'তে পারে? এই যে স্বামীর অসুখটা চলে যাচ্ছে এতে যে সে নানা কষ্ট অসুবিধা অগ্রাহ্য করে তার স্বামীকে প্রাণপণে সেবা শুশ্রূষা করে আসছে, এতে কি তার ভালবাসা প্রকাশ পাচ্ছে না?"

তারপর মনে পড়িল তাহাদের দারিদ্র্যের কথা, ডাক্তারের কথা, আর সেই সঙ্গে সংসারের বিচিত্র গতির কথা। স্বামী যে সমুদ্রের হাওয়ার গুণে দিন দিন সারিয়া উঠিতেছে, সেজন্য মেরীর মনে একটু আনন্দ জাগিয়া উঠিল।

সূর্য্য তখন ডুবিয়া যাইতেছিল। হোটেলে ফিরিবার কথা মেরী স্বামীকে বলিতে যাইতেছিল, এমন সময় সে দেখিল সেই পুরুষটি অস্তোন্মুখ সূর্য্যের কনক আলোকে দাঁড়াইয়া আছে। মেরীর মনে বেশ একটু অশান্তি ও ভয় আসিয়া উপস্থিত হইল। "তবে কি আমি লোকটাকে ভালবেসেছি? না, কিছুতেই নয়। তবে লোকটাকে যে ভাল লেগেছে তা' ঠিক। আহা! লিজি দিদি যদি থাকতো তা হলে নিশ্চয়ই ঐ লোকটার চেহারা নিয়ে এতক্ষণ সে ঠাট্টা বিদ্রূপ জুড়ে দিত।" এই রকম অনেক কথাই মেরী ভাবিল।

এমন সময় মেরীর চোখে পড়িল সেই লোকটা তাহার দিকেই চাহিয়া রহিয়াছে। মেরীর ভয় হইল, পাছে সে আসিয়া তাহার সহিত কথা বলিয়া বসে। যাহাতে সে না আসে, সেইজন্য মেরী তাড়াতাড়ি বিরক্তিসূচক ভঙ্গী করিয়া তাহার রুগ্ন স্বামীর দিকে ঘুরিয়া ব'সল। আর মনে মনে ভাবিল, "লোকটা যদি কথাই বলে, তবে বড়ই অসুবিধায় পড়তে হবে দেখছি।"

হোটেলে ফিরিবার সময় মেরীর মনে হইতে লাগিল, "আচ্ছা, লোকটা যদি কথাই বোল্‌ত তবে আমি কি উত্তর দিতাম? যতটুকু ফরাসী জানি তাতে বোধ হয় জবাবটা মুখে বেধে যেত না।"

পরের দিন স্বামীর অসুখ বেশ একটু বাড়িয়া উঠিল। মেরীর আর ঘরের বাহির হইবার উপায় রহিল না। দিনের

দিন দিন সে রোগের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল। মৃত্যু-সঙ্গীতে ভরা একখানি পুস্তক ছিল, তাহার গানগুলি স্থাথানির্য্যেলের বড়ই ভাল লাগিত। স্বামীর অনুরোধ না রাখিলে নয় তাই সেগুলি প্রায় সকল সময়েই স্বামীকে পড়িয়া শুনাইতে হইত। ডাক্তার আসিয়া আশা দিলেও মেরীর মন কিছুতেই প্রবোধ মানিতেছিল না।

এত অশান্তিতেও মেরীর মন পাশের ঘরের ফরাসী মেয়েটি কি করিতেছে জানিবার জন্য উৎসুক হইয়া থাকিত। সেই মেয়েটির স্নান করিবার শব্দ, দাসীর সহিত পোষাক ইত্যাদি লইয়া বাদানুবাদ, তারপর ধীরে ধীরে চলিয়া যাওয়ার শব্দ—সকলই মেরী কাণ পাতিয়া শুনিত। দাসীটার সহিত চাকর বাকরের যে সব ছোট-খাট মিষ্টি প্রেমালাপ সুযোগমত হইত তাহাও মেরীর কান এড়াইতে পারিত না। সাড়ে পাঁচটার সময় মেয়েটি যখন স্কুলের মেয়ের মত দাসীর সহিত সমানে সমানে আলাপ জুড়িয়া দিত, তখন মেরী ভাবিত—ঐ ফরাসী মেয়েটি না-জানি কতই সুখী। রাত্রি দশটার সময় খুড়ার নিকট বিদায় লইয়া মেয়েটি যখন ঘরে ফিরিত, তখন মেরী বুঝিত দাসী আসিয়া তাহার কাপড় জামা খুলিয়া দিতেছে। দাসী চলিয়া গেলে মেয়েটি খুব ক্লান্ত ভাবে প্রার্থনা করিয়া শুইয়া পড়িত তাহা মেরী বুঝিতে পারিত। আর স্বামীর শয্যাপার্শ্বে বসিয়া মেরী মেয়েটির গভীর নিশ্বাসের শব্দ শুনিত। উহাই ছিল মেরীর একমাত্র সান্ত্বনাস্থল; কারণ ঐ নিশ্বাসের শব্দই তাহার মনে নবীন আশা ও শান্তি আনিয়া দিত।

এইরূপে কয়দিন কাটিয়া গেল। একদিন মেরী বুঝিল রাত্রির খাওয়া সারিয়া মেয়েটী ঘরে ঢুকিতেছে। দাসী আসিয়া যেন তখন তাহার হাতে একখানা চিঠি দিল। মেয়েটী বলিল, "কে দিয়েছে?" দাসী বলিল, "সেই। আমি হল দিয়া আসছিলাম। কিছুতেই ছাড়ল না। আমাকে পাঁচশ ফ্র্যাঙ্ক বথশিশ দিয়া নানা আজুহাত দেখাইয়া গছাইয়া দিল।"

ইহার পর উহারা দুইজনে খুব ধীরে ধীরে বলিতে লাগিল, আর মধ্যে মধ্যে মেয়েটি খিল খিল করিয়া হাসিতে লাগিল। মেরীর রক্ত গরম হইয়া উঠিল, ঘুম তাহার ছুটিয়া গেল—বুক তাহার কাঁপিয়া উঠিল। "চিঠিখানিতে কি-ই বা থাকবে? বোধ হয় মেয়েটিকে ভালবাসা জানিয়েছে। আর বোধ হয় তাকে বিয়ে করবার নিবেদনটি জানিয়েছে।" এইরূপ নানা কথাই মেরী বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল। কিন্তু এমন শুভ মুহূর্ত্তেও মেয়েটি কেন যে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেছে না অথচ দাসীর সহিত ফিস-ফিস করিয়া কথা কহিতেছে, এই সমস্যা মেরী কিছুতেই মীমাংসা করিতে পারিতেছিল না। এমন সময় দাসীর চলিয়া যাওয়ার শব্দ শুনা গেল। একটু পরেই মেরী শুনিল, মেয়েটি যেন খুব ধীরে অথচ প্রাণভরা হাসি ও আনন্দের সহিত কাহাকে যেন অভ্যর্থনা করিতেছে। মেরী বুঝিল সেই লোকটি আসিয়াছে। এখনই বিয়ের কথাটা পাকা হইয়া যাইবে—এই কথা ভাবিয়া মেরীর চোখ দুইটি আনন্দে ভিজিয়া উঠিল। আহা! সে যদি মেয়েটীর কাছে থাকিত, তবে তাহাকে বুকে করিয়া আশীর্ব্বাদ করিত, সে যেন আজীবন সুখে থাকে। "মেয়েটির কিন্তু ভগবানের নিকট প্রার্থনা করা উচিত ছিল। আচ্ছা, সে যদি না করে, তবে তার হয়ে আমিই প্রার্থনা কোরব।"—এইরূপ ভাবিয়া মেরী হাত জোড় করিয়া প্রার্থনায় বসিতে যাইতেছিল, এমন সময় পশ্চাৎ হইতে ভাঙ্গা গলায় স্বামী বলিল—"মেরী, আমাকে একটা মৃত্যু-সঙ্গীত শোনাও দেখি।"

মেরীর সমস্ত শরীর কাঁপিয়া উঠিল। এতদিন সে একবারের জন্যও ঐ রকম গান পড়িতে ইতস্ততঃ করে নাই। কিন্তু আজ সে এক লাফে উঠিয়া স্বামীর বিছানায় উবুড় হইয়া পড়িয়া স্বামীর রুগ্ন হাতখানি দুই হাতে চাপিয়া ধরিয়া মিনতি করিয়া কহিল, "দয়া কর একবার, আজ আমাকে একবার রেহাই দাও। আমি কিছুতেই পারব না, আজ আমি কিছুতেই পারব না।"

তিন দিন চলিয়া গেল। রোগী দিন দিন আরোগ্য লাভ করিতে লাগিল। তবুও মেরীকে দিন রাত্রি ঘরেই আটক রহিতে হইল। পাশের ঘরের মেয়েটির হাসি ও সঙ্গীত বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। মেরী ভাবিল—"মেয়েটির কাকা বোধ হয় বিয়েতে মত দেয় নাই। বোধ হয় তাদের দুটিতে দেখা শুনা করা পর্য্যন্ত বন্ধ হইয়া গেছে। হয়ত

ভদ্রলোকটি অন্য কোথাও চলে গিয়ে থাকবেন।" মেরী আরও ভাবিল—"লোকটার কি কালো চোখ! কে জানে লোকটা ভালমানুষ কি না? যাই হোক না কেন, তারা ছটিতে যেন সুখে থাকে। তার নিজের জীবনের মত যেন তাদের না হয়।"

সেদিন জানুয়ারী মাসের শেষ রবিবার। ন্যাথানিয়েল বিছানায় পড়িয়া অতি কষ্টে নিশ্বাস ছাড়িতেছিল। জ্বর বেশী ছিল না, তবুও তাহাকে বড়ই কাহিল দেখাইতেছিল।

মেরী আলোর লাল ঢাকনীটা ভাল করিয়া আঁটিয়া দিয়া নিজের বিছানার কাছে বসিল। রাত্রি তখন বেশ হইয়াছিল। একে একে সকলে যার যার ঘরে গিয়া দরজা বন্ধ করিতেছিল। পাশের ঘরের মেয়েটি আসিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিল তাহা মেরী স্পষ্টই শুনিল। কিন্তু তারপর সে ঘর হইতে আর কোনও শব্দ আসিল না! যদিও তাহার নিশ্বাসের শব্দ শুনা যাইতে ছিল না, তবুও মেরী ভাবিল মেয়েটি নিশ্চয়ই ঘুমাইতেছে। মেরীও খুব ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল, তাহার পক্ষে ঘুমের তখন নিতান্ত প্রয়োজন ছিল, কিন্তু চোখে তাহার একেবারেই ঘুম আসিতেছিল না। সমস্ত শরীরে তাহার যেন কেমন একটা উত্তেজনা জাগিয়া উঠিয়াছিল।

এমন সময় স্বামী তাহাকে বালিশটা ঠিক করিয়া দিতে বলিল। মেরী বালিশটা ঠিক-ঠাক করিয়া দাঁড়াইতেই ন্যাথানিয়েল কহিল, "আজকার রাত্রিটায় দেখছি যন্ত্রণার সীমা থাকবে না।"

মেরী একটু পানীয় দিতে চাহিল। ন্যাথানিয়েল মাথা নাড়িয়া অস্বীকার করিল। কিন্তু একটু পরেই আবার কহিল, "বারেন্দার কবাটটা একবার খুলে দাও না।"

মেরী অস্বীকার করিয়া কহিল, "রাত্রের হাওয়া আর ঠাণ্ডা লাগলে অপকার করবে।" ন্যাথানিয়েল বিরক্ত হইয়া কহিল, "আমার এই যন্ত্রণার সময় এই সামান্য অনুগ্রহটুকু তুমি করতে পারবে না?"

"ক্ষমা কর, তোমার ভালর জন্যই আমি খুলে দিচ্ছিলুম না।" এই বলিয়া মেরী দরজাটা খুলিয়া দিল। ঠাণ্ডা বাতাসে মেরীর ক্লান্তি অনেকটা কমিয়া গেল। পশ্চাৎ ফিরিয়া স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিল, "হাওয়াটা ভাল লাগছে কি না?" স্বামী কহিল, "বেশ ভালই লাগছে।" মেরী তখন দরজা পার হইয়া বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল। তখন চতুর্দ্দিক জ্যোৎস্নায় ভরা ছিল।

মুহূর্ত্তকাল বাহিরে থাকিয়াই কি দেখিয়া যেন মেরী পিছু হটিয়া আসিল। পাশের ঘরের বারান্দায় শাদা লেসের জামা পরা একটি মেয়ে যেন চাঁদের আলোকে কি দেখিতেছিল। মেরী বুঝিল ভূত নয়, সেই পাশের ঘরের ফরাসী মেয়েটি। মেরীর মনে কৌতূহল জাগিয়া উঠায় ধীরে ধীরে সে আবার বারেন্দায় আসিয়া দাঁড়াইল। দেখিল সেই ফরাসী মেয়েটির পাতলা কোমল সুন্দর মুখখানির উপর জ্যোৎস্না পড়িয়া অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিয়া তুলিয়াছে। মেয়েটির অভ্যন্তর হইতে কিসের যেন একটা জ্যোতিঃ বাহির হইয়া মুখখানিকে আরও উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছে, চোখের মধ্যে কিসের যেন একটা ব্যগ্রতা মাখান আছে। বেশ একটু সঙ্কোচ ভরা আনন্দে যেন তাহার ঠোঁট দুখানি গোলাপের পাপড়ির মত ধীরে ধীরে কাঁপিতেছে। আর যে হাত দুইখানি দিয়া রেলিংটা সে শক্ত করিয়া ধরিয়াছে, সে দুইটি যেন আকাঙ্খা ও ভয়ে দুলিতেছে।

মেরীর বুকের ঘড়ী জোরে জোরে আওয়াজ করিতে লাগিল, আর মুখখানি রাঙ্গা হইয়া উঠিল। এমন দৃষ্টি আর হাসি জীবনে সে কখনও দেখে নাই। তবুও তার মনে হইল "ওগুলি যেন তার খুবই পরিচিত। আর মেয়েমানুষের ও অমন ভাবেই চাওয়া উচিত, অবশ্য যে নাকি—"

মেরীর চিন্তাস্রোতে বাধা পড়িল। তাহার স্বামী ভয়ানক জোরে কাসিয়া উঠিল, তাই মেরী আর তাহার ভাবনাটা শেষ করিতে পারিল না। স্বামী দরজা জানালা বন্ধ করিবার জন্য হাত দিয়া ইঙ্গিত করায় মেরী তাড়াতাড়ি সে সব বন্ধ করিয়া স্বামীর মাথাটা একটু উঠাইয়া ধরিল। কাসি বন্ধ হইল বটে, কিন্তু রোগী অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িল। মেরী স্বামীর আঙ্গুলগুলি নাড়িতেছিল বটে, কিন্তু তাহার মন ছিল সেই ফরাসী মেয়েটির নিকট। বিবাহিত জীবনে সে যে সুখ পায় নাই, আর সুখের পরিবর্ত্তে সে যে

বরাবর দুঃখ আর অসুবিধাই পাইয়া আসিয়াছে, সেই সব তখন মেরীর মনে অলক্ষিতে জাগিয়া উঠিল।

এমন সময় রোগী কহিল, "মেরী, তোমার খুব সহিষ্ণুতা বলতে হবে। আমার মত রোগী মানুষের সঙ্গে তুমি বরাবরই সদয় ব্যবহার করে আসছ।"

মেরী ফিস্ ফিস্ করিয়া বাধা দিয়া কহিল, "ছি! অমন কথা বলতে নাই।" কিন্তু ন্যাথানিয়েল সে আপত্তি অগ্রাহ্য করিয়া আরও জোরের সহিত কহিল, "তুমি যেমন দৃঢ়তার সহিত তোমার কথা ভগবানের নিকট বলতে পারবে আমিও যেন তেমনই বলিতে পারি প্রভু! তুমি আমার জন্য যে কর্ত্তব্য নির্দ্দিষ্ট করে দিয়েছিলে তা আমি পালন করেছি।"

কর্ত্তব্যের কথা শুনিয়া মেরীর হাত কাঁপিয়া উঠিল—কেমন একটা ঘৃণার ভাব মনের মধ্যে জাগিয়া উঠিল। মনে হইল স্বামীর কথার মধ্যে যেন কোন তিরস্কার লুকান আছে। আবার মনে হইল ন্যাথানিয়েল বোধ হয় কর্ত্তব্য ছাড়া আর কিছুই জানে না। সে বোধ হয় তাহার নিকট তার বেশী কিছুই প্রত্যাশা করে না। আর কর্ত্তব্যের অতিরিক্ত যা কিছু তা বুঝি তার নিকট পাপ। কিন্তু মেরীর মনে আজ নূতন স্বপ্ন জাগিয়া উঠিয়াছিল। কর্ত্তব্যের দ্বারা আজ তার সন্তুষ্টি হইতেছিল না। সে বুঝিয়াছিল কর্ত্তব্যের অতিরিক্ত আরও কিছু আছে। মেরীর সমস্ত শরীরে তখন বিদ্যুৎ খেলিয়া যাইতেছিল। তাহার মন কিসের আকাঙ্খায় যেন শিহরিয়া উঠিতেছিল।

অনেকক্ষণ ধরিয়া আপন-হারা ভাবে মেরী ঐসব কথাই ভাবিয়া গেল। সহসা নিশ্বাস প্রশ্বাসের বিকট শব্দ শুনিয়া সে চেতনা লাভ করিয়া তাড়াতাড়ি সঙ্কুচিত ভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "কেন, তুমি কি খারাপ বোধ করছ?" স্বামী কহিল, "হাঁ, আমার একটু ভয় করছে। তুমি যদি পড়তে সেই—।" আর বলিতে পারিল না। মেরীর হাত কাঁপিতেছে দেখিয়া সে একটু থামিয়া কহিল, "দেখ, তোমার যদি ইচ্ছা না হয় তবে—।" মেরী তাহার মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া কহিল, "না, আমার বেশ ইচ্ছা হচ্ছে। তোমার যাতে ভাল লাগবে তা আমি করবই করব।"

তাড়াতাড়ি টেবিলের নিকট আসিয়া ঔষধের শিশি কয়টা এক পার্শ্বে রাখিয়া মেরী পড়া আরম্ভ করিয়া দিল। কিন্তু কি যে সে পড়িতেছে সেদিকে তার লক্ষ্যই ছিল না। তাই স্বামী যখন কহিল, "থাক, আর পড়তে হবে না।" তখন মেরী দেখিল সে একটা বৃষ্টির গান পড়িতেছিল। তাই সে লজ্জিত হইয়া বইখানির পাতা খুব ধীরে ধীরে উল্টাইতে লাগিল। কিন্তু কান দুইটি তখনও পাশের ঘরের দিকে উন্মুখ হইয়াছিল। মেরী শুনিল, দরজা বন্ধ করার একটা মৃদু শব্দ হইল। অমনই তাহার মনে ঘোরতর সন্দেহ হইল আর সঙ্গে সঙ্গে লজ্জার আরুণিমা তাহার মুখখানিতে ঝলকাইয়া উঠিল। তারপর ধীরে ধীরে শঙ্কাবিজড়িত আনন্দময় অর্দ্ধ উচ্চারিত গুঞ্জনধ্বনি যখন মেরীর কানে পৌঁছিতে লাগিল তখন তাহার হাত হইতে অলক্ষিতে বইখানি পড়িয়া গেল। কেমন একটা উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টিতে সে দরজার দিকে তাকাইয়া রহিল।

আজ সে বুঝিল জিনিষটা মিথ্যা নয়। যারা ভদ্র, যারা সমাজে গণ্যমান্য, যারা আশৈশব খৃষ্টীয় ধর্ম্ম ও জনসমাজের ছায়ায় লালিত পালিত ও বর্দ্ধিত তাহাদের মধ্যে ও জিনিষটা আছে। এমন একটা শক্তি তাহা হইলে নিশ্চয়ই আছে যার জন্য মানুষ তার গৌরব করিবার যাহা কিছু তাহা সমস্তই সে বিসর্জ্জন দিতে পারে।

মেরীর মন আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিল। একবার চেঁচাইয়া কাঁদিতে ইচ্ছা হইল। কি লজ্জা! ন্যাথানিয়েল যদি শোনে এই সব। ন্যাথানিয়েল ছাদের দিকে চাহিয়া আছে দেখিয়া মেরী বুঝিল অত মৃদু গুঞ্জন শুনিবার শক্তি তাহার নাই। তবুও মেরীর মনে হইল সে একবার জোর গলায় তার সঙ্গে কথা বলে আর খানিকটা হাসে আর গান গায়।

মেরী স্বামীর কাছে আসিয়া কহিল, "তুমি কি এখন ঘুমুবে?" চোখের পাতা নামাইয়া ন্যাথানিয়েল জানাইল, সে ঘুমাইবে। আবার পরক্ষণেই কহিল—"পড় একটু।"

"আস্তে আস্তে পড়ব কি?"

"হাঁ, তাই পড়।"

তবুও মেরী পড়িতে পারিল না। তার সে শক্তি যেন চলিয়া গিয়াছিল। তখন স্বামী কহিল, ঘুমিও না, একটু পড় একবার।"

"না, ঘুমুচ্ছি না" বলিয়া মেরী বইয়ের পাতা উল্টাইতে লাগিল, কিন্তু কিছুই সে পড়িতে পারিল না। তখন ন্যাথানিয়েল কহিল, "থাক, আর পড়তে হবে না।"

মেরী কিন্তু বই ছাড়িয়া উঠিল না। পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে সে আপন মনে বলিতে লাগিল—"পড়তে হবে, সেই মরণ-গীতটাই পড়তে হবে। দূর ছাই, কোথায় গেল সে গীতটা? এ যে দেখতেই পাচ্ছি না।"

এমন সময় গুঞ্জনধ্বনির স্পষ্ট আওয়াজ পাশের ঘর হইতে মেরীর কানে আসিয়া পৌছিল। লজ্জার ভারে তাহার চক্ষু দুইটি বুজিয়া গেল। তাহার মনে হইল ওদের মত সেও বুঝি লজ্জা সরম জলাঞ্জলি দিয়া বসিয়াছে। মেরী ভাবিল—"প্রেম, যার জন্য মানুষ পাগল হয়—যার জন্য সে মরিতে পারে, তবে ত গাঁজাখুরী কবির কল্পনা নয়—এযে রক্ত মাংসের জিনিসের মত বেজায় সত্যি।" মেরীর আবও মনে পড়িল তার সেই বিয়ের দিনের কথা "ন্যাথানিয়েলের সঙ্গে তার তখনও ভাল পরিচয় হয় নাই। সে যখন বিয়ের আয়োজন সব ঠিক করিয়া চলিয়া গেল, মেরী তার মাতার হাঁটু ধরিয়া বসিয়া একেবারে শিশুর মত কাঁদিয়া ফেলিল। বিয়ের পর সন্ধ্যার সময়, মা তাহাকে বলিল, "ভগবানের নাম নিয়ে সব সহ্য করিস—মেয়েমানুষের অদৃষ্টে তা ছাড়া আর কিছুই নাই।"

এতদিন সে ইহাকেই প্রেম বলিয়া জানিয়া আসিয়াছিল। কিন্তু আজ ঐ প্রণয়ী যুগল তাহার চোখের বাঁধন খুলিয়া দিয়াছে। এমন সময় স্বামী ডাকিল—"মেরী!"

মেরী চমকিয়া কহিল—"কি?"

"তুমি কি পড়বে না?"

"কেন পড়ব না, নিশ্চয়ই পড়ব।"

মেরী বই লইয়া বসিতেই দেখিল বইটাতে কেমন একটা বিশ্রী পচা গন্ধ লাগিয়া রহিয়াছে। এতদিন গন্ধটা তার নাকে লাগে নাই, কি আশ্চর্য্য!

একটু খুঁজিতেই সেই মরণ-গীতটা পাইয়া বসিল। মেরী একটানা পড়িয়া চলিল। কিন্তু মনে প্রাণে সে আর এক গীত গাহিয়া যাইতেছিল। সে মনে মনে বলিতেছিল—"প্রভু, দয়াল, হে করুণাময়! ক্ষমা কর ঐ দুইটি প্রণয়ীকে। ওদের প্রেমের উপর তোমার শুভ আশীর্ব্বাদ বর্ষণ কর, প্রভু! ওরা তোমার আশীর্ব্বাদ চাচ্ছে না, সেজন্য তুমি ওদের প্রতি বিমুখ হয়ো না, প্রভু! তুমি যে আনন্দ আজ ওদিকে মাতিয়ে তুলেছ, প্রভু! আজীবন যেন ওরা সেজন্য কৃতজ্ঞ থাকে। ওরা যেন সারাজীবন আন্তরিক বন্ধুত্বে ও বিশ্বাসে কাটাইয়া দেয়, প্রভু।"

মেরীর চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িতেছিল। মাথা নীচু করিয়া চোখ ঢাকিয়া সে মরণ-গীতটা পড়িয়া চলিল।

আজ মেরী বুঝিল সূর্য্য ঠাকুর সাগরের কানে কানে কোন্ ভাষায় কথা কয়, গাছের ফুল কোন্ স্বপ্নে ফুটিয়া উঠে, পাখীর গানে আর নরনারীর কলহাস্যে কোন্ মধু লুক্কায়িত থাকে।

তখন মনে পড়িয়া গেল তার নিজের কথা। পবিত্র বেদীর উপর ধর্ম্মযাজকের সম্মুখে সে প্রতিজ্ঞা করিয়াছে স্বামীকে ভালবাসিবে। সে ত ভালবাসে নাই। তবে ত স্বামীকে সে ভয়ানক ভাবে প্রতারিত করিয়াছে। না জানি তাহার কত অপূর্ব্ব বাসনা রহিয়া গিয়াছে!

মেরীর হৃদয় দ্বার খুলিয়া গেল। সে মুক্ত হস্তে তার সমস্ত মন প্রাণ আজ স্বামীকে উপহার দিবে। একটুও কার্পণ্য করিবে না। তার যা কিছু অভাব তা সে আজ শত সহস্র গুণে ভরিয়া দিবে। কিন্তু এত ভালবাসা সে কি চাহিবে? সে কি তাহা বুঝিবে? সে কি এত প্রেমের যোগ্য? "কি আসে যায় তাতে? যোগ্য হোক্, অযোগ্য হোক্, চাউক বা না চাউক, বুঝুক বা না বুঝুক, আমি তাকে প্রাণ খুলে ভালবাসব, আমার তরফ থেকে সে যেন কোন অভাবের অনুযোগ না দিতে পারে এমন ভাবে ভালবাসব।"—এইরূপ ভাবিয়া মেরী তাড়াতাড়ি উঠিয়া আসিয়া স্বামীর পার্শ্বটুক অধিকার করিয়া স্বামীকে বুকের কাছে বেষ্টন করিয়া তাহার শীর্ণ হাত দুইটি চুম্বন করিল, আর মনে মনে কহিল—"তুমিই আমার আনন্দ, তুমিই আমার জীবন-দেবতা—তুমিই আমার আশা ভরসা।" আনন্দে মেরীর চোখ দিয়া অশ্রু গড়াইতে লাগিল।

বড়ই শান্তিতে ন্যাথানিয়েল শুইয়াছিল। মেরীর দিকে সে একবার চাহিয়াও দেখিতেছিল না। মেরী বড়ই

শঙ্কিত হইয়া কপালে বুকে নাকে মুখে হাত বুলাইয়া দেখিল সব শেষ হইয়া গিয়াছে! সুখের প্রদীপ তার এ জন্মের মত নিবিয়া গিয়াছে!

মেরী চীৎকার করিয়া উঠিল, আর সঙ্গে সঙ্গে হইয়া পড়িল। *

Hermann Suderman হইতে।

আমাদের খাদ্য।

[শ্রীসুরেশচন্দ্র মিত্র, এল, এম, এস]

সুপ্রসিদ্ধ জার্ম্মান ডাক্তার Vinchow আবিষ্কার করিয়াছেন যে, আমাদের দেহ কতকগুলি কোষ (Cell) সমষ্টি দ্বারা নির্ম্মিত। এই কোষ নানাশ্রেণীর ও নানা আকারের। এই কোষ হইতেই অস্থি, মাংস, মেদ, রক্ত ও রস প্রভৃতির সৃষ্টি। ইহাদের বিবৃদ্ধিতে দেহের গঠন এবং হ্রাসে দৈহিক ক্ষয় হইতে থাকে।

দেহের এই গঠন, বৃদ্ধি ও ক্ষয় পূরণাদি কার্য্যের জন্য আমাদের আহারের আবশ্যক। আমরা যে সকল সামগ্রী আহার করি সেগুলিকে মোটামুটি ৫ ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে; যথা—

১। আমিষ জাতীয় (Protied)
২। শালী জাতীয় (Carbohydrates)
৩। স্নেহ জাতীয় (Fats and oil)
৪। লবণ জাতীয় (Salts)
৫। জল (Water)

মৎস্য, মাংস, ডিম্ব প্রভৃতি আমিষ জাতীয় খাদ্য এবং চিনি, ভাত, আলু, ময়দা, গম—ইহারা শালী জাতীয় খাদ্য মধ্যে গণনীয়। ঘৃত, তৈল, মাখন প্রভৃতি তৈলময় পদার্থগুলি স্নেহ জাতীয় খাদ্যশ্রেণীর অন্তর্গত এবং যে সকল ফল বা তরকারিতে লৌহ, সোডা, পটাস্, চুণ প্রভৃতির অংশ বর্ত্তমান আছে সেইগুলিকেই লবণ জাতীয় খাদ্য বলা যায়।

আমিষ জাতীয় খাদ্যের গুণ :—

(ক) শরীর গঠনের উপাদান প্রস্তুত করা ও দেহের ক্ষয় পূরণ করা।

(খ) শরীরস্থ দহন ক্রিয়া নিয়মিত করা।

শালী জাতীয় খাদ্যের গুণ :—

(ক) দেহে উত্তাপ ও তেজ (Energy) উৎপাদন করিয়া কার্য্য করিবার শক্তি আনয়ন করা।

(খ) চর্ব্বি প্রস্তুত করা।

স্নেহ জাতীয় খাদ্যের গুণ :—

শালী জাতীয় খাদ্যের ন্যায়।

লবণ জাতীয় খাদ্যের গুণ :—

রক্তের উপাদান প্রস্তুত ও হজমের সহায়তা করা।

জল—সমস্ত আহার্য্য দ্রব্যকে তরল ও কোমল করিয়া পরিপাকের উপযোগী করিয়া দেয়।

আমরা বাঙ্গালী, ভাতই আমাদের প্রধান খাদ্য। এই ভাত শালী জাতীয় খাদ্যের অন্তর্গত। এক সময়ে Licbig, Chittenden ও Cart-Voit প্রভৃতি পণ্ডিতগণ মত প্রকাশ করেন যে, আহারীয় দ্রব্যের মধ্যে আমিষ জাতীয় খাদ্যই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। কলিকাতা মেডিকেল কলেজের অধ্যাপক Mc-Cay সাহেবও ঐ মত অনুমোদন করিয়া বলিয়াছিলেন যে, বাঙ্গালীর খাদ্যে আমিষ উপাদান অল্প মাত্রায় থাকায় বাঙ্গালী এত দুর্ব্বল।

বিখ্যাত জাপানী অধ্যাপক Kintaro Oshima বহু পরীক্ষা দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে, আমিষ জাতীয় উপাদান খাদ্যে অল্প পরিমাণ থাকায় দৈহিক বল কম হয় না; দুর্ব্বলতার অন্য কারণ থাকিতে পারে।

তিনি বলেন, "ভেতো" জাপানীরা নিত্য যে খাদ্য গ্রহণ করে, তাহাতে আমিষ পদার্থ অতি অল্পই থাকে। অথচ এই জাতি পৃথিবীর অন্যান্য বলশালী জাতি অপেক্ষা বল বীর্য্যে ও বুদ্ধিতে কোন অংশে কম নহে।

সম্প্রতি Funk, Eykman, Grijno, Emmet

প্রভৃতি শরীরতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ অনেক গবেষণার পর সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে,আমাদের অধিকাংশ খাদ্য সামগ্রীতে এক প্রকার অতি সূক্ষ্ম পদার্থ আছে। উহা ভাইটামিন্ (Vitamine) নামে অভিহিত। তাঁহারা বলেন—

"Even if all the food principles—protines, fats, carbohydrates and minerals—are present in proper amounts and proportions and the organs engaged in metabolism are normally active, health is not maintained unless vitamines are present."

অর্থাৎ ভুক্ত বস্তুতে যদি আবশ্যক পরিমাণ ভাইটামিন না থাকে তবে পর্য্যাপ্ত খাদ্য পাইলেও এবং পরিপাক যন্ত্র রীতিমত ক্ষমতাশালী থাকিলেও দেহ সুস্থ থাকিতে পারে না। দেহ সুস্থ ও সবল রাখিতে হইলে খাদ্যে উপযুক্ত পরিমাণ ভাইটামিন থাকা নিতান্ত আবশ্যক। ভুক্তদ্রব্য এই ভাইটামিন সহযোগে পরিপাক প্রাপ্ত হইয়া দেহীর স্বাস্থ্য সংবর্দ্ধন করে। ইহারি অভাবে "রিকেট," "স্কার্ভি," "বেরিবেরি" প্রভৃতি নানা রোগ আসিয়া উপস্থিত হয়। এই কারণে ঐ রোগ গুলিকে "অভাবজনিত" রোগ (deficiency disease) বলে।

ভাইটামিন শস্য ও ফলমূলাদিতেই অধিক থাকে এবং উহা বহিরাবরণের নিম্নস্তরেই থাকে। সে কারণ অতি পেষণে বা অতি উত্তাপে উহা নষ্ট হইয়া যায়। ফলমূলের খোসা পুরু করিয়া বাদ দিলেও ভাইটামিন নষ্ট হইয়া যায়।

নিম্নলিখিত খাদ্যে ভাইটামিন পাওয়া যায়,—

চাউল (আছাটা) ভাত, খৈ, চিঁড়ে।

আটা, ছাতু।

মৎস্য ও ডিম্বের পীত অংশ।

দুগ্ধ, ঘৃত, মাখন, ছানা ও দধি।

গুড়, লালচিনি, লালমিছরী ও মধু।

শাক, কলমী, পালম, পুঁই, বাঁধাকপি প্রভৃতি।

তরকারি—আলু, পটল, ঝিঙ্গে, মোচা, কলা প্রভৃতি।

মূল—মূলা, শাঁক আলু, রাঙ্গাআলু, কচু, বিট প্রভৃতি।

ফল—নারিকেল, আম, আতা, পেঁপে, আঙ্গুর প্রভৃতি।

ডাইল—অঙ্কুরিত মটর (germinated pulse) ঝুট বিউলি।

অম্বল—তেঁতুল, কুলচুর, নেবু।

তৈল—সর্ষপ তৈল, কডলিভার অয়েল।

খাদ্য সামগ্রী—Pastuerise, sterilize ও বহুকাল ধরিয়া গুদামজাত করিয়া রাখিলে ঐ সকল দ্রব্যের ভাইটামিন নষ্ট হইয়া যায়।

আমাদের শরীরে বিধিদত্ত এক ব্যাধি প্রতিষেধক শক্তি আছে। আমাদের ঐ শক্তি দিন দিন হ্রাস হইতেছে। দরিদ্রতাই উহার বিশিষ্ট কারণ বলিয়া পণ্ডিতগণ নির্দ্দেশ করেন। অর্থাভাবে আমরা উপযুক্ত ও পর্য্যাপ্ত খাদ্য পাই না। এখন দেশে কোন একটি প্রবল সংক্রামক ব্যাধি (যথা প্লেগ, বেরিবেরি, ইনফ্লুয়েঞ্জা, ডেঙ্গু ইত্যাদি) আসিয়া উপস্থিত হইলে, সে রোগ বদ্ধমূল হইয়া থাকে। Epidemic আকার হইতে ক্রমে Endemic হইতে দেখা যায়। ইহার কারণ খাদ্য দোষে আমাদের দেহ ক্রমে ক্রমে রোগপ্রবণ হইয়া পড়িতেছে। যে সামান্য ভোজ্য সামগ্রী এখন আমরা সংগ্রহ করিতে পারি, সভ্যতার খাতিরে সে গুলিকে সুদৃশ্য সুস্বাদু ও সুপাচ্য করিতে যাইয়া স্বাস্থ্যরক্ষার পক্ষে অত্যাবশ্যক সামগ্রী ভাইটামিন পদার্থটাকে নষ্ট করিয়া ফেলিতেছি। এবং সেই ভাইটামিন শূন্য অসার খাদ্য ভক্ষণ করিয়া দেহটাকে ক্রমশঃ রোগপ্রবণ করিয়া তুলিতেছি। ছাটা সাদা চাউল (milled polish rice) মুড়ি, রিফাইন চিনি ও মিছরি, ময়দা, ঘন দুধ, ভাজা মাছ এবং পুরু করিয়া খোসা ছাড়ান ফল ও তরকারিতে মোটেই ভাইটামিন থাকে না। অথচ সেই খাদ্যগুলিই আমরা অধিক পছন্দ করি এবং আগ্রহ সহকারে আহার করিয়া থাকি।

তৈলে যথেষ্ট ভাইটামিন আছে। ইহা রিকেট প্রতিষেধক। তৈল মাখিলে বিশেষ উপকার (মর্দ্দনাৎ ন চ ভক্ষণাৎ) হয়। সে কারণ আঁতুড়ে ছেলেকে তৈল মাখাইয়া রৌদ্রে রাখার প্রথা আমাদের দেশে প্রাচীনকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। এই প্রথা বিজ্ঞানসম্মত।

Burney Yes বলিতেছেন—

"Free exposure to the Vivifying influence

of sun-light and fresh air is one of the best blood retoratives."

আছাটা চাউলের পোরের ভাতে যথেষ্ট পরিমাণে ভাইটামিন থাকে। ঐ ভাতের ফেনও বাদ দিতে হয় না; সুতরাং উহাতে প্রোটীডাংশও সমস্ত থাকিয়া যায়। সে কারণ ঐরূপ ভাত বিশেষ উপাদেয় ও স্বাস্থ্যের পক্ষে হিতকর।

টাটকা কাঁচা দুগ্ধেও প্রচুর ভাইটামিন থাকে। সুতরাং ঐ দুগ্ধ বিশেষ বলকারক। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে ধারোষ্ণ দুগ্ধের গুণ এইরূপ লিখিত আছে :—

"ধারোষ্ণ দুগ্ধমমৃত তুল্যম"

বাঙ্গালীর খাদ্যে আমিষ উপকরণ অল্প থাকিলেও অধুনা শরীরতত্ত্ববিদ পণ্ডিতগণের মতে নিরামিষভোজী (vegetarian) দিগের আহারে যথেষ্ট ভাইটামিন আছে। ঐ ভাইটামিনই এখন আহার্য্য দ্রব্যের মধ্যে অত্যাবশ্যক পদার্থ বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে। তবে আমাদের খাইবার পদ্ধতির দোষে ভাইটামিন বাদ দিয়া খাইলে শরীর স্বতঃই দুর্ব্বল হইয়া রোগগ্রস্ত হইবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

নবযুগের সত্য

[শ্রীসাহাজী]

সংকীর্ত্তনে অষ্টপ্রহর নাচিয়া গাইয়া বাজাইয়া খোল ভাঙ্গিবার লোকের অভাব গ্রামে নাই, কিন্তু দিনে এক ঘণ্টা করিয়া চরকায় সুতা কাটিয়া দুই পয়সা উপার্জ্জন করিবার লোক মেলে অল্পই—বড় দুঃখেই আমাদের মুখ দিয়া একদিন এই কথা বাহির হইয়া পড়িয়াছিল। আমাদের এই কথায় এক 'বাবাজী' কিন্তু সেদিন ক্রুদ্ধ হইয়া বলিয়াছিলেন, তাহা হইলে কি তোমরা বলিতে চাও, শ্রীচৈতন্যদেবের অনুসরণ করিলে এ যুগের মানবের সিদ্ধিলাভ হইবে না?—ফলতঃ কাহারও সাধ্য কি, তাহা জানিতে না পারিলে, এই প্রকার প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সম্ভবপর হয় না।

এক্ষণে দেখা যাউক, কি উদ্দেশ্যে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সে যুগে সংকীর্ত্তন সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন।

বৌদ্ধ ধর্ম্মের পতনের পর হইতে চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সময়কে শাঙ্কর যুগ বলা যায়, এবং আমাদের এই বর্ত্তমান যুগকে চৈতন্যের যুগ বলিলে অসঙ্গত হয় না।

শাঙ্করবাদ প্রচারিত হইবার ফলে, ভারতীয় সমাজে ব্যষ্টিপ্রাধান্য তখন অত্যন্ত প্রবল হইয়া পড়িয়াছিল। শঙ্করের ধর্ম্মও ছিল ব্যষ্টির ধর্ম্ম। কি রাষ্ট্রীয়, কি সামাজিক, কি দাম্পত্য— মানবের সর্ব্বপ্রকার মিলনই স্বার্থঘটিত এবং যেখানে স্বার্থ, সেইখানেই অনর্থ। শঙ্কর তাই মিলনের আদৌ পক্ষপাতী ছিলেন না। নিঃসঙ্গ সন্ন্যাসীর জীবনই ছিল, তাঁহার মতে, তাই আদর্শ জীবন। তাঁহার প্রচারের ফলে লোকে তখন সংসারী হইয়া সমাজে বাস করা অপেক্ষা সন্ন্যাসী হইয়া কাননে-কন্দরে অবস্থান করাই সৌভাগ্যের বিষয় বলিয়া মনে করিত। মানবের এইপ্রকার মনোভাব হেতু সমাজ ধর্ম্মের সে সময়ে ব্যত্যয় ঘটিয়াছিল, বিবিধ সামাজিক বিশৃঙ্খলার উৎপত্তি হইয়াছিল। ইহারই প্রতীকার করিবার জন্য শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর তখন মিলনের ধর্ম্ম প্রচারিত করিবার প্রয়োজন হইয়াছিল। সংকীর্ত্তন করিতে হইলে সকলে মিলিত হইতে হয়। সুতরাং মিলিত হওয়া সংকীর্ত্তন সম্প্রদায়ের অন্যতম সার্থকতা।

দ্বিতীয়তঃ, ভগবানকে পাইতে হইলে কৃচ্ছ্র সাধন করিতে হয়, ইহাই ছিল সে যুগের লোকের বিশ্বাস। ধর্ম্ম বলিতে লোকে তখন বুঝিত পূজা অর্চ্চনা, ব্রত হোম, যজ্ঞ তপস্যা, কুম্ভক প্রাণায়াম ইত্যাদির অনুষ্ঠান। কিন্তু কলির জীব অন্নগত প্রাণ। কৃচ্ছ্র সাধন করিতে অসমর্থ সে। তাই তাহার জন্য সহজ সাধনা "হরের্নামৈব কেবলম্।" সংকীর্ত্তন একাধারে সাধনা এবং উপাসনা—"মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ।" সর্ব্বোপরি উহা আনন্দেরই

সাধনা। এই প্রকারে শ্রীচৈতন্যদেব ধর্ম্মের সহিত আনন্দের অভূতপূর্ব্ব সমন্বয় সাধন করিয়াছিলেন। "প্রকৃতি আমাদের জীবন দেয়, সমাজ আমাদের আনন্দ দেয়।" সমাজের অর্থ, মিলিত হইয়া বাস করা। এই হিসাবে যে মিলন যত আনন্দের, সে মিলন তত সার্থক। শাঙ্কর যুগে ধর্ম্ম যখন ছিল non communial, শুষ্ক জ্ঞানচর্চ্চার ফলে লোকে যখন নীরস এবং প্রাণহীন হইয়া পড়িয়াছিল, ধার্ম্মিক বলিতে—লোকে যখন বুঝিত stoic school এর Sullen-gloomy scholar অথবা দুর্ব্বাসা ঋষির সংস্করণ কোনও ব্যক্তিবিশেষ, তখন সেই সময়েই এই সংকীর্ত্তন সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা হয়। সুতরাং কীর্ত্তন সম্প্রদায়ের সার্থকতা বুঝিতে হইলে এই সকল কথা স্মরণ করিতে হয়।

তৃতীয়তঃ, ধর্ম্মপ্রচারকেরা সে সময়ে বেদীতে বসিয়া ধর্ম্মপ্রচার করিতেন। ইহাতে বক্তা বড় এবং শ্রোতা ছোট, এই প্রকার ভেদভাব সূচিত হইত। কিন্তু সংকীর্ত্তনে "চণ্ডালে ব্রাহ্মণে করে কোলাকুলি" এই নূতন রঙ্গ দেখিবার অবসর মিলিয়াছিল। চৈতন্যদেব এই অভিনব পদ্ধতির প্রচলন করিয়া সকলকে সমভূমিতে আনিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ভেদ জর্জ্জরিত ভারতীয় সমাজে সংকীর্ত্তন সম্প্রদায়ের এইরূপ একটি সার্থকতার মূল্য যে কত অধিক, তাহা সকলেরই ভাবিয়া দেখিবার বিষয়।

অধিকন্তু, সেকালে না ছিল মুদ্রাযন্ত্র, না ছিল সংবাদপত্র, না ছিল উৎকৃষ্ট যানবাহন। ফলতঃ, একালের ন্যায় ভাবের আদান-প্রদানের কোনও প্রকার সুব্যবস্থাই সেকালে ছিল না। কিন্তু তথাপি লোকে যাহাতে পরস্পর পরস্পরের সহিত মিলিত হয়, সে সময়ে তাহার ব্যবস্থা করা একান্ত প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছিল। কেন না, মিলনেই প্রেমের উপচয় হয়। জ্ঞান ও সভ্যতার বৃদ্ধি হয়। ভারতবাসী চিরদিনই ধর্ম্মপ্রাণ এবং আনন্দ জীব মাত্রেরই প্রার্থনীয়। এইরূপে, শ্রীচৈতন্যদেব একমাত্র সংকীর্ত্তন পদ্ধতির প্রবর্ত্তনের দ্বারা মিলন, আনন্দ এবং ধর্ম্মের একত্র সমাবেশ সাধন করিয়াছিলেন। এই জন্যই কীর্ত্তন সম্প্রদায় সে যুগের তাদৃশ উপযোগী হইয়াছিল। ফলতঃ, আমাদের জাতীয় চিত্তে চৈতন্যের সময়ে যে নবভাবের উৎপত্তি হইয়াছিল, সংকীর্ত্তনরূপ অনুষ্ঠান সেই ভাবের উপযুক্ত বাহন হইয়াছিল বলিয়াই উহা সে যুগে জাতীয় অনুষ্ঠানরূপে বাংলার সর্ব্বত্র গৃহীত হইয়াছিল।

* * * *

ব্যষ্টিপ্রধান যুগে মানবের আদর্শ ছিল—"যত লোক তত মত।" সমষ্টির ধর্ম্মও তখন ছিল না; সুতরাং কোনওরূপ নেতা বা অবতারেরও তখন প্রয়োজন হইত না। কিন্তু ধর্ম্ম যখন সমষ্টির হইয়া দাঁড়াইল, তখনই অবতারের আবির্ভাব হইল। (১) এইজন্য অবতার মানবের কল্যাণের জন্য যে সকল পন্থার নির্দ্দেশ করিয়া দেন, সেই সকল পন্থা যাহাতে সমাজের প্রত্যেক ব্যষ্টির উপযোগী হয়, তজ্জন্য তাঁহারা যথাসম্ভব চেষ্টা করিয়া থাকেন। * * * আমরা ভারতবাসী জাতি বিশেষ, সুতরাং আমাদের জাতীয় কর্ত্তব্যে উদাসীন থাকা কর্ত্তব্য নহে। বর্ত্তমান সময়ে আমাদের জাতীয় কর্ত্তব্য কি এবং কিরূপে তাহার সাধনা করা সম্ভবপর, এই সকল বিষয়ের নির্ণয় করিয়া দেওয়াই বর্ত্তমান মনীষীদিগের কার্য্য। চৈতন্যের কার্য্যক্ষেত্র ছিল শুধু বঙ্গদেশ—তথা ভারতবর্ষ। বিশেষতঃ, ভারতবর্ষের তখনও বর্ত্তমান যুগের ন্যায় অধঃপতন হয় নাই। কিন্তু অধুনাতন মনীষীদের কার্য্যক্ষেত্র শুধু দুঃস্থ দলিত ভারতবর্ষ মাত্র নহে, পরন্তু বর্ত্তমান "বিশ্বভারত" তাঁহাদের যথার্থ কার্য্যক্ষেত্র। বস্তুতঃ, বর্ত্তমান ভারতকে এক্ষণে 'বিশ্বভারত' নামে অভিহিত করাই সঙ্গত; কেন না, ভাবের দিক দিয়া এদেশ এক্ষণে বিশ্বের অন্যান্য দেশের সহিত মিলিয়া মিশিয়া এক হইয়া গিয়াছে এবং যাইতেছে। অতএব, বর্ত্তমান নেতাদের কর্ত্তব্য যে কিরূপ গুরুতর, তাহা সহজেই অনুমেয়। ভারতভূমি এক্ষণে হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান বৌদ্ধ জৈন প্রভৃতি বহু ধর্ম্মাবলম্বীদিগের বাসস্থান। সুতরাং, এক্ষণে যদি প্রয়োজন

(১) বৌদ্ধ ধর্ম্মই ভারতবর্ষের সর্ব্বপ্রথম সমষ্টির ধর্ম্ম। হিন্দু ধর্ম্ম চিরদিনই ব্যষ্টিপ্রধান। বিশেষতঃ, শঙ্করের শৈব ধর্ম্ম ব্যষ্টিপ্রাধান্যেরই অধিক পক্ষপাতী। চৈতন্যের বৈষ্ণব ধর্ম্মই অপেক্ষাকৃত আধুনিক এবং উহা মিলনেরই (সমষ্টির) ধর্ম্ম, সুতরাং বর্ত্তমান ভারতের উপযোগী। ভারতের বর্ত্তমান যুগ সমষ্টির যুগ এবং চৈতন্যই ইহার আদি প্রবর্ত্তক।

হয়, তাহা হইলে এমন কোনও ব্যবস্থা হওয়ার প্রয়োজন, যাহা জাতি-ধর্ম্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে প্রত্যেক ভারতবাসীর উপযোগী হয়। আবার, ভারতবর্ষ এক্ষণে "বিশ্বভারত" সুতরাং ঐ ব্যবস্থা এরূপ ভাবে প্রবর্ত্তিত হওয়া চাই, যাহাতে ভারতেরও যথার্থ কল্যাণ হয়, অথচ তজ্জন্য অন্য কোন দেশেরও কোনরূপ অপকার না হয়। মনে করুন, এক্ষণে যদি কীর্ত্তন-পদ্ধতি পুনঃ প্রবর্ত্তিত হয়, তাহা হইলে জাতীয়তার দিক দিয়া উহার মূল্য বড় অধিক হয় না; কেন না, উহা পুনঃ প্রবর্ত্তিত হইলে বৈষ্ণবেরা পরম প্রীত হন, তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু শাক্তদের উহা তাদৃশ তৃপ্তিকর হয় না। পক্ষান্তরে, মুসলমানগণ কর্ত্তৃক উহা সম্ভবতঃ গ্রহণের অযোগ্য বলিয়াই বিবেচিত হয়। কিন্তু বর্ত্তমান যুগের এই যে চরকার প্রচলন,—হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ জৈন খৃষ্টান প্রভৃতি ভারতবর্ষের প্রত্যেক জাতিরই ইহা তুল্যরূপে গ্রহণীয় হইবার যোগ্য। বেদে, কোরাণে, বাইবেলে, চরকার আদর সর্ব্বত্রই তুল্য। যে যুগে কলবস্ত্রের প্রচলন ছিল না, চরকা সে যুগে মানবধর্ম্মের প্রতীকরূপে প্রত্যেক গৃহে আদৃত হইত। * * * অন্য দিকে আবার জাতীয় বস্ত্রের জোর দোহাই দিয়া অন্য জাতির ক্ষতি সাধন করাও সঙ্গত হয় না। কেন না, পরের নাক কাটিয়া দিলে নিজের নাক বড় হয় না, ইহা ধ্রুব সত্য। এইজন্যই, ইংলণ্ড, জার্ম্মাণি ও জাপান প্রভৃতির ন্যায় কলবস্ত্র করিয়া বস্ত্র-ব্যবসায়ী হওয়া এবং তাহারই ফলে ঘরে মজুর মালিকের দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করা এবং ঘরে পরে আন্তর্জাতিক সমস্যা জটিলতর করিয়া তুল আমাদের সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। ফলতঃ, এই যে চরকার প্রচলন, ইহার সহিত ব্যবসায়িক প্রতিযোগিতা অথবা রাজনীতির কোনও সম্বন্ধ নাই;—আছে যাহা, তাহা শুধু স্বাবলম্বনের কথা—আত্মশক্তি উপলব্ধি করিবার কথা। ইহাই চরকার বিশেষত্ব—এই স্থানেই উহার মাহাত্ম্য। তুচ্ছ চরকা, এই জন্যই আজ ভারতীয় স্বরাজের প্রতীকরূপে পরিগৃহীত। তাই চরকার ঘর্ঘর ধ্বনিতে মহাত্মা আজ সামগান শুনিতে পান। তাই আজ মহামতি Ronaldsay এর মুখে শুনিতে পাই,—There was a time when the Charka was a familiar object in every household in India, and I do not see why it should not be brought in the use again * * * অধিক কি, যেদিন জগতের প্রত্যেক জাতি, জাতির প্রত্যেক ব্যক্তি কলবস্ত্র রাক্ষসীর মোহপাশ হইতে মুক্ত হইয়া চরকার আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারিবে, সেদিন শ্রমজীবি সমস্যা, বেকার সমস্যা, ধর্ম্মঘট, যুদ্ধবিগ্রহ ইত্যাদিরূপ মানবজাতির অর্দ্ধেক দুঃখ জগৎ হইতে চিরদিনের জন্য মুছিয়া যাইবে। বস্তুতঃ, আমাদের এই যে বর্ত্তমান জাতীয় ভাব, চরকাই উহার একমাত্র যোগ্য বাহন। এ কথা অস্বীকার করিলে সত্যেরই অপলাপ করা হয়।

* * *

তবে প্রাচীন পন্থারা "চরকার আন্দোলন অনাধ্যাত্মিক" বলিয়া যতই নিন্দা করুন, "কীর্ত্তনের প্রয়োজন ধর্ম্মের জন্য, চরকার প্রবর্ত্তন অন্নবস্ত্র সংস্থানের জন্য (২) সুতরাং চরকা ও কীর্ত্তনে তুলনা করা বাতুলতা" ইত্যাদিরূপ বলিয়া তাঁহারা আপত্তি করুন, "আমরা জড়বাদী—ভোগবাদের উপাসক—অনাধ্যাত্মিক—বহির্ম্মুখ—রাজনৈতিকের দরের আসনে প্রতিষ্ঠিত বাহিরের প্রয়াসী—তুচ্ছ অন্ন বস্ত্রের সংস্থান চেষ্টাকেও আমরা সাধনা বলিয়া নির্দ্দেশ করিবার পক্ষপাতী, অতএব আমরা অধঃপতিত" ইত্যাদি রূপ বলিয়া আমাদের বিরুদ্ধে তাঁহারা চীৎকার করুন, কিন্তু আমরা "চোরা না শোনে ধর্ম্মের কাহিনী।" কেন না, আমরা জানি, শব্দব্রহ্ম, জ্যোতির্ব্রহ্ম প্রভৃতির ন্যায় অন্নব্রহ্মও ব্রহ্ম। ইহা শাস্ত্রেরই বাণী। সুতরাং কাহারও উদ্বেগের কারণ না হইয়া নিজের প্রয়োজনের অনতিরিক্ত অন্ন বস্ত্রের সংস্থান করাও সাধনারই বিষয়; বিশেষতঃ বর্ত্তমান যুগে অন্নহীন অলস ভারতবাসার পক্ষে উহার উপযোগীতা যে সমধিক, তাহা নিঃসন্দেহ। শ্রীচৈতন্যদেবের আমলে ধান্য ছিল টাকায় আট মণ, তাঁহার ধর্ম্মে তাই অন্নের স্থান তেমন নাও থাকিতে পারে, (৩) কিন্তু যে যুগে "অন্নচিন্তা চমৎকারা,

---

(২) বর্ত্তমান সময়ে চরকার দ্বারা অন্নবস্ত্রের সংস্থান হওয়াও অসম্ভব।

(৩) শঙ্করের "আত্মার ক্ষুধা নাই, তৃষ্ণা নাই,"—ইত্যাদিরূপ প্রচারের ফলে সে যুগের লোকের মনে বিশ্বাস জন্মিয়া গিয়াছিল,

কালিদাস হন বুদ্ধিহারা," সে যুগে অন্নহীন ধর্ম্ম বস্তুতঃই নিরর্থক। * * বিশেষতঃ, খোল করতাল আর নাচানাচি লইয়াই যেমন কীর্ত্তন, সেইরূপ কয়েকখানি কাষ্ঠখণ্ড এবং ঘ্যারব ঘ্যাবর শব্দ লইয়াই চরকা। সুতরাং এই হিসাবে দুয়েরই কোনও মূল্য নাই। তবে, কীর্ত্তন এবং চরকাকে আশ্রয় করিয়া যে মহাভাব জাতীয় চিত্তে একদিন উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছিল এবং বর্ত্তমান সময়ে উঠিতেছে, উহাই প্রধান লক্ষ্য করিবার বিষয়। চরকা এবং কীর্ত্তনের সার্থকতা এইখানেই। কেন না, অনুষ্ঠান-গুলু বাহ্য বিষয় মাত্র; মূল ভাব লইয়াই কথা। চৈতন্যের যুগে কীর্ত্তন পদ্ধতি যে দিন সর্ব্বপ্রথম প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, সেদিনও লোকে "পাঁচ পাগলে যুক্তি করে ভাঙল নবদ্বীপ" বলিয়া আক্ষেপ করিয়াছিলেন। সুতরাং দেশের এই বর্ত্তমান অবস্থা দেখিয়া বিচার করিলে চরকার প্রতি বস্তুতঃই অবিচার করা হয়। সুদূর ভবিষ্যতে হয়তো এমন এক দিন আসিবে, যেদিন চরকা আধ্যাত্মিক চিহ্ন স্বরূপ ভারতের প্রত্যেক গৃহে বিরাজিত থাকিবে।

* *

বিভিন্ন ধর্ম্মের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, সকল ধর্ম্মেরই উদ্দেশ্য মানবের ঐহিক ও পারত্রিক কল্যাণ সাধন করা। প্রাচীন ভারতে ইহলোকের সমস্যা জটিল ছিল না। মানব জীবনে স্বাচ্ছন্দ ও স্বচ্ছলতার অভাব ছিল না, হিংসা দ্বেষ হত্যা উৎপীড়ন যুদ্ধ বিগ্রহের আধিক্য ছিল না। এই জন্যই, সে যুগের সকল ধর্ম্মেরই দৃষ্টি ছিল প্রধানতঃ পরলোকবিষয়িণী। কিন্তু এই জটিল ঐহিক সমস্যার দিনে, এ যুগের সকল ধর্ম্মেরই পরলোকের সহিত ইহলোককেও মিলাইয়া লওয়া কর্ত্তব্য। কিন্তু হিন্দু-ধর্ম্ম এ বিষয়ে অদ্যাবধিও তাহার পূর্ব্ব সংস্কারের আশানুরূপ পরিবর্ত্তন করিতে পারিল না। ইহা বস্তুতঃই দুঃখের বিষয়। ধর্ম্মের গভীর দৃষ্টি অতীন্দ্রিয় রাজ্যে চলিয়া যাউক—এই জীব জগৎকে অতিক্রম করিয়া—তাহাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু তাই বলিয়া এই জীব জগৎকে পরিত্যাগ করিয়া যাওয়া তাহার কর্ত্তব্য নহে। পৃথিবীর অন্য সকল ধর্ম্মেরই ইহলোক-বিষয়িণী উপযোগিতা অত্যন্ত অধিক। মুসলমান ধর্ম্মের সমাজ ব্যবস্থা অত্যন্ত উদার। খৃষ্ট ধর্ম্মের মানব সেবার তুলনা নাই। ভারতীয় ধর্ম্মের মধ্যে বৌদ্ধ ধর্ম্মের মানবসেবা বিষয়িণী উপযোগিতাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। খৃষ্টধর্ম্মের ন্যায় মানব সেবামূলক হইয়াও এই ধর্ম্ম, কিন্তু ইহার ভারতীয় ধর্ম্মসুলভ পরলোক-সম্বন্ধীয় বিশেষত্ব বর্জ্জন করিতে পারে নাই। মানব একই পরম পিতার সন্তান হইয়াও পরস্পর হিংসা দ্বেষ করে। মানবের এই স্বকৃত ব্যাধির চিকিৎসা করিবার জন্যই খৃষ্টের Help thy neighbours ইত্যাদি-রূপ আদেশ বাণী। বুদ্ধ কিন্তু "সকল মানবই সমান ও স্বাধীন" ইত্যাদি বাক্য প্রচারিত করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই; পরন্তু মানবের জরা মৃত্যু ক্ষুধা তৃষ্ণা কামনা প্রভৃতি অনিবার্য্য সহজ ব্যাধির চিকিৎসা করিতেও তিনি সচেষ্ট হইয়াছিলেন। (৪) ভারতীয় ধর্ম্মের এই বিশেষত্ব যতই প্রশংসনীয় হউক, কিন্তু উহার সমাজসম্বন্ধীয় উদাসীনতা অথবা অনবধানতা যে বস্তুতঃই মারাত্মক, তাহা কদাপি অস্বীকার করা যায় না। হিন্দুধর্ম্মের যখন প্রাণ ছিল, যখন উহার সর্ব্বতোমুখী দৃষ্টি ছিল, তখন উহা বুদ্ধকেও অবতারের মধ্যে পরিগণিত করিয়া হিন্দু ও বৌদ্ধগণের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করিতে সমর্থ হইয়াছিল। ইহা হিন্দুধর্ম্মের অল্প প্রশংসার কথা নহে।

নিরাহারী হইতে না পারিলে ধর্ম্ম সাধনার অধিকারী হওয়া যায় না। যোগীরা বায়ুভুক,—ইহাই ছিল সে যুগের প্রচলিত বিশ্বাস। এই হেতু শ্রীচৈতন্যদেব ক্ষীণপ্রাণ কলির জীবের জন্য অন্নগ্রহণের ব্যবস্থা দিয়াছিলেন। অন্ন ধর্ম্ম সাধনার অন্তরায় নহে, বরং কলির জীবের পক্ষে উহা ধর্ম্ম সাধনার সহায়ক, এ কথা তিনি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছিলেন। এইরূপে, বৈষ্ণব ধর্ম্মেই, সর্ব্বপ্রথমতঃ, অন্নের প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হইয়াছিল।

(৪) জরা মৃত্যু প্রভৃতি যখন যাইবারই নহে, তখন সাধনায় উহাদের সম্বন্ধে আমাদের মনোগত বর্ত্তমান ধারণার পরিবর্ত্তন করাই উহাদের জয় করার প্রকৃত উপায়, ইহাই ছিল বুদ্ধাদি মহাপুরুষগণের এই অদ্ভুত চিকিৎসার যথার্থ স্বরূপ। If the mountain does not come to Mehamet, Mehamet will go to the mountain; অথবা, নীলাকাশ যখন সবুজ হইবেই না, তখন উহাকে সবুজ করিতে হইলে আমাদিগকেই সবুজ চশমা চোখে পরিতে হইবে,—বুদ্ধাদির এই চিকিৎসার প্রণালী ছিল প্রায় ইহারই অনুরূপ।

কিন্তু পরবর্ত্তী যুগে, বিশেষতঃ মুসলমানগণের সময়ে, অধঃপতিত হিন্দুধর্ম্ম ঐ প্রকার উদারতা প্রদর্শন করত হিন্দু মুসলমানগণের মধ্যে সখ্য স্থাপন করিতে সচেষ্ট হয় নাই। অথবা ঐ প্রকার চেষ্টা রাজনৈতিক এবং সমাজনৈতিকেরই কর্ত্তব্য বলিয়া ধারণা করত সার্ব্বজনীন উদার হিন্দুধর্ম্মকে সংকীর্ণ শুষ্ক আধ্যাত্মিকতা মাত্রে পর্য্যবসিত করিয়াছিল এবং উহারই ফলে ভূমাদৃষ্টিহীন সমাজসংস্কারকগণ "কমঠব্রত" নামক ভেদনীতি অবলম্বন করত উভয় জাতির মধ্যে বিরোধেরই বৃদ্ধি করিয়াছিল। কিন্তু তথাপি হিন্দুধর্ম্মের এই সংকীর্ণতার প্রতিকার করিবার জন্য সে সময়ে প্রকৃত ধর্ম্মাচার্য্য পদবাচ্য যে সকল মহাত্মার আবির্ভাব হইয়াছিল, তাঁহাদের মধ্যে বঙ্গের চৈতন্য, উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের নানক, কবীর ও রামানুজের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইঁহাদের মধ্যে নানক এবং কবীরের প্রচার কার্য্যের ফলই অধিক হইয়াছিল। বাঙ্গালীরা প্রাচীনতার অত্যন্ত পক্ষপাতী, তাহাদের সংস্কার অত্যন্ত প্রবল। এই জন্যই হিন্দু মুসলমান প্রীতির সার্থকতা চৈতন্যের বাঙ্গালীরা তেমন করিয়া বুঝিতে পারেন নাই, কবীর এবং নানকের শিষ্যেরা ঐ সত্য যেমন করিয়া ধরিতে পারিয়াছিলেন। এবং এই জন্যই দয়ানন্দের আর্য্যসমাজ উত্তর পশ্চিমাঞ্চলবাসীদের যাহা করিতে পারিয়াছেন, বঙ্গবাসীদের বিবেকানন্দ সংঘ তাহা করিতে অদ্যাবধিও সমর্থ হন নাই। এই কারণেই বিদ্যাসাগরের প্রচারিত সত্যের বীজ বাঙলার অনুর্ব্বর ক্ষেত্রে অঙ্কুরিত হইতে পারিল না, পারিল উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে। এবং গান্ধির প্রচার কার্য্যের ফল পশ্চিম ভারতে যেরূপ সুন্দর হইয়াছে, বঙ্গদেশে যে সে প্রকার হয় নাই, তাহার কারণও উহাই। বাঙালীরা ভাবের রাজা, কিন্তু কার্য্যের কেহই নহে। ইহা এক দিক দিয়া যেমন প্রশংসার কথা, অন্যদিক দিয়া আবার তেমনি নিন্দার বিষয়। ফুল বড় সুন্দর, এ কথা সত্য, কিন্তু ফুলের পরিণতি হয় ফলে, ইহাও আবার তেমনি সত্য। অতীন্দ্রিয় রাজ্যে ভাবের ইয়ত্তা নাই। কিন্তু সেই ভাব মূর্ত্তির মধ্যে যতটুকু ধরা দেয়, ততটুকুই উহার সার্থকতা। এই ক্ষুদ্র মূর্ত্তিমান জগৎ সেই অমূর্ত্ত অনন্তের (ব্রহ্মের) তুলনায় যতই ক্ষুদ্র হউক, এই মূর্ত্ততাতেই উহার যাহা কিছু সার্থকতা। এই জন্যই, জীব শিব অপেক্ষাও, ব্রহ্মাণ্ড ব্রহ্ম অপেক্ষাও একদিক দিয়া বড়, ভারতবাসী, বিশেষতঃ বাঙ্গালী, এ কথা অদ্যাবধিও বুঝিতে পারিল না। * * * ধর্ম্মের জন্য—ঈশ্বরের জন্যই মানব, এ কথা যেমন সত্য, মানবের জন্যই ধন্য, এবং ঈশ্বর, এ কথাও আবার তেমনি সত্য, চৈতন্যের শিষ্যেরাই সর্ব্বাগ্রে এ সত্য সবিশেষ উপলব্ধি করিয়াছিলেন। এইজন্য, তাঁহাদের রাধাই শুধু কৃষ্ণের জন্য উন্মাদিনী ছিলেন না, কৃষ্ণও তাঁহাদের রাধার জন্য আত্মহারা হইয়াছিলেন। "দুহুঁ কাঁদে দোহাঁর লাগিয়া।" বলা বাহুল্য, বৈষ্ণবদের কৃষ্ণই ঈশ্বর এবং তাঁহাদের রাধাই জগৎ। যে সকল বাঙালী চৈতন্যের শিষ্য বলিয়া গর্ব্ব করেন, দুঃখের বিষয়, তাঁহারা কিন্তু আজও তাঁহাদের সেই বিশ্বপূজ্য অবতার পুরুষের প্রচারিত মহাসত্যের প্রকৃত তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেন না। * * যাহা হউক, প্রকৃত কথা এই যে, ধর্ম্মের দুই প্রকার দৃষ্টি—উহার পরলোক বিষয়িণী পরোক্ষ দৃষ্টি, যাহাকে আকাশ দৃষ্টি বলা যায় এবং উহার ইহলোক বিষয়িণী প্রত্যক্ষ দৃষ্টি, যাহাকে পার্থিব দৃষ্টি বলিলে অশোভন হয় না। ঊর্দ্ধদৃষ্টি জ্যোতির্ব্বিদ আকাশের সংবাদ রাখুক, তাহাতে ক্ষতি নাই। কিন্তু তথাকার সংবাদ রাখিতে গিয়া তাহাকে যেন পৃথিবীর গর্ত্তে পড়িয়া মরিতে না হয়, সেদিকে দৃষ্টি রাখাও তাহার অবশ্য কর্ত্তব্য। বুদ্ধের দৃষ্টি ছিল মর্ত্ত্য এবং আকাশের দিকে। কিন্তু শঙ্করের দৃষ্টি ছিল শুধু আকাশেরই দিকে। চৈতন্যের মতে, মানবের আকাশে বসতি হওয়া অথবা পৃথিবীর সমতল হওয়া দুই-ই যখন সুদূরপরাহত, তখন মর্ত্ত্য এবং আকাশ দৃষ্টির মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া চলাই বুদ্ধিমানের কার্য্য। সমাজে যখন সর্ব্বত্র শান্তি বিরাজ করে, ধর্ম্মেরও তখন ঊর্দ্ধদিকে দৃষ্টি করিবার অবসর হয়, উহার তখন অতীন্দ্রিয়মুখী গতি হয়। অন্যথা, সমাজে যখন বিবিধ বিশৃঙ্খলার উৎপত্তি হয়, ধর্ম্মের দৃষ্টিও তখন নিম্নাভিমুখী হইতে বাধ্য হয়। কেন না, যে ধর্ম্মের উদ্দেশ্য কৃৎস্ন জগৎকে ধরিয়া রাখা, সংস্কৃত ধৃ ধাতু হইতে যে ধর্ম্ম শব্দ ব্যুৎপন্ন, পতিত অবনতদিগকে রক্ষা না করিলে সেই ধর্ম্মেরও তাই চলে না, তাহার সার্থকতা রক্ষিত হয় না। জননী শিশুকে কোলে লইয়া ঊর্দ্ধমুখে চন্দ্র দেখান,

এ দৃশ্য বড় মধুর। কিন্তু সেই শিশু যখন অঙ্কচ্যুত হইয়া ভূপতিত হইবার উপক্রম করে, তখন তাহাকে রক্ষা করিবার জন্য জননীকেও অবনত হইতে হয়। জননীর সেই শশব্যস্ত ভাব যে কত মধুর, কত স্নেহের পরিচায়ক, তাহা সহৃদয় চৈতন্যদেব বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তাই তিনি ভারতীয় ধর্ম্ম জগতে এক মহাপরিবর্ত্তন আনয়ন করিয়াছিলেন। আমাদের এই বর্ত্তমান যুগের সূচনা করিয়া দেন তিনিই—তিনিই ইহার আদি প্রবর্ত্তক। শাঙ্কর যুগে ঈশ্বর বলিতে লোকে বুঝিত, জগদতীত পরব্রহ্ম মাত্র—যিনি জগতের সহিত সর্ব্বপ্রকার সংস্রববর্জ্জিত নির্গুণ পুরুষ। সুতরাং জগৎ তাঁহাদের মতে ছিল প্রকাণ্ড এক মিথ্যা ভুয়াবাজী। চৈতন্য কিন্তু ঈশ্বর বলিতে বুঝাইতে চাহিয়াছিলেন—বিশ্বের ঈশ্বর—বিশ্বের সহিত যাঁহার নিত্য অভেদ মিলন—রাধা-কৃষ্ণের নিত্য যুগল মিলন; সুতরাং জগৎ তাঁহার মতে ছিল বিশ্বেশ্বরের লীলা নিকেতন—শ্রীকৃষ্ণের নিত্য বৃন্দাবন। অন্নগতপ্রাণ কলির জীবের জন্য তিনি ঈশ্বর আরাধনার সহজ উপায় "নামে রুচি"র নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন এবং উহার সহিত "জীবে দয়া ও বৈষ্ণব সেবনের" বিধান যোগ করিয়া দিয়া ঈশ্বরের সহিত জগতের, শিবের সহিত জীবের, ধর্ম্মের সহিত সমাজের, পরলোকের সহিত ইহলোকের সমন্বয় সাধন করিয়াছিলেন। শুধু তাহাই নহে, তিনি জীবকে শিব, ভক্তকে ভগবান, জগৎকে ব্রহ্ম অপেক্ষাও বড় করিয়া দেখিয়াছিলেন, কৃষ্ণকে দিয়া রাধার পায়ে ধরাইয়া তবে ছাড়িয়াছিলেন। (৫) রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ আবার শ্রীচৈতন্য দেবের সেই আরব্ধ কার্য্যই আরও অধিক দূর অগ্রসর করিয়া দিয়াছিলেন এবং বর্ত্তমান সময়ে মহাত্মা গান্ধীও সেই একই কার্য্যে ব্রতী রহিয়াছেন। সুতরাং অন্নগতপ্রাণ কলির জীবের জন্য ঐ প্রকার সহজ সাধন পদ্ধতির নির্দ্দেশ করা যদি চৈতন্যদেবের পক্ষে অন্যায় না হয়, তাহা হইলে বর্ত্তমান যুগের এই সকল অন্ন বস্ত্রহীন জীবের জন্য কিরূপ ব্যবস্থা করা সঙ্গত, তাহা ভাবিয়া দেখিবার বিষয়।

* * * *

ধর্ম্মের দুই দিক—বাহ্য অনুষ্ঠান, যাহাকে ধর্ম্মের দেহ বলা যায় এবং তাহার অন্তর্নিহিত সত্য, যাহা ধর্ম্মের প্রাণ স্বরূপ। ধর্ম্মের অন্তর্নিহিত সত্যই মুখ্য, তাহার অনুষ্ঠান গৌণ। কিন্তু তাই বলিয়া অনুষ্ঠানকে উপেক্ষা করাও কর্ত্তব্য নহে। দেহহীন প্রাণের যেমন সার্থকতা নাই, অনুষ্ঠানহীন ধর্ম্মও তেমনি নিরর্থক এবং উহার অস্তিত্ব অসম্ভব, কিন্তু তথাপি ধর্ম্মকে অনুষ্ঠান-সর্ব্বস্ব অর্থাৎ কতকগুলি অনুষ্ঠানের গণ্ডীতে আবদ্ধ করিয়া ফেলাও কর্ত্তব্য নহে। (৬)

---

(৫) রাধাকৃষ্ণলীলার রূপক বঙ্গদেশে প্রচারিত হইয়াছিল প্রধানতঃ বৈষ্ণব ভক্তগণ কর্ত্তৃক। প্রথমতঃ, বিশ্ব এবং বিশ্বনাথে—রাধা এবং কৃষ্ণে অভেদ; দ্বিতীয়তঃ, পুরুষ অপেক্ষাও নারী গরীয়সী,—কৃষ্ণ অপেক্ষাও রাধা বড়; তৃতীয়তঃ, লোকস্থিতির হেতু সংসার, সংসার ধর্ম্মের ঋত্বিক স্ত্রীপুরুষ, রাধা কৃষ্ণ সেই স্ত্রীপুরুষেরই আদর্শ—রাধাকৃষ্ণ-লীলার রূপকের দ্বারা—এই সকল সত্যেরই তাঁহারা প্রচার করিয়াছিলেন। কেন না, সে সময়ে ঈশ্বরত্বের আদর্শ ছিল নির্গুণ ব্রহ্মবাদ; সুতরাং জগৎ মিথ্যা; নারী ছিল তখন নরকের দ্বার; সন্ন্যাসীর জীবন ছিল তখন আদর্শ জীবন।

(৬) মনে করুন, আমাদের এই যে পৌত্তলিকতা—যাহা হিন্দু ধর্ম্মের অনুষ্ঠানরূপ দেহের অংশবিশেষ,—তাহাও বস্তুতঃ নিরর্থক নহে। অনন্তদেবের অনন্তভাব। হিন্দুরা নানাপ্রকারে অনন্তদেবের অনন্তভাবের প্রতিমা গড়িয়া পূজা করেন। অনেকে মনে করেন, ইহারা এই ভাবে—স্বহস্তে ভগবানের এই সকল তুচ্ছ প্রতিমা গড়িয়া—ইহাদের স্রষ্টা সেই পরম দেবতারই অবমাননা করিয়া থাকেন। তাঁহারা যাহাই মনে করুন, প্রকৃত কথা কিন্তু ঐরূপ নহে। পিতৃভক্ত পুত্র যে স্বহস্তে স্নেহময় পিতার সামান্য তৈলচিত্র অঙ্কিত করিয়া নিজের গৃহ প্রাচীরে রক্ষা করেন, ইহাতে কি তাহার তাঁহার পূজনীয় পিতৃদেবের অবমাননা করা হয়? নিরাকারের ভাব উপলব্ধি করিতে গিয়া ক্ষুদ্র মানবের কি অজ্ঞাতসারে সমুদ্র, আকাশ, অথবা উন্মুক্ত কোনও প্রান্তরেরই কথা মনে উদিত হয় না? ভক্ত স্বয়ংই সাকার জীব, তাই তাঁহার নিরাকারেরও "চরণ" বাহির হয়, নিরাকারও তাই তাঁহার "পিতা" হইয়া দাঁড়ান। ফলতঃ, ভক্ত হৃদয়েই ভগবানের জন্ম হয়। ভক্ত হৃদয়ে যাহা অনুভব করেন, রূপক আকারে তাহা বাহ্য চিত্রে প্রকাশিত করিলে উহা কদাপি দূষণীয় হইতে পারে না,—মুক্ত সংস্কার উদার বুদ্ধি মানবমাত্রেই তাহা স্বীকার করিবেন। এই যে পৌত্তলিকতা—হিন্দু ধর্ম্মে যাহার বাহুল্য দৃষ্ট হয়, ইহার অনুরূপ ভাব কিন্তু খ্রীষ্ট ধর্ম্মেও সমানতঃ বিদ্যমান্। ঈশ্বর সর্ব্বত্রই রহিয়াছেন, তথাপি church এ গেলে ঈশ্বরের উদ্দীপন অধিক হয়। আবার, বিশ্বের যে কোন পদার্থের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই বিশ্বেশ্বরের কথা স্মৃতিপথে

আবার, এ কথাও সত্য যে, ধর্মের প্রত্যেক অনুষ্ঠানের মূলেই কোনও না কোনও গূঢ় উদ্দেশ্য নিহিত থাকে এবং সেই উদ্দেশ্য যতক্ষণ সিদ্ধ না হয়, ততক্ষণ সেই অনুষ্ঠানের সার্থকতাও অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু সেই উদ্দেশ্য যখন পূর্ণ হইয়া যায়, তখন সেই অনুষ্ঠানেরও আর তাদৃশ প্রয়োজন থাকে না। তথাপি সেই নিরর্থক প্রাণহীন অনুষ্ঠান যদি তখনও মানব কর্ত্তৃক গতানুগতিক ভাবে অনুসৃত হইয়া অমঙ্গলের হেতু হইয়া দাঁড়ায়, পূর্ব্ব প্রচলিত অথচ ইদানীং অনাবশ্যক সেই অনুষ্ঠানের মোহে মানব যদি বর্ত্তমান যুগের কোনও অতি প্রয়োজনীয় অনুষ্ঠানেও অবহিত না হয়, তাহা হইলে সেরূপ স্থলে সেই অমঙ্গলকর অনর্থক অনুষ্ঠানের ধ্বংস অথবা সংস্কার সাধন করা তখন অনিবার্য্য হইয়া পড়ে। এই জন্যই সংস্কারের পাষাণ চাপে ধর্ম্মের এই মুক্তধারা যাহাতে রুদ্ধ হইয়া না যায়, ভাবই অনুষ্ঠানের প্রাণ, সুতরাং ভাব পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে যাহাতে তদনুযায়ী অনুষ্ঠান অতি সহজেই গড়িয়া উঠিতে পারে, সে দিকে লক্ষ্য রাখা সকলেরই অবশ্য কর্ত্তব্য। বৃদ্ধের জীর্ণদেহে শিশুর সদানন্দ প্রাণ যেমন স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হয় না, নূতন ভাবও সেইরূপ, পুরাতন প্রথার আশ্রয়ে পুষ্ট হইতে পারে না। পরমহংস দেবের "নবাবী আমলের টাকা এ কালে চলে না" খৃষ্টের "The new wine in the new bottle" ইত্যাদি বাক্যের তাৎপর্য্যও ইহাই। এবং চৈতন্য যাঁহার অবতার, স্বয়ং সেই শ্রীকৃষ্ণও তাই গীতায় বলিয়াছেন, "সম্ভবামি যুগে যুগে।" ধর্ম্ম যদি মৃতের ধর্ম্ম হইত, তাহা হইলে আর তাঁহার পুনঃ পুনঃ অবতীর্ণ হইবার প্রয়োজন হইত না।

ফলতঃ, বর্ত্তমান ভারতকে প্রাচীন ভারত বলিয়া মনে করার ন্যায় মারাত্মক ভ্রম আর নাই, ইহা যেন আমরা সর্ব্বদা স্মরণ রাখি, এবং চৈতন্যের ধর্ম্মে কীর্ত্তন পদ্ধতি একদিন যে স্থান অধিকার করিয়াছিল, বর্ত্তমান যুগের ধর্ম্মে চরকার সেই স্থান গ্রহণ করিবার অধিকার আছে, এ কথাও আমরা যেন ভুলিয়া না যাই।

উদিত হইতে পারে, কিন্তু তথাচ "ক্রস" নামক কাষ্ঠও বিশেষ নয়ন পথে পতিত হইলে, তাঁহাকে বিশেষ করিয়া মনে পড়ে। সুতরাং ইহাও বস্তুতঃ পৌত্তলিকতারই অনুরূপ। এইজন্যই, হিন্দু ধর্ম্মের উদ্দেশ্যমূলক এই অনুষ্ঠানকে নিরর্থক মনে করা সঙ্গত হয় না। এই পর্য্যন্তই মূর্ত্তি পূজার যাহা কিছু সার্থকতা। কিন্তু যখন দেখা যায়, গ্রামে সরস্বতী পূজার ঘটাঘটা, অথচ এদিকে যে "চাষার মূর্খে গাঁ উজাড়", সে দিকে কাহারও লক্ষ্য নাই, তখনই রাজা রামমোহন রায়কে এই ঋষির বংশধরদিগকেও পৌত্তলিক বলিয়া নিন্দা করিতে বাধ্য হইতে হয়। দৃষ্টি যাহার এত ক্ষুদ্র, চিন্ময়ীকে যে মৃন্ময়ীর মধ্যে সীমাবদ্ধ করিয়া ফেলে—ভাব বিষয়ে দীনাতিদীন অনুষ্ঠান সর্ব্বস্ব এরূপ ব্যক্তিকে পৌত্তলিক বলিলে তাহা অসঙ্গত হয় না। প্রকৃত কথা এই যে, ক্রস তুচ্ছ কাষ্ঠখণ্ড মাত্র। মূর্ত্তি এবং খড় কাঠ মাটি ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। চরকা এবং খোল করতালও বৈষ্ণব বস্তু, এ সকলের কোনও মূল্য নাই। মূল—ভাব লইয়াই কথা। সুতরাং দেশ কাল পাত্র বিশেষে ধর্ম্মের বিভিন্ন অনুষ্ঠানের সার্থকতাও স্বীকার করিতে হয়। এই হিসাবে, যাহা একের পক্ষে প্রয়োজনীয়, অন্যের পক্ষে তাহা প্রয়োজনীয় নাও হইতে পারে। চৈতন্যের যুগে ভারতের পক্ষে যাহা সার্থক ছিল, বর্ত্তমান যুগে তাহা নিরর্থক হইয়া যাওয়াও তাই অসম্ভব নহে।

সংগ্রহ ও সঙ্কলন।

ডাক-টিকিটের ইতিহাস।

৬০।৭০ বৎসরের মধ্যে পৃথিবীতে যে কত পরিবর্ত্তন হয়ে গেছে আর এখনও হচ্ছে, তা ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। শিক্ষিত সমাজ কতই না চেষ্টা করছেন, তাঁদের দৈনন্দিন কাজকর্ম্মকে সুচারুরূপে অল্প ব্যয়ে চালাবার জন্য; এই চেষ্টার একটি শ্রেষ্ঠ নিদর্শন,—পোষ্টাল ডিপার্টমেন্ট বা ডাক-বিভাগ। যেখানে ডাক-ঘর নেই, যে-দেশে ডাক-টিকিটের জয়-পতাকা বুকে ক'রে চিঠিগুলি নির্ব্বিঘ্নে যাতায়াত করছে না, এমন জায়গা পৃথিবীতে খুবই কম আছে। এই ডাক-বিভাগ আর ডাক-টিকিটের প্রথম প্রচলনের ইতিহাস বেশ চিত্তাকর্ষক।

ইংরাজী ১৮০০ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি ইংলণ্ডে প্রথম ডাক

বিভাগ খোলা হয়। জায়গায় জায়গায় ডাকঘর স্থাপিত হল বটে, কিন্তু টিকিট তখনও প্রচলিত হয় নি। এই বিভাগের নিয়ম ছিল, পত্র প্রেরক চিঠিতে টিকিট দিতেন না, যাঁর নামে চিঠি যেত, বিলি করবার সময় তাঁর কাছ থেকে পয়সা আদায় করা হত। এই নিয়মে অসুবিধা ছিল বিস্তর,—হিসাব রাখবার জন্য অসম্ভব সংখ্যায় কেরাণী রাখতে হত, কাজেই চিঠি পাঠাতে ব্যয়ও হত খুব বেশী। এই অতিরিক্ত অভিযোগগুলিকে দূর করবার জন্য পার্লামেন্টের সদস্য সার রোলণ্ড হিল 'নাছোড় বান্দা' হয়ে পড়লেন। তাঁরই অসীম চেষ্টার ফলে ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে Uniform penny posting Act পাশ হয়, আর সেই বৎসরই এক পেনীর ডাক-টিকিট প্রচারিত হয়। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে ২ পেনীর টিকিটও লণ্ডনে চলতে শুরু হয়। সময়ের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে ডাক বিভাগেরও বিশেষ উন্নতি হতে থাকে। ফলে বিশ্ব জুড়ে নানা রকমের টিকিটের আবির্ভাব হতে লাগল, তাতে এক দেশের লোক ঘরে বসে মনের সুখে অন্য দেশবাসীর সঙ্গে আলাপ করবার যথেষ্ট অবসর পেলে।

১০।১৫ বৎসর আগেকার টিকিট সংগ্রহ করা এক রকম অসম্ভব। নানা দেশের টিকিট সংগ্রাহকদের কাছে বিভিন্ন দেশের প্রথম প্রচলিত ডাক টিকিট কাচিৎ দেখা যায়। হাজার হাজার টাকা দাম আজকাল সর্ব্ব প্রথম প্রচলিত টিকিটের। টিকিট আবিষ্কার হবার ১০।১৫ বৎসর পরে অনেকে আগেকার টিকিট সংগ্রহের দিকে মন দেন; কাজেই টিকিট সংগ্রহ করা অবস্থাপন্ন লোকের একটা 'বাই' হয়ে দাঁড়াল, আর তাতে অনেক বেকারের অর্থ সমস্যাও পূরণ হতে চল্‌লো। পুরানো টিকিট সংগ্রহ করাকে ইংরাজীতে Philately বা Timbrology বলে। এই শব্দ দুটীর সৃষ্টিকর্ত্তা প্যারিস এক ভদ্রলোক,—নাম তাঁর হর্‌প্যাঁ।

আমেরিকার ব্রুকলীন এসোসিয়েশন পুরানো টিকিট সম্বন্ধে আলোচনা করবার জন্য এক সভা স্থাপন করেন। টিকিট-সংগ্রাহকদের উৎসাহ দেবার জন্য লণ্ডনে ১৮৯৭ ও ১৯০০ খৃষ্টাব্দে ডাক-টিকিটের একজিবিসন হয়েছিল। তাতে অসংখ্য দুষ্প্রাপ্য ও বিচিত্র ডাক-টিকিট-পূর্ণ পাঁচশো বই আর অগণ্য টিকিট দেখানো হয়। বৃটিশ মিউজিয়মের কর্ত্তারা তা থেকে বিস্তর অপ্রাপ্য টিকিট কিনে মিউজিয়মে রেখেছিলেন। তার এক-একখানা টিকিটের দাম এখন ৫০০।১০০০৲ টাকা।

১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে Stamp collectors Magazine আর Gimbse Post * নামে টিকিট সম্বন্ধে দুখানি কাগজ প্রকাশিত হয়। ডাক টিকিট সংগ্রহ করবার জন্য লণ্ডনে ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে The London Philatelic. আর ফ্রান্সে ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে Lasociet Francaisede Timbrologic নামে সভা স্থাপিত হয়েছিল। এই সময় থেকে টিকিট সংগ্রহ করা একটা art মধ্যে গণ্য হয়। ইউরোপের অনেক বিশ্ব-বিদ্যালয়ে ডাক-টিকিটের আলোচনা হয়।

১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের পর [illegible] প্রেসিডেন্সিতে সর্ব্বপ্রথম টিকিট প্রচলিত হয়। United States of America থেকে ওয়াসিংটন ও ফ্রাঙ্কলিনের ছবি বুকে করে প্রথম ডাক টিকিট দেখা দেয় ১৭৪৭ খৃষ্টাব্দে। [illegible] 'সুইজারল্যাণ্ড' নামের জন্য ঘোষণা করে ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দের ১লা [illegible] ফ্রান্সে প্রথম টিকিট [illegible] ১৮৫০ খৃষ্টাব্দের ১লা জুন অষ্ট্রীয়া হাঙ্গারীও টিকিট বার করেছিল। ইংলণ্ডে ডাক-টিকিট প্রচলিত হবার প্রায় দশ বৎসর পরে কুড়ি জায়গায় এর প্রচলন হয়; আর প্রায় ৩০ বৎসরের মধ্যে দুনিয়াময় টিকিটের আবির্ভাব হয়েছে। বিভিন্ন দেশে নানা রকম চলতি টিকিটের সংখ্যা বিশ হাজার রকমেরও বেশী। তা ছাড়া প্রথম প্রথম যে সব টিকিট বেরিয়েছিল, সে সব আর পাওয়া যায় না, বন্ধ হয়ে গেছে।

মরীসশ দ্বীপের ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে প্রথম প্রচলিত টিকিটের একখানার দাম আজকাল ১৫০ পাউণ্ড। বৃটিশ গায়নার এক পেনী দামের প্রথম ষ্ট্যাম্পের দাম এখন ২০০০ পাউণ্ড; তাও পাওয়া যায় না। ক্যানেডার ১২ পেন্সের টিকিট মেলে না। অসম্ভব রকম দাম (ত্রিশ

* Stamp-collectors Magazine তিনখানা আর Gimbse Post দু'খানা আমার কাছে আছে; অন্য কারো কাছে যদি থাকে, দয়া করে আমাকে জানালে চিরকৃতজ্ঞ হব।

হাজার পাউণ্ড) দিয়েও এই টিকিটখানি কোন সংগ্রাহক সংগ্রহ করতে পারেন নি। সেডাং দেশের (Sedang) প্রথম টিকিটের আলোচনা এখন গল্প কথায় দাঁড়িয়েছে। অনেকে বলেন Sedang-এর রাজা প্রথমে মেরার সময় ডাক-টিকিট প্রচলিত হয়েছিল, তার নাম ছিল,—"S. M. be Roides Sedangs." বর্ত্তমান ভারত-সম্রাট জর্জ্জ এ কজন শ্রেষ্ঠ ষ্ট্যাম্প বৈজ্ঞানিক ও টিকিট-সংগ্রাহক। ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে যখন ইনি যুবরাজ ছিলেন, তখন ক্যানাডার নূতন ষ্ট্যাম্পের ডিজাইন নিজে তৈরী করেন। ঐ বৎসরেই England Stamp Exhibition থেকে তাঁকে মেডেল দেওয়া হয়।

আমেরিকায় Argentine Confederation এর প্রথম টিকিটের পরিকল্পনা করেছিল, সেখানকার এক রুটী-বিক্রেতার ছেলে ; সে টিকিটে সেই ছেলেটির নামও লেখা আছে।

ক্যানাডার পোষ্টমাষ্টার-জেনারেল কনেলকে ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে নূতন টিকিট বার করবার ভার দেওয়া হয় ; তিনি টিকিট ছাপবার জন্য আমেরিকা গেলেন। আমেরিকা থেকে টিকিট ছেপে এলে দেখা গেল, পাঁচ সেণ্টের টিকিটে রাজার বদলে কনেলের মূর্ত্তি ছাপা হয়ে গেছে। এই টিকিটের পরিবর্ত্তে রাজার চিত্র সহ নূতন পাঁচ সেণ্টের টিকিট ছাপিয়ে দেবার জন্য গভর্ণমেণ্ট কনেলকে আদেশ করেন, তিনি তাতে স্বীকার হলেন না। নিজের কাজে ইস্তফা দিয়ে New Brunswick ছেড়ে চলে গেলেন।

১৯১০ সনের ২৯শে নভেম্বর Captain Scott জনকয়েক সহযাত্রী নিয়ে টেরানেভা জাহাজে নিউজিলণ্ড পোর্ট থেকে ধ্রুব আবিষ্কার করতে বেরিয়েছিলেন। নিউজিলণ্ড গভর্ণমেণ্ট এর জন্য নূতন রকমের টিকিট ছাপিয়ে দেন আর কেপ ইভান্সে একটা পোষ্ট অফিস খোলা হয় ; এই ডাক-ঘরের কর্ত্তা ছিলেন Captain Shackleton :—কেপ ইভান্স থেকে জায়গায় জায়গায় যে চিঠি পাঠানো হয়েছিল, তার উপরকার ছাপ মারা টিকিটের দাম আজকাল অনেক। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে ১৮ই জানুয়ারী ক্যাপ্টেন স্কটের মৃত্যু আর টেরানেভার দুর্ঘটনার সংবাদ লণ্ডনে পৌঁছায়। সেই থেকে ধ্রুব-আবিষ্কারের টিকিটের দামও খুব বেড়ে গেছে।

গত মহাযুদ্ধের সময় যখন ভারতবাসী যুদ্ধে যেতে আরম্ভ করলে, তখন তাদের জন্য ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট এক রকম পোষ্ট কার্ড ছাপিয়ে দেন, এতে কোন রকম টিকিট ছাপা হোত না। আমাদের দেশী রাজ্যগুলির টিকিটে বিশেষত্ব আছে ; সে সব টিকিট নিজের নিজের রাজ্যের এক বিশেষ চিহ্ন বুকে করে ঘুরে বেড়ায়।

শ্রী কমলকান্তি মুখোপাধ্যায়
ভারতী, অগ্রহায়ণ, ১৩৩০।

চিত্ত কোথায় ?

[শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল, বি-এল]

এই যে প্রভাত-আলো
এই যে কল-পাখী
এই যে সবুজ শাখী
চিত্ত কোথায় ?

এই যে শ্যামল তৃণ
এই যে ফুলের রাশি
হাওয়ার কল-হাসি
চিত্ত কোথায় ?

এই যে রবির কিরণ
মেঘের সজল কালো
রাতের জ্যোৎস্না-আলো
চিত্ত কোথায় ?

আনন্দেরি ধারা
বইছে পাগল-পারা
ধরণী তায় হারা
চিত্ত কোথায় ?

এই যে তাঁহার পরশ
সকল দুঃখ সুখে
বীণা বাজায় বুকে
চিত্ত কোথায়

ডাক আসে যে তাঁর
ভেঙ্গে সকল দ্বার
খোঁজ করে আমায়
চিত্ত কোথায় ?

অশ্রু-অঞ্জলি।

[শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত।]

হেমন্তের আকাশ-প্রদীপের প্রায় শেষ রশ্মির সঙ্গে সঙ্গে কুমার-পূজার, অধিবাসে নায়ক-সম্পাদক পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের জীবন-প্রদীপ নির্ব্বাপিত হইয়াছে। এ কঠোর সংবাদ বঙ্গবাসীমাত্রেরই নয়ন অশ্রুভারাক্রান্ত করিবে। স্বাবলম্বন ও তেজস্বিতার মন্ত্রোপাসক দেশপ্রাণ অশ্বিনীকুমারের শোকের ছায়া অপসারিত হয় নাই; বাণী-মন্দিরের একনিষ্ঠ পূজারী সাহিত্য-বিতানের কলকণ্ঠ পিক পাঁচকড়ি বাবু দেহ রক্ষা করিলেন। বিধাতার এ বিধান বড়ই নিষ্ঠুর। সংবাদপত্র আজকাল বাঙ্গালা দেশে অনেকের জীবিকার উপায়। কিন্তু আশৈশব পাঁচকড়ি বাবু যেমন সংবাদপত্রের সেবায় প্রাণ মন ঢালিয়া দিয়াছিলেন, এমন নিষ্ঠা কাহারও দেখি নাই। বাঙ্গালার সংবাদপত্রের ইতিহাসে পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম স্বর্ণাক্ষরে না লিখিলে ইতিবৃত্তকার কর্ত্তব্যচ্যুত হইবে। বাল্যকালে দেখিয়াছি, পাঁচকড়ি বাবু একাধারে ইংরাজি, বাঙ্গালা, হিন্দী তিন ভাষায় তিনখানি সংবাদপত্র কৃতিত্বের সহিত পরিচালন করিয়াছেন। তাহাতেও তাঁহার শক্তি অপ্রতিহত ছিল। তিনি লেখনী ছাড়িয়া বক্তৃতায় শ্রোতার মনোরঞ্জন করিয়াছেন। এক সময়ে এককালে তিনি একাধিক দৈনিকপত্র সম্পাদন করিয়াছেন, সঙ্গে সঙ্গে একাধিক সাপ্তাহিক চালাইয়াছেন, বক্তৃতা করিয়াছেন, পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন এবং সামাজিক আমন্ত্রণ-নিমন্ত্রণ, রাজনৈতিক দলাদলি, সন্ধি-বিগ্রহে সমান আগ্রহ দেখাইয়াছেন—এই দৈনন্দিন কর্ত্তব্যের বোঝা শিরে বহিয়া, অবসর-কালে সরস নির্ভীক বক্তৃতায় বাঙ্গালীর নিকট নিজের দলের রাজনৈতিক মত প্রচার করিয়াছেন। এই শক্তির—এই দৈহিক শক্তির কয়জন বাঙ্গালী গর্ব্ব করিতে পারেন? অবশ্য এই অমানুষিক পরিশ্রম যে তাঁহার অকালমৃত্যুর কারণ, তাহা সন্দেহ করিবার উপায় নাই।

দেশে নাম কিনিতে গেলে, দেশের মধ্যে একজন হইতে হইলে অক্লান্তকর্ম্মী হইতে হয়, এ কথা আমি অস্বীকার করি না। একাধারে নানাপ্রকারের কর্ম্ম করিয়া দেশ-সেবা করিবার প্রকৃষ্ট উদাহরণ আধুনিক সমাজে সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। এত বিরাট বাধা বিশাল বিপত্তি পথের মাঝে দেখিয়া বীর-দর্পে সেগুলার মাথার উপর পাদ বিক্ষেপে গন্তব্য-পথে অগ্রসর হইবার চলন-পদ্ধতি দেখাইয়াছেন যেমন সার আশুতোষ, এযুগে তেমন চলন-ভঙ্গিমা আর কাহারও দেখি নাই। কিন্তু সার আশুতোষ প্রমুখ লক্ষ্মী সরস্বতীর বরপুত্রদিগের বহু আয়াসের রণসজ্জা, দরিদ্রের বহু আয়াসের আয়োজনের ভিতর দিয়া একাধারে যশ ও জীবিকা অর্জ্জনের ব্যবস্থা হইতে বিভিন্ন। বিশালকর্ম্মী নরবীর একবার বিজয়-লক্ষ্মীর নির্ম্মাল্যের প্রভাব ও উন্মাদনা অনুভব করিলে জীবনের পথে অগ্রসর হইবার বিধানটাই যেন স্বাভাবিক মনে করেন। কিন্তু দারিদ্র্যের ভ্রূকুটি, অভাবের তাড়না, পাত্রমিত্র জনসাধারণ দ্বারা দৈহিক ও মানসিক শক্তির তাচ্ছিল্য, অন্যের মোহ-হাস্য আজীবন যাহার জীবন-পথকে কলঙ্কিত ও অন্ধকার-পরিবৃত করিয়া রাখে, সেই পথে সহজ জ্ঞানের দীপকে প্রজ্বলিত রাখিয়া পদে পদে পরাজয়ের সঙ্গে কোস্তাকুস্তি করিতে করিতে জ্ঞান ও রসের পরিচয় প্রদান করা অসাধারণ যোগ্যতা। এই যোগ্যতার পূর্ণ পরিচয় দিয়াছেন ৺পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার জীবনে। শতকরা নিরানব্বই জন বাঙ্গালীর যাহা জীবনের সমস্যা, পাঁচকড়ি বাবুর জীবনের সমস্যা ঠিক তাহাই ছিল—কিরূপে মান-সম্ভ্রম অক্ষুণ্ণ রাখিয়া পিতা-মাতা, পুত্র-কন্যা, আত্মীয় বিধবা, অনাথ আত্মীয়ের ভরণপোষণ হইবে। সামান্য বুদ্ধি বিদ্যার মূলধন লইয়া শত শত লোক সকল দেশেই বাণীমন্দিরে পূজারীর কার্য্য গ্রহণ করে। সংবাদপত্রের কার্য্যালয় অনুসন্ধান করিলে এ শ্রেণীর লোক সংখ্যায় অনেক। তাঁহাদের পক্ষে এ সমস্যা ভঞ্জনের আজীবন চেষ্টায় নবীনত্ব কিছুই নাই। কিন্তু

পাঁচকড়ি বাবুর মত মনীষাসম্পন্ন বিদ্যাবুদ্ধির আকর অমায়িক জীবের পক্ষে কেবল ভারতী সেবা-ধর্ম্মে প্রেম-বশতঃ সাহিত্যসেবায় আত্ম-নিয়োগ করা এবং বাধা-বিঘ্নের তীব্র আঘাত বুকে করিয়া পদদ্বয় কণ্টকাকীর্ণ করিয়া সে পথে পড়িয়া থাকায় নূতনত্ব আছে। তাই পাঁচকড়ি বাবুর জীবন-কথা স্মরণ করিয়া তাঁহাকে সাহিত্য-মন্দিরের একনিষ্ঠ সাধক না বলিয়া থাকিবার উপায় নাই। অর্থ-লোলুপ হইলে তাঁহার ঐ বিদ্যাবুদ্ধি-রসিকতা-বাগ্মিতা লইয়া ওকালতী বৃত্তিতে পাঁচকড়ি বাবু প্রভূত ধনের অধি-স্বামী হইতে পারিতেন। তাঁহার অতি-বড় শত্রুকে এ কথা স্বীকার করিতে হইবে।

তাঁহার সাহিত্য-সমালোচনার স্থান এ নয়; তাঁহার চিতায় দুই ফোঁটা অশ্রু দিবার দিন এত কথা বলিলাম তাহাও অপ্রাসঙ্গিক। কিন্তু একটা কথা না বলিলে এ অঞ্জলি পূর্ণ হইবে না। বাঙ্গালা ভাষায় লেখকের অভাব নাই। কিন্তু দৈনিক প্রবন্ধ লিখিয়া, কঠোর বিশ্ব সংবাদ লইয়া নাড়া চাড়া করিয়া পাঁচকড়ি বাবু যে সরস মধুর ভাষা তাঁহার সংবাদপত্রে ঢালিয়া দিতেন সে ভাষা কোন সংবাদ-পত্রে খুঁজিয়া পাওয়া সম্ভবপর নয়। তাঁহার ভাষা মধুমাখা ছিল—কি প্রবন্ধে কি বক্তৃতায়। তাঁহার লেখনী হইতে মধু বর্ষিত হইত। তাঁহার বিপক্ষ-মতাবলম্বী ব্যক্তিকেও সে কথা স্বীকার করিতে হইত।

পাঁচকড়ি বাবুর অকালমৃত্যুতে আমি স্বয়ং বিষাদমগ্ন। তাঁহার পিতামাতা পুত্র পুত্রবধূ আত্মীয়-স্বজনকে সান্ত্বনা দিবার শক্তি আমার নাই। তাঁহাদের অশ্রুজলের সহিত আমাদের মত অনেক সাহিত্যসেবীর অশ্রুজল মিশ্রিত হইতেছে। যিনি বিশ্বনিয়ন্তা, যিনি মরণের বিধান করেন, সান্ত্বনার বিধানও তাঁহার করায়ত্ত। পাঁচকড়ি বাবুর আত্মীয়-স্বজনের সান্ত্বনার ব্যবস্থা তিনিই করিবেন।

কবিতা-কুঞ্জ।

সমর্পণ।

[শ্রীমতী রাধারাণী দত্ত]

তোরে মোর এ জগতে ছিল যা' দেবার
হে দেবতা! সকলি তো রয়ে গেছে বাকি,
আজিকে বাসনা হয়ে চরণ-সেবা'র
তার পূজা-অর্ঘ্য কহ কোন্ খানে রাখি?
তার প্রাপ্য যাহা দেওয়া হয় নাই তারে
দ্বিগুণ হয়েছে তাহা আজি গুরু-ভার
দুর্ব্বল-পরাণ মম বহিতে যে নারে
নিষ্কাম পবিত্র অশ্রু-ধৌত-প্রেম আর!
লঘু গুরু যত কিছু অপরাধ ক্রটী
জ্ঞানহীনা করিয়াছি তার দু'টি পায়
ক্ষুব্ধ প্রাণ আজি তাই ধরাতলে লুটি'
শূন্যে চাহি অশ্রু-জলে করে হায় হায়।
তার পূজা কোথা রাখি, ও চরণ বিনা
তব কাছে তার ক্ষমা লব দ্বিধাহীনা।

আত্মোৎসর্গে।

[শ্রীঅক্ষয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বি-এ]

আমার আঁধারে হায় কেন রব আর—
আলোকে পুলকে আজি ভাতিল সংসার—
নিখিল জগৎব্যাপী উঠিল যে কলরব,
নিমিষে ভুলায় সব দুখ জ্বালা হাহারব—
আমার আমার আর অবিচার সুবিচার
তোমার তোমাতে হায় হইল নীরব
ভুলিয়া গিয়াছি সব, ভুলিয়া গিয়াছি সব—
তোমাতে হেরেছি আমি সকলি আমার।
পূরবে অরুণ রেখা আসিয়া দিয়াছে দেখা
আঁধার চলিয়া গেছে দিগন্তের পার,
কুলায় কুলায় পাখী ডাকিতেছে থাকি থাকি
প্রভাত সমীর বহে পরশ কাহার,
সে যে গো তোমার ওগো তুমি যে আমার
আমি যে তোমার ওগো সকলি তোমার।

[illegible]া।

[শ্রীঅরীন্দ্রজিৎ মুখোপাধ্যায় এম-এ]

যদি কভু দিয়ে থাকি ব্যথা
　　ভুলে যাও সে দোষের কথা,
মিছে কেন পুষে রাখ ক্ষত
　　হৃদয়ের গুঢ়তর ব্যথা।
ধরণী কালের আবরণে
　　ঢেকে দেয় সকল শূন্যতা,
স্নেহভরা পরশে তাহার
　　ভরি উঠে সকল দীনতা।
ভেঙে-পড়া বিটপীর শির
　　নব দেহে উঠে মুঞ্জরিয়া,
শীতান্তের, শিথিলিত বনে
　　বসন্ত সে উঠে গুঞ্জরিয়া।
দাবদাহ অরণ্যের বুকে
　　ঢেকে যায় শ্যাম আবরণে,—
সন্ধ্যা করি মুখর মধুর
　　পাখী গেয়ে উঠে বনে বনে।
তুমি শুধু ফিরাইয়া মুখ
　　চলে যাবে, সে কথা কেমন।
তুমি শুধু ক্ষমিবে না দোষ
　　শূন্য হিয়া করিবে বহন।
আমার এ দীন দুর্ব্বলতা
　　স্নেহদান লবে না ঢাকিয়া,
যদি কভু দিয়ে থাকি ব্যথা
　　চিরদিন রবে তা' স্মরিয়া।
কবে কাঁট ফুটেছিল পায়
　　চিরদিন কে করে স্মরণ,
দিনেকের অবজ্ঞা লভিয়া
　　আপনায় কে করে কৃপণ।
ভুলে যাও সেই কথা রাশি।
　　তোমরা যে স্বরগের ফুল,
পৃথিবীর মলিনতা মাঝে
　　হারাওনা দেবত্ব অতুল।

বিধান।

[শ্রীআশুতোষ মজুমদার*]

মেঘ ব'লে বায় উচ্চে উঠে
　　দেখ্‌বো চাষা ভায়া,
পরের কাজে গা খামিয়ে
　　ক'রবো না আর দয়া।
কৃষক বলে জন্ম তোমার
　　আমায় দিতে জল,
মাথায় ঘুরে' নাম্‌তে হবে
　　বাক্যে কিবা ফল।

———

কুঞ্জ-দ্বারে।

[শ্রীকৃষ্ণধন দে, এম-এ]

১

তুমি এখন এলে?—মালা শুকায়ে গেল,
ওই গগন কোলে চাঁদ নিভিয়া এল,
　　উষা মেঘের ফাঁকে
　　রাঙা ছবিটী আঁকে,
দূরে বিহগ ডাকে,—'সুখনিশা ফুরাল!'

২

কত আশা না বুকে সারা রজনী জাগি,
কত কামনা নিয়ে তব দরশ মাগি,
　　কত মিলন স্মরি
　　প্রাণে গুমরি মরি
হায়! পরাণ ধরি বল কিসের লাগি?

৩

ভরা চাঁদের আলো যদি বৃথাই ঝরে,
যদি তরুণ হিয়া বৃথা কেঁদেই মরে,
　　যদি ফুলের বাসে
　　প্রাণে যাতনা আসে
যদি বেদনা ভাসে ওই পাপিয়া স্বরে,—

৪

যদি তটিনী-জলে শত ঝিলিক জ্বলে
যদি বাতাস শিহরি' বয় মাধবী তলে,
যদি উদাস সুরে
কেহ গাহে গো দূরে,
যদি সে সুর ঘুরে মোর স্মৃতির দলে,—

৫

কেন রব না সখা, চাহি পথটি পানে ?
কেন রবে না আঁকা মম তরুণ প্রাণে ?
জাগি নিঝুম রাতে
ভরা বীণাটি হাতে
তব স্মৃতির সাথে কাঁদি তোমারি গানে !

৬

সেই অলকে যাওয়া কোন্ রঙিন্ সাঁঝে,—
সেই চমকি চাওয়া তব কুঞ্জ মাঝে,—
সেই যমুনা তীরে—
বাঁশী বাজিত ধীরে,
সেই নয়ন-নীরে বাধা সকল কাজে !

৭

সেই বাদল দিনে বনে ঝুলন খেলা,
সেই বাঁশরী শেখা সারা দুপুর বেলা,—
। অধরে ছুঁয়ে,
নাচে বেতাল সুরে
সেই আধেক ছুঁয়ে কত হাসির খেলা !

৮

সবি জাগিছে ধীরে আজি স্মৃতির সুখে,
স্মরি গুমরি মরি হায় ! আপন দুখে !
যদি বাসিতে ভাল
কেন অনল জ্বাল
কেন গরল ঢাল সখা তরুণ বুকে ?

৯

যদি ভুলেই যাবে কেন হৃদয় হরি'
সখা বাজালে বাঁশরী মম জীবন ভরি' ?
আজি নিশার শেষে
জাগি শিথিল বেশে—
কেন কাঁদালে এসে সখা ছলনা করি ?

১০

মালা শুকায়ে গেছে, গেছে নিভিয়া বাতি,
চাঁদ ডুবিয়া গেছে, নাহি তারার পাঁতি,
ম্লান কুসুম সাজে,
কি যে যাতনা বাজে,
হায় ! জীবন মাঝে মম ঘনাল রাতি !

২০শ ভাগ] মাঘ, ১৩৩০। [১২শ সংখ্যা

স্কন্দোপাখ্যান।

[শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়]

পুরাণাদিতে এমন কতকগুলি আখ্যায়িকা আছে যাহার মধ্যে স্পষ্ট জ্যোতিষ তত্ত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। একই আখ্যান ভিন্ন ভিন্ন পুরাণে বিভিন্নাকারে বর্ণিত হওয়ার দরুণ, সকল পুরাণে জ্যোতিষ তত্ত্ব প্রস্ফুটিত হয় নাই বটে, কিন্তু পুরাণবিশেষে কোনও কোনও আখ্যান এরূপ ভাবে বর্ণিত হইয়াছে যে, উহা নভোমণ্ডলস্থ নক্ষত্রবিশেষ লইয়া রচিত বলিয়াই বোধ হয়। স্কন্দ বা কার্ত্তিকেয় আমাদের একজন পৌরাণিক দেবতা। মহাভারতের বনপর্ব্বে ইঁহার যেরূপ জন্ম-বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতে দেখা যায়, আখ্যানভাগের সহিত নক্ষত্রবিশেষের যথেষ্ট সম্বন্ধ রহিয়াছে; সুতরাং মনে হয়, নক্ষত্রাদি বিষয়ে যৎকিঞ্চিৎ বর্ণনা করাই এই আখ্যান রচনার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। বিবিধ পুরাণে স্কন্দের জন্ম-বৃত্তান্ত বিভিন্নাকারে বর্ণিত হইলেও মূল আখ্যানভাগ সর্ব্বত্র প্রায় একই; সুতরাং মহাভারতের বনপর্ব্বের আখ্যানভাগ লইয়া এ সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাইতেছে।

মহাভারতের বনপর্ব্বের ২২২ ও ২২৩ অধ্যায়ে কথিত আছে,—দেবরাজ ইন্দ্র অসুরগণ কর্ত্তৃক বারম্বার পরাজিত হইয়া একদা মানস শৈলে গমন পূর্ব্বক একান্ত চিত্তে ঐ বিষয় চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় অদূরে স্ত্রীলোকের আর্ত্তনাদ শ্রবণ করিয়া, ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন, এবং দেখেন যে, কেশী নামক এক দানব একজন স্ত্রীলোককে বলপূর্ব্বক হরণ করিবার প্রয়াস পাইতেছে। ইন্দ্র আর কাল বিলম্ব না করিয়া দানবের হস্ত হইতে স্ত্রীলোকটিকে উদ্ধার করেন, এবং তাঁহার পরিচয়াদি জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারেন যে, তিনি প্রজাপতি দক্ষের কন্যা দেবসেনা,—তাঁর পিতার বর প্রভাবে তিনি এরূপ মহাবলপরাক্রান্ত বীর পুরুষকে স্বামী রূপে লাভ করিবেন, যিনি সমরে সমুদায় দেব, দানব, যক্ষ, কিন্নর, উরগ, রাক্ষস প্রভৃতিকে পরাজয় করিতে সমর্থ হইবেন। দেবরাজ তখন ইঁহার ইপ্সিত পতি সম্বন্ধে চিন্তা করিতে করিতে দেখিতে পাইলেন,—ভাস্কর উদয়াচলে সমুদিত এবং চন্দ্রমা তাঁহার শরীরে প্রবিষ্ট হইতেছেন। শশি দিবাকরের এরূপ একতা দর্শনে দেবরাজ ইন্দ্র মনে মনে সিদ্ধান্ত করিয়া লইলেন যে, সূর্য্য ও চন্দ্রের এই সমাগমে ভগবান চন্দ্রমা যে পুত্র উৎপাদন করিবেন, তিনিই, অথবা সূর্য্যের ন্যায় সর্ব্বগুণসম্পন্ন অগ্নি যাহাকে উৎপাদন করিবেন, তিনিই এই কন্যার ইপ্সিত পতি হইবেন। এখন কথা হইতেছে যে, এই সূর্য্য ও চন্দ্রের সম্মিলন দেখিয়া ইন্দ্রের

এরূপ কল্পনা করিবার হেতু কি? প্রতি মাসেই যখন একবার করিয়া অমাবস্যা ঘটে অর্থাৎ শশি দিবাকরের সংযোগ হয়, তখন অমাবস্যার মধ্যে কোনও বিশেষত্ব নাই; সুতরাং মাত্র চন্দ্র সূর্য্যের সম্মিলনেই ইন্দ্রের মনে বলবীর্য্য সম্পন্ন পুত্রোৎপত্তির কথা উদিত হয় নাই,—ইহা কোনও বিশেষ দিনের অমাবস্যা ছিল, এবং সেই জন্যই কোনও কারণ বিশেষে ইন্দ্র এরূপ কল্পনা করিয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে পশ্চাৎ আলোচনা করা যাইবে।

ইহা ত গেল আখ্যানের এক প্রকার প্রস্তাবনা মূল উপাখ্যানটি এইরূপ,—একদা হুতাশন বশিষ্ঠ প্রমুখ দেবর্ষিগণের অনুষ্ঠিত যজ্ঞে আহুত হইয়া সূর্য্যমণ্ডল হইতে নিষ্ক্রান্ত হন, এবং যজ্ঞালয়ে আগমন করিয়া তথায় মহর্ষিপত্নীগণের রূপরাশি দর্শনে আত্মহারা হইয়া পড়েন। তাঁহার চিত্তবিকার ঘটে বটে, কিন্তু তিনি প্রকাশ্যভাবে মহর্ষিপত্নীগণের নিকট মনোভাব ব্যক্ত করিতে সাহসী হন নাই। ইতিপূর্ব্বে দক্ষদুহিতা স্বাহা হুতাশনের প্রতি অনুরাগিণী হইয়াছিলেন; কিন্তু অগ্নি তাঁহার প্রতি অপ্রমত্ত ছিলেন বলিয়া, এতকাল নিজ অভিলাষ পূরণ করিতে সমর্থ হন নাই। এইবার স্বাহা হুতাশনকে ঋষিপত্নীগণের প্রতি অনুরাগী জানিতে পারিয়া কৌশলে নিজ অভিলাষ পূরণ করিবার প্রয়াস পাইলেন। প্রথমে তিনি মহর্ষি অঙ্গিরার সহধর্ম্মিণীর মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া মহাবন মধ্যে অগ্নিকে ভজনা করিলেন। পাছে ঋষিপত্নীগণ জানিতে পারেন, এই ভয়ে তিনি সুপর্ণীর রূপ ধারণ করিয়া মহাবন হইতে পলায়ন করেন; এবং প্রস্থান কালে পথিমধ্যে শরস্তম্বাচ্ছাদিত শ্বেত পর্ব্বতের এক কাঞ্চনময় কুণ্ডে অগ্নির শুক্র নিক্ষেপ করিয়া যান। এইরূপে তিনি একে একে ছয়জন মহর্ষিপত্নীর রূপ ধারণ করিয়া অগ্নিকে ভজনা করেন; এবং প্রতিবারেই বন হইতে প্রস্থান কালে প্রতিপদ তিথিতে ঐ শ্বেত পর্ব্বতের কাঞ্চনময় কুণ্ডে বহ্নি-শুক্র নিক্ষেপ করেন। অরুন্ধতীর অসামান্য তপঃ প্রভাব ও স্বামী শুশ্রূষা নিবন্ধন, স্বাহা তাঁহার দিব্যরূপ ধারণে সমর্থ হয় নাই।

এই বহ্নি-রেতঃ হইতে আমাদের কুমার বা কার্ত্তিকেয়ের জন্ম (১)। তেজোময় স্কন্নরেতঃ হইতে উৎপন্ন বলিয়া উঁহার নাম স্কন্দ। ইঁহার ছয় মস্তক, দ্বাদশ চক্ষু, দ্বাদশ কর্ণ, দ্বাদশ হস্ত, এক গ্রীবা ও এক জঠর। প্রতিপদ তিথিতে বহ্নিতেজ কাঞ্চন কুণ্ডে নিক্ষিপ্ত, দ্বিতীয়াতে অপেক্ষাকৃত কিঞ্চিৎ সুব্যক্ত, তৃতীয়াতে সুস্পষ্ট শিশুর ন্যায় প্রতীত, চতুর্থীতে ইঁহার সমুদায় অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সম্পন্ন হইয়া উঠে, পঞ্চমীতে দক্ষ কন্যা দেবসেনার সহিত ইহার বিবাহ হয়, এবং ষষ্ঠীতে ইনি মাতৃগণ সমভিব্যাহারে জগতে পূজিত হন। এখন কথা হইতেছে যে, এই তিথিগুলির পর পর উল্লেখের কারণ কি? পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, ইন্দ্র, চন্দ্র সূর্য্যের সঙ্গম হইতে দেখিয়া এইরূপ পুত্রের উৎপত্তি কল্পনা করিয়াছিলেন। হুতাশন যজ্ঞালয়ে আহুত হইয়া সূর্য্যমণ্ডল হইতেই নিষ্ক্রান্ত হইয়াছিলেন। অতএব দেখা যাইতেছে যে, এই আখ্যানের অগ্নি ও সূর্য্যতেজ একই। অমাবস্যার দিন চন্দ্র ও সূর্য্যের সঙ্গম, প্রতিপদের দিন বহ্নিতেজ কুণ্ডে নিক্ষিপ্ত, এবং তাহার পর পর তিন দিনের মধ্যেই পূর্ণ বলের স্কন্দের উৎপত্তি। এ কারণ মনে হয়, এই ব্যাপারের সহিত চন্দ্র ও সূর্য্যের গতির একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে।

তাহার পর স্কন্দের মাতৃ-নির্ণয় সম্বন্ধে সন্দেহ উপস্থিত হইল। যাহারা স্বাহাকে সুপর্ণীরূপে গমন করিতে দেখিয়াছিল, তাহারা প্রচার করিল,—সুপর্ণী এই কুমারের জননী। যে বনে স্বাহা হুতাশনকে ভজনা করিয়াছিলেন, সেই বনবাসীরা প্রচার করিল, ছয় ঋষিপত্নীই এই কুমারের জননী। স্বাহা যে এই কাণ্ড করিয়াছিলেন, তাহা একমাত্র বিশ্বামিত্র অবগত ছিলেন। বিশ্বামিত্র সপ্তর্ষিগণের নিকট তাঁহাদের পত্নীগণের নির্দ্দোষিতা প্রতিপন্ন করিবার প্রয়াস পাইলেন; কিন্তু সপ্তর্ষিগণ বিশ্বামিত্রের কথায় সম্পূর্ণ আস্থা স্থাপন করিতে পারিলেন না, সন্দিগ্ধ চিত্তে অরুন্ধতী ভিন্ন অপর ছয় পত্নীকে ত্যাগ করিলেন। এ কারণ সপ্তর্ষিমণ্ডলে মাত্র অরুন্ধতীই অবস্থান করিতেছেন;—অরুন্ধতী সমেত আটটি তারাই আকাশে সপ্তর্ষিমণ্ডল নামে অভিহিত। সপ্তর্ষিগণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত ছয় ঋষিপত্নী

(১) ঋগ্বেদের পঞ্চম মণ্ডলে দ্বিতীয় সূক্তে ১।২ ঋকে অগ্নির পুত্রকে কুমার নামে অভিহিত করা হইয়াছে। অরণি (যে কাষ্ঠ ঘর্ষণ করিলে অগ্নি উৎপন্ন হয়) উহার মাতা।

স্কন্দের শরণাপন্ন হন, এবং তাঁহাকে পুত্ররূপে গ্রহণ করিয়া তাঁহার সহিত একত্রে বাস করিতে থাকেন। স্কন্দের অপর নাম কার্ত্তিকেয়। কৃত্তিকা নক্ষত্র কর্ত্তৃক পালিত বলিয়াই তাঁহার এই কার্ত্তিকেয় নামকরণ করা হইয়াছে। আমরা কৃত্তিকা নক্ষত্রে ছয়টি উজ্জ্বল তারা দেখিতে পাই। এই ছয়টি উজ্জ্বল তারাই ছয় ঋষিপত্নী; এবং এই ছয় ঋষিপত্নী কর্ত্তৃক পালিত বলিয়াই স্কন্দের ছয় মস্তক; এবং তিনি ষড়ানন নামে অভিহিত। (২)

দেবরাজ ইন্দ্র স্কন্দকে যে সকল কথা বলিয়াছিলেন, তাহা হইতে এই উপাখ্যানটি যে জ্যোতিষতত্ত্ব লইয়া রচিত তাহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। স্কন্দ ও ইন্দ্রের কথোপকথনটি স্বর্গীয় মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয় কর্ত্তৃক অনুবাদিত মহাভারত হইতে অবিকল উদ্ধৃত করিলাম;—

"অনন্তর কার্ত্তিকেয় দেবরাজকে বিমনা দেখিয়া কহিতে লাগিলেন,—'সুররাজ! কি করিতে হইবে আজ্ঞা করুন।' ইন্দ্র কহিলেন,—'হে মহাত্মন! রোহিণীর কনিষ্ঠা ভগিনী অভিজিৎ স্পর্দ্ধা করিয়া জ্যেষ্ঠা হইবার বাসনায় তপোনুষ্ঠান করিতে বন গমন করিয়াছেন, তন্নিমিত্ত আমি নক্ষত্র সংখ্যা পূরণে অসমর্থ হইয়াছি, অতএব এক্ষণে তুমি ব্রহ্মার সহিত মিলিত হইয়া গগনচ্যুত অভিজিতের পরিবর্ত্তে অন্য নক্ষত্র প্রতিষ্ঠিত করিবার উপায় চিন্তা কর।' স্কন্দ ইন্দ্র কর্ত্তৃক এইরূপে অভিহিত হইয়া ব্রহ্মার নিকট গমন করিলে, তিনি ধনিষ্ঠাদি কালের কল্পনা করিলেন। সেই কালই পূর্ব্বে রোহিণী নক্ষত্রে হইয়াছিল। এদিকে কৃত্তিকাগণ ইন্দ্রের অভিপ্রায় অবগত হইয়া নক্ষত্র সংখ্যা পূরণ করিবার নিমিত্ত স্বর্গে গমন করিলেন। তাঁহারা ছয় জন গারুড়ীর সহিত মিলিত হইয়া সপ্তশীর্ষাভ নক্ষত্ররূপে অদ্যাপি দীপ্তি পাইতেছেন।"

সর্ব্বপ্রথমে নভোমণ্ডলে ২৮টি নক্ষত্র পরিকল্পনা করা হইয়াছিল। পরে যখন দেখা যায় যে, অভিজিৎ নক্ষত্র, নক্ষত্র চক্র হইতে বহু দূরে অবস্থিত, তখন ইহাকে নক্ষত্র তালিকা মধ্যে পরিগণনা না করিয়া, সর্ব্ব সমেত ২৭টি নক্ষত্র লইয়া নক্ষত্র চক্র গঠন করা হয়। এই কারণেই বোধ হয় এই আখ্যানে অভিজিতের বনগমন পরিকল্পনা করা হইয়াছে। যে সময়ের ঘটনা অবলম্বন করিয়া এই আখ্যান রচনা করা হইয়াছে, সেই সময়ের পূর্ব্বে বিষুবান্ রোহিণী নক্ষত্রে অবস্থান করিত, অর্থাৎ রোহিণী নক্ষত্রে সূর্য্যের অবস্থান কালীন দিবা ও রাত্রি সমান হইত। প্রকৃতির নিয়মই এই যে, বিষুব বিন্দু ৬৬২/৩ বৎসর অন্তর (ইংরাজি মতে ৭১.২ বৎসর অন্তর) এক অংশ করিয়া পশ্চাতে সরিয়া আসিতেছে: কালক্রমে যখন বিষুবান্ রোহিণী নক্ষত্র হইতে পিছাইয়া আসিয়া কৃত্তিকা নক্ষত্রে উপস্থিত হয়, অর্থাৎ কৃত্তিকা নক্ষত্রে সূর্য্যের অবস্থান কালীন দিবা ও রাত্রি সমান হইতে থাকে, তখন বৎসরাদি গণনার পরিবর্ত্তন করিবার প্রয়োজন হইয়া পড়ে। এই পরিবর্ত্তনটাকেই রূপক ছলে বর্ণনা করিবার অভিপ্রায়েই বোধ হয় এই স্কন্দোপাখ্যান রচিত হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত মহাভারতের উক্তিতে বলা হইয়াছে, 'স্কন্দ ব্রহ্মার নিকট গমন করিলে তিনি ধনিষ্ঠাদি কালের কল্পনা করিলেন।' কৃত্তিকা নক্ষত্র হইতে ধনিষ্ঠা নক্ষত্রের দূরতা প্রায় ৯০° অংশ, অর্থাৎ কৃত্তিকা নক্ষত্রে বিষুব সংক্রমণ হইলে ধনিষ্ঠা নক্ষত্রে উত্তরায়ণ হইয়া থাকে। অধুনা আমাদের বিষুব-সংক্রান্তি (চৈত্র সংক্রান্তি) হইতে বৎসর গণনা করা হইলেও, পূর্ব্বে উত্তরায়ণ হইতে বৎসর গণনা করিবার রীতি প্রচলিত ছিল। যে সময়ে কৃত্তিকা নক্ষত্রে বিষুবান্ পিছাইয়া পড়িয়াছিল, সেই সময়ের উত্তরায়ণ অর্থাৎ ধনিষ্ঠা নক্ষত্র হইতে বৎসর গণনা আরম্ভ করা হইয়াছিল। বেদাঙ্গ জ্যোতিষে ধনিষ্ঠা হইতে বৎসর গণনার উল্লেখ পাওয়া যায়। বেদ ব্রহ্মার মুখ হইতে উদ্ভূত, এবং সেই জন্যই পুরাণে ব্রহ্মা ধনিষ্ঠাদি কালের কল্পনা করিলেন বলিয়া উল্লিখিত।

তাহার পর এই আখ্যান-প্রসঙ্গে মহাভারতে কথিত আছে;—দেবরাজ ইন্দ্র স্কন্দের প্রতি বজ্র নিক্ষেপ করিলে, তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্ব বিদীর্ণ হইয়া গেল। তখন এই বিদীর্ণ পার্শ্বদেশ হইতে দিব্য সুবর্ণ কুণ্ডল ও শক্তিধারী এক যুবা-পুরুষ নির্গত হইলেন। বজ্র প্রহার দ্বারা নির্গত হইয়াছেন বলিয়া তাঁহার নাম বিশাখ হইল। আমরা দেখিতে পাই,

(২) শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় প্রণীত "আমাদের জ্যোতিষ ও জ্যোতিষী" গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

কৃত্তিকা নক্ষত্রের প্রায় ১৮০° অংশ দূরে অর্থাৎ সম ক্রান্তিপাতে বিশাখা নক্ষত্র অবস্থিত। কৃত্তিকা নক্ষত্রে যদি বিষুব সংক্রমণ হয়, তাহা হইতে বিশাখা নক্ষত্রেও অপর বিষুব সংক্রমণ হইয়া থাকে। এই হিসাবে কৃত্তিকার সহিত বিশাখার সম্বন্ধ আছে; কিন্তু পুরাণে ইহাকে কৃত্তিকা হইতে সঞ্জাত বলিবার উদ্দেশ্য কি? পূর্ব্বকালে গ্রহনক্ষত্রাদি লক্ষ্য করিবার জন্য এখনকার মত যন্ত্রাদি ছিল না। সূর্য্য যখন যে নক্ষত্রে অবস্থান করেন, সূর্য্যালোকে সে নক্ষত্র নয়নগোচর হয় না; কাজেই আর্য্যঋষিগণ সূর্য্যাস্তের সময় উদয়গামী নক্ষত্র হইতে হিসাব করিয়া সূর্য্য কোন্ নক্ষত্রে অবস্থান করিতেছেন তাহা নির্ণয় করিতেন। যেদিন দিবা ও রাত্রি সমান হইত, সেই দিন সূর্য্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব্বগগনে বিশাখা নক্ষত্র উদিত হইতে দেখিয়া, ঋষিগণ স্থির করিতেন, সূর্য্য কৃত্তিকা নক্ষত্রে অবস্থান করিতেছেন; অপর পক্ষে সূর্য্যাস্তের সময় পূর্ব্বগগনে কৃত্তিকাকে উদিত হইতে দেখিয়া জানিতে পারিতেন সূর্য্য বিশাখা নক্ষত্রে অবস্থিত। এই কারণেই বোধ হয়, বিশাখ বা বিশাখা নক্ষত্র স্কন্দ বা কৃত্তিকা হইতে সঞ্জাত বলা হইয়াছে। একদিকে পুরাণে বিশাখ কার্ত্তিকেয় হইতে সঞ্জাত, অপর দিকে নভোমণ্ডলে কৃত্তিকা ও বিশাখা সমক্রান্তিপাতে অবস্থিত, ইহা আকস্মিক ব্যাপার বলিয়া মনে হয় না।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, শশি দিবাকরের সংযোগ দর্শনে দেবরাজ ইন্দ্র সিদ্ধান্ত করিয়া লইয়াছিলেন যে, এই সংযোগ ফলে যে পুত্র উৎপন্ন হইবে, তাহাই দেবসেনার পতি হইবে। চন্দ্র ও সূর্য্যের সংযোগে অমাবস্যা হয়, এখন দেখা যাউক এই অমাবস্যার দিন এরূপ কল্পনা করিবার কি হেতু থাকিতে পারে। আমরা দেখিতে পাই, পূর্ব্বে পূর্ণিমা হইতে মাস গণনা করিবার রীতি প্রচলিত ছিল, পরে বেদাঙ্গ জ্যোতিষের সময়ে মাঘ মাসের অমাবস্যা হইতে বৎসর গণনা করিবার প্রথম সূত্রপাত হয়। বেদাঙ্গ জ্যোতিষে কথিত আছে;—

স্বরাক্রমেতে সোমার্কৌ যদা সাকং সবাসবৌ।
স্যাত্তদাদিযুগং মাঘস্তপঃ শুক্লোঽয়নং হ্যুদক্॥

অর্থাৎ বাসব বা ধনিষ্ঠা নক্ষত্রে সূর্য্য ও চন্দ্র যখন একত্র অবস্থান করেন, তখন আদি যুগ, মাঘ মাস, তপঃ ঋতু, শুক্লপক্ষ ও উত্তরায়ণ আরম্ভ হইয়া থাকে। পূর্ব্বে পূর্ণিমান্ত মাস ও রোহিণী নক্ষত্রে বিষুব সংক্রমণ অনুসারে বৎসর গণনা করিবার রীতি ছিল; পরে এই রীতি যখন পরিবর্ত্তিত হইয়া অমান্ত মাস ও কৃত্তিকায় বিষুব সংক্রমণ অনুসারে বৎসর গণনা করিবার প্রথা প্রচলিত হইল, তখন সূর্য্যের বিষুব সংক্রমণ কালীন অমাবস্যা দিনের একটা বিশেষত্ব ঘটিল। এই বিশেষত্বটাকেই বোধ হয় স্কন্দোপাখ্যানে রূপক ছলে বর্ণিত হইয়াছে। দেবসেনা প্রজাপতি দক্ষের কন্যা। পুরাণে ২৭টি নক্ষত্রকেই প্রজাপতির কন্যা বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। সুতরাং মনে হয়, এই ২৭টি নক্ষত্রই আমাদের আখ্যানের দেবসেনা। অমাবস্যার দিন সূর্য্যের বিষুব সংক্রমণ অনুসারে স্কন্দ বা কৃত্তিকা নক্ষত্র অমাবস্যার দিন উৎপন্ন এবং ইনি নক্ষত্র-চক্রের আদি নক্ষত্র বলিয়া পরিগণিত। এই কারণেই ইনি নক্ষত্রমণ্ডলীর শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ দেবসেনাপতি। মহাভারতে কথিত আছে;—"ব্রাহ্মণগণ যাঁহাকে ষষ্ঠী, সুখপ্রদা লক্ষ্মী, সিনীবালী, অপরাজিতা, ও কুহূ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, সেই দেবসেনা স্কন্দের মহিষী হইলেন। * * * ভগবান কার্ত্তিকেয় পঞ্চমীতে লক্ষ্মীর সহিত মিলিত হইয়াছিলেন, এইজন্য ঐ তিথি শ্রীপঞ্চমী এবং ষষ্ঠীতে তাঁহার প্রয়োজন সকল সুসম্পন্ন হইয়াছিল, এই নিমিত্ত ষষ্ঠী মহাতিথি বলিয়া প্রসিদ্ধ হইল।"—[মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহের অনুবাদ] এখানেও দেখা যাইতেছে যে, কৃত্তিকায় বিষুব সংক্রমণ অনুসারে ধনিষ্ঠাদি কালের অর্থাৎ উত্তরায়ণের পঞ্চমীই আমাদের শ্রীপঞ্চমী। পুরাণ অনুসারে দেবসেনা কার্ত্তিকেয়ের মহিষী, জ্যোতিষ অনুসারেও কৃত্তিকা নক্ষত্র-চক্রের আদি নক্ষত্র; অথচ কেহ কেহ দেবসেনাপতি শব্দের দেবগণের সেনাপতি অর্থ করিয়া কার্ত্তিকেয়কে কেন যে অবিবাহিত বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, বুঝিলাম না। মনে হয়, কার্ত্তিকেয়ের কুমার নামকরণ দেখিয়াই এরূপ কল্পনা করা হইয়াছে। ঋগ্বেদে অগ্নিপুত্রের নাম কুমার; কার্ত্তিকেয় অগ্নিপুত্র, এবং সেই জন্যই ইঁহার নাম কুমার;—অবিবাহিত বলিয়া

ইহাঁর নাম কুমার নয়। কার্ত্তিকেয় মহিষী দেবসেনা অধুনা ষষ্ঠীদেবী নামে খ্যাতা এবং ষষ্ঠী মহাতিথিতে পূজিতা।

যদি চন্দ্র ও সূর্য্যের সংসর্গেই স্কন্দের উৎপত্তি থাকে, তাহা হইলে অগ্নি ও স্বাহা, ও অন্যান্য পুরাণে রুদ্র ও রুদ্রাণী, হর ও পার্ব্বতী প্রভৃতির কথা কোথা হইতে আসিল? মহাভারতেই, বলা হইয়াছে, হুতাশন সূর্য্যমণ্ডল হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া বশিষ্ঠাদির যজ্ঞে আগমন করেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, এই আখ্যানে বহ্নি সূর্য্যতেজ হইতে উৎপন্ন, অর্থাৎ সূর্য্য ও বহ্নি একই। যাস্ক ও সায়ন বলেন, রুদ্র অগ্নির নামান্তর। (৩) পৌরাণিক হর, শিব, মহাদেব প্রভৃতি রুদ্রেরই অপর নাম। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, এই আখ্যানের হর, শিব, রুদ্র, অগ্নি ও সূর্য্যতেজ একই। রুদ্র ও অগ্নি যে একই, তাহা মহাভারতে স্পষ্ট করিয়া বলা হইয়াছে। মহাভারতে কথিত আছে,—"সন্তানার্থী ও পুত্রবান ব্যক্তি সকল প্রদোষ সময়ে অগ্নিরূপ রুদ্র ও স্বাহারূপ উমাকে অর্চ্চনা করিয়া থাকে। * * * ব্রাহ্মণগণ অগ্নিকে রুদ্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন; এই রুদ্ররূপ অনল কর্ত্তৃক উৎসৃষ্ট শুক্রে শ্বেত পর্ব্বতে কৃত্তিকাদিগের প্রযত্নে স্কন্দদেব জন্মগ্রহণ করেন, এই জন্য ইনি রুদ্রপুত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ হইলেন।" [মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহের অনুবাদ]

পুরাণ-বিশেষে শরবনের পরিবর্ত্তে গঙ্গাগর্ভে কার্ত্তিকেয়ের জন্ম বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। আমরা দেখিতে পাই, কৃত্তিকা নক্ষত্রের উপরেই ছায়াপথ (Milky way); ইহাই পুরাণ-বর্ণিত স্কন্দের জন্মস্থান শরবন বা স্বর্গগঙ্গা। আর্দ্রার অধিপতি রুদ্র; এই আর্দ্রা নক্ষত্রও ছায়াপথের ঠিক নিম্নে কৃত্তিকার অনতিদূরে অবস্থিত। এই সকল কারণে মনে হয়, স্কন্দই আমাদের কৃত্তিকা নক্ষত্র। মহাভারতে স্কন্দের স্তোত্রে বলা হইয়াছে,—"তুমিই সম্বৎসর, তুমিই ছয় ঋতু, তুমিই মাস, অর্দ্ধমাস ও অয়ন।" কৃত্তিকায় বিষুব সংক্রমণ অবলম্বন করিয়া যদি এই স্কন্দোপাখ্যান না রচিত হইয়া থাকিবে, তাহা হইলে, স্কন্দের স্তোত্রে এ সকল কথা কোথা হইতে আসিল?

(৩) যাস্ক—"অগ্নিরপি রুদ্র উচ্যতে"।
সায়ন—"রুদ্রায় ক্রূরায় অগ্নয়ে।"

বিসর্জ্জন।

[শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী]

(১৬)

দুই দিন বাদে ইভিকে লইয়া সুরেন্দ্রনাথ সিঙ্গাপুর চলিয়া যাইবে এইরূপ কথা ছিল। কিন্তু বিবাহের পর দিনই দুপুর বেলা সে শ্রীনাথ বাবুর নিকটে আসিয়া শুষ্ক-কণ্ঠে বলিল, "আমার আজই যেতে হচ্ছে। কাল সকালে ষ্টিমারে রওনা হওয়াই চাই, নইলে আমার বেজায় ক্ষতি হবে।"

পাণ্ডাস মুখে শ্রীনাথ বাবু বলিলেন, "আজই?"

সুরেন্দ্রনাথ বলিল, "আজই এই সন্ধ্যার ট্রেনে যেতে হবে।"

শ্রীনাথ বাবু একটু নীরব থাকিয়া বলিলেন, "ইভিকে বলে দেই তবে তার সব গুছিয়ে নেবার জন্যে?"

সুরেন্দ্রনাথ মাথা নাড়িয়া বলিল, "না, সে এখন এখানেই থাকুক, আপনি একটু ভাল হ'লে আশ্বিন মাসে নিয়ে যাওয়া যাবে। আপনি এখন উত্থানশক্তি রহিত, আমি এমন হৃদয়হীন নই যে, আপনার এই অবস্থা দেখে ওকে নিয়ে যাব। আপনাকে দেখবার শোনবার কেউ যদি থাকত, আমি এখুনি ওকে নিয়ে যেতুম।"

জামাতার এই অসাধারণ স্বার্থত্যাগে শ্রীনাথ বাবু একেবারে চমৎকৃত হইয়া গেলেন। তথাপি তিনি বলিলেন, "কিন্তু বাবা, তোমার যে কষ্ট সেই কষ্টই রয়ে গেল। সেই চাকর বামনের হাতেই—"

বাধা দিয়া তাচ্ছিল্য ভাবে মুখ বাঁকাইয়া জামাতা বলিল, "তা হোক একটু কষ্ট। চিরকালই যা' সয়ে আসছি তা আর বেশী গায়ে বাজবে না। আপনি একটু ভাল হোন, আমি খবর পেয়ে নিয়ে যাব এসে।"

কৃতজ্ঞতায় শ্রীনাথ বাবুর চোখে জল আসিয়া পড়িল, কণ্ঠ রোধ হইয়া গেল।

সন্ধ্যার সময়ে অত্যন্ত তাড়াতাড়ি করিয়া সুরেন্দ্রনাথ বিদায় লইয়া চলিয়া গেল।

ইতি তখন রন্ধনগৃহে রন্ধন চাপাইয়া দিয়া উনানের পাশে চুপ করিয়া বসিয়া আগুনের শিখার পানে একদৃষ্টে চাহিয়া ছিল। সে শিখা কেমন নাচিতেছিল, কেমন উঠিতেছিল, আবার নামিতেছিল। কি এক ভাবনায় সে বিভোর হইয়া গিয়াছিল, বাহিরের কথা সে একটাও শুনিতে পায় নাই। সারাদিন সুরেন্দ্রনাথ শ্রীনাথ বাবুর কাছে ছিল বলিয়া সে আজ পিতাকে খাওয়াবার সময় ব্যতীত আর তাঁহার কাছেও যায় নাই।

পরশু তাহাকে চলিয়া যাইতে হইবে। কে জানে কোথায় সে দেশ, কে জানে কেমন তাহার অধিবাসী। দেশ ও অধিবাসী যেমনই হউক তাহাতে তাহার কিছু আসিয়া যায় না। বৃদ্ধ স্থবির পিতা ও বালক ভ্রাতাকে কাহার হাতে সঁপিয়া দিয়া যাইবে তাহা ভাবিয়াই সে আকুল হইতেছিল।

মণি একমুখ হাসি লইয়া দৌড়াইতে দৌড়াইতে আসিয়া একেবারে তাহার গলা জড়াইয়া ধরিল।

সচকিত হইয়া ইতি মুখ ফিরাইল—"ওকি রে? অত আনন্দ কিসের?"

মণি উত্তেজিত কণ্ঠে বলিল, "দিদি, জামাই বাবু চলে গেল!"

বিস্মিতা ইতি বলিল, "চলে গেল?"

মণি বলিল, "হাঁ্যা, চলে গেল।"

ইতি শান্ত চোখে তাহার পানে চাহিয়া বলিল, "কিন্তু আমায় যে নিয়ে যাবার কথা ছিল তার, সে যে আমায় নিয়ে যাবে।"

মণি মাথা নাড়িয়া সবেগে বলিয়া উঠিল, "না, তুমি কখখনো যেতে পাবে না তার সঙ্গে। নিয়ে যাবে—অমনি? সত্যি যদি নিয়ে যেতে চাইত পরশু তোমায়, দেখতে আমি ঢিল দিয়ে তার মাথা ভেঙ্গে দিতুম; রক্তের স্রোত বইয়ে দিতুম।"

ইতি একটু হাসিল; তাহার গায়ে হাত বুলাইয়া দিতে দিতে বলিল, "দূর, ও কথা কি মুখে আনতে আছে রে বোকা? সে যে আমার স্বামী, তাকে ও রকম কথা বলতে নেই। সে যদি এখনি আমায় নিয়ে যেতে চায়, আমায় এখনি যেতে হবে তার সঙ্গে, তা জানিস? তাকে গালাগালি করলে আমার বড্ড লাগে।"

মণি একেবারে মলিন হইয়া গেল, রুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, "কেন—তোমার সঙ্গে বিয়ে হয়েছে বলেই সে তোমার এত আপনার হয়ে গেল? ও যদি তোমায় নিয়ে যেতে চায় এখনি যাবে তুমি, ওকে নিন্দে করলে তোমার বড্ড লাগে। তা হ'লে বল যে আমাদের চেয়েও তাকে বেশী ভালবাস তুমি? আমাদের তা হ'লে দেখতে পার না?"

তাহার কান্না আসিতেছিল, ইতি হাসিয়া তাহাকে কোলে টানিয়া লইল, বলিল, "দূর বোকা, কি যে বলিস কিছু ঠিক নেই তার। তোদের আমি যত ভালবাসি, আর কাউকে কি তত ভালবাসতে পারি? তোদের কাছে কেউ আসতে পারে?"

মণি চোখ মুছিয়া বলিল, "তবে যেতে চাচ্ছিলে কেন?"

ইতি অন্যমনস্ক হইয়া উত্তর করিল, "কর্ত্তব্য বলে, নইলে আর কি।"

ও ঘর হইতে পিতা ডাকিলেন, "ইতি।"

"যাই বাবা—"

তাড়াতাড়ি সে মণিকে কোল হইতে নামাইয়া দিয়া বলিল, একটু বোস ভাই, উনুনের জালটা দিস, আমি চট্ করে শুনে আসি বাবা কিজন্যে ডাকছেন।"

শ্রীনাথ বাবু বিছানার উপর বসিয়াছিলেন। ইতিকে দেখিয়া হর্ষোৎফুল্ল মুখে বলিলেন, "শুনেছিস, সুরেন চলে গ্যাছে?"

ইতি বলিল, "শুনেছি।"

শ্রীনাথ বাবু বলিলেন, "যা হোক মনটা তার খুবই

ভাল। আমার এই অবস্থা দেখে—আমি বলা সত্বেও তোকে নিয়ে যেতে চাইলে না। নাঃ, মানুষের চেহারা দেখে তার হৃদয়টা, প্রকৃতিটা বুঝতে যাওয়া ভারি ভুলের কাজ। বিশ্রী যারা তাদেরও হৃদয় থাকে, সুশ্রী হলেই যে হৃদয় থাকে তা নয়।"

ইতি চুপ করিয়া রহিল।

সে দিন রজনী শেষে যে প্রভাত পৃথিবীর মুখে সুন্দর রং ফলাইয়া দিল, সেরূপ প্রভাতকে ইতি অনেক দিন দেখিতে পায় নাই। আজ ঘুম হইতে উঠিয়া দরজা খুলিয়াই সামনে আলোভরা আকাশের পানে দৃষ্টি পড়িতেই কেমন একটা শান্তিধারায় ইতির প্রাণটা পূর্ণ হইয়া গেল, পাখীর কল-গীতির সঙ্গে আজ তাহার প্রাণও স্বাধীনতার গান গাহিয়া উঠিল।

কাজকর্ম্ম সারিয়া লইয়া সে কলসী লইয়া ঘাটে গিয়া দাঁড়াইল। এ সেই সময় যে সময় সেদিন সে ডুবিয়া মরিতে গিয়াছিল।

একটা নিশ্বাস বাহির হইয়া বায়ু-তরঙ্গে মিশিয়া গেল। সে মুখ ফিরাইয়া পার্শ্ববর্ত্তী জমিদারের বাগানের পানে চাহিল। আজ কেহ সে বাগানে নাই, কমনীয় কলিকাতায় এবং তুষার নিজ কর্ম্মস্থলে চলিয়া গিয়াছে।

কাপড় কাচিয়া জল লইয়া সে বাড়ী ফিরিয়া আসিল।

বৈকালে যখন সে কি কাজের জন্ত পথে বাহির হইয়াছে সেই সময় তাহার বাল্য-সঙ্গিনী সেই মেয়েটির সহিত দেখা হইয়া গেল, যে কয়েক দিন আগে তাহাকে মরিবার জন্ত তীব্র উপদেশ দান করিয়াছিল। মিহিরাকে দেখিয়া আজ সে পলাইয়া গেল না, চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

মিহিরা নিতান্ত অবহেলার ভাবেই পাশ দিয়া যাইতে একবার তাহার পানে চাহিল। আজ ইতির ললাটে সিন্দুর ধক্‌ধক্ করিয়া জ্বলিতেছে, মিহিরা আর অবহেলা করিয়া থাকিতে পারিল না। থমকিয়া দাঁড়াইয়া গালে হাত দিয়া বিস্ময়ের সুরে বলিল, "ও কিলো, সিঁথের সিঁদুর দেখছি যে তোর, এর মধ্যে বিয়ে হ'ল কবে?"

ইতি নরম সুরে বলিল, "পরশু।"

"ওমা, পরশু বিয়ে হয়ে গেল তোর, আমরা তা' কেউ একটু জানতে পারলুম না? খবরটা দিতেও কি এত ভয় হ'ল তোদের? সত্যি আমাদের খাওয়াতে তোদের খরচ কি এতই লাগতো? না হয় খাওয়ার নেমন্তন্ন নাই করলি, বিয়ে দেখার নেমন্তন্নটা করলে তো খরচ হ'ত না, না হয় বিয়েটাই দেখতুম। তোর তো সে ভয় নেই যে তোর বরকে আমরা ভুলিয়ে নেব; আমাদের মত পেত্নীর পানে সে ফিরেও চাইবে না। সত্যি ইতি, তুই আচ্ছা মানুষ বটে ভাই।"

ইতি মুখ নত করিয়া একটু হাসিল, উত্তর দিল না।

মিহিরা বলিল, "তোর বর আছে এখানে তো? তা' চল একবার দেখে যাই।"

ইতি বলিল, "সে চলে গ্যাছে কাল।"

"চলে গ্যাছে?" মিহিরা আরও আশ্চর্য্য হইয়া উঠিল —"তোকে নিয়ে গেল না?"

ইতি বলিল, "না—আমি এখানেই থাকব।"

মিহিরা জিজ্ঞাসা করিল, "তোর শ্বশুরবাড়ী কোথা?"

ইতি মাথা নাড়িয়া বলিল, "জানি নে।"

"জানিস নে?" মিহিরা একটু থামিয়া বলিল, "শ্বশুর-বাড়ী কেউ আছে?"

ইতি উত্তর করিল, "জানি নে।"

মিহিরা বলিল, "ও মা, কিছুই জানিস নে যে। তোর বর কোথায় থাকে, কি করে, নাম কি, কেউ আছে কি না, কিছুই জানিস নে?"

ইতি মাথা নাড়িয়া অন্ত দিকে চাহিয়া বলিল, "আমি যাই ভাই, কাজ আছে।"

মিহিরা বলিল, "দাঁড়া না ভাই, কাজ তো সারাদিনই আছে, করিস'খন খানিক বাদে। আচ্ছা, সত্যি সে কে, কোথা হ'তে এল, কোথা চলে গেল তা কিছু জানিস নে? আচ্ছা, সে যদি কোন জুয়াচোর হয়, যদি অন্ত কোন জাত হয়—"

ইতি বলিল, "শ্যামাপদ জ্যেঠা নিজে বিয়ে দেছেন, জুয়াচোর বা অন্ত জাত কখনও হ'তে পারে না।"

অকস্মাৎ অন্ধকারে আলো পাইয়া মিহিরা বলিয়া উঠিল, "ও সেই লোকটা বুঝি—যে জ্যেঠামশাইয়ের বাড়ী এসেছিল?"

ইতির গম্ভীর মুখ আরও গম্ভীর হইয়া গেল, সে বলিল, "হ্যাঁ।"

পরিহাসের ভাবে মিহিরা বলিল, "আ আমার পোড়া কপাল রে, সেই মোটা ধুমসো লোকটা তোর বর? হ্যাঁরা—কোন্ চোখ দিয়ে দেখে তোর বাবা তার হাতে তোকে দিলে?"

বিমর্ষ মুখে একটু তীব্র কণ্ঠে ইতি বলিল, "তা কি করবেন তিনি? যার টাকা নেই, যে নিজে অথর্ব্ব, লোকে যাকে কথায় কথায় বড় মেয়ে দেখিয়ে সমাজচ্যুত করতে চায়, তার কি চোখ থাকতে পারে? সে যে চোখ থাকতেও অন্ধ মিহিরা!"

মিহিরা বলিল, "তুই তার হাতে নিজকে সঁপে দিলি, এমনই হাসিমুখে, একটা আপত্তিও করলি নে?"

ইতি তেমনই সুরে বলিল, "জলে ডুবে আত্মহত্যা করে মরার চেয়ে এ হাজার গুণে ভাল।"

মুখের উপযুক্ত জবাব পাইয়া মিহিরা চুপ করিয়া গেল, একটু পরে গম্ভীর মুখে বলিল, "কে জানে ভাই, যার যেমন পছন্দ। আমি যাই, মা ডাকছে।"

সে চলিয়া গেল।

(১৭)

সুষমা বারাণ্ডার ধারে বসিয়া নির্নিমেষে কোনও দিক পানে চাহিয়া ছিলেন, নিকটে বসিয়া সুভা চরকায় সুতা কাটিতেছিলেন, আর নিজের মনে বকিতেছিলেন। বকুনিটা তাঁহার স্বাভাবিক, শুভ্রা গিয়া পর্য্যন্ত এ বকুনী আরও বাড়িয়াছে।

সে চলিয়া গিয়াছে আজ দেড় বৎসর। সুভা এখনও তাহার আশা ছাড়িতে পারেন নাই, এখনও তাঁহার বিশ্বাস আছে, সে যেখানেই থাক, একদিন সে আবার তাহার এই কুটিরে ফিরিয়া আসিবে, মা ও পিসিমার স্নেহপূর্ণ চক্ষের আড়ালে লুকাইবার জন্য সে দুই বাহু প্রসারিত করিয়া আবার ছুটিয়া আসিবে। তাই—সুষমা যখন বাড়ী ঘর বেচিয়া কাশী কিম্বা বৃন্দাবনে যাইবার কথা বলিয়াছিলেন, তিনি তীব্র ভাবেই ইহার প্রতিবাদ করিয়াছিলেন।

সুষমার বুকে আর আশার প্রদীপ জ্বলে নাই। স্বামীর সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার উজ্জ্বল আলো নিভিয়া গিয়াছিল, ছিল একটী ক্ষুদ্র প্রদীপ, তাহারই মলিন আলোয় অন্ধকার হৃদয়খানা নিতান্ত অল্প পরিমাণে আলোকিত হইয়া উঠিত মাত্র। কোথা হইতে ভীষণ ঝড় উঠিয়া সেই প্রদীপালোকটিও নিভাইয়া দিয়া গেল। এখন কেবল অন্ধকার—বিরাট, বিপুল, সীমাহীন, শব্দহীন অন্ধকারই তাঁহার ভিতরে—বাহিরে—চারিদিকে।

অনেকক্ষণ কাজ করিয়া চরকা ছাড়িয়া দিয়া সুভা শ্রান্তভাবে বৈকালের দীপ্ত সুনীল আকাশখানার পানে চাহিলেন, একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "কাল না একাদশী বউ?"

চমকাইয়া সুষমা ফিরিয়া তাঁহার পানে চাহিলেন, তখনই চোখ অন্য দিকে ফিরাইয়া বলিলেন, "হ্যাঁ।"

সুভা আবার একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "ঠিক আজকের রাত্রেই হতভাগী চলে গেছল—না বউ?"

সুষমা কথা কহিলেন না।

রুদ্ধ কণ্ঠে সুভা বলিলেন, "তুমি অমন করে শুধু আকাশ পানে চেয়ে বসে থেক না বউ, যা' হয় দুটো কথা বল। তোমার অত কথা, অমন হাসি আজ দেড় বছর হ'তে কোথা চলে গ্যাছে। লোকজন কেউ আসলে তুমি ছুটে ঘরের মধ্যে লুকাও। এ রকম একভাবে থাকলে তুমি আর বাঁচবে না যে।"

শান্ত কণ্ঠে সুষমা বলিলেন, "কি কথা বলব ঠাকুরঝি, কথা বলবার মত কি আছে আমার বল দেখি? আর বাঁচা মরার কথা বলছ? ভয় নেই, আমি মরব না। আমার মত স্ত্রী যারা, আমার মত মা যারা, তারা শীগগির মরে না, সকলের পরেই তারা মরে থাকে।"

সুভা একটু নীরব থাকিয়া বলিলেন, "দাদার যেন ডাক এসেছিল তাই তিনি চলে গেলেন। মরণের ডাক কো কেউ এড়াতে পারে না, কিন্তু এ সর্ব্বনাশী কার ডাকে চলে গেল বউ?"

সুষমা বলিলেন, "ধ্বংসের।"

সুভা অঞ্চলে চোখ মুছিয়া বলিলেন, "আর কোথাও দিয়ে শান্তি পাওয়া যায় না, একমাত্র মরণের কোলে সঁপে

দিয়ে শান্তি পাওয়া যায়। এবং মরণের খবরটা পেলেও যে শান্তিতে থাকতুম। সে যে বেঁচে আছে, নরকের তাণ্ডব-নৃত্যে সে আত্মহারা হয়ে আছে, এ কথা ভেবে যে কোনও মতে শান্তি পাচ্ছিনে বউ! হয় তো সে এখন নিজের ভুল বুঝতে পেরে ঘরে আসতে চায়, আমাদের বুকের মধ্যে লুকিয়ে পড়তে চায়, কিন্তু তার সেই নরকের সঙ্গীরা তাকে আসতে দিচ্ছে না। সে হয় তো আছড়ে পড়ে হাহাকার করে কাঁদছে—"

তাঁহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল, তিনি নত মুখে চোখের জল মুছিতে লাগিলেন।

সুষমা তাঁহার পানে খানিক চাহিয়া রহিলেন, তাহার পর মাথা নাড়িয়া গম্ভীর মুখে বলিলেন, "ভুল—ঠাকুরঝি, ওইটেই বুঝতে, আমাদের মহা ভুল হয়েছে। সে আসতে চায়, সে আছড়ে পড়ে কাঁদে, এটা আমাদেরই মনগড়া কথা মাত্র, তুমি তার জন্যে ভেবে মরছ, কেঁদে মরছ, কিন্তু সে দিব্য আনন্দে দিন কাটিয়ে দিচ্ছে।"

সুভা বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলিলেন, "তুমি কি মনে কর বউ, তার মন চঞ্চল হয়ে ওঠে না, সে তার চিরপরিচিত এই ঘর দুয়ার, এই মা পিসীমার কথা একটী বার ভাবে না, সে একবারও কেঁদে ওঠে না?"

সুষমা বলিলেন, "না, আমি বেশ জানি সে একবারও আমাদের কথা, এই ঘর বাড়ীর কথা ভাবে না।"

আর্ত্তকণ্ঠে সুভা বলিয়া উঠিলেন, "তুমি না তার বউ? কেমন করে কোন্ মুখে এ কথা বলছ? একবার বল—একবার আমার মনের কথা মিলিয়ে কথা বল; বল, সে কাঁদছে—বল, সে আসতে চায়।"

সুষমা শান্তস্বরে বলিলেন, "এই জীবন্ত মিথ্যা কথাটাকে আমি সত্য করে গড়তে পারব না ঠাকুরঝি। তার কথা এখন মনে ভাবাই অন্যায়। সে চলে গ্যাছে—সেই খানেই থাক সে। আমার কথায় চিরজন্ম সে সেখানে থাক, জন্ম জন্ম সে সেখানে থাক, আর তাকে আমার কাছে যেন না আসতে হয়, তার মা-ডাক আমায় যেন কানে শুনতে না হয়।"

সুভা হাঁ করিয়া সুষমার পানে চাহিয়া রহিলেন, তাহার পর বলিলেন, "যদি সে ফিরে আসে, যদি সে তোমায় মা বলে ডাকে—"

সুষমা বলিলেন, "আমার কাছে আর সে আসতে পাবে না, সে অধিকার হ'তে সে বঞ্চিতা হয়েছে।"

সুভা একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "কিন্তু আমি তা' পারব না বউ, আমি তাকে বুকে তুলে নেব। সে বড় জ্বালায় অধীর হয়ে যখন ছুটে আসবে, তখন তাকে আমি তাড়িয়ে দিতে পারব না। আমি শুধু সেই দিনটীর প্রত্যাশাতেই বেঁচে আছি বউ, সেই দিনকেই আমি প্রার্থনা করছি। গ্রামের সকল লোকের কাছে মাথা নুইয়ে প্রার্থনা করছি, সে কোথা আছে শুধু সেই খবরটা আমায় এনে দেবার; আমি খবর পেলে নিজে সেখানে যাব, সে যদি এখনও পাপে ডুবে থাকে, আমি তাকে উদ্ধার করবো। তুমি না নাও নিয়ো না তাকে, আমি তাকে সন্ন্যাসিনী সাজিয়ে সঙ্গে করে তীর্থে তীর্থে বেড়াব। আমি তাকে এমন করে গড়ে তুলব বউ, তুমি তখন দেখে তাকে চিনতে পারবে না।"

সুষমা চুপ করিয়া রহিলেন। অনেকক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিলেন, "আমি কাশী যাব ঠাকুরঝি, সপ্তাহ বাদে মিত্র বাবুরা কাশী যাচ্ছেন, আমিও তাঁদের সঙ্গে যাব।"

সুভা বলিলেন, "তোমার ইচ্ছে।"

কথা বার্ত্তা এইখানেই থামিয়া গেল। দুর্ব্বিনীতা ভ্রাতৃবধূর উপর অত্যন্ত রাগ করিয়াই সুভা চরকা উঠাইয়া রাখিয়া পাড়ায় বাহির হইয়া গেলেন।

সন্ধ্যার পরে বাড়ী ফিরিয়া তিনি যেরূপ ব্যস্তভাবে কাপড় গুছাইতে লাগিলেন, তাহাতে সুষমা বিস্মিতা হইয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু সুভা কোনও কথা না বলায় তিনিও সাহস করিয়া জিজ্ঞাসা করিতে পারিলেন না।

দ্রুত হাতে একটা কাপড়ের বোঁচকা বাঁধিয়া, খানকত নোট অঞ্চলে বাঁধিয়া সন্তর্পণে লুকাইয়া সুভা গীতাপাঠরতা ভ্রাতৃবধূর নিকট আসিয়া দাঁড়াইলেন, সুষমা একবার মুখ তুলিয়া তাঁহার পানে চাহিয়া আবার পাঠে মনোযোগ দিলেন।

সুভা বলিলেন, "একটা দরকারের জন্য আমি আজই অন্য দেশে চললুম বউ, তিন চার দিন বাদেই ফিরব।

কাশী যেতে হয়, আমি ফিরলে তাঁর পরে যেয়ো। আমি যে পর্য্যন্ত না আসি, সে পর্য্যন্ত যদি একা থাকতে তোমার ভয় হয়, তবে নিতাইয়ের পিসীকে ঘরে নিয়ে শুয়ো, আমি তাকে না হয় বলে দিয়ে যাচ্ছি।"

বিদ্রোহী ভ্রাতৃবধূ বলিয়া উঠিলেন "না—কাউকে বলতে হবে না, আমায় কারও দেখবার দরকার নেই।"

সুভা বিরক্ত ভাবে বলিলেন, "তাই ভাল।"

তিনি চলিয়া গেলেন। হাতের গীতা হাতেই রহিয়া গেল, সুষমা শক্ত কাঠের মত বসিয়া একদিকে চাহিয়া রহিলেন।

সুভা যে এমন ব্যস্ত ভাবে কোথায় চলিয়া গেলেন তাহা সুভা না বলিলেও তিনি জানিতেন। আজই প্রমথ মিত্রের বড় ছেলে বঙ্কিম তাঁহাকে জানাইয়াছিল শুভ্রাকে সে মুঙ্গেরে দেখিয়া আসিয়াছে। সে দগ্ধ মাতৃ-হৃদয়কে বড় আঘাত করিয়া ইহাও বলিয়াছে, শুভ্রার নাম এখন গাঙ্গে বানু। সে নৃত্য ও গানের দ্বারা নিজের জীবিকা অর্জ্জন করিতেছে ও মহা স্ফূর্ত্তিতে আছে।

আর্ত্তকণ্ঠে হঠাৎ তিনি কাঁদিয়া উঠিলেন—"ভগবান—ভগবান তোমার রাজ্যে কি বিচার নেই, তোমার অস্ত্র বজ্র কি আজ ঘুমিয়ে আছে নাথ? সে যে বিধবা—ওগো সে যে হিঁদুর ঘরের মেয়ে—এখনও তাকে বাঁচিয়ে রেখেছ? এতে তোমার কি মঙ্গল উদ্দেশ্য সাধন হবে প্রভু?"

মূর্চ্ছিতার ন্যায় তিনি পড়িয়া রহিলেন।

সারারাত কাটিয়া গেল, প্রভাত আসিল। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া তিনি আবার উঠিলেন, আবার কাজ করিলেন। দিন কাটিল, রাতও কাটিয়া গেল, এমনি করিয়া তিন চার দিন কোথায় চলিয়া গেল।

দারুণ উদ্বেগে বুক কাঁপিতেছিল, যদি সে আসিয়া পড়ে। যদি সে আসিয়া তাঁহার পা দুখানি জড়াইয়া ধরিয়া চোখের জলে সিক্ত হইয়া মা বলিয়া ডাকে? হৃদয় যে গলিয়া যাইবে তখন, স্নেহের ধারা গড়াইয়া পড়িবে যে পতিতার উপরে। তিনি যে মা, তিনি আর কেহ নহেন।

চৈত্রের রৌদ্রতপ্ত দুপুরে মেঝেয় মাদুর পাতিয়া শুইয়া পড়িয়া তিনি ঘুমাইবার চেষ্টা করিতেছিলেন, কিন্তু কোথায় ঘুম? এই সব কথাই তাঁহার মনে জাগিয়া উঠিতেছিল। ছোট বেলা হইতে আজ পর্য্যন্ত সব দিনগুলি তাঁহার চোখে স্পষ্ট হইয়া উঠিল, পিতা মাতার স্নেহ, ভাই ভগিনীর ভালবাসা, স্বামীর প্রণয়, সকলের উপরে শ্রেষ্ঠ আসন পাইল অপত্যস্নেহ। মায়ের তুল্য গর্ব্বপূর্ণ পদ জগতে আর কি থাকিতে পারে? যে আসিয়া মাতাকে এই দেবীর আসনে প্রতিষ্ঠিত করে, তাহার 'পরে মায়ের ক্রোধ থাকে কতক্ষণ? ওরে অকৃতজ্ঞ সন্তান, তোরা মাতাকে অবহেলা করিতে পারিস, তোদের কথায় সেই স্নেহপূর্ণ হৃদয়কে দগ্ধ করিতে পারিস, কিন্তু সে স্নেহ সাগর তবু তো শুখাইয়া যাইবে না। তোদের অবহেলা মায়ের বক্ষে বিঁধিলেও মা যে তোদেরই মা, তোদেরই পানে চাহিয়া তাঁর বাঁচিয়া থাকা।

সে আবার আসিবে, সকল ঘৃণা, লজ্জা, সঙ্কোচ, কুণ্ঠা, বিসর্জ্জন হইয়া গেল—একটী বাণী মাতৃ-হৃদয়ে জাগিয়া রহিল সে আসিবে, পতিতা সে, তাহার সে পাপ ধুইয়া যাইবে শুধু নয়ন জলে।

প্রাঙ্গণের বড় দরজাটা বন্ধ ছিল, মনে হইল কে যেন দরজায় দু'বার আঘাত করিল। সুষমার প্রাণ ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল, একটী আহ্বানের আশায় তিনি উৎকর্ণে দ্বার পানে চাহিয়া রহিলেন।

বাহিরে কাহার ক্ষীণ কণ্ঠ শুনা গেল—"বউ।"

তাড়াতাড়ি সুষমা উঠিয়া পড়িলেন দ্রুতপদে গিয়া দ্বার খুলিয়া দিলেন।

দ্বারের পার্শ্বে বসিয়া সুভা! তাঁহার মুখ আরক্ত, চোখ রক্তজবা তুল্য, সমস্ত দেহ থর থর করিয়া কাঁপিতেছে।

"ঠাকুর-ঝি—"

অবনত মস্তক প্রাণপণে তুলিয়া সুভা রুদ্ধ কণ্ঠে বলিলেন, "অনেক কষ্টে এসে পড়েছি বউ, আর উঠবার ক্ষমতা নেই, আমায় ঘরে নিয়ে চল।"

মনের মধ্যে যে কথা জাগিতেছিল, তাহা চাপা দিয়া সুষমা বলিলেন, "আমার কাঁধে ভর দাও ঠাকুরঝি, ঘরে চল।"

অতি কষ্টে সুভাকে বহন করিয়া আনিয়া তিনি তাঁহাকে শয্যায় শয়ন করাইয়া দিলেন। সুভা খানিকক্ষণ হাঁফাইতে

লাগিলেন। নিস্তব্ধে মাথার কাছে বসিয়া সুষমা তাঁহাকে বাতাস করিতেছিলেন।

প্রায় আধঘণ্টা পরে তন্দ্রার আবেগ কাটাইয়া সুভা বলিলেন "জিজ্ঞাসা করলি নে বউ আমি কোথায় গেছলুম?"

নিশ্বাস চাপিয়া সুষমা বলিলেন, "আমি তা' জানি ঠাকুরঝি।"

"জানো!—সুভা জোর করিয়া উঠিতে গেলেন, সুষমা তাঁহাকে উঠিতে না দিয়া বলিলেন, "উঠতে হবে না ঠাকুরঝি, উঠ না।"

সুভা আবার শুইয়া পড়িয়া হাঁফাইতে হাঁফাইতে বলিলেন, "কই, তবু তো জিজ্ঞাসা করলি নে—কেন সে এল না?"

সুষমা উদাস ভাবে বলিলেন, "আমি তো এ বরাবরই জানি, এতে বেশী আঘাত লাগবার বা বিস্ময় করবার মত কিছু নেই। বাইজি বাবু তার উজ্জ্বল আলোময় ঘর, গান বাজনা, ইয়ারকি, অজস্র বাহবা ফেলে এই নিরানন্দ অন্ধকার কুটিরে ফিরে আসবে? আমি তবুও যে আশা করেছিলুম তার জন্যে নিজেকেই নিজে ধিক্কার দিচ্ছি। আমি বরাবর ভাঙ্গিনি, কখনও ভাঙ্গবও না। কিন্তু তুমি কেন এ রকম অধীর হচ্চ ঠাকুরঝি, তুমি কেন এত ভেঙ্গে পড়লে?"

কাঁদিয়া সুভা বলিলেন, "কেন? কেন তা' আমিই যে জানিনে বউ, শিশু বেলায় আমিও বিধবা, ভগবান সাক্ষী, এ পর্য্যন্ত নিজের ব্রত আমি নিয়মমত পালন করেই এসেছি। যখন সে বিধবা হ'ল, ভাবলুম আমার শিক্ষা তাকে দিয়ে তাকে আমার চেয়েও উঁচুতে তুলব। কিন্তু কি হ'ল বউ, কি গড়তে কি গড়লুম আমি? যাকে দেবীর আসনে দেখব ভেবেছিলুম, তাকে দেখলুম কোথায়? সে গান গাচ্ছে সে দেহ বিক্রয় করেছে, বিনিময়ে সে আজ বড় লোক। দেখা করতে চাইলুম, একবার চোখের দেখা দিল না, লুকিয়ে পালিয়ে গেল। বউ, আমি অভিশাপ দিয়ে এসেছি, আমি কেঁদে চীৎকার করে বলে এসেছি, ভগবান! এর যেন সত্য বিচার হয়। আর কি বলব, আর কি করব? অনুতাপে দগ্ধ হয়ে সে আজীবন পুড়ে মরুক, পুড়ে মরুক, পুড়ে মরুক।"

তিনি মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন।

দুরন্ত টাইফয়েডকে কোনও মতে নিবারণ করিয়া রাখিতে পারা গেল না। সুষমার প্রাণান্ত যত্ন, ডাক্তারের চিকিৎসা সব ব্যর্থ করিয়া মৃত্যু আসিয়া একদিন এই আজন্ম ব্রহ্মচারিণী যুবতীর প্রাণটুকু হরণ করিয়া দাবদগ্ধ দেহখানাকে একেবারেই শীতল করিয়া দিয়া গেল।

মৃতা ননদিনীর পার্শ্বে পড়িয়া সুষমা অস্ফুটে স্বামীকে ডাকিয়া ক্ষুদ্র বালিকার ন্যায় কাঁদিতে লাগিলেন।

এবার যথার্থই তাঁহার সংসারের সহিত সকল সম্পর্ক ঘুচিয়া গেল, এবার যথার্থই তিনি সংসার ত্যাগ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

সুভার শ্রাদ্ধ শেষ করিয়া, ঘর বাড়ী সব বিক্রয় করিয়া গ্রামের সহিত সকল সম্পর্ক মিটাইয়া একদিন সুষমা পরম তীর্থ কাশীতে যাত্রা করিলেন। আজ তিনি যথার্থ সন্ন্যাসিনী, নিজের বলিতে জগতে আজ তাঁহার কেহই নাই।

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত।

চাঁদপ্রতাপের ব্রত-কথা।

[শ্রীযোগেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী]

(১১) আকুলী সুকুলী।

বিপদ হইতে উদ্ধার পাইবার মানসে মহিলাগণ এই ব্রত করিয়া থাকেন। অকূল পাথারে পড়িয়া এই ব্রত মানস করিলে বিপন্মুক্ত হওয়া যায় ও সুকূল (সুখ সৌভাগ্য) লাভ হয়, ইহাই হিন্দুললনাগণের দৃঢ় বিশ্বাস। বিপদ হইতে ত্রাণ পাইবার পর ব্রত না করিলে পুনরায় বিপন্ন হইতে হয়, ইহাও তাঁহারা মনে করিয়া থাকেন। মানস না করিয়াও বিবাহাদি শুভ কর্ম্মের পর কেহ কেহ এই ব্রত করিয়া থাকেন বলিয়া শুনা যায়।

যে-কোন মাসের যে-কোন বারে দিবাভাগে এই ব্রত করা হয়। এই ব্রতে অর্থব্যয় অতি সামান্যই হইয়া থাকে। কতকটি পান ও সুপারি, কতকটা খয়ের ও চুণ, কিছু তৈল ও সিন্দুর ও কিয়ৎ পরিমাণ বাতাসা কিংবা অন্য কোন প্রকার মিষ্ট সামগ্রী পূর্ণ একখানি পাত্র হস্তে লইয়া, নিজ বাড়ীর ও প্রতিবেশিনী মহিলাদিগকে ডাকিয়া সঙ্গে লইয়া ব্রতিনী পুকুর-ঘাটে যাইয়া হস্তস্থিত পাত্রটি নিকটস্থ পবিত্র স্থানে নামাইয়া রাখিয়া 'কথা' বলিয়া থাকেন। ব্রতিনী নিজে 'কথা' না জানিলে অপর মহিলাকেই তাহা বলিতে হয়। 'কথা' শেষে ব্রতিনী ভক্তিপ্লুত মনে যথাজ্ঞানে আকুলী ও সুকুলী দেবীকে উপকরণাদি নিবেদন করিয়া দিয়া থাকেন। পরে সকলে মিলিয়া হুলুধ্বনি করিয়া উদ্দেশে দুই দেবীকে প্রণাম করিয়া থাকেন। তৎপর ব্রতিনী উপকরণাদি হস্তে লইয়া, সকলের সহিত বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া, নিজ হস্তে সধবাদিগের সিঁথিতে কপালে সিন্দুর দিয়া, হাতে পান, সুপারি প্রভৃতি দেন। ললনাগণ পুনরায় হুলুধ্বনি করিয়া নিজ নিজ বাড়ী গমন করিয়া থাকেন।

শাস্ত্রে এই ব্রতের উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। 'কথা'য় আকুলী ও সুকুলী দেবী জগজ্জননী ভগবতী দেবীর কন্যা বলিয়া উল্লিখিত। এ ব্রতে পুরোহিতের আবশ্যক হয় না। নিম্নশ্রেণীর হিন্দু রমণীদিগকে এই ব্রত করিতে বড় একটা দেখা যায় না।

'কথা'—সকল দেব দেবীই মর্ত্ত্যলোকে পূজা পাইয়া থাকেন; কিন্তু আকুলী ও সুকুলী দেবীর অর্চ্চনা নরলোকে হয় না। তাঁহারা দুই ভগ্নী যে দেবী ভগবতীর কন্যা ও তাঁহাদের মাহাত্ম্যও যে অপরাপর দেব-দেবী অপেক্ষা কোন অংশে কম নয়, তাহা এমন কি, তাঁহাদের নাম পর্য্যন্তও মনুষ্যমাত্রেই অবগত নহে। এই কারণে তাঁহারা বড়ই দুঃখিত।

একদিন তাঁহারা এ বিষয়ে পরামর্শ করিয়া কোন উপায়ই স্থির করিতে পারিলেন না। অবশেষে তাঁহারা মা জগদম্বার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে এ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলেন। ইহার উত্তরে তিনি বলিলেন,—"মনুষ্যলোকে এক অতি দরিদ্র ধর্ম্মপরায়ণ ব্রাহ্মণ আছেন। তোমরা সেই ব্রাহ্মণ ও তাঁহার স্ত্রীর মনে কোন উপায়ে তোমাদের প্রতি ভক্তি জন্মাইতে পারিলে ব্রাহ্মণ-পত্নী তোমাদিগকে অর্চ্চনা করিবে এবং সেই সময় হইতেই তোমরা নরলোকে পূজা পাইতে থাকিবে।" ইহা বলিয়া তিনি তখনই তাঁহাদিগকে সেই ব্রাহ্মণের নাম ধাম বলিয়া দিলেন। তাঁহারা সত্বরই ছদ্মবেশ ধারণপূর্ব্বক মর্ত্ত্যলোকে সেই ব্রাহ্মণের বাড়ীর দিকে যাত্রা করিলেন।

একদিন দিবা দ্বিপ্রহরের পর সেই ব্রাহ্মণ আহার করিয়া বিশ্রামের ইচ্ছায় গৃহে প্রবেশ করিবার সময় দুইটি পরম রূপলাবণ্যবতী রমণী তাঁহার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদিগকে দেখিয়া তিনি বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে আপনারা? কোথা হইতে এবং কি জন্যই বা এই দরিদ্র ব্রাহ্মণের বাটীতে এমন সময় পদার্পণ করিয়াছেন?" ইহার উত্তরে আগন্তুকদের একজন কোমল কণ্ঠে বলিলেন,—"আমাদের বিশেষ পরিচয়ের আবশ্যক নাই; আমরা অতিথি। ক্ষুধায় ও পথশ্রমে কাতর হইয়া, বৃথা বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া, অবশেষে তোমার বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। শীঘ্র আমাদের আহারের বন্দোবস্ত করিয়া দাও। ক্ষুধার জ্বালায় আমরা অস্থির। শুনিলাম যে, তুমি পরম ধার্ম্মিক; অতিথি-সৎকার করিয়া পুণ্য অর্জ্জন কর।" ব্রাহ্মণ তাঁহাদিগকে দেখিয়াই বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে তাঁহারা যে-সে নারী নহেন। তিনি বিনীতভাবে বলিলেন,—"আপনারা যখন এই দরিদ্রের বাটীতে পদার্পণ করিয়াছেন, তখন সাধ্যানুসারে আপনাদের সেবা করিয়া কৃতার্থ হইব। আপনারা বারেন্দায় উঠিয়া বসুন।" এই বলিয়া তিনি তাঁহাদিগকে বারেন্দায় দুইখানা আসনে বসাইয়া, রান্নাঘরের সম্মুখে যাইয়া দেখিতে পাইলেন যে, অন্ন ব্যঞ্জনাদি সাজাইয়া ব্রাহ্মণী নিজের আহারের উদ্যোগ করিতেছেন। তখন তিনি তাঁহার স্ত্রীকে বলিলেন,—"দুইটী অতিথি উপস্থিত। অতএব আগে এই অন্ন-ব্যঞ্জনাদি দ্বারা অতিথি ভোজন হউক। পরে তুমি রান্না করিয়া আহার করিও।" গৃহিণী এ প্রস্তাবে অসন্তুষ্ট হইলেন; কিন্তু স্বামীর কথায় কোন প্রতিবাদ না করিয়া

স্বীয় আহার্য্য দুইখানা থালায় সাজাইতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণ অতিথিদিগকে গৃহের মধ্যে লইয়া দুইখানা আসনে বসাইলেন। ব্রাহ্মণী তাঁহাদিগকে পরিবেশন করিতে লাগিলেন। অন্নে হাত দিয়াই অতিথিদের একজন ব্রাহ্মণীকে বলিলেন, —"কিছু গরম ভাত নিয়া আইস; এগুলি বড়ই ঠাণ্ডা।" ইহা শুনিয়া ব্রাহ্মণী কহিলেন,—"হাঁড়িতে ভাত আর নাই। এখন রান্না না করিলে গরম ভাত মিলিবার আর উপায় নাই। আপনারা আহারে বসিয়াছেন ও ক্ষুধায় কাতর হইয়া পড়িয়াছেন। অতএব, এই অন্নই ধীরে ধীরে আহার করিতে থাকুন; আমি শীঘ্রই আবার ভাত রাঁধিয়া দিই।" এ কথার উত্তরে সেই রমণী বলিলেন,—"আর রান্না করিতে হইবে না। হাঁড়িতেই গরম ভাত আছে, নিয়া আইস।" ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণী ইহা শুনিয়া আশ্চর্য্য বোধ করিলেন ও যন্ত্র চালিতের ন্যায় রান্নাঘরে যাইয়া দেখিতে পাইলেন যে, বাস্তবিকই হাঁড়িভরা ভাত রহিয়াছে। ব্রাহ্মণী ভাতে হাত দিয়াই বুঝিতে পারিলেন যে, উহা বেশ গরম; যেন এইমাত্র রান্না করা হইয়াছে। ইহাতে তাঁহারা উভয়েই আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। সেই অন্ন তাঁহাদিগকে পরিবেশন করা হইল। তাঁহারা আহার করিতে লাগিলেন। ভোজনকালে তাঁহারা নানারূপ তরকারি, দধি, দুগ্ধ, মিষ্টান্ন ইত্যাদি চাহিয়া ব্রাহ্মণীকে রন্ধনগৃহে পাঠাইতে লাগিলেন। তিনিও সেই সমুদায় দ্রব্য ঘরে রহিয়াছে দেখিতে পাইয়া বিস্মিত হইলেন ও সমস্ত দ্রব্যই পরিবেশন করিয়া অতিথিভোজন করাইলেন। তাঁহারা আহার-অন্তে আচমন করিয়া বারান্দায় বসিয়া তাম্বুল চর্ব্বণ করিতে লাগিলেন।

এইরূপ অলৌকিক ব্যাপার দেখিয়া ব্রাহ্মণ ও তাঁহার স্ত্রীর বিস্ময়ের সীমা রহিল না। তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন যে, এই দুই অতিথি নিশ্চয়ই মানবী নহেন; ছদ্মবেশে দুই দেবী তাঁহাদের আতিথ্য স্বীকার করিয়া তাঁহাদিগকে কৃতার্থ করিয়াছেন। ব্রাহ্মণ বিনীত ভাবে তাঁহাদিগকে বলিলেন, —"আপনারা দয়া করিয়া আপনাদের প্রকৃত পরিচয় প্রদানে আমাদিগের বিস্ময় দূর করুন।" ইহা শুনিয়া অতিথিদের একজন বলিলেন,—"ব্রাহ্মণ, আমরা দুই ভগিনী দেবী ভগবতীর কন্যা। আমাদের নাম আকুলী ও শুকুলী দেবী।" তাঁহাদের পরিচয় পাইয়া ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণী সাষ্টাঙ্গে তাঁহাদিগকে প্রণাম করিলেন। ব্রাহ্মণ নিজেদের দুঃখ দুর্গতি দূর করিয়া দিবার জন্য তাঁহাদের নিকট প্রার্থনা করিলেন। আকুলী দেবী বলিলেন,—"ভক্তি সহকারে আমাদের পূজা করিলে, ও চিরকাল আমাদের প্রতি তোমাদের শ্রদ্ধা থাকিলে তোমরা আজীবন সুখে থাকিবে।" ব্রাহ্মণী ব্রতের নিয়মাদি জিজ্ঞাসা করায় শুকুলী দেবী তাঁহাকে তাহা সবিস্তার বলিয়া দিলেন। আবার তাঁহাদের প্রণাম গ্রহণ করিয়া দেবীরা অন্তর্হিতা হইলেন।

যথ সময় ব্রাহ্মণী ব্রত করিলেন। তিনি স্বামী-পুত্রাদি সহ সুখে স্বচ্ছন্দে কালযাপন করিতে লাগিলেন।

এক প্রতিবেশিনী নারী ব্রাহ্মণীর প্রথম ব্রতের দিন তাঁহার আহ্বানে ব্রতস্থানে না যাওয়ার পরই হইতেই কঠিন রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়েন। ব্রত স্থানে না যাওয়ায় বড়ই অন্যায় হইয়াছে ও দেবীদিগের কোপেই রোগ-যাতনা ভোগ করিতে হইতেছে মনে করিয়া, বধূ ব্রত মানস করিলেন। ইহার পরই তিনি রোগ-মুক্ত হইলেন ও ভক্তি সহকারে ব্রত করিলেন।

দেবীদের মাহাত্ম্য অবগত হইয়া দরিদ্র গৃহস্থ ললনাগণ ব্রত করিতে লাগিলেন; কিন্তু ধনী গৃহের রমণীরা দেখিয়া শুনিয়াও এ ব্রত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন না। ইহাতে দেবীরা চিন্তিত হইলেন ও উভয়ে পরামর্শ করিয়া এক উপায় স্থির করিলেন।

একদিন এক সওদাগর বাণিজ্য করিয়া দেশে ফিরিলেন। ধন-রত্নাদি পূর্ণ নৌকা নদীর ঘাটে লাগান হইল। তাহার আগমনবার্ত্তা বাড়ীতে পাঠান হইল। এই সুসংবাদ পাইয়া সওদাগরের স্ত্রী আহ্লাদিত মনে অন্যান্য মহিলাগণের সহিত ঘাটের দিকে গমন করিলেন। তিনি ঘাটে উপস্থিত হইবামাত্রই সওদাগর, মাঝী-মাল্লা ও জিনিস পত্রাদি সহ নৌকাখানি জলমগ্ন হইল। ইহা দেখিয়া সওদাগরের স্ত্রী কাঁদিয়া আকুল হইলেন। সকলেই ভাবিল যে, বিনা মেঘে বজ্রপাত হইল। বিনা বাতাসে যে কিরূপে নৌকাখানি জলে ডুবিয়া গেল, তাহা কেহই বুঝিতে পারিল না। খবর পাইয়া অনেকেই সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং

সকলেই যথাসাধ্য চেষ্টাও করিল; কিন্তু কেহই সওদাগর প্রভৃতিকে উদ্ধার করিতে পারিল না। এমন সময় দৈববাণী হইল,—সওদাগরের পত্নী আকুলী ও সুকুলী দেবীর ব্রত মানস করিলে সওদাগর ও মাঝী প্রভৃতি সহ নৌকা আপনিই ভাসিয়া উঠিবে। দৈববাণী শ্রবণ করিয়া সওদাগরের স্ত্রী ব্রত মানস করিলেন। দেখিতে দেখিতে নৌকা খানা ভাসিয়া উঠিল। নৌকায় উপবিষ্ট সওদাগর স্বীয় স্ত্রীকে দেখিতে পাইয়া, আনন্দিত মনে তীরে পদার্পণ করিয়া, তাহার সম্মুখীন হইয়া হাসিমুখে তাহাকে কুশল প্রশ্নাদি করিলেন পত্নী পতিকে পাইয়া ও তাহার চরণে প্রণাম করিয়া পরম প্রীতিলাভ করিলেন। সওদাগর স্বীয় স্ত্রী ও অন্যান্য সকলের সহিত আনন্দে বাড়ী পঁহুছিলেন।

সত্বরই সওদাগরের স্ত্রী খুব ঘটা করিয়া ব্রত করিলেন। সওদাগর স্ত্রী পুত্রাদি সহ সুখে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন।

এইরূপে ধনী গৃহের মহিলাগণও এই ব্রত করিতে লাগিলেন।

কর্ম্মকার জাতি সম্বন্ধে কিম্বদন্তী *

[শ্রীপ্রিয়লাল দাস, এম্‌-এ, বি-এল্‌]

গত বৎসর বঙ্গীয় কর্ম্মকার সম্মিলনীর একবিংশ বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষে আমি গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা করিবার বিধি অনুসরণ করিয়া 'বাঙ্গালার ইতিহাসে কর্ম্মকার শিল্পীর স্থান" শীর্ষক প্রবন্ধে আপনাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণের গুণকীর্ত্তন করিয়া স্বজাতি-নারায়ণের অর্চ্চনা করিয়াছিলাম। আমার হৃদয়ের অভিলাষ কিন্তু তাহাতে পূর্ণ হয় নাই। সেই জন্য অদ্য আমি পঞ্চোপকরণে আপনাদিগের পূজা করিব মনে করিয়াছি। সূচনাতেই বলা উচিত যে, আমার নৈবেদ্য পঞ্চরত্নে প্রস্তুত নহে। "নীলকং বজ্রকঞ্চেতি পদ্মরাগশ্চ মৌক্তিকং। প্রবালং চেতি বিজ্ঞেয়ং পঞ্চরত্নং মনীষিভিঃ॥" হীরক, মুক্তা, নীলকান্ত, পদ্মরাগ, প্রবাল, এই পঞ্চরত্নমণি সংগ্রহ করিয়া দেবতার উদ্দেশে অর্পণ করা আমার মত অকৃতী সেবকের সাধ্যাতীত। কর্ম্মকার জাতি ধাতু শিল্পের জন্মদাতা আর সেই কারণেই আমি আপনাদিগকে পঞ্চলোহ নিবেদন করিয়া দিতে সাহসী হইয়াছি। সুবর্ণ, রজত, তাম্র, রঙ্গ, সীসক, এই পঞ্চধাতুর নাম পঞ্চলোহ। এই সকল ধাতুর সহিত কর্ম্মকার জাতির উৎপত্তি ও অন্যান্য বিষয় কিম্বদন্তীর কৃপায় বহুকাল হইতে সুন্দরভাবে জড়িত হইয়া রহিয়াছে। কিম্বদন্তী ইতিহাস নহে, ইতিহাসের উপকরণ মাত্র। তাহা হইলেও "নহ্য মূলা জনশ্রুতিঃ।" লোকপরম্পরায় যাহা শ্রুত হইয়া থাকে তাহার মূলে কিছু সত্য থাকিতে পারে। কিম্বদন্তীর প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে যেখানে প্রমাণের অভাব আছে সে স্থলে কিন্তু বুঝিতে হইবে যে তাহা অলীক ও কল্পিত কথা। কর্ম্মকার জাতি সম্বন্ধে যে সকল কিম্বদন্তী সংগ্রহ করিয়াছি সেগুলি বিশেষভাবে আলোচনা করিবার সুযোগ যে পাইয়াছি তাহা আমি বলিতে পারি না। হিন্দুশাস্ত্র সমুদ্র মন্থন করিলে হয়ত কতকগুলি কিম্বদন্তী সম্বন্ধে উপাদেয় তথ্য অবগত হওয়া যায়। আমি আপাততঃ এই প্রবন্ধে যতটা সম্ভব প্রামাণিক কিম্বদন্তীমূলক তথ্যের আলোচনা করিব।

কর্ম্মকার জাতির উৎপত্তি।

সুবর্ণাদি পঞ্চধাতুর সহিত কর্ম্মকার জাতির উৎপত্তির ইতিহাসের একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। 'আমরা বংশপরম্পরায় শুনিয়া আসিতেছি যে পুরাকালে লোহাসুর নামে দৈত্য কষ্টসাধ্য তপস্যা দ্বারা অমরত্ব লাভ করিয়া দেবতাদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়। দেবরাজ ইন্দ্র যুদ্ধে পরাজিত হইয়া মহাদেবের নিকট গমন করেন। ইন্দ্র লোহাসুরের অত্যাচার হইতে দেবগণকে রক্ষা করিবার জন্য

* বঙ্গীয় কর্ম্মকার-সম্মিলনীর দ্বাবিংশ বার্ষিক অধিবেশনে পঠিত।

প্রার্থনা করিলে শিব লোহাসুর বধের উপায় স্থির করিলেন। লোহাসুর বরলাভ করিয়া দেবতার অস্ত্রে অবধ্য হইয়াছিল। সেই কারণে, শিব তাহার বধের জন্য একটি মানুষকে সৃষ্টি করিয়া তাহাকে ধাতু শিল্পের উপযোগী যন্ত্রাদি অর্পণ করিলেন। শিব কর্ত্তৃক সৃষ্ট এই মানুষটিই কর্ম্মকার জাতির আদি পুরুষ। শিবের ডম্বুরু হইতে তাহার হাতুড়ি, খর্পর হইতে নেহাই, সর্পরূপ কটীবন্ধ হইতে তাহার চিমটা প্রস্তুত হইয়াছিল। হাপরের যাঁতার জন্য শিবের বাহন বৃষভরাজ নিজের দেহ হইতে খানিকটা চর্ম্ম প্রদান করিয়াছিল। এই সকল যন্ত্র গ্রহণ করিয়া আদি কর্ম্মকার লোহাসুর বধের জন্য গমন করিলেন। বলদৃপ্ত ভীষণকায় অসুর সেই ক্ষুদ্র মানুষটির সহিত যুদ্ধ করিতে সম্মত হইল না। লোহাসুর ঘৃণার হাসি হাসিয়া তাঁহাকে উপেক্ষা করিলে আদি কর্ম্মকার তাহাকে বলিলেন, "হে অসুর! তুমি যে অমরত্ব লাভ করিয়াছ তাহা কি প্রকারে বুঝিব? যদি তুমি আমার হাপরে প্রবেশ করিয়া কিছুক্ষণ অবস্থান কর আর আমাকে যাঁতাযন্ত্র চালিত করিতে অবসর দাও, তাহা হইলে বুঝিব যে তুমি যথার্থই অমরত্ব লাভ করিয়াছ।" লোহাসুর তৎক্ষণাৎ হাপরে প্রবেশ করিল এবং তাহার পর সে অঙ্গচালনা বা পার্শ্বপরিবর্ত্তন করিবার পূর্ব্বেই আদি কর্ম্মকার এরূপ দ্রুত যাঁতাযন্ত্র চালাইতে লাগিলেন যে, সেই অসুরের দেহ অগ্নির উত্তাপে হাপর হইতে ভূমিতে রক্তবর্ণ গলিত লোহাকারে পড়িতে আরম্ভ হইল। এই গলিত লোহ হইতে অষ্ট প্রকার ধাতু উৎপন্ন হইয়াছে আর উক্ত অষ্ট প্রকার ধাতু হইতে আটটী বিভিন্ন কর্ম্মকার-শিল্প ও তৎসঙ্গে আটটী বিভিন্ন কর্ম্মকার শ্রেণীর উৎপত্তি হইয়াছে। রিজলী সাহেব (H. H. Risley) তৎপ্রণীত "বাঙ্গলার জাতিমালা" (Tribes and Castes of Bengal) নামক সুবিখ্যাত গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, উল্লিখিত কিম্বদন্তী মেদিনীপুর জেলায় প্রচলিত আছে, এবং এই জেলায় আটটী বিভিন্ন শ্রেণীর কর্ম্মকার বাস করেন। অসুরের দেহ হইতে ধাতুর উৎপত্তি সম্বন্ধে আর একটী কিম্বদন্তী আছে। "পূর্ব্বে গুড়াকেশ নামে এক মহাসুর তাম্রাকার হইয়া বিষ্ণুর অর্চ্চনাপূর্ব্বক বিষ্ণুচক্রে দেহত্যাগের কামনা করাতে, হরি চক্রাঘাতে তাহাকে বিনাশ করিয়া বিষ্ণুলোকে নীত করেন। তখন সেই অসুরের মাংসে তাম্র, রক্তে সুবর্ণ, অস্থিতে রজতাদি ও মলাদিতে রৈত্যাদি (পিত্তল) ধাতু উৎপন্ন হয়।" (প্রকৃতিবাদ অভিধান) "ভাবপ্রকাশ" নামক সুপ্রসিদ্ধ সংস্কৃত গ্রন্থে লৌহের উৎপত্তি সম্বন্ধে আরও একটি কিম্বদন্তী স্থান পাইয়াছে। "পুরা লোমিল দৈত্যানাং নিহতানাং সুরৈর্য়ুধি। উৎপন্নানি শরীরেভ্যো লোহানি বিবিধানি চ।" পুরাকালে লোমিল নামে দৈত্য দেবগণ কর্ত্তৃক যুদ্ধে নিহত হইলে তাহার শরীর হইতে লৌহাদি নানাপ্রকার ধাতু উৎপন্ন হইয়াছিল।

কর্ম্মকার জাতি ও ধাতু বিষয়ে উপরোক্ত কিম্বদন্তী হইতে স্পষ্ট অনুমান করা যায় যে, একটি সুন্দর কবিত্বময় রূপক রচিত হইয়া আর্য্য সভ্যতার শৈশবকালে খনিজ ধাতুর আবিষ্কার ও সর্ব্বপ্রথম ধাতুশিল্পির আবির্ভাবের ইতিহাস তাহার মধ্যে প্রচ্ছন্ন ভাবে রক্ষিত হইয়াছে। লোহাসুর, গুড়াকেশ ও লোমিল নামক দৈত্যত্রয়ের দেহ হইতে ধাতু সকল উৎপন্ন হইয়াছে, এ কথা বিশ্বাসযোগ্য নহে। দৈত্যগণের অধিকৃত দেশে যে সকল খনি ছিল আর্য্যগণ যুদ্ধে দৈত্যগণকে নিহত করিয়া সেই খনি সকল অধিকার করিয়াছিলেন, উক্ত রূপকের এই ব্যাখ্যা সমীচীন বলিয়া মনে হয়। দ্বিতীয় কথা, খনিতে ধাতু, প্রস্তরের সহিত মিশ্রিতাবস্থায় থাকে। গুরুভার কঠিন প্রস্তর মিশ্রিত ধাতুপিণ্ডকে অগ্নি সংযোগে দ্রব করিয়া না লইলে তাহা হইতে খাঁটি ধাতু পৃথক করা যায় না। ধাতুশিল্পি কর্ম্মকার কর্ত্তৃক সর্ব্বপ্রথমে উক্ত প্রকার পিণ্ড হইতে লৌহাদি ধাতু নিষ্কাশিত করিবার প্রণালী আবিষ্কৃত হইয়াছিল, লোহাসুর বিষয়ক কিম্বদন্তী হইতে তাহাই বুঝা যায়। স্বয়ং শিব কর্ম্মকারকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন, ইহার তাৎপর্য্য এই যে, সমাজের মঙ্গলের জন্যই শিল্প ও বিজ্ঞানের জন্ম, আর সেই কারণে হিন্দু শাস্ত্রের মতে শিব হইতে সকল প্রকার শিল্প-বিজ্ঞান উদ্ভূত হইয়াছে। আলোচ্য কিম্বদন্তীতে স্বয়ং শিব কর্ম্মকার জাতির আদিপুরুষকে পিণ্ড হইতে ধাতু নিষ্কাশিত করিবার যন্ত্রগুলি প্রদান করিয়াছেন। ফল কথা, প্রাচীনতম বৈদিক যুগে শিল্প বিষয়ক

নূতন জ্ঞানের বিকাশ যাহার শিল্পবিদ্যায় দেখা দিয়াছে তাহাকে সমসাময়িক আর্য্যগণ দৈবশক্তি-সম্পন্ন মনে করিতেন। প্রতিভাশালী সেই শিল্পির সম্বন্ধে যে প্রবাদ বাক্য মুখে মুখে প্রচারিত হইত, বৈদিক যুগের পরবর্ত্তী সময়ে তাহা বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন আকার ধারণ করিয়াছে। লোহাসুর সম্বন্ধে উল্লিখিত কিম্বদন্তী সেইজন্য বর্ত্তমান সময়ে ভারতের বিভিন্ন স্থানে অল্প-বিস্তর রূপান্তরিত হইয়া প্রচলিত আছে।

সন ১৩১৫ সালে শ্রীযুক্ত বঙ্কুবিহারী চৌধুরী কর্ত্তৃক প্রকাশিত "কর্ম্মকার বৈশ্য-তাত্ত্বিক সমিতি"র বিবরণে লোহাসুর সম্বন্ধে কৌতুকাবহ একটি কিম্বদন্তীর বিষয় লিখিত হইয়াছে। এই ক্ষুদ্র পুস্তকে লেখকের নাম নাই। লেখক যিনিই হউন, তাঁহার মতে "লোহাসুর বধ কালে যুদ্ধোপযোগী অস্ত্র শস্ত্র ও পরিধেয় আভরণাদি বিনির্ম্মাণার্থ এবং অন্যান্য সাহায্যার্থ শ্রীশ্রীব্রহ্মবদনী জগন্মাতা গৌরীদেবী তাঁহার বাম উরু হইতে কর্ম্মকার জাতির আদিপুরুষ সৃষ্টি করেন বলিয়া যে রূপকময় প্রাচীন কিম্বদন্তী আছে, উহার তাৎপর্য্য এই যে, কর্ম্মকার জাতি বৈশ্য, তাই ব্রহ্মবদনীর উরুজ, অর্থাৎ সমাজের আদিম ও তৃতীয় স্থানীয়, অন্য পক্ষে অসুর নামক এক প্রকার অসভ্য অনার্য্য জাতি বিদূরিত করিয়া ইঁহারা পার্ব্বত্য অঞ্চলে লৌহাদি ধাতুর খনি অধিকার করিয়াছিলেন, তাই লৌহাসুর বধ কালে শ্রীজগন্মাতা গৌরীদেবী ইঁহাদের সৃষ্টি করিয়াছেন বলিয়া একটি প্রাচীন বাক্য-সম্ভূতি চলিয়া আসিতেছে। লক্ষ্মী নারায়ণ স্বরূপিণী গৌরিদেব ও রমাদেবী নাম্নী দম্পতী যুগলকে বিশিষ্ট শ্রেণীর কর্ম্মকার বৈশ্যগণ তাঁহাদের আদি পুরুষ রমণী বলিয়া ঘোষণা করিয়া থাকেন। সম্ভবতঃ এই প্রখ্যাত দম্পতির নেতৃত্ব অধীনে ইঁহারা পশ্চিমাঞ্চলে অথবা বঙ্গপ্রদেশে বিশেষ প্রসিদ্ধি ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন।"

"বঙ্গীয় কর্ম্মকার জাতিতত্ত্ব বিবৃতি" নামক আর এক খানি ক্ষুদ্র পুস্তকে এই কিম্বদন্তীর অনুরূপ বিবৃতি আছে। ইহাতেও লেখকের নাম নাই। তিনি বলেন, "এতদ্দেশে চড়ক পূজার সময় যে সকল স্তবকাদি পঠিত হইয়া থাকে, বিশেষতঃ এজাতিগত যে সকল ঐতিহ্য প্রচলিত আছে তচ্ছ্রবণে অবগত হওয়া যায় যে, পুরাকালে সুররাজ্য-বিধ্বস্তক লৌহাসুর যুদ্ধে শ্রীশ্রীজগন্মাতা ভগবতী পরাঙ্মুখ হইয়া পুনরায় যুদ্ধোপযোগী অস্ত্র শস্ত্র এবং আভরণাদি পুনঃ বিনির্ম্মাণার্থ, পরন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে অসুর-সংহার কার্য্যে অন্যান্য সাহায্যার্থে তাঁহার বামাঙ্গ হইতে একটি মহাপুরুষ সৃষ্টি করেন। অসুর নিপাতিত হইলে এই পুরুষ প্রবর দেবগণের অনুরোধে শ্রীজগন্মাতার অনুজ্ঞায় জ্ঞানবৃদ্ধ দেবশিল্পি বিশ্বকর্ম্মা দেবের নিকট বিবিধ নিগূঢ়তর শিল্প বিজ্ঞান রহস্যাদি অবগত হইয়া অভিনব কারু-কৌশল প্রচারার্থ মর্ত্ত্যে আগমন করেন। কালক্রমে এই মহাপুরুষ হইতে ক্রমশঃ বংশ বিস্তৃতি হইয়া অধুনাতন শাক্লক্ষেত্রী বা কর্ম্মকার জাতির সংসৃষ্টি হইয়াছে।" কোনও প্রামাণিক গ্রন্থ হইতে এই দুইটি কিম্বদন্তী সংগৃহীত হইয়াছে কি না তদ্বিষয়ে উক্ত পুস্তক দুইখানিতে আভাস মাত্রও না থাকাতে এই কিম্বদন্তী দুইটি কৃত্রিম ও কল্পিত মনে হইতে পারে। আমার কিন্তু বিশ্বাস যে, এই দুইটি কিম্বদন্তী কল্পিত না হইবারই কথা, কারণ এইরূপ মিথ্যা প্রবাদ কেহ রচনা করিয়া দিলেও এতদিনে তাহার প্রতিবাদ নিশ্চয় হইত। তবে, আলোচ্য কিম্বদন্তী দুইটি যে লোহাসুরের ইতিকথার আধুনিক সংস্করণ বা প্রাদেশিক নূতন পাঠ, তদ্বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই। বঙ্গদেশের সকল স্থানেও এ কিম্বদন্তী দুইটির কথা শুনা যায় না। বঙ্গদেশের বাহিরে অপর কোথাও প্রদেশে ইহাদের অস্তিত্ব যে কোনও কালে ছিল তাহাও মনে হয় না। উক্ত পুস্তক দুই খানির রচয়িতা একজন মাত্র ইহা কল্পনা করিয়া লইলে তাঁহার স্বগ্রামে যে আলোচ্য জনশ্রুতির জন্ম এই অনুমান অসঙ্গত হইবে না। বঙ্গদেশের বৈশ্য কর্ম্মকার প্রধান কোনও জেলায় এই কিম্বদন্তী দুইটীর যে প্রচলন আছে, তাহা উক্ত পুস্তক দুইখানির পাঠককে স্বীকার করিতেই হইবে। বৈদিক যুগের পর প্রাচীনতম জনশ্রুতিমূলক ইতিকথা দেশ কাল পাত্রভেদে যে রূপান্তরিত হইয়াছে, তাহা নেহাত অনুমান-সাপেক্ষ নহে। প্রাচীন বাঙ্গালা কাব্য-সাহিত্যের এক স্থানেও আলোচ্য কিম্বদন্তী দুইটীর অনুরূপ অধিকতর কৌতুকাবহ ঘটনাবিশেষ লিপিবদ্ধ আছে। শ্রীযুক্ত হরিদাস পালিত

মহাশয় লিখিত "গৌড়ীয় মঙ্গলচণ্ডীতে বৌদ্ধভাব" শীর্ষক প্রবন্ধ যাহা ১৩১৭ সালে সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল তাহাতে মাণিক দত্তের চণ্ডীকাব্যের প্রসঙ্গে আদ্যাশক্তি কর্ম্মকারের ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া উক্ত হইয়াছে। শ্রীকবি মাণিক দত্তের চণ্ডীকাব্য চার পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বে মালদহ অঞ্চলে গীত হইত। "এই কাব্যে কবি বলেন, আদ্যাশক্তির উৎপত্তির পর ধর্ম্ম তাঁহাকে স্ত্রীরূপে সাজাইলেন। তাহার পর ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বরকে সৃষ্টি করিলেন। ধর্ম্ম শিবকে আদ্যার পতিত্বে বরণ করিতে চাহিলে শিব বলিলেন, সাতবার জন্মগ্রহণ করিলে তবে আদ্যার সহিত বিবাহ হইতে পারে। ইহা শ্রবণ করিয়া "হরি হরি বলি মাতা দেহ যে ছাড়িল।" আদ্যাদেবী সর্ব্ব প্রথমে কর্ম্মকার গৃহে জন্মগ্রহণ করিলেন। "তবে জন্ম লৈল মাতা কর্ম্মকার ঘরে।" শেষবারে দক্ষ রাজের গৃহে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। শ্রীকবি মাণিক দত্ত যে মালদহ অঞ্চলে তাঁহার সমকালে প্রচলিত জনশ্রুতি অবলম্বনে তাঁহার চণ্ডীকাব্যে কর্ম্মকারের ঘরে আদ্যাশক্তির জন্মগ্রহণের কথা কবিতাকারে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহাতে সন্দেহ করিবার কোনও কারণ নাই। ইহাতে কর্ম্মকার জাতির শক্তিমত্তা ও প্রাচীনত্বেরই পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। কর্ম্মকার জাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে সমুদয় কিম্বদন্তী গুলি যে আমি সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি এ কথা আমি বলি না। উল্লিখিত কিম্বদন্তীগুলি হইতে ইহাই বুঝা যাইতেছে যে, সৃষ্টির প্রারম্ভ কালে কর্ম্মকার শিল্পী দেবরাজ ইন্দ্র, দেবাদিদেব মহাদেব, আদ্যাশক্তি, শ্রীহরি, দেবাসুরের যুদ্ধ ও অসুর বিনাশন প্রভৃতি পুরাবৃত্ত সংক্রান্ত নায়ক নায়িকা ও ঘটনাবলীর সহিত বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন।

কর্ম্মকার জাতির বিস্তৃতি।

উৎপত্তির পর বিস্তৃতি। আর্য্যজাতি দেশভেদে কেবল যে বিভিন্ন সমাজে বিভক্ত হইয়াছিলেন তাহা নহে। এক একটি সমাজের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী, প্রত্যেক শ্রেণীর মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন মেল, এমন কি মেল বা থাকবিশেষের মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোষ্ঠী সৃষ্টি হইয়া ভারতের প্রত্যেক প্রদেশে অসংখ্য জনসমষ্টি সমগ্র আর্য্যজাতিকে ঊর্ম্মিমালা শোভিত মহাসমুদ্রের ন্যায় শক্তিশালী করিয়াছিল। বঙ্গীয় সমাজেও কর্ম্মকার জাতির বহুমুখীন প্রতিভা বিভিন্ন ধাতু শিল্পকে আশ্রয় করিয়া এই জাতিকে প্রাচীন কাল হইতেই একাধিক শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছিল। লোহাসুর সংক্রান্ত কিম্বদন্তীর উল্লেখ করিয়া রিজলী সাহেব মেদিনীপুর জেলায় যে আটটী বিভিন্ন শ্রেণীর কর্ম্মকারের কথা বলিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে ছয়টি আর্য্যজাতি সম্ভূত। (১) লোহার-কর্ম্মকার, (২) পিতুলে কর্ম্মকার, (৩) কাঁসারি কর্ম্মকার, (৪) স্বর্ণ-কর্ম্মকার, (৫) ঘেটুরে-কর্ম্মকার, ও (৬) চাঁদ-কর্ম্মকার। ইহাঁরা যথাক্রমে লৌহ, পিত্তল, কাঁসা, স্বর্ণ নির্ম্মিত দ্রব্যাদি, কাজল-লতা ও দর্পণ প্রস্তুত করেন। এতদ্ব্যতীত, উক্ত জেলার জঙ্গল মহলে, (৭) ডোকরা ও (৮) তামরা নামে আরও দুই শ্রেণীর কর্ম্মকারের কথা উল্লিখিত হইয়াছে। ইহারা ম্লেচ্ছভাবাপন্ন ও অভক্ষ্য আহার করে। এই শেষোক্ত দুইটী শ্রেণীর পুরোহিত পতিত ব্রাহ্মণ শ্রেণী বিশেষের মধ্যেই বর্ত্তমান আছেন। কোনও সৎ ব্রাহ্মণ এই শ্রেণীদ্বয়ের বাটীতে জল গ্রহণ করেন না। রিজলী সাহেবের মতে, বর্দ্ধমান জেলায় বেলাসী, মামুদপুরীয় ও কমলা এই তিন শ্রেণীর কর্ম্ম-কার বাস করেন। ২৪-পরগণায় উত্তর রাঢ়া, দক্ষিণ রাঢ়ী ও আনুরপুরী কর্ম্মকারের বাস। পূর্ব্ববঙ্গে ভূষণইপটী, ঢাকাই ও পশ্চিমা কর্ম্মকারগণ বাস করেন। উক্ত ভূষণই-পটী আবার নলদিপটী, চৌদ্দ সমাজ ও পাঁচ সমাজে বিভক্ত। মুর্শিদাবাদের কর্ম্মকারগন চারি শ্রেণীতে বিভক্ত, যথা, রাঢ়ী, বরেন্দ্র, ঢাকাওয়ালা, পোট্টা। পাবনা জেলার রাঢ়ী ও বরেন্দ্র শ্রেণীর কর্ম্মকারগণ দাস সমাজ ও পাঁচ সমাজের কর্ম্মকার বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। নোয়াখালিতে কর্ম্মকারগণ জাতি-কর্ম্মকার ও শিখু-কর্ম্মকার, এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। বলা বাহুল্য, বঙ্গদেশের কর্ম্মকারগণের যে সকল শ্রেণীর কথা রিজলী সাহেব বলিয়াছেন, সেই সকল শ্রেণী ব্যতীত আরও অনেকগুলি শ্রেণী মেল বা থাক আছে। নদীয়া জেলায় শান্তিপুর বা পাঁচনহর, ও ২৪-পরগণায় চাকলাই মেলের কর্ম্মকারগণ বাস

করেন। কর্ম্মকার জাতির শ্রেণী নির্ণয় করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে, বিশেষতঃ এই জাতির বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে একতা স্থাপন যখন বঙ্গীয় কর্ম্মকার সম্মিলনীর উদ্দেশ্য তখন আমি কর্ম্মকার জাতির মধ্যে শ্রেণী বিভাগ সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচনা না করিয়া যে সকল শ্রেণীর বিষয়ে কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে সেই শ্রেণীগুলির উল্লেখ করিব। এস্থলে বক্তব্য এই যে, উল্লিখিত শ্রেণী মেল বা থাকের তালিকা দৃষ্টে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, বঙ্গদেশে কর্ম্মকারগণের বংশ বৃদ্ধি হওয়াতে এদেশের সর্ব্বত্র তাঁহারা বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিলেন। রাষ্ট্রবিপ্লব ঘটিয়া আবার কোন-ও সমাজের কর্ম্মকারগণকে এক জেলা হইতে অন্য জেলায় স্থানান্তরিত হইতে হইয়াছিল।

ভূষণইপটী।

আনন্দনাথ রায় প্রণীত ফরিদপুরের ইতিহাসে লিখিত হইয়াছে, যে সময়ে বক্তিয়ার খিলিজা বাঙ্গলাদেশ আক্রমণ করিয়া পূর্ব্ববঙ্গের দিকে অগ্রসর হইতেছিল সেই সময়ে পূর্ব্ববঙ্গে "ভূষণাপটী বলিয়া একটি সাধারণ সমাজের সৃষ্টি হয়। বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণের মধ্যে ভূষণাপটী বলিয়া এক সম্প্রদায় বর্ত্তমান দেখা যায়। এতদ্ভিন্ন তিলি, বণিক, কর্ম্মকার শ্রেণীর মধ্যেও ভূষণইপটী বলিয়া একটি সমাজ আছে।" সতীশচন্দ্র রায় চৌধুরী প্রণীত "বঙ্গীয় সমাজ" নামক গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে, "ভূষণা সমাজে কুলীনগণ সাত সমাজ নামে এবং মৌলিকগণ পাঁচ সমাজ নামে অভিহিত। ভূষণা সমাজে "মাথুর" কুলীন এবং শাণকার, বাকলাই ও প্রামাণিক "মৌলিক।" দ্বাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভকালে রাষ্ট্রবিপ্লব ঘটিয়া বঙ্গের রাজধানী গৌড় মুসলমান কর্ত্তৃক অধিকৃত হইলে অনেক নিরীহ বাঙ্গালী শিল্পী ও বণিক ব্রাহ্মণাদি অন্যান্য জাতির সহিত গৌড় হইতে পলায়ন করিয়া যে যশোহর ও ফরিদপুর জেলায় বসবাস করিতে আরম্ভ করেন ইহা ঐতিহাসিক ব্যাপার। লক্ষ্মণ সেনের পূর্ব্বে বল্লাল সেনের সময়েও একবার বঙ্গীয় হিন্দু সমাজে বিপ্লব ঘটিয়াছিল এবং তাহার ফলে গৌড়বাসী অনেক ব্রাহ্মণ কায়স্থ ও অন্যান্য জাতির লোক ঘর বাড়ী ত্যাগ করিয়া পূর্ব্ববঙ্গে গমন করিয়াছিলেন। এই সময় হইতেই বরেন্দ্র কায়স্থ সমাজ জন্মলাভ করে। আমার মনে হয়, যে সকল কর্ম্মকার গৌড় ত্যাগ করিয়া বরেন্দ্র ভূমিতে গমন করেন তাঁহারা, বরেন্দ্র সমাজভুক্ত হইয়াছিলেন। ভূষণাপটী সমাজে বাকলাই মেলের কর্ম্মকারগণ বোধ হয় পূর্ব্বে প্রাচীন বাকলায় বাস করিতেন। আকবরের সময়ে বাকলা জলপ্লাবনে ধ্বংস হইয়া গেলে তাঁহারা যশোহর ও ফরিদপুরে স্থানান্তরিত হইয়াছিলেন এবং কালক্রমে ভূষণাপটী সমাজভুক্ত হইয়া যান। বাঙ্গালার রাজনৈতিক ইতিহাসের সহিত কর্ম্মকার জাতির সামাজিক ইতিহাসের ঘটনাগুলি মিলাইয়া পাঠ করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, বিভিন্ন স্থানের বিভিন্ন সমাজভুক্ত কর্ম্মকারগণ ঘটনাচক্রে পড়িয়া একস্থান হইতে অন্যস্থানে গমন করিয়া বসবাস করাতে তত্রত্য সমাজে তাঁহারা মিশিয়া গিয়াছেন এবং তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণের যে প্রদেশে জন্ম সেই প্রদেশের সমাজ হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছেন।

আনরপুর।

২৪ পরগণার অন্তর্গত আনরপুরের কর্ম্মকারগণ সপ্তগ্রাম সমাজের কর্ম্মকারগণের প্রতিবাসী বলিয়া আমার ধারণা ছিল। উপরোক্ত "কর্ম্মকার বৈশ্য তাত্ত্বিক সমিতি" কিন্তু অন্য কথা বলেন। তাঁহাদের মতে "বারাসতের নিকট এবং কলিকাতার দক্ষিণে আনরপুর নামক এক মেলের কর্ম্মকার আছেন। * * সুরকৃতি মেলের এক ভগ্নাংশ লইয়াই এই আনরপুরের মেলের সৃষ্টি।" সুরকৃতি মেল সম্বন্ধে তাঁহারা বলেন, "মথুরার প্রাচীন সুরসেন, পুরাকালীন ব্রহ্মর্ষি প্রদেশের এই অংশেই সুরকৃতি মেলের অতি পূর্ব্বপুরুষগণের আবাস।" শেষোক্ত ছত্রটি ব্যাকরণদুষ্ট লেখার ভঙ্গীতে সম্পূর্ণ অর্থহীন হইয়াছে। "কর্ম্মকার বৈশ্য-তাত্ত্বিক সমিতি"র উল্লিখিত পুস্তকের মতে "খুলনার পশ্চিম অংশে এবং যশোহরের দক্ষিণ অংশে নূনগর নামে এক মেলের কর্ম্মকার আছেন।" আলোচ্য পুস্তিকার প্রামাণিক মূল্য যদিও কিছুই নাই কিন্তু ইহাতে কর্ম্মকার বৈশ্য জাতির অনেকটা সংবাদ লিপিবদ্ধ হওয়াতে এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তি-

গণের উপাদেয় পাঠ্য-পুস্তক রূপে পরিগণিত হইতে পারে। কর্ম্মকার-বৈষ্ণব তালিকায় ৺আবিরাম ও তাঁহার প্রপৌত্র হরষিত লাল ওরফে মৌলিন্দ্র মোহনের নাম উল্লেখযোগ্য। আমরা মেদিনীপুর হইতে আরম্ভ করিয়া পূর্ব্ববঙ্গের দিকে যতই অগ্রসর হই, কর্ম্মকার জাতিকে ততই খণ্ড শ্রেণীতে বিভক্ত দেখিতে পাই। ইহার একটি বিশেষ কারণ আছে। বঙ্গদেশের লৌহ তাম্র প্রভৃতি খনির মানচিত্রের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, মেদিনীপুরের পশ্চিম ও দক্ষিণ সীমানার পরেই বঙ্গমাতা তাঁহার খনিজ ধনরত্নাদি ভূগর্ভে প্রোথিত করিয়া রাখিয়াছেন। সেইজন্য মেদিনীপুর জেলায় কর্ম্মকার জাতির মধ্যে শ্রেণী বিভাগ বিভিন্ন ধাতু শিল্পে নিযুক্ত জনসমষ্টির উপর নির্ভর করিতেছে। এই স্থান হইতে কাঁচা মাল (raw material) সংগ্রহ করিয়া অন্যান্য জেলার কর্ম্মকারগণ ধাতুময় দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিতেন। ঐ সকল জেলায় যে গ্রামে অধিক-সংখ্যক কর্ম্মকার শিল্পিবাস করিতেন, তাঁহারা সমাজবদ্ধ হইয়া সেই গ্রামের নামে একটি থাক গড়িয়া লইতেন।

ঢাকা।

ডাঃ উইসের মতে ('Dr. Wise) ঢাকার সন্নিকটস্থ বুজুহা নামক স্থানে পূর্ব্বে লোহার খনি ছিল। 'In the Ain it is stated there was an iron mine in Sarkar Buzuha which included Dacca and in later times jagirs called Ahangar were granted to the skilled workmen employed in smelting iron from the red laterite soil of the Dacca District" আবুল ফজলের লিখিত আইন-ই-আকবরীতে উক্ত হইয়াছে যে, সরকার বুজুহা যাহার এলাকায় ঢাকা সহর অবস্থিত, পূর্ব্বে তথায় একটি লোহার খনি ছিল এবং অপেক্ষাকৃত আধুনিক সময়ে যে সকল নিপুণ শিল্পী ঢাকা জেলার কঠিন লাল বর্ণ জমাট মৃত্তিকা হইতে লৌহ নিষ্কাশিত করিতে পারিতেন, তাঁহাদিগকে আহঙ্গর নামে জায়গীর প্রদত্ত হইত। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন রায় প্রণীত ঢাকার ইতিহাসের ১ম খণ্ডে লিখিত হইয়াছে, "ভাওয়াল পরগণার অন্তর্গত লোগাইদ্ ও কীর্ত্তনীয়া প্রভৃতি স্থানে লৌহের খনি ছিল বলিয়া আবুল ফজল আইন-ই-আকবরিতে উল্লেখ করিয়াছেন।" আমরা সেইজন্য দেখিতে পাই যে, মেদিনীপুরের ন্যায় ঢাকা অঞ্চলের কর্ম্মকারগণের মধ্যে সমাজ বিশেষের নাম ও কীর্ত্তি ধাতুশিল্পের সহিত জড়িত হইয়া রহিয়াছে। ডাঃ উইস বলেন "ঢাকার কর্ম্মকারগণের মধ্যে একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, মুসলমান শাসনকর্ত্তারা তাঁহাদিগকে ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিমাঞ্চল হইতে আনয়ন করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান সময়ে ঢাকার কর্ম্মকারগণ কিন্তু লৌহ-নিষ্কাশন শিল্প সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ। ("Among the Karmakars of Dacca says Dr. Wise there exists a tradition that they were brought from Upper India by the Mahomedan Government * * At the present day the Karmakars are unacquainted with the art of smelting iron"). শ্রীযুত [illegible] রায় ১৩[illegible] সালের বঙ্গীয় কর্ম্মকার কনফারেন্সের রিপোর্টের ভূমিকায় আত্মপরিচয় স্থলে লিখিয়াছেন, "মুসলমান রাজত্বের সময় নবাব জাহাঙ্গীর দীল্লি হইতে আসিয়া ঢাকাতে রাজধানী স্থাপন করেন। ঐ সময় কতক জন আর্য্য কর্ম্মকার দীল্লি হইতে আসিয়া ঢাকাতে বসবাস করিতে থাকেন ও নবাব সরকারে শিল্পকার্য্য করিতেন। নবাব তাঁহাদের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া "রায়" পদবী দেন; সেই সময় হইতেই ঢাকার কর্ম্মকারদিগের রায় পদবী হইয়াছে। ৺দুর্লভ রায় ঢাকা টাউনের পূর্ব্বাংশে নারিন্দা নামক স্থানে বাস করিতেন। তাঁহার দুই পুত্র রামনারায়ণ ও রামভদ্র শিল্পকার্য্যে উপযুক্ত হইয়া নবাব সরকারের অস্ত্রাগারের বন্দুক কামানাদি অস্ত্র নির্ম্মাণ কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইলে নবাব সন্তোষ সহকারে উক্ত ভ্রাতাদ্বয়কে 'মেহাত্তর' উপাধি দেন (মেহাত্তর পার্শি শব্দ, ইহার বাঙ্গালা মাননীয়, ইং Honourable) ও কতক জায়গীর সম্পত্তি দান করেন। এই সম্পত্তির পরিচয়ে কলেক্টরীতে এখনও দেখা যায় বাজেয়াপ্ত লাখেরাজ তালুক রামনারায়ণ রামভদ্র জায়গির আহঙ্গর (লোহার কার্য্য) অর্থাৎ লোহার কার্য্যের জন্য এই সম্পত্তি দান করা হইয়াছে।" বলা বাহুল্য,

মোগল রাজত্বে কয়েক শত বৎসর গোলামীর পর "আর্য্য" এই শব্দটী হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী পরাধীন ভারতবাসীর নাম হইতে বিচ্যুত হইয়াছিল। আসল কথা, মানসিংহ কর্ত্তৃক প্রতাপাদিত্য পরাজিত হইলে মোগল শাসন এদেশে দৃঢ়ভাবে স্থাপন করিবার জন্য ভেদনীতি অবলম্বন করিয়া জাহাঙ্গীর হিন্দুস্থানী কর্ম্মকারগণকে ঢাকায় আনয়ন করিয়াছিলেন। তাঁহারা সামরিক অস্ত্রাদি নির্ম্মাণে যেমন দক্ষ, মুসলমান রাজার বিশ্বাসপাত্রও তেমনি ছিলেন। বঙ্গদেশবাসী সুপ্রাচীন কর্ম্মকার শ্রেণী যাহারা স্বাধীন বাঙ্গালায় প্রতাপাদিত্যের সময়ে যুদ্ধাস্ত্র প্রস্তুত করিতেন ও যাঁহাদিগের শিল্পবিদ্যার কথা মুকুন্দরাম চণ্ডী কাব্যে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে মুসলমান শাসনকর্ত্তারা বিশ্বাস করিতে পারিতেন না। সেই কারণে উক্ত পশ্চিমাঞ্চলবাসী উক্ত কর্ম্মকারগণকে তাঁহারা জায়গীর ও উপাধিদানে তাঁহাদের রাজভক্তির সম্যক সম্মাননা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কালক্রমে বহুদিন একত্র বসবাস করাতে তাঁহারা ঢাকা অঞ্চলের প্রাচীন বাঙ্গালী কর্ম্মকারগণের সহিত মিশিয়া গিয়াছিলেন। সুখের বিষয়, ইংরাজাধিকারে বাষ্পীয়যানের কৃপায় বঙ্গদেশের দূরতম স্থানের কর্ম্মকারগণ এক্ষণে বঙ্গের রাজধানী এই কলিকাতা নগরীতে ব্যবসাদি উপলক্ষে আসিয়া বসবাস করাতে পূর্ব্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ সকল স্থানের কর্ম্মকারগণই বিবাহরূপ পবিত্র সূত্রের বন্ধনে ধীরে ধীরে একটি অখণ্ড কর্ম্মকার শ্রেণীতে পরিণত হইতেছেন। মূলে যে সকল কর্ম্মকার এক, ইহা আমরা মাঝে মাঝে ভুলিয়া যাই, আর সেইজন্য লোকবলহীন কর্ম্মকার জাতিকে খণ্ড খণ্ড করিয়া শক্তিহীন করিয়া ফেলি। ক্রমশঃ।

ভারতীয় সভ্যতার একটি ধারা।

[শ্রীমতী নীহারবালা নাগচৌধুরী]

মানব সভ্যতার প্রাচীন উপাদান সংগ্রহের চেষ্টায় লর্ড কেয়ারনার্ভন প্রভৃত অর্থব্যয় ও পরিশ্রমের ফলে কর্ম্মক্ষেত্রে টুটানখামেনের কবর আবিষ্কারের অব্যবহিত পরেই বিষাক্ত মক্ষিকার দংশনে প্রাণ হারাইলেন। য়ুরোপ ও আমেরিকার ঐতিহাসিক প্রতিষ্ঠান সমূহ কর্ত্তৃক প্রেরিত ইজিপ্টতত্ত্বজ্ঞগণ প্রাণপাত পরিশ্রম ও অর্থব্যয়ের ফলে মানব সভ্যতার একটি প্রাচীনতম বিভাগের অজ্ঞাত ইতিহাসের যেরূপে পুনর্গঠন করিয়াছেন এবং করিতেছেন, তাহা পর্য্যালোচনা করিলে ঐ সমস্ত উদ্যমশীল জাতির অধ্যবসায় এবং অনুসন্ধিৎসার সবিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। আমরা কেবল অনুমান শক্তির সাহায্যে নীল নদের বালুকাময় সৈকতে ভারতীয় সভ্যতার অধুনালুপ্ত প্রবাহের চিহ্ন কল্পনাচক্ষে দর্শন করিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হই। আমেরিকাকে পুরাণ বর্ণিত রসাতল প্রমাণ করিবার জন্য "বলিভিয়া" প্রভৃতি দেশকে বলিরাজার কীর্ত্তিস্থল বলিয়া প্রচার করিতে ব্যস্ত লেখকের অভাব নাই। এমন কি, শিক্ষাভিমানী লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখককেও 'হারকিউলেশ'কে 'হরিকুলেশ' বা 'যাদবকৃষ্ণ' হইতে অভিন্ন মনে করিতে দেখা গিয়াছে। এই সমস্ত উর্ব্বর মস্তিষ্ক লেখকগণের স্বদেশ-প্রীতি প্রশংসনীয় হইলেও তাঁহাদের বিচারশক্তি সর্ব্বথা অনুকরণীয় নহে। সুদূর গান্ধার, তুর্কীস্থান, তিব্বত, চীন, কম্বোজ, (পুর্ব্ব) অযোধ্যা, চম্পা, যবদ্বীপ, বলিদ্বীপ প্রভৃতি দেশে ভারতীয় সভ্যতার যে সমস্ত চিহ্ন এখনও লোকচক্ষুর অন্তরালে ঐতিহাসিকের আগমন প্রতীক্ষায় দণ্ডায়মান, তাহাদের প্রতি এ দেশের বিবুধমণ্ডলীর দৃষ্টি এখনও সম্যক আকৃষ্ট হয় নাই। ষ্টীন সাহেব তুর্কীস্থানে অধুনালুপ্ত হিন্দু নগরীর ধ্বংসাবশেষের মধ্যে যে সমস্ত সংস্কৃত পুঁথি ও হিন্দু সভ্যতার চিহ্ন আবিষ্কার করিয়াছেন তাহার অস্তিত্ব সম্বন্ধেও তথাকার বর্ত্তমান অধিবাসীরা সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। প্রাচীন হিন্দু জাতির সুদূরপ্রসারী অভিযানের ফলে ভারতের চতুষ্পার্শ্ব-

বর্ত্তী প্রদেশ সমূহে যে বৃহৎ ভারত গঠিত হইয়াছিল, জাতীয় জীবনী-শক্তির হ্রাসের সহিত, তাহাদের সহিত মাতৃভূমির সকল সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়, কিন্তু বহু শতাব্দী ধরিয়া এই সমস্ত হিন্দুসাম্রাজ্য বিদেশে তাহাদের জাতীয় বিশিষ্টতা রক্ষা করিতে থাকে এবং স্থানে স্থানে তাহাদের অস্তিত্ব লুপ্ত হইলেও ভারতীয় হিন্দু এবং বৌদ্ধ সভ্যতার বহু নিদর্শন ঐ সমস্ত দেশে এখনও বর্ত্তমান। বৈদিক যুগের অনেক প্রাচীন হিন্দুপ্রথা বর্ত্তমান সময়ে ভারতে দেশাচার বহির্ভূত হইলেও ভারত সীমার বাহিরে স্মৃতিশাস্ত্রের বিধানানুসারে অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে। বৌদ্ধরাজার অভিষেক ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক পৌরাণিক মতে এখনও সম্পাদিত হইতেছে এবং চতুর্বর্ণ বিভাগ স্থানে স্থানে এখনও বর্ত্তমান। দক্ষিণপূর্ব্ব এসিয়ার কয়েকটি প্রাচীন হিন্দুসাম্রাজ্যের ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত আলোচনা 'অর্চনা'র পাঠকগণের অপ্রীতিকর হইবে না বিবেচনায় এই প্রবন্ধে সন্নিবিষ্ট হইল।

এশিয়া মহাদেশের দক্ষিণপূর্ব্ব সীমান্তে ত্রিকোণাকৃতি ভূভাগের প্রাচীন হিন্দুনাম কম্বোজ। এই স্থানের আদিম অধিবাসীরা 'ক্মের' বলিয়া পরিচিত। নৃতত্ত্ববিদ্গণ অনুমান করেন ইহারা দক্ষিণ ব্রহ্মদেশের 'মন' জাতির একটি শাখা এবং তথা হইতে এই দেশে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছে। এক কালে এই প্রদেশ প্রাচীন মহাচীন সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল কিন্তু শতাধিক দ্বিসহস্র বৎসরেরও পূর্ব্বে ভারতবর্ষীয় হিন্দুগণ ব্রহ্মদেশ, আরাকান, পেগু এই অঞ্চলে আগমন করিতে থাকেন এবং স্থানীয় অধিবাসীগণকে হিন্দুভাবাপন্ন করিয়া খৃষ্ট-পূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দীতে তাহাদের উপর আপনাদের প্রভাব বিস্তার করেন। খৃষ্ট-পূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দীর মধ্যভাগে এখানে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রথম প্রচারিত হয়। খৃষ্ট-পূর্ব্ব প্রথম শতাব্দীর শেষভাগে 'শৈলোক সুখোদয়ে' হিন্দু শান রাজত্বের প্রতিষ্ঠা হয় এবং আট শত বৎসর ধরিয়া এই রাজ্য আপনার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতে সমর্থ হয়। ইহা উত্তরে উনান প্রদেশের চীন ভাবাপন্ন শান রাজ্যসমূহ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন ছিল, কিন্তু কম্বোজের প্রাচীনতম হিন্দুরাজ্য হইলেও কম্বুকুলোদ্ভব কৌণ্ডিন্য স্থাপিত বর্ম্মাবংশের ন্যায় প্রতিষ্ঠা ইহা কোন কালেই লাভ করে নাই। লোকপ্রসিদ্ধ কম্বোজ বংশের প্রতিষ্ঠাতা বিখ্যাত হিন্দুবীর কম্বুর আবির্ভাব কাল খৃষ্ট পূর্ব্ব ৬০ বা ৮০ বর্ষ বলিয়া প্রবাদ আছে। কম্বুর ঐতিহাসিকতা বা তাঁহার আবির্ভাব কাল অবিসম্বাদিতরূপে নির্দ্ধারিত হয় নাই। কম্বোজ বুদ্ধঘোষ (৩৯০-৪৫০ খৃষ্টাব্দ) কর্ত্তৃক ৪২২ খৃষ্টাব্দে প্রথম হীনযান মতের প্রবর্ত্তন হয়। আখ্যায়িকা এবং কিম্বদন্তী ছাড়িয়া দিলে আমরা প্রধানতঃ কৌণ্ডিন্যের সময় হইতেই ঐতিহাসিক ঘটনার সুস্পষ্ট পরিচয় প্রাপ্ত হই।

কৌণ্ডিন্য (৪৩৫-৪৯৫ খৃষ্টাব্দ) বা সম্রাট 'শ্রুতবর্ম্মা কম্বোজ' বর্ম্মা বংশীয় কম্বোজ রাজগণের আদিপুরুষ। শক্তিশালী কম্বোজ রাজগণের রাজত্বকালে এই প্রদেশ উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করে। মহাচীন সম্রাটকে পর্য্যন্ত এই দুর্দ্ধর্ষ প্রতিবেশীর ভয়ে সর্ব্বদা সন্ত্রস্ত থাকিতে হইত। বর্ম্মাবংশীয়গণের রাজত্ব কালে কম্বোজ সাম্রাজ্যের আয়তনের বিশেষ বিস্তৃতি লাভ এবং বহির্বাণিজ্যের প্রভূত প্রসার ঘটে, ভাস্কর্য্য শিল্পেরও সমধিক উন্নতি হয়। কম্বোজ রাজগণ বহুসংখ্যক নূতন নগরী নির্ম্মাণ করিয়া সুবৃহৎ দেবমন্দির প্রভৃতি দ্বারা সুশোভিত করেন।

কম্বোজে আবিষ্কৃত প্রাচীনতম শিলালিপি হইতে জানা যায় যে, বর্ম্মবংশীয় ভব(ব)র্ম্মা ৫৬০ খৃষ্টাব্দ হইতে ৫৯০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কম্বোজে রাজত্ব করেন। তাঁহার পরবর্ত্তী সম্রাট মহেন্দ্রবর্ম্মা (৫৯০—৬১০ খৃষ্টাব্দ) কর্ত্তৃক ৬০৪ খৃষ্টাব্দে উৎকীর্ণ একটি শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। বিখ্যাত পর্য্যটক হুয়েন সাঙ ভারত হইতে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন কালে পথিমধ্যে কম্বোজে কিছুকাল অবস্থান করেন (৬২৯—৬৪৫ খৃষ্টাব্দ)। তিনি তৎকালে মহেন্দ্রবর্ম্মার উত্তরাধিকারী (প্রথম) ঈশান বর্ম্মাকে কম্বোজ রাজসিংহাসনাধিরূঢ় দেখিতে পান। ঈশান বর্ম্মা কম্বোজের পার্শ্ববর্ত্তী বহু প্রদেশ স্বীয় সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। এই পরাক্রান্ত সম্রাট ব্যাধপুর নামে একটি বিশাল নগরী নির্ম্মাণ করেন। ইহার পর ৭০৫ খৃষ্টাব্দে গৃহবিবাদের ফলে এই সাম্রাজ্য দ্বিধা বিভক্ত হইয়া দুইটি স্বাধীন রাজ্যে পরিণত হয়, এবং এই সময়ে কিছুকালের জন্য কম্বোজ রাজশক্তি হ্রাস হইতে থাকে। ৮০২ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয় জয়বর্ম্মার (৮০২—৮৬৯

খৃষ্টাব্দ) সময় হইতে বর্ম্মা সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় অভ্যুদয়ের যুগ আরম্ভ হয়। জয়বর্ম্মা এবং তদ্বংশীয়গণের নির্ম্মিত হর্ম্ম্যাবলীর ধ্বংসাবশেষের বিশালত্বে বিস্ময়ে অভিভূত হইতে হয়। যশোবর্ম্মণের (৮৮৯—৯১০ খৃষ্টাব্দ) রাজত্বকালে যশোধাপুরের নির্ম্মাণকার্য্য সমাপ্ত হয়। তৎপরে রাজেন্দ্রবর্ম্মার (৯৪৪—৯৬৮ খৃষ্টাব্দ) রাজত্বকালে কম্বোজে বৌদ্ধধর্ম্মের সবিশেষ প্রচার হয়। দ্বিতীয় সূর্য্যবর্ম্মা (১১১২—১১৫২ খৃষ্টাব্দ) আঙ্কর বটের বিশালকায় ব্রহ্ম মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা। এই মন্দিরটি ত্রিতল এবং ইহার মধ্যদেশ একটি গম্বুজাকৃতি চূড়ার নিম্নে অবস্থিত। 'আঙ্কর বট' কম্বোজীয় হিন্দু ভাস্কর্য্যের একটি প্রকৃষ্ট নিদর্শন। ইহাতে প্রথমে ব্রহ্মার পূজা হইত, পরে ইহা বৌদ্ধ মন্দিরে পরিণত হয়। আঙ্কর বটই এই হিন্দুরাজগণের শেষ কীর্ত্তি। ধরণীন্দ্র বর্ম্মার (১১৫২—১১৬২ খৃষ্টাব্দ) সময়ে চম্পানগরীর হিন্দু-রাজার সহিত যুদ্ধ আরম্ভ হয় এবং ইহার পর সমস্ত নির্ম্মাণ কার্য্য বন্ধ হইয়া যায়। অষ্টম জয়বর্ম্মা (১১৬২—১২০১ খৃষ্টাব্দ) শেষ শক্তিশালী কম্বোজ সম্রাট। ১১৭৭ খৃষ্টাব্দে তাঁহার রাজধানী লুণ্ঠিত হয়। যদিও ১১৯০—১২২৪ খৃষ্টাব্দে চম্পা পরাজিত এবং কম্বোজ রাজের অধিকৃত হয় কিন্তু এই লোকক্ষয়কর বহু বর্ষব্যাপী যুদ্ধ বিগ্রহের ফলে কম্বোজ রাজশক্তি চিরকালের জন্য শ্রীভ্রষ্ট হইয়া যায়। তাতার চীন সম্রাট কুবলা খাঁ কর্ত্তৃক (১২৯০—১২৯৪ খৃষ্টাব্দ) চীনের শান রাজগণের পরাজয় হেতু শ্যাম দেশের শান গণের পরাক্রম বৃদ্ধি পায়। ১২৮৪ খৃষ্টাব্দে রাম খামেঙের নেতৃত্বে শ্যামদেশের শানগণ সঙ্ঘবদ্ধ হয়, পরে রামাধিবাদি প্রথম সম্রাট রূপে 'অযোধ্যা'য় শ্যামরাজ্যের রাজধানী স্থাপন করেন। কম্বোজ পরিশেষে শ্যামরাজ্যের সামন্ত রাজ্য রূপে পরিগণিত হয়। ব্রা (ব্রহ্মা)বংশীয় নরোত্তম ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে ফরাসীর প্রাধান্য স্বীকার করেন। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে নরোত্তমের ভ্রাতা শিশোবথ কম্বোজ সিংহাসন আরোহণ করেন।

কম্বোজের উত্তর এবং পশ্চিমে যে সমস্ত শান রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয়, তন্মধ্যে ল্যাম্পুন প্রভৃতি লাওশান এবং চীন যুনানের রাজ্য সমূহে চীন সভ্যতার এবং অন্যান্য শান-রাজ্যে ভারতীয় হিন্দু এবং পরে বৌদ্ধ সভ্যতার প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়। শ্যামাধিপতি প্রথম রামাতিবোদির (১৩৫০—১৩৬৯ খৃষ্টাব্দ) সময় হইতে কম্বোজের আধুনিক যুগ আরম্ভ হয়। দ্বিতীয় রামসেন (১৩৮৪ খৃষ্টাব্দ) কম্বোজ এবং পেগুরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। তাঁহার পর পরম রাজা (১২০৯—১৫১৩ খৃষ্টাব্দ) এবং তৎপরে নরেশ (১৫৫৮—১৫৫৯ খৃষ্টাব্দ) পেগু, চম্পা এবং কম্বোজ এই তিন রাজশক্তির সহিত বহুকাল ধরিয়া যুদ্ধ করিয়া শ্যামের আধিপত্য বিস্তার করেন। ১৬১২ খৃষ্টাব্দ হইতে য়ুরোপীয়গণ শ্যামদেশে আগমন করিতে থাকেন এবং ফরাসী রাজদূত ১৬৮। খৃষ্টাব্দে সমাদরে অযোধ্যায় অভ্যর্থিত হন। নারায়(ণ) অযোধ্যার শেষ সম্রাট। ইঁহার রাজত্বকালেই কনষ্টানটাইন ফল্কন নামক একজন গ্রীক, শাসন ব্যাপারে বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করেন। ১৬৮৮ খৃষ্টাব্দে শানবংশীয়গণের রাজত্বের অবসান হয়। ১৭৮২ খৃষ্টাব্দে শ্যামের বর্ত্তমান রাজবংশের আদিপুরুষ ব্যাঙ্ককে নূতন রাজত্ব স্থাপন করেন। প্রসৎ সেনের রাজত্বকালে মালয় অধিকৃত এবং কম্বোজ চম্পারাজের অধীনতাপাশ হইতে মুক্ত করিয়া শ্যামরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। পরমেন্দ্র মহামুকুটের রাজত্বকালে ফরাসীগণ আঙ্কর বটের মন্দির আবিষ্কার করেন। চূড়ালঙ্করণের রাজত্বকালে শ্যামদেশের সীমা নির্দ্ধারণ এবং বিভিন্ন ইয়ুরোপীয় রাজশক্তি এবং জাপানের সহিত শ্যামরাজের সখ্যতামূলক সন্ধি হয়। দশম শতাব্দীর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত শ্যামদেশে হিন্দুধর্ম্মের প্রাধান্য ছিল, তৎপরে ক্রমে ক্রমে ব্রহ্মদেশের ন্যায় ইহার শাসকগণের বৌদ্ধধর্ম্ম অবলম্বনের সঙ্গে সঙ্গে দেশের জনসাধারণ বৌদ্ধধর্ম্মানুরাগী হইয়া পড়েন। শ্যামরাজগণ বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী হইলেও এখনও এই প্রদেশে প্রচলিত বহু আচার, অনুষ্ঠানে হিন্দু এবং বৌদ্ধধর্ম্মের সংমিশ্রণ পরিলক্ষিত হয়। সেদিনও একজন অধ্যাপক কলিকাতা হইতে সুদূর শ্যামদেশে গিয়া ব্যাঙ্ককে তথাকার প্রাচীন ব্রাহ্মণ অধিবাসীগণের বংশধরগণের সহিত পরিচিত হইয়াছিলেন।

খৃষ্ট-পূর্ব্ব ১৫০ বর্ষে কম্বোজের উত্তর এবং পূর্ব্বভাগে বর্ম্মাবংশীয় হিন্দু রাজকুমার কর্ত্তৃক চম্পা রাজ্য স্থাপিত হয়।

খৃষ্ট-পূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দী বা তাহার কিছু পূর্ব্ব হইতে আদিম চামগণ কর্ত্তৃক অধ্যুষিত এই প্রদেশে হিন্দুগণ প্রথমে আগমন করিতে থাকেন। চম্পা দেশের উত্তর বিভাগে চীন রাজগণের অধিকার ছিল। পরমেশ্বর চম্পার প্রথম হিন্দু রাজা। খৃষ্টপূর্ব্ব ১৫০ বর্ষ হইতে ১৪৭০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত হিন্দু রাজবংশ চম্পায় রাজত্ব করেন। বর্ত্তমানে আনাম প্রদেশে ইসলাম ও চৈনিক বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু পূর্ব্বে এখানে ভারতীয় হীনযানে মতের বিশেষ প্রচলন ছিল। ২৫০ খৃষ্টাব্দে মুড়ারাজা পাণ্ডুরঙ্গ নগরের পত্তন করেন। মহাচীন সম্রাট অনেকবার এই হিন্দু সাম্রাজ্য ধ্বংস করিতে চেষ্টা করিয়া বিফলমনোরথ হয়েন। ৩৯৯ খৃষ্টাব্দ হইতে ৪৩১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই মহাযুদ্ধ চলিতে থাকে। রাজ্য মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইলে ৪৫০ খৃষ্টাব্দে ভদ্রবর্ম্মন বা ধর্ম্মমহারাজ পো নগরের বিখ্যাত মন্দির কারুকার্য্য দ্বারা সুশোভিত করিতে থাকেন। চম্পারাজ্য কিন্তু অধিককাল নির্ব্বিরোধে শান্তিভোগ করিতে সক্ষম হয় নাই। চম্পা-রাজধানী শ্রীবনবী ক্ষেত্রে আন্দাজ ৬০৫ খৃষ্টাব্দে চম্পাসৈন্য মহাচীনের সহিত যুদ্ধে বিধ্বস্ত হয়। এই সময় হইতেই উত্তর বিভাগের চীন শাসনকর্ত্তার সহিত চম্পার যুদ্ধ বিগ্রহ চলিতে থাকে। প্রথম ঈশানবর্ম্মার রাজত্বকালে (৬১০—৬৫০ খৃষ্টাব্দ) হুয়েন সাঙ মহাচম্পায় আগমন করেন। পৃথিবীন্দ্র বর্ম্মা (৭৪০—৭৮১ খৃষ্টাব্দ) এবং প্রথম ইন্দ্রবর্ম্মা (৭৮৬—৮০২ খৃষ্টাব্দ) বার বার মলয় এবং যবদ্বীপবাসীগণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হন। বিক্রান্তবর্ম্মার (৮২৯ ৮৫৪ খৃষ্টাব্দ) সময়ের বহু বৌদ্ধ শাবণ আবিষ্কৃত হইয়াছে। ৯১৮ খৃষ্টাব্দে কম্বোজরাজগণ চম্পারাজের বিরুদ্ধে অভিযান করেন এবং দুর্ব্বল চম্পারাজগণ দশম এবং একাদশ শতাব্দীতে বহুবার আনামীয় ভিত্তরাজগণ কর্ত্তৃক পরাজিত হন। ১০০৪ খৃষ্টাব্দে চম্পারাজধানী শ্রীবনবী লে হাঙ কর্ত্তৃক লুণ্ঠিত হয়। ইহার অর্দ্ধশতাব্দী পরে চম্পারাজ-শ্রীপরমেশ্বর (১০৪৪—১০৬১ খৃষ্টাব্দ) লিথান টঙ্গের সহিত যুদ্ধে সমরক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জ্জন করেন। শ্রীপরম বোধিসত্ত্বের রাজত্বকালে আন্দাজ ১০৮৪ খৃষ্টাব্দে বৌদ্ধধর্ম্ম কিছুকালের জন্য চম্পা-রাজ্যের রাজধর্ম্মরূপে প্রচলিত হয়। শ্রীজয় দ্বিতীয় ইন্দ্রবর্ম্মার (১১৩৯—১১৪৫ খৃষ্টাব্দ) পরে আর কোন সংস্কৃত তাম্রশাসন চম্পারাজ্যে আবিষ্কৃত হয় নাই। শ্রীজয় তৃতীয় ইন্দ্রবর্ম্মার (১১৭৮—১১৯০ খৃষ্টাব্দ) রাজত্বকালে ১১৯০ খৃষ্টাব্দে কম্বোজাধিপতি জয়বর্ম্মা চম্পারাজ্য অধিকার করেন এবং এই সময় চম্পারাজ্যে কিছুকাল কম্বোজের অধীনতা স্বীকার করে। শ্রীজয় দ্বিতীয় সিংহবর্ম্মা (১২৭৫—১২৯০ খৃষ্টাব্দ) কুবলে খাঁ কর্ত্তৃক ১২৯০ খৃষ্টাব্দে পরাজিত হইলেও অত্যল্প কালমধ্যেই তরবারীর সাহায্যে চীনসম্রাটের অধীনতা-পাশ হইতে মুক্তিলাভ করেন, কিন্তু চম্পার ভাগ্যাকাশে বিপদজাল এই সময় হইতেই ঘনীভূত হইতে থাকে। শ্রীজয় তৃতীয় সিংহবর্ম্মার (১২৯৮—১৩০৬ খৃষ্টাব্দ) সময়ে চম্পারাজ্যে প্রথম ইসলাম ধর্ম্মের প্রবর্ত্তন হয়। ১৩০৬ খৃষ্টাব্দে চম্পারাজ্য আনামের অন্তর্ভুক্ত হইয়া যায়। চম্পারাজগণ কিন্তু অবনত মস্তকে চিরকাল আনামের প্রভুত্ব স্বীকার করেন নাই। সুবিধা পাইলেই চম্পারাজ আপনার স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া আনামের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতেন। শ্রীজয় চতুর্থ সিংহবর্ম্মার (১৪৩৬—১৪৪৬ খৃষ্টাব্দ) সময়েরও উৎকীর্ণ লিপি চম্পারাজ্যে পাওয়া গিয়াছে। তাঁহারই রাজত্বকালে ১৪৪৬ খৃষ্টাব্দে লে থান টঙ কর্ত্তৃক শেষ চম্পা-রাজধানী পাণ্ডুরঙ্গ অধিকৃত হইলে স্বাধীন চম্পারাজ্যের অস্তিত্ব চিরকালের জন্য লুপ্ত হইয়া যায়।

এক্ষণে ফরাসী রাজশক্তির অধীনে হুয়ের আনামীয় সম্রাট আনাম দেশ শাসন করিতেছেন, কিন্তু যে বিশাল হিন্দুসাম্রাজ্য অমিত প্রতাপে সপ্তদশ শতাব্দীর অধিক কাল ধরিয়া চীন, আনাম, যবদ্বীপ, ব্রহ্মদেশ, কম্বোজ প্রভৃতি পরাক্রান্ত রাষ্ট্রমণ্ডলীর লোলুপদৃষ্টি হইতে আপনার স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিল, সর্ব্বধ্বংসী কালের প্রভাবে সেই মহাচম্পার স্মৃতি আজ বিস্মৃতি-সাগরে ডুবিয়া গিয়াছে। এখনও মহাচম্পায় হিন্দু ভাস্কর্য্যের বিরাট কীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষগুলি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। আকৃতির বিশালতায় ও শিল্পসৌকর্য্যার্থে ইহারা আঙ্কর বট প্রভৃতি কম্বোজ স্থাপত্য কীর্ত্তিগুলিকে পরাজিত করিয়াছে। ১৮২০ খৃষ্টাব্দেও চম্পার শেষ রাজকুমার তথায় বাস করিতেন,

কিন্তু ঐ বৎসর তিনি চিরকালের তরে জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া কুম্বোজে প্রস্থান করেন। ফরাসী প্রত্নতাত্ত্বিকগণ এখনও এই সমস্ত প্রদেশের হিন্দুরাজ্য সমূহের প্রকৃত ইতিহাস রচনার উপযোগী প্রচুর উপকরণ প্রাপ্ত হন নাই। উৎকীর্ণ লিপি, চীন ও আনামীয় সমসাময়িক ইতিহাস, দেশীয় কিম্বদন্তী ও আখ্যায়িকা প্রভৃতির সাহায্যে তাঁহারা কয়েকটি রাজ্যের ইতিহাসের যে স্থূল বৃত্তান্তগুলি অবগত হইয়াছেন তাহারই সার সঙ্কলন এই প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ হইল। ভারতীয় হিন্দুসভ্যতার এই সমস্ত অতীত নিদর্শনের মধ্যে অনুসন্ধান করিলে হয়ত বাঙ্গালার প্রাচীন ইতিহাসের এক অজ্ঞাত অধ্যায়ের পরিচয় পাইবার বিশেষ সম্ভাবনা আছে, কিন্তু যতদিন না শিক্ষিত বাঙ্গালী ঐতিহাসিক স্বচক্ষে এই সমস্ত পুরাকীর্ত্তি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তাহাতে প্রাচীন বাঙ্গালীর পূর্ব্বপুরুষের হস্তাবলেপ নিঃসংশয়ে প্রমাণ করিতে পারিতেছেন, ততদিন বিজ্ঞানসম্মত ঐতিহাসিক জগতে এইরূপ অনুমানের কোনই মূল্য নাই। আত্মবিস্মৃত বাঙ্গালীর দৃষ্টি স্বদেশের অজ্ঞাত ইতিহাসের প্রতি এতদিনে আকৃষ্ট হইয়াছে বটে, কিন্তু বাঙ্গালীর কীর্ত্তি, বাঙ্গালীর প্রতিভা বহু দেশেই কেবল আবদ্ধ ছিল না—যবদ্বীপ শ্যাম-কম্বোজ ক্ষেত্রের বিশাল অরণ্যানী বক্ষে ভগ্ন প্রস্তর ইষ্টকাস্তূপ এবং ধাতু ও শিলালিপির মধ্যে তাহার চিহ্ন এখনও মুদ্রিত রহিয়াছে। *

পিস্তলের গুলি।

[শ্রীসুশীলকুমার রায়]

সেবার আমাদের তাঁবু পড়েছিল ন—সহরেতে। সৈনিক জীবনের রোজনামচা বোধ হয় সকলের জানাই আছে। সকালে উঠে কুচকাওয়াজ, ঘোড়ায় চড়া,—সন্ধ্যেবেলা মদ আর তাস। এই একঘেয়ে নিয়ম-ছাড়া ছোট্ট সহরটিতে তেমন কোন মেশবার জায়গা ছিল না, তাই আমরা পরস্পরে যে যার তাঁবুতে গিয়ে দেখা ক'রতাম আর পোষাকগুলোই হ'ত আমাদের দর্শক।

সহরের একটি লোককে আমরা কেবল দলের ভেতর পেয়েছিলাম। বয়স তার প্রায় পঁয়ত্রিশ। চেহারা রুষিয়ানদের মত হ'লেও নাম বিদেশী ধরণের। সে প্রায়ই একটা কালো কোট গায়ে দিয়ে পায়ে হেঁটে সব জায়গায় ঘুরে বেড়াত।

তার সখের ভেতর ছিল পিস্তল ছোঁড়া। ঘরের দেওয়ালটা গুলি ছুঁড়ে ছুঁড়ে মৌচাকের মত ক'রে তুলেছিল। আমরা সহরে গেলেই প্রায় তার বাড়ীতে গিয়ে বসতাম। পাঁচ রকম কথা কইতে কইতে যখন ডুয়েলের কথা উঠ্‌ত তখনই সে চুপ ক'রে যেত। আমরাও কথাটা ইচ্ছে ক'রেই অন্যদিকে ঘুরিয়ে নিতাম।

একদিন সন্ধ্যেবেলা তাকে চেপে ধরলাম তাস খেলবার জন্যে। আমাদের তাঁবুতে অন্য সৈন্যদল থেকে একজন সৈনিক সেইদিন বদলি হ'য়ে এসেছিল। সে সঙ্গে থাকাতে উৎসাহটা আরো যেন বেড়ে গেল। সিলভীও প্রথমে কিছুতেই রাজী হ'ল না। শেষে অনেক অনুরোধের পর খেলতে রাজী হ'ল।

সিলভীও খেলা ক'রতে বসে কখনও কথা কইত না। খেলা বেশ জমে এসেছে এমন সময় দলের নতুন বন্ধুটি বোধ হয় ভুলে দু' তিনটি নম্বর বেশী বসিয়ে গেল। সিলভীও গম্ভীরভাবে সেগুলি মুছে ঠিক নম্বর বসিয়ে দিলে। নতুন বন্ধু খেলার বাজীর সময় আবার ভুল নম্বর দিলে। সিলভীও এবারও সেটা মুছে দিলে। সঙ্গে সঙ্গে নতুন বন্ধুর ধৈর্য্যচ্যুতি হ'ল। টেবিলের ওপর থেকে পেতলের বাতিদানটা টেনে নিয়ে সিলভীওর মাথা লক্ষ্য ক'রে ছুঁড়লে। আঘাত লাগবার আগেই সিলভীও সেটা ধরে ফেলে রাগে কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে বল্লে, "ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে আজ আপনি আমার বাড়ীর অতিথি—"

* Historical facts are mainly taken from the History of the Nations of the World.

আমরা এই উদ্ধত বন্ধুর জীবনের আশা ছেড়ে দিলাম। খেলা আর জমল না। সেদিনকার মত খেলা ভাঙ্গল।

সকালে উঠে কুচকাওয়াজ করবার সময় সেই বন্ধুকে জীবিত দেখে আমরা আশ্চর্য্য হ'য়ে গেলাম। একদিন, দুদিন, তিনদিন গেল, বন্ধুর জীবনের কোন আশঙ্কাই দেখলাম না।

আমার ধারণা ছিল, সিলভীও একজন নির্ভীক বীর-পুরুষ, কিন্তু এই ব্যাপারে তার ওপর আমার শ্রদ্ধা অনেকটা কমে গেল।

দু'চার দিন বাদে আমরা সিলভীওর বাড়ীতে গিয়ে হাজির হ'লাম। দেখি, সে বোর্ডের ওপর কাগজ লাগিয়ে তার ওপর পিস্তল ছুঁড়ছে। আগে আমাদের যেভাবে সে অভ্যর্থনা ক'রে বসাত সেইভাবে আজও বসালে। গল্প-গুজব চলতে লাগল। কিন্তু আগেকার মত তেমন প্রাণ খুলে তার কথায় যোগ দিতে পারলাম না। সিলভীওর চরিত্রের ওপর অশ্রদ্ধাই বোধ হয় আমাকে তার কাছ থেকে অনেকটা দূরে সরিয়ে দিয়েছিল।

মঙ্গলবার আর বুধবার আমাদের চিঠি আসবার দিন। সেদিন আমরা সকলেই যে যার ডাক নিয়ে ব্যস্ত থাকি। সিলভীও আমাদের তাঁবুতে এসে ডাক খুলত।

সেদিন ডাক খুলতে খুলতে সিলভীওর চোখে মুখে বেশ একটা চঞ্চল ভাব দেখা গেল। সে তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে বল্লে, কোন জরুরী কাজের জন্যে আমাকে বাইরে যেতে হচ্ছে, আর হয়ত তোমাদের সঙ্গে দেখা হবে না। আজ তোমাদের আমার বাড়ী চা পান করবার নিমন্ত্রণ রইল। তারপর আমার দিকে ঘুরে বল্লে, তুমিও এসো। আমি তোমার জন্যে অপেক্ষা করব।

সন্ধ্যের সময় আমি সিলভীওর বাড়ীতে গিয়ে হাজির হ'লাম। দেখি, জিনিষপত্র সব প্যাক হয়ে গ্যাছে, শুধু মৌমাছির চাকের মত বুলেটে ছ্যাঁদা করা বোর্ডটা পড়ে রয়েছে।

বেশ তৃপ্তির সঙ্গে আমাদের খাওয়া হ'ল। সিলভীওকে আজ এই প্রথম সকলের সঙ্গে বেশ গল্প করতে দেখলাম।

আমরা যখন চেয়ার ছেড়ে উঠলাম তখন বাইরে বেশ অন্ধকার হয়ে গ্যাছে। একে একে সবাই বিদায় নিলে। আমি হাত বাড়িয়ে দিতেই সে আমার হাতটা চেপে ধরে বল্লে, তোমার সঙ্গে আমার একটা বিশেষ কথা আছে। আমি তার কথা এড়াতে পারলাম না। আস্তে আস্তে দুজনে গিয়ে সাম্না-সাম্নি চেয়ারে বসে পড়লাম। সে দুটি সিগার ধরিয়ে একটি আমার হাতে দিলে।

সিলভীওর মুখ চোখ যেন ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। পনের মিনিট আগে যার মুখের ওপর দিয়ে একটা আনন্দের ঢেউ বয়ে গেছে, তার এই হঠাৎ পরিবর্ত্তন দেখে আমিও যেন কেমন হয়ে গেলাম। খানিকক্ষণ এইভাবে বসে থেকে সিলভীও বলতে আরম্ভ করলে—"বোধ হয় আর তোমার সঙ্গে আমার দেখা হবে না। আজ যাবার আগে তোমাকে দু' একটা কথা বলে যাব। তুমি বোধ হয় জান আমি লোকের মতামত মানি না, কিন্তু আমি তোমায় পছন্দ করি, তাই যাবার আগে তোমার মনে একটা ভুল সন্দেহ রেখে যেতে চাই না।"

সিলভীও সিগারের ছাইটা টোকা মেরে ফেলতে ফেলতে আবার বলতে লাগল—

তুমি মনে মনে বোধ হয় আশ্চর্য্য হচ্চ আমি সেদিনকার অপমানের প্রতিশোধ কেন নিই নি।

তুমি হয় ত বলবে, পিস্তলের গুলিতে তারই মৃত্যুর আশঙ্কা বেশী। ঠিক, কিন্তু আমি মিথ্যে বলব না, যদি সেই সঙ্গে আমার জীবনের আশঙ্কা না থাকত তাহ'লে আমি কখন তাকে ক্ষমা করতে পারতাম না।

আমি এই অদ্ভুত লোকটির দিকে শুধু অবাক হয়ে চেয়ে রইলুম। নিজের দুর্ব্বলতা লোকে যে এমন স্পষ্ট করে খুলে বলতে পারে, তা' আগে জানতুম না। সিলভীও বলতে লাগল—

নিজেকে মৃত্যুর মুখে দাঁড় করিয়ে দেবার অধিকার এখন আমার নেই। ছ'বছর আগে এই গালে একজন চড় মেরেছিল, কিন্তু সে এখন বেঁচে আছে।

আমি আর থাকতে পারলাম না। বলে ফেল্লাম, তুমি তার প্রতিশোধ নাও নি?

নিয়েছিলাম, আর তার চিহ্ন আজ পর্য্যন্ত আমার কাছে আছে।

সিলভীও উঠে ড্রয়ার টেনে একটি লাল টুপি বার করে মাথায় দিলে। দেখলাম কপালের ঠিক দু' আঙুল ওপর দিয়ে গোল ছেঁদা করে একটি গুলি বেরিয়ে গেছে।

সিলভীও বলতে আরম্ভ করলে—আমি আগে হুসার সৈনিকদলে কাজ করতাম। মদ খেয়ে মারামারি করবার প্রধান সর্দ্দার ছিলুম আমি। সেই সময় আমাদের দলে একজন লোক এল। আমি তার নাম করব না, তবে এমন ভাগ্যবান লোক আমার জীবনে আর কখন দেখিনি।

সে আসার পর থেকেই আমার আত্মমর্য্যাদায় যেন আঘাত লাগ্‌ল। তার সঙ্গে কোন মতেই বন্ধুত্ব পাতাতে পারলুম না। কিসে তার সঙ্গে ঝগড়া করব, এই হ'ল আমার প্রধান চিন্তা।

একদিন বল নাচেতে তার সঙ্গে আমার দেখা। সব মেয়েরা তাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আমোদ করছে। আমি আর থাকতে পারলুম না। এক সময় ফাঁক পেয়ে তাকে গিয়ে অপমান করলুম। সে সহ্য করতে পারলে না। রেগে আমার গালে জোরে এক চড় মারলে। আমি নিজের তলোয়ারে হাত দিলাম, সেও দিলে। নাচ বন্ধ হ'য়ে গেল। দু' চারজন মেয়ে ভয়ে মূর্চ্ছিত হ'য়ে পড়ল। সেই রাত্রেই আমরা ডুয়েলের জন্য প্রস্তুত হ'লাম।

সূর্য্য ওঠবার সঙ্গে সঙ্গে রাতের অন্ধকার ধীরে ধীরে পশ্চিম আকাশের কোণে সরে যাচ্ছিল। আমি মাঠের মাঝখানে তিনজন বন্ধু নিয়ে তার অপেক্ষায় দাঁড়িয়েছিলাম। একটু পরেই দেখি সে একটুপি চেরীফল হাতে নিয়ে একজন বন্ধুর সঙ্গে আসছে।

বার পা মেপে বন্ধুরা আমাদের যায়গা ক'রে দিলে। প্রথমেই আমার পিস্তল ছোঁড়বার কথা, কিন্তু উত্তেজনায় আমার হাত এমন কাঁপছিল যে লক্ষ্য ঠিক করতে পারলাম না। তাকে প্রথম পিস্তল ছুঁড়তে বল্লাম। সে রাজী হ'ল না। কিন্তু শেষে লটারী ক'রে ঠিক হ'লে গেল সেই আগে পিস্তল ছুঁড়বে। লক্ষ্য ঠিক ক'রে পিস্তল ছুঁড়লে বটে, কিন্তু সেটা কপালের দু' আঙুল ওপর দিয়ে বেরিয়ে গেল। এইবার আমার পালা। তার জীবন এখন আমার হাতে। আমি তার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে দেখতে লাগলাম যদি এক সেকেণ্ডের জন্যে তার মুখে কাতরতার ভাব ফুটে ওঠে। কিন্তু সে আমার পিস্তলের মুখের সামনে দাঁড়িয়ে পাকা চেরী ফল চুষে চুষে বিচিগুলো এমন ভাবে ফেলতে লাগল যে আমার পায়ের কাছ পর্য্যন্ত ছিটকে আসতে লাগল। তার এই অন্যমনস্কতা আমাকে যেন ক্ষেপিয়ে দিলে। আমি মনে মনে ভাবলাম, যখন এ জীবনটাই গ্রাহ্য করে না, তখন একে মেরে কোন লাভ নেই। একটা দুষ্টু মতলব আমার মাথার ভেতর বোঁ করে ঘুরপাক খেয়ে গেল। আমি আস্তে আস্তে পিস্তলটা নীচু ক'রে নিয়ে বল্লাম, 'তুমি বোধ হয় এখন মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত নও। আমি তোমার প্রাতঃভোজনে বাধা দেবো না।'

সে উত্তর দিলে, বাধা কিছুই নয়। তুমি ইচ্ছে করলে গুলি ছুঁড়তে পার,—নাও পার। কিন্তু এ তোমার পাওনা রইল। তুমি যেদিন ব'লবে আমি সেদিন প্রস্তুত হ'ব। আমি বন্ধুদের সাক্ষী ক'রে বাড়ী ফিরলাম।

সেইদিনই আমি চাকরী ছেড়ে দিয়ে এই সহরে এসে বাস করছি আর প্রত্যেক দিনই প্রতিশোধ নেবার জন্যে প্রস্তুত হ'চ্চি। এইবার সেই সময় এসেছে।

সিলভীও পকেট থেকে সকাল বেলাকার চিঠিখানি বার ক'রে আমার হাতে দিলে।

কে একজন মস্কো থেকে লিখেছে—যুবকের সঙ্গে একটি সুন্দরী যুবতীর বিবাহ হ'য়ে গেছে।

সিলভীও আমার মুখের দিকে চেয়ে বল্লে, তুমি বোধ হয় অনুমান ক'রতে পারছ কে সেই যুবক, যার জন্যে আমি মস্কো যাচ্ছি। আমি দেখবো এইবার মৃত্যুর বিভীষিকা তাকে কাতর ক'রতে পারে কি না।

সিলভীও তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে মাথার সেই বুলেটে ছ্যাঁদা করা লাল টুপিটা ফেলে দিয়ে মেঝের ওপর পায়চারী করতে লাগল। বোধ হ'ল যেন একটা ক্রুদ্ধ বাঘ খাঁচার ভেতর ঘুরে ফিরে বেড়াচ্ছে।

চাকর এসে বলে গেল গাড়ী প্রস্তুত। সিলভীও আমার হাতখানা খুব জোরে চেপে ধ'রলে। তারপর বিদায় নিয়ে গাড়ীতে গিয়ে উঠে ব'সল। চাকর দুটি বাক্স গাড়ীর ওপর রেখে দিলে। একটিতে তার পিস্তল আর অপরটিতে তার সাজ সরঞ্জাম।

আমি শেষ বিদায় নিলাম। দেখতে দেখতে কালো গ্রাউণ্ড ঘোড়া দুটো অন্ধকারে যেন মিশে গেল।

তার পর দু' চার বছর কেটে গেছে। আমি সৈনিকের কাজ ছেড়ে নিজের ছোট্ট ম - গ্রামে এসে বাস ক'রছি। যেটুকু জমি আছে তাইতে চাষ করি আর দিনের বেলা খুব দেরী করে খাই সন্ধ্যে হলেই শুয়ে পড়ি।

এই ভাবে যখন দিনগুলো কাটছিল তখন একদিন খবর পেলাম কাউণ্টেস বি—তাঁর স্বামীর সঙ্গে আমাদের পাশের গ্রামে তাঁর জমিদারীতে গ্রীষ্ম ক'মাস বাস ক'রতে আসছেন। এত বড় একটা বড়লোক আমাদের গাঁয়ের পাশে আসছে, এঁদিতে গেলে এক রকম প্রতিবেশী—শুনে বড় আনন্দ হ'ল।

জুন মাসের প্রথম সপ্তাহেই তাঁরা এলেন। আমি খবর পেয়ে রবিবার দিন খাওয়া দাওয়া ক'রে তাঁদের সঙ্গে দেখা করবার জন্যে গেলাম।

একজন চাকর এসে আমাকে কাউণ্টের ঘরে বসিয়ে তাঁকে খবর দিতে গেল।

ঘরটি বেশ সুন্দর ভাবে সাজান। বইশুদ্ধ বড় বড় আলমারী, আয়না-বসান টেবিল। মেঝেটি সবুজ কার্পেট দিয়ে মোড়া। আমি অবাক হ'য়ে ঘরের সাজ সজ্জা দেখছিলাম, এমন সময় পাশের দোর ঠেলে প্রায় তিরিশ বত্রিশ বছর বয়সের একটি সুশ্রী যুবক ঢুকল। আমার বুঝতে বাকি রইল না যে ইনিই কাউণ্ট। তিনি হাসতে হাসতে এসে আমার পাশে একটি চেয়ারে বসে পড়লেন। আমিও আদব-কায়দার হাত থেকে অনেকটা বেঁচে গেলাম। প্রথম সাক্ষাতের যেটুকু লজ্জা ও জড়তা সেটুকু কাউণ্টের সরল কথা বার্ত্তায় ক্রমশঃ ভেঙ্গে আসছিল, এমন সময় কাউণ্টেস এলেন। প্রকৃতই তিনি একজন সুন্দরী। জগতের যত লজ্জা যেন আমায় পেয়ে বসলো। মনের ভেতর কেমন যেন একটা অশোয়াস্তি বোধ করতে লাগলাম। আমার দুরবস্থার কথা কাউণ্ট বোধ হয় বুঝতে পেরে, আমার একটু সুযোগ দেবার জন্যে তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে কথা কইতে লাগলেন, আমি ততক্ষণ উঠে ঘরের চারিদিকে ছবি ও বই দেখতে লাগলাম। সব চেয়ে একখানি ছবি বড় ভাল লাগল, সেখানি সুইটজারল্যাণ্ডের একটি দৃশ্য। ছবিতে আর একটি দেখবার আশ্চর্য্য জিনিষ ছিল। দুটি বুলেট পাশাপাশি ছেঁদা ক'রে চ'লে গেছে।

আমি কাউণ্টের দিকে ঘুরে বল্লাম, লক্ষ্যভেদটা বেশ হয়েছে।

কাউণ্ট একবার ছবির দিকে চেয়ে বল্লেন, ওঃ! হ্যাঁ, আপনারও অভ্যেস আছে না কি?

একটু আধটু আছে বৈ কি। আমি যে পিস্তল ব্যবহার করি সেই পিস্তলে তিরিশ পা দূর থেকে একখানি তাস লক্ষ্য করতে পারি।

কাউণ্টেস আমার মুখের দিকে একবার হাসিমুখে চেয়ে স্বামীকে বল্লেন, তুমি কি এখনো ঐ অতটা দূর থেকে নিশানা ঠিক ক'রতে পার?

কাউণ্ট একবার উদাস ভাবে ছবিটার দিকে চেয়ে বল্লেন, হ্যাঁ, আমিও এক সময় পারতুম—কিন্তু প্রায় চার বছর ও সব ছেড়ে দিয়েছি।

আমি বল্লাম, এ অবস্থায় আমার বোধ হয় আপনি এখন কুড়ি পা দূর থেকে নিশানা ঠিক ক'রতে পারবেন না। এ কেবল অভ্যাসের দরকার। আমি নিজেই একদিন বুঝেছিলাম। আমাদের সৈন্যদলে আমিই ভাল পিস্তল ছুঁড়তে পারতাম। একবার এমন হ'ল, আমার নিজের পিস্তল সারাতে দিয়েছিলাম, প্রায় এক মাস ব্যবহার করি নি, তার পর কুড়ি পা দূর থেকে একটি বোতলকে চারবার লক্ষ্য ঠিক ক'রেও মারতে পারি নি। আমি একজন লোককে জানি সে প্রত্যেক দিন তিনবার ক'রে পিস্তল ছোঁড়া অভ্যেস ক'রত।

আমি কথা কইছি দেখে কাউণ্ট ও কাউণ্টেস দুজনেই যেন বড় আনন্দিত হলেন।

কাউণ্টেস উৎসাহের সঙ্গে বল্লেন, তার কি রকম লক্ষ্য ছিল?

যেমন সে দেখলে একটা মাছি দেওয়ালে বসেছে—হাসবেন না কাউণ্টেস্—একেবারে সত্যি, অমনি সে ব'লবে কাউজকা, আমার পিস্তল। কাউজকা পিস্তল নিয়ে আসতেই আওয়াজ হ'ল—ফটাস! সঙ্গে সঙ্গে মাছিটা একেবারে দেওয়ালের সঙ্গে পিষে গেল।

কাউণ্ট ব'লে উঠলেন, আশ্চর্য্য! তার নাম কি?

সিলভীও।

যেন চমকে উঠে কাউণ্ট বল্লেন, সিলভীও! আপনি কি সিলভীওকে জানেন?

আমাদের দুজনকার ভেতর খুব বন্ধুত্ব ছিল। আমাদের তাঁবুর সকলেই তাকে ভায়ের মত দেখত। আজ পাঁচ বছর হ'ল তার কোন খবর পাই নি। আপনিও কি তাকে জানেন?

খুব জানি। সে কি তার জীবনের কোন নির্দ্দিষ্ট ঘটনা আপনাকে ব'লেছিল?

হ্যাঁ, শুনেছি বলনাচের সময় একজন তার গালে চড় মেরেছিল।

নাম ব'লেছিল কি?

না, সে ত' কই তা ব'লে নি...

কাউণ্ট তাড়াতাড়ি বল্লেন, আমিই সেই লোক, আর ঐ যে ছবিতে পিস্তলের গুলির পাশাপাশি দাগ রয়েছে, ওটা হচ্চে আমাদের শেষ বিদায়ের চিহ্ন।

কাউণ্টেস কাতর ভাবে বল্লেন, আর সে সব পুরোণো কথা তুলো না। আমার বড় কষ্ট হয়।

কাউণ্ট দৃঢ়ভাবে বল্লেন, আমি সিলভীওকে অপমান ক'রেছি তা উনি জানেন, তখন সে কি ভাবে তার প্রতিশোধ নিয়েছিল সেটাও ওঁর জেনে রাখা উচিত।

কাউণ্ট চেয়ারটা সরিয়ে নিয়ে আমার কাছঘেঁষে ব'সলেন। আমিও খুব উৎসাহের সহিত নীচেকার বর্ণিত ঘটনা শুনতে লাগলাম।

পাঁচ বছর আগে আমি বিয়ে করি। বিয়ের প্রথম মাসটা এই গ্রামেই বাস করি। এই যে বাড়ী, এর সঙ্গে আমার জীবনের পরিপূর্ণ সুখ ও দুঃখের স্মৃতি জড়ানো আছে।

একদিন সন্ধ্যাবেলা আমরা দুজনে ঘোড়া চ'ড়ে বেড়াতে গেছলাম। ফেরবার মুখে স্ত্রীর ঘোড়া বিগড়ে যায়, কাজেই তাকে হেঁটে আসতে হয়। আমি আগেই বাড়ী ফিরেছিলাম। এসে দেখি আমার বাড়ীর সামনে একখানা গাড়ী দাঁড়িয়ে। খবর নিয়ে জানলাম একজন লোক আমার জন্যে বৈঠকখানায় অপেক্ষা ক'রছে। ঢুকে দেখি অন্ধকারে একটি লোক আগুনের চিমনীর পাশে দাঁড়িয়ে আছে।

আমায় দেখেই সে বল্লে, আমায় চিনতে পারছেন না কাউণ্ট? তার গলার স্বরটা যেন কাঁপছিল।

আমি চীৎকার করে বল্লাম, সিলভীও! সঙ্গে সঙ্গে আমার মাথার চুলগুলো যেন খাড়া হ'য়ে উঠল।

হ্যাঁ, ঠিক তাই। আপনার কাছে আমার একটা পিস্তল ছোঁড়া পাওনা আছে। আজ তাই শোধ দিতে এসেছি। আপনি প্রস্তুত হ'য়ে দাঁড়ান।

তার পাশের পকেটে পিস্তলের নলটা উঁচু হয়েছিল।

আমি তাড়াতাড়ি বার পা গুণে ঐ কোণটাতে দাঁড়িয়ে বল্লাম, শীগ্‌গীর পিস্তল ছুঁড়ুন আমার স্ত্রী আসবার আগে। সে একটা আলো চাইলে। আমি একটা বাতি নিয়ে এসে দোর ভেজিয়ে দিয়ে তাকে পিস্তল ছুঁড়তে অনুরোধ করলাম। সে পিস্তল বার ক'রে আমার দিকে লক্ষ্য ক'রতে লাগল... আমি সেকেণ্ড গুণছিলাম...স্ত্রীর মুখ আমার চোকের সামনে ভেসে উঠল। উঃ সে সেকেণ্ড ক'টা কি ভীষণ! সিলভীও আস্তে আস্তে পিস্তল নীচু ক'রে নিলে।

সে বল্লে, আমি বড় দুঃখিত যে, পিস্তলে ভারী বুলেট দেওয়া। আমার বোধ হচ্ছে এ ডুয়েল হবে না, খুন করা হবে। আর নিরস্ত্রের ওপর লক্ষ্য করা আমার অভ্যেস নেই। আবার গোড়া থেকে সুরু করা যাক।

আমার মাথা ঘুরে গেল... বোধ হয় কোন আপত্তিও তুলেছিলাম। অবশেষে আবার দুটো পিস্তল ভরা হ'ল। দু' টুকরো কাগজে চিহ্ন দিয়ে টুপির ভেতর থেকে যখন শেষে বার করা হ'ল তখন দেখি আমারই প্রথম পালা পড়েছে গুলি ছোঁড়বার।

সে আমার দিকে চেয়ে হেসে বল্লে, কাউণ্ট, তুমি বড় ভাগ্যবান। সে হাসি আমি জীবনে কখন ভুলব না।

জানি না সেদিন আমার কি হয়েছিল, অথবা কি ক'রে আমায় বাধ্য করেছিল...আমি পিস্তল ছুঁড়লাম, ঐ ছবিট ফুঁড়ে গুলি চলে গেল।

কাউণ্ট আঙ্গুল দিয়ে ছবির মাঝখানে ছ্যাদাটা দেখিয়ে দিলেন। তাঁর মুখ উত্তেজনায় লাল হ'য়ে উঠেছিল। কাউণ্টেসের মুখ হাতের রুমালের মত সাদা।

কাউণ্ট বলে যেতে লাগলেন, আমি গুলি ছুঁড়লাম,—লক্ষ্যভ্রষ্ট হ'য়ে গেল। তার পর সিলভীও · সে সময় তাকে কি ভীষণ দেখাচ্ছিল···সিলভীও পিস্তল উঁচু করে লক্ষ্য ঠিক ক'র্‌তে লাগ্‌ল। হঠাৎ দোর খুলে গেল। মাশা দৌড়ে এসে আমার গলা জড়িয়ে ধরলে, সঙ্গে সঙ্গে আমার নুইয়ে-পড়া মনটা আবার সতেজ হ'য়ে উঠল।

আমি তাকে বল্লাম, দেখছ না আমরা দুজনে ইয়ারকি করছিলা তুমি কতই ভয় পেয়েছ! যাও, একগ্লাস জল খেয়ে আমার কাছে এসো। আমি তোমায় আমার বন্ধুর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবো।

মাশার তবু যেন সন্দেহ গেল না!—সে সিলভীওর ভয়ানক চেহারার দিকে ফিরে বল্লে, সত্যি কি আপনি ঠাট্টা ক'রছেন?

সিলভীও হেসে উঠল, বল্লে, উনি সব সময়েই ঠাট্টা করছেন। একদিন ঠাট্টা ক'রে আমার গালে চড় মেরে-ছিলেন, আর একদিন আমার টুপির ভেতর দিয়ে গুলি চালিয়ে দিলেন, আবার এখন পিস্তল ছুঁড়ছিলেন, ফ'সকে গেছে,—সেও ঠাট্টায়; এবার আমিও একটু ঠাট্টা ক'রব বলে তৈরী হয়েছি।

সিলভীও গম্ভীর ভাবে পিস্তল তুলে আমার দিকে লক্ষ্য ক'র্‌তে লাগল।

মাশা তার পায়ের ওপর আছড়ে গিয়ে পড়্‌ল।

আমি অসহ্য রাগে চেঁচিয়ে উঠলুম, মাশা কি ক'রছো, ওঠো, তোমার একটু লজ্জা করে না! তার পর তার দিকে ফিরে বল্লাম, আপনি স্ত্রীলোকের সঙ্গে তামাসা করবেন না। পিস্তল ছুঁড়বেন?—কি না?

সিলভীও গম্ভীর ভাবে উত্তর দিলে, না। আমি আজ আপনার মুখের ওপর ভয় ও ভাবনার একটা করুণ ভাব ফুটে উঠতে দেখেছি। আমি সন্তুষ্ট। আমি জোর ক'রে আপনাকে পিস্তল ছুঁড়িয়েছিলাম। যথেষ্ট। আপনি আমায় মনে রাখবেন।

কথা শেষ হ'বার সঙ্গে সঙ্গেই সে যাবার জন্যে ফিরলে, তার পর দোরের কাছে এক সেকেণ্ডের জন্যে দাঁড়িয়ে ছবিটার দিকে চেয়ে নিশানা না ক'রেই পিস্তল ছুঁড়লে, তার পরেই ঝড়ের মত বেরিয়ে গেল। আমার স্ত্রী অজ্ঞান হয়ে গেছল। চাকররা সিলভীওর সামনে পর্য্যন্ত যেতে সাহস করে নি। আমি সুস্থ অবস্থায় ফিরে আসবার আগেই সে বাড়ী ছেড়ে চলে গেছল।

কাউণ্ট চুপ ক'রে বাইরের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইলেন।

যার জীবনের প্রথম ইতিহাস শুনে আকৃষ্ট হ'য়ে প'ড়ে-ছিলাম, তার বিষয় আজ সমস্তই জানতে পারলাম। কিন্তু তাকে আর কখন দেখি নি। শুনেছি দেশের জন্যে কোন্ যুদ্ধে সে প্রাণ দিয়েছে। *

* Alexander Poushkinএর গল্প হইতে।

অগ্নিমান্দ্য বা অজীর্ণ রোগ।

দেশীয় মতে চিকিৎসা।

[কবিরাজ শ্রীঅমূল্যচরণ চক্রবর্ত্তী ভিষগ্‌রত্ন]

দেহীদিগের উদর-দেশ মধ্যে নাভির পার্শ্বে আমাশয় ও পক্বাশয়ের মধ্যবর্ত্তী স্থানে পাচক নামক অগ্নি ও সমান নামক বায়ু আছে। উক্ত পাচক অগ্নি সমান বায়ুর সাহায্যে ভোজ্য, ভক্ষ্য, চর্ব্ব্য, লেহ্য, পেয্য ও পেয়, এই ষড়বিধ আহারকে পরিপাক করিয়া তাহার সার পদার্থ রস ও সার-হীন অসার পদার্থ তরল মলরূপে পৃথক পৃথক ভাবে উৎপন্ন

করে। সার পদার্থ রস হইতে রক্ত, মাংস, অস্থি, মেদ, মজ্জা ও শুক্র যথাক্রমে সপ্তধাতুতে পরিণত হইয়া জীবন ধারণ ও পোষণ করে, এবং অসার পদার্থ দ্রব মল হইতে জলীয় অংশ মূত্র ও অদ্রব অংশ পুরীষ (বিষ্ঠা) রূপে পরিণত হইয়া মূত্র ও মলমার্গ দ্বারা নির্গত হইয়া শরীরকে সুস্থ ও সচ্ছন্দে রাখে। পাচক অগ্নি ও সমান বায়ুর ক্রিয়ার বৈলক্ষণ্যই অগ্নিমান্দ্য বা অজীর্ণ রোগ। ডাক্তারী মতে ইহাকে Dyspepsia or Indigestion বলে।

কারণতত্ত্ব ঃ—অধিক জলপান, অপরিমিত ও গুরুপাক দ্রব্য ভোজন অল্প ও বহুবার বা অসময়ে আহার, উত্তমরূপে চর্ব্বণ না করিয়া উদরস্থ করা, অধিক অম্ল বা অপক্ক তৈল, ঘৃত ভোজন, অধিক তামাক, চা বা মদ্য পান, অতিরিক্ত শারীরিক বা মানসিক পরিশ্রম, অথবা একেবারে পরিশ্রম না করা, মল মূত্রের বেগ ধারণ, দিবা নিদ্রা বা রাত্রি জাগরণ, অতি মৈথুন, অস্বাস্থ্যকর গৃহে বাস; এই সমস্ত কারণে ভুক্ত দ্রব্য উপযুক্ত পরিমাণে পরিপাক না হইয়া বিকৃত প্রাপ্ত হইয়া অজীর্ণ বা অগ্নিমান্দ্য রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

লক্ষণতত্ত্ব ঃ—অজীর্ণ বা অগ্নিমান্দ্য রোগ উপস্থিত হইলে ক্ষুধামান্দ্য, পেটফাপা, কোষ্ঠবদ্ধ, বা উদরাময়, অম্লোদগার, বমন ইচ্ছা, বুক ও গলা জ্বালা, পেটভার, মুখ দিয়া জল উঠা, আহারান্তে পেটবেদনা, শ্বাসে দুর্গন্ধ, বুক ধড়ফড় করা, মাথা ব্যথা, এই সকল লক্ষণ দৃষ্ট হয়। ইহা হইতে বিসূচিকা (কলেরা), বাত, বহুমূত্রাদি বহুবিধ পীড়া উৎপন্ন হইয়া থাকে।

চিকিৎসা ঃ—

(১) হরীতকী, চিতা ও সৈন্ধব লবণ চূর্ণ উষ্ণ জল সহ সেবন করিলে অজীর্ণ নিবারিত হয়।

(২) শুঁঠ ও ধনিয়ার কাথ পান করিলে অজীর্ণ ও শূল প্রশমিত হয়।

(৩) হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, সৈন্ধব লবণ চূর্ণ কিম্বা আদা ও সৈন্ধব লবণ চূর্ণ গরম জল সহ সেবন করিলে অজীর্ণ উপশম হয়।

(৪) যোয়ান ও শুঁঠের কাথ সেবন করিলে অজীর্ণ, পেটফাঁপা, চুঁয়াঢেকুর প্রশমিত হয়।

(৫) চিতা, বনযমানি, সৈন্ধব লবণ ও মরিচচূর্ণ সেবন করিলে অজীর্ণ উপশম ও অগ্নির বৃদ্ধি হয়।

(৬) হরীতকী, পিপুল ও সৌবর্চ্চল লবণ চূর্ণ দধির মাৎ কিম্বা উষ্ণজলের সহিত সেবন করিলে অজীর্ণ, মন্দাগ্নি, বাতশূল ও গুল্মের শান্তি হয়।

(৭) ডহর করঞ্জার ছাল, নিমছাল, আ[illegible] বীজ, গুলঞ্চ, শ্বেত তুলসী, ইন্দ্রযব (কুড়চির বিচি) [illegible] কাথ পান করিলে অজীর্ণ, বিসূচিকা (কলেরা) নিবৃত্ত হয়।

(৮) হরীতকী, ধনে কাঁজীতে সিদ্ধ করিয়া [illegible] হিঙ্গু * পিপুল ও সৈন্ধব লবণচূর্ণ, প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে অজীর্ণ শান্ত হইয়া ক্ষুধার উদ্রেক হয়।

(৯) যোয়ান, হরীতকী, সৈন্ধব লবণ ও শুঁঠের চূর্ণ গরম জলের সহিত সেবন করিলে অজীর্ণ ও উৎকট আমশূল নিবারিত হয়।

(১০) চিতা, পিপুল মূল, কুড়মূল, শুঁঠ ও ধনে ইহাদের কাথে শোধিত হিঙ্গু, বিট ও সৈন্ধব লবণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে অজীর্ণ ও কোষ্ঠবদ্ধ প্রশমিত হয়।

(১১) কাঁকরোলের মূলের কাথ † সেবন করিলে রস-অজীর্ণ বিনষ্ট হয়।

(১২) সচল লবণ গোমূত্র সহযোগে পান করিলে রস-অজীর্ণ নিবৃত্ত হয়।

(১৩) ডহর করঞ্জার বিচির শাঁস, হরীতকী, চিতা, বিড়ঙ্গ, পিপুল, শুন্ঠী, প্রত্যেক ১ ভাগ ও চিনি ৬ ভাগ একত্র চূর্ণ করিয়া ।০ চারি আনা হইতে ॥০ অর্দ্ধ তোলা

---

* হিঙ্গু শোধন :—লৌহপাত্রে ঘৃত দিয়া ভুনিয়া লইলে হিঙ্গু শোধিত হয়।

† কাথ বা কষায় প্রস্তুত প্রণালী :—

কাথের দ্রব্যগুলি সমান ভাগে লইয়া সর্ব্বমোট দুই তোলা ওজন করিয়া বেশ টুকরা টুকরা কাটিয়া থেঁতো করিয়া একটি মাটীর হাঁড়িতে /॥০ অর্দ্ধসের পরিমাণ জল দিয়া কাঠের জ্বালে সিদ্ধ করিয়া /৴০ অর্দ্ধ পোয়া থাকিতে নামাইয়া বেশ পরিষ্কার কাপড় দ্বারা ছাঁকিয়া সেবন করিবে।

মাত্রায় সেবন করিলে অজীর্ণ, কোষ্ঠবদ্ধ ও অগ্নিমান্দ্য প্রশমিত হয়।

(১৪) আহারের পূর্ব্বে আনারসের রস ২ ভাগ, চিনি ১ ভাগ গরম জল সহ সেবন করিলে পুরাতন অজীর্ণ উপশম হয়।

সাধারণ নিয়মঃ—অজীর্ণ বা অগ্নিমান্দ্য রোগে পথ্যাপথ্যের নিয়ম পালন করিয়া চলিলে বিশেষ সুফল পাওয়া যায়। প্রত্যহ যথাসময়ে স্নান ও ভোজন করা এবং আহারীয় দ্রব্যাদি ধীরে ধীরে চর্ব্বণ করা বিধেয়। গুরুপাক দ্রব্য (যথা :—মরিচ, লঙ্কা বা বেশী গরম মশলা অথবা তৈল ও ঘৃত সংযুক্ত ব্যঞ্জনাদি) ভোজন নিষিদ্ধ। আহার করিয়া অন্ততঃ অর্দ্ধ ঘণ্টা বিশ্রাম না করিয়া দ্রুত পথ পর্য্যটন, শারীরিক বা মানসিক পরিশ্রম করা উচিত নয়। দিবানিদ্রা বা রাত্রি জাগরণ, অধিক রাত্রিতে ভোজন, আহার করিয়াই শয়ন, অতি মৈথুন পরিত্যাগ করিবে। পুরাতন চাউলের অন্ন বা পোরের ভাত, কিম্বা চিঁড়া গরম জলে ভিজাইয়া দধি বা ঘোলের সহিত খাইলে অনেক সময় উপকার পাওয়া যায়। পাতিলেবুর রস পানের রসের সহিত মিশাইয়া পান করিলে অরুচি দমন হয়। মুখ দিয়া অনবরত স্বাদহীন বা টক জল উঠিতে থাকিলে ও পিপাসিত হইলে, একমাত্র ঘোল পান করা উত্তম ব্যবস্থা। ঘোল ও আনারসের রস সুপথ্য। আপেল, আঙ্গুর, ডালিম, পেঁপে প্রভৃতি সুপাচ্য ফল খাইতে বাধা নাই। চা বা কাফি, বেশী সোডা বা সোডাওয়াটার, বরফ ও আইসক্রিম্ বিশেষ অপকারী জিনিষ, ইহা ব্যবহার না করাই ভাল।

অগ্নিমান্দ্য বা অজীর্ণগ্রস্ত (Dyspepsia) রোগী স্থান পরিবর্ত্তন করিয়া কোন স্বাস্থ্যকর স্থানে কিছুদিন বাস করিলে অনেক স্থলে সুফল পাওয়া যায়। রাণীগঞ্জ, সাঁওতাল পরগণা, ছোটনাগপুর প্রভৃতি যে যে স্থানের মৃত্তিকায় প্রচুর লোহ (iron) আছে, সেই সেই স্থানে যকৃত দোষযুক্ত ও অজীর্ণ রোগীর পক্ষে বাস করা অহিতকর। এতাদৃশ রোগীর পক্ষে কাশী, গয়া বা সমুদ্রতীরবর্ত্তী স্থান (যথা—পুরী) সমূহে বাস করা বিশেষ হিতকর।

সংগ্রহ ও সঙ্কলন।

সংক্রামক ব্যাধি।

সচরাচর হইয়া থাকে এরূপ কয়েকটী সংক্রামক রোগের তালিকা নিম্নে দেওয়া গেল, যথা—প্লেগ, ওলাউঠা, ইনফ্লুয়েঞ্জা, বসন্ত, টাইফয়েড (বা আন্ত্রিক জ্বর), হাম, ডিপথিরিয়া, সংক্রামক কর্ণমূল (Mumps), হুকওয়ার্ম রোগ (Ankylostoma), যক্ষ্মা, পানবসন্ত, উপদংশ, ইরিসিপ্লাস, দূষিত মেহ প্রভৃতি।

কি কি উপায়ে সংক্রমণ এক শরীর হইতে অন্য শরীরে প্রবিষ্ট হয়?

(১) প্রত্যক্ষ ভাবে—যথা কামড়ের দ্বারা, কাটা বা ছড়াড় ভিতর দিয়া। উদাহরণ—জলাতঙ্ক ব্যাধি (কুকুরের কামড় দ্বারা), উপদংশ, ফোড়া ইত্যাদি।

(২) মনুষ্যের দ্বারা—

- (ক) নিশ্বাস প্রশ্বাসের দ্বারা-যথা যক্ষ্মা, নিউমোনিয়া ইত্যাদি।
- (খ) রস বা পুঁজের দ্বারা—ইরিসিপ্লাস, মেহ ইত্যাদি।
- (গ) রোগের সংক্রমিত অণুর দ্বারা, যথা—বসন্ত।
- (ঘ) মল, মূত্র, ঘাম, কফ্ বা থুতু ইত্যাদির দ্বারা যথা—ওলাউঠা, টাইফয়েড, নিউমোনিয়া, যক্ষ্মা, ডিপথিরিয়া ইত্যাদি।
- (ঙ) প্রত্যক্ষ স্পর্শের দ্বারা—ডিপথিরিয়া, যক্ষ্মা ও

পাওরিয়া (অর্থাৎ দাঁতের গোড়ায় পুঁজ হওয়া) চুম্বনের দ্বারা ছড়াইয়া পড়ে। দাদ ও চুলকানি স্পর্শের দ্বারা হইতে পারে।

(৩) সর্ব্বদা ব্যবহৃত সাধারণ জিনিষ পত্রের দ্বারা —

(ক) কাপড় জামা, গামছা ইত্যাদি যদি রোগীর মল, মূত্র, ঘাম, কফ বা থুতুর দ্বারা দূষিত হয় তাহা হইলে উহাতে সংক্রমণ বহু দিবস পর্য্যন্ত থাকিতে পারে, যদি সম্যকরূপে তাহা শোধিত করা না হইয়া থাকে। টাইফয়েড বা ওলাউঠা রোগীর মল মূত্রে দূষিত কাপড়, জামা, গামছা, বিছানার চাদরে, যক্ষ্মা ও নিউমোনিয়া রোগীর কফ, থুতু ইত্যাদির দ্বারা, বসন্ত রোগীর ব্যবহৃত কাপড় জামা ইত্যাদির দ্বারা। এমন কি আসবাব পত্র, তৈজস আদিও বসন্ত বা কলেরা রোগীর দ্বারা ব্যবহৃত হইলে বহু দিন পর্য্যন্ত সংক্রমণ রক্ষা করিতে পারে।

(৪) খাদ্য ও পানীয়ের দ্বারা—

দুগ্ধ, জল, কাঁচা শাক সব্জি, বাজারে বিক্রীত সরবৎ ইত্যাদি যে কোন পানীয় যাহাতে মাছি বসিবার সুবিধা আছে তাহা ওলাউঠা, টাইফয়েড মহামারীর সময়ে ব্যবহার করা বিশেষ বিপদজনক।

(৫) সংক্রমিত কীট পতঙ্গের কামড়ের দ্বারা—'এনফিলিস' মশার কামড়ের দ্বারা ম্যালেরিয়া, ইন্দুরে মাছির কামড়ে প্লেগ হইতে পারে। সাধারণ মাছি ওলাউঠা, টাইফয়েড, আমাশয় এবং অন্যান্য অসুখের সংক্রমণ ছড়াইবার সহায়তা করে।

কিরূপ সাবধান হওয়া উচিত ?

গৃহস্থের মধ্যে কাহারও কোন সংক্রামক ব্যাধি হইলে যাহাতে আর কেহ আক্রান্ত না হয় এবং এক বাটী হইতে অন্য বাটীতে ঐ রোগ না যাইতে পারে এ বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখা এবং উপযুক্ত পথ অবলম্বন করা যে প্রত্যেক ব্যক্তিরই একান্ত কর্ত্তব্য তাহা কি বিশেষ করিয়া বলিতে হইবে? কি ধনবান, কি গরীব, কি বিদ্বান, কি নিরক্ষর সকলের পক্ষেই এ বিষয়ে বিশেষ ভাবে সাহায্য করা তাঁহাদের নিজ আয়ত্বাধীন।

সংক্রামক ব্যাধি কাহারও হইলে গৃহস্থের এই কথা কয়টি মনে রাখা একান্ত দরকার—

(১) রোগীকে সম্পূর্ণ ভাবে পৃথক করিয়া একটি ঘরে রাখিতে হইবে। গৃহস্থের সকলেই যেন শুশ্রূষা না করেন, দায়িত্ব জ্ঞানবিশিষ্ট ২।১ জন লোকই যেন ঐ কার্য্যের ভার লন। যখন তাঁহারা ঐ রোগীর ঘর হইতে বাহিরে আসিবেন, হস্তাদি বেশ করিয়া ধৌত করতঃ কাপড় জামাদি ছাড়িয়া ফেলিবেন।

(২) সেই অঞ্চলের স্বাস্থ্যবিভাগের কর্ম্মচারীকে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক এবং যাহাতে তাঁহাদের শোধন কার্য্য বা পরীক্ষাদির সুবিধা হয় এরূপ সাহায্য করা একান্ত উচিত। আমরা সাধারণতঃ কি দেখিতে পাই? আমাদের দেশবাসীগণ ওরূপ কার্য্যে সাহায্য করা দূরে থাক বরং বাধা দিয়া থাকেন—খবর ত মোটেই দেন না।

(৩) **চিকিৎসা**—প্রথম অবস্থাতেই উপযুক্ত ডাক্তার ডাকিয়া চিকিৎসার বন্দোবস্ত করা দরকার। অনেক সময়েই সংক্রামক ব্যাধিসকল মারাত্মক হয়, তাই প্রথম হইতেই উপযুক্ত চিকিৎসার দরকার কারণ, তাহারা 'ও' ভাবিবার সময় দেয় না, ক্ষিপ্র গতিতে বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। নিতান্ত অপারগ হইলে নিকটস্থ হাঁসপাতালে পাঠান উচিত ও হেল্থ্ অফিসারকে জানান দরকার। তিনি হয় ত' বিনাব্যয়ে চিকিৎসার বন্দোবস্ত করিয়া দিতে পারেন।

(৪) সংক্রামক এত রকম উপায়ে ছড়াইয়া পড়িতে পারে যে, কোন প্রকার নিবারণী উপায়ই অবহেলার ছলে হাসিয়া উড়াইয়া দেওয়া উচিত নহে। কারণ কি জানি কোন উপায়ে সংক্রমণ ছড়াইয়া পড়িবে কিছুই বলা যায় না।

সংক্রামণ ছড়াইবার প্রশস্ত উপায় সকল এবং তাহাদের প্রতিকার—

(ক) মল, মূত্রাদি—এক বোতল ফিনাইল থাকিলেই যথেষ্ট হইবে। একটি মাটির গামলায় বা বেডপেনে উহার কিছু পরিমাণ জলে গুলিয়া রাখিয়া দিবে এবং রোগীকে, মল, মূত্র আদি উহার মধ্যে ত্যাগ করিতে বলিবে এবং সময় মত মেথর দ্বারা ড্রেনে নিক্ষেপ করাইবে বা যেস্থানে ড্রেন নাই তথায় পোড়াইয়া ফেলিবার বন্দোবস্ত করিবে; অভাবে মাটির মধ্যে পুতাইয়া দিবে। অবশ্য বাসগৃহ ও জলাশয় হইতে দূরে অবস্থিত স্থানেই ওরূপ করা উচিত।

রোগীর মল মূত্রে দূষিত কাপড় জামা এক ঘণ্টা কাল শতকরা ২০ ভাগ কার্ব্বলিক এসিডের জলে ভিজাইয়া তাহার পর সাবান দিয়া কাচিয়া, বা কেবল মাত্র জলে ভিজাইয়া তাহা বেশ করিয়া ফুটাইয়া লইতে হয়, পরে কাচিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া লইলেই চলিবে।

নিউমোনিয়া, যক্ষ্মা ইত্যাদি রোগীর গয়ের থুতু শুষ্ক হইবার আগেই জ্বালাইয়া দেওয়া উচিত, অভাবে তাহার পিকদানিতে খুব কড়া কার্ব্বলিক এসিডের জল (শতকরা ৩০ বা ৪০ ভাগ) রাখা দরকার। ফিনাইল, সাইলিন আদি রাখিলেও চলিতে পারে। এটি দেখিতে হইবে যেন ঐ রোগী পিকদানী ছাড়া আর কোথাও থুতু গয়ের আদি না ফেলেন।

(খ) রোগীর ব্যবহৃত তৈজস পত্র ফুটন্ত জলে পরিষ্কার করা উচিত।

(গ) আরোগ্য হইবার বা মরিয়া যাইবার পর ঘরে দরজা জানালাদি বন্ধ করিয়া গন্ধক জ্বালান দরকার। পরে ফিনাইলের জলে মেঝে দেওয়াল উত্তমরূপে ধৌত করতঃ চুণকাম করাইয়া লইবে। ঘরের আস্‌বাব আদি ফিনাইলের জলে ধুইয়া মুছিয়া পরিষ্কার করিয়া লইবে।

সংক্রামক ব্যাধি নিবারণী "ইনঅকুলেসন"—

ইনঅকুলেসন কাহাকে বলে সে বিষয়ে একটু পরিচয় বোধ হয় এখানে আবশ্যক। বসন্ত আদি সংক্রামক রোগে একবার আক্রান্ত হইলে আর ঐ রোগ হয় না, এ কথা অনেকেই জানেন, সেই জন্য রোগের জীবাণু এমন ভাবে প্রবেশ করান চাই যাহাতে রোগও প্রকাশ না পায় অথচ ঐ রোগ নিবারণী শক্তিগুলি বেশ উত্তেজিত হইয়া শরীরকে সংক্রমণের হাত হইতে বাঁচাইতে পারে। এই দিক দিয়া পরীক্ষার ফলে ঐ জীবাণুর মৃতদেহ স্বাভাবিক লাবণিক দ্রব্যের সহিত মিশ্রিত করিয়া, যে শরীরে যেরূপ ব্যবহার করা চলে সেইরূপ সংখ্যা নির্দ্ধারিত করিয়া দেওয়া হয় এবং ফলে ঐ রোগের হাত হইতে নিরাপদ থাকা যায়।

(১) ইনঅকুলেসন লইলে বিশিষ্ট রোগের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাওয়া যায়।

(২) ইনঅকুলেসন লইবার পর কোন প্রকারে ঐ রোগ হইলেও উহার প্রকোপ অনেক মৃদু হইয়া থাকে।

(৩) ইনঅকুলেসনে মৃত্যু সংখ্যা অনেক কমাইয়া দেয়।

কোন্ কোন্ সংক্রামক ব্যাধিতে 'ইনঅকুলেসন' সাধারণতঃ দেওয়া হয়?

জলাতঙ্ক ব্যাধি, 'প্লেগ', 'ওলাউঠা', 'বসন্ত' 'টাইফয়েড'।

কেহ উপরি উক্ত কোন রোগে (প্রথমটী ছাড়া) আক্রান্ত হইলে সেই গৃহস্থের অন্যান্য সকলের "ইনঅকুলেসন" লওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়, কারণ—

(১) ইহা লইতে কোন বিপদ নাই; সুতরাং নিরাপদ।

(২) মহামারীর সময় না লইলে বরং বিপদজনক হইতে পারে—কে জানে যে ঐ রোগের আক্রমণে পরবর্ত্তী পাত্র আপনি হইবেন না? ইনঅকুলেসন দেওয়া থাকিলে আক্রমণের সম্ভাবনা অনেক পরিমাণে কমিয়া যায়।

—স্বাস্থ্য, ১৩৩০।

মেয়েরা পোষাক-পরিচ্ছদের ভক্ত কেন?

মেয়েরা যে যথেষ্ট পরিমাণে পোষাক-পরিচ্ছদের ভক্ত, এ কথা আমরা প্রায় সকলেই বিশ্বাস করে থাকি, এমন

কি অনেক মেয়েরাও তা' স্বীকার করে। এখন, এই মেয়েদের দলের যদি কেউ পোষাকের নিন্দে করে কথা বলতে আসে তাহলে আমরা যেন একেবারে আকাশ থেকে পড়ি! কথাটা আমাদের কানে এম্নি খাপছাড়া শোনায়! তখন তার সম্বন্ধে এ-রকম সিদ্ধান্ত করে নিতে আমাদের আর একটুও বাধে না যে, এই মেয়েটির নারী-প্রকৃতিতে কোথায় কি যেন একটা অসম্পূর্ণতার ছাপ আছে যার জন্য এ এমন বিচিত্র মনোভাব ব্যক্ত করছে! বাস্তবিক পোষাক জিনিসটে মেয়েদের এতখানি প্রিয় ও আকাঙ্ক্ষার বস্তু যে, যখনই তাদের কারুর পোষাক-নিস্পৃহতা আমাদের কাছে প্রমাণ হয়ে যায়, তখন আমরা এ-টা না ভেবে পারিনে যে, সে নিশ্চয়ই একটা অভাব নিয়ে জন্মেচে যা খুবই বিস্ময়োৎপাদক নয়তো অবস্থা-বিপর্য্যয়ের তাড়নায় তার মনের ওপর এই বসন-বিতৃষ্ণাটা এসে পড়েচে তার নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও।

কিন্তু মেয়েদের দিক থেকে এটা প্রমাণ হয়ে যাওয়াটাও খুব কম সময়েই ঘটে। বেশীর ভাগ স্থলেই দেখা যায় যে, এটা একটা pose অথবা রূপ অভাবে অপরূপকে ফুটিয়ে তোলা। (If you can't be beautiful be odd)।

তবে পোষাকের ব্যাপার নিয়ে সত্য সত্যই মাথা ঘামায় না বরং তার চাইতেও ঢের উঁচুদরের কাজে নিজেকে নিযুক্ত রেখেচে, এমন মেয়েও যে সংসারে নেই, তা নয়। থাকলেও কিন্তু তাদের সংখ্যা নিতান্ত কম।

দেখা যায় প্রায় সকল মেয়ের জীবনেই এমন একটা সময় আসে যখন তাদের এই বসন-স্পৃহাটা অত্যুগ্র হয়ে ওঠে, ভাল কাপড় চোপড়ের নাম শুনলেই তারা এক রকম ক্ষেপেই যায়, কিন্তু এ-অবস্থাটা তাদের বেশীদিন স্থায়ী হয় না, আর তার উপর অধিকাংশের পক্ষেই অর্থ-সঙ্গতি এ সখকে খুব সহজেই দাবিয়ে রাখে। মেয়েদের এই সাজগোজের ধুমধাম সবার আগে বৃদ্ধদের চোখেই বড় বিরক্তিকর ঠেকে। তারা তখন শৃগালের দ্রাক্ষা-বৈরাগ্যের দর্শনটাকে বেশ যুক্তিপূর্ণ মনে করে নিজেদের সুদূর-পরাহত যৌবনের দুঃখকে ভোলবার চেষ্টা করেন। এ মন্দ কথা নয়, কিন্তু তাদের এটুকুও বোঝা উচিত যে, মেয়ের চরিত্রে এটা খুব দূষ্য নয়, কারণ যৌবনের ধর্ম্মই হচ্ছে নিজেকে সুসজ্জিত ও সুন্দর করে' দেখানো।

সত্য কথা বলতে কি, ছেলেদের অনেকেও আবার মেয়েদের এই পরিচ্ছদ-প্রিয়তা লক্ষ্য করে সময়ে সময়ে হাসে, কেউবা সহজভাবে, কেউবা উপহাস করে—যার যেমন শিক্ষা ও রুচি! তাদের বক্তব্য হচ্ছে এই যে, তারা এক-সুট পোষাকে মেয়েদের তুলনায় ঢের বেশীদিন চালিয়ে দিতে পারে, আর তাদের চোখে এইটে সব চাইতে আশ্চর্য্য ঠেকে যে, মেয়েরা কতকগুলো তুচ্ছ কাপড় চোপড়ের মানান বেমানান নিয়ে কি করে' ঘণ্টার পর ঘণ্টা অনর্থক কাটিয়ে যেতে পারে।

প্রকৃতপক্ষে ছেলেদের তরফ থেকে এ-রকম আশ্চর্য্য হবার কোন সঙ্গত কারণ দেখতে পাওয়া যায় না, তারা যেমনটি চায় মেয়েরাও ঠিক সেই ভাবেই নিজেদের সজ্জিত করে তোলে। মেয়েদের বসন-বিলাসকে তারা অপছন্দ করে, কিন্তু বেশভূষা সম্বন্ধে উদাসীন অথবা কুসজ্জিতা মেয়ের প্রতি তাদের মনোভাবকে কি যথার্থ সন্তোষজনক বলা যেতে পারে? তা কি অনেকটা অবজ্ঞা অথবা তাচ্ছিল্যের পর্য্যায়ভুক্ত হয়ে ওঠে না?

শুধুই যে ছেলেরা তাদের সৌন্দর্য্যের প্রশংসা করবে এই আশাতেই মেয়েরা পোষাক সম্বন্ধে বিচক্ষণ তাও নয়; তাদের নিজেদের সম্প্রদায়ের ভিতরেও এ জিনিসটার আদর খুব বেশী। সুবেশা মেয়েরা নারী-সমাজে বিশেষ খাতির পেয়ে থাকে। মাত্র এটুকু বলেই আমরা নির্দ্দেশ করে দিতে পারিনে যে, মেয়েরা নিজেদের ধনসম্পত্তি ও সজ্জিত সৌন্দর্য্যকে জাহির করে' প্রশংসা কুড়োবার জন্যেই পোষাকের এত ভক্ত। এ ত আছেই, এগুলি ছাড়া আরও কিছু আছে। চারু দর্শন অঙ্গাবরণে ভূষিতা হয়ে মেয়েরা একটা সূক্ষ্ম অথচ লঘু আনন্দের রেশ তাদের সর্ব্বদেহে অনুভব করে থাকে। রেশমের তৈরী পোষাকে এটুকু স্পষ্ট উপলব্ধি করা যায়। একেই মেয়েদের মন স্বভাবতঃ কোমল ও ভাবপ্রবণ, তার উপর পোষাকের ছাঁট-কাটের দিক দিয়ে যে কলাসম্ভূত আনন্দ artistic pleasure উপভোগ করার আছে, তাও অতি সহজে তাদের মনকে আকর্ষণ করে ও তার ফলে তারা পরিশেষে বস্ত্রানুরাগী হয়ে ওঠে।

... হয়েছিল যে, মেয়েদের মধ্যেও যদি কেউ পোষাককে অবহেলা দেখাবার চেষ্টা করে তাহলে ... সেটা খুব স্বাভাবিক তো হবেই না, বরং তার মধ্যে যা প্রকৃতি-সিদ্ধ হয়তো তাকেই গোপন করা হবে। এ অতি সত্য কথা যে, ছেলে ও মেয়ে উভয়েই সুচারুরূপে সাজ্জিত হয়ে একটা বড় রকম দানের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার সুচক তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচে।

পোষাকে মনোযোগী হওয়া কোনমতেই লজ্জার বিষয় নয়। সাজ-সজ্জার ভিতর দিয়ে আমরা মানুষের রুচির অনেকখানি পরিচয় পাই। তাছাড়া ভকৃতকে পোষাকে ম... ও বেশ ভাল থাকে। সুতরাং এ থেকে প্রমাণ হচ্ছে এ-জিনিসটা একেবারে হেলা ফেলার যোগ্য নয়। ...ান সভ্য দেশই চায় না যে তাদের মেয়েরা কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ না থাকা সত্ত্বেও শুদ্ধ একটা ভারী চাল চালাবার জন্য সজ্জাহীনা হয়ে থাকবে। বোধ হয় একমাত্র বাংলা দেশেই এটি সম্ভব।

মেয়েদের পোষাকের প্রতি অনুরাগ মোটের ওপর অনিষ্টকর কিছু নয়। তবে যারা নিত্য নূতন পোষাকে অঙ্গ ঢাকবার জন্যে ব্যগ্র অথচ অর্থ সঙ্কুলান করে উঠতে পারে না, তাদেরই এই পোষাক-লোলুপতা সংসারে নানান রকম অশান্তি ডেকে আনে। এই শ্রেণীর মেয়েরা যে কাজ ভাল করেন না তা বলাই বাহুল্য। আর আমাদের বিশ্বাস যে, সংখ্যায় এরা খুব কম।

সোজা কথায় মেয়েদের পরিচ্ছদ-প্রবৃত্তি নিতান্ত স্বাভাবিক এবং সুবিবেচনার সঙ্গে পরিচালিত হলে সকলেরই তা নয়ন-রঞ্জন ও আনন্দের কারণ হয়ে দাঁড়াবে।

শ্রীবিনয় চক্রবর্ত্তী।

কবিতা-কুঞ্জ।

মাতৃনাম।

[শ্রীসতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়]

ধার্ম্মিকের এ তীর্থরেণু,
গঙ্গাজল এ তৃষ্ণাতুরে;
আর্ত্তজনের রক্ষাকবচ
শ্যামের সুর এ ব্রজের পুরে।
সম্বল এযে পান্থজনের
সিদ্ধিমন্ত্র, যোগাভ্যাসে—
সুহৃদের এ গীতধ্বনি
গায়ত্রী এ মন্ত্রপাশে।
উদ্বোধনের ছন্দঃ এযে
শক্তি সাধন জগৎ'পরে;—
বল্ ওরে ভাই মধুর বাণী
বল্‌রে মা নাম ভক্তিভরে।

অমার মাঝে পূর্ণশশী,
দুঃখ দাহ ত্রিতাপ হরে—
মৃত্যু পরম শঙ্কা মানে
বল্ না সে নাম যুক্তকরে।
খড়্গী এযে পাপের 'পরে
পুণ্য জ্যোতিঃ জীবন মাঝে;—
বর্ণ চারি আচণ্ডালের
কণ্ঠে শিশুর সদাই রাজে।
প্রেম এ নামে উথলে উঠে
মুক্তি পায়ে লুটিয়ে পড়ে;
বল্ ওরে ভাই আকুল প্রাণে
বল্‌রে মা নাম কণ্ঠভরে।
ভক্তজনের কল্পতরু
বর্ম্ম এযে যুদ্ধমাঝে,

দয়ার নিখুঁত মূর্ত্তিখানি
আহ্বান তার চিত্তে বাজে।
স্নিগ্ধ পাবন প্রাণের বাণী
জীবন মরণ সফল করে ;
মাতৃনামের সাধন-ব্রতে
বল্‌রে মা নাম ভক্তিভরে।

বর্ষ-বিদায়।

[শ্রীশ্রীপতিপ্রসন্ন ঘোষ, বি-এ]

আজ্‌কে এ কি কোকিল দেখি ধর্‌ছে বিদায়-তান,
ধরার কাছে গায় কাজিকে শেষ বিদায়ের গান।
আগল ভেঙে পাগল হাওয়া আস্‌ছে হেথা রুখি,
পুরাতনের ঘোম্‌টা টুটি নবীন দিল উঁকি।
হর্ষ ব্যথার পুরাণ খাতার আজ্‌কে অবসান,
তরুণ আলোর রঙিন হয়ে গাও নূতনের গান।
বসুন্ধরা অশ্রুভরা—ফেল্‌ছে দীঘল্ শ্বাস,
বিদায় বিদায় বর্ষ-বিদায়,—বিদায় মধুমাস।

কেমনে।

(গান)

[শ্রীদীননাথ মজুমদার, এম-এ]

কেমনে ডাকিব তোমায় ?
কোন্ ধুপ দীপ কেমন মন্ত্রে,
কোথা, অনুসরি কোন্ তন্ত্রে
পূজিব তোমায় কোন্ গীতি ছন্দে
বলে দাও আমায় ;
কোথা মন্দির তব পুণ্য উজল ?
অর্ঘ্য ঢালিব কোন্ শতদল ?
(তব) রাতুল চরণ রেণুকা বিমল
কেমনে মাখিব গায়
বল, বল হে আমায়।

কতদূর ?

[শ্রীঅবনীকুমার দে]

একটী মানব শিশু কল্পনার বলে
তোমারে বাঁধিতে চায়
স্বীয় বক্ষপুটে,
তরঙ্গিত সুরধুনী ক্ষুদ্র অঞ্জিতলে—
তার,—মহাবেগে ধায়
তালে ছন্দে লুটে।

(২)

অশ্রান্ত উচ্ছ্বাস লয়ে লক্ষ শাখা মেলি
ছুটেছে সে যুকে কলি
মহাতীর্থ পথে,
হাসে কাঁদে নাচে গায় করে
নানা রঙ্গ রূপ ধরি
স্বীয় মনোরথে।

(৩)

তুমি যে সারথি তার র'য়েছ গোপনে
সে ত তাহা নাহি জানে
মহান চতুর।
অলক্ষ্যে লইয়া যাও আবর্ত্তের পানে
ভুলায়ে শিশু অজ্ঞানে
হায় পথচোর।

(৪)

তাই শেষে হ'য়ে যায় অন্ধ দিশিহারা
টুটে যায় সব সুর
হয় সে উন্মাদ,
কোথা মহা সাগর-সঙ্গম খুঁজে হয় সারা
কত—আর কতদূর ?
করে আর্ত্তনাদ।